সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দে
উৎসবে...
প্রাত্যহিক প্রয়োজনে..
সবার মনোরঞ্জনে...
পরিনামরমনীয়
কেশতৈল
কেশরঞ্জন
কবিরাজ এন. এন. সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড।

ঝক্ ঝকে দাঁত
আর সুন্দর হাসি
সাধনা
দশন
আয়ুর্বেদীয় মতে তৈরী আদর্শ দাঁতের মাজন
SADHANA
DASAN
SADHANA AUSADHALAYA
সাধনা দশন নিয়মিত ব্যবহার করিলে কোন দন্তরোগের ভয় থাকে না। দন্তরাজী সুস্থ, সবল ও সুন্দর হয়।
দেশীয় গাছগাছড়া হইতে ইহা প্রস্তুত হয়।

QUALITY RUBBER PRODUCTS .....
OUR SPECIALITY
PATHASATHI & PATHABIR
CYCLE TYRE & TUBE
A.R.P
1 INSERTION SHEET
2 RUBBER TUBE & HOSE
3 V BELT
4 HORN-BULB
5 SOLE-HEEL
6 TRI-CYCLE RUBBER PARTS
7 SPONGE PAD
8 PEDAL
9 SADDLE-TOP
10 BRAKE-RUBBER
11 PLAY BALL
12 BLADDER
13 HOT-BAG
14 RUBBER CLOTH
15 ERASER
STOCKISTS ALL OVER INDIA
ASSOCIATED RUBBER & PLASTIC WORKS
CALCUTTA • DUM-DUM

MARK TIME
Now is the season to see India by road—to see it at leisure and in comfort, by Mark II.
There's no need to suffer the holiday rush, or adhere to rigid time-tables. Choose your own itinerary. Plan stop-overs to suit yourself. Get there in your own sweet time—enjoying leisurely sight-seeing all the way.
Designed basically as a family car, and provided with ample leg-room, head-room and elbow-room, the Mark II allows you to ride in relaxed comfort.
Be it a moonlight visit to the Taj, a morning trip to Amber or Fatehpur-Sikri, a week-end jaunt to Jaipur or Agra, or an extended tour of Northern India, the Mark II provides the tourist with speedy, smooth, luxury motoring—without cramping, without fatigue.
Taj Mahal
Gateway of India
Howrah Bridge
Qutab Minar
Hawa Mahal
HINDUSTHAN
Ambassador
Mark II
HM
HINDUSTAN MOTORS LTD.
CALCUTTA-1.
ASP/HM-69
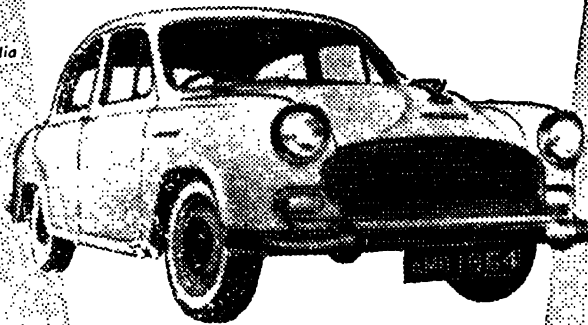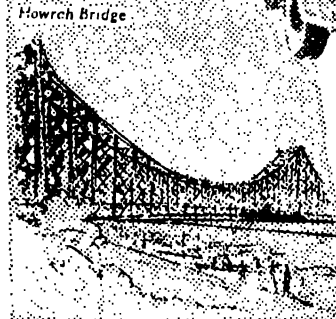
মানুষকে যখন
বিচারের জন্যে
তুলে ধরা হয়...
জে, এন, টাটা
৩রা মার্চ ১৮৩৯—
১৯শে মে ১৯০৪

ত্রয়োদশ বর্ষ ১ম সংখ্যা

বৈশাখ তেরশ' বাহাত্তর

সমকালীন ঃ প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

সম্পাদক ঃ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

RICHER LIQUOR FULL OF FLAVOUR

A blend of the finest Assam and other fine teas selected for strength and flavour.

Liptons, blenders of fine teas for over 70 years.

LYC-34

বৈশাখ
তের'শ বাহাত্তর

সমকালীন

ত্রয়োদশ বর্ষ
১ম সংখ্যা

রবীন্দ্রনাথের কবিতা অনুবাদের নিজস্ব ধারা

সুধাময়ী মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্র সাহিত্যের অনুবাদ কখন থেকে সুরু হয়, তা' জানতে আগ্রহ হয় স্বভাবতই। আরও জানতে ইচ্ছা হয় কখন থেকে কবি নিজে তাঁর কবিতার অনুবাদে হাত দেন।

১৯০৯ সনে রবি দত্তের Echoes from East and West বইতে তাঁর করা রবীন্দ্রনাথের আগের দিকের কবিতার কয়েকটি অনুবাদ আছে।

১৯১০ সনে আমরা দেখি মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প, কবিতা ইত্যাদির অনুবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। পান্নালাল বসু, যদুনাথ সরকার, লোকেন পালিত, অজিত চক্রবর্তী, আনন্দকুমার স্বামী, ভগিনী নিবেদিতা প্রভৃতির করা বহু অনুবাদ প্রকাশিত হয় ঐ পত্রিকায় ক্রমান্বয়ে ১৯১৩ পর্যন্ত।

১৯১২ সনে মডার্ণ রিভিউতে প্রকাশিত ভগিনী নিবেদিতার করা 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের অনুবাদ পড়ে উইলিয়ম রোদেনস্টাইনের এত ভালো লাগে যে রবীন্দ্রনাথের লেখা আরও পড়বার জন্য তিনি ব্যগ্র হন।

ঐ বৎসর (১৯১২) মার্চে কবি বিলাত যাবেন সব ঠিক। যাবার আগের দিন অসুস্থ হয়ে পড়ায় যাওয়া হল না তখন। একটু সুস্থ হয়ে তিনি চলে যান শিলাইদহে।

শিলাইদহে থাকেন নদীবক্ষে হাউসবোটে। সেখানে লেখেন গীতিমাল্যের অনেকগুলি কবিতা ও গান। আর কতকটা নিজের আনন্দে কতকটা হয়ত পশ্চিমের বন্ধুদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের আশায় নিজের কবিতা কিছু তিনি অনুবাদ করতে থাকেন।

১৯১২—মে মাসের শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথ বিলাত যান। লণ্ডনে পৌছে তিনি

রোদেনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করেন ও তাঁর হাতে একটি ছোট খাতা দেন—এটিতে ছিল তাঁর কবিতা কয়টির ইংরাজি অনুবাদ—এটিই ইংরাজি গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপি।

তারপর আমরা জানি—ইণ্ডিয়া সোসাইটি থেকে ঐ বৎসর নভেম্বরে ৭৫০ কপি ইংরাজি গীতাঞ্জলি বা Song offerings ছাপা হয়। পরে ম্যাক্‌মিলান কোম্পানি এই বই প্রকাশের ভার নেন। ১৯১৩ সনের নভেম্বরে কবি গীতাঞ্জলির জন্য নোবেল পুরস্কার পান।

ইংরাজি গীতাঞ্জলি কেবল বাংলা গীতাঞ্জলির অনুবাদ নয়। এর মধ্যে বাংলা গীতাঞ্জলির ৫১টি গীতিমাল্যের ১৮টি, নৈবেদ্যের ১৬, খেয়ার ১১, শিশুর ১৩ ও চৈতালি, স্মরণ, কল্পনা, উৎসর্গ ও অচলায়তন থেকে একটি করে—মোট ১০৩টি কবিতার অনুবাদ আছে।

লণ্ডনে, ম্যাক্‌মিলান কোম্পানি প্রকাশ করেন ১৯১৩ সনে অক্টোবরে The Gardener, নভেম্বরে, The Crescent Moon.

আমরা আগে বলেছি—১৯১২ সনের মার্চে কবির বিলাত যাওয়া স্থগিত হওয়ায় তিনি চলে যান শিলাইদহে; থাকেন নদীবক্ষে হাউসবোটে। সেসময় গীতিমাল্যের গান ও কবিতা রচনা করেন কিছু আর করেন তর্জমা কিছু কিছু নিজ কবিতার। দেখি ইংরাজি গীতাঞ্জলির প্রথম কবিতাটি হচ্ছে গীতিমাল্যের একটি গান 'আমারে তুমি অশেষ করেছ এমনি লীলা তব'। এই গানটি ও তার অনুবাদ উদ্ধৃত করে আমরা দেখবো কবির অনুবাদের নিজস্ব ভঙ্গীটি—

আমারে তুমি অশেষ করেছ এমনি লীলা তব
ফুরায়ে গেলে আবার ভরেছ জীবন নব নব।
কত যে গিরি কত যে নদী তীরে
বেড়ালে বহি ছোটো এ বাঁশিটিরে
কত যে তান বাজালে ফিরে ফিরে কাহারে তাহা কব।
তোমারি ঐ অমৃত পরশে আমার হিয়াখানি
হারাল সীমা বিপুল হরষে উছলি উঠে বাণী।
আমার শুধু একটি মুঠি ভরি
দিতেছ দান দিবস বিভাবরী
হোলোনা সারা কত না যুগ ধরি
কেবলি আমি লব।

Thou hast made me endless, such is
thy pleasure. This frail vessel thou
emptiest again and again and fillest it
ever with fresh life.
This little flute of a reed thou hast
carried over hills and dales, and hast
breathed
through it melodies eternally new.

At the immortal touch of thy hands
my little heart loses its limits in joy and
gives birth to utterance ineffable.
Thy infinite gifts come to me only
on these very small hands of mine.
Ages pass and still thou pourest,
and still there is room to fill.

আমরা জানি যে রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতার অনুবাদ তাঁর নিজের করা আছে আবার অন্য কারও করা আছে। এরকম একটি গানের তাঁর নিজের করা অনুবাদ প্রথমে আমরা উদ্ধৃত করছি :—

গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ আমার মন ভুলায় রে
কার পানে মন হাত বাড়িয়ে লুটিয়ে যায় ধূলায় রে।
ওযে আমার ঘরের বাহির করে
পায়ে পায়ে পায়ে ধরে
কেড়ে আমায় নিয়ে যায়রে
যায় রে কোন চুলায় রে।
কোন্ বাঁকে কি ধন দেখাবে
কোন্ খানে কি দায় ঠেকাবে
কোথায় গিয়ে শেষ মেলে যে
ভেবে না কুলায় রে।

My king's road that lies still before
my house, makes my heart wistful.
It stretches its beakoning hand towards me.
Its silence calls me out of my home,
With dumb entreaties, it kisses my feet at every step.
It leads me on I know not to what
abandonment,to what sudden
gain or surprises of distress
I know not where its windings end—
But my king's road that lies still
before my house, makes my heart wistful.

[Crossing 63]

এখানে দেখ্ ছি,—'গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ'-এর জায়গায় শুধু বললেন 'my king's

road'। 'যায়রে কোন্ ভুলায়রে'—এখানে লিখলেন 'it leads me on to what abandonment. তাঁর নিজের কবিতাকে তিনি রূপান্তরিত করেছেন—অবাঙালী পাঠকের কাছে যাতে তা সহজ সুন্দর হয়। অন্য অনুবাদকদের কাছে কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হয়—যাতে কবিতাটির রূপ না বদলে যথার্থ অনুবাদ হয়। এই গানটির অনুবাদ আর একজনের করা এবার আমরা উদ্ধৃত করছি :—

Ah, the red red road,
the run away village road,
lures my mind away.
It stretches its arms
out to the far distance
and my heart rolls away with the dust.
Out of the home it seduces me,
it solicits me, alas, at every lagging step.
It runs away with me
and leads me on to where I do not know.

[Cultural Forum, Tagore Number 1961]

অনুবাদ করবার সময় কবি কোনো দীর্ঘ কবিতার দু-তিনটি অংশের মধ্যে বেছে নিয়েছেন শেষেরটি আগে—পরে দিয়েছেন মাঝেরটি—প্রথম অংশটি বাদই দিয়েছেন। কড়ি ও কোমলের মধ্যে মঙ্গলগীত কবিতাটির তিনটি অংশের মধ্যে শেষেরটা অনুবাদ করে একটি পৃথক্ কবিতার আকার দিয়েছেন :—যেমন মঙ্গলগীত (৩)—

'আমার এ গান মাগো'র অনুবাদ হল Crescent Moonএর ৭৮ পৃষ্ঠায় 'my song' নামে কবিতাটি।

আর মঙ্গলগীতি (২)

'চারিদিকে তর্ক উঠে'র অনুবাদ—Crescent Moonএর ৭৯ পৃষ্ঠায় 'The Child Angel' কবিতা।

সোনার তরীর মধ্যে 'মানস সুন্দরী' দীর্ঘ কবিতাটি থেকে মাঝে মাঝে কিছু অংশ বেছে নিয়ে বিভিন্ন কবিতাকারে অনুবাদ করেছেন। যেমন--

'অবসন্ন দিবালোকে কোথা হতে ধীরে'—অনুবাদ করেছেন Fugitive II 8এ—I believe you had visited me in a vision.

'জানি আমি জানি সখী'—এ অংশের অনুবাদ রয়েছে Fugitive II 9এ—-I think I shall stop startled if ever we meet'.

'রজনী গভীর হ'ল'—এখান থেকে কিছুটা অনুবাদ করেছেন Fugitive II 18এ—The night deepens and the flame in the lamp flickers to its death.

'বীণা ফেলে দিয়ে এসো অংশটি অনুবাদ করেছেন Fugitive II—10এ—Lay down your lute, my love, leave your arms free to embrace me.

'তুমি এই পৃথিবীর প্রতিবেশিনীর মেয়ে'—এই অংশের অনুবাদ দেখা যায় আছে Fugitive III 6এ—My world, when I was a child, you were like a neighbouring girl to me —a stranger timid in her love.

নৈবেদ্যের দুটি পর পর কবিতা হল (১) 'তব পূজা না আনিলে দণ্ড দিবে তারে' (২) সেই তো প্রেমের গর্ব ভক্তির গৌরব'। এই দুটির মধ্যকার খানিকটা অংশ বেছে নিয়ে একত্রে একটি কবিতায় অনুবাদ করেছেন কবি—যেমন :—

হে বিশ্বভুবনরাজ, এ বিশ্বভুবনে
আপনারে সব চেয়ে রেখেছ গোপনে
নিস্তব্ধ নির্জন মাঝে যায় অভিসারে
পূজার সুবর্ণ থালি ভরি উপহারে
সে চাহে পূজিতে
একটি প্রদীপ হাতে রহে সে খুঁজিতে
বিনা আদেশের পূজা, হে গোপনচারী
বিনা আহ্বানের খোঁজ—সেই গর্ব তারি।

You hide yourself in your own glory,
my king.
... ...
You make room for us, while standing
aside in silence, therefore love
lights her own lamp to seek you
and comes to your worship unbidden. [Crossing 56]

এইভাবে দুটি কবিতা একত্রে অনুবাদ আরও করেছেন।

তিনি নিজেই একই কবিতা—একবার একভাবে অনুবাদ করেছেন—আবার অন্যভাবে করেছেন পরে এমনও দেখা যায়।

সোনার তরীর 'ঝুলন' কবিতাটির অনুবাদ The Gardenerএ আছে। আবার Fugitiveএ আছে ছোট করে—অন্যভাবে। The Gardener প্রকাশিত হয় ১৯১৩ সনে, Fugitive ১৯২১ সনে। আগে একরকম অনুবাদ করেছিলেন, ক'বছর পরে করলেন নূতনভাবে।

উৎসর্গের মধ্যে 'প্রবাসী'—(সব ঠাঁই মোর ঘর আছে)—কবিতাটির তৃতীয় ও চতুর্থ স্তবকের শেষের দিকে আছে :—

'তৃণে পুলকিত যে মাটির ধরা লুটায় আমার সামনে
সে আমারে ডাকে এমন করিয়া কেন যে কব তা কেমনে।

নিশার আকাশ কেমন করিয়া তাকায় আমার পানে সে
লক্ষ যোজন দূরের তারকা মোর নাম যেন জানে সে।
যে ভাষায় তারা করে কানাকানি
সাধ্য কী আর মনে তাহা আনি
চির দিবসের ভুলে যাওয়া বাণী
কোন্ কথা মনে আনে সে।
অনাদি উষার বন্ধু আমার তাকায় আমার পানে সে।
... ...
আছে আছে প্রেম ধূলায় ধূলায় আনন্দ আছে নিখিলে।

ধূলো সাথে আমি ধূলো হয়ে রব
সে গৌরবের চরণে
ফুলমাঝে আমি হব ফুলদল
তাঁর পূজা রতিবরণে।
... ...
যা হয়েছি আমি ধন্য হয়েছি
ধন্য এ মোর ধরণী।

Poems এ দেখি এই ক'টি পংক্তির অনুবাদ রয়েছে। আমরা অনূদিত কবিতাটি এখানে তুলে দিচ্ছি :—

'The dumb earth looks into my face and
spreads her arms about me.
At night the fingers of the stars touch my
dreams. They know my former name.
Their whispers remind me of the music
of a long silent lullaby. They bring
to my mind the smile of a face seen
in the gleam of the first day break.
There is love in each speak of earth and
joy in the spread of the sky.
I care not if I become dust, for the dust
is touched by his feet.
I care not if I become a flower, for the
flower he takes up in his hand.

What ever I am, I am blessed and blessed
in this earth of dear dust.

এইবার আমরা একটি বিষয়ে পাঠকদের লক্ষ্য করতে অনুরোধ করছি—তাহল কবি অনুবাদের জন্য কি ভাবে কবিতা নির্বাচন করে নিয়েছেন। আমরা দেখি খুব আগের দিকের কবিতা—যেমন সন্ধ্যা সংগীত, প্রভাত সংগীত, ছবি ও গান ভানুসিংহের পদাবলী থেকে কোনো কবিতা তিনি নিজে অনুবাদ করেননি। কড়ি ও কোমলের অনেক কবিতার অনুবাদ তার আছে। কারও কারও ধারণা কড়ি ও কোমল রচনার সময় কবি পাশ্চাত্য কবিদের সাহিত্য অনেক পড়ছিলেন; কতকটা হয়ত প্রভাবিতও হয়েছিলেন। তাই কড়ি ও কোমলের কবিতাগুলির সঙ্গে পাশ্চাত্য কবিদের কবিতার কিছু কিছু মিল যেন পাওয়া যায়।

মায়ার খেলার দু'চারটি অনুবাদ; মানসী থেকে খুব কম অনুবাদ আছে তাঁর। সোনার তরী, নৈবেদ্য, শিশু, খেয়া, উৎসর্গ ও গীতাঞ্জলি পর্বের অনেক অনুবাদ, বলাকা থেকে পূরবী পর্য্যন্ত অনেক অনুবাদ তিনি করেছেন। মহুয়ার কবিতা বেশী তাঁর করা নেই। আবার পুনশ্চ, পরিশেষ, শেষ সপ্তক, পত্রপুট, বীথিকা, সেঁজুতি, নবজাতক, প্রান্তিক থেকে অনেক অনুবাদ তিনি করেছেন। রোগশয্যা থেকেও দু'চারটি অনুবাদ তাঁর করা আছে।

এমনিভাবে দেখলে কতকগুলি অনুমান হয় যে খুব প্রথমদিকের কবিতা—তাঁরই মতে—এমন দানা বাঁধে নাই যে ভাষান্তরিত করে বিদেশী পাঠকদের কাছে ধরা যায় আবার কতকগুলির ভাবনা এমনি সূক্ষ্ম যে ভাষান্তর করতে গেলে তার স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়। অবশ্য কবির অনুবাদওত দেখেছি কেবলই অনুবাদ নয়; সেগুলি নূতন সৃষ্ট কবিতা। প্রকৃত মর্মার্থের কাব্যময় প্রকাশ ছিল কবির লক্ষ্য—অনুবাদ তার গৌণমাধ্যম।

কবির অন্যান্য অনূদিত কবিতা উদ্ধৃত করে এরূপ তুলনামূলক আলোচনা পরে আরও করার ইচ্ছা রইল।

রবীন্দ্রনাথের চার অধ্যায়ঃ কাহিনী

শুভব্রত রায়চৌধুরী

এক মানবিক জীবনবাদের পরিপ্রেক্ষিতে চার অধ্যায় কাহিনীর প্রবর্তনা। চার অধ্যায়ের বৈশিষ্ট্য হ'ল জীবনবাদ ও সাহিত্যের সুমিত সমন্বয়। এই জীবনবাদকে তত্ত্ব নাম দিলে ভুল করা হবে। **মানুষের ধর্ম** বা **কালান্তর**-এর পাতায় যখন তার প্রকাশ দেখি, তখন তাকে তত্ত্ব বললে কোনো দোষ নেই। কিন্তু সে যখন **গোরা ঘরে বাইরে** চার অধ্যায়ের ব্যক্তি পুরুষের চরিত্র মানসকে সঞ্জীবিত করে, তখন তাকে জীবনবাদ আখ্যা দিতে হবে। বস্তুত, তত্ত্ব এবং জীবনবাদের মধ্যে একটা বড় পার্থক্য আছে, যেমন আছে গাছের সঙ্গে বীজের।

বহুবিচিত্র জগতের বিপুল তথ্যসম্ভার মানুষের মনে জাগায় অসীম কৌতূহল, অনন্ত জিজ্ঞাসা। প্রকৃতির সামনে দাঁড়িয়ে মন যেন **রক্তকরবীর** রাজার মতো দাবি করে, "আমি জানতে চাই"। যা কিছু সে দেখছে শুনছে স্পর্শ করছে, তার বুদ্ধির কাছে তারা এক বিরাট দুর্বোধ্যতার চ্যালেঞ্জ। তাদের উলটে পালটে ছিঁড়ে কুটে সে বুঝতে চায় এই অগণিত তথ্যের অর্থ কি। নইলে তার বিরাম নেই স্বস্তি নেই। জানবার অদম্য আগ্রহে সে তথ্যের পর তথ্য সংগ্রহ ক'রে চলে, থরে বিথরে তাদের সাজায় গোছায়, তাদের পারম্পর্য তাদের কার্যকারণ সম্বন্ধ আবিষ্কার করে, বর্ণনা দিয়ে সংজ্ঞা দিয়ে ব্যাখ্যা দিয়ে তাদের এক একটা সুবোধ্য রূপ দেবার প্রয়াস পায়। এমনি ক'রে তথ্য জগতের আপাতদৃষ্ট-বিচ্ছিন্নতা-বৈষম্য-অসামঞ্জস্য-দুর্বোধ্যতার মধ্যে যখন এক সুষ্ঠু সুসম্বদ্ধ সুসমন্বিত রূপ ফুটিয়ে তুলতে পারে, তখনই বুদ্ধি তৃপ্ত হয় স্বস্তি পায়। বিজয়ী বুদ্ধির এই প্রয়াসের ফল হ'ল তত্ত্ব। বুদ্ধির কাজ এখানে শেষ হ'ল বটে, কিন্তু মনের কাজ তখনো অনেক বাকি। মনের ধর্ম মানুষকে চালানো, লক্ষ্যের অভিমুখে জীবনকে নিয়ে যাওয়া। মন খুঁজে ফেরে ধ্রুব তারার নিশানা। তার অনুসন্ধানের পথে যদি কোনো তত্ত্বের সাক্ষাৎ মেলে যার মধ্যে মানুষের অনন্ত জিজীবিষার প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়, মন তাকে আপন অন্তরলোকে ঠাঁই দেয়। সেখানে জীবনলিপ্সা ও বিশ্বাসের রঙে রসে সজীব সতেজ হয়ে তত্ত্ব তার শিকড় ছড়িয়ে দেয় চরিত্রমানসের গভীরে, শ্রেয়প্রেয়বোধের ফুলে পল্লবে জীবনকে সবুজ সুন্দর ক'রে তোলে। ব্যক্তি জীবনের আলো ছায়ায় নূতন রূপে বিকশিত তত্ত্বের নাম জীবনবাদ—মানুষের পথ চলার দিগ্‌নির্দেশ। তত্ত্ব নৈর্ব্যক্তিক; ব্যক্তি পুরুষের হৃদয়বৃত্তি ও বিশ্বাসের স্পর্শ বাঁচিয়ে চলতে হয় তাকে। কিন্তু জীবনবাদ মূলত ব্যক্তিক—প্রত্যেক ব্যক্তিজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা আকূতির প্রাণময় প্রতীক। ব্যক্তিমানস সাহিত্যের উপজীব্য, তাই জীবনবাদের সঙ্গে সাহিত্যের আত্মীয়তা আছে। কিন্তু নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্ব সাহিত্য এলাকার বাইরে। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন যে, কুমারসম্ভব পড়তে বসে কেউ প্রশ্ন তোলে না সাংখ্যতত্ত্ব যথাযথ ব্যাখ্যাত হয়েছে কিনা। ঠিক যেমন, "সীমার মাঝে অসীম তুমি" পড়বার সময় কেউ সেখানে রামানুজের বিশিষ্টা দ্বৈতা-দ্বৈতবাদের ভাষ্য খোঁজে না। Sholokov-এর Don-সিরিজের উপন্যাস সাহিত্যের দরবারে

মার্ক্সবাদী রাশিয়ার অনবদ্য দান; কিন্তু তার মধ্যে যদি কেউ *Capital*-এর ভাষ্য খুঁজে বেড়ায় তাকে আর যাই বলা হোক-না কেন, রসিক বলবে না কেউই। জ্ঞানলোকে তত্ত্ব মাথার বোঝা, কিন্তু অনন্তলোকে জীবনবাদ প্রাণের ঐশ্বর্য্য। সাহিত্যস্রষ্টা ব্যক্তি পুরুষের এই ঐশ্বর্যকে সকলের অন্তরের ধন ক'রে তুলবার প্রয়াস পায়।

চার অধ্যায় একটি প্রেমের কাহিনী—অতীন্দ্র এলার প্রেমের ইতিহাস। তাদের ভালোবাসায় যে-তীব্রতা যে-বেদনা ছিল, তাকে রূপ দেওয়াই আখ্যানবস্তুর উদ্দেশ্য। প্রেমের ট্র্যাজেডি যে কত বিচিত্ররূপে প্রকাশ পেতে পারে, রবীন্দ্রনাথের গল্প উপন্যাস তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। শ্রীশ-দামিনী-মধুসূদন-কুমুদিনী নিখিলেশ-বিমলা শশাঙ্ক-উর্মিলা আদিত্য-নীরজা-সরলা অমল-চারু এমন কি, অমিত-লাবণ্য—সকলের ভালোবাসাতেই ট্র্যাজেডির একটা-না-একটা দিক উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। প্রেমের ট্র্যাজেডিতে এত বৈচিত্র্য কেমন ক'রে সম্ভব তার এক সহজ সত্য উত্তর মেলে প্রেমের বিকাশ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আখ্যানে: "নর-নারীর ভালোবাসার গতি ও প্রকৃতি কেবল যে নায়ক-নায়িকার চরিত্রের বিশেষত্বের উপর নির্ভর করে তা নয় চারিদিকের অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতের উপরেও। নদী আপন নির্ঝর প্রকৃতিকে নিয়ে আসে আপন জন্ম শিখর থেকে, কিন্তু সে আপন বিশেষরূপ নেয় তটভূমির প্রকৃতি থেকে। ভালোবাসারও সেই দশা, একদিকে আছে তার আন্তরিক সংরাগ, আর একদিকে তার বাহিরের সংবাধ। এই দুইয়ে মিলে তার সমগ্র চিত্তের বৈশিষ্ট্য।" (রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৩শ | ৫৪৩ পৃষ্ঠা) প্রত্যেক প্রেমের ক্রমবিকাশে আছে এই সংরাগ ও সংবাধের দ্বন্দ্ব এবং এই দ্বন্দ্বের বিচিত্রতাই প্রেমকে নব নব বৈশিষ্ট্য দান করে। তাই প্রত্যেক প্রেমের ট্র্যাজেডি মূলে এক হ'লেও বিকাশে বিভিন্ন। **চতুরঙ্গ, ঘরে বাইরে, যোগাযোগ, মালঞ্চ, দুই বোন, শেষের কবিতা**—প্রত্যেক কাহিনীতেই এক বিশেষ সংবাধের সংঘাতে সংরাগ এক বিশেষ রূপ নিয়েছে। তাদের প্রত্যেকের প্রেমের ইতিহাস তাই আপন আপন বৈশিষ্ট্যের মহিমায় অভিনব। চার অধ্যায় কাহিনীতেও কবি "এলা ও অতীনের ভালোবাসার সেই বৈশিষ্ট্য"কে মূর্ত করতে চেয়েছেন। সুতরাং "তাদের স্বভাবের মূলধনটাও দেখাতে হয়েছে, সেই সঙ্গে দেখাতে হয়েছে যে-অবস্থার সঙ্গে তাদের শেষ পর্যন্ত কারবার করতে হল তারও বিবরণ।" (রবীন্দ্র রচনাবলী ১৩শ | ৫৪৪ পৃষ্ঠা) এলা এবং অতীন্দ্র যার যার আপন "স্বভাবের মূলধন" নিয়ে নদীর মত এসে পড়েছে এক বিশিষ্ট পরিস্থিতির মাঝে। সেই বিশিষ্ট পরিস্থিতি কেমন ক'রে তাদের জীবনকে গ্রাস ক'রে ফেলল, সেই বিরোধ কেমন ক'রে তাদের প্রেমের বিবর্তনকে প্রভাবিত করল, তাদের ভালোবাসার স্রোতকে কোন্ মরা বালুচরের দিকে টেনে নিয়ে গেল, কেনই বা গেল এটাই কাহিনীর বক্তব্য। অতএব তাদের অন্তর্দ্বন্দ্বের যৌক্তিকতা ও তীব্রতা অনুভব করতে হ'লে তাদের "স্বভাবের মূলধনটা"কে বুঝতে হবে। এই যে স্বভাবের মূলধন. এই যে প্রাণের ঐশ্বর্য—এটাই হ'ল জীবনবাদের প্রশ্ন। তাই তাদের উদ্‌ভ্রান্ত লক্ষ্যহীন রাহুগ্রস্ত চরিত্রমানসের মর্মোদ্ধার করতে গেলে জীবনবাদের প্রশ্নটাকে এড়িয়ে যাওয়া চলবে না। সে জয়দ্রথের মত সাহিত্যিক মূল্যায়নের ব্যূহদ্বারে দাঁড়িয়ে আছে।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহোদয় সংক্রান্ত আভাসের মাঝে তর্কের বীজ উপ্ত আছে সন্দেহ নেই।

কিন্তু স্বচ্ছ দৃষ্টি দিয়ে দেখলে এটাই প্রতিভাত হবে যে, উপক্রমণিকাটি কাহিনীকে বুঝতে সাহায্য করে, অন্তরায় হয় না। "আমার খুব পতন হয়েছে"—ব্রহ্মবান্ধবের এই স্বীকারোক্তি যেন ব্যক্তি-মানসের ইতিহাসে এক সকরুণ অভিজ্ঞতার শিরোনামা। এর মাঝে বাজে গভীর বেদনাবোধ ও আত্মগ্লানির রেশ। এই গ্লানিবোধের কারণ কি হ'তে পারে, সহানুভাবক মন নিয়ে কবি তার বিশ্লেষণ করেছেন অতীন্দ্র চরিত্রে। যে-অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি উপাধ্যায় মহোদয়ের আত্মগ্লানির কারণ হয়েছিল, সেই অভিজ্ঞা ও উপলব্ধি যে-কোন সংবেদনশীল মানবধর্মীর মনে অনুরূপ হৃদয়ানুভূতির আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে, এই মনস্তাত্বিক সত্যকে স্বীকার ক'রে নিলে চার অধ্যায় কাহিনীর রসাস্বাদন সহজ হয়ে উঠবে। মূল বক্তব্য হ'ল এই যে, যদি কোনো জীবনবাদ মানুষের বৈচিত্র্যময় ব্যক্তিত্বকে অস্বীকার ক'রে, তার মানবিক সত্তাকে উপেক্ষা ক'রে তাকে দল গোষ্ঠী বা সমাজের একটি জৈবিক ইউনিটমাত্র বানিয়ে ফেলে. যদি তাকে এমন পথে চলতে বাধ্য করে যে-পথে তার আপন জীবনবাদ প্রতি পলে বিপর্যস্ত, তবে সেই প্রতিকূল জীবনবাদের সঙ্গে মানবতাবাদীর সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। এমন সংঘর্ষ যখন ঘটে, মানবধর্মী চরিত্র হয় রঞ্জনের মতো হাসিমুখে রক্তকবীর গুচ্ছ নিয়ে মৃত্যুর সামনে দাঁড়ায়, ধনঞ্জয় বৈরাগীর মত 'পাড়ায় পাড়ায় ক্ষেপিয়া বেড়ায়', নিখিলেশের মত উন্মত্ত জনতার মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ে—নয়-তো ব্রহ্মবান্ধব এবং অতীন্দ্রের মতো স্বভাবভ্রংশতার দুঃসহআত্মগ্লানিতে পুড়ে মরে অনুখন অনুদিন।

কাহিনীর নায়ক-নায়িকা অতীন্দ্র এবং এলা। নায়িকার পরিচয় দেবার ভার কবি নিজেই নিয়েছেন। তাই এলার আবাল্য জীবনকাহিনী এবং ব্যক্তিত্বের গঠন সযত্নে বিবৃত হয়েছে আখ্যায়িকার ভূমিকায়। কিন্তু অতীন্দ্রনাথের আত্মপরিচিতি স্বমুখনিঃসৃত। এটা বোধ হয় তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের লক্ষণ। অতীন্দ্র কথা বলতে ভালোবাসে। একদা "কথার টর্নেডো দিয়ে সনাতন মূঢ়তার ভিৎ" ভাঙবার পণ করেছিল সে। এই বাক্‌প্রীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অহংকার যাকে তার "স্বভাবের সর্বপ্রধান সদ্‌গুণ" ব'লে নিজেই পরিহাস করেছে। ক্ষুরধার বিশ্লেষণে অতীন্দ্রের আনন্দ। এলা, দল, সহকর্মী, নিজে—কেউই সে বিশ্লেষণের কাটাছেঁড়ার বাইরে পড়ে নি। তাই চিত্রধর্মী সাহিত্যপ্রতিভা কথার তুলি দিয়ে নিরন্তর ছবি এঁকেছে আপন অন্তরের ভালোবাসার, আশা-নিরাশার। অতীন্দ্র যেন এক অস্থির অগ্নিশিখা—অবিরাম গতি, শ্রান্তিহীন অন্তর্দাহন ; ঊর্ধ্বে যাবার পথ বন্ধ তাই নিজের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে মরছে অশ্রান্ত অন্তরাবেগে। সেইজন্য আমরা দেখতে পাই, অতীন্দ্র আপন দোষত্রুটি নিয়ে গর্ব করছে, নিষ্ফল ভালোবাসার বেদনায় গুমরে মরছে, স্বভাবভ্রংশতার গ্লানিতে আত্মধিক্কারের চিতা সাজিয়ে জ্বলছে। তাকে দেখলে মনে হয় সে যেন এক অশান্ত পাগলাঝোরা, অন্ধকার গুহার মধ্যে বন্দী হয়ে চারিদিকের দেয়ালের উপর মাথা ঠুকে মরছে অসম্ভাব্য মুক্তির মর্মান্তিক নিরাশায়। একদিকে দুরন্ত বিদ্রোহ, আর একদিকে গ্লানিময় সমাপ্তির অনিবার্যতাবোধ—এ দুয়ের সংঘর্ষে যে আগুন জ্বলে ওঠে তার আভা অতীন্দ্রের পুরুষকারকে উজ্জ্বল ক'রে তুলেছে। এক ক্ষতবিক্ষত বন্দী আত্মা সে, যেন এক নূতন Prometheus Bound। কিন্তু বন্ধন বাইরের নয়। যদি হ'ত,

তাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবার শক্তি ছিল তার পৌরুষের। বন্ধন তার অন্তরে, তার ব্যক্তি-মানসের মাঝে, তার সংকল্পের শুচিবোধে, আত্মসম্মানের দৃঢ়তায়। স্বভাবকে সে নষ্ট করেছে, কিন্তু সে যেন তার স্বভাবরক্ষার প্রণোদনাতেই। এই আন্তর্বিরোধিতা অতীন্দ্রচরিত্রের একটি অতি-বিশিষ্ট লক্ষণ। এই কারণেই সে এমন জটিল পুরুষচরিত্র হয়ে উঠেছে যার দোসর বৈচিত্র্যময় রবীন্দ্র সাহিত্যেও বিরল।

অতীন্দ্রের মুখর ব্যক্তিত্বের কাছে এলা যেন মৌন-ম্লান। প্রশ্ন জাগে, এলা কি অশরীরী ছায়া—সে কি শুধু অতীন্দ্রের মতামতের একটা ক্ষীণকণ্ঠ প্রতিবাদ? সমালোচকমহলে এমন কথা শোনা গেছে যে, এলা শুধু একটা idea মাত্র, অতীন্দ্রের আদর্শবাদী বিশ্লেষণী প্রতিভার প্রকাশ-কল্পেই তার উপস্থাপনা। এলার কথাবার্তায় তার ব্যক্তিত্ব মূর্ত হয়ে উঠে নি, শুধু কতকগুলি অভিমত ব্যক্ত হয়েছে; এটাও কোনো কোনো সমালোচকের ধারণা। সে যেন রক্তে-মাংসে-গড়া নারী নয়, কেবল নারীত্বের রূপহীন লাবণ্যের আবছায়া আভাস।

এই মতামত যুক্তিসংগত কি না সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। এলার জীবনকাহিনী পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়, তার চারিত্রিক ক্রমবিকাশ এক বিশিষ্ট ধারা বেয়ে চ'লে এসেছে। সেই ধারা ধোঁয়াটে তো নয়ই, বরং রঙে রসে রেখায় সুস্পষ্ট। মনস্তত্ত্বের গূঢ় সূক্ষ্ম নির্দেশ দেখতে পাওয়া যায় তার কাজে কথায় চিন্তায়। এমন কি, যে-জায়গায় এসে তার জীবনায়নের মোড় ঘুরল, সেখানেও মনস্তত্ত্বের অঙ্গুলীসংকেত স্থানির্দিষ্ট। তার জীবনের সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনা হ'ল, প্রেমের আবির্ভাব। আবাল্য-সঞ্চিত সংস্কার, আত্মসৃষ্ট বাধা—সব ভেঙে চুরে গেল সেই আবির্ভাবের আকস্মিকতায়। সংস্কার এবং প্রেমের দ্বন্দ্বে উদ্‌ভ্রান্ত এলা যখন জীবনের শেষ সীমানায় পৌঁছল তখন তার আত্মোপলব্ধির পরিপূর্ণতা ঘটল। ক্ষণিক সেই মুহূর্তটুকু। কিন্তু সেই ক্ষণিক মুহূর্তই যেন অনন্ত হয়ে উঠল তার জীবনে যখন সে জেনে গেল এবং জানিয়েও যেতে পারল সে নারী। তার অন্তর্বেদনার মধ্যে এক দুর্লভ মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেম মূর্ত হয়ে উঠেছে। তার সম্বন্ধে মন তাই ব'লে উঠতে চায়—

"দুরাকাঙ্ক্ষার পরপারে বিরহতীর্থে করে বাস
যেথা জ্বলে ক্ষুব্ধ হোমাগ্নিশিখায় চিরনৈরাশ—
তৃষ্ণাদাহনমুক্ত অনুদিন অমলিন রয়।
গৌরব তার অক্ষয়॥"

এলা এবং অতীন্দ্রের ব্যক্তিত্বে অনেকখানি মিল আছে। থাকাই স্বাভাবিক। পরস্পরকে তাই তারা নিবিড় ক'রে আকর্ষণ করেছে। আবার অমিলের পরিমাণও কম নয়। সেইজন্য তাদের প্রেমের মাঝে সংঘাত আছে, আছে সমর্পণ। দুই-ই প্রকাশ পেয়েছে পাশাপাশি বিষণ্ণ-সুন্দর মাধুর্যে। দু'জনেই উচ্চ শিক্ষিত, বুদ্ধি-অভিমানী। দু'জনের চরিত্রেই স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। উভয়েই সাহিত্যধর্মী। উভয়েই অন্যায়-অসহিষ্ণু, নীতি-নিষ্ঠ, শুচি-প্রিয়, সংকল্পসাধক। চারিত্রিক গঠনের এই সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও তাদের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে দুস্তর ব্যবধান, যার ফলে দু'জনের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য সহজেই ধরা পড়ে। যদিও অতীন্দ্রের বাল্যজীবন সম্বন্ধে

আমরা বিশেষ কিছুই জানি না, তবু এটা অনুমান করা অসংগত হবে না যে, তার পারিবারিক প্রতিবেশে এলার জীবনের অঘটনগুলো ঘটে নি। সুতরাং যে-সংস্কারগুলি এলার অভিজ্ঞতা থেকে সঞ্জাত হয়েছে, অভিজ্ঞতার আলোয় যেগুলি সত্য ব'লে স্বীকৃত হয়েছে, এলার সেই সংস্কারগুলি অতীন্দ্রের কাছে অদ্ভুত অযৌক্তিক অধার্মিক ব'লে প্রতীত হয়। এলার জীবনের ট্রাজেডির মূলে আছে এই আবাল্য-অর্জিত অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত সংস্কারগুলির দ্যোতনা। অন্যদিকে, অতীন্দ্রের জীবনে ট্র্যাজেডি এনেছে তার স্বধর্মাশ্রমের অনমনীয় আত্মাভিমান। নারীর জীবনে সংস্কারের প্রভাব প্রবল। পুরুষের কাছে স্বধর্ম-সাধনের আশা দুর্বার।

এলা অতীন্দ্র ছাড়া আর একটি ধ্রুপদী চরিত্র আছে। সে ইন্দ্রনাথ। বিপ্লবী আন্দোলনের নেতা, সকলের মাস্টার মশায়। নেতৃজনোচিত গুণের আধার ব'লে পুতুল নাচের সব দড়িগুলো তার হাতে বাঁধা। তার সাক্ষাৎ আমরা স্বল্পই পাই; কিন্তু সেই স্বল্প পরিচয়েই আমাদের মনে ইন্দ্রনাথ এক ঋজু লৌহকঠিন বলিষ্ঠ নির্মোহ পুরুষকারের ছাপ রেখে যায়। সে যেন মধ্যাহ্ন সূর্য।

এদের সঙ্গে আছে কানাই গুপ্ত। সে একাধারে ইন্দ্রনাথের "প্রধান মন্ত্রী" ও দলের "রসদজোগানদার"। পুলিশের কুদৃষ্টি পড়েছিল তার 'পরে। সরকারী কোপ এড়াবার জন্য সরাসরি সে সরকারী 'কানাকানি বিভাগের' গোয়েন্দার তালিকায় নাম লিখিয়ে নিল, কারণ "নিমতলাঘাটের রাস্তা ছাড়া কোনো রাস্তা নেই যাদের সামনে, তাদের পক্ষে এটা গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, দেশের বুকের উপর দিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত বরাবর লম্বমান।" (চা, অ, | ৮৩ পৃঃ) সে নিঃসংকোচে স্বীকার করে, "যে-শিকার জালে পড়েইছে আমি তার ফাঁস টেনে দিই।" (চা, অ, | ৮৪ পৃঃ) দলের যারা আপনি ঝ'রে পড়ে, তাদের "ঝেঁটিয়ে ফেলে পুলিশের পাঁশতলায়"। এ ধরণের বিশ্বাসঘাতকতা গর্হিত, কিন্তু কানাইএর কাছে নিষ্পাপ। ঘোরতর অকাল্পনিক প্রাক্‌টিকাল লোক সে, দু'কূল রক্ষা ক'রে চলাই তার লক্ষ্য। Informer জাতীয় লোকের ভাগ্যে সহানুভূতি কদাচিৎ জোটে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, কানাই প্রথম থেকেই পাঠক মনের সঙ্গে একটা সহজ সম্পর্ক পাতিয়ে ফেলে। তার কারণ, সে মূলত একজন মরমী মানুষ। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ফলে তার কোমল হৃদয় বৃত্তিগুলি শুকিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। অনেকটা গেছেও, তবু যেটুকু বাকি আছে, সেটাই তার মনুষ্যত্বের পরিচয়। কানাইএর কথা-বার্তায় দৃষ্টিভঙ্গীতে cynicism এর বিদ্যুচ্ছটা দেখতে পাওয়া যায়; কিন্তু সেটা যেন বাহ্য। মানুষের দুর্বল দিকটাকে সে ভালো ক'রেই জানে, জানে কোথায় তারা ছোট। তবু মানুষকে সে ভালোবাসে, কোনো প্রতিদানের আশায় নয় নিছক ভালোবাসার দায়ে। এক স্নেহশীল ঔদার্য তার চরিত্রে জাগিয়ে তুলেছে বন্ধুতার ক্ষেমংকর প্রবণতা। তাই সে আমাদের প্রিয় হয়ে ওঠে নিমেষেই। তাকে আমরা মাত্র দু বার দেখি। কিন্তু এই ক্ষণিক পরিচয়ের অতি-সীমিত পরিসরের মধ্যেই সে প্রমাণ ক'রে যায়, ভরা-ডুবি মানুষের জন্য তার অফুরন্ত সহানুভূতি। চার অধ্যায়ের গুমোট অন্ধকারে কানাই গুপ্ত একমাত্র আলোক রন্ধ্র।

এরা চারজন ছাড়া আরো একটি মানুষ আছে যে শুধু একবার মাত্র দেখা দেয়, তারপর

নেপথ্যে ব'সে শেষ পরিণামের মর্মান্তিক ঘুঁটি চালে। সে বটু। এলার কাছেই তার যথাযথ বর্ণনা পাওয়া যায় "ওর একটা ভিতরকার চেহারা দেখতে পাই কুৎসিত অক্টোপাস জন্তুর মত। মনে হয় ও আপনার অন্তর থেকে আটটা চটচটে পা বের ক'রে আমাকে একদিন ঘিরে ফেলবে—কেবলি তার চক্রান্ত করছে।" (চা, অ, | ৭৭ পৃঃ) বটু এক কামুক চরিত্র যার "স্বভাবে অনেকখানি মাংস, অনেকখানি ক্লেদ।" এলার দিকে তার লালায়িত হাত বাড়িয়ে দিয়েছে আত্মবিস্মৃত দুরাশায়। তাই প্রত্যাখ্যানের অপমান তাকে সর্বনাশ ঘটাবার পথে টানে। ভোগের জিনিস থেকে বঞ্চিত হ'ল ব'লে বিশ্বাসঘাতকতা করতে তার বাধল না কোথাও। মাংস প্রধান চরিত্রে ভোগলিপ্সা দুর্বার, পাওয়ার নেশা অদম্য, ঈর্ষা সহজাত। না-পাওয়া জিনিসকে ভেঙে ফেলায় তাদের জান্তব উল্লাস। বটু-চরিত্র এত সুষ্ঠুরূপে আঁকা হয়েছে যে তাকে একবার দেখেই আমাদের আশ মেটে, দ্বিতীয়বার দেখবার ইচ্ছা হয় না। তার কিলবিল করা লালসার স্পর্শ শুধু এলাই অনুভব করে তা নয়, পাঠকও এড়িয়ে যেতে পারে না।

রবীন্দ্র-মানসে যন্ত্রের মূল্যায়ন

অমিয়কুমার মজুমদার

ইয়োরাপ যে সর্বদেশের পরে তার আধিপত্য বিস্তার করেছিল তার মূল অনুসন্ধান করতে গেলে একটি সত্যেই উপনীত হতে হয় যে বিজ্ঞান তাকে ক্ষমতা দিয়েছে, সম্ভ্রম দিয়েছে, এনে দিয়েছে সমগ্র বিশ্বে স্বতন্ত্র মর্যাদা। বিজ্ঞানকে সে তার জীবনের সত্য বলে মেনে নিয়েছে। বিজ্ঞানের বিরাট শক্তিকে যদি মূর্তিমান করে তোলা যেত তাহলে আমরা নিঃসন্দেহে অভিভূত হয়ে পরতাম। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন 'বিজ্ঞান বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে মানুষের প্রবেশপথ খুলে দিচ্ছে।' অথচ যন্ত্রের প্রতি কবি বিরূপতা প্রকাশ করেছেন। আমার মন্তব্য স্পর্ধিত হলেও বলবো—তাঁর ধারণা সঠিক ছিল কিনা এ বিষয়ে যথেষ্ট সংশয়ের অবকাশ আছে।

যন্ত্র মানুষকে দেয় আরাম, স্বাচ্ছন্দ্য, আনে নিশ্চিন্ত নিরাপত্তার ইঙ্গিত। কিন্তু যন্ত্রকে মারণযজ্ঞে প্রয়োগ করবার জন্য দায়ী কে? যন্ত্র নিজে? না—মানুষ? আলফ্রেড নোবেল যখন ডিনামাইট আবিষ্কারের উল্লাসে মেতে উঠলেন তখন কি ভেবেছিলেন এর ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ প্রাণের বলি হতে পারে? তাই বলে কি ডিনামাইট অপ্রয়োজনীয় বস্তু? মানুষের হিতকামী বন্ধু সে কি নয়? এ প্রশ্নসমূহের উত্তরদান বাহুল্যমাত্র। রবীন্দ্রনাথ বিশুদ্ধ বিজ্ঞানকে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন কিন্তু ফলিত অধ্যায়কে প্রথমে আহ্বান জানাতে পারেন নি। বিজ্ঞানের দুটি দিক নিয়ে কবির অন্তরে বেশ দ্বন্দ্ব ছিল। যন্ত্রকে সহজে তিনি প্রাণের আসরে ঠাঁই দেন নি। কেন? কবির কথাতেই তাঁর কৈফিয়ত শোনা যাক: 'বিজ্ঞান যে বিশুদ্ধ তপস্যার প্রবর্তন করেছে সে সকল দেশের, সকল কালের, সকল মানুষের—এইজন্যেই মানুষকে তাতে দেবতার শক্তি দিয়েছে, সকলরকম দুঃখ দৈন্য পীড়াকে মানবলোক থেকে দূর করবার জন্যে সে অস্ত্র গড়ছে; মানুষের অমরাবতী নির্মাণের বিশ্বকর্মা এই বিজ্ঞান। কিন্তু এই বিজ্ঞানই কর্মের রূপে যেখানে মানুষের ফলকামনাকে অতিকায় করে তুললে সেইখানেই সে হল যমের বাহন।' (১)

কবির মতে ইয়োরোপ বিজ্ঞানকে করে তুলেছে যমের বাহন। সে দেবতার শক্তি পেয়েছে অথচ পায়নি দেবত্ব। কবি বলেন পাশ্চাত্য জগৎ তার বিজ্ঞান নিয়ে আমাদের কাছে আসে নি। এসেছে তার লোভ, লালসা নিয়ে, তার কামনা নিয়ে। বিজ্ঞানের স্পর্ধায়, শক্তির গর্বে, অর্থের প্রাচুর্যে মদমত্ত হয়ে সমগ্র পৃথিবীর মানুষদের লাঞ্ছনা দেবার কাজে আনন্দ পেয়েছে ইয়োরোপ। তার ফল এবার নিজেদের এলাকাতেও প্রবেশ করেছে। পৃথিবী জুড়ে যুদ্ধবিগ্রহকে কবি যন্ত্রবাহন সভ্যতার অন্যতম অভিশাপ বলে মনে করেছেন। পৃথিবীতে মানুষনিধন যজ্ঞের অগ্নিশিখা যে লোলজিহ্ব হয়ে উঠছে তাকে নিবারণ করবে কে। এ সম্বন্ধে কবি বলেছেন, 'সে থামা কি যন্ত্রকে থামিয়ে দিয়ে আমি তা বলিনে। থামাতে হবে লোভ। সে কি ধর্ম উপদেশ দিয়ে হবে। তাও সম্পূর্ণ হবে না। তার সঙ্গে বিজ্ঞানেরও যোগ চাই। যে-সাধনায় লোভকে ভিতরের দিক থেকে দমন করে সে-সাধনা ধর্মের, কিন্তু যে-সাধনায় লোভের কারণকে

বাইরের দিক থেকে দূর করে সে-সাধনা বিজ্ঞানের। দুইয়ের সম্মিলনে সাধনা সিদ্ধ হয়। বিজ্ঞানবুদ্ধির সঙ্গে ধর্মবুদ্ধির আজ মিলনের অপেক্ষা আছে।' (২) আধুনিক সভ্যতার যুগে একটি রিপু মানুষকে ক্রমাগত ভাবে উন্মাদ করে তুলছে, তা হলো লোভ। লোভের মাত্রা যত বাড়ছে, পৃথিবী জুড়ে অশান্তির পরিমাণ সেই অনুসারে বেড়ে চলেছে। হয়ত একারণেই কবি শিল্পের প্রসার যদি কামনা না করে থাকেন তাহলে তিনি কি আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন ? কৃষি-সভ্যতার পুনরাগমন ? এখানে আরো একটি প্রশ্ন জাগবে। রামায়ণ বা মহাভারতের যুগে যখন কৃষি সভ্যতার প্রাধান্য ছিল (বিশেষভাবে রামায়ণের যুগে) তখনও কি শিল্পের কোন প্রসার ঘটে নি ? লোভ দ্বেষ, ঈর্ষা কি যুদ্ধ ডেকে আনেনি ? বিশেষতঃ যুদ্ধ সময়ে যে সমস্ত অস্ত্র বা বাহন ব্যবহৃত হতো তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও তো আজকাল কিছু কিছু মিলছে। কাজেই কে বলতে পারে যে সেকালে ফলিত বিজ্ঞানের প্রসার ছিল না ! কবি বলছেন, 'বড়ো বড়ো মুনফাওয়ালা পাটকল চটকল গঙ্গার ধারের লাবণ্যকে দলন করে ফেলেছে দম্ভভরেই। মানুষের রুচিকে সে একেবারেই স্বীকার করে নি ; একমাত্র স্বীকার করেছে তার পাওনার ফুলে-ওঠা থলিটাকে।'

এখানেও বিচার •নিরপেক্ষ হয়• নি। পাটকল, চটকল, যেগুলো গড়ে উঠেছে তা কি আমাদের স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিচ্ছে না ? একসময় এমন অবস্থা ছিল যে বিদেশ থেকে বস্ত্রসম্ভার না এলে, ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড় না হলে বাজার চলতো না। কবির পরিবারেও এঘটনা ঘটেছে। যদি বলা হয় দেশীয় তাঁতে কাপড় বুনে নিলেই হবে। গান্ধিজী তো চরকার কথা সাড়ম্বরে প্রচার করে গেছেন। কিন্তু তাতে কি দেশেব এই বিপুল জনসংখ্যার 'আবরণ' তৈরী করা সম্ভবপর। এর পরে যে প্রশ্ন আসছে তা হলো আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য আনা। স্বদেশে কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হলে দেশের প্রয়োজন সুলভে মেটানো যাবে। দ্বিতীয়তঃ বিদেশ থেকে (বাণিজ্যের সাহায্যে) অর্থ এনে দেশের অভাব দূর করা সম্ভব হবে। তৃতীয়তঃ দেশের মানুষের রুজির সমস্যা কিছু পরিমাণে লাঘব হয়।

এখন প্রশ্ন আসবে কল কারখানা স্থাপনের স্থান নির্বাচন নিয়ে। সহজে পণ্যসামগ্রী নিয়ে আসার সুবিধে যেখানে আছে সেখানেই গড়ে ওঠে মিল, কারখানা। তবে একথা সত্য যে অর্থের লালসা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধির দিকে চলেছে এবং তা নিশ্চিতভাবে অস্বাস্থ্যকর। কবি ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন এ যুগের বাইরের দিকটা নির্লজ্জতায় ভরা। যেন পাকযন্ত্রটা দেহের পর্দা সরিয়ে সামনে বেরিয়ে নিজের জটিল অন্ত্র-তন্ত্র নিয়ে দোলায়মান অবস্থায় আছে। ক্ষুব্ধ কবি কণ্ঠ বলে উঠল, 'তার ক্ষুধার দাবি ও সুনিপুণ পাকপ্রণালীর বড়াইটাই সর্বাঙ্গীণ দেহের সম্পূর্ণ সৌষ্ঠবের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে। দেহ যখন আপন স্বরূপকে প্রকাশ করতে চায় তখন সুসংযত সুষমার দ্বারাই করে ; যখন সে আপন ক্ষুধাকেই সব ছাড়িয়ে একান্ত করে তোলে তখন বীভৎস হতে তার কিছুমাত্র লজ্জা নেই। লালায়িত রিপুর নির্লজ্জতাই বর্বরতার প্রধান লক্ষণ, তা সে সভ্যতার গিলটি-করা তকমাই পরুক কিম্বা অসভ্যতার পশুচর্মেই সেজে বেড়াক--ডেভিল্ ডান্সই নাচুক কিম্বা জাজ্ ডান্স্।' (৩)

যে সব উদ্ধৃতি দেওয়া হলো তাতে একথাই পরিষ্কার করে ফুটে উঠছে কবি যন্ত্রের পক্ষপাতি

ছিলেন না। একথা বললে কবির প্রতি অবিচার করা হবে। কারণ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুকে এক পত্রে তিনি যা লিখেছিলেন তাতে তাঁর যন্ত্রের প্রতি বীতরাগের কোন ইঙ্গিত নেই। পত্রটি ১৩১৪ সালের পৌষ মাসে লেখা। তা হলে কি একথাই মনে করতে হবে যে পরবর্তী অধ্যায়ে যন্ত্রের প্রতি তাঁর বিরূপতা এসেছিল! এ নিয়ে বিতর্কের অবকাশ থাকতে পারে। যদি মেনে নেওয়া যায় কবি যন্ত্রকে অপছন্দ করতেন না, করতেন অপব্যবহারকে তাহলে কবির মনোভাবের ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে মানুষের পরে দোষ না চাপিয়ে দায়ী করেছেন নিষ্প্রাণ যন্ত্রকে। সে যাই হোক বিজ্ঞানীর কাছে লেখা কবির পত্রটির কিছু অংশ আমরা উদ্ধৃত করবো।

'কারখানা ঘরের কাজ চালাইবার উপযুক্ত Engine, Lathe প্রভৃতির কথা তোমার চিঠিতে পড়িয়া বিশেষ লোভ জন্মিতেছে। আমি যেমন করিয়া পারি বোলপুরে টেকনিকাল বিভাগ খুলিব। ধর্মপাল আমাকে গোটাকতক কল দিতে স্বীকার করিয়াছে। তাহার কতকগুলি কৃষি ব্যাপারের যন্ত্র আছে, একটা কাপড় কাঁচিবার আমেরিকান কল আছে। সে বলে আমি যদি টেকনিকাল বিভাগ খুলি তাহা হইলে আমাকে সাহায্য যোগাড় করিয়া দিবে। কিন্তু তাহার Condition এই যে এই টেকনিকাল বিভাগের নাম রাখিতে হইবে Indo-American Industrial school। আমি তাহাকে লিখিয়াছি সাহায্যের পরিমাণ যদি যথেষ্ট এবং যদি যথার্থ কাজের হয় তাহা হইলে আমেরিকার ঋণ স্বীকার করিতে আপত্তি করিব না। আচ্ছা, তোমাকে যদি হাজারখানেক টাকা সংগ্রহ করে পাঠাই তবে সুরেশকে দিয়া আমার Work shop-এর মালমসলা কিনাইয়া পাঠাইয়া দিতে পারিবে কি ?' (৪)

যন্ত্র সম্বন্ধে কবির ধারণা কিছু পরিবর্তিত হয়েছে। তখনও দেখা যাচ্ছে কুটির শিল্পে যেসব যন্ত্রপাতি প্রয়োজন তা তিনি অপছন্দ করছেন না। কিন্তু বড়ো কারখানা সম্বন্ধে তাঁর তখনও ভীতি আছে। যন্ত্রের গুণাগুণ ক্রমেই উপলব্ধি করতে পারছেন অথচ তাকে স্বচ্ছন্দ চিত্তে গ্রহণ করতে পারছেন না। 'রাজপুতানা' কবিতায় কবি কৃষিকর্মের বাহক ও ধারকদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন,

'হোতা যারা মাটি করে চাষ
    রৌদ্রবৃষ্টি শিরে ধরি বারো মাস,
ওরা কভু আধামিথ্যারূপে
    সত্যেরে তো হানে না বিদ্রূপে।
ওরা আছে নিজ স্থান পেয়ে
দারিদ্র্যের মূল্য বেশি লুপ্ত মূল্য ঐশ্বর্যের চেয়ে।'

ঐ একই কবিতায় যন্ত্র ও যন্ত্রসভ্যতার উদ্দেশে কবির অপ্রসন্ন মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে।

'এদিকে চাহিয়া দেখো টিটাগড়
লোষ্ট্রে লৌহে বন্দী হেথা কালবৈশাখীর পণ্যঝড়
    বণিকের দম্ভে নাই বাধা
আসমুদ্র পৃথ্বিতলে দৃপ্ত তার অক্ষুণ্ন মর্যাদা।

প্রয়োজন নাহি জানে ওরা
ভূষণে সাজায়ে হাতি ঘোড়া,
সম্মানের ভান করিবার,
ভুলাইতে ছদ্মবেশী সমুচ্চ তুচ্ছতা আপনার।'

ভাবলে অবাক হতে হয়, রবীন্দ্রনাথ কেন বারে বারে যন্ত্র বা 'machine as such' কে ধিক্কার দিচ্ছেন। যন্ত্রের নিজের তো কোন অপরাধ নেই। কবি একথা উপলব্ধি করেছিলেন পরে।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বমানবের মিলনভূমি বিশ্বভারতী সৃষ্টি করেই কি তৃপ্ত ছিলেন? তা পারেন নি, যেহেতু তিনি কখনোই ভুলতে পারেন নি স্বদেশের অন্ন-বস্ত্র-স্বাস্থ্যের নিদারুণ অভাবের কথা, অনুন্নত কৃষি ও ক্ষীণ বাণিজ্যের মর্মান্তিক অবস্থার কথা। তিনি জানতেন ক্ষুধিতের কানে পৌঁছবে না শিক্ষার বাণী, তার মধ্যে সাড়া জাগাতে হলে প্রথমেই জৈব প্রয়োজনগুলি মিটিয়ে ফেলা দরকার।

'তাই ফুটলো শ্রীনিকেতন, নগরের উপকণ্ঠে প্রয়োজন মেটাবার কারখানাঘর। ঘন-বিজলী-আলোয় ঘেঁষাঘেঁষি বাড়িতে শ্রীনিকেতনের হাবভাবও যেন ঔপনাগরিক। সমস্ত মিলিয়ে ছোটো, কিন্তু সুন্দর, ; বিভিন্ন কারুকর্মের ঘননিবদ্ধ দ্বীপপুঞ্জ। শুনলুম একদল বেরোচ্ছেন বাংলার বিভিন্ন জেলায় রাক্ষসী নিরক্ষরতার সঙ্গে যুঝতে, ওদিকে পড়ে আছে চাষের জমি, এখানে তাঁত চলে, ছুতোর খাটে, ঘোরে কুমোরের চাকা, চামড়া রঙিন রূপ নেয়।'(৫)

যন্ত্র সভ্যতার পরিণতি কি তাও কবি ভবিষ্যবাণী করে গেছেন। সেখানেও একই অবস্থা।

'শেষের পংক্তিতে যবে থামিবে ওদের ভাগ্য লিখা,
নামিবে অন্তিম যবনিকা
উত্তাল রজতপিণ্ড উদ্ধারের শেষ হবে পালা
যন্ত্রের কিংকরগুলো নিয়ে ভস্মডালা
লুপ্ত হবে নেপথ্যে যখন
পশ্চাতে যাবেনা রেখে প্রেতের প্রগল্‌ভপ্রহসন।'

সোবিয়েত ভ্রমণের পর যন্ত্র সম্পর্কে কবির ধারণার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। কবি সোবিয়েতে গিয়ে যন্ত্রের সার্থকতা দেখে এসেছেন। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যন্ত্রের অন্য চেহারা দেখে কবি আনন্দিত। তিনি একটি সত্য উপলব্ধি করতে পারলেন। তা হলো—যন্ত্রের বিষদাঁত আমাদের লোভের মধ্যেই বর্তমান। মানুষের লোভ দুর্দমনীয় হয়েছে বলেই যন্ত্রকে অভিশাপ বলে বলে মনে হচ্ছে। কবির ভাষায়, 'একথা মানি যন্ত্রের বিপদ আছে। দেবাসুরে সমুদ্র মন্থনের মত সে বিষও উদ্‌গার করে। পশ্চিম মহাদেশের কল-তলাতেও দুর্ভিক্ষ আজ গুঁড়ি মেরে আসচে।··· কিন্তু এজন্য প্রকৃতিদত্ত সম্পদকে দোষ দেবো না, দোষ দেবো মনুষ্যের রিপুকে। খেজুর গাছ, তাল গাছ বিধাতার দান, তাড়িখানা মানুষের সৃষ্টি। তালগাছকে মারলেই নেশার মূল মরে না।

যন্ত্রের বিষদাঁত যদি কোথাও থাকে, তবে সে আছে আমাদের লোভের মধ্যে। রাশিয়া এই বিষদাঁতটাকে সজোরে ওপড়াতে লেগেচে, কিন্তু সেই সঙ্গে যন্ত্রকে শুদ্ধ টান মারে নি; উল্টো, যন্ত্রের সুযোগকে সর্বজনের পক্ষে সম্পূর্ণ সুগম করে দিয়ে লোভের কারণটাকেই ঘুরিয়ে দিতে চায়।'(৬)

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে জার্মানীতে গিয়ে কবির দেখা হলো আইনষ্টাইনের সঙ্গে। কবি ও আইনষ্টাইনের মধ্যে আধুনিক জীবনযাত্রার মান-উন্নয়নে আধুনিক যন্ত্র-শিল্পের উপযোগিতা সম্পর্কে আলাপ হয়েছিল। সে সম্পর্কে কবি বলেছেন : তখন আমি বলেছিলাম, আর আজও আমি বিশ্বাস করি, যন্ত্রবিদ্যার এই উন্নতি আসলে আমাদের শারীরিক কল্যাণ বিধানের অনুকূল---বিশেষতঃ এই উন্নতির প্রতিরোধ যখন অসম্ভব, তখন প্রয়োজনের তাগাদায় মানুষের বিদ্যাবুদ্ধি জীবনে যে সুবিধার সৃষ্টি করেছে তার সুচিন্তিত সদ্‌ব্যবহার করাই তো আমাদের কর্তব্য। সভ্যতার যে স্তরে মানুষ আজ উন্নীত, তাতে যেমন আঙুলে জমি আঁচড়ে চাষ করার কথা ভাবা যায় না, তেমনি হস্তপদ জ্ঞানেন্দ্রিয় যেখানে পরাজিত আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি যন্ত্র সৃজন করে আমাদের অক্ষমতা ঘুচিয়ে চলেছে। আইনষ্টাইন আর আমার মধ্যে এবিষয়ে সম্পূর্ণ মতের মিল হল যে, নূতন নূতন যন্ত্রাবিষ্কারের সাহায্যে প্রকৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে আমাদের জীবনযাত্রার সম্পদ আহরণ করতে হবে।' (৭)

কবি স্বীকার করেছেন যন্ত্রকে আধ্যাত্মিক করে তোলার চেষ্টা বৃথা, তা অর্থহীন। যন্ত্রকে যে ব্যবহার করে একমাত্র সে-ই নিজেকে আধ্যাত্মিক ক'রে তুলতে পারে।

যন্ত্র থেকে যে মুনাফা আজ মানুষের ঘরে আসছে তার আকৃতি ক্রমেই এত বৃহদাকার হয়ে উঠছে যে তা নিয়ে টানাটানি করতে গিয়ে মানুষ তার মনুষ্যত্বকেও খোয়াতে দ্বিধা করে না। কবির আশা বিজ্ঞানই মানুষের শুভ বুদ্ধি ফিরিয়ে আনবে। বস্তু সম্ভার নিয়ে জুয়ো খেলা সে দেবে কমিয়ে। এখানে কবির একটি বক্তব্য তুলে ধরবো।

'প্রকৃতির ভাণ্ডারে প্রবেশের যে উপায় বিজ্ঞান উদ্ভাবন করেচে তা এতই জটিল যে শুধু বিজ্ঞানের অপরিণতিই প্রমাণিত করবে, সে যেন প্রথম শিক্ষার্থীর সাঁতার কাটা। তাতে প্রয়াসহীন সহজ গতির একান্ত অভাব। যন্ত্রের এই গুরুভার জটিলতার ফলে অধিকাংশ লোকের কাছে আজ তা অব্যবহার্য; এবং এই জন্যেই যন্ত্রকে কেন্দ্রীভূত করতে হয়েছে আসুরিক কারখানাগুলোয়, আর শ্রমিকদের জীবনকে তার স্বাভাবিক ক্ষেত্র থেকে উৎপাটনের ফলে হয়েছে শুধু দুঃখ বৃদ্ধি। অমঙ্গলের এই নাগপাশ থেকে বিজ্ঞান একদিন আমাদের মুক্তি দেবে, ধনসৃষ্টির পথগুলো প্রশস্ত করে দিয়ে ব্যক্তিগত লোভের প্রচণ্ডতা বিজ্ঞানই দেবে কমিয়ে—এই আশায় বুক বাঁধা ভিন্ন আর তো কোন উপায় দেখি না।' ৮

যন্ত্র সম্পর্কে কবির মনোভাব ক্রমেই পরিবর্তিত হচ্ছে। ১৯০০ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে এক পত্রে কবি লেখেন যে তাঁদের সত্যিকার কাজের ক্ষেত্র শ্রীনিকেতন। শিক্ষাকে সব দিক থেকে পরিপূর্ণ করে তুলতে হবে। ছিটে ফোঁটা শেখানো নয় 'গোড়া থেকেই বিজ্ঞান ধরিয়ে দেওয়া দরকার, বিশেষতঃ ফলিত বিজ্ঞান।····· ম্যাডাম দিনা আমাদের ইলেকট্রিসিটি ও জল দেবেন কথা আছে, এরই কলঘরের কাজে ছেলেদের হাত পাকাতে হবে।······তা ছাড়া মোটরের কাজ—শুধু গাড়ি চালানো নয়, ওর যন্ত্রতত্ত্ব। কলম ধরা ছাড়া আর সব বিষয়ে আমাদের ছেলেদের হাত দুটো

থাকে আড়ষ্ট, সর্বদা কল নাড়াচাড়া করে এইটে ঘোচানো চাই।' (৯)

পুত্র রথীন্দ্রনাথকে লিখিত এই পত্রে কবির মনোভাব প্রকাশিত। মাঝে মাঝে দ্বন্দ্ব এসেছে, কিন্তু শেষপর্যন্ত ভালবেসে ফেলেছেন। শেষ পর্যায়ের গ্রন্থসমূহে এই ভালোলাগার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। 'সে' গ্রন্থে সুকুমার ইঞ্জিনীয়র হতে চলে যায়। 'তিন সঙ্গী' গল্পগ্রন্থের 'নন্দকিশোর' এঞ্জিনীয়র, নবীনমাধবও। পরে জিওলজিষ্ট হলেও আদিতে যন্ত্রবিদ। যন্ত্র সম্বন্ধে কবির ধারণার পরিবর্তন ঘটেছিল বলেই হয়ত রক্তকরবীর বা মুক্তধারার মত আর কোন নাটক সৃষ্টি করেন নি। যন্ত্র সম্পর্কে কবির মানসিক অবস্থা নিয়ে আরো ভাববার আছে।

তথ্যপঞ্জী ঃ

১। জাভাযাত্রীর পত্র, রবীন্দ্র রচনাবলী ১৯ খণ্ড, পৃঃ ৪৫৫
২। নির্মলকুমারী মহলনাবিশকে লিখিত পত্র ঃ ১লা শ্রাবণ, ১৩৩৪
৩। যাত্রী
৪। চিঠিপত্র, ৬ষ্ঠ খণ্ড
৫। সব পেয়েছির দেশে—বুদ্ধদেব বসু
৬। প্রবাসী, কার্তিক ১৩৩৮
৭। বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৬২ (শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্য')
৮। রবীন্দ্রনাথের রেডিও বক্তৃতা (দ্বিতীয়াংশ)
নিউইয়র্ক, ১০ই নভেম্বর, ১৯৩০ ; অনু ঃ বিচিত্রা, ১৩৩৮, আশ্বিন
৯। প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৭

এক 'পর্দানশীন' স্মৃতিকথা ও তার লেখিকা

নারায়ণ দত্ত

'তোমার চিঠি লেখার ধরণ কখনই খুব উচ্চাঙ্গের নয়। এবং পত্রলেখক হিসেবে তোমার ব্যর্থতার আসল কারণ তুমি তোমার বক্তব্য বলার চেয়ে তোমার লিপিকুশলতা দেখাবার জন্যে পাগল। ভবিষ্যতে নিরাড়ম্বর ভাষায়, সহজ করে লিখবে। এতে লেখক এবং পাঠক উভয়েই কম কষ্ট পাবে।' —না, এই চিঠি কোন লর্ড চেষ্টারফিল্ড তাঁর পুত্রকে লেখেন নি। সে 'ঘটনার প্রায় সাড়ে তিন শ' বছর আগে, এক ভারতীয় পিতা তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে তিরস্কার করে লিপি রচনার এই সাধু উপদেশ দিয়েছিলেন। পিতার এই আপ্তবাক্য পুত্রের রচনায় বাস্তবিকই কোন প্রসাদগুণ এনেছিল কিনা, বলা শক্ত। তবে তাঁর শিক্ষা তাঁর কন্যার রচনার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সন্দেহ নেই।

এই পিতার নাম জহরুদ্দিন মহম্মদ বাবর। পনর শ' আটাশ সালে শরৎকালে দিল্লী থেকে এই চিঠিখানা তিনি লিখেছিলেন জ্যেষ্ঠপুত্র হুমায়ুনকে, তাঁর অপর পুত্র কামরানের বিবাহ উপলক্ষে। যখন লিখেছিলেন তখন এই লেখা পরবর্তী জীবনে যাকে সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত করেছিল, সেই ছোট্ট মেয়েটির বয়স বছর পাঁচেক। তার যখন বছরদুই বয়েস, বাবর কাবুল ত্যাগ করেন। আর এই ঘটনার মাস আটেক নয় বাদে হিন্দুস্থানের নরম মাটিতে সুদৃশ্য আগ্রা শহরে কাবুলের সেই ফুটফুটে মেয়েটি তার নরম নরম চোখ তুলে দেখল, ইতিহাসের সেই বিচিত্র পুরুষ, বাবরশা'কে। তার আগের দিন মধ্য রাত্রে—সাতাশে জুন পনেরশ'উনত্রিশ, আগ্রার বাইরে বিরহী যক্ষ বাবর—হিন্দুস্থানের মাটিতে প্রথম সাক্ষাৎ পেলেন তাঁর প্রধানা বেগম—মহমের সঙ্গে। মেয়েটি মহমের সঙ্গেই যাত্রা করেছিল সুদূর কাবুল থেকে। কিন্তু গন্তব্যস্থলে পৌছানোর শেষদিন মহম মেয়েকে ফেলে রেখে নিজেই এগিয়ে গেলেন।

কিন্তু সম্বন্ধটা বোধ হয় ঠিক বলা হ'ল না। মেয়েটি, সেই ফুটফুটে গোলাপরঙা মেয়েটির মায়ের নাম মহম নয়। মহম হুমায়ুনের মা। মেয়েটির মায়ের নাম দিলদার বেগম। দিলদার বেগমের একটি পুত্র, ইতিহাসে যাকে হিন্দাল বলে জানে, আর এই আশ্চর্য সুন্দর মেয়েটি—গুলবদনকে কেড়ে নেন মহম বেগম। হ্যাঁ, কেড়ে নেওয়াই বলা যায়। দিলদার বেগম খুশী মনে যে তাঁর এই ছেলে আর মেয়েকে সতীন মহম বেগমের হাতে তুলে দেন নি, তার বোধ হয় একটি প্রমাণ দিলেই হয়—বাবরের মৃত্যুর পর এরা দুজনেই দিলদার বেগমের কোলেই ফিরে যায়। দুজনেই।

সেকথা যাক। পনের শ' সাতাশ সালের শেষাশেষি বাবর হিন্দুস্থানের বুকে তাঁর কর্তৃত্ব পুরোপুরি পাকা ভিতের ওপর রচনা করতে সক্ষম হলেন। পর বছর এগারই ফেব্রুয়ারী গৃহকাতর বাবর মুঘল মেয়েদের ভারতবর্ষে নিয়ে আ'বার সিদ্ধান্ত নিলেন। বাবর কাবুলের শাসনকর্তাকে তাঁর সেই বিখ্যাত পত্রটিতে হুকুম দিলেন: পত্রপাঠমাত্র, কালক্ষেপ না ক'রে, আমার বোনেদের এবং

আমার পরিবারভুক্ত মহিলাদের সিন্ধুনদীর তীর পর্যন্ত নিরাপদে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করবে। কাবুল পরিত্যাগের জন্যে যে কোন বাধাবিপত্তিই আসুক না কেন, এই চিঠি পৌঁছানোর সপ্তাহকালের মধ্যে, যে কোন প্রকারেই হোক না কেন তাঁরা যেন যাত্রা করেন। কেন না একদল সৈন্য হিন্দুস্থান পরিত্যাগ করে সেখানে তাঁদের জন্যে অপেক্ষা করবে। যে কোন প্রকার বিলম্ব তাদের অসুবিধার সৃষ্টি করবে এবং তার ফলে দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'

এই চিঠিই আমাদের সেই পদ্মকান্তি মেয়েটিকে ভারতবর্ষে নিয়ে এল চিরকালের জন্যে। এবং তার ধাত্রী মা, বাবরের তৃতীয়া পত্নী, প্রথম পুত্রসন্তানের জননী, মহম্ বেগমের সঙ্গে পনের শ' উনত্রিশের জানুয়ারী মাসে কিছুবা ঘোড়ায় টানা দোলায় দুলুনীতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে কিছুবা পালকী বেহারার গলার ঐক্যতানে হিন্দুস্থানের বুলবুলের মিঠি ডাক শুনতে শুনতে এক সময়ে কাবুল কান্দাহার, পেশোয়ার, মুলতান, বামে ডাইনে ফেলে, পঞ্চনদের অববাহিকা পেরিয়ে কাবুলের মেয়ে এসে হিন্দুস্থানের মাটিতে নামল। পথে বুটখাব, জাগতলিক, জালালাবাদ, খাইবার পেরিয়ে এই প্রথম মুঘল অন্তঃপুরবাসিনীরা এলেন হিন্দুস্থানে। এলেন চিরকালের জন্যে। আর সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠল ভারতবর্ষের বুকে প্রথম মুঘল রঙমহালের ক্ষীণ কিন্তু প্রাণপূর্ণ শিখার বিচিত্র চিরাগটি। হিন্দুস্থানের উদ্দেশে মহম কোমের এই দীর্ঘ ছয়মাসব্যাপী যাত্রাটুকুর একঘেয়েমী মাঝে মাঝে চঞ্চল করে রেখেছিল এই কচি কিশোরীর অজস্র-জিজ্ঞাসা, মাঝে মাঝে বাবরশাহের পত্রবাহক শিরাকের আবির্ভাব, তার নিয়ে আসা বাবরশাহের অবরেসবরে পত্র কিছু বা উপহার।

হিন্দুস্থানের সকলের আগে এসে বুঝিবা সকলের চেয়ে বেশীই পিতৃস্নেহ পাবার অধিকার নিয়ে এসেছিলেন গুলবদন। নয়তো, অন্যান্য সবাই থাকতে মহম বেগম আর গুলবদনকে নিয়েই কেন ঢোলপুর আর শিক্রি দেখতে গেলেন মুঘল সম্রাট। প্রথমে ঢোলপুর তারপরে শিক্রি।—শিক্রির বাগানে যেখানে 'তুরখারা' বানিয়েছিলেন বাবর, যেখানে বসে তাঁর বিখ্যাত আত্মজীবনী লিখেছিলেন সম্রাট, ছোট্ট মেয়ে গুলবদন তার টানা চোখ তুলে সব খুঁটিয়ে খুটিয়ে দেখল। আর সেই সময়ে ঘটে গেল দুর্ঘটনাটা। মহম গিয়েছিলেন নমাজ পড়তে। আর বিবি মুবারিকার সঙ্গে খেলছিল গুলবদন। নতুন দেশের বিচিত্র সৌন্দর্য দুজনেই নয়ন ভরে দেখছিলেন। বাচ্ছা মেয়ে গুল আবদার ধরল, 'আমার হাত ধরে টান বিবিজী।' একটু বা অন্যমনস্ক ছিলেন বিবি মুবারিকা। মেয়ের হাত ধরে টান দিলেন তিনি আর সঙ্গে সঙ্গে ডাক ছেড়ে চিৎকার করে উঠল গুলবদন—'মরে গেলুম মরে গেলুম'—'; সবাই ছুটে এল। ভাগ্যের এমনি দুর্বিপাক, হেকিম এসে দেখল, সত্যিই হাতের হাড় নড়ে গেছে। ডাক্তার এসে বেঁধে দিয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গেই অত্যন্ত আকস্মিক ভাবেই শেষ হয়ে গেল তাঁদের সেবারের শিক্রিভ্রমণপর্ব।

বেশ কাটছিল মেয়েটির। কিন্তু-আগ্রার জল সবায়ের সইছিল না। কয়েকদিন পরেই গুলবদনের ভাই আলওয়ার মির্জা মারা গেলেন। হিন্দুস্থানের বুকে মুঘল পরিবারের এই প্রথম শোকের ছায়া নেমে এল। বুক চাপড়ে কাঁদতে লাগলেন দিলদার বেগম। কিন্তু সে আঘাত সে শোক সত্যই সামান্য। তার চেয়ে অনেক বড়শোক মুঘল পরিবারের জন্যে অলক্ষ্যে অপেক্ষা করেছিল। সেকথা তখন কেইবা জানত। বরঞ্চ সবাই এক প্রমোদ ভ্রমণের জন্যেই তখন প্রস্তুত হচ্ছিলেন।

ঠিক ছিল যমুনার কালো জলে নৌকা বিহার করে সম্রাট যাবেন ঢোলপুর। বেগমরা ধরে বসলেন তাঁরাও যাবেন—তবে দোলায় নয়। পাল্কীতেও নয়। ময়ূরপঙ্খীর পাল তুলে যমুনার হাওয়া খেতে খেতে এবার তাঁরা যাবেন ঢোলপুরে।

সব ঠিক ঠাক। ঠিক সেই সময় চিঠি এল দিল্লী থেকে। মৌলানা মহম্মদ পরগহালির কাছ থেকে। ছোট্ট চিঠি: 'হুমায়ুন মির্জা সাংঘাতিকভাবে অসুস্থ। মহামান্যা বেগম সাহেবা যেন অবশ্য-অবশ্য দিল্লী চলে আসেন। মির্জা অত্যন্ত কাহিল। স্নেহবিহ্বল করুণা ছলছল মহম বেগম তৎক্ষণাৎ রওনা হয়ে গেলেন দিল্লীর পথে। পথে মথুরাতে উদ্বিগ্ন মাতার দোলা গিয়ে ধরল রোগকাতর সন্তানকে।

মহম বেগম হুমায়ুনকে আগ্রায় নিয়ে এলেন। পরিবারের অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে গুলবদনও দেখতে গেলেন অসুস্থ যুবরাজকে। এক সময় সম্রাট স্বয়ং দেখতে এলেন হুমায়ুনকে। দেখলেন আর বুঝতে বাকী রইল না, যে পীড়া কি গুরুতর। আর সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবকোমল বাবর কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

মহম বেগম সম্রাটের সে কাতর মুখ সইতে পারলেন না। বললেন, 'সম্রাট, আপনার কি কান্না সাজে? আপনার তো অনেক পুত্র। আমার একটিই তাই আমি কাঁদছি। আপনি কাঁদবেন কেন?'

সম্রাট বললেন, 'মহম, আমার অনেক পুত্র আছে ঠিকই। কিন্তু তোমার হুমায়ুনের মত কাউকেই আমি ভালবাসি না।'

আর তারপর, তার কথার সত্যতা প্রতিপন্ন করবার জন্যই বুঝি, প্রার্থনা সুরু করলেন। আর একসময় সেই বুধবার থেকেই বাবর হুমায়ুনের শয্যাপার্শ্বে তাঁর প্রার্থনা চালিয়ে গেলেন: 'আল্লা, খোদা, যদি জীবনের বিনিময়ে জীবন দিলে হয় তাহলে আমি বাবর, আমার জীবন, আমার দেহ আমি হুমায়ুনের জন্যে দিলাম। তুমি গ্রহণ কর।'

মঙ্গলবার দিন বাবর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। হুমায়ুনের মাথায় জল দেওয়া হ'ল। আর অসুস্থ বাবরকে ধরে ঘরে নিয়ে যাওয়া হ'ল। আর এই কাহিনীর নীরব দর্শক, সেই ছোট্ট মেয়েটির মণির স্মৃতিকোঠায় এইসব ছোট ছোট, টুকরো টুকরো বিশ্বাস্য, অবিশ্বাস্য কাহিনী একে একে জমা হতে লাগল। আগামী কালের আম দরবারে এক সময়ে তার বিচিত্র পরিবেশনের জন্যে।

কিন্তু এরই মধ্যে মুঘল আমলের প্রথম পুরুষের কাহিনী শেষ হয়ে গেল। মুঘল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা জহরুদ্দীন মুহম্মদ বাবর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। মৃত্যুর আগে বার বার তিনি খোঁজ করেছিলেন হিন্দালের। বার বার লোক এসেছে আগ্রা, কাবুল, কান্দাহার থেকে। উৎকণ্ঠিত মুমূর্ষু সম্রাট জিজ্ঞাসা করছেন,—'কি হ'ল হিন্দালের? কত বড় হয়েছে। কতটা লম্বা হয়েছে, ভারতবর্ষের মুঘল সাম্রাজ্য কি তিনি হুমায়ুনের বদলে হিন্দালকে দিতে চেয়েছিলেন? না, কি শুধু অপত্যস্নেহই সম্রাটকে এতদূর উৎকণ্ঠিত করে তুলেছিল?

হুমায়ুননামার রচয়িত্রী গুলবদন বেগম সে কথা বলেননি। শুধু মৃত্যুপথ যাত্রী সম্রাটের মির্জা হিন্দালের জন্যে উৎকণ্ঠার কথাই বলেছেন। আরও যে কথা বলেছেন সেগুলি মুঘল অন্তঃপুরের

নানা অজানা পাল—পার্বন, নানা উৎসব উল্লাসের স্বচ্ছ সরল বিবরণ, বলেছেন, মির্জা হিন্দালের বিবাহ উৎসবে মুঘল অন্দর মহলের আয়োজন, সম্রাট আকবরের 'সুন্নত' উৎসব—এমনি নানা অজ্ঞাত কাহিনী। অবশ্য এগুলি যেমন সুনিপুণ ভাবে বলা আছে, তেমনি আশ্চর্যভাবে অনুক্ত রয়েছে কয়েকটি বিচিত্র পরিচ্ছেদ। যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, গুলবদন বেগমের বিবাহ হ'ল কবে? কেমন হয়েছিল সেই অনুষ্ঠান? সেই বিবাহ নির্ধারিতই হয়ই বা কি করে? হুমায়ুননামা বা গুলবদননামার রচয়িত্রী সে কথা বলেননি। হঠাৎ এক সময়ে দেখি বিবি সাহেবা তাঁর মাথার 'তাক', কুমারী মেয়েদের শিরস্ত্রাণ, সরিয়ে রেখে 'লচক' বা ঘোমটার মত করে রাখা রুমালের মত কাপড় দিয়ে ঢেকেছেন তাঁর অনিন্দ্য সুন্দর মুখখানি। গৌরী মেয়েটির বয়স তখন সতের। বিবাহিত বোনকে দেখে হুমায়ুনও অবাক হয়ে বলেছিলেন, 'ও মা এ' মেয়েটি কে গো? একেত আমি চিনতেই পারিনি।'

অবশ্য হতে পারে, নিজের বিবাহের কথা বলতে স্বভাবতঃই কিছুটা লজ্জা এসে সেই মহিলা ঐতিহাসিকের মুখখানি আরক্ত ক'রে তুলেছিল। বিশেষ করে, যখন জানা যায়, এই কাহিনী লেখবার জন্যে যখন তিনি কলম ধরেছিলেন, তখন তাঁর বয়স একষট্টি। সে বয়সে, নিজের জীবন, নিজের দাম্পত্যজীবন, বোধ করি, স্বভাবতঃই অপ্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। সে যাই হোক, গুলবদন বেগমের বিবাহ হয় চথতাই মুঘল বংশে। স্বামীর নাম খিজির খাজা খান। শ্বশুরের নাম আইমন খাজা। শাশুড়ী ছিলেন হাইদার মির্জা দুখলাতের ভ্রাতুষ্পুত্রী। কিন্তু তার বেশী আর কিছু জানার উপায় নেই গুলবদনের বিবরণে। শুধু জানাগেল বেগম 'তাক' ছেড়ে লচক পড়েছেন। ঘরেতে ভ্রমর গেছে গুনগুনিয়ে।

এমনি চকিতের জন্যে গুলবদন বেগমের অন্দর মহলের পর্দাটা একবার কেবল নডে উঠে আবার স্থির হয়ে গেল আর বাইরে হুমায়ুনের মুঘল বাহিনী শেরশাহের সঙ্গে চরম মোকাবেলার জন্যে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে। আর এই সময়ে বেগমের জীবনে এক বিচ্ছেদ এসে আঘাত হানল। মির্জা কামরান তাঁর বার হাজার সৈন্য নিয়ে লাহোর যাত্রা করলেন। বহু আমীরপত্নী, বহু বিবি, বেগম চললেন তাঁর সঙ্গে। আর কামরান বললেন যে গুলবদন যেন তাঁর সঙ্গেই যায়। গুলবদন বেগমের যাওয়া নিয়ে চমৎকার এক পারিবারিক ছবি এঁকেছেন বেগম তাঁর নামচায়। বেগমের ইচ্ছা ছিলনা বড় ভাই হুমায়ুনের সঙ্গ ত্যাগ করেন। কিন্তু কামরানের জিদ যেন চেপেই গিয়েছিল—'তোমাকে যেতেই হবে আমার সঙ্গে।' এমন সময় খবর এল হুমায়ুন নিজেই বলছেন, বেগম সাহেবা যেন মির্জা কামরানের সঙ্গেই যান লাহোর। বেগম সাহেবা কি আর করেন। হুমায়ুনকে একটা চিঠি লিখলেন তিনি, 'সম্রাট যে এই অকিঞ্চিৎকরকে তাঁর সেবা থেকে বঞ্চিত করবেন এবং তাঁকে মির্জা কামরানের হাতে তুলে দেবেন এ আমি কখনও ভাবিনি।' হুমায়ুন তার জবাবে লিখলেন 'বেগম সাহেবার কাছ থেকে সরে আসবার কোন ইচ্ছাই ছিল না আমার। কিন্তু করি কি। মির্জা কামরান বড্ড পীড়াপীড়ি করছে। কাজেই, তার হাতেই তোমাকে সঁপে দিলাম। তা ছাড়া হাতে শের শাহের সঙ্গে মোকাবেলার জরুরী কাজ রয়েছে আমার। কাজ মিটলে অবশ্যই তোমায় ডেকে পাঠাব।' আর তাই, এক সময়ে চোখের জলে

বুক ভিজিয়ে জীবনে প্রথম মা, বোন, ভাই, স্বজাতিস্বজনকে ফেলে রেখে এই মন্দভাগিনী বেগম সাহেবা লাহোরের পথে তাঁর উটে টানা দোলায় গিয়ে উঠলেন।

অবশ্য গুলবদন বেগমকে সঙ্গে নেওয়ার পিছনে কামরানের শুধু ভগ্নীরপ্রতি স্নেহই নয়, সাময়িক কোন স্বার্থও জড়িত থাকতে পারে। কেননা গুলবদনের স্বামী খিজির খাজা কামরানের শ্যালক, আর সুলতানের (ইয়াসিন দৌলত) ভাই। যোদ্ধা হিসাবে নাম আছে। কাজেই বেগম সাহেবা থাকলে এই ডামাডোলের বাজারে তার সৈন্যের সাহায্য পাওয়া কঠিন নাও হতে পারে। কুশলী যোদ্ধা মির্জা কামরান এ কথা বোধ হয় বিস্মৃত হননি।

তবে এই বিচ্ছেদে আর কারও ক্ষতি না হোক, বৃদ্ধা বেগম সাহেবার লেখা ইতিহাসে যে ফাঁক রয়ে গেল তা' কোনদিনই ভরাট হবে না। কেননা এর পরেই হুমায়ুনের জীবনের বহু ঘটনাই বেগম সাহেবা নিজে দেখেন নি। কানে শুনে লিখেছেন।

যেমন আকবর জননী হামিদাবানুর সঙ্গে সম্রাটের প্রণয় ও বিবাহ। হুমায়ুন সিন্ধুতীরে ভাক্করের চারবাগ বাগানে সৈন্য সামন্ত নিয়ে অপেক্ষা করছেন। এমন সময়ে খবর গেল তাঁর ভাই মির্জা মুহম্মদ হিন্দাল, গুলবদন বেগমের মায়ের পেটের ভাই, সিন্ধু পেরিয়ে চলেছেন কান্দাহার। দূত এসে খবর দিলে যে আশঙ্কা মিথ্যা। হিন্দাল মির্জা হুমায়ুনেরই পক্ষে। কাজেই হুমায়ুন আর দেরী না করে হিন্দাল জননী দিলদার বেগমের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তার এই অবকাশে, তাঁর চারদিকে যখন দুর্যোগের ঘনঘটা, শেরশাহ-তাড়িত ভারতসম্রাট হুমায়ুন দেখলেন চতুর্দ্দশী অপরূপা রূপসী হামিদাবানুকে।

সম্রাট গেছেন ভাই মির্জা হিন্দালের হারেমে। হারেমের বিবি বেগমরা সব ভেঙে পড়েছেন সম্রাটকে দেখবার জন্যে। মুঘল মেয়েদের এই ভীড়ের একপাশে সম্রাট দেখলেন মেয়েটিকে।

—'কে এ মেয়েটি?'

কে যেন জবাব দিলে—'মীর বাবা দোস্তের মেয়ে'।

পাশে দাঁড়িয়েছিল রাজা মুয়াজ্জাম। হামিদাবানুর ভাই। সম্রাট বললেন, 'এ' আমার কুটুম্ব হবে।'

সেদিন এ পর্যন্ত। তারপর, পর পর কয়দিনই গেলেন সম্রাট দিলদার বেগমের মহলে। একদিন বললেন বিমাতাকে, 'মীর বাবা দোস্ত তো আমাদের কুটুম্ব। কাজেই,—সেই উজ্জ্বল প্রত্যুষে সম্রাট দিলদার বেগমের কাছে প্রার্থনা করলেন হামিদাবানু নামে সেই কন্যা রত্নটিকে। হিন্দাল মির্জা কিছু আপত্তি করেছিল। বলেছিল, না-না, সে কি করে হয়। মেয়েটি আমার বোনের মত। মেয়ের মতও বা। আর সম্রাট মহানুভব—তাঁর পক্ষে এমন কিছুই করা ঠিক হবে না যার ফলে কোন অশান্তি সৃষ্টি হতে পারে।' গুলবদন বলেছেন হিন্দাল এ আশঙ্কাও করেছিলেন যে সেই আর্থিক অনটনে সম্রাট কন্যাপণ যোগাড় করতে পারবেন না।

ক্রুদ্ধ সম্রাট ঝেড়েমেরে উঠে পড়ে দোলায় গিয়ে চাপলেন এবং সেই যে চাপলেন আর এলেন না দিলদার বেগমের কাছে। অভিমানে চোখমুখ রাঙা করে বসে রইলেন। এমন সময় বেগম সাহেবার চিঠি গেল, সম্রাটের কাছে, মেয়ের মায়ের মত আছে। রাগের হি

আছে বাছা। মাথা ঠাণ্ডা করে হুমায়ুন এলেন দিলদারের কাছে মাতাপুত্রে আবার দেখা। ভোজের ব্যবস্থা। কিন্তু আবার বাধা। এবার বাধা দিল স্বয়ং কন্যা। হুমায়ুন বাঁদীকে বললেন, 'হামিদা বেগমকে একবার ডেকে দেবে ত'। যে বাঁদীটি দিলদার বেগমের আদেশ নিয়ে গেল, তাকে একা একাই ফিরে আসতে হ'ল। হামিদা বানু আসেন নি। বলেছেন, 'আমিত বেগম সাহেবাকে এই সেদিন সেলাম জানিয়ে এসেছি। আবার যাব কেন'? ব্যর্থ হুমায়ুন এক তোলা আফিং মুখে ফেলে ঝিমোতে লাগলেন। কিন্তু সেই ডাগর আঁখির মোহ ভুলতে পারলেন কই? উদ্ভিন্নযৌবনা সেই যে চতুর্দশী কন্যার মুখে তিনি তাঁর জীবনের চরম চরিতার্থতা খুঁজে পেয়েছেন, তাকে? এবারে শোভান কুলিকে পাঠালেন ভাই মির্জা হিন্দালের কাছে; "হামিদা বানুকে পাঠাও।"

ব্যর্থকাম হিন্দাল বলে পাঠালেন, 'আমরা অনেক বলেছি সম্রাট। পারেন ত স্বয়ং চেষ্টা করে দেখুন'। কিন্তু শোভান কুলির ত গর্দানের ভয় আছে। কি করে। অনেক ভেবে, আগা-পিছু চিন্তা করে' সেই-ই গিয়ে দাঁড়ালে বাবা দোস্তের কন্যার তাঁবুর পর্দা সরিয়ে। মাটি ছুঁয়ে কুর্নিশ করে বললে, বেগম সাহেবা মেহেরবাণী করে যদি সম্রাটের সংগে সাক্ষাৎ করেন। তাঞ্জাম হাজির। সোনার খাটে শুয়ে রূপার পালঙ্কে পা ছড়িয়ে সুর্মাটানা চোখে কিঞ্চিৎ বিরক্তি হেনে মুখে পান চিবোতে চিবোতে হামিদা বানু বেগম সাহেবা বললেন, সম্রাটের সংগে একবারই ভেট করা ঠিক। দু'বার নিষেধ। 'আমি যাব না নফর। তোমার বাদশাকে গিয়ে বোলো'।

কি আর করবে শোভান কুলি। আর একবার আভূমি তসলিম করে' সে হুমায়ুনের তাঁবুর উদ্দেশে তার ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে আর বিরসবদনে বললে বেগমের বক্তব্য।

এমনি করে দিন যায়। সিন্ধু নদীর তীরে রাজ্যের পাশের সেই চারবাগের উদ্যানে বসে হুমায়ুন তাঁর জীবনে নতুন করে আসা নারীর জন্য কালক্ষয় করতে লাগলেন।

মা ছেলের মন বোঝেন। শেষে দিলদার বেগমই ডাকলেন হামিদাকে, 'হ্যাঁরে মেয়ে, বিয়েত করবি একদিন কাউকে। সম্রাটের চেয়ে আর ভাল বর পাবি কাকে?' মাথা নেড়ে ঝোলানো বেণী দুলিয়ে টকটকে গৌর মুখে একরাশ লজ্জার আবীর ছড়িয়ে হামিদা বানু বললে, 'না, না।' দিলদার বেগম তাকে কাছে টেনে আনলেন। আর কোলে মাথা রেখে সে যখন তখন 'না, না' করে মাথা নাড়তে লাগল, দিলদার বেগম তার মিষ্টি গলায় বোঝাতে লাগলেন, 'না না নয়। বুঝে বল। হুমায়ুনের চেয়ে ভালো ছেলে কোথা পাবি?' 'পাবনা ত পাবনা' ঝেঁ ঝেঁ উঠে থাকবেন কিশোরী কন্যা। 'বিয়ে ত করব। কিন্তু তাকে করব যার গলায় আমার হাত যায়। কিন্তু যার কোমরে আমার হাত যায় না তাকে আমি বিয়ে করব না। কক্ষণো না। কক্ষনো না। বললেন ত আর বলে ছোট্ট চড়ুই পাখীর মত ফর ফর করে উঠে গেলেন দিলদার বেগমের কোল থেকে। বেগম হেসে ফেললেন।

পাখীর মত উড়ে গেল বটে কিন্তু পাখীর মতই আবার বেগমের কোলে এক সময়ে ফিরে এল হামিদা বানু। আর এক সময়ে রাজীও হয়ে গেল। পনেরশ একচল্লিশে সেপ্টেম্বর

মাস। সে এক সোমবারের নিদাঘ মধ্যাহ্ন। স্থানের নাম পাতর। হুমায়ুন তাঁর পঞ্জিকাখানি হাতে নিয়ে বসলেন আর সংগে সংগে শুভদিন দেখে নতুন করে তাঁর বিবাহের দিন ঠিক করলেন। মোল্লার নাম মীর আবুল বাকা। আর এক সময়ে ভবিষ্যত ভারতের সর্বোত্তম নৃপতির জননীর সংগে সম্রাটের বিবাহ নিষ্পন্ন হয়ে গেল। গুলবদন বেগমের নামচায় রয়েছে সম্রাট নাকি যৌতুক দেন দু' লক্ষ মুদ্রা।

এই ঐতিহাসিক বিবাহ কিন্তু দেখেন নি গুলবদন। না দেখুন, ঐ খবর তিনি পেয়েছিলেন তাঁর আমৃত্যু-সহচরী স্বয়ং আকবর জননী হামিদা বানুর কাছে।

গুলবদননামায় এমনি রয়েছে কান্দাহারের পথে তাড়িত হুমায়ুনের দুরবস্থার কথা। মির্জা আশকরীর ভয়ে মাত্র ত্রিশজন সংগী নিয়ে হুমায়ুন পালিয়ে চলেছেন তুষারাচ্ছন্ন পার্বত্য উপত্যকার মধ্য দিয়ে।...সারা রাত বরফের মধ্য দিয়ে চলেছেন। আগুন জ্বালাবার কাঠ পর্যন্ত নেই। খাবার জন্যে ভোজসামাগ্রী নেই। দিনের পর দিন শুধু এক টানা কষ্ট। দুঃখের যেন শেষ নেই; শেষ বেশ সম্রাট খাবার জন্যে একটা ঘোড়া মারবার হুকুম দিলেন। কিন্তু রাঁধবার পাত্র কোথায়? খুঁজতে খুঁজতে সৈন্যদের একটা শিরস্ত্রাণ নিয়ে আসা হ'ল আর তাতেই কিছু মাংস সিদ্ধ করে নেওয়া হ'ল। কিছু বা ঝলসে নেওয়া হ'ল ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যে। এখান ওখান থেকে কেটে আনা গাছপালার আগুনে কিছু মাংস ঝলসে নিয়ে সম্রাট হুমায়ুন তাই পরমানন্দে চিবোতে লাগলেন।

তবে দুঃখের হোক আর সুখেরই হোক, রাতও কাটে। এক সময়ে সম্রাটের সেই দুঃখের রাত ও কেটে গেল। তার সেই দিনেই সম্রাট হুমায়ুন সবিস্ময়ে দেখলেন তাঁর নিজের ভাই মির্জা কামরান আর মির্জা আশকরী যখন তাঁর ছিন্ন মুণ্ডের জন্যে খ্যাপা কুকুরের মত হন্যে হয়ে ফিরেছে, তখন সাধারণ একজন সর্দার তাঁর সাহায্যের জন্যে ছুটে এসেছে।

নূতন সূর্যের আলো বরফের ওপরে পড়ে রাতের অন্ধকার যেন পরম যত্নে মুছে দিয়ে গেছে। আর সেই পরিচ্ছন্ন প্রভাতে সম্রাট দেখলেন, দুটো তিনটে পাহাড় টপকে যেতে পারলেই বেশ একটা বসতি রয়েছে। সম্রাট সেই দিকেই ঘোড়া চালিয়ে দিলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যে পৌঁছে সেখানেই তাঁবু ফেলতে থাকলেন। এই দিকে স্থানীয় বেলুচীরাও তাঁকে দেখতে পেয়ে তাঁবুর অদূরে জমা হয়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল: 'এদের যদি আমরা মির্জা আশকরীর কাছে ধরে নিয়ে যেতে পারি, মির্জা আমাদের এদের অস্ত্রশস্ত্র গুলো নিশ্চয়ই দিয়ে দেবেন এ ছাড়াও দেবে টাকা কড়ি'।

রাজকঞ্চুকী হাসান আলির স্ত্রী ছিলেন বেলুচিস্থানের মেয়ে। এদের ভাষা বুঝতে পেরে সংগে সংগে তিনি স্বামীকে ডেকে বললেন, 'ওগো শুনছ। এদের গতিক ত বেশ সুবিধার নয়'।

রাজকঞ্চুকী শুনলেন। হুমায়ুনও শুনলেন। সংগে সংগে তাঁবু তুলবার হুকুমও দিলেন। কিন্তু তাঁবু তুলতে দেখে সেই বেলুচিরা ছুটে এল। এসে একেবারে তাঁবুর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল, 'কি করছো তোমরা?'

—'তাঁবু তুলছি। দেখতেই পাচ্ছ ত। আমরা চলে যাচ্ছি।'

—না। তা' হবেনা। আমাদের সর্দার এখানে নেই। সে আসুক। তারপর যেও তোমরা। তার আগে নয়। 'খানিকটা আদেশ খানিকটা রুক্ষতা মেশানো গলায় তারা তাদের শেষ কথা জানিয়ে দিলে। সম্রাটের সংগী মাত্র ত্রিশজন। দু'জন নারী—আকবরের জননী হামিদাবানু আর হাসান আলির স্ত্রী। তাছাড়া সবাই ক্লান্ত। সম্রাট বললেন 'থাকাই যাক। তবে একটু সজাগ থেকো'।

দিন ফুরিয়ে গেল এক সময়ে। অস্তগামী সূর্য তার শেষ রশ্মির স্পর্শে বরফ ঢাকা পর্বত শীর্ষগুলিকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেল। তুষারের রাজা যেন সাদা চাদরে ঢাকা একটা বিরাট মৃতদেহ বলে মনে হ'ল। আর সৈন্য সামন্তদের কেটে আনা কাঠের আলোয় তাপ পৌছাতে পৌছাতে ভাগ্যতাড়িত ভারত সম্রাট, বোধ করি, আকাশের বুকে আঁকা তারার হিজিবিজির মধ্যে ভবিষ্যতের গূঢ় রহস্য উন্মোচন করতে লাগলেন আনমনে।

হঠাৎ ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দে সম্রাট চমকে উঠলেন। প্রথমে দূরে পাহাড়ে গায়ে শব্দের প্রতিধ্বনি শুনে বুঝলেন অনেকগুলি ঘোড়সওয়ার আস্তে আস্তে এইদিক পানেই এগিয়ে আসছে। আর শুধু বোঝা নয়, একটু পরেই হুমায়ুন দেখতে পেলেন কয়েকজন অনুচরসহ যমদূতের মত একটা লোক এসে দাঁড়াল সামনে। বলবার দরকার ছিলনা, স্থানীয় বেলুচীদের সর্দার। কুর্ণিশ করে বললে, মির্জা কাম্‌রান আর মির্জা আশকরী ফারমান পাঠিয়েছে— 'সম্রাটকে পেলেই তাঁর জিনিষপত্র কেড়ে নিয়ে তাঁকে বন্দী করে পাঠাবে কান্দাহার।' সম্রাট, যতক্ষণ আমি আপনাকে দেখিনি ততক্ষণ আমার মনে এই পাপ ইচ্ছা যে ছিল না তা' নয়। কিন্তু সম্রাটকে দেখবার পর আমি, আমার ছয় পুত্র সম্রাটের সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করছি। এই সরল লোকটির দিকে বিস্ময়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন সম্রাট তারপর তার বিশ্বস্ততার পুরস্কার হিসাবে তাকে একটি বৃহৎ পদ্মরাগ মণি ও এক খণ্ড মুক্তা দিলেন তার বুকে ঝুলিয়ে। দিলেন আরও কিছু উপহার।

এ' কাহিনী গুলবদনের দেখা নয়। শোনা। শোনা হামিদা বানুর কাছে। একষট্টি বছর বয়সে সম্রাট আকবরের আদেশে যখন এই কাহিনী তাঁর স্মৃতির মণিকোঠার ধূলো ঢাকা পর্দা সরিয়ে সযত্নে একে একে বার করে আনছিলেন, তখন প্রিয় সহচরী হামিদা বানুই হয়ত বা সব মনে করিয়ে দিয়ে থাকবেন।

গুলবদন কিন্তু নিজে চোখে আবার হুমায়ুনের জীবন কাহিনী দেখবার জন্যে ফিরে এসেছিলেন। ফিরে এসেছিলেন যখন তখন পাশার দান উল্টে গেছে। শেরশাহ তখন মৃত। আফগান শক্তি পর্যুদস্ত। মির্জা কামরান তখন তাঁর হাতের মুঠোয়। হুমায়ুনের জীবনে সেই সুদিনের কাহিনী প্রত্যক্ষ করবার জন্যে এলেন গুলবদন বেগম। তবে সেই কাহিনী শুধু সুখেরও নয়, দুঃখেরও। কেননা সেই যুদ্ধে হুমায়ুনের চিরসংগী ভাই মির্জা হিন্দাল প্রাণ হারায়। কিন্তু সে ত অনেক পরের ঘটনা। বালা-ই-হিশারের যুদ্ধে কামরান যখন পরাজিত হ'ন তখন সম্রাট হুমায়ুন তাঁকে ক্ষমা করেছিলেন। পাঁচ ভাই এক পাত্রে বসে আহার করেছিলেন। এক পাত্রে জল নিয়ে গোসল করেছিলেন। নিজেদের অন্তঃকলহ ভুলে যাবার চেষ্টা করেছিলেন।

ভাইয়ে ভাইয়ে এই মিলের কাহিনী ক্ষণবসন্ত মাত্র। মিলনের যে সূর্য মেঘে ঢাকা আকাশের কানাতে তার স্নিগ্ধ কিরণের ছটায় উদ্ভাসিত করে তুলেছিল, অচিরেই আবার তা' ঢেকে গেল। মুঘল রাজবংশের এই বুঝি নিয়তি।

কিন্তু এই ফাঁকেই গুলবদন বেগম কামরানের একটা ছোট্ট কাহিনী বলে নিয়েছেন। কামরান তখন কুলাবে। পনের শ' পঞ্চাশ। বেগমটির নাম কেউ বলেন হরম বেগম্। কেউ বলে খুররম বেগম। ফুলের মত এই মুঘল মেয়েটির ধমনীতে আলেকজাণ্ডারের রক্ত নাকি প্রবাহিত। এঁর স্বামীর নাম সুলেমান মির্জা। এক সন্তানের জননী। সম্বন্ধে ইনি কামরানের শালিকা। মাহ বেগম—মির্জা কামরানের স্ত্রী, এঁর বোন।

নাটকটি সুরু করবার মধ্যে তরখান বেগমের দূতিয়ালী ছিল। বেগমই একদিন বললেন। বললেন এমনভাবে যে হরম বেগম কামরানে আসক্তা। কামরান কেন তাঁকে তাঁর প্রণয় জ্ঞাপন করছেন না? প্রণয়ীর এ কি ভীরুতা?

প্রেম কি মানুষকে নির্বোধ করে তোলে? অন্ততঃ মির্জা কামরানকে তাই করেছিল। তরখন বেগমের কথা বেদবাক্য বলে নিলেন মির্জা। আর হৃদয়ের সকল আবেশ, সকল কামনা একটি দীর্ঘ পত্রে আখরে আখরে ছড়িয়ে দিলেন তিনি। আর দিলেন একটি স্নিগ্ধ সুবাসিত রুমাল মুঘল রাজপুত্রের প্রণয়ের উপহার এক প্রসন্ন সন্ধ্যায় বেগী আগা নিয়ে গেল রূপসী হরম বেগমের কাছে। শুধু নিয়ে গেল না। করুণ স্বরে বলে চললে যে কথা সে কথা চিঠিতে ছিল না। কামরান তাঁর মুগ্ধ প্রেমিক। সে প্রেম আজকের নয়। অনেক কালের। অনেক দিনের।

হরম বেগমের গলা—সোনা রূপ ধীরে ধীরে রাঙা হয়ে উঠল। বেগী আগার মুখে কামরানের প্রণয় নিবেদনে তাঁর সারা দেহে আগুন জ্বেলে দিলে। তাঁর টানা টানা চোখে ক্রোধের ফিনকি ছিটোতে লাগল। বেগী আগাকে বসতে বলে তৎক্ষণাৎ বেগম তাঁর স্বামী ও সন্তানকে খবর দিলেন।

নফর তাঁদের একেবারে ডেকেই নিয়ে এল। আর তাদের মুখে সেই চিঠি আর সেই রুমাল ছুঁড়ে দিয়ে বেগম বললেন, মির্জা কামরান নিশ্চয়ই ভেবেছে তোমরা ভীরু। তোমরা কাপুরুষ। নয়ত এ 'চিঠি আমায় সে লিখে কি সাহসে?'

সেই রাতেই সুলেমান মির্জার ভর্ৎসনাপূর্ণ চিঠি এল মির্জা কামরানের কাছে। আর সেই আগা বিবিকে তৎক্ষণাৎ বান্দার তলোয়ারে দু'খানা করে ফেললে। কিন্তু সেখানেই শেষ হ'ল না। হরম বেগমের রোষ চিরকালের জন্য কামরানের পিছু পিছু তাড়া করে ফিরতে লাগল। গৃহযুদ্ধে চিরকালের জন্যে সুলেমান মহিষী কামরানের পক্ষ ত্যাগ করলেন।

যে চরম যুদ্ধে মির্জা কামরান চিরকালের জন্যে হেরে গেলেন, সেই যুদ্ধেই মির্জা হিন্দাল অতর্কিত আক্রমণে মারা যান। এবং পাছে শত্রু পক্ষ জানতে পারলে সৈন্যরা নিরুৎসাহ হয়, সেজন্য সকলের অলক্ষ্যে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

কিন্তু ঘটনাটা গোড়া থেকে বলা দরকার। সম্রাট হুমায়ুনের যখন কাবুলের পথে তখন কামরান অন্যতম প্রধান আমীর বিভিন্ন খাজা খানের সাহায্য চেয়ে লোক পাঠান। খিজির

খাজা গুলবদনের স্বামী। গুলবদন তখন কামরানের কাছে। কাজেই আশা করা গিয়েছিল খাজা সায়েব কামরানের সহায়তা করবেন। হুমায়ুনকে নয়। কিন্তু গুলবদনকে যাঁরা জানতেন তাঁরা এও জানতেন গুলবদন মনে মনে বড় ভাই হুমায়ুনকেই বেশী টানতেন। গুলবদনের স্বামীর স্বভাবতঃই সে কথা অজ্ঞাত ছিল না। তা' ছাড়া বাবর যখন হুমায়ুনকে তাঁর উত্তরাধিকারী করে গেছেন তখন অন্য কোন প্রশ্নই ওঠে না।

এদিকে কামরান লোক পাঠিয়েছে শুনেই কমবর বেগকে পাঠালেন হুমায়ুন। কমবর বেগের দৌত্য বৃথা হ'ল না। অনতিবিলম্বে খাজা এসে কুর্ণিশ করে দাঁড়ালেন সম্রাটের সেবার্থে।

এদিকে হুমায়ূন এগোচ্ছেন। সসৈন্যে যখন তিনি মিনার পর্বতের কাছে পৌঁছালেন, কামরান আর অপেক্ষা করা সমীচীন মনে করলেন না। তাঁর সুশিক্ষিত বাহিনী নিয়ে আফকানকে পাঠালেন হুমায়ুনের সংগে লড়াই করতে। ডিহী আফগানের খণ্ড যুদ্ধের বিজয়লক্ষ্মীর বরমাল্য হুমায়ূনের ভাগ্যে পড়ল। আর দেরী না করে সম্রাট কামরানের শেষ আশ্রয় বালা-ই-হিশার দুর্গ অবরোধ করে বসে রইলেন।

দীর্ঘ সাত মাস ধরে চলল এই অবরোধ। এ সময়ের নিজের চোখে দেখা কয়েকটা মজার কাহিনীর কথাও বলেছেন আমাদের মহিলা ঐতিহাসিক। মুঘল অন্তর্দ্বন্দ্বের সেই অজ্ঞাত ছবি থেকে এই ঘরোয়া লড়ায়ের আসল চরিত্রটা ফুটে ওঠে।

সে এক সকালের কথা। মির্জা কামরান বালা-ই-হিশার দুর্গের ছাতে উঠে, বোধ করি, যুদ্ধের 'স্ট্র্যাটেজি' সম্বন্ধে সরজমিনে তদন্ত করছিলেন। হঠাৎ 'দুম' 'দুম' করে কয়েকটা শব্দ। সন্ত্রাসে লক্ষ্য করলেন মির্জা কামরান, হুমায়ূনের শিবির থেকে তাঁকে লক্ষ্য করেই এই বন্দুকের গুলি ছোঁড়া হয়েছে। বোন কথা নয়। 'অ্যাবাউট টার্ণ'। মির্জা শুধু নেমে এলেন না। হুমায়ূন পুত্র ভাবী সম্রাট আকবর তখন মায়ের সংগে কামরানের কাছে। তিনি এসে সংগে সংগে কিশোর যুবরাজ আকবরকে পাঠিয়ে দিলের দুর্গের মাথায়। হুমায়ুনের শিবিরে যারা দুর্গের পাহাড়ায় ছিল তাদের কাছে খবর গেল। সে খবর গিয়ে পৌঁছাল সম্রাটের কাছে। আর সংগে সংগে বালা-ই-হিশার দুর্গকে লক্ষ্য করে বন্দুক ছোঁড়ার পর্ব বন্ধ হয়ে গেল।

অবশ্য এই চালাকী শুধু যে কামরানই করেছিলেন, তা নয়। হুমায়ূনও করেছিলেন। মির্জা কামরান যখন দেখলেন অবরোধ করে হুমায়ূন তাকে বিশেষ যন্ত্রণায় ফেলেছে, আর হুমায়ুনের সৈন্য আর তাঁর দুর্গ লক্ষ্য করে কোন দিনই গুলি ছুঁড়তে পারবে না তখন কামরানই দুর্গের মাথা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছোঁড়া সুরু করে দিলে। হুমায়ুনের বেশ কয়েকজন মারা গেল। অনেকে আহতও হ'ল। হুমায়ুন বিব্রত। তাঁর এতদিনের অবরোধ বুঝিবা ব্যর্থ হয়। কিন্তু এই সময়ে কামরানের বুদ্ধিই হুমায়ুনকে পথ দেখালে। কামরানের ভাই মির্জা আশকারী তখন হুমায়ূনের কাছে। নিজের সৈন্যদলের সামনে তিনি মির্জা আশকরীকে দাঁড় করিয়ে দিলেন। গুলিবর্ষণ মন্ত্রের মত বন্ধ হয়ে গেল।

এই যুদ্ধের মীমাংসাও সেই একই কারণেই করতে পারছিলেন না হুমায়ুন। হুমায়ুনের বহু আপনার জন, তাঁর বিমাতা ও অনেক সম্মানীয়া মুঘল মহিলা রয়েছেন কামরানের শিবিরে।

ভারী কামান ব্যবহার তাঁদের ক্ষতি হতে পারে।

কিন্তু, সে যাই হোক, এই দীর্ঘ অবরোধেই একদিন ফল ফলল। বেগম সাহেবা তাঁর রোজ নামচায় লিখছেন—'আমাদের বালা-ই-হিশারে সন্ধ্যার আজানের সময় থেকে ভোর পর্যন্ত সারাক্ষণ একটা গোলমাল শোনা যেত। যেদিনের কথা বলছি (সাতাশে এপ্রিল, পনর শ' সাতচল্লিশ) সেদিন সন্ধ্যায় মুয়াজ্জিনের আজান থেকে আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত বিছানা নিলাম সর্বক্ষণ'একটুও গোলমাল কানে এল না।

আমাদের ওপরে আসবার জন্যে একটা খাড়া সিঁড়ি ছিল। সারা শহরটা তখন নিদ্রিত। হঠাৎ সিঁড়িতে অস্ত্রের ঝনঝনা, আর আর্তনাদ শোনা গেল। ধড়মড় করে আমরা যে যার বিছানায় উঠে পড়ে এ' ওকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলাম, 'এত গোলমাল কেন?' আমরা বেশ ভীত হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু যেমন অকস্মাৎ তারা এসে ছিল তেমনি চকিতেই তারা সব সরে গেল। এমন সময়ে দ্রুত পদে এল কারছা খাঁর ছেলে, বাহাদুর। তার মুখেই খবর এল মির্জা কামরান পালিয়ে গেছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই হুমায়ূনের লোক এসে দুর্গ অধিকার করে নিলে। বেগমদের স্থান ত্যাগ করতে নিষেধ করলে এবং অল্পক্ষণ পরেই সম্রাট স্বয়ং এসে বর্ষিয়সী বেগমদের পাদবন্দনা করলেন।

এর পরেই অবশ্য বাদাকশানের পথে হুমায়ূনের কাছে কামরান আত্মসমর্পণ করেন। কিন্তু তার আগে আর এক লড়ায়ে উভয়ের মধ্যে শক্তির পরীক্ষা হয় এবং সেই যুদ্ধেই মির্জা হিন্দাল মারা যায়। সে কাহিনী আনুপূর্বিক বলেছেন গুলবদন। বলেছেন, কেমন করে একটা হাঁচি হুমায়ূনের এই লক্ষণ ভাইটির মৃত্যুর আগে থেকে সঙ্কেত দিয়ে গিয়েছিল।

কামরানের সঙ্গে এই শেষ যুদ্ধে ব্যূহ রচনা শেষ করে মির্জা হিন্দাল তাঁর দেহরক্ষীকে বললেন, 'আমার অস্ত্রশস্ত্র, শিরস্ত্রাণ, বর্ম সব নিয়ে এস।' লোকটা কুর্নিশ করে সেই যে গেল, আর আসে না। দণ্ড পল গড়িয়ে পহর যায়। কিন্তু তার আর আসবার নাম নেই। উৎকণ্ঠিত মির্জা আবার লোক পাঠাইলেন। এবার সেই লোকটা ফিরে এল। মার্জনা চেয়ে বললে, 'কসুর মাপ হয় হুজুর। অস্ত্রশস্ত্র সবে বার করেছি আর সঙ্গে সঙ্গে কে যেন হেঁচে উঠল। কাজেই, কিছুক্ষণ বসে, অপেক্ষা করে নিয়ে এলাম। তাই এত দেরী।'

অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে মির্জা সৈন্যদের মধ্যে ফিরে যাচ্ছেন। হঠাৎ শুনলেন তাঁর 'তবাকচী' চিৎকার করে উঠলে 'ওরা আমায় মেরে ফেললে। মেরে ফেললে।' হিন্দাল দ্বিতীয়বার চিৎকারের জন্যে আর অপেক্ষা করলেন না। ঘোড়া থেকে নেমে তাকে সাহায্য করতে ছুটে গেলেন আর পাশের পরিখাতে নেমে পড়লেন। আর উঠলেন না।

হুমায়ূনের শ্বশুর মির্জার শীতল দেহটা চুপিচুপি বুকে করে তুলে নিয়ে তাঁর শিবিরে নিয়ে গেলেন। কাউকে কিছু বলা হ'ল না। শিবিরে দরজায় কড়া পাহাড়া রাখা হ'ল। আর জানিয়ে দেওয়া হল যে মির্জা অসুস্থ। কারও দেখা করা নিষেধ।

হুমায়ূনের কাছে খবর গেল। আর হুমায়ূনের সকল সংযমের বাঁধ হারিয়ে গেল।

কান্নায় ভেঙে পড়লেন সম্রাট। গুলবদন বেগমের স্বামী খিজির খাজা খায়ের রাজ্য জুই শাহাতে তাঁর সমাধির ব্যবস্থা করলেন সম্রাট। ভায়ের মৃত্যুতে শোক করে' গুলবদন বলছেন 'মেঘের পিছনে আমার সূর্য ঢেকে গেল।'

এটা শুধু গুলবদন বেগমেরই নয়। মির্জা কামরানেরও। কেননা, এর পরের কোন যুদ্ধেই, কোন ব্যাপারেই তিনি সুবিধা করতে পারেন নি। এমন কি পালাতে গিয়েও তিনি শেষ বেশ খুশাবের কাছে ধরা পড়েন।

তারপর সকল আমীর উজিরের নির্বন্ধাতিশয্যেই নাকি কামরানের চোখের আলো চিরকালের জন্য অন্ধ করে দেবার আদেশ দেন হুমায়ূন। গুলবদন বলছেন, হুমায়ূন মোটেই রাজী হন নি! তাদের মুখের কথায় বিশ্বাস করেন নি। সম্রাট তাদের বক্তব্য লিখে জানাতে বলেছিলেন। ওমরাহ্ উজিররা সবাই লিখিতভাবেই মৃত্যু কামনা করেন কামরানের। আর হুমায়ূন যখন পাঞ্জাবের বোটকের কাছে তখন সৈয়দ মুহম্মদকে তিনি কামরানের দুটি চোখই অন্ধ করে দেবার আদেশ দেন।

আর এই সঙ্গেই গুলবদন বেগমের বিরাশি পাতার পাণ্ডুলিপি শেষ হয়ে গেল। অত্যন্ত বৃদ্ধ বয়সেই এই কাজ সুরু করেছিলেন তিনি। হুমায়ূননামা রচনার উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু কোন ইতিহাস রচনা নয়। ইতিহাস রচনায় সাহায্য করা। সেই ইতিহাস সম্রাট আকবরের। জালালুদ্দিন মুহম্মদ আকবরের। সে ইতিহাস রচনা করবার ভার পড়েছিল আল্লামা আবুল ফজলের ওপরে। আর যাতে তাঁর রচনা স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়, সেই কারণে সম্রাটের পূর্বপুরুষদের বৃত্তান্ত যে যা জানেন তার একটা সংকলন রচনার আদেশ জারী হয়।

ঐ আদেশে সাড়া দিয়েছিলেন দু'জন। বাইয়াজিদ রচনা করেছিলেন হুমায়ুন নামা। অপরজন মুঘল রাজবংশের প্রথম এবং খুব সম্ভব শেষ এই মহিলা ঐতিহাসিক। গুলবদন তাঁর কথারম্ভে সম্রাটের এই হুকুমের কথা বলেই তাঁর গ্রন্থ সুরু করেছেন। বলেছেন যে সম্রাট বাবর যখন মারা যান তখন তাঁর বয়স আট। এও স্বীকার করেছেন যে সম্রাট বাবর সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ কিছুই মনে নেই।

না থাক, তবু তিনি যা' দেখেছেন তা' আর কেউ দেখেনি। অসূর্যম্পশ্যা মুঘল অন্দর মহলের ছবি, যাকে নাকি মহাকালের অগোচর রাখবার প্রয়াস ছিল, গুলবদন তার কঠিন কালো পর্দাটা মাঝে মাঝে সরিয়ে দিয়েছেন। তা' ছাড়া কবি-নায়ক বাবরকে তিনি দেখেছেন। সহজ, হৃদয়বান অথচ অহিফেনসেবী স্নেহপরায়ণ হুমায়ুনকে অত্যন্ত কাছ থেকে—নানা অবস্থায় দেখেছেন তিনি। আর দেখেছেন ছোট্ট আকবর কি করে' দিল্লীশ্বর জগদীশ্বর হয়ে উঠল। এত দেখার অবকাশ কেউই পায়নি। এ' তাঁর আশ্চর্য সুবিধা। পর পর তিনটি মুঘল সম্রাটের রাজত্বকালের তিনি এক অনন্য সংযোগসূত্র।

হুমায়ুননামার খণ্ডিত পাণ্ডুলিপিতে অবশ্য এর সবটুকু নেই। বেগমের লেখা হুমায়ুনের শেষ পাঁচ বছরের কাহিনী উত্তরকালের জন্য এসে পৌছায়নি। তবু, যেটুকু পৌছেচে, তাও বড় কম নয় এবং যে উদ্দেশ্যে এই লেখনী চালনা, তাও যে একেবারে ব্যর্থ হয়নি তার পরিচয়

আছে। আবুল ফজলের বাবর সম্বন্ধে উল্লেখটুকুর সঙ্গে হুমায়ুননামার কাহিনীর আক্ষরিক মিল আছে। কাজেই আকবরনামার লেখকের হুমায়ুননামার সঙ্গে অবশ্যই পরিচয় ছিল। কিছু বা ঋণও ছিল। যদিও সামান্য তবু ছিল।

কিন্তু কথা আছে। হুমায়ুননামার লেখিকার যতটা প্রচার হওয়া উচিত ছিল তা হয় নি। একেবারে হয়নি। সমসাময়িক ঐতিহাসিকরা কেউই বড় একটা তাঁর কথা বলেন নি। পর্দানসীন বেগমের রচনার ওপর থেকে মুঘল সম্রাটের পর্দাটা বুঝি বা সরাতে সাহস করেনি কেউ। শিরাজের মির মেহেদীর 'তাজকিরাতুল খতয়াতিন' গ্রন্থে অবশ্য গুলবদন বেগমের উল্লেখ আছে। কিন্তু সে তাঁর অন্য পরিচয়। সেখানে লেখিকা কবি। মুঘল অন্দর মহলের কাব্য চর্চার সরিক। অন্ততঃ তাঁর প্রেমের কবিতার একটি বয়েৎ চিরকালের কাব্য রসিকদের জন্য রেখে গেছেন—

হর প্যারী কে উ বা অশক্ খুদ ইয়ার নিস্ট।
তু ইয়াকিঁ সীদাঁ কে হেচ অজ উমর বর-খুর-দার নিস্ট॥

অর্থাৎ—

রূপসী নারীর যদি নাহি মিলে দয়িতের ভালোবাসা।
নিষ্ফল জেনো জীবন তাহার, মিথ্যাই যাওয়া-আসা॥

যদি ভালোবাসাই না রইল, তা' এ' জীবনে ফল হল কি?

অনেক দিন বেঁচেছিলেন গুলবদন। আশীটি বছর। মাঝে হজ ঘুরে এসেছেন। আকবরের বাড়বাড়ন্ত অবস্থা তখন। মক্কার পথে জলদস্যুর হাতে পড়েছেন। অনেক কষ্ট পেয়েছেন। অনেক জ্বালা। অনেক শোক। স্বামী মারা গেছে। ছেলেও। ভাইপোর সংসারেই কাটিয়ে গেছেন। ভাইপোর ছেলেদের খৃস্টানী দেখে ক্ষুব্ধ হয়েছেন। শেষে আকবরের রাজত্বের উনপঞ্চাশ বছর—ষোল শ' তিন সালে ফেব্রুয়ারী মাসে হঠাৎ জ্বরে পড়লেন তিনি। বিছানার পাশে ছিল হিন্দালের মেয়ে রুকায়া। শেষ পর্যন্ত সেই দেখত বৃদ্ধা পিসীকে। এই বল্লালী বালাইকে। আর তাঁকে দেখত তাঁর আশৈশব সহচরী আকবর-জননী হামিদা।

জ্বরের ঘোরে অঘোরে পড়েছিলেন গুলবদন! হেকিমরা সব জবাব দিয়ে গেছে। মুখে মৃত্যুর পাংশু রঙ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গোলাপী রঙ মরণের রোদ্দুরে একেবারে কালো তামাটে হয়ে গেছে। হামিদা ডাকলেন, 'জিউ। দিদি।'

কোন সাড়া এল না। একবার চোখ তুলে তাকালেন। আবার ঢলে পড়লেন। হামিদা প্রিয় নামে আবার ডাকলেন, 'গুলবদন।'

পদ্মকান্তি মেয়েটি আবার চোখ খুলল। তার ঘুমন্ত পদ্মের মত রঙে বুঝি একটু অতীতের আমেজ এল। সেই রঙে যেন শেষবারের মত জীবনের স্পন্দন জেগে উঠল। শেষবারের কথা বললেন গুলবদন, 'আমি যাচ্ছি। তোমরা রইলে। বলেই ঢলে পড়লেন। আর এই পর্দানশীন বেগমের ওপরে মহাকাল চিরকালের জন্যে তাঁর কালো পর্দাটা টেনে দিলেন।

তা দিক্। তবু, আকবরের মুঘল মহলের পাঁচ হাজার বেগম বিবিদের মধ্যে তিনিই একমাত্র

মহাকালের দরবারে নিজেকে পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন। সৃষ্টির ফরমাস নিয়ে এসেছিলেন তিনি। আর সে ফরমাস অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেলেন তিনি।

তবে হ্যাঁ। তাঁর স্মৃতিকথা চিরকাল পর্দানশীন সাহিত্য হিসেবেই পরিচিত হয়ে রইল। থাকবেও। কেননা, হুমায়ূন নামার একবার মাত্র পাণ্ডুলিপি উচ্চকালের জন্যে রয়ে গেছে। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ডক্টর রিউর সংগ্রহে রয়েছে সেটা। তাও খণ্ডিত। সমসাময়িক ইতিবৃত্তকাররা বুঝি অসূর্যম্পশ্যা, মুঘল অন্দর মহলের কারুকার্য খচিত যবনিকা সরিয়ে এই রচনাকে সাধারণের আমদরবারে হাজির করাটা বাদশাহী সম্রাটের পক্ষে হানিকর বলে মনে করেছিলেন। হয়ত বা!

তা' ছাড়াও কথা আছে। বেগম বইটা লিখেছেন ফার্সীতে। তুর্কী তাঁর মুখের বুলি। তবে নাগর ফার্সীতে লিখলেন কেন? অবশ্য তাঁর রচনায় তুর্কী শব্দ বার বার এসেছে। তবু এই নাগরিকতা কেন?

এ সব প্রশ্নের সর্বজ্ঞ কোন জবাব দেওয়া শক্ত। নানা দ্বন্দ্ব, নানা সংশয়ের মধ্যেই এই মুঘল স্মৃতিকথা আজও আধো আলো আধো অন্ধকারে বোনা এক অতলান্ত রহস্য রক্ষা করে চলেছে। পর্দানশীন স্মৃতিকথার রহস্যের পর্দাটা অন্ততঃ আজও ওঠেনি।

আদিবাসীদের লোককথা অধ্যয়নের পটভূমি

সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

আদিবাসীদের লোককথা ভাণ্ডারের অনেকখানি এখন পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত। অথচ তার মধ্যে বহু অমূল্য রত্নের সন্ধান পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। যাঁরা এই বিষয়ে কিছুটা অনুসন্ধান করেছেন তাঁরা সকলেই অনুরূপ মত প্রকাশ করেন। এপর্যন্ত যতটুকু কাজ হয়েছে তা প্রাথমিক অর্থাৎ সংগ্রহের স্তরে সীমিত রয়ে গেছে। ফলে উক্ত সম্ভাবনার সম্পূর্ণ তাৎপর্য এখনও পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি। 'সমকালীন'এর একটি সংখ্যায় সাধারণ ভাবে লোক-সাহিত্য তথা লোক-কথা অধ্যয়নের পরিপ্রেক্ষিত সম্বন্ধে লেখকের বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল। (১) এখানে তার পুনরুল্লেখ না করে শুধু এইটুকু বলাই যথেষ্ট হবে যে আদিবাসীদের লোককথা সম্পর্কে তা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। অর্থাৎ বিষয়টির প্রতি সুবিচারের জন্য সঠিক পটভূমি এবং পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করা নিতান্ত প্রয়োজন।

আমাদের দেশে স্মরণাতীত কাল থেকে বিভিন্ন ভাষাভাষী ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত জনসমষ্টি পরস্পরের সংস্পর্শে এসেছে। তাদের মধ্যে সংঘাত ও সংমিশ্রণ উভয় প্রক্রিয়াই চলেছে। বহু বিচিত্র মানবিক উপাদানের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে ভারতীয় মহাজাতির ভিত্তিভূমি। এদেশের সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি সেই সব জনসমষ্টির যৌথ অবদানে সমৃদ্ধ হয়েই গ্রহণ করেছে তার পরিপূর্ণ রূপ। আজ এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সব নানা ভাষাভাষী এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জনগোষ্ঠি এককথায় আদিবাসী বলে পরিচিত তাদের অবদান আদৌ উপেক্ষণীয় নয়। 'হিন্দু সংস্কৃতি' নামে পরিচিত বস্তুটি যে আর্যভাষী, দ্রাবিড় ভাষী এবং অষ্ট্রিকভাষী জনসমষ্টির সংস্কৃতির মিলনেই প্রধানত গড়ে উঠেছে তা পণ্ডিতদের গবেষণার দ্বারা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত। সেই মিলিত সংস্কৃতির ভিত্তির উপাদান যুগিয়েছে অষ্ট্রিক এবং দ্রাবিড়ভাষীরা আর সৌধ (Superstructure) ও সংশ্লেষণ (Synthesis) হল আর্যভাষীদের কৃতী। ব্রতপার্বণ, উৎসব অনুষ্ঠান, সামাজিক রীতিনীতি, ভাষা, লোককথা, এমন কি দার্শনিক চিন্তার বিকাশের ক্ষেত্রেও উপরোক্ত প্রক্রিয়ার বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। একজন প্রখ্যাত ভারতীয় মনীষীর মতে হিন্দুধর্ম ও দর্শনে 'কর্ম' এবং জন্মান্তরবাদ' এই দুই ধারণার মূলে রয়েছে অষ্ট্রিক প্রভাব। অন্যদিকে 'যোগ', 'শিব ও উমা' এবং 'বিষ্ণু ও শ্রী'র উপাসনা হল দ্রাবিড় ভাষীদের প্রভাবের ফল। (২) খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে উক্ত সংশ্লেষণের প্রক্রিয়া সুস্পষ্ট রূপরেখায় আত্মপ্রকাশ করে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে হিন্দু ভারতের ধর্ম এবং সংস্কৃতির বিকাশে দ্রাবিড় ও অষ্ট্রিক ভাষীদের প্রভাব সম্বন্ধে অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে। 'কিরাত' বা ইন্দো-মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠির অবদান অপেক্ষাকৃত ভাবে কম হলেও তুচ্ছ করার মত নয়। এই বিষয়ে

---

(১) আষাঢ় সংখ্যায় 'লোক-সাহিত্য অধ্যয়নের পরিপ্রেক্ষিত' নামে প্রবন্ধ।

(২) 'কিরাত-জন-কৃতি'—অধ্যাপক সুনীতিকুমার চাটার্জী।

অনুসন্ধান এযাবৎ বেশীদূর অগ্রসর না হলেও যেটুকু হয়েছে তা থেকে বিশেষ সম্ভাবনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

ব্রতপার্বণ, সামাজিক অনুষ্ঠান, রীতিনীতি, উৎসব ইত্যাদির ক্ষেত্রে আদিবাসীদের প্রভাবের দিকগুলি কিছু পরিমাণে তুলনামূলক নৃতত্ত্বের অধ্যয়নের ফলে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। কিন্তু লোক-কথার ক্ষেত্রে অনুসন্ধান সাধারণভাবে যেমন বেশী দূর অগ্রসর হয় নি তেমনি এই বিশেষ দিকটি এখনও বিদ্বৎ সমাজের দৃষ্টির আড়ালে রয়ে গেছে।

উপরে যে সংশ্লেষণের প্রক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে তারই অন্যতম অঙ্গ হিসাবে বিভিন্ন পুরাণের উৎপত্তি। পুরাণগুলিতে সমসাময়িক কালে লোক সাধারণের মধ্যে প্রচলিত সৃষ্টিতত্ত্ব, রূপকথা, ঐতিহাসিক কাহিনী, বীরগাথা ইত্যাদি একত্র সঙ্কলিত হয়েছে। সেগুলি আর্য এবং অন্-আর্য উভয় উৎস থেকেই গৃহীত। মহাকাব্যগুলিতে যে সব কাহিনী, উপাখ্যান ইত্যাদির দেখা পাওয়া যায় সেগুলিও অনুরূপ ভাবে আর্যভাষী এবং অন্-আর্যভাষী উভয় ধারার সম্মিলিত সৃষ্টি। সংশ্লেষণের প্রক্রিয়ায়, পুরুষানুক্রমে লোক মুখে প্রচলনের ফলে সেগুলি এমনভাবে পরস্পরের সাথে মিশে গেছে যে তাদের উৎসকে আলদা ভাবে চিনে নেওয়া খুব কঠিন। নৃতত্ত্ব এবং বিশেষভাবে লোককথাবিদেরা এই বিষয়ে তুলনামূলক পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে থাকেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, পুরাণ ও মহাকাব্যে প্রচলিত কতকগুলি কাহিনীর অনুরূপ জিনিষ যদি আদিবাসীদের লোককথায় দেখা যায় সেখানে তুলনামূলক পদ্ধতি প্রয়োগের দ্বারা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব। এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরণের জনসমষ্টির মধ্যে প্রচলিত অনুরূপ কাহিনীগুলির মূলগত সাদৃশ্য এবং পার্থক্য দুই-ই বিচার করা হয়ে থাকে।

বিশ্ব ও মনুষ্য সৃষ্টি, আদিম যুগের অবস্থা এবং অন্যান্য বিষয়ে বিভিন্ন দেশের জনসমষ্টির মধ্যে প্রচলিত কাহিনীর ভিতরে অনেক ক্ষেত্রে সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। সেই সাদৃশ্যের মূলে যথাক্রমে দুইটি কারণ থাকে। প্রথমত সুদূর অতীতকালে বহুক্ষেত্রে বিভিন্ন জনসমষ্টির পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগের ফলে একের লোককথা অপরের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। তা হয়ে থাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয়ভাবে। আবার অনেকক্ষেত্রে হয়ত দেখা যায় যে তারা আদিতে একই মূল-গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত ছিল। উত্তরকালে পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় সেই যোগসূত্র এবং আত্মীয়তার স্মৃতি কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।

অন্য দিকে, যোগাযোগ তথা আত্মীয়তা ছাড়াও অনুরূপ বাস্তব পরিবেশে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে অর্থাৎ অপরের প্রভাব ব্যতীতই বিভিন্ন জনসমষ্টির ভিতরে অনুরূপ কাহিনীর উৎপত্তি হয়ে থাকে। এই ধরনের সাদৃশ্যের দ্বারা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে সমস্ত দেশের ও ধরণের মানুষের আনন্দ-বেদনা, কামনা-বাসনা ও চিন্তা ভঙ্গীর মধ্যে মূলগত ঐক্যের সত্যটি।

সেইজন্যই সাদৃশ্য বিচারের সময় লোক-কাহিনী সঞ্চারণ (transmission) অথবা স্বতন্ত্র উৎপত্তি, এই দুইয়ের কোন একটি মাত্র তত্ত্বের ভিত্তিতে সঠিক সিদ্ধান্ত করা সম্ভব নয়। বহু তথ্য ও প্রমাণের সাহায্যে সাদৃশ্যের চরিত্র এবং মূলগত পার্থক্য উভয় দিকের উপর মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

আমাদের দেশের আদিবাসীদের লোককথা অধ্যয়ন করতে গিয়ে তাদের মধ্যে প্রচলিত বহু কাহিনীর সঙ্গে পুরাণ ও মহাকাব্যের অনেক কাহিনীর সাদৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়। সেগুলির উৎস সম্বন্ধে কোনরূপ সিদ্ধান্ত করা লেখকের সীমিত জ্ঞান এবং ক্ষমতার সাহায্যে সম্ভব নয়। তবে এইটুকু স্বচ্ছন্দে বলা যায় যে উপরে উল্লিখিত আর্য ও অনার্যভাষীদের সংস্কৃতির মিলনের প্রক্রিয়ার পটভূমিতে ঐ সাদৃশ্যগুলি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সেদিকে সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

পুরাণের মহাপ্লাবনের কাহিনী সুপরিচিত। বিভিন্ন অঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যেও স্মরণাতীত কালে এক মহাপ্লাবনের কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। সেই সব আদিবাসীরা ভৌগোলিক অবস্থান, নৃতাত্ত্বিক উপাদান, ভাষা ইত্যাদির বিচারে বর্তমানে পরস্পরের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।

মহাপ্লাবন সম্বন্ধে অনুরূপ কিম্বদন্তী শুধু ভারতেই নয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশের লোককাহিনীতে প্রচলিত আছে। এক সময়ে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা মনে করতেন যে ঐ সব কিম্বদন্তী আসলে বাইবেলে বর্ণিত কাহিনীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। কিন্তু প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ জেমস ফ্রেজার অনেক তথ্য ও যুক্তির দ্বারা সেই মত খণ্ডন করেন। বরং তিনি প্রমাণ করেন যে বাইবেলের কাহিনীই এশিয়া মাইনরে প্রচলিত অতি প্রাচীন লোককাহিনীর ভিত্তিতে রূপ নিয়েছে। এই প্রসঙ্গে তিনি উপরোক্ত তুলনামূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। তিনি মূলগত সাদৃশ্য ও পার্থক্য উভয়দিকের বিচারে সিদ্ধান্ত করেন যে কতকগুলি ক্ষেত্রে যেমন এক জন-সমষ্টি থেকে অন্য জনসমষ্টিতে ঐ কাহিনী সঞ্চারিত হয়েছে তেমনি অপর কতকগুলি ক্ষেত্রে তার উদ্ভব হয়েছে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে। সে সবের মূলে রয়েছে স্মরণাতীত কালে প্লাবনের সত্যকার ঘটনার স্মৃতি। পরে পুরুষানুক্রমে লোক মুখে প্রচলনের সময় তাতে আরো অনেক উপাদান সংযোজিত হয়েছে, ঐতিহাসিক তথা সাংস্কৃতিক পরিবেশের বৈশিষ্ট্যের ছাপ পড়েছে।

পণ্ডিতদের মতে বৈদিক স্তোত্রগুলিতে মহাপ্লাবনের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। সংস্কৃত সাহিত্যে তার প্রথম উল্লেখ দেখা যায় 'শতপথ ব্রাহ্মণে', তারপর মহাভারতে এবং আরো পরে পুরাণে। শতপথ ব্রাহ্মণের কাল বুদ্ধের সামান্য পূর্বে বলে ধরা হয় অর্থাৎ সেই সময়ে আর্য এবং অন্-আর্য সংস্কৃতির সংশ্লেষণের প্রক্রিয়া দানা বেঁধে উঠেছে।

আদিবাসীদের মধ্যে মহাপ্লাবন সম্বন্ধে প্রচলিত কিম্বদন্তীর কয়েকটি দৃষ্টান্ত নীচে উল্লেখ করা গেল।

ভীলদের মধ্যে এইরূপ কাহিনী প্রচলিত আছে। এখানে একটি মাছ জনৈক ভীল রমণীকে পূর্বাহ্নে সতর্ক করে দেওয়ার ফলে তারা সকলে একটি উচ্চ পর্বতশৃঙ্গে আশ্রয় নেয় এবং বন্যার প্রকোপ কমে গেলে নীচে নেমে আসে।

সিকিমের লেপচাদের কিম্বদন্তী অনুসারে স্মরণাতীত কালে একবার এক বিশাল বন্যাপ্রবাহে সমস্ত দেশ ডুবে যায়। লেপচাদের মধ্যে যে অল্প সংখ্যক লোক কোন মতে রক্ষা পায় তারা 'টেন্-ডঙ্গ' নামে এক পাহাড়ের চূড়ায় আশ্রয় নেয়। সেখনে বসে তারা অসহায় হয়ে দেখে যে হিমালয়ের শিখরগুলি একের পর এক জলের নীচে তলিয়ে যাচ্ছে। তবে দেবতার কৃপায়

তাদের আশ্রয়স্থল পর্বত চূড়াটি ক্রমেই উঁচু হয়ে আকাশের দিকে উঠতে থাকে। এই বিপর্যয়ে তারা এত ভীত হয়েছিল যে জল সরে যাওয়ার পরও কিছুদিন পর্যন্ত আশ্রয় স্থান ত্যাগ করে নীচে নামতে সাহস করে নি। অবশেষে সবুজ পাতাযুক্ত গাছের উপশাখা মুখে নিয়ে একটি পাখীকে উড়ে যেতে দেখে তাদের মনে সাহস ফিরে আসে এবং তারা নিম্নে অবতরণ করে।

কেরলে কাদারদের কিম্বদন্তী অনুযায়ী তাদের আদি পিতা 'মালাঙর' এবং আদি মাতা 'মালানকুরতি' ঐরূপ প্লাবনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পর্বতের গুহার মধ্যে থেকে চূড়ায় উঠে আসেন।

সাঁওতালদের মধ্যে প্রচলিত কাহিনী একটু অন্য ধরণের। তদনুযায়ী আদিতে সমগ্র পৃথিবী ছিল জলমগ্ন। 'ঠাকুর' বা 'সিঙ্গবোঙা'র আদেশে কেঁচো জলের নীচে থেকে মাটি এনে কাছিমের পিঠের উপর স্তূপীকৃত করে। তারপর ঠাকুর সেই স্তূপকে বর্তমান রূপ দান করেন।

শুধু মহাপ্লাবনের কিম্বদন্তীই নয়, আরো বিভিন্ন ধরণের কাহিনীর মধ্যেও আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। তার মধ্য থেকে একটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত নীচে দেওয়া গেল।

রামায়ণে দেখা যায় যে হনুমান জন্মগ্রহণের কিছুক্ষণ পরেই নিজ মাতার আদেশে সূর্যকে বন্দী করেন। নীলগিরি পাহাড়ের টোডাদের লোক কথায় অনুরূপ একটি ঘটনার সন্ধান মেলে।

পেক্কান এন নামে একজন টোডারপত্নী সন্তানের বদলে একটি কুমড়ো প্রসব করে। পেক্কান বলে যে সন্তান যখন মৃত তখন তার সৎকার করা প্রয়োজন। কিন্তু চিতায় অগ্নি-সংযোগের সাথে সাথে কুমড়োটি দুই খণ্ডে ভাগ হয়ে যায় এবং দেখা যায় যে একটি ভাগের মধ্যে একটি ছেলে শুয়ে রয়েছে। পেক্কান দম্পতি তখন ছেলেটিকে নিয়ে ওকাদানামন্দ অর্থাৎ বর্তমান উটাকামণ্ডে ফিরে আসে ও সুখে বাস করতে থাকে। কিছুদিন পরে ছেলেটি যখন খেলায় মত্ত ছিল তখন কি ভেবে পেক্কান তার উপরে এক মুঠি ধুলো ছিটিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি চিলের রূপ ধারণ করে উড়ে চলে যায়। সেই যুগে দেবতারা দোদ্দাবেত পাহাড়ের চূড়ায় সমবেত হতেন। চিলটি গিয়ে দেবতাদের সাথে আসন গ্রহণ করে। দেবতারা তাকে তাড়াবার উদ্দেশ্যে কয়েকটি অসাধ্য সাধনের নির্দেশ দেন। তারমধ্যে অন্যতম ছিল সূর্যকে ধরে আনার নির্দেশ। চিল প্রথমে লোহার এবং পরে কাঁসার তৈরী শিকল দিয়ে সূর্যকে টেনে নামাতে চেষ্টা করে। কিন্তু সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপে দু'বারই শিকল গলে যায়। তখন চিল শিকলের উপরের অংশ বানায় পাথর দিয়ে এবং তার সাহায্যে সূর্যকে টেনে নামাতে সমর্থ হয়। ফলে সারা পৃথিবী অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে গেল। দেবতারা তখন চিলের কাছে গিয়ে বলেন যে তুমি সত্যিই মহান্। এখন সূর্যকে মুক্তি দাও। চিল সে অনুরোধ রক্ষা করে এবং দেবতাদের সঙ্গে সমান মর্যাদার আসনের অধিকারী হয়।

দৃষ্টান্তের সংখ্যা বাড়াতে গেলে প্রবন্ধের কলেবর আয়ত্তের বাইরে চলে যাওয়ার আশঙ্কায় তা থেকে বিরত থাকতে হচ্ছে। যেটুকু দেওয়া গেল তাই এই বিষয়টি যত্ন সহকারে অধ্যয়নের দিকে মনোযোগ আকর্ষণের পক্ষে যথেষ্ট হবে আশা করি।

আদিবাসীদের লোককথা অধ্যয়নে আর-একটি দিকের প্রতি মনোযোগ দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। তা হল লোককথায় তাদের জীবন এবং সংগ্রামের প্রতিফলন। এই প্রসঙ্গে ম্যাকসিম গোর্কীর একটি বক্তব্য বিশেষভাবে অনুধাবন যোগ্য। তাঁর মতে আদিম যুগের মানুষ প্রকৃতি এবং বহিঃশত্রুর সাথে লড়াইতে যে সব জয়লাভ করেছে তার অভিজ্ঞতা রূপায়িত হয়েছে নানা কাহিনীতে। সেদিনের মানুষ বাধার সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভের কামনা করেছে, স্বপ্ন দেখেছে সুন্দর সুখী জীবনের। সেই সব স্বপ্নেরও কল্পনারঙিন অভিব্যক্তি হয়েছে তাদের রূপকথায়। যে সব জনসমষ্টিকে আপাতদৃষ্টিতে অত্যন্ত পশ্চাৎপদ মনে হয়, যাদের লিখিত সাহিত্য নেই তারা লোককথার মাধ্যমে নিজেদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা করে। এইভাবে শত কষ্ট এবং অবমাননার মধ্যেও তারা রূপকথা সৃষ্টির মাধ্যমে এক সুন্দর সুখীজীবনের স্বপ্নের দীপশিখাকে জ্বালিয়ে রাখে অনির্বাণভাবে।

গোর্কী রূপকথার মধ্যে শুধুমাত্র ইচ্ছাপূরণের প্রক্রিয়া দেখতে বা তাকে অপরিণত মনের কল্পনা বলে উড়িয়ে দিতে রাজী নন। তাঁর মতে বাস্তবের তাগিদে, বাধার উপরে জয়লাভ এবং শ্রমের কঠোরতা লাঘবের কামনা রূপকথার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়। যেমন, অতি শীঘ্র দীর্ঘপথ পাড়ি দেওয়ার প্রয়োজন ও বাসনা থেকে 'সেভন লীগ বুটস' (Seven League Boots) এর কল্পনার উদ্ভব হয়েছে। এব্যাখ্যা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। মানুষের ইতিহাসে একযুগের রূপকথা উত্তরকালে সত্যে পরিণত হয়।

লোককথার বীরকাহিনীগুলিতে যে সব অলৌকিক শক্তিধর পুরুষের দেখা পাওয়া যায় সে সম্বন্ধেও গোর্কী সম্পূর্ণ নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন যে ঐ সব মহাবীরেরা হলেন আদিম সমাজের সমষ্টিগত শক্তির প্রতীক। আদিম সাম্যবাদী সমাজের মানুষ সঙ্ঘজীবনের সাথে জড়িত ছিল অঙ্গাঙ্গীভাবে। সেদিন শুধুমাত্র সঙ্ঘশক্তির সাহায্যে প্রকৃতি বা বহিঃশত্রুর সাথে যুদ্ধে জয়লাভ সম্ভবপর হত। তাই তখনকার মানুষের মধ্যে যৌথ চেতনাই ছিল প্রধান। জীবিত গোষ্ঠিপতি যেমন সমগ্র সমাজের প্রতীকরূপের মর্যাদার অধিকারী ছিল তেমনি অতীতের মহাবীর চরিত্র চিত্রণের মধ্যে সেই যৌথশক্তির প্রতি বিশ্বাসই মূর্ত হয়ে উঠেছে।

উপরিউক্ত দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যায় যে আমাদের দেশের আদিবাসীদের লোককথা সম্বন্ধেও গোর্কীর বক্তব্য প্রযোজ্য। তাদের মধ্যে আত্মমর্যাদা বোধ এবং নিজেদের অতীত গৌরব সম্বন্ধে গর্বের অনুভূতি খুব প্রবল। যে সব উপজাতি এখনও সমাজবিকাশের স্তরের দিক থেকে প্রায় আদিম অবস্থায় পড়ে রয়েছে তাদের ক্ষেত্রেও এই জিনিসটি লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয়ত, অনেক উপজাতির কিম্বদন্তীতে এক বিস্মৃতপ্রায় স্বর্ণযুগের বিবরণ পাই। তাদের জীবিকাপ্রণালীর ভিত্তিকে আশ্রয় করে সেই স্বর্ণযুগের কল্পনা গড়ে উঠেছে। বর্তমানে তাদের আদিম জীবনযাত্রার ভিত্তি বিপর্যস্ত হওয়ায় অনেক দুর্দশার সৃষ্টি হয়েছে। তবু তারা হতাশার কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করেনি। ঐ সব কাহিনীর মাধ্যমে সুখী ও সুন্দর জীবনের স্বপ্ন তথা অতীতের গৌরব বোধকে জীবিত করে রেখেছে। ছেলেদের বয়ঃপ্রাপ্তি-সংস্কার অনুষ্ঠান উপলক্ষে উপজাতীয় পুরোহিতেরা তাদের ঐ সব কাহিনীর সাথে পরিচিত করে।

আদিবাসীদের লোককথায় অনেক মহাবীর চরিত্রের দেখা পাওয়া যায়। এমনকি ব্রিটিশ আমলে বিভিন্ন অঞ্চলে আদিবাসীদের মধ্যে যে সব অভ্যুত্থান হয়েছে তার নায়কদের কেন্দ্র করে অনেক কাহিনী রচিত হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে দেখলে যেগুলিকে কুসংস্কার এবং অলৌকিকত্বে বিশ্বাস ইত্যাদিতে ভরা মনে হতে পারে সেগুলির মধ্যে বলিষ্ঠভাবে স্পন্দিত হয়েছে তাদের সংগ্রামী চেতনা। আর গোর্কীর বক্তব্যের আলোকে বিচার করে দেখলে সেইসব কাহিনী নতুন তাৎপর্য-মণ্ডিত হয়ে ওঠে।

আদিবাসীদের অতীত অবদানে চিত্রটি পরিস্ফুট হয়ে উঠলে তা আদিবাসী তথা উপজাতি এবং অন্-উপজাতীয় জনগণের মধ্যে ভাবগত সংহতি সাধনে বিশেষভাবে সাহায্য করবে। সংস্কৃতির ভাণ্ডারের পুনরুদ্ধার তাদের বিকাশের প্রক্রিয়ায় সঞ্চারিত করবে নতুন গতিবেগ। তারাও স্বাধীন ভারতে উন্নতি এবং বিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগ লাভের অধিকারী। নবযুগে নতুন ভাবে আবার আদান-প্রদানের প্রক্রিয়া উঠুক প্রাণবন্ত হয়ে। ভারতীয় সংস্কৃতির ভাণ্ডার এইভাবে আরো সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, বিবিধের মাঝে মিলন মহানের মূলমন্ত্র সার্থক হবে সর্বাঙ্গীন ভাবে।

শিল্পে সাবেকীয়ানা

শিল্পে সাবেকীয়ানা বলতে বোঝায় সময়ের ধারা বেয়ে উৎরে চলে আসা ভাবপ্রকাশের কিছু মানানসই প্রথা আর শিল্প গড়ার কিছু চলনসই পন্থা। সমাজসঙ্ঘের চোখ দিয়ে যদি দেখি তবে তো সরাসরি না মেনে উপায় নেই যে, নিজেরা আধুনিক বলে যতোই গর্ব করি না কেন, আসলে পুরাণপুরুষের আমলকে আমরা রক্তের ভেতর গেঁথে নিয়ে বেড়াচ্ছি, এমনকি ছাতাপড়া মান্ধাতা বলে যাকে বাঁকা হাসি আর তুড়ির হাওয়ায় উড়িয়ে দিই, খুঁজলে মনে তারও দেখা মিলতে পারে। কাজেই সাবেককালকে আমরা ফেলে আসতে পারি, কিন্তু সাবেককাল কখনোই আমাদের ছেড়ে যায় না। ফলে সেকালের শিল্পের ধরণধারণ আর বিশেষ ঢঙের অভ্যেসটুকু নানা যুগের ঢেউয়ে ভেসে একালে এসে পৌঁছয় সংস্কারের মতো। এমনি করেই সাবেকীয়ানার পথ পাকা হয় শিল্পের কোন মেজাজ নিয়ে, মর্জি নিয়ে, কোনো যুগের ভাবনা নিয়ে, কোনো দেশের স্বভাব নিয়ে। হরেক রসদে মহফিল জমালেও আমরা জানি সবকিছু ধোপে টেঁকে না; তারই ভেতর যেগুলো টিঁকে যায় সেগুলোই কালে সাবেকী হয়ে ওঠে। এদিক থেকে সাবেকীয়ানাকে বলতে পারি তাগসই টানাপোড়েনের ফসল।

অবশ্য শিল্প যদি শুধু এই সাবেকীয়ানাকেই গয়া-গঙ্গা বলে ভাবতে শেখে তবে সে-শিল্প সাবেককালের একটা অসাড় নকল হতে বাধ্য। কারণ একাল সব সময়েই সেকালের চেয়ে এক কদম এগিয়ে চলে। শিল্পীরও তাই নিজের কালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে রাখাটা পয়লা দস্তুর, সাবেকীয়ানার প্রশ্ন সেখানে আলাদা ব্যাপার। আমার এ-কথায় কেউ যেন মনে না করেন, একাল বুঝি একেবারে ভুঁইফোড় কিছু একটা, সাবেক আমলের সাথে তার আড়ি। মোটেই তা নয়, বরং দুটি কালের মেলামেশা ষোলোকলা পেরিয়ে গিয়ে আছে। রুচির পাথরে কষে সেকালের টেঁকসই মালমসলাগুলোকে বেছে নিয়ে তার ওপর চলতিসময়ের পালিশ চড়িয়েই তো একাল ডগমগ।

কাজেই, সেকালকে পুরোপুরি বাতিল করে দিয়ে একালকে নিয়ে বড়ো বেশি মাতামাতি করে আমরা যেমন মাতাল হবো না, তেমনি গোটা একালকে তালাক দিয়ে সেকালের সবকিছুকে মাথায় তুলে নেচে-কুঁদে বেতাল হবার ইচ্ছে রাখিনে। একালে জন্মেছি বলে পা দুটো যখন একালমুখো, তখন চোখ দুটোকেও তেমনি করে সাজাতে হবে। মুখ ফিরিয়ে মাঝে মাঝে শুধু পেছনটাকে দেখে নিতে পারি। কিন্তু পেছনটাকেই দেখবো বলে চোখ দুটোকেও যদি পিঠের দিকে বসিয়ে নিই তবে পা আর চোখের বেছাঁদ রেশারেশিতে চলাটাই যায় ঘুচে। শিল্পী তখন ঘুরে ফিরে ঐ সাবেককালের একটা অসাড় নকল গড়তে থাকেন। আর তাঁর সেই সাবেকীয়ানার বাড়াবাড়িকে কিছুমাত্র শিল্পের দাম না দিয়ে আমরা তাকে সেকেলে বলতে সুরু করি।

মোটের ওপর, সাবেকীয়ানা হচ্ছে ঝরতিকালের শিল্পের রেওয়াজ আর ঘরানার সঙ্গে চলতি-কালের কুটুম্বিতের সাঁকো। এই কুটুম্বিতের ব্যাপারটা অবশ্য বেশ ঘোরালো। তাছাড়া একজন শিল্পী একে যেভাবে কাজে লাগাবেন, অন্য শিল্পীর হাতে তেমনটি না ঘটতেও পারে। যেমন ধরা যাক, 'সূর্য' বললে একসময় শক্তির কথা বোঝাতো, সুদিনের কথা, সুন্দরের কথাও। কিন্তু আজকের শিল্পীর চোখে সেই সূর্যই চিতা চুল্লী হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ এ কথা ঠিক, সূর্যের সেদিনকার চালু মানেগুলোকে আমরা এখনো একেবারে ভুলে যাই নি। কাজেই এমনি এক অবস্থায় আজ কোনো শিল্পী যদি সূর্যের কথা বলেন—কি, ছবি আঁকেন—তখন সত্যিই তিনি সাবকীয়ানার সাঁকো বেঁধেছেন কি না, আমরা সহজে ঠাওর করতে পারি নে। ফলে সেকালের আর একালের কুটুম্বিতের ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে ওঠে।

সাবেকীয়ানার চওড়া মানেটাকে যদি মেনে নিই, তবে তো সাবেকীয়ানার ভেতরেই চলে আমাদের আসা-যাওয়া হাসিখুশির হাট। কারণ একেবারে আনকোরা কোনো কিছু আমরা গড়তে পারি নে; এক সাবেকীআনা থেকে রস টেনে নিয়ে আরেক সাবেকীয়ানার ফুল ফোটাই। আমরা যা দেখছি শুনছি, তারই কিছু-না-কিছু আমাদের দশজনের ভাবে আর ভাবনায় ঘুরতে ঘুরতে প্রতি মুহূর্তে সাবেকী হয়ে উঠছে। তাকে নিয়েই আবার অন্য দশজনের ভাব আর ভাবনা দানা বাঁধছে সাবেকী হবার জন্যে। তবে কথা হচ্ছে, জন্মের ভেতর দিয়ে মুফতে পেয়ে যাওয়া সাবেকীয়ানা নিয়েই যদি মৃত্যু অবধি আমরা খুশি থাকি, তাহলে শিল্পকে আর তিলে তিলে নোতুন হতে হচ্ছে না। কারণ গৎ-বাঁধা কাজে একটা যে আপনঘোরা গতানুগতিকতা আছে, সেটাই তখন শিল্পীকে পেয়ে বসে, শিল্পকেও।

সাবেককাল আর সাবেকীয়ানাকে একই জিনিস বলে ধরে নিলে বড়ো রকমের ভুল করা হবে। এ তো জানা কথা, সাবেককালের সবকিছুই সাবেকীয়ানায় ঠাঁই পায় না। কাজেই সাবেকীয়ানার দিকে মুখ ফেরাতে গিয়ে যদি সাবেককালের দিকেই মুখ রেখে বসি, তবে চলতিকালের ঝামেলা থেকে আমাদের পালানোর ইচ্ছেটাই তাতে ফুটে উঠবে বেশি করে। মনের দিক থেকে সমাজঘেঁষা শিল্পীর রচনায় ঐ ইচ্ছেটি ফুটে উঠলে আমরা নিশ্চয়ই সে-রচনাকে তেমন করে খাতির করবো না অবশ্য চলতি কালটাকে ভালো করে বুঝে নেবার জন্যে অনেকসময় সাবেককালের দিকে মুখ রেখে আমাদের বসতে হয়। কিন্তু তাই বলে সেই সাবেককালের ওপর ফলাও করে মিথ্যে রঙ চড়িয়ে তাকে মনভোলানো বাহারে করে তুলবার কাজটিকে আমরা মোটেই বরদাস্ত করতে পারি নে। সাবেককালকে যদি দেখতেই হয় তবে তাকে রূপকথার চোখে বিভোর হয়ে না দেখে ইতিহাসের চোখে যাচাই করে দেখাই ভালো। সাবেকীয়ানার আসল রূপটিকেও তাহলে ঠিক ঠিক বুঝে নেয়া সহজ হবে।

শিল্পী যদি বণিকনীতির দৌলতে সাবেককালের দু-একটি নাম-ধাম কিংবা দু-চারটি থাম গম্বুজে আর বাকীটুকু নিজের মনগড়া খেয়ালখুশি মিশিয়ে শিল্প গড়ে ফাঁকি দিয়ে রসিকের মন কাড়তে আসেন, তবে হলপ করে বলতে পারি—শিল্পের হাটে তিনি মিথ্যের বেসাতদার। কারণ নাম-ধাম-থাম-গম্বুজে সাবেকীয়ানাটা আটকে বসে নেই। ভাবটিকে না ধরতে পারলে বাইরের ঐ

সাজপোষাকের নিছক চটকদারি দিয়ে কিছুতেই তুরুপ মারা যাবে না।

সাবেকীয়ানাকে আমরা দেখি কেল্লার চাঁদিতে টাঙিয়ে দেয়া নিশান হিসেবে নয়, মিছিলের হাতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ঝাণ্ডা হিসেবে। আমাদের কাছে এটি তাই চলন্ত স্রোতের অ্যালবাম। কিন্তু তবু বিনা বিচারে তাকে তুলে নিয়ে কেউ যদি শিল্প গড়তে বসেন, তবে চলতিকালের সঙ্গে সেই সাবেকীয়ানার যোগ ঘটবে না, এমন কি সাবেককালের সঙ্গে তার যোগটুকুও সে হারাবে। তাই সাবেককালকে মিঠে স্বপ্নের সব-পেয়েছির-দেশ মনে করে শিল্পী যখন তাকে অন্যায় আবদারে রঙিন করে তোলেন, চলতিকালের ঝাঁঝালো গন্ধ আর চোখ-রাঙানীকে ভোলবার জন্যে তার ভেতরে মৃদু নিরিবিলি আস্তানা খুঁজে বেড়ান এবং যা দিয়ে সেই সাবেককালের মুশকিল আসান হয়েছিলো, সেই পুরোনো দাওয়াই বাৎলে দেন চলতিকালের ঝঞ্ঝাট মেটানোর জন্যে, তখন আমরা বিরক্তিতে বিষিয়ে উঠে বলি—শিল্পী একেবারে সেকেলে।

এই সাবেকীয়ানা মনের কল্পনা নয় যে সহজেই মুছে ফেলবো। শিল্পের চালু রেওয়াজ বলে গোটা সমাজ একে মেনে নিয়েছে, ধরে রেখেছে। এর হাত-বদল হয়, সে সঙ্গে চেহারাও। যেমন সেদিনকার জলসাঘরের গানের আসরই আজ সভাঘরের সংগীত, সম্মেলন হয়ে উঠেছে। দৌলতকুলীনের চষকে যে-রস একলার ছিলো, গণসমাজ তাকে তুলে দিয়েছে সকলের উপভোগের জন্যে। কাজেই বাইরের দিক থেকে নোতুন আসনে নোতুন রসিকমহল মজলিস জমালেও গুণী শিল্পীর কাছ থেকে গান শোনার উদ্দেশ্যটি ঠিকই বজায় আছে।

হালআমলে অবশ্য কেউ কেউ বস্তুবাদের বোল তুলে সাবেককাল আর সাবেকীয়ানাকে ভাসান দেবার কাজে বড়ো বেশি উৎসাহী। আমার বিশ্বাস, সাবেকীয়ানা সম্বন্ধে তাঁদের স্পষ্ট কোনো ধারণা নেই। ধোঁয়া-ওঠা আকাশ-ছোঁয়া চিমনির কথা বলতে শুনলেই তাঁরা শিল্পীকে বলেন পাকা রিয়ালিষ্ট; চতুর্দশী চাঁদের আলোমাখা রাতের ছবি আঁকতে দেখলেই ধরে নেন, শিল্পী একজন ন্যাকা রোমান্টিক, মোদ্দা কথা, রোজদিনকার পথে-ঘাটে আমরা যেমন আতসে-রোশনায়ে উৎসব চিনে আর তিলকে-চন্দনে ভক্ত ঠাউরে ভুল করি, তাঁরাও তেমনি চিমনি আর চাঁদের ঐ ওপরকার ধারণাটিকে নিয়ে ভুল করেন। সাবকীয়ানাকে কোনমতেই খারিজ করা যায় না। কারণ সেটা যে আমাদেরই ভেতর দিয়ে একটা কিছু হয়ে উঠছে। বস্তুবাদের সেইসব ডাকাবুকো আসাবরদারেরা যদি সাবেকীয়ানার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান, তবে তো নিজের সঙ্গে নিজেরই লড়াই হয়ে উঠবে। কোনো শিল্প যে-কালে তৈরী হয়, সে-কালকে পেরিয়ে গিয়ে যখন তা সব কালের রসিকের মন কেড়ে নেয়, তখনই বুঝতে পারি—সাবেকীয়ানা জিনিসটা কতোখানি মজবুত।

এ-কথা ঠিক, যতোই দিন যাচ্ছে ততোই আমাদের জীবনের মানে পাল্টাচ্ছে, জীবনের মানও। তাহলে দেখা যাচ্ছে, কালের সঙ্গে তাল রেখে সাবেকীয়ানার অনেককিছুই হয়তো একদিন খসে পড়বে, কিন্তু কখনো দল বেঁধে সবকিছুই নয়। কারণ সবটুকু সাবেকীয়ানার পাট উঠে যাবার ঢের আগেই নোতুন সাবেকীয়ানার পত্তন হবে।

দেবব্রত চক্রবর্তী

জমা-খরচ, ১৩৭১

একটা বছর শেষ হবার সংগে সংগেই জমা-খরচের খাতায় দাঁড়ি টানা হয়; নতুন বছরের প্রথম দিনে নতুন খাতায় নতুন করে আবার হিসাব স্বরু করবার আগে পুরানো খাতার জমা আর খরচ দু' দিকের অংকগুলো যোগ করে পারস্পরিক বিয়োগের দ্বারা লাভ ক্ষতির একটা নিরিখ করা নীতি। কিন্তু সেখানেই শেষ হয় না কাজ, ব্যবসাদারদের সমস্ত খাতাটার নিরীক্ষা করিয়ে সরকারকে কি কর দিতে হবে না হবে স্থির করতে হয়। অসাধু ব্যবসায়ীরা অবশ্য নিজেদের স্থবিধাজনক সর্তে খাতাটি তৈরী করে রাখেন কিন্তু সে কথাকে বিশ্বাস করাটা সর্বদা সম্ভব হয় না। তবু মোটামুটি অবস্থা আন্দাজ করা কিছুটা সময় সাপেক্ষ হলেও অসম্ভব নয়।

বাংলা নাট্যশালার ক্ষেত্রে সেই সময় সাপেক্ষ নিরীক্ষার কাজ করার চেষ্টা করছি। বর্তমানে কতকগুলি প্রাথমিক আলোচনা উপস্থিত করছি। এতে সাধারণভাবে বাংলা নাট্যশালার গত বছরের অবস্থা, নাটকের ধরণ, কোন কোন নাট্যকারের নাটক বেশী মঞ্চস্থ হয়েছে, দর্শকরা কিভাবে নাটক গ্রহণ করছে ইত্যাদি আলোচনা করা হচ্ছে। পরে স্থবিধা ও স্থযোগ মত পেশাদারী, অর্ধসৌখীন ও সৌখীন সম্প্রদায়ের নাট্য প্রচেষ্টা সম্বন্ধে তথ্য বহুল বিশদ আলোচনার চেষ্টা করব।

[প্রসঙ্গত বহুল প্রচারিত এক সহযোগী পত্রিকার নাট্যালোচনার স্তম্ভে উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতার নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে যে মন্তব্য করা হয়েছে তার ওপর সামান্য দু' এক কথা বলতে চাই। প্রথমতঃ, নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে উত্তর-দক্ষিণ বিভাগটা শুধু অপ্রয়োজনীয় নয় অবাস্তবও বটে। নাট্যরসিকরা পছন্দসই দল পেলে উত্তর-দক্ষিণ বাছাই করেন না এবং দক্ষিণের বহু দলে উত্তরের অভিনেতা অথবা তার বিপ্রতীপ অবস্থা বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায়। তাছাড়া আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য-অস্বাচ্ছন্দ্যের বিচারে উত্তর-দক্ষিণ একাকার হয়ে যায়, এমন দৃষ্টান্তের অভাব দেখি না। কাজেই এমন ধরণের তথ্য উপস্থিত করলে অকারণে নাট্যরসিকদের বিভ্রান্তই করা হয়।]

নাট্য বিষয়ে কোন কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় নাটুকে দলের প্রাচুর্যের কথা। গত কয়েক বছর ধরে অফিস ক্লাবের দৌলতে নাট্যাভিনয়ের যে জোয়ার চলেছে এ বছরও তা অব্যাহত ছিল। এ বছরে এমন কয়েকটি নতুন শক্তিমান দলের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে যাদের মধ্যে সম্ভাবনার অংকুর দেখা গেছে। আপন কর্মে যদি সমনোযোগে তাঁরা সনিষ্ঠ থাকতে পারেন তো অদূর ভবিষ্যতে নাট্যশালা তাঁদের দ্বারা যে উপকৃত তথা উন্নত হবে, অভিনয় ও নাটকের মানোন্নয়ন হবে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। পুরানো প্রতিষ্ঠিত দলগুলির

কোন কোনটির মধ্যে প্রত্যাশার আংশিক পূর্ণতা যে দেখা গেছে একথাও বলা চলে। আবার কতকগুলি ক্ষেত্রে কিছুটা নিরাশার কারণ ঘটেছে এ কথাও বলা চলে। তবে মোটামুটি ভাবে বিশেষ ভাবে সৌখীন নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে রীতিমত প্রাণ চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যায়। নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজও তাঁরা চালিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু তাঁদের দৃষ্টি মুখ্যত পশ্চিমী দেশগুলির দিকেই নিবদ্ধ।

সৌখীন দলের নাটক ও নাট্যকারের হিসাব নিলেই তত্ত্বটা পরিস্ফুট হবে। গত এক বছরে অভিনীত নাটকের বেশ একটা বড় অংশই বিদেশী নাটকের সরাসরি অনুবাদ বা ভাবানুবাদ। এই অনুবাদের তালিকায় প্রাচীন গ্রীক নাট্যকার সোসেক্লিম, সেকসপীয়ার, মার্লো, সেরিডান, মলেয়ার, ইবসেন, চেখভ, বার্ণাড শ, পিরান্দেলো, অস্কার ওয়াইল্ড, গোল্ডস্মিথ, বেকেট, ব্রেখট, আয়োনেস্কো প্রমুখ বহু বিশ্ববিখ্যাত স্বল্পখ্যাত মায় অখ্যাত নাট্যকারও উপস্থিত আছেন। এদেশী নাট্যকারদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নাট্যাভিনয়ের জের এখনো কাটেনি, এ বছরেও তিনিই বোধ হয় সর্বাধিক অভিনীত নাট্যকার। এ বছরেও রসরাজ অমৃতলালের বেশ কয়েকটি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে, অভিনয়ের সংখ্যার দিক থেকেও তাঁর নাটক খুব কম যায় না। সে তুলনায় গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদরা অনেকটা অবহেলিত।

নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয় বিচার করলে দেখা যায় যে, সামাজিক সমস্যামূলক নাটকই শতকরা ৯৯টি বা তারো বেশী। ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক নাটক সাধারণতঃ মঞ্চস্থ হয় না বললেও চলে। ক্বচিৎ কদাচিৎ হলেও তা ধ্রুপদী পদবাচ্য নাটক। আধুনিক নাট্যকারেরা বড় একটা ঐ ধরণের নাটক লেখেন না কারণ মঞ্চস্থ হবার সম্ভাবনা তাছাড়া ঐ সব নাটকে অভিনয় করবার মত অভিনেতৃ সমবেত করাও রীতিমত কঠিন। তাই বহু অভিনীত নাটকের চর্বিত-চর্বণ ছাড়া ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক নাটক মঞ্চস্থ হবার সম্ভাবনা নেই বললে অত্যুক্তি হবে না। এ বছরেও নাট্যানুসংগ তার প্রাধান্য হারায়নি তবে দর্শকদের যে আর এইধরণের অলংকারে আকৃষ্ট করে রাখা যাবে না তার পূর্বাভাস ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এ বছরেই বহু বিঘোষিত পেশাদারী মঞ্চের নবদিগন্ত সৃষ্টিকারী যুগান্তকারী নাটক দর্শক সাধারণের কৃপাদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হওয়ায় অকাল অবলুপ্তি বরণ করে নিয়েছে।

দর্শকের নিয়ে ফাঁকির কারবার যে আর চলবে না সে তথ্যও আজ সুস্পষ্ট। পেশাদারী ও অর্ধ সৌখীন দলগুলির নাটক যে আজ আর একই ভাবে দর্শককে আকৃষ্ট করতে পারছেনা তা বুঝতে কষ্ট হয় না। আগে পাঁচ শত রজনী যেখানে প্রথা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল এখন দুই শত রজনী চললেই সৌভাগ্য বলে মনে করা হচ্ছে।

এ বছরে সবক'টি স্থায়ী মঞ্চেই নতুন নাটক সুরু হয়েছে তবে একটি ক্ষেত্রে ছাড়া অন্যগুলি নাট্যশালার গতানুগতিক রীতি সম্মত নাটকই হচ্ছে। প্রহসন দর্শক সাধারণকে টেনে আনতে পারে এ তথ্যে বিশ্বাসী একাধিক মঞ্চ কিছুটা সাফল্য অর্জন করেছে বলে শোনা যাচ্ছে। অর্ধসৌখীন দলগুলির পক্ষ থেকেও প্রহসন মঞ্চায়নের যে ঝোঁক দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হয় এ জনশ্রুতির কিছুটা সারবত্তা আছে।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের নাট্য প্রচেষ্টার যে সব খবর এ দেশে এসে পৌছচ্ছে তার থেকে এ তত্ত্ব নিতান্ত অর্বাচীনেও বুঝতে পারবে যে, বিশ্বনাট্য সভায় ভারতীয় নাটকের (না ভারতীয় নাটক বললে কিছু ভুল হবে কারণ কালিদাস, ভাস বা শূদ্রকের নাটক আজও পশ্চিমী দেশগুলিতে মঞ্চস্থ হওয়ায় ওদেশী নাট্য চিন্তা যে কিছুটা প্রভাবিত হয় এ কথা এ দেশের তরফ থেকে স্বীকার না করলেও ওদেশের রসিকজন স্বীকার করে থাকেন।) স্থান সর্বনিম্নে না হোক প্রায় তার কাছাকাছি। অবশ্য তার জন্য অন্য দেশীয়দের দোষ দিয়ে লাভ নেই, অনুকরণ করতে দেখলে মূলের স্রষ্টা খুসী হলেও অনুকরণকারীকে প্রশংসা করবে এ ধারণা করা অন্যায়।

আমরা কিন্তু খুব আনন্দে আছি, কারণ আমাদের মতে, আমাদের সৃষ্টি আন্তর্জাতিক। এই আন্তর্জাতিকতার ভূত ঘাড়ে চেপে বসার জন্য আমরা একটা অতি সরল তথ্য বুঝতে পারছি না, টবের গাছে ঘর সাজানো যায় বটে কিন্তু তাতে ফল মেলে না আর ফলহীন গাছের আদর মরশুমী ছাড়া চিরন্তন হওয়া সম্ভব নয়।

এ বিষয়ে আরো বিশদভাবে আলোচনা অতীতে করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও করবার ইচ্ছে রইল, বর্তমানে প্রসঙ্গান্তর করা যাক।

দর্শকদের মানসিকতা সম্বন্ধে যে সাবধান বাণী বহুদিন ধরে উচ্চারিত হচ্ছিল, বাংলা নাট্যশালার গজদন্ত মিনারবাসী কর্তৃপক্ষস্থানীয়রা তার প্রতি কর্ণপাত করা প্রয়োজন বোধ করেন নি; কিন্তু এবার তাঁরা বোধহয় যেখানে ঘা দিলে ব্যথাটা পরিষ্কার ভাবে অনুভব করা যায় সেখানেই টের পাচ্ছেন অর্থাৎ জমা-খরচের খাতায় জমার অংকটা যে ক্রমেই হালকা হয়ে আসছে, সেটা দেখতে পাচ্ছেন।

আধুনিক নাট্যকারদের মধ্যে কিছু কিছু নামকে প্রশংসনীয় বলা হ'ত, তাঁদের মধ্যে সম্ভাবনার অংকুরও দেখা গিয়েছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সে অংকুর আর মহীরুহ হয়ে ওঠেনি। নতুন কোন সম্ভাবনাময় নাট্যকারের খোঁজও পাওয়া গেছে এমন কথা বলা যায় না।

অভিনয়ের ক্ষেত্রেও সেই কথাই বলা চলে। পুরাণো অভিনেতৃবর্গ ছাড়া নতুন কোন অভিনয় প্রতিভার সন্ধান পাওয়া যায় নি, এ কথা বলা চলে। যে দু' একজনকে দেখে মনে হয়েছে ভবিষ্যতে উন্নততর অভিনয় করতে পারবেন তাঁদের সম্বন্ধে এখনই প্রশংসা বাক্য উচ্চারণ করতে পারছি না কারণ এঁদের অনেকেই শেষ পর্যন্ত মরশুমী ফুলের মত হঠাৎ আলোর ঝলকানি দেখিয়ে ফুরিয়ে যেতে পারেন সুতরাং তাঁদের ভবিষ্যৎ প্রচেষ্টা বিচার করে এ বিষয়ে মতামত প্রকাশ করা হবে।

মোট কথা, বাংলা নাট্যশালার বর্তমান অবস্থায় নাট্য রসিকরা মোটেই খুসী হবেন না। একমাত্র সৌখীন নাট্য দলগুলির কিছু কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে ভবিষ্যত সম্বন্ধে আশা পোষণ করা যায়। অন্যথায় বাংলা নাট্যশালার উষরত্ব বিরাট মরুভূমির আকার নিত এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই।

ভবিষ্যতে বিশদ আলোচনা কালে এ বিষয়ে আরো কথা বলা যাবে।

রবি মিত্র

ভারতবর্ষে একমাত্র রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে যতো গবেষণা, আলোচনা হয়েছে এবং হচ্ছে তা বোধকরি আর কারো সম্পর্কে হয়নি। এবং বলা যেতে পারে হওয়া সম্ভবও নয়। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত নানা বিষয় আশ্রয়ী গ্রন্থসম্ভার আশ্চর্যরকম প্রচুর। কিন্তু তারই পাশাপাশি, অন্যান্য বিশিষ্ট আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যিক সম্পর্কে, তাঁদের সাহিত্যমানস, জীবনবোধ, ঐতিহ্য, দর্শন ইত্যাদি সম্পর্কে আমাদের জিজ্ঞাসা, দায়িত্ব যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকার গণ্ডীকে অতিক্রম করতে নারাজ। অথচ বিদেশে প্রতিষ্ঠিত আধুনিক লেখক শিল্পীদেরও নিয়ে প্রতিদিন প্রচুর আলাচনার, গবেষণার বহু বিচিত্র দৃষ্টিকোণের গ্রন্থ প্রকাশের আয়োজন চলেছে। সেখানে একই লেগক নানাভাবে, নানা ভাবনায় নানা আলোচক, সমালোচক গবেষকের উৎসাহে প্রচারিত হচ্ছেন।

আধুনিক মার্কিনী সাহিত্যে আর্নেস্ট হেমিংওয়ে একটি নাম। একটি যুগ। একটি কাল। হেমিংওয়ে তাঁর রচনার মাধ্যমে দুরন্ত তরুণহৃদয় জয় করেছেন। বিশিষ্ট জীবনদর্শনের জন্য জয় করেছেন বয়স্কদের মনস্কতা-ও। হেমিংওয়ে নানা কারণেই বিশ্বে সুষ্ঠু প্রচারিত এবং নানা কারণেই স্বদেশে এবং বিদেশে আধুনিক লেখকদের আদর্শ; সমালোচক ও গবেষকদের বিশেষ আকর্ষণের বিষয়। হেমিংওয়ের জীবনকাহিনী চমকপ্রদ এবং সেইসঙ্গে রোমাঞ্চকর। সেজন্য তাঁর সম্পর্কে নানা কৌতূহল নানা জিজ্ঞাসায় মুখর এবং আন্দোলিত। হেমিংওয়ের বিচিত্র জীবন, আশ্চর্য জীবনবোধ, দর্শন, রোমাঞ্চকর জীবনপ্রবাহ ইত্যাদি ঘিরে ইতোপূর্বে আমেরিকায় প্রচুর গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর সাহিত্যিক জীবনের শিক্ষানবিশী পর্যায় অর্থাৎ জীবনের প্রথম পর্বকে কেন্দ্র করে কিছুকাল পূর্বে চার্লস এ ফেণ্টন যে গ্রন্থ রচনা করেছেন সেটি মানুষ হেমিংওয়ের পরিপূর্ণ জীবনদর্শন ও সাহিত্যপাঠের সহায়তা করে। হেমিংওয়ের প্রথম জীবনের বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতা, বিশিষ্ট ঘটনাপুঞ্জ সাহিত্যমানসের প্রথম চেতনা, মানসিকতা ইত্যাদি তথ্য সমৃদ্ধভাবে সংযোজিত। বিশেষত সাংবাদিক, বৈদেশিক সংবাদ সংগ্রহকারী হেমিংওয়ে, ফিচারিস্ট হেমিংওয়ে; প্রথম মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় হেমিংওয়ের সাহিত্যিক মানসক'ল পরম্পরায় এ গ্রন্থে নিপুণভাবে চিত্রিত। তাঁর জটিল ব্যক্তিত্ব, রোমাঞ্চকর জীবনপ্রবাহের পূর্বাভাস তাঁর জীবনের প্রথম পদক্ষেপেই কেমন ভাবে পায়ে পায়ে এগিয়ে এসেছিল তা বোঝা যাবে 'দি এ্যাপ্রেন্টিসশিপ অব আর্নেস্ট হেমিংওয়ে দি আর্লি ইয়ারসে'। বিশেষত ১৯১৬ থেকে ১৯২৪—এই উল্লেখযোগ্য পর্বের মধ্যেই যে আর্নেস্ট হেমিংওয়ের পরবর্তী কালের বিশ্ববন্দিত মানসিকতা রূপ লাভ করেছিল বর্তমান গ্রন্থে তারই কৌতূহলদ্দীপক পরিচয় উৎসাহী পাঠক আবিষ্কার করতে পারবেন।

The Apprenticeship of Ernest Hemingway. By Charles A. Fenton. New American Library of World Literature, Inc. 1961, 240 pp.

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

ঔপনিষদ—চিত্রিতা দেবী। শ্রীশঙ্কর পাবলিশার্স। মূল্য ৫.০০

এমন এক দুর্যোগের দিন বাঙালীর জীবনে এসেছিল যখন উপনিষদ বলে যে কোন গ্রন্থ আছে এই কথা রামমোহন রায়কে প্রমাণ করতে হয়েছিল। তখনকার গতানুগতিক জড়ত্বস্পৃষ্ট সমাজে রামমোহন অনূদিত উপনিষদের বাণী যে ভীতিবিহ্বলতার সৃষ্টি করেছিল তার থেকে এই কথাই প্রমাণ হয় যে যুগে যুগে নতুন বাণী, নতুন আশা ও আশ্বাস উপনিষদের বচনসমষ্টির মধ্যে পাওয়া যেতে পারে। সেই চিরপুরাতন অথচ চিরনতুনকেই ঊনবিংশ শতকের গোড়ার বাঙালী ভয় পেয়েছিল। যা ছিল সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিজস্ব কোলে-টানার সম্পদ তাকে রাজা রামমোহন সর্বজনের করে দিলেন। সেই এক ধারার সূত্রপাত।

তারপর ঈশোপনিষদের একটা পাতা খুঁজে পেলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাংলা দেশের ধর্মান্দোলনের একটা নতুন ধারা সুরু হলো। 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা' এই মন্ত্রকে তিনি শুধু মুখের কথায় নয় জীবনেও পরম সত্য করে তুললেন। পুত্র রবীন্দ্রনাথের জীবনে সেই উপনিষদের সুরে বাঁধা জীবনের ধারা অনুসৃত হলো। তাঁরই প্রভাবে বাংলা দেশে উপনিষদ পাঠের চর্চা ধীরে ধীরে জেগে উঠলো। তাঁর কাব্যে যে উপনিষদের প্রত্যক্ষ আলো পড়েছে সে কথা রবীন্দ্র অনুরাগী মহলে নিত্য আলোচনার বিষয়।

ভাব ও অনুভবের জগতে মানুষের মন কত সূক্ষ্ম, কত সুকুমার হতে পারে উপনিষদ তার প্রমাণ। প্রাচীন ভারতের জীবনাদর্শ যে শুধু মায়াবাদ-আচ্ছন্ন নয়, তা যে শুধুই বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকারী কুহক জাল সৃষ্টি করে না, জীবনের নানা আনন্দ যে তার শ্লোকগ্রন্থে বিধৃত একথা রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকেই আধুনিক বাঙ্গালী পাঠক জেনেছে

সহজবোধ্য কাব্যভাষায় যে উপনিষদের বচন অনূদিত হবার প্রয়োজন আছে সেকথা কি বিশদ আলোচনার অপেক্ষা রাখে। সেই প্রয়োজন অনেকাংশে মিটিয়েছেন চিত্রিতা দেবী তাঁর ঔপনিষদ গ্রন্থে। ঈশ, কেন, কঠ ও শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ তিনি বাংলা কাব্যরূপে অনুবাদ করেছেন। উপনিষদের ভাষা যথেষ্ট সংহত সেই সংহতি রক্ষা করে অনুবাদ করলে বাংলায় কোথাও কোথাও বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে আবার ভাবানুবাদ করলে তাতেও মাত্রারক্ষা করা কঠিন হবে। উপনিষদ অনুবাদকদের এই দ্বৈত সমস্যার সামনে দাঁড়াতেই হবে। আলোচ্য গ্রন্থের অনুবাদিকাও এই সমস্যার হাত হতে মুক্তি পান নি। সাধারণতঃ এই চেষ্টাই থাকা উচিত যে অনুবাদ যতদূর সম্ভব মূলানুগ হবে। ছন্দের হাত খুব ভাল না হলে সরল গদ্যানুবাদ অনেক সত্য ও সফল হয়। ছন্দ মেলাতে গিয়ে ভাষারকাঠামো ও ভঙ্গী বদলে যায়। যেমন—যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি (তোমার কল্যাণতম রূপ যেন দেখি)—এর অনুবাদ হলো 'শিবরূপ দিক দেখা।'

বায়ুরনিলমমৃতমথেদং
ভস্মান্তং শরীরম্
ওঁ ক্রতোস্মর, কৃতংস্মর
ক্রতোস্মর কৃতংস্মর
-এর বাংলা অনুবাদ হয়েছে—

মন,প্রাণ মিশে যাক
মৃত্যুহীন আকাশে
স্থূল দেহ ভস্ম হোক
উড়ে যাক বাতাসে,

যা করেছি, আর যাহা স্মরণীয়
জাগুক তোমার স্মরণে,
যে বহ্নি আছে, ওঙ্কার রূপে
নিগূঢ় আমার মনে।

ঈশ ॥ ১৭

এ অনুবাদ স্বচ্ছন্দ ভাবানুবাদেরও বেশি। আর একটু সংহত হলে শুধু শক্তি বারতো তা নয় আরও ভাষা ও ভাবের ঐক্য রক্ষা পেতো।

উপনিষদের রচনা গদ্য ও পদ্য উভয়েই হয়েছে। লেখিকা যেগুলি থেকে অনুবাদ করেছেন, ঈশ, কেন, কঠ, শ্বেতাশ্বতর। এগুলির মধ্যে কেনোপনিষদ অংশতঃ গদ্য ও অংশতঃ পদ্যে রচিত। বাকিগুলি কাব্যরূপেই গঠিত।

এ গ্রন্থ বহুল প্রচারিত হোক। হিন্দুধর্মের মূল প্রাণবস্তুর সঙ্গে বৃহৎ হিন্দুসমাজের যোগ বিচ্ছিন্ন হচ্ছে প্রতিদিন, নানা লৌকিক আচার বিচার ও ভ্রান্ত ধারণায় ধর্মবোধ আচ্ছন্ন হচ্ছে। রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সকলেই চেয়েছিলেন হিন্দুধর্মের মূল প্রাণবস্তু সকলে জানুন। এই গ্রন্থ সেই জানারই সহায়তা করবে।

সোমেন্দ্রনাথ বসু

সাহিত্য অকাদেমীর কয়েকটি বই

চৈতন্যচরিতামৃত ॥ ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত
লঘু সংস্করণ। ১০'০০

বৈষ্ণব পদাবলী ॥ ডঃ সুকুমার সেন কর্তৃক
সংকলিত ও সম্পাদিত। ২০'০০

ভারতচন্দ্র ॥ ডঃ মদনমোহন গোস্বামী কর্তৃক
সংকলিত ও সম্পাদিত। ৩'০০

মনসামঙ্গল ॥ ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য কর্তৃক
সংকলিত ও সম্পাদিত। ৩'০০

জ্ঞানেশ্বরী ॥ জ্ঞানদেবের মারাঠী গীতাভাষ্য।
অনুবাদক গিরীশচন্দ্র সেন। ২০'০০

জীবনলীলা ॥ কাকা সাহেব কালেলকরের
ভ্রমণগ্রন্থ। অনুবাদক ডঃ প্রিয়রঞ্জন সেন। ১০'০০

অ্যারিওপ্যাগিটিকা ॥ মিল্টনের প্রবন্ধ।
অনুবাদক : শশিভূষণ দাশগুপ্ত। ৩'০০

আন্তিগোনে ॥ সোফোক্লেসের গ্রীক নাটক।
অনুবাদক : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। ২'৫০

তার্তুফ ॥ মলিয়ের-এর ফরাসী নাটক।
অনুবাদক : লোকনাথ ভট্টাচার্য। ৪.৫০

ওয়ালডেন ॥ হেনরী ডেভিড থোরোর ওয়ালডেন
পড়ে থাকাকালীন অভিজ্ঞতার বর্ণনা।
অনুবাদক : কিরণকুমার রায়। ৭'৫০

তাও-তে-চিং ॥ লাওৎস কথিত জীবনবাদ।
পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন দর্শন গ্রন্থগুলির মধ্যে অন্যতম
গ্রন্থ। অনুবাদক : অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২'০০

লূন-য়্যু বা কনফুসিয়াসের কথোপকথন ॥
অনুবাদক : অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৫'০০

Rabindranath Tagore-*A Centenary Volume* (1861-1961). Contains serious studies by eminent scholars from many parts of the world, a comprehensive chronicle of the poet's life, bibliography of publications, and reproductions, of some of his famous portraits, and facsimilies of pages from his manuscripts. Rs. 30'00

Chaturanga (a novel) by Tagore. Translated by Asoke Mitra Silk-bound Rs. 8'00. Paper Rs. 5'00

History of Bengali Literature by Sukumar Sen. Rs. 8'00

History of Assamese Literature by Birinchikumar Barua
Cloth Rs. 8'00. Paper Rs. 6'00

History of Oriya Literature by Mayadhar Mansinha
Cloth Rs. 8'00. Paper Rs, 6.00

সাহিত্য অকাদেমী রবীন্দ্র ভবন। ফিরোজ শাহ রোড। নিউদিল্লী-১
রিজিওনাল অফিস : ব্লক ৫-বি রবীন্দ্র সরোবর ষ্টেডিয়াম। কলিকাতা-২৯

Regd. No. C-315 Phone : 23-5155 May '65 (0.50) Central Regd. No. R.N.2602/57 SAMAKALIN

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

ত্রয়োদশ বর্ষ ২য় সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ তেরশ' বাহাত্তর

সমকালীন ঃ প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সূচী পত্র

সম্পাদক ঃ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

প্রাচীন ভারতের মধ্যদেশ

হিতেশরঞ্জন সান্যাল

আর্য জাতি যে ঠিক কোনো সময়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করতে শুরু করেছিল এবং ঠিক কোন সময়টিতে তারা সাতটি প্রবাহিনী বিধৌত 'সপ্ত সিন্ধবঃ' অঞ্চলে বসবাস করতে শুরু করেছিল সে সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রমাণ আজও পাওয়া যায় নি। তবে এক শ্রেণীর পণ্ডিতেরা আলোচনা গবেষণা করে এটুকু অন্তত স্থির করেছেন যে খৃষ্ট পূর্ব ১৪০০ অব্দে উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষে এই অঞ্চলে তাঁরা বসতি স্থাপন করেছিলেন।

ভারতবর্ষে আর্যজাতির অবস্থান ও তাঁদের ঐহিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রাচীনতম তথ্য লিপিবদ্ধ হয়েছে ঋক-বেদে। এই গ্রন্থের যে প্রাচীনতম অংশ সেখানে দেখা যায় আর্যরা সপ্তসিন্ধু—সরস্বতী সহ—বিধৌত অঞ্চলে বসবাস করেছেন। কিন্তু ঋক্ যুগের সমাপ্তিকালে দেখা যায় আর্যরা পশ্চিমে আফগানিস্থান থেকে সুরু করে পূর্বে একেবারে উত্তর গাঙ্গেয় উপত্যকা পর্যন্ত বিশাল ভূখণ্ডের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছেন। এই ভূখণ্ডের দক্ষিণাঞ্চল সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যে ঠিক কতটুকু ছিল সে কথা অনুমান করাও সম্ভব নয়। 'দক্ষিণপদা' নামে একটি শব্দের ব্যবহার দেখা যায়—তবে এর প্রকৃত অর্থ ও তার ব্যাপকতা যে যথার্থ কি সেটা বলা সম্ভব নয়। বর্তমান ভারতবর্ষের পশ্চিমে—রাজপুতানা মরুভূমি অঞ্চল সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞানের পরিচয় রয়েছে 'ধনবন' এই শব্দটীর অসংখ্য উল্লেখ ও ব্যবহারে।

আর্যরা অভিযাত্রী—রক্তের উত্তেজনা প্রভাবেই তাঁরা প্রসারকামী, যোদ্ধা ও বিজেতা। অঞ্চল থেকে অঞ্চলে দেশ থেকে দেশান্তরে পশ্চিম থেকে পূর্বে ক্রম-অগ্রসরের যে ইতিবৃত্ত তাঁরা রচনা করেছিলেন তার প্রমাণ রয়েছে যজু ও অথর্ব বেদে ও ব্রাহ্মণসমূহে। এই গ্রন্থগুলো থেকে যে-তথ্য

প্রমাণাদি পাওয়া যায় তাতে বোঝা যায় যে আর্যরা ভারতবর্ষের চতুর্দিকে আপন প্রভাব বিস্তারের পথে নিরবিচ্ছিন্ন গতিতে অগ্রসর হয়ে চলেছেন। ভারতবর্ষের একটা বিশাল অংশে আজ তাঁদের বিস্তৃত প্রভুত্ব। গাঙ্গেয় উপত্যকা বিজয় সম্পূর্ণ হয়েছে। পূর্বে ভরত গোষ্ঠী যমুনা-প্রবাহপথে অগ্রসরমান আর বিদেহ গোষ্ঠী সদানীরা (রাপ্তী বা গণ্ডক) অতিক্রম করে গিয়েছেন। ঋক্‌বেদে কিকট নামে একটা জাতির উল্লেখ আছে বটে, তবে তারা পূর্বাঞ্চলস্থ মগধের অধিবাসী কি না সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোনও সিদ্ধান্তে আজও উপনীত হতে পারা সম্ভব হয় নি। অথর্ব্ববেদে কিন্তু সর্বপ্রথম মগধ (দক্ষিণ বিহার) ও অঙ্গ (পূর্ব বিহার—ভাগলপুর) জনগোষ্ঠী হিসাবে উল্লেখ পেয়েছে। এঁদের বাসভূমি আর্যদের বাসভূমি থেকে পূর্বমুখে বহু দূরে অবস্থিত। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে মধ্য ও দক্ষিণভারতের পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দেখা যায়, মধ্যভারতে বরণাবতী নদীর তীরে সমৃদ্ধশালী জনপদ গঠিত হয়ে উঠেছে, আর বিন্ধ্যপর্বতমালার দক্ষিণে যে বিশাল ভূখণ্ড পরিব্যাপ্ত তার পরিচয়ও পরবর্তী বৈদিক সাহিত্য বহন করছে।

অধিকৃত এই বিস্তৃত ভূখণ্ডকে আর্যরা কয়েকটা ভাগে বিভক্ত করে যেমন বিভিন্ন নামে অভিহিত করলেন তেমনি তাঁদের মর্যাদাও হল বিভিন্ন। এই বিভাগ যে সংখ্যায় পাঁচটা সে জানা যায় অথর্ববেদের উল্লেখ থেকে। কিন্তু অথর্ববেদে এ সম্পর্কে আর কোনও তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই পাঁচটা বিভাগের নাম সর্বপ্রথম দেখতে পাওয়া গেল ঐতরেয় ব্রাহ্মণে। ব্রাহ্মণ বলছেন এগুলো হ'ল (১) ধ্রুবা মধ্যমা প্রতিষ্ঠাদিশ—মধ্য দেশ, (২) প্রাচীন দিশ—পূর্বদেশ (৩) প্রতিচী দিশ—পশ্চিম দেশ, (৪) দক্ষিণ দিশ—দক্ষিণ দেশ, ও (৫) উদিচী দিশ—উত্তরাঞ্চল, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এই -সমস্ত বিভাগের কোন সীমান্ত নির্দেশ করা হয় নি—তবে দু'একটি বিভাগে বসবাসকারী কয়েকটা উপজাতির উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লিখিত উপজাতির বাসস্থান পরিচয় থেকে নির্দিষ্ট বিভাগটার ভৌগলিক অবস্থান সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা সৃষ্টি করা যেতে পারে। বলা হয়েছে কুরু, পঞ্চাল, উশীনর ও বস এই ক'টা গোষ্ঠী মধ্যদেশের অন্তর্ভুক্ত। এই উপজাতিগুলোর অবস্থান পরিচয় সম্পর্কে আমাদের যে জ্ঞান আছে তাতে, 'বস' এই শব্দটা 'বসে' জাতির সমার্থবোধক হয় তবে এ কথা অনুমান করা যেতে পারে যে মধ্য দেশের পূর্ব সীমান্ত বৎসজাতির বাসভূমি উত্তর প্রদেশের কৌশাম্বী (বর্তমান নাম কোশাম) পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল।

দেশের ভৌগলিক বিভাগ নিয়ে প্রাচীন ভারতবর্ষে অনেক জল্পনা কল্পনা হয়েছে। পাঁচিশটা মাত্র ভাগই যে সর্বথা গ্রাহ্য ছিল, তা নয়। সাতটা বা নয়টা ভাগের কথাও কল্পনা করা হয়েছে। তবে এমনতর জল্পনা কল্পনা সমূহে ভৌগলিক সত্য অপেক্ষা কোন কবি বা লেখকের কল্পনাকে ভৌগলিক সত্যের স্থান দেবার প্রচেষ্টাই হয়েছে বেশী। যেমন সমগ্র ভারতবর্ষটাকে একটা পদ্মরূপে কল্পনা করা হয়েছে। তার কোরকটি হ'ল মধ্য দেশ আর আটটা দল হ'ল আটটা জনপদ। এইভাবে দেশটা যে নয় ভাগে বিভক্ত সেকথা বলা হয়েছে। আবার, পুরাণের 'কূর্ম নিবেশ' অংশে ও বিভিন্ন জ্যোতির্বিদ্যা গ্রন্থে নবভাগে বিভক্ত ভারতবর্ষকে বিস্তারিত অবস্থায় পূর্বমুখী হয়ে শায়িত কূর্মের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এই ব্যবস্থাপনায় দেশের বিভিন্ন অংশকে বিশেষভাবে শায়িত কূর্মদেহের মধ্যে সুসমঞ্জসরূপে নির্দিষ্ট করতে গিয়ে প্রচুর বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। পুরাণোক্ত নয়টা অংশ বা দ্বীপের

সমষ্টি কিন্তু বর্তমান ভারতবর্ষ থেকে বহুগুণে বৃহৎ। এই নয়টী দ্বীপের মধ্যে বর্তমান ভারতবর্ষ হ'ল কুমারীদ্বীপ।

পুরাণে ভারতবর্ষের সাতটী অংশের কথাও বলা হয়েছে। কিন্তু যেভাবে এই সাতটী অংশের বিন্যাস করা হয়েছে। তাতে দুইটী অংশ—পর্বতাশ্রয় ও বিন্ধ্যপৃষ্ঠ—বাদ দিলে ভারতবর্ষের ভৌগলিক কোন ক্ষতি সাধন হবে না। এই অংশ দুটোকে বাদ দিলে অংশ সংখ্যা থাকে পাঁচ। অথর্ব বেদের ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণের তথ্য অনুসারেও আর্য ভূমির অংশ সংখ্যা পাঁচটী। বৌধায়ন তাঁর ধর্মসূত্রে ভারতবর্ষকে পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন কিন্তু তিনি যে পাঁচটী নামের উল্লেখ করেছেন সেগুলো ঐতরেয় ব্রাহ্মণ কথিত নামের সঙ্গে কিছু পৃথক। তবে ভৌগলিক অবস্থানের যে বিশেষ কোন ব্যতিক্রম হয়েছে এমন কোন প্রমাণ নেই।

ভারতবর্ষের পাঁচটী ভাগ অবশেষে প্রথাগত ভাবে গৃহীত হয়ে উঠল। পুরাণের ভুবনকোষ অংশে এই সংখ্যাই সমর্থিত হয়েছে। এই পাঁচটী অংশের মধ্যে মধ্য দেশই হ'ল সর্বাপেক্ষা পবিত্র—এই ছিল ধারণা। যে সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে আর্যরা সর্ব প্রথম এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন সেই পঞ্জাব পবিত্রভূমির আসন লাভ করতে পারল না—করল মধ্য দেশ, যেখানে পর্য্যায়ক্রমে পূর্বমুখে অগ্রসর হতে গিয়ে আর্যরা বসতি স্থাপন করেছিলেন। আঃ খৃষ্টিয় পঞ্চম শতকে কামসূত্রকার বাৎস্যায়ন পঞ্জাব অঞ্চলকে স্পষ্ট ভাষায় 'নষ্টধর্মাঃ' বলে চিহ্নিত করে গেছেন। পবিত্রতার গরিমা মধ্য দেশে এতই অধিক যে বাংলা, আসাম, উড়িষ্যা—এসব অঞ্চলের ব্রাহ্মণরা সকলেই নিজেদের মধ্য দেশাগত বলে দাবী করেন ও গৌরব অনুভব করেন।

বৌধায়নের ধর্মসূত্রে এই মধ্য দেশের সীমান্ত নির্দেশ করে বলা হয়েছে ; মধ্যেদেশ, পারিপাত্র পর্বতের (বিন্ধ্যপর্বতের পশ্চিমাংশ) উত্তরে, বিনাশনের (যেখানে সরস্বতা রাজপুতানার মরুভূমির মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে) পূর্বে, কালকাবনের (বর্তমান এলাহাবাদের নিকটস্থ বনভূমি) পশ্চিমে ও উশীনর পর্বতের দক্ষিণে অবস্থিত। অর্থাৎ পূর্বে কালকাবন, পশ্চিমে বিনাশন, উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বত এই সীমান্তে বিধৃত ভারত ভূখণ্ডই মধ্যদেশ। অবশ্য সীমান্ত নির্দিষ্ট ভূমিখণ্ডকে বৌধায়ন আর্যাবর্ত বলে উল্লেখ করেছেন। পতঞ্জলী বলছেন আর্যাবর্ত ও মধ্যদেশ একই অঞ্চলের বিভিন্ন নাম। মনু তাঁর, ধর্মশাস্ত্রে ধর্মসূত্রের আর্যাবর্ত অংশকে মধ্যদেশ বলে উল্লেখ করেছেন আর আর্যাবর্ত বলতে যে ভূখণ্ডের বর্ণনা দিয়েছেন সে মধ্যদেশ থেকে বহুগুণে বৃহৎ ও বিস্তৃত। আর্যাবর্ত তাঁর মতে পূর্ব ও পশ্চিম উভয় প্রান্তেই সমুদ্র স্পর্শ করেছে। এতে এটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে পূর্ব নির্দিষ্ট মধ্যদেশ মনু কথিত আর্যাবর্তের একটা অংশবিশেষ। মনুও মধ্যদেশের সীমা নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে মধ্যদেশের উত্তরে হিমালয় দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত, পূর্বে প্রয়াগ (এলাহাবাদ) ও পশ্চিমে বিনাশন। বোঝা যাচ্ছে মনু নির্দিষ্ট মধ্যদেশ ও সূত্র নির্দিষ্ট মধ্যদেশ একই—ভৌগলিক সীমানায় কোন পরিবর্তন ঘটে নি।

মধ্যদেশ সম্পর্কিত বর্তমান আলোচনায় এর পরবর্তীকালের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করছেন প্রতিহার সম্রাটদের সভাকবি রাজশেখর (নবম শতাব্দীর শেষাংশ ও দশম শতাব্দীর প্রারম্ভ)। তাঁর কাব্য-মীমাংসা গ্রন্থে তিনি ভারতবর্ষের পাঁচটি অংশের কথা উল্লেখ করেছেন তবে এদের ব্যাপ্তি

ও সীমান্ত বিস্তার সম্পর্কিত কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। তাঁর মধ্যদেশ পূর্বে বারানসী, পশ্চিমে দেবসভা (দেওস পূর্ব রাজপুতনা) অতিক্রম করে অগ্রসর হয়েছে। আর উত্তরে ও দক্ষিণে তার বিস্তার যথাক্রমে পৃথূডক বেওরা-উত্তরপূর্ব পঞ্জাব ও মাহিষমতীর (নর্ম্মদাতীরস্থ মান্ধাতা) ও পশ্চিম সীমান্ত নিয়ে মনু ও রাজশেখরের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কারণ পৃথডক হিমালয়েই অবস্থিত আর দেবসভা বিনাশন থেকে বিশেষ দূরবর্তী নয়। রাজশেখরের মতে মধ্যদেশ পূর্বে বারানসী ও দক্ষিণে মাহিষমতী অতিক্রম করেছে—এটা নিঃসন্দেহে বিশেষ অগ্রসর। তবে পূর্ব সীমান্তের পরিবর্তনটাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

মধ্যদেশের গুরুত্বের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। রাজশেখরের মধ্যদেশ যে পূর্বে বারানসী অতিক্রম করে গিয়েছে তার কারণটা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্মের পতনের সঙ্গে কতগুলো হিন্দুধর্ম সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিল এদের অন্যতম শৈব ধর্ম ক্রমে বিশেষ প্রভাবশালী হয়ে উঠে—বারানসী হল তাদের প্রধান তীর্থ, শিবভূমি। এই সঙ্গে বারানসীর রাজনৈতিক গুরুত্বও বেড়ে চলেছিল। এইধরনের একটা কেন্দ্র জনসাধারণের স্বতস্ফুর্ত শ্রদ্ধাবেগে জনমানসে একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে নিতে পারে। বারানসীও তাই নিয়েছিল। বোঝা যাচ্ছে, রাজশেখর বারানসীকে মধ্যদেশের—শিষ্ট দেশ ও সদাচার সম্পন্ন দেশের—মধ্যে স্থান দিয়েছিলেন তাঁর কালের যুগমানসের দাবীতে ও তারই প্রয়োজনে। ব্রাহ্মণ্য ভাবনাকল্পনায় মধ্যদেশের অগ্রগতি অবশ্য এর পরে খুব বেশী একটা হয় নি। শুধু রাজশেখর নন, অন্য যে সব লেখকের গ্রন্থ থেকে প্রমাণাবলী উদ্ধৃত হ'ল, তারা যে বিভিন্ন অংশের ও মধ্যদেশের সীমান্ত নির্দেশ করতেন সে তাঁদের কালের ধারণা ও জ্ঞানের অনুবর্তন করেই—স্বকীয় কল্পনাদ্বারা নয়।

মধ্যদেশের পবিত্রতা সম্বন্ধে বৌদ্ধদের ধারণা ব্রাহ্মণ্যহিন্দুদের মতই সুদৃঢ় তবে মধ্যদেশের সীমান্ত তারা আরও প্রসারিত করে দিয়েছে—সে অবশ্য তাদের নিজেদের প্রয়োজনে। বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক বুদ্ধদেবের জন্ম, তপস্যা, সিদ্ধি, প্রচার ও মৃত্যু এ সবই ঘটেছিল ব্রাহ্মণ্য মধ্যদেশের বাইরে—প্রয়াগের পূর্বাঞ্চলে। মগধ (দক্ষিণ-বিহার) ও বর্ত্তমান উত্তর প্রদেশের পূর্বাংশে ছিল বৌদ্ধধর্মের আদি বিকাশক্ষেত্র। মধ্যদেশের সংস্কার ভারতীয় চিত্তে এতই দৃঢ় মূলবদ্ধ যে বুদ্ধদেবের জন্ম ও কর্ম-স্থানকে মধ্যদেশের বাইরে কল্পনা করা বৌদ্ধদের পক্ষে কষ্টকর ছিল। বৌদ্ধদের মতে মঝ্ঝিম দেশ (মধ্য দেশ) পূর্বে বর্তমান রাজমহলের নিকটবর্তী কজঙ্গলনগর পর্যন্ত বিস্তৃত। দক্ষিণ-পূর্বে এর প্রান্তভূমি নির্দেশ করছে সলাবতী (সরাবতী) নদী। দক্ষিণে রয়েছে শতকর্নিকানগর। পশ্চিম-প্রান্তে আছে থূনা (স্থানীশ্বর বা স্থানেশ্বর) আর উত্তরভূমির শেষ হ'ল উসীরধজ পর্বতে (উশীর-গিরি ; হরিদ্বারের নিকটবর্তী কনখলের কাছে)। বৌদ্ধগ্রন্থ দিব্যাবদানে পূর্ব সীমান্ত আরও পূর্বে অগ্রসর করে দেওয়া হয়েছে। দিব্যাবদান অনুযায়ী পূর্বে পুণ্ড্রবর্ধন ও (মহাস্থান বগুড়া জিলা পূর্ব-পাকিস্থান) মঝ্ঝিম দেশের অন্তর্ভুক্ত। দিব্যাবদানের এই সীমান্ত পরিবর্তনের কারণ ঐ গ্রন্থের অঙ্গীভূত একটা কাহিনীর মধ্যে পাওয়া যাবে। এই কাহিনী পাঠে জানা যাবে বুদ্ধদেব প্রচারোদ্দেশে এসে পুণ্ড্রবর্ধনে কিছুকাল বাস করেছিলেন। যে দেশে বুদ্ধদেব স্বয়ং আগমন ও অবস্থান করেছিলেন সে দেশকে যে বৌদ্ধরা মধ্যদেশের পবিত্রতার সঙ্গে সংযুক্ত করে দেবেন—এ স্বাভাবিক।

হিউয়েন-সাঙ ৭ম শতকের প্রথম ভাগ)-এর বিবরণে মধ্যদেশের সর্বাধিক ব্যাপ্তি দেখতে পাই। তাঁর বিবরণে দেখা যায় কাশ্মীর, পাঞ্জাব ও রাজপুতনা বাদে সমগ্র উত্তর ভারতই মধ্যদেশের অন্তর্ভুক্ত। মধ্যদেশ তাঁর মতে পূর্বে একেবারে করোতোয়া (ব্রহ্মপুত্রের শাখা; বর্তমানে পূর্ব পাকিস্থান) পর্যন্ত বিস্তৃত। বৌদ্ধ ঐতিহ্যে মধ্যদেশের পূর্বসীমা বঙ্গদেশ অবধি বিস্তৃত, এটা গৃহীত হয়ে গিয়েছিল।

মধ্যদেশের পূর্বসীমা ক্রমশ বিস্তার লাভ করেছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে মধ্যদেশের কোন সুনির্দিষ্ট সীমারেখার কথা বলা হয় নি। কিন্তু মধ্যদেশের অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লিখিত কতগুলো উপজাতির বাসভূমির কথা বিবেচনা করলে গাঙ্গেয় দোয়াব অঞ্চলে এর পূর্বসীমা বিস্তারলাভ করেছিল একথা বলা যায়। ধর্মসূত্র সুনির্দিষ্টভাবে এর পূর্বসীমা কালকাবন অবধি বিস্তারিত একথা বলছেন। মনুর মতে এ সীমা প্রয়াগ অবধি। রাজশেখর বারানসীকেও এর অন্তর্ভুক্ত বলেছেন। হিন্দুশাস্ত্র আর অগ্রসর না হলেও বৌদ্ধ মধ্যদেশ করোতোয়া তীরে এসে শেষ হয়েছে।

মধ্যদেশ প্রসঙ্গের অবতারণা না করেও খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র বলছেন—গঙ্গার পশ্চিমকূল বারাণসী সমতুল।

রবীন্দ্রনাথের চার অধ্যায় ঃ এলা চরিত্র

শুভব্রত রায়চৌধুরী

এক অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার মধ্যে এলার বাল্য জীবন কেটেছে। মাতৃস্নেহহীন পরিবেশে উৎপীডনের ভিতর দিয়ে সে বড় হয়ে উঠেছে। আর, সেই উৎপীড়ন এসেছে মায়ের কাছ থেকেই। যেটুকু ভালোবাসা তার ভাগ্যে জুটেছিল, সে বাবার ভালোবাসা। নরেশ দাশগুপ্ত পণ্ডিত মানুষ। জ্ঞানপ্রীতির সঙ্গে সাংসারিক সাফল্যের যে একটা বিরোধ আছে, তাঁর জীবন সেই সত্যের উদাহরণ। সাংসারিক উন্নতির দিকে তাঁর লোভ যেমন কম, তেমনি কম সে সম্বন্ধে তাঁর দক্ষতা। তিনি মানুষকে বিশ্বাস ক'রে ঠকতেন। নরেশবাবুর এই বিশ্বাস প্রবণ সহনশীলতা ও ঔদার্যের ঠিক বিপরীত হ'ল স্ত্রী মায়াময়ীর বেহিসেবী মেজাজ এবং সন্দেহবাতিকগ্রস্ত তোষামদপ্রিয় প্রকৃতি। অকারণে সন্দেহ করা এবং অন্যায় শাস্তি দেওয়া মায়াময়ীর স্বভাব। আশ্রিত অন্নজীবীদের তোষামোদে পুষ্ট হয়েছে তাঁর প্রভুত্ববোধ ও অহমিকার মোহ। যে-ঔদার্যের গুণে বাবার প্রতি এলার একটা সদা-ব্যথিত স্নেহ, একটা নিত্য-জাগরূক প্রশ্রয়শীল অভিভাবকত্ববোধ জন্মেছিল, সেটাই মায়াময়ীর কাছে ক্ষমাহীন ত্রুটি। এই ত্রুটির জন্য স্বামীকে খোঁটা দিতেও তিনি কার্পণ্য করতেন না এবং তাঁর কলহের ভাষায় ইঙ্গিত থাকত সুস্পষ্ট যে, স্বামীর চেয়ে বুদ্ধি বিবেচনায় তিনি শ্রেষ্ঠ। পিতা-মাতার চারিত্রিক বৈষম্য এলার চরিত্র গঠনে অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল, এ অনুমান অসংগত হবে না। বস্তুত, নারী-পুরুষ সম্বন্ধে উত্তরকালে এলার যে-ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়, তার সূত্রপাত এখানেই। পুরুষের প্রতি তার সস্নেহ প্রশ্রয়োন্মুখতার উৎস হচ্ছে উপদ্রুত উদার-চরিত বাবার জীবনী। পরে যখন সে কাকার আশ্রয়ে এল, সেখানেও সেই একই অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি। মেয়েদের সংকীর্ণচিত্ততা এবং পুরুষের উদারতা বার বার তার অভিজ্ঞতায় গভীর ছাপ রেখে গেছে। তাই এলার মুখে শুনতে পাই, "অনেক দেখেছি ইতর নোংরা নিন্দুক, অনেক দেখেছি কৃপণ কুৎসিৎ। সব বাদ দিয়ে সব মেনে নিয়ে তবু অনেক বাকী থাকে। সেই বাকীদেরই দেখেছি উজ্জ্বল আলোয়।" (চা. অ. ।৬৪ পৃঃ) যাদের জন্য এই প্রশস্তি তারা তার বাবা ও কাকার উত্তরাধিকারী।

কবি তাঁর মানসকন্যার জীবনের সূচনা দেখেছেন বিদ্রোহের মধ্যে। মায়ের কাছে বাবার অসম্মান যেমন তাকে নরেশবাবু সম্বন্ধে স্নেহাতুর ক'রে তুলেছিল, তেমনি তাঁর "অতিমাত্র ধৈর্য্য অন্যায় বলে এলা অনেক সময় তার বাবাকে মনে মনে অপরাধী না করে থাকতে পারে নি।" (চা. অ.।৩ পৃঃ) অন্যায় চুপ করে সয়ে যাওয়াই অন্যায়, এ কথা বাবাকে বোঝাতে সে চেষ্টা করত। অন্যায়ের অপ্রতিহত প্রকাশ দেখে সে অন্যায়-অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল। শান্ত প্রকৃতি নরেশবাবু যা করতে ভালোবাসতেন না এলা সেটাই করত, বিদ্রোহ করত, অন্যায়টাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাত। মায়াময়ীর কাছে এটা নিতান্তই দুঃসহ স্পর্ধা, সুতরাং অমার্জনীয় শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কিন্তু অসঙ্গত শাস্তির ভয় এলার সত্যবাদিতাকে তার অন্যায়বিরোধিতাকে দমাতে পারে নি কোনোদিন।

বরং অবিচারের বিরুদ্ধে তার অসহিষ্ণু প্রতিবাদ ভিতরে ভিতরে তুষের আগুনের মতো জলত। আপন সংসারে প্রতিকারের কোনো পথ ছিল না। পিতৃস্নেহ, গভীর হলেও, এলাকে প্রতিকারের সন্ধান দেবার মতো সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে নি।

মানুষের বাল্যজীবনে স্নেহভালোবাসার গভীর প্রয়োজন। কিন্তু ভালোবাসার উন্মুখ আশা যখন প্রতিহত হয়, তখন ক্ষেত্র বিশেষে ভালোবাসার জাল থেকে নিজেকে মুক্ত রাখবার একটা দুর্বার স্পৃহা জাগা অসম্ভব নয়। এটা স্বভাবসিদ্ধ প্রতিক্রিয়া। অন্যের ভালোবাসা নইলে আমার চলবে না—এই উপলব্ধির মধ্যে একটা অসহায়তাবোধ আছে, আর আছে নিরাশ হবার সুপ্ত সম্ভাবনা। এটা যেন আত্মবিলোপের পথ। নিজেকে সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত রেখে, আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ হয়ে বেঁচে থাকা—এটা স্নেহবঞ্চিতদের স্বাতন্ত্র্য লিপ্সার উৎস। তাই নির্বন্ধন আত্মনির্ভর জীবনের প্রতি এলার আকর্ষণ।

এলার মুক্তি-প্রিয়তার দুটো দিক লক্ষ্য করা যায়। একদিকে, অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে অসহিষ্ণু প্রতিবাদ—শুধু নিজের হয়ে নয়, অন্যের হয়েও; আর একদিকে বন্ধনহীন স্বাতন্ত্র্যের সাধনা। প্রথমটা তাকে টেনে নিয়ে এল রাষ্ট্রিয় আন্দোলনের আবর্তে। দ্বিতীয়টি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল তার এবং অতীন্দ্রের মাঝখানে।

ইন্দ্রনাথের আন্দোলনে যোগ দেওয়া এলার জীবনে আকস্মিক নয়। তার মন যেন তৈরী হয়ে উঠছিল অনেকদিন ধরে। এলা তখন তার কাকা সুরেশবাবুর আশ্রয়ে। সেখানে থাকতে থাকতে এলা 'স্পষ্টই বুঝতে পারল যে সে তার কাকার স্নেহের সঙ্গে কাকার সংসারের দ্বন্দ্ব ঘটাতে বসেছে'। এমন বিষাক্ত পরিস্থিতির কবল থেকে মুক্তি তার পক্ষে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল। মুক্তির একটা পথ অবশ্য খোলা ছিল—বিবাহ। কিন্তু বিবাহ সম্বন্ধে এলার এক বদ্ধমূল বৈরূপ্য গ'ড়ে উঠেছে গোড়া থেকেই। কন্যার ব্যাপারে স্বাতন্ত্র্যের লক্ষণ দেখে এলার উদ্‌বাহ সম্পর্কে মায়াময়ী শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং বিবাহ—এদুটো যে সহবাসী হতে পারে না মায়ের কথায় এলা এটা স্থির সিদ্ধান্ত ক'রে নিয়েছিল। বিবাহ আত্মসম্মানকে পঙ্গু করে, ন্যায়-বোধকে অসাড় ক'রে দেয়—এই ধারণা এলার মনে একটা স্বাভাবিক সত্য হিসেবেই ঠাঁই পেয়েছিল। তাই সে বিবাহ-বিমুখ। সুতরাং ইন্দ্রনাথ যখন তাকে দেশের কাজে ডাক দিল, পথ বেছে নিতে তার দেরী হ'ল না। সংসারে বীতস্পৃহা যখন তার তীব্র হয়ে উঠেছে তখন ঐ অসাধারণ মানুষটির মুখ হ'তে এলা শুনল : 'তুমি নবযুগের দূতী, নবযুগের আহ্বান তোমার মধ্যে।' (চা, অ. ১১ পৃঃ) এত বড় সম্মানের যোগ্যতা তার আছে কি না সে বিষয়ে সন্দিগ্ধ হলেও ইন্দ্রনাথের আহ্বান তাকে এক নূতন উদ্দীপনা জোগালো। দেশসেবার গুরুভার গ্রহণের জন্য যে-অঙ্গীকার তাকে করতে হ'ল, সেটা এলার কাছে কিছুই কঠিন নয়। ইন্দ্রনাথ শুধু চাইল, এলা যেন কখনো সংসার-বন্ধনে জড়িয়ে না পড়ে : 'তুমি সংসারের নও, তুমি দেশের।' সংসারবিরাগী যার মন, বন্ধনবিরূপ যার চরিত্র, সংসার-বিলগ্ন হবার সম্ভাবনা কখনই তার ঘটবে না—এলার এই আত্মপ্রত্যয় দৃঢ় ছিল। দেশসেবার মধ্য দিয়ে অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার সুযোগ পেল সে। সেই সঙ্গে পূর্ণ হ'ল সংসারমুক্তির আকাঙ্ক্ষা। তাই অকুণ্ঠিত আত্মদানের প্রতিজ্ঞায় তার কোনো দ্বিধাই দেখা দিল না

রাষ্ট্রবিপ্লবের পটভূমিকায় এক বিদ্রোহী আত্মা যেন খুঁজে পেল আদর্শ-প্রাণিত জীবনের পথ। এও বিধাতার এক পরিহাস। বন্ধনবিরূপ মন আপনার অজ্ঞাতসারেই সংকল্পের বন্ধনে নিজেকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল।

পাঁচ বছর বাদে যখন কাহিনীর যবনিকা উঠল তখন দেখা যায় সেই সত্যটাই এলাকে সংশয়প্রবণ দ্বিধাগ্রস্ত ক'রে তুলেছে। জীবনায়ন বেছে নেওয়ায় ভুল হয়েছে কি না, এই প্রশ্নে সে তখন বিচলিত। পাঁচটা বছর যেন এলার জীবনে আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছে। পরিবর্তনের কারণ স্পষ্টতই ভালোবাসা।

আপন স্বভাব সম্বন্ধে যে ধারণা এলার মনে গ'ড়ে উঠেছিল সেখানে নারীসুলভ ভালোবাসার ঠাঁই ছিল না। ভালোবাসা আনে হৃদয় দৌর্বল্য, আর সেটাই হল বন্ধনের বীজ। আপন শক্তির 'পরে তার আস্থা অটল। তাই সে কখনো ভাবে নি ভালোবাসার বন্ধনে সে কোনোদিন বন্দী হবে। মন বিচলিত হবার মত ঘটনা তার জীবনে যে ঘটে নি তা নয়; 'কিন্তু চঞ্চলতা জয় করে খুসি হয়েছি নিজের শক্তির গর্বে'—এ কথা এলা অতীন্দ্রের কাছে কবুল করেছে। (চা. অ.।৫৫) আত্মবিচলনকে কখনই সে আত্মনিবেদনের পর্যায়ে এনে ফেলে নি, কারণ স্বাতন্ত্র্য বিসর্জনের দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেবার মত দুর্বল মেয়ে সে নয়। তাই ব'লে তো আর এ কথা বলা চলে না যে, তার অবচেতনায় কোনো দোসরের কল্পরূপ রঙে রসে রচিত হয় নি। হয়েছিল ব'লেই তার জীবনে অতীন্দ্রের আকস্মিক আবির্ভাব এমন বৈপ্লবিক। প্রথম দর্শনেই এলা যেন 'অতি বিপুল ব্যাকুলতায়' জেগে উঠল; 'এক-চমকের চির-পরিচয়' ঘটল তার হঠাৎ-পাওয়া দোসরের সঙ্গে। প্রথম পরিচয়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে এলা অতীন্দ্রের কাছে স্বীকার করেছে, 'ওগো, কতবার বলেছি —অনেকক্ষণ ধ'রে ডেকের কোণে ব'সে তোমাকে চেয়ে চেয়ে দেখছিলুম। ভুলে গিয়েছিলুম আর কেউ সেটা লক্ষ্য করছে কি না। জীবনে সেই আমার সবচেয়ে আশ্চর্য এক-চমকের চির-পরিচয়।' (চা. অ. ।৫৩ পৃঃ) হঠাৎ-পাওয়ার এই চমক যেন এক ঝলক বিদ্যুৎ; এলার মত আত্মস্থকেও দিশেহারা ক'রে দিয়েছিল।

স্বাধীনমনা মনস্বিনী ধীমতী আত্মনির্ভরা এলা—তার জীবনে যে পুরুষ আসবে সে কখনোই সাধারণের কোঠায় পড়তে পারে না। এলার প্রাণে অতীন্দ্রের অসাধারণত্ব প্রথম দেখার দিনেই সাড়া জাগিয়েছিল। তাই সেদিন এলার 'মন বললে, কোথা থেকে এল এই অতি দূর জাতের মানুষটি, চারিদিকের পরিমাপে তৈরী নয়, শ্যাওলার মধ্যে শতদল পদ্ম।' (চা. অ. ।৫১ পৃঃ) এলার কাছে অতীন্দ্র এমন পুরুষ যার সম্বন্ধে বলা চলে, 'লাখে না মিলল এক'। এই দুর্লভ অসামান্য মানুষটি শুধু যে তার জীবনে প্রাণস্পন্দন জাগিয়েই ক্ষান্ত হ'ল তা নয়, সে যেন

'দস্যুর মত ভেঙে-চুরে দেয়
চিরাভ্যাসের মেলা'

'নারীজাতির গুমোর ভেঙে' এলা অতীন্দ্রের কাছে অকপটে স্বীকার করেছে, 'একটা মন্ত্রপড়া বেড়ার মধ্যে ছিলুম। তোমাকে দেখবামাত্র মন উৎসুক হয়ে উঠল, বললে—ভাঙুক সব বেড়া। এমন বিপ্লব ঘটতে পারে সে কথা কোনো দিন ভাবতে পারি নি।' (চা. অ. ।৫৫ পৃঃ) এখানেই

এলার নবজন্ম।

প্রেমের অনুভূতি বৈপ্লবিক। আত্ম-অপরিচিতির আড়াল ভেঙে সে অন্তরতম সত্যকে আবিষ্কার করে, জাগিয়ে তোলে। অতীন্দ্রের মাধ্যমে এলার জীবনে সেই জাগরণ এল বটে কিন্তু আবাল্য-সঞ্চিত সংস্কার-ধারণা-বিশ্বাসের ঘুমপাড়ানো ঘোর কাটল না সহজে। নারী-ধর্মের জয় তখনো সুদূরপরাহত।

অতীন্দ্র এবং এলার চরিত্ররচনায় একটা বিশেষ প্রভেদ চোখে পড়ে। এলা-চরিত্রের গতি এগিয়ে চলায়; অতীন্দ্র-চরিত্রের গতি বৃত্তাকার। যে-এলাকে আমরা শুরুতে দেখি, অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে তার নবজন্মের উন্মেষ দেখিয়ে কাহিনী সমে পৌছয়। কিন্তু অতীন্দ্র যেন আরম্ভেই পূর্ণ উন্মেষিত। তার চিত্তবৃত্তির ক্রমবিকাশের কোনো পথ নেই—অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানকে শুধু কেটে ছিঁড়ে পর্যবেক্ষণ করা। তাই তিনটি অধ্যায় জুড়ে অতীন্দ্রের ত্রিপদী পরিক্রমণ; কিন্তু এলা প্রতিটি অধ্যায়ের ধাপে ধাপে নূতন প্রকাশের দিকে এগিয়ে চলে।

এলা চরিত্রের ক্রমবিকাশে তিনটি সুনির্দিষ্ট স্তর নির্ণয় করা যায়। প্রথমে, এলা কর্তব্য ও প্রেমের দ্বন্দ্বে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে আপসের পথ খুঁজছে। দ্বিতীয় স্তরে, তার কর্তব্যনিষ্ঠা হার মানে প্রেমের কাছে। তখন রুদ্ধদ্বার মিলনের সামনে দাঁড়িয়ে স্বয়ম্বরা এলার যেন এক সকরুণ প্রার্থনা 'খোলো খোলো দ্বার'। তৃতীয় স্তরে, আত্মনিষেধের 'প্রস্তরশৃঙ্খলোন্মুক্ত' নারীসত্তার উদ্বেল প্রকাশ।

ইন্দ্রনাথের দাবি এলার কর্তব্যবোধের কাছে; কিন্তু অতীন্দ্র দাবি করেছে তার ভালোবাসা। এ দুটো কি এতই পরস্পরবিরোধী যে, তাদের পক্ষে সহাবস্থান একেবারেই অসম্ভব? সব ক্ষেত্রে না হলেও ঘটনাচক্রে এলার জীবনে তাই ঘটেছে। এলা দেশ-সেবার যে ব্রত গ্রহণ করেছে, তার কাছে প্রেম একটা হৃদয়দৌর্বল্যমাত্র। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রেম এক নির্দিষ্ট সীমিত পরিসরের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত থাকে, ততক্ষণ পর্যন্তই তাকে সহ্য করা চলে। মাত্রা ছাড়ালেই সে ছোঁয়াচে রোগের সামিল হয়ে পড়ে। এমন আদর্শের মধ্যে নিষ্ঠুরতার রক্তচক্ষু দেখতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেই নিষ্ঠুরতার উপর কর্তব্যের শীলমোহর আঁকা। উমার প্রেমে গলদ কোথায় সে কথা বোঝাতে গিয়ে ইন্দ্রনাথ যখন তার 'নিষ্ঠুরের সাধনা'র ব্যাখ্যা করে, তখন সত্যনিষ্ঠ এলা প্রকাশ করতে বাধ্য হয় সে-ও ভালোবেসেছে, 'আপনার কাছে মিথ্যা বল্‌বো না, বুঝতে পারছি আমার ভালোবাসা দিনে-দিনে অন্য সব ভালোবাসাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে।' (চা, অ. ।২৬ পৃঃ) একমনা হয়ে কাজ করবার অঙ্গীকার করেছিলো এলা। কিন্তু এখন সে দ্বিধাগ্রস্ত, অন্যমনা। দলের চোখে উমার ভালোবাসা যদি হৃদয়-দৌর্বল্যের অপরাধ হয়ে থাকে তবে এলাও অপরাধিনী। সুতরাং তার পক্ষেও দলের সংশ্রব ত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয়। তাই ইন্দ্রনাথের কাছে তার মুক্তির আবেদন। কিন্তু মাস্টারমশায়ের চোখে উমা আর এলা তো এক নয়। এলার সম্বন্ধে ইন্দ্রনাথ বিশ্বাস করে, 'ভালোবাসার গুরুভার তোমার ব্রত ডোবাতে পারে তেমন মেয়ে তুমি নও।' এই বিশ্বাসের বলেই ইন্দ্রনাথ এলাকে আশ্বাস দিতে পারে, 'কোনো ভয় নেই, খুব ভালোবাসো।' তবে যে-ভালোবাসার অনুমতি এলা পেল, সে ভালোবাসা শুষ্ক, রুদ্র, তার মাঝে 'সংসার পিঞ্জরেয়' বাঁধা পড়বার আকুতি নেই। এমন শুষ্ক রুদ্র ভালোবাসার সাধনা তার সাধ্যায়ত্ত কিনা সে বিষয়ে এলা সন্দিহান নয়; কিন্তু ইন্দ্রনাথের

দাবী তার অসাধারণত্বের কাছে। অন্যের পক্ষে যা সম্ভব নয়, এলার পক্ষে তা সম্ভব ইন্দ্রনাথ বারবার এলাকে এ কথাই বিশ্বাস করতে বলে। ইন্দ্রনাথ জানত, "দাবীর জোরেই দাবী সত্য হয়ে উঠবে।" (চা. অ. ।২০ পৃঃ) হ'লও তাই। ইন্দ্রনাথের দাবির যাদুস্পর্শে এলার মুক্তিকামনা নিস্তেজ হয়ে পড়ে। অসাধারণত্বের অগ্নিপরীক্ষায় হার মানা তার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠল না। অঙ্গীকারের জাল থেকে মুক্তি পাওয়ার আশা হ'ল পরাহত।

দলের সাথে তার অসামঞ্জস্য আছে তবু নিষ্কৃতি নেই। অতীনের কাছে মন পড়েছে বাঁধা তবু মিলনের পথে পণের বাধা। এমনি এক নিরুদ্দেশ অসহায়তার মাঝদরিয়ায় প'ড়ে এলা অতীনকে বোঝাতে চেষ্টা করে কেন অতীনের দাবিকে সে মেনে নিতে পারল না, কোথায় তার বাধা। এলার যুক্তি প্রধানত দুটি। একদিকে স্বজাতির প্রতি আপন মনোভাব, আর-একদিকে পুরুষের প্রতি—বিশেষ ক'রে অতীন্দ্রের সম্বন্ধে—তার ভাব-রঞ্জিত ধারণা।

'পৃথিবীতে সবচেয়ে জঘন্য যে স্পাইয়ের ব্যবসা সেই ব্যবসাতে মেয়েদের নৈপুণ্য পুরুষের চেয়ে বেশি একথা যখন বইয়ে পড়লুম তখন বিধাতার পায়ে মাথা ঠুকে বলেছি সাত জন্মে যেন মেয়ে হয়ে না জন্মাই।' (চা. অ. ।৬৭ পৃঃ) এই খেদোক্তির মধ্যে স্বজাতির প্রতি এলার ঘৃণা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঘৃণার কারণ, 'মেয়েরা বায়োলজির সংকল্প বহন ক'রে' জগতে এসেছে, সঙ্গে এনেছে 'জীবপ্রকৃতির নিজের জোগানো অস্ত্র ও মন্ত্র।' এই সব অস্ত্র ও মন্ত্র 'ঠিক মতো ব্যবহার করতে জানলেই সস্তায় আমরা জিতে নিতে পারি আমাদের সিংহাসন।' এই যে 'সস্তায় জিতে নেওয়া' এর মধ্যে গ্লানি আছে আর সেটাই এলাকে লজ্জা দেয় গভীরভাবে, 'সস্তা' জয়ের পথ থেকে তাকে দূরে সরিয়ে রাখে। এই জয়ের সঠিকরূপ নির্ধারণ করতে গিয়ে এলা দেখতে পায় এটা আর কিছুই নয়, শুধু পুরুষকে নীচে নামানো। প্রাকৃত নারীর টানে পুরুষ নেমে আসে বায়োলজির নীচের তলায়। এই যেন নারী-জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা প্রয়োজনের প্রশ্ন ওঠে না, '…নীচে টেনে আনবার একটা সাধারণ ষড়যন্ত্রে আমরা সমস্ত মেয়ে এক হয়ে যোগ দিয়েছি, সাজে সজ্জায় হাবে ভাবে বানানো কথায়।' (চা. অ. ।৬৪) শুধু অতীন্দ্র নয়, ইন্দ্রনাথের কাছেও সে তার এই মত প্রকাশ ক'রে বলেছে, 'মেয়েরা নিঃশব্দ নৈপুণ্যে প্রশ্রয় ঘটিয়েছে আর তার দায় মানতে হয়েছে পুরুষকে, আমার অভিজ্ঞতায় এমন ঘটনার অভাব নেই।' (চা. অ. ।২৩) তার বিদগ্ধ বিচারবুদ্ধির কাছে নীরব এই প্রাকৃত ষড়যন্ত্র লজ্জাকর ঘৃণ্য রুচিবিরুদ্ধ—এলা সর্বতোভাবে তা পরিহার ক'রে চলতে চেষ্টা করেছে। তাই এলার জীবনবাদে প্রেমের সার্থকতা সম্ভোগে নয় ত্যাগে—স্বাধিকার প্রসারে নয় মুক্তি দানে।

এলা বিশ্বাস করে, 'পুরুষরা আমাদের চেয়ে অনেক বড়।' (চা. অ. ।৬৩) এই বড়োকে সে বড়ো ক'রেই দেখতে চেয়েছে, বড়ো ক'রেই রাখতে চেয়েছে। পুরুষকুলে অতীন্দ্র আবার পুরুষোত্তম—'কারো মতো নয় যে তুমি ; মস্ত তুমি। তফাতে আছি ব'লেই দেখতে পেলুম সেই তোমাব অলোক সামান্য প্রকাশ। সামান্য আমাকে দিয়ে তোমাকে জড়িয়ে ফেলবার কল্পনা করতে আমার ভয় হয়।' (চা, অ. ।৬২ পৃ) এমন পুরুষকারের আত্মবিকাশের জন্য বিরাট পরিসরের প্রয়োজন। নারীর দেহনির্ভর ভালোবাসার গণ্ডী ছোট্ট, সেখানে বন্দী হয়ে পড়লে অতীন্দ্র তার

অলোকসামান্য পরিচয় হারিয়ে ফেলবে আর সেই সঙ্গে হারিয়ে যাবে এলার কাছেও—এই ভয়েই এলা তাকে কাছে পেয়েও দূরে সরিয়ে রাখল। অতীন্দ্রকে সে বোঝাবার চেষ্টা করে, 'তোমার নিজের চেয়ে তোমাকে আমি বেশি চিনি অন্তু। আমার আদরের ছোট্ট খাঁচায় দুদিনে তোমার ডানা উঠতো ছটফটিয়ে। যে তৃপ্তির সামান্য উপকরণ আমাদের হাতে, তার আয়োজন তোমার কাছে একদিন ঠেকত তলানিতে এসে। তখন জানতে পারতে আমি কতই গরীব। তাই আমার সমস্ত দাবী তুলে নিয়েছি, সম্পূর্ণ মনে সঁপে দিয়েছি তোমাকে দেশের হাতে। সেখানে তোমার শক্তি স্থান-সংকোচে দুঃখ পাবে না।' (চা. অ. ।৬৯) এই অনাগত দিনের দেউলে-হবার সম্ভাবনা তার বর্তমানের পাওয়ার আশার উপর কালো ছায়া ফেলে। এলার মন এ'কথা বিশ্বাস ক'রে নিয়েছে যে, সে যদি অতীন্দ্রকে পাশমুক্ত করে রাখে তবেই তার অন্তু তার চির-পাওয়ার ধন হয়ে থাকবে। সংসারসীমানার বাইরে বিরাট কর্ম-ক্ষেত্রে সহকর্মিতার মধ্য দিয়ে যে বিদেহী পাওয়া সেইটুকুই এলার কাছে কাম্য। এ কথা সে অস্বীকার করে না যে, এমন বিদেহী পাওয়ার শূন্যতা দুঃসহ। গভীর দুঃখে অতীনকে সে জানায়, 'যে আশ্চর্য সৌভাগ্য সকল সাধনার অতীত, যা দৈবের অযাচিত দান তা এলো আমার সামনে, তবু নিতে পারলুম না। হৃদয়ে হৃদয়ে গাঁঠ-বাঁধা, তৎসত্ত্বেও এত বড় দুঃসহ বৈধব্য কোনো মেয়ের ভাগ্যে যেন না ঘটে।' (চা. অ. ।৫৫) কিন্তু এই শূন্যতার হাহাকারকেও ছাপিয়ে ওঠে তার অসাধারণ ত্যাগের আত্মতুষ্টি, 'তোমাদের মতো পুরুষের জীবনকেও চাপা দিতে ভয় পায় না এমন মেয়ে হয় তো আছে; তারা ট্রাজেডি ঘটিয়েছে কত আমি তা জানি। চোখের সামনে দেখেছি লতার জালে বনস্পতিকে বাড়তে দিল না; সেই মেয়েরা বুঝি মনে করে তাদের জড়িয়ে ধরাই যথেষ্ট।' (চা. অ. ।৬২) এখানেই এলার আত্মশ্লাঘা যে, সে এমনতরো জড়িয়ে ধরার দলে নয়, সে পুরুষের পুরুষকারকে চিনতে পারে, নিজের দুঃখ স্বীকার করেও পুরুষের অসামান্যতার সাধনাকে নিষ্কণ্টক রাখে। এলার অপূর্ণতার বেদনায় এটুকুই শুধু সান্ত্বনার প্রলেপ।

এলার চিন্তাধারার মধ্যে এমন একটা অস্বাভাবিক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় যেটা অতীন্দ্রের কাছে আত্মপ্রবঞ্চনার নামান্তর। প্রথমত, যে-পণরক্ষার দোহাই পাড়ে এলা অতীন্দ্র সেটাকে অসত্য মনে করে, কারণ সেটা স্বধর্মবিরোধী। এলাকে আপন করে পেল না বলে অতীন্দ্র যখন দুঃখ করে, এলা তখন স্বপক্ষে যুক্তি দেখায়, আমার উপায় ছিল না অন্তু। দ্রৌপদীকে দেখবার আগেই কুন্তী বলেছিলেন, তোমরা সবাই মিলে ভাগ করে নিয়ো। তুমি আসবার আগেই শপথ করে দেশের আদেশ স্বীকার করেছি, বলেছি আমার একলার জন্যে কিছুই রাখব না। দেশের কাছে আমি বাগদত্তা।' (চা. অ. ।৫৪) এখানেই অতীন্দ্রের নালিশ, 'অধার্মিক তোমার পণ গ্রহণ, এ পণকে রক্ষা করাও প্রতিদিন তোমার স্বধর্ম বিদ্রোহ।' (চা. অ. ।৫৪) ভালোবাসা পবিত্র ভালোবাসার মধ্যে যে-চাওয়া আছে তা-ও পবিত্র, কারণ তা মানুষের একটি সহজাত এষণা, অন্তর্যামীর আদেশবাণী। যে-আদর্শ এই স্বতঃসিদ্ধ এষণাকে অস্বীকার করে, তার প্রকাশপথ রুদ্ধ করে রাখে, সে আর যাই হোক মানবিক আদর্শ হতে পারে না। কর্তব্যবোধ যখন মানবতার দাবির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তখন ভালোবাসার সঙ্গে তার কোনো বিরোধ নেই, কারণ ভালোবাসাও যে মানবতার দাবি। কিন্তু দ্বন্দ্ব জাগে যখন দল বা গোষ্ঠীর বানানো কর্তব্যবোধকে মানবিক

কর্তব্যবোধের সাজ পরিয়ে পুজাবেদীতে বসানো হয়। এলা এই নকল দেবীর সামনে বলি দিয়েছে তার ব্যক্তিত্বকে তার সহজাত স্বভাবকে। মানবধর্মের কাছে স্বভাবহননের মত বড় পাপ আর নেই। এলা যাকে মহিমময় ত্যাগ মনে করে আত্মতৃপ্তি লাভ করবার চেষ্টা করছে, অতীন্দ্রের কাছে তা কেবলমাত্র অর্থহীন নয়, নীতিবিগর্হিত অধার্মিক আত্মপ্রবঞ্চনা।

নারীত্ব সম্বন্ধে এলার ধারণাকেও অতীন ভ্রমান্ধ বলে উড়িয়ে দেয়। সে বিশ্বাস করে, মেয়েদের ঐশ্বর্য প্রকাশ পায় মাধুর্যের দানে। এলা যাকে প্রকৃতির যোগানো অস্ত্র ও মন্ত্র বলে ঘৃণা করে, তার মধ্যে আছে বিধাতার কল্পনার স্পর্শ: 'রঙে সুরে আপন দেহে মনে অনির্বচনীয়কে' প্রকাশ করার প্রতিশ্রুতি। নারীর মাধুর্যের দানে পুরুষ চরিতার্থ হবে, এটাই বিধিলিপি। যে-পুরুষ 'সেই বিধিলিপিকে ব্যর্থ করে সে পুরুষ নামের যোগ্য নয়।' অতীন্দ্র বিশ্বাস করে, পুরুষ যখন তার পৌরুষ হারায় তখনই মেয়েরা নেমে আসে আর নামায় নীচতার দিকে।

অতীন্দ্র যেন এলার আত্মসমর্থনের সবগুলো পথ বন্ধ করে দেয়, তার সুচির-সঞ্চিত ধারণাগুলিকে ছত্রভঙ্গ করে ফেলে। তবু এলা যুক্তির ব্যূহ রচনা করে, তবু চেষ্টা করে তার কৃতকর্মকে সমর্থন করতে। কিন্তু তখন তার বিশ্বাসের আয়ু এসেছে ক্ষীণ হয়ে, তার প্রতিবাদের ভাষায় আর বল নেই। এমন সময় অতীন্দ্র চরণ আঘাত হানে একেবারে এলার অহংকারের মর্মস্থলে। এলা শোনে অতীন্দ্রকে সে ভুলিয়ে নিয়ে এসেছে বিপথে। তার কানে বাজে অতীন্দ্রের রূঢ় নালিশ, 'আপন দেশে আপন স্থান নেবার দায় ছিল আপন শক্তিতেই, সে শক্তি আমার ছিল। কেন তুমি সে কথা আমায় ভুলিয়ে দিলে?' (চা. অ. ।৭০) যে-পুরুষমৃগয়া আজীবন এলার কাছে ঘৃণ্য ছিল সেই মৃগয়ার অভিযোগই তার বিরুদ্ধে! এ যেন নিয়তির তির্যক হাসি।

একটা স্বতঃসিদ্ধ সত্য সম্বন্ধে এলা আগাগোড়াই উপকথার উঠপাখীর মতো আত্মপ্রবঞ্চনার বালিতে মাথা গুঁজে ছিল নিশ্চিন্ত চিত্তে। ইন্দ্রনাথ যখন তাকে বলত 'কেমন করে তুমি নিজে বুঝবে তোমার হাতের রক্তচন্দনের ফোঁটা ছেলেদের মনে কী আগুন জ্বালিয়ে দেয়,' তখন সে যেন বুঝেও বুঝত না তার আগুন-জ্বালানো শক্তি কোথায়। ছেলেদের প্রেরণা জোগাবার কাজে 'প্রকৃতির যোগানো অস্ত্র ও মন্ত্র'ই-কি তার একটা প্রধান সহায় ছিল না? দানসংগ্রহের ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টাচ্ছলে অতীন্দ্র তো বলেইছে, 'দুঃসাধ্য ক্ষতিসাধনের শক্তি দেহে দুর্জয় বেগে সঞ্চার করলে কে? সংগ্রহের ভার যদি থাকত আমাদের গণেশ মজুমদারের 'পরে তা হোলে তার পৌরুষ আমার কাপড়ের বাক্সে ক্ষতি করত অতি সামান্য। (চা. অ. ।৪৮) কিন্তু তখন তার মনে আত্মপ্রসাদের রঙীন নেশা; অতীন্দ্রের এই হাল্কা কথাগুলির আড়ালে যে রুক্ষ সত্য ছিল, সেটা তার কাছে তখন ধরা পড়ে নি। তাই অতীন্দ্রের মর্মঘাতী স্পষ্টোক্তি তাকে তড়িৎ-স্পৃষ্টের মত এক নিমেষে সচেতন করে তোলে। কোনো জবাব পায় না খুঁজে, ক্লিষ্ট কণ্ঠে সে শুধু অতীনকে প্রশ্ন করতে পারে— অতীন ভুলল কেন, কেন সে গোড়াতেই এলাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিল না। অতীন্দ্রের নির্মম উত্তর তার আত্মপ্রবঞ্চনার শেষ আশ্রয়টুকুও ভেঙে-চুরে দেয়, 'ভোলাবার শক্তি তোমাদের অমোঘ নইলে ভুলেছি ব'লে লজ্জা করতুম। আমি হাজারবার করে মানব যে, তুমি আমাকে ভোলাতে পারো, যদি না ভুলতুম, সন্দেহ করতুম আমার পৌরুষকে।' (চা. অ ।৭১) আত্ম-অপরিচিতির

অন্ধকার হ'তে অতীন এলাকে সবলে টেনে নিয়ে আসে আলোর স্বচ্ছতায় ; এলা নিজেকে চিনতে পারে। তার গুহাহিত তুষারহিম নারীচেতনা সেই চেনার আলোকে সহসা সজীব চঞ্চল হয়ে ওঠে। তখন সংস্কারমুক্ত উচ্ছল আবেগ তার কণ্ঠে জাগিয়ে তোলে অনবদমিত সমর্পণের উচ্ছ্বাস, সে বলতে পারে 'দস্যু আমার, কেড়ে নিতে হবে না গো, নাও এই নাও, এই নাও।' (চা, অ.।৭৬)

অনুচিত কর্মারম্ভের অন্তে আছে গ্লানি, আছে অনুতাপ, আছে ব্যর্থতার হাহাকার। এলার জন্য সেই ভাগ্যই প্রতীক্ষা করছিল। তৃতীয় অধ্যায়ে যে-এলার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, সে অধীর-বিহ্বল, অনুশোচনায় দীর্ণচিত্ত। অতীন্দ্রের সস্নেহ মন্তব্যের মাঝে তখনকার এলার একটি স্বচ্ছ ছবি পাওয়া যায়, 'এতক্ষণে সেই মেয়েটির প্রকাশ হলো, যে মেয়েটি রিয়ল্।' (চা. অ.।৯৮) এই 'রিয়ল্' মেয়েটি চিরদিনের জানাশোনা আত্মসংবৃত এলা নয়—এ মেয়েটি প্রিয়জনের অদর্শনে উদভ্রান্ত হয়ে ওঠে, সমস্ত বিপদবাধা শুভ-অশুভ তুচ্ছ ক'রে ভুতুড়ে পাড়ায় ছুটে আসে ; এ মেয়েটি পুরুষের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে স্বীকার করে, 'অতীন, অতীন, পারলুমনা থাকতে।' (চা. অ.।৮৯) এমন ভুতুড়ে পাড়া যেখানে কোনোদিন কোনো বাঙালী ভদ্রমহিলার আবির্ভাব ঘটে নি, সেখানে এলাকে কেন ছুটে আসতে হ'ল সে কথা অতীন্দ্রকে এখন নিঃসংকোচে জানাতে পারে এলা, '…বাংলাদেশের কোনো ভদ্রমহিলার অদৃষ্টে এত বড়ো গরজ এমন দুঃসহ হয়ে কোনো-দিন প্রকাশ পায় নি।' (চা. অ.।৯১) কিন্তু কই গরজ শুধু কেবল তার নিজের কারণে নয়, অতীন্দ্রের জন্যও। এলা একথা কিছুতেই মুছে ফেলতে পারে না যে, সে তার একমাত্র প্রিয়জনকে পথভ্রষ্ট করেছে। '…আমার ভুলে তুমি ভুল কেন করলে? কেন নিলে জীবিকাবর্জনের দুঃখ?' (চা. অ.।৯১) এই প্রশ্নের উত্তর এলার কাছে আজ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। সস্নেহে অতীন্দ্র তাকে বোঝায় তার কোনো দায়িত্ব নেই, বলে, 'আমি ছিটকে পড়েছি রাস্তায় অন্তরের বেগে, তুমি উপলক্ষ্যমাত্র। অন্য কোনো শ্রেণীর বঙ্গ মহিলাকে উপলক্ষ্য পেলে এতদিনে গোরা-কালা-সম্মিলনী ক্লাবে ব্রিজ খেলতে যেতুম, ঘোড়-দৌড়ের মাঠে গবর্ণরের বক্সের অভিমুখে স্বর্গারোহণ পর্বের সাধনা করতুম।' (চা. অ.।৯৭) কিন্তু এ যেন মামুলী সান্ত্বনা। এর মাঝে এলা আপন শাপমুক্তির কোনো সন্ধান পায় না।

বনস্পতিকে বাড়তে না-দেওয়া এলার চোখে অমার্জনীয় অপরাধ। অথচ ভাগ্যচক্রে সে-ই আজ কাঠগড়ায়। অপরাধের গুরুভার সিন্ধুবাদের ঘাড়ে-চড়া বুড়োটার মতো তার বিবেকের কাঁধে চেপে ব'সে আছে, কিছুতেই নিস্তার নেই। একদিন অহংকার ক'রে অতীন্দ্রকে বলেছিল, 'তোমার নিজের চেয়ে তোমাকে আমি বেশী জানি অন্তু।' (চা. অ.।৬৮) কিন্তু এখন আর তার সেই অহংকার নেই। এখন সে নম্র অনুশোচনায় স্বীকার করে, 'যখন তোমায় চিনতুম না তখন তোমাকে এই রাস্তায় দাঁড় করিয়েছি।' (চা. অ.।৯৬) অনুতাপের অন্ধকারে তার শুধু একটি ক্ষীণ আশার আলো, যদি অতীন্দ্রকে জীবনের পথে ফেরানো যায়। সেই আশায় উৎকণ্ঠ হয়ে করুণ মিনতি জানায় এলা, 'ফিরে এস, অন্তু। এত বছর ধরে যে বিশ্বাসের মধ্যে বাসা নিয়েছিলুম তার ভিৎ তুমি ভেঙে দিয়েছ। আজ আছি ভেসে-চলা ভাঙা নৌকো আঁকড়িয়ে। আমাকেও উদ্ধার করে নিয়ে যাও।…এখনি তুমি হুকুম করো আমি ভাঙব পণ। ভুল করেছি আমি। আমাকে মাপ

করো।' (চা. অ.।১১২) এই প্রাণভরা মিনতি, এই বিহ্বল ক্ষমা প্রার্থনা: সবই তখন বৃথা। অতীনের মুক্তিপথ বন্ধ। বিবাহ-বিমুখ এলা এক কূল-ভাঙানো প্লাবনের মুখে দাঁড়িয়ে অসহায় বেদনায় নিবেদন করে, 'আমি স্বয়ম্বরা, আমাকে বিয়ে করো অন্তু। আর সময় নষ্ট করতে পারব না—গন্ধর্ব বিবাহ হোক, সহধর্মিণী করে নিয়ে যাও তোমার পথে।' (চা. অ. ।১১২) কিন্তু অতীন অটল। দিশেহারা এলা খুঁজে পায় না কেমন ক'রে সে বোঝাবে অন্তুই তার নিষ্ফল নিঃসঙ্গ জীবনে একমাত্র অবলম্বন—'তুমি ছাড়া আর কেউ নেই আমার, এ কথা যদি বা সন্দেহ করো, একান্ত মনে আশা করি মৃত্যুর পরে সে সন্দেহ সম্পূর্ণ ঘোচাবার একটা কোনো রাস্তা কোথাও আছে।' (চা. অ. ।১১৪) তার এই আকুল আবেদন চাপা প'ড়ে যায় অতীন্দ্রের কর্তব্যের আহ্বানে, যে কর্তব্যের পথে এলাই তাকে টেনে এনেছে। এবার এলাই তাকে'বাধা দেয়, এলাই তার পা জড়িয়ে ধ'রে বলে,'···আমাকে ফেলে যেয়ো না, ফেলে যেয়ো না।' কিন্তু ব্যর্থ হয় এই আবেগোদ্বেল মিনতি। একদিন পথ বেঁধে দিয়েছিল তাদের গ্রন্থী। আজ পথই আবার ছেদন করল সেই গ্রন্থী। তৃতীয় অধ্যায়ে অতীন্দ্রের নির্গমন যেন অন্তহীন বিচ্ছেদের ইঙ্গিত। দুঃসহ নিরাশার বেদনায় এলা ইন্দ্রনাথের সামনে ভেঙে পরে, বলে, 'ফিরিয়ে আনুন অন্তুকে।' অভাগা এলা সেদিন ব্যর্থতার আঘাতে এতই দিশাহারা যে, সে বুঝতেই পারল না কার কাছে তার এই অনুনয়। ইন্দ্রনাথের ডাক্তারী চোখে এলা তখন গুঁটি-বেরুনো অস্পৃশ্য রোগী—আশু বর্জনীয়।

একদিন এলা ইন্দ্রনাথকে গর্ব করে জানিয়ে দিয়েছিল, 'মাষ্টারমশায়, মনে রইল আপনার কথা, প্রস্তুত থাকব। আমাকে সরাবার দিন হয় তো আসবে। নিঃশব্দেই মিলিয়ে যাব।' (চা. অ. ।৩৩) অবশেষে তার নিঃশব্দ সমাপ্তির দিন এল। সেই দিনের দূত হয়ে এল স্বয়ং অতীন। অতীন্দ্র এলার মহাজীবন, অতীন্দ্রই তার মহামরণ। অতীন তাকে মৃত্যুতত্ত্ব বোঝায়, সে শোনে মৃত্যুই মোহরাত্রির অবসান। তার জীবনে মৃত্যু সত্যিই এল 'বঞ্চনার দলিলটা'কে লোপ করে দেবার জন্য। তাই মৃত্যুমুখী এলা সহসা এক অপরূপ আত্মোপলব্ধির সত্য আলোয় জ্যোতির্ময়ী হয়ে ওঠে।

আত্মোপলব্ধির দুটো দিক আছে: নিজের সত্য পরিচয় জানা এবং সেই পরিচয়কে সত্য বলে গ্রহণ করা। শেষ অধ্যায়ে এলার আত্মোপলব্ধি পূর্ণ হল। কারণ সেদিন সে আপনার নারীসত্তাকে জেনেই ক্ষান্ত হল না, তাকে সত্য বলে গ্রহণ করতেও আর কোনো দ্বিধা জাগল না মনে। মৃত্যু যেন তাকে দীর্ঘ-প্রতীক্ষিত সুযোগ এনে দিল আত্মসমর্পণের। চরম পরিসমাপ্তির সম্ভাবনা তাকে ত্রস্ত করে না। বরং, আগ্রহে অধীর হয়ে ওঠে এলা। অতীন্দ্রের হাতে মৃত্যু, এর চেয়ে কাম্যতর তার আর কিছুই নেই: 'মারো আমাকে অন্তু, নিজের হাতে। তার চেয়ে সৌভাগ্য আমার কিছু হোতে পারে না।' (চা. অ. ।১৩৬) এখন এলা মনে প্রাণে জেনেছে, সে অতীন্দ্রের। এই জানার মধ্যে কোন ত্রুটি নেই, কোনো ফাঁক নেই, কোনো কুয়াশা নেই। জানার পূর্ণতা তার 'মধুর বেদন-বিধুর হৃদয়ে' এক অনৈসর্গিক আনন্দের উদারতা জাগায়। অতীন্দ্রে দ্বিধা দেখে এলাই তাকে সান্ত্বনা দেয় আত্মনিবেদনের মর্মস্পর্শী আবেগে: 'একটুও ভেবো না অন্তু। আমি যে তোমার, সম্পূর্ণই তোমার—মরণেও তোমার নাও আমাকে। নোংরা হাত লাগতে দিয়ো না

আমার গায়ে, এ দেহ তোমার।' (চা. অ. ১৩৭) এতদিনে দেহ পেল স্বীকৃতি। একদিন তার কাছে দেহ ছিল নিছক বায়োলজির বাহন। আজ তা পবিত্র অর্ঘ হয়ে উঠল। জীবনে অতীনকে এলা যা দিতে পারে নি জীবন-সীমানায় দাঁড়িয়ে তাই দিয়ে যাবার অকৃপণ প্রতিশ্রুতি। অতীতের কার্পণ্যের দীনতা সে মুছে ফেলতে চায় শেষ মুহূর্তের অমলিন দানে। যে পবিত্র অর্ঘ্য বন্দনায় লাগল না, সেই দেহই হল মৃত্যুর নৈবেদ্য। দ্বিধাহীন হাতে এলা ছিঁড়ে ফেলে তার বুকের জামা, যেন ছিঁড়ে ফেলে তার ভ্রুকুটিকুটিল আত্মনিষেধের পরোয়ানা। তার ব্যাঞ্জনার মধ্যে প্রকাশ পায় এক রুদ্ধশ্বাস ব্যাকুলতা, প্রত্যেকটি মুহূর্ত যে তার কাছে অমূল্য। মৃত্যুকে শিয়রে দাঁড় করিয়ে রেখে সে প্রত্যেক মুহূর্তের দ্রুত মিলিয়ে যাওয়া মিলনস্পন্দন সমস্ত সত্তা দিয়ে তিল তিল করে অনুভব করতে চায়। অতীনকে বুকে চেপে ধরে এলা তার শেষ আদরের ডাক ডেকে নেয়, শেষ নিবেদন জানিয়ে যায়, 'অন্তু, অন্তু আমার, আমার রাজা, আমার দেবতা, তোমাকে কত ভালবেসেছি আজ পর্যন্ত সম্পূর্ণ করে তা জানতে পারলুম না। সেই ভালোবাসার দোহাই, মারো আমাকে মারো।' (চা. অ. ।১৩৭) মৃত্যু তার মোহমুক্তির পথ ; নির্ভয়ে তাকে সে অভ্যর্থনা করে। চৈতন্যের শেষ মুহূর্তটুকুও সে তার জীবনদেবতাকে দিয়ে যাবে এই শুধু তার অন্তিম কামনা। অতীন্দ্রকে ক্লোরোফরমের শিশিটা ফেলে দেবার আদেশ দিয়ে এলা মিনতি জানায় 'জেগে থেকে যাতে মরি তোমার কোলে তাই করো।' এলার শেষ চুম্বন অফুরান হল মৃত্যুর অসীমতায়।

এক অপূর্ব চিন্ময়ী নারীচরিত্র মূর্ত হয়ে উঠেছে এলার মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ নারীচরিত্ররচনায় যে অদ্বিতীয় সে-কথা নূতন করে প্রমাণ করল এলা। নিস্ফলতার বেদনা, আত্মসমর্পণের আনন্দ, প্রস্তরশৃঙ্খলোন্মুক্ত অন্তরাবেগের বাধাবন্ধহারা প্রবাহ, চেনার শেষ মুহূর্ত দিয়ে দুর্লভ মিলনের অন্তিম উপলব্ধি—শেষ অধ্যায়ে এক সঙ্গে যেন বীণার সবগুলি তার ঝংকৃত হয়ে উঠল জীবন-রাগিণীর সমে-আসা মূর্ছনায়। সত্যই, সুরের রেশের মতো এলা অনুরণিত হতে থাকে পাঠকমনে।

কাশীপ্রসাদ জয়সোয়াল

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

১৮৮১ খৃস্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর কাশীপ্রসাদ জয়সোয়াল মানভূম জেলার ঝালদা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে এই শহর পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত। উত্তর প্রদেশের মীর্জাপুর শহর জয়সোয়াল পরিবারের বাসস্থান ছিল। কাশীপ্রসাদের পিতা এই শহরের একজন ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। মীর্জাপুরের লণ্ডন মিশন হাই স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কাশীপ্রসাদ এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য ইংল্যাণ্ড গমন করেন ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের Jesus College-এ প্রবিষ্ট হন। এই কলেজে তিনি প্রাচীন ইতিহাস এবং চীনা ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। চীনা ভাষায় পারদর্শিতার জন্য এই কলেজ হইতে তিনি একটি বিশেষ বৃত্তি লাভ করেন। অক্সফোর্ড হইতে ইতিহাসে এম. এ. ডিগ্রী ও মিড্‌ল টেম্পল হইতে 'ব্যারিস্টার' শ্রেণীভুক্ত হইয়া ১৯০৯ খৃস্টাব্দে কাশীপ্রসাদ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

স্বদেশে ফিরিয়া কাশীপ্রসাদ এলাহাবাদে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করিতে মনস্থ করেন। ইউরোপে বাসকালে কাশীপ্রসাদ ভারতীয় বিপ্লবীদের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলিয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরাগ ভাজন হন। বিপ্লবীদের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকার অভিযোগে এলাহাবাদ হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় করিবার অনুমতি অর্জন করিতে অপরাগ্ হইয়া ১৯১০ খৃস্টাব্দে কাশীপ্রসাদ কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ের জন্য আবেদন করেন। বিশিষ্ট দেশ নেতা ও কলিকাতা হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবী সার আশুতোষ চৌধুরীর অনুরোধে কলিকাতা হাইকোর্টের তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি সার লরেন্স জেঙ্কিন্স্ কাশীপ্রসাদের আবেদন মঞ্জুর করেন। তীক্ষ্ণধী ও সুপণ্ডিত জয়সোয়াল অল্পদিনের মধ্যেই কলিকাতা হাইকোর্টে দক্ষ আইনজীবীরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সহিত কাশীপ্রসাদের পরিচয় স্থাপিত হয়। গুণগ্রাহী আশুতোষ কাশীপ্রসাদকে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের চর্চায় অনুপ্রাণিত করেন এবং তাঁহাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের সহকারী অধ্যাপক পদে নিয়োগের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। নানা কারণে কাশীপ্রসাদ এই পদে যোগদান করেন নাই। আইন ব্যবসায়ের অবসরকালেই কাশীপ্রসাদ গভীর ভাবে ভারতীয় ইতিহাস চর্চায় নিমগ্ন হন। প্রাচীন ভারতের রাজনীতি (দণ্ডনীতি) ও প্রাচীন ভারতীয় স্মৃতিশাস্ত্র এই সময়ে তাঁহার বিশেষ অধ্যয়ন ও গবেষণার বিষয় ছিল। এ যাবৎ প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার এই দিকটি প্রায় অনালোচিত ছিল। কাশীপ্রসাদ প্রথমে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত সুপ্রসিদ্ধ "মর্ডার্ন রিভিউ" পত্রিকায় প্রাচীন হিন্দুর দণ্ডনীতি সম্বন্ধে কয়েকটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন (May to December, 1913)। এই প্রবন্ধগুলি বিদ্বজ্জনের সবিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে। প্রাচীন হিন্দু-রাজনীতি সম্পর্কিত এই প্রবন্ধমালায়

জয়সোয়াল প্রমাণ করেন যে খৃস্ট জন্মের বহু পূর্ব হইতেই ভারতের নানাস্থানে বিশেষতঃ মগধের বৈশালী প্রভৃতি অঞ্চলে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া প্রচলিত ছিল। বর্তমানেও আমাদের দেশের গ্রাম্য পঞ্চায়েতগুলি সুদূর অতীতকালে অনুসৃত এই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার স্মৃতির সাক্ষ্য বহন করিতেছে। "মডার্ণ রিভিউ"-এ প্রকাশিত এই প্রবন্ধগুলি পরিবর্দ্ধিত হইয়া ১৯২৪ খৃস্টাব্দে দুই ভাগে প্রকাশিত এবং প্রচুর ভাবে সমাদৃত হয়।(১)

১৯১৬ খৃস্টাব্দে নবগঠিত বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের জন্য পাটনায় একটি পৃথক হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হইলে জয়সোয়াল কলিকাতা হাইকোর্ট ত্যাগ করিয়া পাটনা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় করিতে মনস্থ করেন এবং পাটনায় আসেন। পাটনা হাইকোর্টে যোগদান করার অত্যল্প কালের মধ্যেই তিনি এই প্রদেশের অন্যতম দিক্‌পাল আইনজীবী রূপে পরিগণিত হন। কাশীপ্রসাদের অবশিষ্ট জীবনকাল পাটনাতেই ব্যয়িত হয়।

১৯১৭ খৃস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কাশীপ্রসাদকে "ঠাকুর আইন বক্তৃতা" দিতে আহ্বান করেন। শুধুমাত্র বিশ্ববিশ্রুত আইনজ্ঞ পণ্ডিতগণকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় Tagore Law Professor নিযুক্ত করিয়া থাকেন। আইন সম্বন্ধে বৎসরকালের মধ্যে মৌলিক কয়েকটি ভাষণ দানের জন্যই এই পদটি ১৮৭০ খৃস্টাব্দে প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে সৃষ্ট হয়। সার রাসবিহারী ঘোষ, সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জুলিয়াস ইয়োলি (Jolly), আমীর আলি, উড্রফ (J. G. Woodroofee), আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বিখ্যাত আইন-বিদ্‌গণ ইতিপূর্বে এই পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। আইনের ঠাকুর অধ্যাপকরূপে কাশীপ্রসাদ মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি অনুযায়ী হিন্দু আইনের বিবর্তনের ব্যাখ্যা করেন। প্রাচীন হিন্দুস্মৃতি সম্বন্ধে কাশীপ্রসাদের এই সারগর্ভ, তথ্য সমৃদ্ধ বক্তৃতা মালা ১৯৩৪ খৃস্টাব্দে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।(২) এই পুস্তকটি পৃথিবীর সর্বত্র প্রাচীন হিন্দুস্মৃতি সম্বন্ধে প্রামাণ্য পুস্তকরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে।

১৯১৫ খৃস্টাব্দে বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশের তদানীন্তন গভর্ণর ইতিহাস-প্রেমিক সার এডোয়ার্ড গেট্ (Sir Edward Gait) এই প্রদেশে ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব আলোচনার জন্য পাটনায় "বিহার য়্যাণ্ড ওড়িশা রিসার্চ সোসাইটি" নামে একটি প্রতিষ্ঠান সংগঠন করেন। এই প্রতিষ্ঠানের সূচনা কাল হইতেই কাশীপ্রসাদ ইহার একজন প্রধান কর্মী হইয়া উঠেন। ১৯ বৎসর কাল ধরিয়া মৃত্যু সময় পর্যন্ত কাশীপ্রসাদ এই প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র (Journal of the Bihar and Orissa Research Society) সম্পাদনের দায়িত্ব বহন করেন। ১৯৩৭ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত এই জার্নালে যে সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার অধিকাংশভাগই ছিল জয়সোয়ালের লেখনী-প্রসূত। এই জার্নালে তাঁহার লিখিত পাটলিপুত্রে প্রাপ্ত মূর্তি, হাতীগুম্ফায় খোদিত লিপি, নাগ বাকটক রাজকুল, প্রাক্ মৌর্য ও মৌর্যযুগের মুদ্রা প্রভৃতির উপর লিখিত মৌলিক গবেষণা সমন্বিত প্রবন্ধগুলি ভারতচর্চাকারী পণ্ডিতের নিকট সবিশেষ আদৃত হয়। কাশীপ্রসাদের সুযোগ্য সম্পাদনায় বিহার-উড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটির মুখপত্রটি প্রাচ্য বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ একটি সম্মান-জনক স্থান অর্জন করে। পাটলিপুত্রে প্রত্নদ্রব্য অনুসন্ধানের জন্য উৎখনন কার্যে জয়সোয়াল

কেবলমাত্র উদ্যোগী ছিলেন না। তিনি নিজেও এই অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন এবং বহু প্রত্নবস্তু উদ্ধার করেন। জয়সোয়ালের দ্বারা সংগৃহীত এই সব মুদ্রা, মূর্তি প্রভৃতি পাটনা মিউজিয়মে রক্ষিত হইয়াছে। সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এই সংগ্রহশালার সূচনাকাল হইতেই কাশীপ্রসাদ ইহার অন্যতম পরিচালক মনোনীত হন, জীবনের শেষ কয় বৎসর তিনি এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সমিতির সভাপতি ছিলেন। পাটনার সংগ্রহশালাটি বর্তমানে ভারতের শ্রেষ্ঠ সংগ্রহশালাগুলির অন্যতম। পাটনা সংগ্রহশালার এই সমৃদ্ধির কৃতিত্ব বহুলাংশেই কাশীপ্রসাদের প্রাপ্য।

১৯২৫ খৃস্টাব্দে জয়সোয়াল খৃষ্টিয় চতুর্দশ শতাব্দীতে চণ্ডেশ্বর ঠাকুর কর্তৃক রচিত 'রাজনীতি রত্নাকর' নামে দণ্ডনীতি সম্পর্কিত প্রাচীন অপ্রকাশিত গ্রন্থটি সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন।(৩)

১৯৩০ খৃস্টাব্দে বিহার-উড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটির আমন্ত্রণে পাটনা শহরে নিখিল ভারত প্রাচ্য বিদ্যা সম্মেলনের ষষ্ঠ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। কাশীপ্রসাদ এই সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিত্ব করেন। ১৯৩৩ খৃস্টাব্দে এই সম্মেলনের সপ্তম অধিবেশন বরোদায় অনুষ্ঠিত হয়। কাশীপ্রসাদ এই সম্মেলনের মূল সভাপতি নির্বাচিত হন। এই উপলক্ষ্যে তাঁহার ভাষণটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই বৎসরে কাশীপ্রসাদ প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনা করেন; ইহাতে ১৫০ খৃস্টাব্দ হইতে ৩৫০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত দুই শত বৎসরের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস আলোচিত হয়।(৪)

১৯৩৪ খৃস্টাব্দে কাশীপ্রসাদ আরও একটি পুস্তক প্রকাশ করেন; এই পুস্তকটিতে খৃস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী হইতে খৃষ্টিয় অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত যে সব নরপতি রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের শাসনকালীন ইতিহাস বিবৃত হয়। আর্য মঞ্জুশ্রীমূলকল্প নামে একটি অতি প্রাচীন ও দুর্লভ সংস্কৃত পুস্তক অবলম্বনে কাশীপ্রসাদ তাঁহার এই ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন।(৫)

মঞ্জুশ্রীমূলকল্পে রাজগণের নাম সাঙ্কেতিক রীতিতে লিখিত ছিল, ভাষাও ছিল দুর্বোধ্য। মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন এই প্রাচীন গ্রন্থের একটি তিব্বতীয় অনুবাদ আবিষ্কার করেন। তিব্বতীয় অনুবাদের সাহায্যে মূল গ্রন্থের দুর্বোধ্য অংশগুলির পাঠনির্ণয়পূর্বক কাশীপ্রসাদ এই গ্রন্থটি রচনা করেন। খৃষ্ট পূর্ব ৭ম শতাব্দী হইতে খৃষ্টিয় তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দী কাল পর্যন্ত ভারতীয় ইতিহাসের অতি অল্প তথ্যই এযাবৎ পরিজ্ঞাত ছিল। বিপুল অধ্যবসায় ও ঐতিহাসিক বিচার-বোধের সমন্বয়ে উপরোক্ত গ্রন্থ দুইটিতে জয়সোয়াল এই তমসাবৃত অধ্যায়গুলিকে আলোকিত করেন। পরবর্তীকালে যাঁহারা এই সময়ের ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা কেহই জয়সোয়ালের প্রদত্ত তথ্যগুলি খণ্ডন করিতে পারেন নাই, উপরন্তু তাঁহার মতামতগুলিই প্রামাণ্য রূপে গৃহীত হইয়াছে। জয়সোয়াল প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে Vincent Smith প্রণীত Early History of India গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণগুলি সংশোধিত হইয়াছিল। সুবিখ্যাত Cambridge History of India এবং সুপ্রসিদ্ধ ভারতবিদ্ পণ্ডিত de la Vallee Poussin লিখিত Histoire du Monde গ্রন্থে কাশীপ্রসাদ আবিষ্কৃত বা পরিবেশিত তথ্যগুলি প্রামাণ্যরূপে

উদ্ধৃত হইয়াছে।

মুদ্রাতত্ত্ব সম্পর্কিত আলোচনা ও গবেষণায় কাশীপ্রসাদ বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি স্বয়ং বহু প্রাচীন মুদ্রা আবিষ্কার বা সংগ্রহ করিয়া এই বিষয়ে অনেকগুলি গবেষণামূলক নিবন্ধ প্রকাশ করেন। দুইবার তিনি ভারতীয় মুদ্রাতত্ত্ব সমিতির (Numismatic Society of India) সভাপতি নির্বাচিত হন। মুদ্রাতত্ত্বে বিশেষ গবেষণা ও পারদর্শিতার জন্য এই সমিতি তাঁহাকে একটি পদক প্রদান দ্বারা সম্মানিত করেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য তিনি বরোদার গায়কোয়াড় প্রদত্ত একটি পদকও লাভ করেন। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির আহ্বানে কাশীপ্রসাদ তথায় মৌর্য ও সুঙ্গ যুগের মুদ্রা ও পাটনায় উৎখননের দ্বারা প্রাপ্ত প্রত্ন দ্রব্যাদি সম্বন্ধে কয়েকটি গবেষণামূলক ভাষণ দান করেন।

বিহার গভর্ণমেণ্টের উদ্যোগে বিহারে প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহের জন্য যে অনুসন্ধান কার্য আরম্ভ করা হয় গভর্ণমেণ্টের অনুরোধে কাশীপ্রসাদ তাহার পরিচালন ভার গ্রহণ করেন। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে এই সমস্ত পুঁথিগুলির বিশদ বিবরণসহ দুই খণ্ড সুবৃহৎ পুস্তক তিনি সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন (৬)। এই দুই খণ্ড পুস্তক সম্পাদনায় বাঙ্গালী পণ্ডিত ডাঃ অনন্তপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রী তাঁহার সহযোগিতা করেন।

মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের সহিত কাশীপ্রসাদ বিশেষ সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। ভারত বিদ্যাচর্চার ইতিহাসে রাহুল সাংকৃত্যায়নের যে বিপুল দান আছে, কাশীপ্রসাদের পৃষ্ঠ পোসকতা না পাইলে তাহা ফলপ্রসূ হইত কিনা সন্দেহের বিষয়। কাশীপ্রসাদের আনুকূল্য লাভ করিয়াই রাহুল পুনঃ পুনঃ তিব্বত গিয়া বহু সংস্কৃত গ্রন্থ উদ্ধার করিয়া ভারতে আনিতে পারেন। রাহুলের সহযোগিতায় কাশীপ্রসাদ স্বয়ং কয়েকটী বৌদ্ধ দর্শন গ্রন্থ সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন (৭)।

ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহের জন্য কাশীপ্রসাদ স্বয়ং দীর্ঘকাল যাবৎ নেপালে অবস্থান করেন। নেপাল ভ্রমণান্তে তিনি নেপালের প্রাচীন নৃপতিবর্গের একটী ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত বিহার-উড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটীর জার্নালে প্রকাশ করেন (৮)। নেপালের ধারাবাহিক বিজ্ঞান সম্মত ইতিহাস রচনায় তাঁহাকে পথিকৃৎ বলা যাইতে পারে।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে কাশীপ্রসাদ পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানসূচক (Honoris Causa) Ph. D. উপাধিতে ভূষিত হন। দীর্ঘকাল যাবৎ 'সেনেট' সভার সদস্যরূপে কাশীপ্রসাদ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবা করিয়াছিলেন। এই বৎসরই কাশী বিশ্ববিদ্যালয় হইতেও তিনি সম্মানসূচক 'ডক্টরেট্' লাভ করেন।

হিন্দী কাশীপ্রসাদের মাতৃ-ভাষা ছিল। যৌবনকাল হইতেই কাশীপ্রসাদ হিন্দী সাময়িক পত্রাদিতে বহু প্রবন্ধ রচনা করিয়া প্রকাশ করেন, এইগুলির মধ্যে কাশীর নাগরী প্রচারিণী সভার মুখপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিহার-উড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটীর মুখপত্র ব্যতীত লণ্ডনের রয়েল এশিয়াটীক সোসাইটী জার্নাল, ইণ্ডিয়ান্ এণ্টিকোয়েরী, কলিকাতা এশিয়াটীক সোসাইটী জার্নাল, এপিগ্রাফিকা ইণ্ডিকা

প্রভৃতিতে ভারতবিদ্যার বিভিন্ন বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে কাশীপ্রসাদ লিখিত বহু গবেষণামূক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। এইভাবে প্রাচীন হিন্দু রাজনীতি, প্রাচীন হিন্দু স্মৃতি, প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস, ভারতীয় মুদ্রাতত্ত্ব, প্রাচীন লিপির পাঠ প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনার দ্বারা কাশীপ্রসাদ প্রাচীন ভারতের অজ্ঞাত অধ্যায়গুলিকে আলোকিত করিয়া জীবদ্দশায় সমগ্র বিশ্বে ধুরন্ধর ইতিহাসবেত্তা রূপে খ্যাতি লাভ করেন। কাশীপ্রসাদ এমন কোন বিষয় লইয়া আলোচনা করেন নাই, যে বিষয়ে তিনি মৌলিক অজ্ঞাত তথ্য পরিবেশন করিতে পারেন নাই।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা আগষ্ট পাটনা শহরে কাশীপ্রসাদ মাত্র ৫৬ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। ইতিহাস চর্চায় নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলাই তাঁহার অকাল মৃত্যুর কারণ। মৃত্যুকালে সমগ্র দেশে তাঁহার তুল্য দক্ষ আইনজীবী বিরল ছিল। বন্ধু বৎসলতা, দানশীলতা ও বিদ্যোৎসাহিতার জন্য উদার-হৃদয় কাশীপ্রসাদ অতিশয় জনপ্রিয় ছিলেন। বাঙ্গালী ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। উড়িষ্যার হাতীগুম্ফায় উৎকীর্ণ লিপির পাঠোদ্ধারে তাঁহারা পরস্পরের সহযোগী ছিলেন। হাতীগুম্ফায় খোদিত লিপি সম্বন্ধে জয়সোয়ালের রচনাটী পৃথক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে (৯)। রাখালদাস বলিতেন যে কোন পুরাতন বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া তাহার নূতন অর্থ উদ্‌ঘাটন বিষয়ে কাশীপ্রসাদের যে সহজাত প্রতিভা ছিল তাহা বিস্ময়জনক। ব্যবহারজীবী অথবা ঐতিহাসিক রূপে কাশীপ্রসাদ প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িত না থাকিলেও তাঁহার প্রোজ্জ্বল দেশপ্রেম রাজনৈতিক কর্মীদেরও অনুপ্রেরণা দান করিত। প্রাচীন ভারতের অতীত ইতিহাসকে যথোচিত মর্যাদার আসন দান তাঁর সমগ্র জীবনের ইতিহাস-সাধনার লক্ষ্য ছিল। কাশীপ্রসাদের অকাল মৃত্যুতে শুধু বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশ নহে সমগ্র দেশই শোকমগ্ন হয়। কাশীপ্রসাদের দেহান্তের পর তাঁহার বিপুল পুস্তক সংগ্রহ তাঁহার শেষ ইচ্ছানুযায়ী বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করা হয়।

কাশীপ্রসাদের মৃত্যুর কয়েক মাস পর ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বর্তমান কেরল রাজ্যের ত্রিবেন্দ্রম্‌ শহরে নিখিল ভারত প্রাচ্য-বিদ্যা সম্মেলনের নবম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে সুবিখ্যাত ইংরাজ ভারত-বিদ্‌ পণ্ডিত ফ্রেডরীখ্‌ উইলিয়ম টমাস মূলসভাপতি রূপে তাঁহার ভাষণে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস সাধনায় কাশীপ্রসাদের বিপুল অবদানের কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহার অকাল মৃত্যুতে প্রভূত খেদ প্রকাশ করেন।

ইংরাজ শাসনকালের অন্তিমপর্বে উড়িষ্যা একটী পৃথক প্রদেশরূপে গঠিত হইলে বিহার ও উড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটী, বিহার রিসার্চ সোসাইটী নামে পরিচিত হয়, এইভাবে সোসাইটীর জার্নালের নামও পরিবর্তিত হয়। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে বিহার গভর্ণমেন্টের উদ্যোগে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে গবেষণা ও অনুসন্ধান কার্যের জন্য "কাশীপ্রসাদ জয়সোয়াল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট্" নামে একটী গবেষণা কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। বিহার রিসার্চ সোসাইটীর তত্ত্বাবধানে এই প্রতিষ্ঠান বর্তমানে পরিচালিত হইতেছে।

বিহারের বেগুসরাই শহরের গণেশ দত্ত কলেজ সংশ্লিষ্ট প্রত্নবস্তু সংগ্রহশালাটী "কাশীপ্রসাদ জয়সোয়াল মিউজিয়ম" নামে আখ্যাত হইয়াছে।

(১) An introduction to Hindu Polity : A constitutional history of India in Hindu times (2 Vols) ; Calcutta, 1924.

(২) Manu and Jagnavalkya—a Comparision and contrast : a treatise on basic Hindu Law, Calcutta, 1930.

(৩) Rajniti Ratnakar by Chandeswar Thakur. Patna, 1934, Second Edition 1936.

(৪) History of India 150 A. D. to 350 A. D., Lahore, 1933.

(৫) An Imperial history of India in a Sanskrit Text—C 700 BC to C 770 A.D, Lahore, 1934

(৬) A Descriptive catalogue of Sansk. Mss in Mithila. with Ananta Prasad Sastri, Bihar Research Society, Vol-I smriti Mss, Vol-II Literature, Prosody and Rpetoric, 1927

(৭) মাতৃচেতা রচিত অধ্যর্ধ শতক ; নাগার্জ্জুন রচিত-বিগ্রহ ব্যাবর্তনী—J. B. O. R. S, Vol, 23 (Parts 3 & 4)'

(৮) Chronology and History of Nepal, 600 BC to 880 AD, Pub by Bihar Research Society (Vol. 22, Part III)

(৯) Hathi-Gumpha Inscription of the Emperor Khar-Vela (173 BC to 160 BC)—Bihar Research Society.

চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ

রবিশেখর সেনগুপ্ত

শেক্সপীয়র জীবননিষ্ঠ শিল্পী। জীবনের প্রতি অকৃত্রিম আনুগত্যই তাঁর সাহিত্যের মহত্তমতা। ইংলণ্ডের ষোড়শ শতকে যখন বিধান-মানা মানুষ নতুন বিশ্বাসের উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হতে চেয়েছিল, শেক্সপীয়রের লেখনী-আত্মপ্রতিষ্ঠার এই সাধনাকে মাধুর্যে উজ্জ্বল করেছিল। সুতরাং বলা যেতে পারে ষোড়শ শতকে ইংলণ্ডের যে উজ্জ্বলতা, শেক্সপীয়র তার সহজ উত্তরাধিকার।

রবীন্দ্রনাথও এমনি এক সহজ উত্তরাধিকার। উনিশ শতকের বাঙলা দেশ নানাভাবে আমাদের দেশের সংস্কৃতিকে পুষ্ট করেছে। তার দুঃসাহসিক চিন্তাধারা, তার 'সুদূরের পিয়াস' এবং সর্বোপরি সনাতন আচার-বিচার ও বিধিনিষেধের প্রতি অপক্ষপাত, সংস্কৃতিক্ষেত্রে তাকে অনন্য আসন দিয়েছে। মহাকালের শাসনদণ্ড এই চিন্তাধারাকে কিভাবে দেখবে জানা নেই; তবে বাঙলাদেশের তৎকালীন সমাজ-মানসে এ যে এক বিচিত্র আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, সে সম্বন্ধে কোথাও কোন সন্দেহ নেই। উত্তরকালের দূরত্ব থেকে আমরা দেখি, উনিশ শতকের বাঙলাদেশ বাতায়ন খুলে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। সেই খোলা পথে ঝোড়ো বাতাসের মত্ততা যেন অনেক নিয়ন্ত্রণকে বিশৃঙ্খল করেছে, স্থানচ্যুত করেছে অনেক আসন-গেড়ে থাকা সংস্কারকে, তেমনি মন্দ-মধুর বাতাসের সংগে ভিজে শিশিরের গন্ধ, কিংবা কোন নাম-না-জানা ভাবনার ঐশ্বর্যও সে বয়ে এনেছে। যাঁরা এখন ঝোড়ো বাতাসের মত্ততা নিয়ে মাতামাতি করেছিলেন, তাঁরা ভাঙার কাজেই হাত লাগিয়েছিলেন; কিন্তু যাঁরা রত্নভাণ্ডারের চাবিকাঠি হাতে পেয়েছিলেন তাঁরা সাম্রাজ্য আবিষ্কারের মতই আনন্দোৎফুল্ল হয়েছিলেন। সেদিনের সেই উৎফুল্লতা শুধু সেই শতক নয়, বর্তমান কালেরও। চিত্তের দীপ্তি ও বুদ্ধির মুক্তি এই দুই হল উনিশ শতকের বাঙলার শ্রেষ্ঠ অবদান এবং বাঙালী মননে তার প্রতিফলন এক বিস্ময়কর কীর্তি।

বিস্ময়কর কীর্তি কেন সে কাহিনীর জন্য কিঞ্চিৎ অবতরণিকার প্রয়োজন। ফুলের সফলতা ফলে। এই ফুল থেকে ফলের পরিণতি অনিবার্য হলেও, পেছনে প্রস্তুতির ইতিহাস থাকে,—থাকে এক অনুকূল প্রতিবেশ-ক্রিয়া। যে-প্রতিবেশ গড়ে উঠতে সময় লাগে। রবীন্দ্রনাথকে যদি উনিশ শতকের সহজ উত্তরাধিকার বলে মানতে হয়, তাহলে অর্ধশতাব্দী বা তারও অধিককাল বাঙলাদেশ ও বাঙালী মনন, কেমন অনুকূল মানস-প্রতিবেশ (mental background) গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল, তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন।

আমরা দেখি অষ্টাদশ শতকে ইংরেজের প্রভুত্ব দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থায় সমাজের সর্বস্তরে বাঙালী মনন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এই আচ্ছন্নতার ইতিহাস দীর্ঘকালের এবং সাংস্কৃতিক জীবনে এর প্রভাবও অপরিসীম। বুদ্ধির মুক্তি ও জ্ঞানের বিকাশ ছিল না বললেই চলে। বিনয় ঘোষের মতে, কৌলীণ্যের খুঁটি রক্ষা ও কুলের-ভাঙা-গড়ার মধ্যেই বাঙালীর সামাজিক জীবনের সর্ববিধ উৎসাহ নিঃশেষ হত। অর্থাৎ, ধর্ম ও শাস্ত্রের অনুশাসন ব্যতীত মানুষের নিষ্ক্রিয় মন-জলাশয়ে

কোন তরঙ্গ উঠত না। এই ভাঙনের এক পরিপূর্ণ চেহারা দেখতে পাই, বিনয় ঘোষ রচিত 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' গ্রন্থে।

এই প্রত্যক্ষ ও ব্যাপক প্রভাব থেকে মুক্তির সাধনা শুরু হয় অষ্টাদশ শতকের শেষ ও উনিশ শতকের গোড়া থেকে। কেননা বাঙলাদেশে নবযুগের উদ্ভব মোটামুটি উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই। এই সময় থেকেই চিন্তাসাম্রাজ্যে আন্দোলন গড়ে ওঠে একটা নতুন আদর্শ কেন্দ্র করে। সে আদর্শ মানবমুখীনতা (Humanism), যা এতদিন নির্বাসিত ছিল আমাদের চিন্তারাজ্য থেকে। এই নব-উন্মেষিত শক্তির ধাক্কা (Impact) মানুষের মন ও বুদ্ধির জড়তাকে বিমুক্ত করতে অনেকখানি সাহায্য করে। মানুষের এই নব চেতনাকেই ইতিহাসে বলা হয় রেনেসাঁস বা নবজাগরণ। রেনেসাঁসের সর্বশ্রেষ্ঠ দান যদি ব্যক্তিত্ববোধ (Individuality) হয়, তাহলে উনবিংশ শতাব্দীতে এই বোধটিই সবচেয়ে বেশী চেতনা-সম্পন্ন বলে মনে হয়। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী এইভাবেই বাতায়ন খুলে রেখে সনাতন প্রথাবদ্ধতার নিরাপদ সান্নিধ্য থেকে, অসংখ্য ট্যাবুর অন্ধত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করে। ষোড়শ শতাব্দীর ইংলণ্ড যেমন নবভাবনার ঝরণাধারায় স্নাত হয়ে পরিচ্ছন্ন হয়েছিল, উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলাও তেমনি পুরোনো, জীর্ণ আবরণ ছেড়ে নবীন ভাবনার পোষাকে সমৃদ্ধ হয়ে ব্যক্তি চেতনাকে সংস্কৃত করেছিল। অবশ্য বলা চলে, এই আন্দোলনের আশু প্রতিক্রিয়ায় তেমন কোন সুফল দেয় নি। কারণ, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে যা কিছু প্রাচীন, যা কিছু সনাতন তারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে 'ইয়ংবেঙ্গল'দল যা প্রচার করেছিলেন তা উগ্র স্বাতন্ত্র্যবোধ ও বিচারবুদ্ধিহীন স্বাধীনতা ছাড়া আর কিছু নয়। ভরসার কথা, উত্তরকাল এই বিবেচনাহীন তরল-ভাবোন্মাদনাকে সত্যিকার বুদ্ধির মুক্তি বা জ্ঞানের দীপ্তি হিসেবে গ্রহণ করে নি। [বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ-বিনয়ঘোষ]

একথা মনে করা অসঙ্গত হবে যে, বাঙলার দুজন শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক ও সমাজকর্মী রামমোহন ও বিদ্যাসাগর হিন্দুধর্মের সনাতনত্ব রক্ষায় খুব বেশী উৎসাহী ছিলেন। বস্তুত, নানা প্রাণহীন আচারের বাঁধনে সমাজ যে শুধু নিষ্ক্রিয় ছিল তা নয়, সেই আচারের 'চোরাগলি' বেয়ে দুর্নীতি ও ব্যভিচার সমাজের সর্ব অঙ্গে প্রবেশ করে। ফলে এঁদের সামনে ধর্মের যে কাঠামোটি প্রতিভাত হয়েছিল তা যেমন বিশৃঙ্খল, তেমনি ভয়াবহ। এর সমাধান হিসেবে রামমোহন ও বিদ্যাসাগর যে ধর্মসাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তার উদ্দেশ্য মানবমুক্তি। অর্থাৎ নিপীড়িত, উপেক্ষিত এক বিরাট জনসমাজের সামনে লৌকিক আচার ও গতানুগতিক সঙ্কীর্ণতার যে আস্ফালন ছিল, এই দুজন শ্রেষ্ঠ মানবদরদী পণ্ডিত প্রস্তুত জনসাধারণের সামনে থেকে সেই আস্ফালনের অনাদর্শ দূর করেছিলেন আত্মনির্ভরতার আদর্শ প্রচার করে। এই মহান মানবাদর্শ আয়ত্ত করতে তাঁদের যে জ্ঞানবিদ্যার ভিৎ তৈরী করতে হয়েছিল তা পুরোপুরি পশ্চিমী সভ্যতার দান নয়। কারণ, সাগরপারের সেই নতুন ভাবাদর্শের আবেগ-বন্যায় সব সনাতনতাকে পা দিয়ে মাড়িয়ে তাঁরা মত্ত করীর দম্ভোক্তি প্রচার করেন নি। সে ভিৎ তৈরী হয়েছিল রিভাইভ্যালিজম্ এর মধ্য দিয়ে—কারণ পাকা-পোক্ত ক্লাসিকাল বনিয়াদ ব্যতীত এই জাতীয় প্রগতিশীল ও মানব কেন্দ্রিক জীবনাদর্শ গড়ে উঠত না; শুধু অবশেষ থাকত জ্ঞানবিদ্যার ভারটুকু। উত্তরকলে রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও এমনি এক ক্লাসিকাল

বুনিয়াদের সুদৃঢ়তা দেখতে পাওয়া যায়। পশ্চিমী সভ্যতাকে সাগর পার থেকে জাহাজভর্তি করে বয়ে এনে এদেশের মাটি উর্বর করবার বিফল চেষ্টা তিনি করেন নি। যদিও পশ্চিমী রেনেসাঁসের পরিপূর্ণ ফললাভের প্রতিশ্রুতি তাঁর মধ্যে লক্ষিত হয়, তাহলেও গ্রহণনীতিকে তিনি নির্বিচার করেন নি। যে সভ্যতা যখন মানুষের জয়গান গেয়েছে, যখন জ্ঞান ও বুদ্ধির মুক্তির আদর্শ প্রচার করেছে তখন তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। কিন্তু যে সভ্যতা যখন মার্কেণ্টাইল আদর্শে মানুষকে 'রাষ্ট্রিক-হাটের কেনা-বেচার সামগ্রী' করেছে, তখন চরম ধিক্কারে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছেন সনাতন ভারতভূমির মাটিচাপা ঐশ্বর্যের দিকে। সে ঐশ্বর্য পুনরনুসন্ধান করেছেন জনমানসের প্রত্যক্ষ হয়ে। তাই জীবনারম্ভ থেকে তথাকথিত ধর্মসাধনার ভাবাবেগের পরিবর্তে উপলব্ধি করেছিলেন বেদ, উপনিষদের ভাব-গভীরতা। আপনার মধ্যে সঞ্জীবিত করেছিলেন আড়াই হাজার বছর পূর্বে এই সনাতন ভারতের আর একজন যুগন্ধর মহামানবের মানবমুখীন জীবনাদর্শ। বুদ্ধদেব অনুভব করেছিলেন যে, উদার, সর্বজনীন মানবধর্মের উপলব্ধি ব্যতীত মানুষের চিত্তজড়ত্বের অবসান নেই। বুদ্ধদেবের এই 'প্রাপ্তবস্তু মুক্তির পথ' রবীন্দ্রনাথও আত্মস্থ করেছিলেন উত্তরজীবনে। বুদ্ধদেবকে তিনি চিরকালই অন্তরের শ্রেষ্ঠ মানব বলে উপলব্ধি করেছেন এবং বুদ্ধযুগকে অভিহিত করেছেন ভারত-ইতিহাসের একটি প্রধান যুগ বলে। [ভারত-ইতিহাস চর্চা] মোটকথা দেখতে পাই, জ্ঞান-বুদ্ধির প্রথম পদক্ষেপ থেকে এই বদলের কাজটুকুই উত্তরজীবনে তাঁর চিন্তা-ভাবনায় সমগ্রত্বের স্বাদ এনে দেয়। অবশ্য এ কথা যথার্থ তাঁর সাহিত্যিক-কীর্তিতে মাঝে মাঝে যে পরস্পর বিরোধী ব্যক্তিত্বের বিরোধ দেখি, যেখান থেকে উত্তীর্ণ হবার সাধনা তাঁর পরিপূর্ণ সফল হয় নি। কবি, শিল্পী অথবা জীবনরসিক সত্তার সংগে সমাজসংস্কারক ও জাতীয়তাবাদী সত্তার মিলন না হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু মিলন না হলেও সমগ্রতার স্বাদ পেয়ে তাঁর অন্তর্বিপ্লব অনেকখানি প্রশমিত হয়েছিল। মোটকথা আমরা দেখি, উনিশ শতকের বাঙলা দেশ, বাঙলার সমাজ-মানস প্রস্তুত হচ্ছিল এক মহৎ সম্ভাবনার জন্য। সে সম্ভাবনার আবাহন দেখি সমাজজীবনের প্রতি স্তরে-জীবনধারণের প্রতি মুহূর্তে-সৃষ্টির প্রতি পরমাণুতে। রবীন্দ্রনাথ এই নতুন কালের রবি। মানবিক চেতন সম্পন্ন, প্রতীভাদীপ্ত, ব্যক্তিত্বে দৃঢ় এক মহাপুরুষ। "তখন পুরাতন কাল সদ্য বিদায় নিয়েছে; নতুন কাল যবে এসে নামল, তার আসবাবপত্র তখনো এসে পৌছয় নি।" [আত্মপরিচয়]

রবীন্দ্রনাথ যখন জন্মগ্রহণ করলেন তখন রিফর্মেশনের কাজ শুরু হয়ে গেছে। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি ঐতিহাসিক সাল তারিখ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। ১৮১৪ সালের মাঝামাঝি থেকে রামমোহন স্থায়ীভাবে কলকাতায় বসবাস শুরু করেন। রিফর্মেশন বা সংস্কার পর্বের খসড়া হয় 'আত্মীয় সভা' থেকে (১৮১৫)। রামমোহনের 'আত্মীয় সভা'র প্রবর্তন ভারতীয় সমাজ-সংস্কার ইতিহাসে এই অবিস্মরণীয় ঘটনা। কারণ, এই 'আত্মীয় সভা' ও পরবর্তীকালে (১৮২৮) 'ব্রাহ্ম সমাজ' গঠনের সময় থেকে উনিশ শতকের ভারত এক নবজাগরণমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, বিদ্যাসাগরের নাগরিক অর্থাৎ কলকাতা-জীবন শুরু হয় এই ১৮২৮ সাল থেকেই। সে যুগে এবং তৎপরবর্তী যুগে 'ব্রাহ্ম সমাজ' ভারতীয় জীবনযাত্রার এক বৈপ্লবিক

পরিবর্তন এনেছিল। এর পর ১৮৩৯ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের 'তত্ত্ববোধিনী সভা' প্রতিষ্ঠিত হল। এই সভার সংগে সংশ্লিষ্ট থেকে সেকালের সমাজকর্মী ও সংস্কারকরা কদাচার ইত্যাদির আড়ালে নির্বাসিত হিন্দুধর্মের মূলরূপটি জগৎসমুখে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছিলেন। এই পুনরুদ্ধার কাজের বৃহৎ অংশীদার ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁর 'প্রার্থনা সভা'। তারপর এলেন বিদ্যাসাগর এবং সমাজ-মানসে যে রূপান্তর ঘটছিল তার কোথাও কোন অতর্কিততা না থাকায় চষা-জমিনেই ফল-ফলনের কাজ তিনি শুরু করলেন। ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইন পাশ হল। ১৮৬৬ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী বহু বিবাহ রহিত করবার জন্য দ্বিতীয়বার আবেদন পত্র পেশ করলেন বিদ্যাসাগর। ওই বছরেই ১১ই নভেম্বর উন্নতিশীল ব্রাহ্মদল কর্তৃক 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপিত হয়। ১৮৬৭ সালে হিন্দুমেলার প্রথম অধিবেশন হল। এই প্রসঙ্গে অবশ্য ১৮২৭—২৮ সালে ডিরোজিও সাহেব ও তাঁর তরুণ ছাত্রদের উদ্যোগে 'অ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশনের' প্রতিষ্ঠাও উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। তৎকালীন ইয়ং বেঙ্গল নব্য য়ুরোপীয় ভাবনায়, বিশেষ ইংলণ্ডের উনিশ শতকের কবিত্রয় শেলী, কীটস ও বায়রনের নব নব ভাবসমৃদ্ধির সংগে পরিচিত হয়েছিলেন এই এসোসিয়েশনের মাধ্যমেই।

মোটকথা সমাজাদর্শ ও বাঙালীমননের গতিশীলতার এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা কালে যে কথা প্রথমেই মনে হয় তা হ'ল ধারাবাহিকতা। এক বিচিত্র ভাবনা-চিন্তার মহান সম্মেলনের ক্ষেত্রে কোথাও কোন অপ্রস্তুত বাধা ছিল না। ছিল না হঠাৎ প্রেরণা বা আকস্মিকতার ঝোঁক। সুতরাং উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া এই মহান ঐশ্বর্য আত্মস্থ করে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এই মাটিরই সংগে ঘনিষ্ঠ হয়ে; কোন আমদানি ভাবনাকে আশ্রয় করে নয়। বস্তুত, সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীর যে বহমানতা ও কালজয়ী চিন্তাধারার মুখরতায় শতাব্দী স্পন্দিত হচ্ছিল, তার 'নূপুরধ্বনি' শুনতে পেয়েছিলেন এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সচেতন প্রতিনিধি রবীন্দ্রনাথ। পরবর্তী-কালে, আমরা দেখি, এই চিন্তাধারাকে আত্মস্থ করে আমাদের ব্যবহারিক উপলব্ধির সব সীমাকে ছাড়িয়ে উঠে যথার্থ অগ্রজের আসন অলঙ্কৃত করেছেন তিনি। তাই রবীন্দ্রনাথ শুধু এই শতাব্দীর প্রতিনিধি নন, তিনি চিন্তানায়ক।

রবীন্দ্রনাথের জন্ম জোড়াসাঁকো প্রাসাদমালায়। পিতামহ দ্বারকানাথ লক্ষ্মীর আশীর্বাদপুষ্ট যে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিজাত কী ঐশ্বর্যে, কী শিক্ষা-সংস্কৃতিতে, কী কৌলীন্যে। সেই বিশাল ঐশ্বর্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ লক্ষ্মীর বরপুত্র ছিলেন না। কারণ, রবীন্দ্রনাথ 'ধন বা ধনের স্মৃতির মধ্যে' জন্মান নি। [আত্ম-পরিচয়] তবে ধনভাণ্ডারের পুষ্টি না হলেও মহর্ষির আভিজাত্য ক্ষুণ্ণ হয় নি। তৎকালীন সমাজে দেবেন্দ্রনাথের অনুরূপ ভাবনা-চিন্তায় সমৃদ্ধ ও অভিজাত পুরুষ সত্যই বিরল। তাই রবীন্দ্রনাথ যে পরিবারে জন্মালেন যে পরিবার অর্থকৌলীন্যে ক্ষীণস্রোত হলেও, অনভিজাত হয় নি। বরং বলা চলে, বাঙলাদেশের সংস্কৃতি-সাম্রাজ্যের সম্রাটরূপেই যে পরিবারের ঐতিহাসিক পরিচয়। এই ভাবে বাল্য ও কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনের প্রথম প্রহর অব্দি এই প্রাসাদমালার অভিজাত আবেষ্টনীর মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের কালাতিপাত হয়। এই কালাতিপাত অবশ্যই আড়ষ্ট দিনযাপন

নয়। কারণ, জীবন সংগ্রামের মহার্ঘ্য অভিজ্ঞতাকে যথার্থ জীবনদর্শন বলে মনে করতেন তিনি। তবে 'বিপুলা পৃথিবীর' বিরাট আবরণমোচন তখনও হয় নি। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া মননশীলতা ও চিন্তাধারাকে দৃষ্টিশক্তির সজাগ স্বচ্ছতা পরিমার্জিত ও পরিচ্ছন্ন করে নি। জনসমাবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে পড়ুয়ার দৃষ্টি দিয়ে জগৎকে দেখাবার ও চেনবার পালা তখন চলছিল। এই জগৎ-দর্শন অনেকখানি কৃত্রিম (sophisticated)। অবশ্য এই সময়েই মাত্র সতেরো বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ যাত্রা করেন। ১৮৮১ সালে প্রকাশিত হয় 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র'। সীমাবদ্ধ, অভিজাত আবেষ্টনী থেকে হঠাৎ মুক্তির উচ্ছ্বাসে অভিভূত হলেন রবীন্দ্রনাথ। হর্ষোৎফুল্ল বিহ্বলতায় চেয়ে দেখলেন জড়বাদী মার্কেণ্টাইল সভ্যতার রূপ। সেখানে, 'বড়ো বড়ো বাড়ি, বড়ো বড়ো কারখানা, নানা আমোদের জায়গা ; লোক চলছে ফিরছে, যাচ্ছে আসছে ; খুব একটা সমারোহ। সে যতই বিচিত্র, যতই আশ্চর্য হ'ক না কেন, তাতে দর্শককে শ্রান্তি দেয়'। (য়ুরোপযাত্রা) বাণিজ্যিক এই সভ্যতার রূপ অনেকখানি বাহ্যিক আড়ম্বরের দিকে ঝোঁক দেওয়া। আপামর জনসাধারণকে যে ঐহিক সুখ দিয়েছে, 'বিস্ময়ের আনন্দ' দিয়েছে, চাওয়ার বস্তু সহজ লভ্য করে নব নব আবশ্যক বোধের পরিচর্যা করেছে। তার বদলে কেড়ে নিয়েছে মানবিক অধিকার। মানুষকে কেন্দ্র করে খুলেছে 'পুতুলবাজীর কারখানা'। ['বিবেচনা ও অবিবেচনা'] রবীন্দ্রনাথের চোখে এ এক অভিনব দৃশ্য। সেই প্রথম তিনি অনুভব করলেন, 'উপচেতন লোকের অন্ধকার' ও অস্পষ্টতা থেকে উদ্ভূত হচ্ছে 'চেতন-লোকের আলো'। যে আলোর দ্যুতি রবীন্দ্রমানস উজ্জ্বল করে রেখেছিল আজীবন। রবীন্দ্রনাথ দেখলেন ইওরোপের মার্কেণ্টাইল সভ্যতা ঐহিক সুখ আর ভোগ-রাজ্যের সীমানা প্রশস্ত করেছে, কিন্তু খণ্ড উপকরণ নিয়ে জীবনের ফাঁক ভরাতে পারে নি। উত্তর জীবনে এই সব উপকরণগুলো একত্র করে রবীন্দ্রনাথ দেখলেন, আধুনিক সভ্যতা, যার ছোঁয়ায় প্রাচ্যদেশও প্রভাবিত, সে যে বস্তুর চর্চা করছে তার নাম আরামের প্রতিযোগিতা। এদেশে ওদেশে জুড়ে এই অনাদর্শনের তাণ্ডবনৃত্য। অথচ প্রাচীন ভারত এই ভাবে ঐহিক আরাম খোঁজার জন্য স্বর্ণমৃগের পেছনে ছোটেনি। সে মুহূর্তকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে চিরন্তনকে পাবার জন্য। সুখকে ছাড়ে নি তবে তাকে একচ্ছত্র সম্রাট হতে দেয় নি। 'আত্মপরিচয়ে কবি লিখছেন,—'আমি জানি সুখ প্রতিদিনের সামগ্রী, আনন্দ প্রত্যহের অতীত। ......সুখ সুবিধাটুকুর জন্য তাকাইয়া বসিয়া থাকে ; আনন্দ দুঃখের বিষকে অনায়াসে পরিপাক করিয়া ফেলে ; এইজন্য কেবল ভালোটুকুর দিকেই সুখের পক্ষপাত—আর আনন্দের পক্ষে ভালো-মন্দ দুই-ই সমান।"

রবীন্দ্রনাথ এইখানেই ক্লাসিসিষ্ট। তাঁর ক্লাসিকাল বনিয়াদের ভিত দৃঢ় ও পোক্ত করতে তাঁকে বেদ-উপনিষদের ভাব গম্ভীর ও ঋষি-প্রতিম আদর্শে প্রবেশ করতে হয়েছিল। 'শ্রীরামচন্দ্রের' আদর্শে মানবিক চরিত্র গঠন ও সমাজাদর্শ গড়ে তুলবার জন্য পশ্চাদানুসরণ করতে হয়েছিল। এই পশ্চাদানুসরণ যদি মানবমুখীন হয় তবেই প্রকৃত প্রগতিবাদ গড়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের জীবনাদর্শ মানবকেন্দ্রিক। তাই তিনি প্রগতিবাদী, প্রতিক্রিয়াশীল নন।

রবীন্দ্রনাথের মঙ্গল ইচ্ছা শুধু যে এই ভাবে আনন্দের বস্তুকে প্রতিদিনের তুচ্ছতার মধ্য

থেকে আহরণ করে নিয়েছে তা নয়; যেখানে মূর্খতা, যেখানে চিন্তাদীনতা আর আত্মাবমাননা সেখানেই মহত্তম প্রেরণা যুগিয়েছে। জীবনকে মহান করে ভাবতে হলে যে চিন্তাসামগ্রীর প্রয়োজন তার যোগান দিয়েছে। ভালো, মন্দ নিয়েই এই জীবন। সত্য বলে যদি মানতে হয়, তাহলে শুধু 'ভালো' অথবা 'মন্দ'কে মানা নয়। এদের অতীত যে জীবন আনন্দসন্ধানী তাকে মানা। যে মানা 'না' নয় 'হঁা'। 'সকল বিধিনিষেধের উপরে' তার স্থান। জীবনের জয়যাত্রার প্রথম লগ্নে বিপুল, বিচিত্র মানুষ যেদিন সব বিচিত্রতা হারিয়ে তাঁর মানসদৃষ্টিতে ভিড করে দাঁড়ালো, সেদিন বিমূঢ় বিস্ময়ে তিনি দেখেছিলেন মানুষ অধীন। অধীনতার কোন পৃথক রূপ নেই। যেমন রাষ্ট্রের, যেমন সমাজের তেমনি প্রবৃত্তির। অন্তরে ও বাইরে এই বন্দীত্ব তার মানসিক ধনভাণ্ডার শূন্য করে তাকে সর্বহারা করেছে। 'ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির মূক সবে' ওদের 'ম্লানমুখে' যা লেখা আছে তা হল এই শতাব্দীর ক্রন্দন। জগৎ জুড়ে এই এই হতাশ, জীবনদ্বেষী সর্বহারা মানুষের দল। এ যেন এক অভিশপ্ত মানুষের প্রাণহীন, গতিহীন মিছিল। টি. এস. এলিয়টের ভাষায়—'Shape without form, Shade without Colour, Paralysed force, Gesture without motion.' মানুষ যেন শুধু খাটবার, সংসার-ধর্ম পালন করবার একটা যন্ত্র বিশেষ।

রবীন্দ্রনাথ ব্যথিত হয়েছিলেন কালের অনন্তর-যন্ত্রণা উপলব্ধি করে। সর্বহারা মানুষের কপালে ভাগ্যের লিখন যে যন্ত্রণায় এঁকে দিয়ে গেছে তাকে আত্মস্থ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ সচেতন জীবনশিল্পী রূপে। সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথের গোত্রান্তর-ভূমিকা কোন সাল-তারিখের হিসেবের মধ্যে পড়ে না। কারণ, কোন অতর্কিত ভাবাদর্শের নির্দেশে সে গোত্রান্তর হয় নি। রবীন্দ্রনাথ আজীবন জীবন-নিষ্ঠ শিল্পী, মানবপ্রেমিক কবি। এ ভাবোত্তমতা তাঁর একান্ত; জ্ঞান-বুদ্ধির প্রথম পদক্ষেপ থেকে শুরু করে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অন্তর্লোকের এই দীপ্যমান আলোয় তিনি উদ্ভাসিত। সব রকম আচ্ছন্নতাকে মুক্ত পুরুষের মত এমন সক্রিয়ভাবে কাটিয়ে উঠতে পারার মধ্যে যে গভীরতা, সে গভীরতা আকস্মিক নয় তা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া।

অবশ্য উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যে সংস্কারকর্মের ধারাবাহিকতা রবীন্দ্রমানসকে প্রভাবিত করেছিল—যে সংস্কার-পর্বের প্রথম পথিকৃৎ রাজা রামমোহন, সেই সংস্কারকর্মের বহিরঙ্গের প্রত্যক্ষতা থেকে উত্তর জীবনে তিনি অনেকখানি সরে এসেছিলেন। রামমোহনের একটা বিশিষ্ট ধর্মমত ছিল, যে ধর্মের তিনি প্রবর্তক ও প্রচারক। দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ও স্বাধীনচেতা এই মানুষটি অনুমান করেছিলেন যে তৎকালীন সমাজের অবক্ষয় রোধ করতে হলে ধর্মমতের নতুন ব্যাখ্যা চাই। যে ব্যাখ্যায় মানুষের স্বীকৃতি থাকবে। রামমোহন এই ভাবেই ধর্মমতের নতুন ব্যাখ্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছেন। রামমোহনের এই ভূমিকাটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম বৈষয়িক জ্ঞানের ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু রামমোহনের যে ধর্ম সমন্বয়ের পথ, রবীন্দ্রনাথ যে পথে অগ্রসর হন নি। আত্ম পরিচয়ে তিনি বলছেন, 'ঠিক যাকে সাধারণ ধর্ম বলে সেটা যে আমি আমার নিজের মধ্যে সুস্পষ্ট দৃঢ়-রূপে লাভ করতে পেরেছি, তা বলতে পারি নে। কিন্তু মনের ভিতরে ভিতরে ক্রমশ যে একটা সজীব পদার্থ সৃষ্ট হয়ে উঠছে, তা অনেক সময় অনুভব করতে পারি'।

অর্থাৎ, 'সজীব পদার্থ' এমন একটা প্রেরণা যা ক্ষয় করে না, যা বিকশিত হতে সাহায্য করে। রামমোহনের ধর্মান্দোলন মানুষকে স্বীকার করেছে, 'জগৎ মিথ্যা, চেতনাই সত্য' এই মনোভাবের মূলোচ্ছেদ করেছে। সে আন্দোলন মানুষকে বাদ দিয়ে চেতনাকে সর্বস্ব করে গড়ে ওঠে নি। রামমোহনের পরবর্তী যুগে বিদ্যাসাগর এই মানবমুখীন আদর্শকে আরো বিস্তৃত, আরো প্রত্যক্ষ করে তাকে ব্যবহারিক পর্যায়ে এনে ফেলেছিলেন। শিক্ষা বিস্তার ও সমাজ সংস্কারের মধ্য দিয়ে এই বাহ্যিক (External) বিপ্লব উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ চিন্তান্দোলন। কিন্তু এই চিন্তান্দোলনের প্রকৃত উত্তর সাধক হয়েও এদের থেকে স্পষ্টতর ভিন্ন রবীন্দ্রনাথ। কারণ রামমোহন যেখানে ব্যর্থ সেখানে তিনি প্রচারক। প্রচার ধর্মে প্রেরণার বাণী থাকে না। রবীন্দ্রনাথ মহান শিল্পী (Great Artist) তাই তিনি প্রেরণাদাতা। আমাদের সব উপলব্ধির, সব অনুভবের অভিব্যক্তি রবীন্দ্রমানসে।

রামমোহনের ধর্মান্দোলন অনুসরণ করে রবীন্দ্রনাথ যদি ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতেন, তাহলে হয়ত তাঁকে নেতিবাচক ধর্মগুরু হিসাবেই পেতুম। সমাজের পাপক্ষালন, চৈতন্যহীন অন্ধ মানুষকে চৈতন্যদান, অথবা আকার-নিরাকার তর্ক কণ্টকিত নানা মত ও পথের সন্ধান দিতেন। সে ক্ষেত্রে দূরের মানুষ হয়ে উদাসীন তত্ত্বজ্ঞানীর ভূমিকায় পুজা পেতে পারতেন, কিন্তু কাছের লোক হয়ে ভালোবাসা পেতেন না। 'আমি তত্ত্বজ্ঞানী, শাস্ত্রজ্ঞানী গুরু বা নেতা নই'। [আত্মপরিচয়] রবীন্দ্রনাথ যখন বললেন, 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়', তখন তিনি জীবন শিল্পী, জীবন রসিক কবি হিসাবেই বললেন। তত্ত্বজ্ঞানী প্রচারক হিসেবে নয়। জীবনের মুক্তি জীবনবৈরাগ্যে নয়, মুক্তি স্বার্থবৈরাগ্যে। বুদ্ধদেব একদিন রাজ্যসম্পদ সমস্ত ছেড়ে কঠোর তপস্যার পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে, অন্তরে সত্য বস্তু যাচাই করে ফিরে এসেছিলেন মানুষেরই সমাজে। মুক্তির বাণী নিয়ে। জনচিত্ত যে রস আহরণ করে বেঁচে থাকে, তার শিকড় থাকে মাটির নিচে। রবীন্দ্রনাথ সেই শিকড়কেই আঁকড়ে ধরে জনচিত্তে আশ্বাস সঞ্জীবিত করার ব্রত নিয়েছিলেন। এই আশ্বাসটুকু গড়ে নিতে কোন বিশেষ ধর্ম বা তত্ত্বকে উপজীব্য করতে তাঁকে হয় নি। জীবনকে ভালোবাসা, জীবনের প্রতি বিরূপ মনোভাব দূর করা এবং তাকে কোন আচার, ধর্ম, জাতি বা দেশের সীমায় বেঁধে না রেখে, তাকে বিশ্বসত্তার আনন্দময়তার সংগে প্রত্যক্ষ করানোর সাধনাই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যায়ন। 'নবযুগ' প্রবন্ধে তিনি বলছেন, 'যে মানব ধর্ম সকল নিরর্থক আচারের বহু উর্ধে', তাকে তথাকথিত 'আচারীদের' হাতে দণ্ড পেতে হবে এ যেন তাঁর কল্পনাতীত। এই বোধের বিশালতা কোথাও ক্ষুণ্ণ নয়, তা যেমন বিরাট, তেমনি বিচিত্র।

এই বিশালতার উপলব্ধি থেকে শুধু দেশ বা জাতি নয় কালকেও অতিক্রম করেছেন রবীন্দ্রনাথ। হাজার হাজার বছরের এক ট্রাডিশন আমাদের এই লীলাভূমির মর্মস্থান অধিকার করে আছে। যে ট্রাডিশন মিলনমূলক। ইওরোপীয় নেশনতন্ত্রের অনিবার্য ফল 'বিরোধ' নয়। পাশ্চাত্য সভ্যতা যেখানে জ্ঞান-বুদ্ধির মুক্তি দিয়ে মানুষকে প্রধান করেছে সেখানে তিনি তাকে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু যেখানে প্রতিযোগিতা করে, তর্ক করে, বিরোধ করে আপন মাহাত্ম্য

প্রচারের চেষ্টা করেছে সেখানে তাকে বর্জন করেছেন। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্রীয় স্বার্থের ক্রমবর্ধমান চেহারার দিকে তাকিয়ে আর্তনাদ করে বলেছেন, 'সে ক্রমশই স্পর্ধিত হইয়া ধ্রুবধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত। এখন গত শতাব্দীর সাম্য-সৌভ্রাত্রের মন্ত্র য়ুরোপের মুখে পরিহাস বাক্য হইয়া উঠিয়াছে'। এই গ্রহণ বর্জন নীতির পরিমিতিবোধ রবীন্দ্রনাথের মানস-সমৃদ্ধির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কোন বিশেষ ধর্ম, আচার অথবা অনুষ্ঠানের গণ্ডী দিয়ে সে সমৃদ্ধির পরিমাপ হয় না। সেখানে যা সত্য তা হল মানবিক বিশ্বের উপলব্ধি। স্বধর্ম বা পর ধর্মের কোন ক্রিয়াকলাপ বা আচার বিচার নয়। এই বোধের প্রেরণাই গত শতাব্দীর স্বদেশীয়ানার কলরব থেকে রবীন্দ্রনাথকে অমন স্বতন্ত্র করেছিল।

পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের ধিক্কার ঠিক সেখানেই প্রবলতম যেখানে 'নেশন' তত্ত্বের যূপকাষ্ঠে অতি সহজ বলি হল মানুষ। সভ্যতার এই অনাদর্শ জগতের সমস্ত চিন্তান্দোলনকে অগৌরবান্বিত করেছে। কিন্তু প্রশ্ন হল এই নেশনতত্ত্বই কি সভ্যতার প্রকৃত আদর্শ? এ জিজ্ঞাসা রবীন্দ্রনাথেরও ছিল। কিন্তু কবিমানসে এই জিজ্ঞাসার যথোচিত মুদ্রাঙ্কনের পূর্বেই তাঁর চারিত্র-আদর্শ বিশালায়তন মানবিক বিশ্বের প্রতিশ্রুতি প্রত্যক্ষ করেছিল। তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন যথার্থ সভ্যতা মানুষে-মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিযোগিতায় নয়, সে সভ্যতা মুক্তিতে। সাংসারিক বা রাষ্ট্রীক বা ধর্মের যে কোন আবশ্যকতার নির্দেশে মানুষকে পরিচালিত করবার নির্বিচার অধিকার যাঁদের করায়ত্ত, তাঁরা রাষ্ট্রের খাতিরে হোক, ধর্মের খাতিরে হোক অথবা গার্হস্থ্য জীবনের খাতিরে হোক সব অবস্থাতেই মানুষকে ক্রীড়নক করেছেন। মানুষের এই সহায়-সম্বলহীন অবস্থাই এযাবৎকাল তথাকথিত সভ্যতার মূল আশ্রয়। এই আশ্রয়ের প্রতিষ্ঠা কোন বিশেষ ধর্ম বা রাষ্ট্রব্যবহারে নয়, এর প্রতিষ্ঠা স্বার্থে। মানুষকে যথার্থ মুক্ত বা যথার্থ স্বতন্ত্র হতে অবিরাম বাধা দিচ্ছে এই স্বার্থবোধ। তাই রবীন্দ্রনাথ সভ্যতাকে অগৌণ করে গাইলেন মানুষের জয়গান। যে মানুষ সভ্যতা সৃষ্টি করেছে সেই মানুষকে যদি বলা হয়, 'তুমি শক্তি চালাইয়ো না, বুদ্ধিও চালাইয়ো না, তুমি কেবলমাত্র ঘানি চালাও,' তাহলে তেমন বিধান মানুষ মেনে নেবে না। 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'পৃথিবীর সমস্ত বড় বড় সভ্যতাই দুঃসাহসের সৃষ্টি। শক্তির দুঃসাহস, বুদ্ধির দুঃসাহস, আকাঙ্খার দুঃসাহস। শক্তি কোথাও বাধা মানিতে চায় নাই বলিয়া মানুষ সমুদ্র-পর্বত লঙ্ঘন করিয়া চলিয়া গিয়াছে। বুদ্ধি আপাত প্রতীয়মানকে ছাড়াইয়া অন্ধ সংস্কারের মোহজালকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া মহৎ হইতে মহীয়ানে, অণু হইতে অনীয়ানে, দূর হইতে দূরান্তরে, নিকট হইতে নিকটতমে সগৌরবে বিহার করিতেছে। ব্যাধি, দৈন্য, অভাব, অবজ্ঞা কিছুকেই মানুষের আকাঙ্খা অপ্রতিহার্য মনে করিয়া হাল ছাড়িয়া বসিয়া নাই; কেবলই পরীক্ষার পর পরীক্ষা করিয়া চলিতেছে।'

আমরা রবীন্দ্রনাথের এই আশ্বাসবাণী শুনি কারণ, কালের এই নির্মম বেদনা, এই আন্তর-যন্ত্রণাকে তিনি আত্মস্থ করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন সর্বহারা মানুষ ভীত চকিত হয়ে আশ্বাস ভিক্ষা করছে। তাদের কোন ফরমাইস নেই, কোন আবেদন নেই। তারা এ কালের কারখানায় তৈরী মানুষ-পুতুল—নির্দেশ-মানা, নিষেধ-মানা, বিধান-মানা। যেখানে খ্যাতির,

'প্রতিষ্ঠার হরির লুট' যেখান থেকে তারা নির্বাসিত। তাদের আত্মপ্রকাশ নেই, ইচ্ছা নেই। তাদের জীবনের পথ নির্দিষ্ট এবং সেই নির্দিষ্ট পথ থেকে সরে এসে জীবনের লীলাক্ষেত্রে প্রবেশের অধিকার থেকেও বঞ্চিত। কবির কল্পনায় তারা যথার্থই পারালাইজ্‌ড্‌ ফোর্স— জাতহীন, ধর্মহীন।

এমন 'ব্রাত্য, জাতিহারা' যুগযন্ত্রণাধারী মহাপুরুষ কে আছেন যিনি বহিরঙ্গের সংস্কারক মাত্র নন্‌? নন্‌ রাষ্ট্রীক হাটের কেনা-বেচাকারী মহাজন? তেমন মানুষ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বিপুলায়তন বিরাট আকাশের মতই তাঁর উদারতা। ঈশান কোণের কালো মেঘের মতই তাঁর অনুভূতির ব্যাপ্তি। সেই গভীরতার কাছে মানুষের পরিচয় তুচ্ছতার মোড়কে ক্ষিন্ন নয়। মানুষ স্বতন্ত্র, আপন মহিমায় উজ্জ্বল। বিচিত্রতার নানা উপকরণে সে পূর্ণ। সে মহান। খণ্ড নয়, আংশিক নয়। সে সমগ্র, সে শিবম্‌। শেক্সপীয়র বলেছেন, 'What a piece of work is man',— নানা খণ্ডকাল অতিক্রম করে অপ্রতিরোধনীয় মহাকালের সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'যাঁরা আমাকে কিছুমাত্র জানবার চেষ্টা করেছেন এতদিন, অন্তত তাঁরা এ কথা জেনেছেন যে, আমি জীর্ণ জগতে জন্মগ্রহণ করি নি।'

বিশ্ববাসী মানুষের দোসর হলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি জীর্ণতা বিশ্বাস করেন না কারণ তা নশ্বর। যা অবিনশ্বর তার নাম আনন্দময়তা। তাই অন্তরের ঐশ্বর্যরাশি হারিয়ে মানুষ যখন রিক্ত, সর্বহারা তখন সে কোন বিশেষ জাতি বা ধর্মের দোসর নয়। ধরণীর মহাতীর্থে সে একাকী। তার কপালে ভাগ্যের লিখন দিয়ে গেছে এই কালের যন্ত্রণা। রবীন্দ্রনাথের উদ্যত তর্জনী সংস্কারকের ভূমিকায়, ধর্মগুরুর উদাসীনতায় এই রিক্ততাকে যন্ত্রস্থ করে নি। তাকে মহৎ করেছে আনন্দের পঙক্তিভোজে সরাসরি আমন্ত্রণ জানিয়ে। রবীন্দ্রনাথ এইখানেই ঘনিষ্ঠ মানবদরদী। তাঁর সাহিত্য গরজের তাড়ায় লেখা নয়, নয় উপদেশের বাণীতে ঠাসা। সে সাহিত্য প্রীতির সৌরভে ভরপুর। এই সুরভি দেশ জাতির সীমা অতিক্রম করে যুগচিত্ত মুখর করেছে। জনচিত্তে কত অসংখ্য অনুভবের দোলা। কিন্তু সবেরই স্পন্দন বিশালায়তন রবীন্দ্রমানসে। তাই সুখে, দুঃখে, শোকে, তাপে, আনন্দে আমাদের তামস প্রকৃতি যুগে যুগে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যভাণ্ডার থেকে রত্ন আহরণ করে ধন্য হবে, অনুপ্রাণিত হবে, মহৎ হবে।

রামানন্দ জয়ন্তী

কমল চৌধুরী

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় একজন আদর্শবাদী নির্ভীক ও দুঃসাহসী সাংবাদিক হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। বাঙালীর অতীত গৌরব এবং বর্তমান চিন্তাধারাকে সম্মুখে রেখে তিনি তাঁর সুদীর্ঘ সম্পাদক জীবনের দায়িত্ব পরম নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে গেছেন। মানবতার সপক্ষে তার বলিষ্ঠ লেখনী আমৃত্যুকাল প্রচার করে গেছে। পরাধীন ভারতের মুক্তির জন্য রামানন্দ প্রতিরোধ ও বিপদের সম্মুখীন হয়েও তাঁর পত্রিকাগুলিতে বিভিন্ন বিষয়ে লিখে স্বদেশবাসীকে সচেতন করেছিলেন। বিশ্বের দরবারে ভারতের বাণী ও আদর্শ পৌঁছে দিয়েছেন। আত্মবিশ্লেষণে তিনি পরাঙ্মুখ ছিলেন না বলেই, নিজেদের দোষ ত্রুটি মুক্তমনে স্বীকার করে গেছেন। তাঁর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় বহু লেখকের আবির্ভাব ঘটেছে; বহু বাঙালী উন্নতির চরম শিখর দর্শন করতে পেরেছেন। রামানন্দের হাতে বাঙলাদেশে সাংবাদিকতার যে যুগের সূচনা ঘটেছিল, তা আজকের মানুষ প্রায় বিস্মৃত। তাঁর জন্মশতবর্ষ পালিত হচ্ছে। এই শতবর্ষের আলোকে একজন শ্রেষ্ঠ বাঙালীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনে যেন আমরা কার্পণ্য না করি।

এই অসামান্য মনীষাদীপ্ত ব্যক্তিত্বমণ্ডিত মানুষটি একদা সমগ্র ভারতব্যাপী এক তীব্র আলোড়নের সূচনা করেছিলেন। শিল্প সাহিত্য, অর্থনীতি, জাতীয় সমস্যা প্রভৃতি প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে তিনি গভীরভাবে পড়াশুনা করেছিলেন এবং লিখেছিলেন। ভারতের প্রতিটি সমস্যা উপলব্ধি করে তাকে ভাষার মাধ্যমে সকল মানুষের মধ্যে প্রচার করেছেন সংবাদপত্রের মারফতে। স্বজাতির প্রতি গভীর প্রেমবোধ এবং দেশকল্যাণব্রত তাঁকে সমস্ত জীবন উদ্দীপিত করেছিল। তাঁর ছিল একটি আদর্শ; যা কোনদিন কোনভাবে পরিবর্তিত হয়নি। সে আদর্শ ছিল রামমোহনের দ্বারা অনুপ্রাণিত। তিনি যা বলতেন সাবধানে বলতেন এবং যুক্তি দিয়ে সংযতভাবে উপস্থিত করতেন। সংবাদপত্রে অভদ্রতা বা কেচ্ছা প্রচারের তিনি ছিলেন বিরুদ্ধে। রামানন্দ চেয়েছিলেন ভারত বাণীর মঙ্গল। ছাত্রাবস্থা থেকেই নানান প্রবন্ধ লিখেছেন। 'দাসী'তে একা দেড়বৎসর লিখেছেন—নিজের আদর্শ প্রচার করেছেন। কিন্তু তাকে সম্পূর্ণ রূপ দিতে পারেন নি। ক্রমে প্রকাশিত হয়েছে প্রদীপ-প্রবাসী-মডার্ণ রিভিয়ু। বাঙলা ও ইংরেজি উভয় ভাষাতেই ছিল তাঁর সমান দক্ষতা। রামানন্দ ছিলেন শিল্প রসিক মানুষ। তাঁর সম্পাদিত প্রতিটি পত্রিকায়ই তার ছাপ ছিল।

অভাব, দুঃখের শেষ নেই। অনাহার, অর্থাভাব, খাদ্যাভাব, নিরক্ষরতা, রোগ, অমানবিকতা, প্রেমহীনতা, অন্যায়, অবিচার, সামাজিক অনাচার, বিদ্বেষ প্রভৃতি এমনভাবে ভারতের জনজীবনে শিকড় গেড়ে চলেছে যা কয়েক শতাব্দীতেও দূর হবে কিনা সন্দেহ। গত শতাব্দীতে কয়েকজন মহৎপ্রাণ মানুষ এই সমস্ত দুষ্ট গ্রহের বিরুদ্ধে অক্লান্ত সংগ্রাম করে গেছেন। তাঁদের মধ্যে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য।

রামানন্দের ৭৮ বৎসর বয়স পূর্তি উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন স্থান ও প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁকে সম্বর্ধনা জানান হয়। রামানন্দের শরীর তখন ভেঙে পড়েছে। প্রায় শয্যাগত। বাহিরের কোন অনুষ্ঠানে যোগদান করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সম্বর্ধনা জানাবার তোড়জোড় চলেছে। তাঁর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ভারতীয় সংবাদপত্র সেবী সংঘ, বিশ্বভারতী, বাঁকুড়া-সম্মিলনী, রামানন্দ-জয়ন্তী-কমিটি, শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ, নিখিল ভারত অন্ধ-আলোক নিকেতন এবং বাঙলাদেশের ও ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে মানপত্র প্রদান করে অভিনন্দিত করা হয়। তাঁর সুদীর্ঘ কর্মজীবন এবং দেশসেবার প্রতি দেশবাসীর সম্মান প্রদর্শন তাঁকে উদ্দীপ্ত করেছিল। অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে তিনি আন্তরিকভাবে সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

প্রদত্ত অভিনন্দন পত্রের কয়েকটি এখানে উদ্ধৃত হল :

২রা জ্যৈষ্ঠ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষথেকে রামানন্দকে সম্বর্ধনা জানান হয় তাঁর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হয়ে। স্যর যদুনাথ সরকারের নেতৃত্বে শ্রীশচন্দ্র নন্দী, প্রফুল্লকুমার সরকার অন্যান্য সদস্য সেই সম্বর্ধনায় উপস্থিত ছিলেন। চন্দনকাঠের সুদৃশ্য একটি বাক্সে সে মানপত্র দেওয়া হয়—

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

হে প্রবীণ কর্ম্মী, নির্ভীক যাত্রীরূপে সুদীর্ঘ জীবনের পথ চলিতে চলিতে আপনি কেবলমাত্র দেশের এবং দশের কল্যাণের কাজই করিয়াছেন, বিশ্বের মানুষকে সত্য, শিব ও সুন্দরের সন্ধান দিয়া তাহাদের কল্যাণ সাধনের মন্ত্রই প্রচার করিয়াছেন। আপনার বাণী শুধু আপনার জন্মভূমি বঙ্গদেশেই আবদ্ধ থাকে নাই, ভারতের সকল প্রদেশের অধিবাসীই আপনার সেই বাণী শুনিয়াছেন। আপনি সকলের হিতের জন্য সমভাবে সাধনা করিয়াছেন। ভারতের বাহিরে বিশ্বজগতে আপনার লেখনী মানবতা, স্বাধীনতা, উদার বিশ্বধর্ম্ম এবং প্রকৃত কলাজ্ঞানের বার্ত্তাবহন করিয়াছে। সেই বাণী সমগ্র পৃথিবীর গুণীজন সাদরে স্বীকার করিয়াছেন।

আপনি চিরজীবন অসত্য, অবিচার ও অশুচির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছেন। এই সংগ্রামে অনেক সময়ে আপনাকে একক দাঁড়াইতে হইয়াছে; অনেক ক্ষতি, অনেক অসম্মান আপনাকে সহ্য করিতে হইয়াছে; তথাপি আপনি ক্ষণকালের জন্য কর্ত্তব্য হইতে বিচলিত হন নাই।

আজ আপনি কর্মজীবনের প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, আমরা আপনাকে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি। আপনার ক্লান্তিহীন জীবনের বহুবিধ কাজের মধ্যে বঙ্গ ভাষায় সাময়িক সাহিত্যে আপনার অতুলনীয় দান স্মরণ করিতেছি। অর্দ্ধ শতাব্দীরও অধিক কাল ধরিয়া 'দাসী', 'প্রদীপ' ও 'প্রবাসীর সাহায্যে সাহিত্যে সেই সত্য, শিব ও সুন্দরের পূজা আপনার স্মরণীয় কীর্তি; আজ বঙ্গ দেশের শত শত সাংবাদিক লেখকের আপনি কুলপতি—প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে তাঁহারা আপনার শিষ্য, আপনার আদর্শে অনুপ্রাণিত; বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ আপনার নিকট বন্ধু ভাবে ঋণী—আপনার ঐকান্তিক সেবা ইহার বর্তমান প্রতিষ্ঠার অন্যতম কারণ।

সাহিত্য-সেবার বাহিরেও স্বদেশবাসীর স্বার্থ ও সম্মান রক্ষা এবং জাতীয় উন্নতির জন্য আপনি আজন্ম চেষ্টা করিয়াছেন, রাজরোষ উপেক্ষা করিয়া বারম্বার ভারতের স্বাধীনতার দাবি জানাইয়াছেন, আপনার জীবন চিরদিন আগত ও অনাগত দেশপ্রেমিকের আদর্শস্থল হইয়া থাকিবে। আপনি ফলের আকাঙ্খা না করিয়া কর্ম-সাধনা করিয়াছেন। আমরা আপনাকে প্রণাম জানাইতেছি। আপনার জীবন দূর ভবিষ্যতেও তরুণ সমাজকে উদ্‌বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করুক, সকলকে কর্তব্যনিষ্ঠ করিয়া তুলুক।

আপনার গুণমুগ্ধ ঋষি রবীন্দ্রনাথ আপনাকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বলিয়া জ্ঞান করিতেন। কোন পার্থিব সম্মান অথবা সম্পদ্ ইহা অপেক্ষা আপনার কাম্য ছিল না। আপনাদের দুইজনের বন্ধুত্বের কথা স্মরণ করিয়াই আমরা ধন্য। আজ আমরা অন্তরের ভক্তি-অর্ঘ্য লইয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি এবং প্রার্থনা করিতেছি যে, আরও দীর্ঘকাল আমাদের পথ প্রদর্শকরূপে আপনি বর্তমান থাকুন এবং চিত্তের শান্তি লাভ করুন। ইতি—

বিনয়াবনত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
কলিকাতা, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫০

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষে
শ্রীযদুনাথ সরকার, সভাপতি

ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী-সংঘ সম্বর্ধনা জানান ৫ই জ্যৈষ্ঠ। রৌপ্যাধারে মানপত্রটি রক্ষিত ছিল এবং পাঠ করেন মৃণালকান্তি বসু। সম্বর্ধনায় উপস্থিত ছিলেন হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ, শ্রীবিধুভূষণ সেনগুপ্ত এবং আরো অনেকে।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

হে সাংবাদিক শিরোমণি,

ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী-সংঘের পক্ষ হইতে আমরা আপনাকে আজ শ্রদ্ধার অর্ঘ্য অর্পণ করিয়া নিজেদের কৃতার্থ ও সম্মানিত জ্ঞান করিতেছি। আপনি এই সংঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং ভূতপূর্ব সভাপতি ইহাও কৃতজ্ঞচিতে স্মরণ করিতেছি।

প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল আপনি বিভিন্ন সাময়িক পত্রের অর্ঘ দিয়া স্বদেশ ও স্বজাতির সেবা করিয়া আসিতেছেন। অসত্য অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে আপনি চিরদিন নির্ভীকভাবে সংগ্রাম করিয়াছেন, রাজরোষের ভ্রূকুটী আপনাকে বিচলিত করিতে পারে নাই, ধন, মান বা পদমর্যাদার প্রলোভনে ও আপনি কোনদিন কর্তব্য ভ্রষ্ট হন নাই। নিপুণ তথ্য বিশ্লেষণ, তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিরপেক্ষ বিচার, সংশয়হীন সিদ্ধান্ত আপনার বিশেষত্ব। বস্তুতঃ এই সব দিক দিয়া সাংবাদিকতার যে আদর্শ আপনি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহা ভারতের সমস্ত প্রদেশের সাংবাদিকদিগকে ধ্রুব তারার মত পথ প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছে। আমরা-যাহারা সংবাদপত্র সেবাকে জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছি, আপনার আদর্শ দ্বারা যে কতদূর অনুপ্রাণিত হইয়াছি, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আপনি এ দেশের সাংবাদিকগণের গৌরব স্বরূপ।

আপনার সমস্ত কর্মের মূল উৎস যে গভীর স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতিপ্রীতি তাহা আমরা বিশেষভাবে উপলব্ধি করি। এই কারণেই আপনার চিন্তাধারা কেবল রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নিবদ্ধ থাকে নাই। সর্বপ্রকার সামাজিক বৈষম্য ও অসত্যের উপরেও আপনি তীব্র কশাঘাত করিয়াছেন। দেশের আর্থিক প্রগতি—শিল্প বাণিজ্যে উন্নতি যে জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মরক্ষার পক্ষে অপরিহার্য এ সত্য আপনি কোন দিনই বিস্মৃত হন নাই এবং আপনার সুচিন্তিত তথ্যবহুল রচনা দ্বারা সে বিষয়ে যথাশক্তি সহায়তা করিয়াছেন।

আপনি অখণ্ড ভারতের আদর্শে বিশ্বাসী এবং বাঙালা দেশ ও বাঙালী জাতির প্রতি চিরদিনই আপনার একান্ত স্নেহ ও গভীর মমত্ববোধ বিদ্যমান। সেই কারণেই অর্ধশতাব্দী ধরিয়া একদিকে যেমন বাঙালী জাতির ত্রুটীবিচ্যুতি বিশ্লেষণ করিতে আপনি পশ্চাদপদ হন নাই, অন্যদিকে তেমনি তাহাদের মহত্তর গুণাবলীর উদ্বোধন করিয়া সত্য ও কল্যাণের পথও প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন।

নবযুগের বাঙালা সাহিত্যও আপনার নিকট অশেষরূপে ঋণী। সাময়িকপত্রের সম্পাদকরূপে উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য প্রকাশ করিয়া এবং নবীন লেখকদিগকে সৎ-সাহিত্য রচনায় উদ্‌বুদ্ধ করিয়া আপনি আপনার কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। বাঙলা ভাষার মধ্য দিয়াও যে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঐশ্বর্য-সম্ভার প্রকাশ করা যাইতে পারে, আপনি তাহা হাতে-কলমে প্রমাণ করিয়াছেন। বিশেষভাবে, এ যুগের সাহিত্যগুরু রবীন্দ্রনাথের বন্ধু ও অনুরক্ত ভক্ত হিসাবে রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রচারের জন্য আপনি যাহা করিয়াছেন, বাঙালী জাতি কখনই তাহা ভুলিতে পারিবে না।

আপনি গৌরবময় কর্মজীবনের শেষপ্রান্তে আসিয়া বিশ্রামলাভের অধিকারী হইয়াছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আপনার উপর আমাদের স্নেহের দাবী ত্যাগ করিতে পারিব না। আপনার জ্ঞানগর্ভ উপদেশ, পরামর্শ ও উৎসাহ হইতে আমরা কোনদিনই বঞ্চিত হইব না—এই আশা অবশ্যই আমরা করিতে পারি। শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি আপনি শতায়ু হউন, আপনার দৈহিক স্বাস্থ্য ও মানসিক বল অটুট থাকুক এবং আপনি দীর্ঘকাল ধরিয়া নিষ্কাম কর্মযোগীর ন্যায় স্বদেশ ও স্বজাতির সেবা করিবার সৌভাগ্য লাভ করুন। বন্দে মাতরম্।

বিনীত

কলিকাতা শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার

২৩শে মে, ১৯৪৩ সভাপতি. ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সঙ্ঘ

বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জানান হয় ১৬ই জ্যৈষ্ঠ। এ উপলক্ষে রামানন্দের শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ক্ষিতিমোহন সেন, দেবেন্দ্রমোহন বসু, আরো অনেকে। ঐ দিন ছিল রামানন্দের জন্মদিন।

বিশ্বভারতীর মানপত্র

আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু এবং বিশ্বভারতীর প্রধান হিতৈষী শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে

তাঁর সুপরিণত জীবনের জয়ন্তী উৎসবের শুভ মুহূর্তে আমি বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে আমাদের সকলের হয়ে ও সকল অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি।

আরো বহু বৎসর আমাদের মধ্যে বর্তমান থেকে এই মহাকর্মী যেন আমাদের জ্ঞান, কর্ম ও সাধনায় প্রেরণা দেন, যেনগুরুদেবের মহান্ আদর্শকে পরিণতির পথে এগিয়ে দেবার জন্য, কি নবীন, কি প্রবীণ আমাদের সকলের প্রাণে উৎসাহ সঞ্চার করেন'—এই প্রার্থনা করি।

দেশ ও দশের সেবায়, সাহিত্য ও শিল্পের উন্নতি প্রচেষ্টায় সকল দিক থেকে এমন একনিষ্ঠ মানুষ দুর্লভ। সৎ-সাহসী এবং নির্ভীক এই পুরুষকে দর্শনেই পুণ্য আর বন্ধুভাবে লাভ করলে তো কথাই নেই। তাঁকে আমরা আমাদের পরম সুহৃদ্ ভাবে পেয়েছি—এ আমাদের বিশেষ সৌভাগ্য।

তাঁর বর্ষপূর্তিতে তাঁকে অভিনন্দিত করে আমরা নিজেকেই ধন্য মনে করছি, কিমধিকমিতি—

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২১ আষাঢ় রামানন্দ জয়ন্তী কমিটির পক্ষ থেকে মানপত্র দেওয়া হয়। বাংলা, ইংরেজি ও হিন্দী এই তিন ভাষায় মানপত্রটি লিখিত। রামানন্দ তখন অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী। ঐদিন কমিটির উদ্যোগে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে একটি সভা হয়। বিভিন্ন বক্তা সভায় বক্তৃতা করেন। প্রদত্ত মানপত্র:

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় শ্রদ্ধাস্পদেষু

মহাত্মন, আপনার ঊনআশীতিতম জন্মবাসরে আপনার স্বদেশবাসী আমরা আপনাকে অভিনন্দিত করিতেছি। আপনার পূত চরিত্র, অকৃত্রিম স্বদেশভক্তি ও জীবনব্যাপী স্বদেশসেবা আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে। আপনি আমাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতির অর্ঘ্য গ্রহণ করুন।

অর্ধশতাব্দী পূর্বে অনায়াসলভ্য সুখসম্পদ ও প্রতিষ্ঠা উপেক্ষা করিয়া আপনি শিক্ষকের কৃচ্ছ্রসাধ্য পুণ্যব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। আপনার দীপ্ত স্বদেশ প্রেম ও আপনার জীবনের সংস্পর্শ বহু ছাত্রকে অনুপ্রাণিত করিয়া তাহাদিগকে স্বদেশসেবায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। আপনি ধন্য।

আপনার সেবাব্রত বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রসারিত হইয়া আপনাকে মাসিক-পত্র সম্পাদনে ব্রতী করিয়াছে। এই তপস্যায় আপনার সিদ্ধি বিস্ময়কর। আপনার প্রবাসী, মডার্ণ রিভিয়ু ও বিশাল ভারত প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া এ দেশকে এক অপূর্ব শক্তি, শুচিতা ও সৌন্দর্যের আদর্শ দান করিয়া আসিতেছে। মাসিক-পত্র সম্পাদন ও প্রকাশে আপনি এ দেশে নবযুগের প্রবর্তন করিয়াছেন।

আমাদের স্বদেশী চিত্রকলা বহুদিন দেশবাসীর অবজ্ঞা বহন করিয়া আসিতেছিল। আপনি সকল বিরুদ্ধতা উপেক্ষা করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য দেশবাসীর চক্ষে প্রস্ফুটিত করিয়া তাহার সাধনা ও প্রচারে বিপুল সহায়তা করিয়াছেন। আমরা আজ তাহা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করিতেছি।

নানা দেশে বিক্ষিপ্ত বঙ্গসন্তানকে এক প্রেমে ও আদর্শে সংহত করার কাজে আপনার দান অতুলনীয়। স্বীয় প্রদেশের প্রতি প্রেম আপনার সমস্ত ভারতের প্রতি প্রেম ও সেবাকে আরও মহনীয় করিয়া তুলিয়াছে। আপনার মঙ্গল হোক।

আমাদের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য আপনার তপস্যায় দেশমাতা গৌরবান্বিত। আপনার নির্ভীক ও তথ্যানুগ লেখনী আপনার দেশবাসীকে নবশক্তি দান করিয়াছে। আপনার জয় হউক।

ভারতের সংস্কৃতিকে বিশ্বসংস্কৃতির সহিত সঙ্গত করিয়া পূর্ণ পরিণতি দান করিতে এবং জগতের কাছে এই সংস্কৃতির প্রকৃত মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখিতে আপনি আজীবন সাধনা করিয়াছেন। অন্ন-দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতায় মানবতার লাঞ্ছনা আপনি কখনও সহ্য করেন নাই। পরাধীনতার বেদনা আপনি মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছেন এবং ভারতের স্বাধীনতার যজ্ঞে আপনার সমস্ত শক্তি আহুতি অর্পণ করিয়াছেন। আপনার সাধনা সিদ্ধ হউক।

আপনার কাম্য ভারতের স্বাধীনতা প্রত্যক্ষ করিবার সৌভাগ্য আপনি লাভ করুন। ভগবান আপনাকে স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু প্রদান করুন। ইহাই আমাদের প্রার্থনা। আপনাকে নমস্কার করি। ইতি—

আপনার গুণমুগ্ধ রামানন্দ-জয়ন্তী কমিটির পক্ষে

শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সভাপতি

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী, সম্পাদক

রামানন্দ-জয়ন্তী কমিটি

১৬ই, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ

রবীন্দ্রাব্দ ৮৩

শিল্পে শোভনতা

অনেক সময় দেখা যায়, কোনো শিল্পকে অশ্লীল বলতে পেরে তুড়ি মেরে আমরা চেঁচিয়ে আর অমনি চড়া তানে কড়া তেহাইতে তামাম রসিকমহল জুড়ে তার বদনাম গেয়ে বেড়াই। অথচ এটুকু ভেবে দেখি না, কারও নামে দল বেঁধে গাল দেয়াটাও তাকে নামজাদা করে দেবার আর একটা পথ। নিজেদের সং শিল্পের পোষ্টা মনে করে শৌখীন মেজাজে আমরা বাইরে যতোই খনেদী সমঝদার সাজি না কেন, একথা কবুল করতেই হবে যে, অশ্লীল শিল্প বাজারে কাটে বেশি। কারণ আমরাই পাঁচজন শিল্পের কপালে অশ্লীলতার রসকলি এঁকে হাজারজনের নজর টেনে আনবার ব্যবস্থা করে দিয়েছি। কাজেই খাঁটি রসিকের মাজা ইচ্ছে নিয়ে আমরা যদি সত্যিই অশ্লীল শিল্পকে দণ্ড দিতে চাই তবে তার নামে সমালোচনার ঝড় না তুলে তাকে বেমালুম এড়িয়ে যাওয়াই, আমার মতে, সে শিল্পের সেরা গুণাগারি।

তাছাড়া আমি বলি, ঐ 'অশ্লীল' শব্দটা তোলা থাক। সেকাল থেকে সুরু করে আজ অবধি ওকে এমনভাবে কাজে লাগিয়েছি যে, মনে হয়, ওর ভেতরে যেন নীতিবাগীশের সনাতন বিধিনিষেধের ভঙ্গিটুকু খোদাই হয়ে গিয়েছে। এদিকে কিন্তু কালে কালে অশ্লীলতার মান বদলেছে, সে সঙ্গে সম্মানও। তাই যে শিল্পকে অশ্লীল বলে সাবেক আমল একদিন একঘরে করেছিলো, আজকাল-পরশুর রেওয়াজ হয়তো তাকেই ঘরানা করে নেবে। এখন, এমনি এক বেসামাল দাঁড়ির ওপর ভর দিয়ে কিছু নিরেস আর অকেজো নীতিকানুনের বাটখারায় শিল্পের ওজন বেঁধে দিলে শিল্প গড়াটা নেহাৎই কবরের ওপর পিদিম সাজাবার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে— যে পিদিমের আলোয় রাতের আঁধারও ভাগে না, দেয়ালির খুশিও জাগে না। সেজন্যে আমি বলতে চাইছি, 'অশ্লীল' শব্দটাকে নিয়ে শিল্পলোকের হাওয়া আর না-ই বা বিষিয়ে দিলুম। ওটা বরং তুলে রাখি উঁচু নাগালের খোপে অচল পয়সার মতো। তার বদলে এবার থেকে আমরা যাচাই করে দেখতে সুরু করি, কোনো শিল্প অশোভন কিনা। এই 'অশোভন' কথাটির ভেতরে আর যা কিছুই থাক, অন্তত অথর্ব নীতির গুরুগিরি নেই বলেই আমার বিশ্বাস। তার ওপর, এর ইঙ্গিতটুকু অনেক বেশি চওড়া, অনেক বেশি দরাজ—'অশ্লীলে'র মতো অমন একঝোঁকা হয়ে বসে নেই। তাহলে এ পর্যন্ত আমরা মেনে নিচ্ছি যে, শিল্পের সমস্যাটা শ্লীলতা-অশ্লীলতার কুয়োর জলে আকাশ-দেখার ঝামেলা নয়, ওটা পুরোপুরি শোভনতা-অশোভনতার কথা।

এখন দেখা যাক, শোভনতা বলতে কী বুঝি। শিল্পের কারুশালায় কারিগর যখন শিল্প গড়তে বসেন তখন তিনি নানান মালমশলা জড়ো করে জোড়া দিয়ে, জোড়ের জায়গাগুলো ঘষে

মেজে তার ওপর পালিশ লাগান। এই টানা কাজের চলনটুকু যদি নিজের ভেতরে নিজেই খাপ খেয়ে সুষ্ঠু হয়ে ওঠে, তবেই শিল্পের সুন্দরকে ছাপিয়ে ধরা দেয় একটা মনমাতানো স্নিগ্ধ জমকের আভাস। রূপ-রস-রীতির ভেতরে এই যে লাগসই মিতালির সাঁকো বাঁধা হয় শিল্পের সুঠাম গড়নের লাবণিকে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে, ওস্তাগরি ভাষায় এরই নাম শোভনতা। এই একদিকে যেমন গোটা শিল্পের ব্যাপার, তেমনি আবার শিল্পের প্রতিটি অংশেরও।

অনেকে হয়তো লাগসই আর মানানসই—এ দুটোকে একই জিনিস বলে মনে করতে পারেন। মোটেই তা নয়। লাগসই-এর গুরুত্ব সব সময় মানানসই-এর চেয়ে বেশি। কারণ ভেতরকার গড়নটা লাগসই হলে তবেই একটা কাঠামোকে আমরা মানানসই বলি। কিন্তু কাঠামোটি মানানসই বলেই তার ভেতরকার গড়নটুকু লাগসই—তর্কের খাতিরে এমনিধারা উল্টোপথে আমাদের ধারণাকে চালাতে আমরা নারাজ। তাছাড়া লাগসই বলতে একই সঙ্গে বোঝায় কোনো কিছুর ভেতকার সুছাঁদ বাঁধুনি আর সেই কোনো কিছুর সাথে বাইরের আর পাঁচটা কিছুর জোড় মেলানো কুটুম্বিতে। ভাবের দিক থেকে 'মানাসই' কোনোমতেই এতোখানি বনেদী নয়।

কাজেই, রূপ-রস-রীতির ভেতরে লাগসই মিতালির সাঁকো বেঁধে শিল্পী যখন খাঁটি সুন্দরকে একটা বিশেষ চেহারায় খোদাই করে তুলতে থাকেন তখন তাঁর সবটুকু ইচ্ছে রয়েছে শিল্পের বিষয়টিকে শুধু চেহারায় নয়, তার নিজের মতোন ঠিক-ঠিক চরিত্রে জাগিয়ে তোলবার কাজে মশগুল হয়ে। শিল্পর ঐ ইচ্ছে সফল হলেই তাঁর শিল্প শোভনতার যাচনদারিতে পাসমার্কা পায়।

এখন, প্রশ্ন হচ্ছে, শোভনতার যাচাই হবে কীসের ওপর ভর দিয়ে—কোনো চলতি সময়ের চালু রুচি আর মানের ওপর, না চিরকালের ধোপে-টিঁকে-যাওয়া সাবেকীয়ানার ওপর। এটুকু ঠিক, চলতি কালের রুচি একদিন আসছে-কালের দরবারে পৌছবেই, এমন কথা নিয়ে বাজি ফেলা যায় না। তা হয়তো শুধু চলতিকালের মন ভরিয়েই ঝরে পড়তে পারে নোতুন কালের রুচির সঙ্গে পাঞ্জাকষায় হার মেনে। ফলে চলতি কালটাই যদি কোনো শিল্পের একমাত্র আলো-মাটি-জলবায়ু হয়ে ওঠে তবে মরশুমী ফুলের মতোই তা দুলে দুলে দু-রোজ আদর কাড়লেও আচমকা মিলিয়ে যাবে ধাতুবদলের সাথে সাথে। ওদিকে আবার শুধু সাবেকী শোভনতার কোল আঁকড়ে বসে থাকলে শিল্পের চলাটাই যায় পঙ্গু হয়ে। কাজেই আমার মনে হয়, চলতিকালে রুচি আর মানের পথ বেয়ে সাবেকীয়ানায় পৌছোনোই শিল্পের শোভনতার যাচনদারিতে সেরা মাপকাঠি।

এমন অনেকে আছেন যাঁরা শিল্পের পটে মানুষের পোষাক-ছাড়া মূর্তিকে অশোভন বলতে চান, এমন কি দেহের বর্ণনাকেও। আমার বিশ্বাস, তাঁদের মনের কুঁড়োজালিতে এখনো নীতির জপমালা ঘুরে চলেছে। তার প্রমাণ, গ্রীস দেশের মূর্তিগুলোকে দেখে আমরা লজ্জায় লাল হয়ে উঠি নে, কিংবা হিন্দুর পবিত্র দেবদেউলের দেয়াল থেকে মূর্তিগুলোকে সরিয়ে ফেলবার ব্যবস্থা করি নে। বরং তাদের দিকে তাকিয়ে আমরা শিল্পীর বাহাদুরিতে অবাক হয়ে যাই, আর

আপনমনেই বাহবা দিয়ে ঐ ন্যুড্‌-চর্চাকে আরো বেশি করে উৎসাহ দিই। অবশ্য এ কথা একশোবার মেনে নেবো, যে-সব নগ্নমূর্তি দেখে আমরা শিল্পীকে তারিফ জানিয়েছি তাদের ওপরই যদি সামান্য কিছু সাজগোজের আভাস টেনে দেয়া যায় তবে তা শিল্পের চোখেও অশোভন হয়ে উঠবে। সোজা কথায়, শিল্পের বিষয়কে দোটানায় ফেললেই স্বাভাবিকতার তাল কেটে গিয়ে শিল্পের সুন্দর ইচ্ছেটি নষ্ট হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, মূর্তি পোষাক-পরাই হোক আর পোষাক-ছাড়াই হোক, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই, সেই মূর্তিকে শিল্পের পটে প্রকাশ করবার ভঙ্গিটুকুই আসল ব্যাপার, এরই 'পরে ভর দিয়ে রয়েছে শিল্পের শোভনতা-অশোভনতা।

কোনো কিছুই লুকোবো না, সত্যি কথা সোজাভাবেই বলবো—অমনি এক মন্ত্র জপে হালআমলে কেউ কেউ নগ্নতাকে বড়ো বেশি করে ফুটিয়ে তোলবার কাজে একরোখা। আমার ধারণা, তাঁদের মন্ত্রটিকে পয়লা নজরে ভাবাদর্শের শ্লোক বলে মনে হলেও আসলে তা অশালীন আবেগের ছদ্মবেশী সংস্করণ। ঐ যে 'বড়ো বেশি করে ফুটিয়ে তোলা', ওর ভেতরেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, শিল্পীর উদ্দেশ্য মোটেই সৎ নয়। শিল্পের তবক মুড়ে কিছু অপরিচ্ছন্ন মনোবাসনার দুনো ফসলে বাজার মাতিয়ে তাঁরা সাহসী শিল্পী বলে নাম কিনতে চান। আমি সবিনয়ে বলছি, তাঁদের এমনিধারা রচনা শিল্পের শোধনাগারেও নির্ভেজালভাবে অশোভন। কারণ অসৎ ইচ্ছের পথে চলে আর রসিককে অশ্লীল কৌতূহলের পথে চালিয়ে তা শিল্প হয়ে উঠতে পারে নি। তাছাড়া সবকিছুকে বেফাঁস বলে ফেলার ভেতরে স্পষ্ট জবানবন্দির বড়াই আছে বটে, কিন্তু শিল্পয়ানার ছিটেফোঁটাও নেই। আমরা জানি, কিছুটা বলা আর অনেকটা না-বলা নিয়েই শিল্প নিজে শিল্প হয়ে ওঠে।

এরই জের টেনে কেউ কেউ আবার প্রেমের ব্যাপারটাকে অশোভনের তালিকায় সাজিয়ে দেবার দলে। আমার বিশ্বাস, তাঁদের মতে মেতে উঠলে শিল্প একেবারে কানামাছি খেলার গান্ধারী হয়ে উঠবে। কারণ শিল্প যদি ঋতুরঙ্গসভা হয়, প্রেম তবে তার পাটে বসে থাকা নিতি-মধুকালের ফাল্গুনী। তাছাড়া সমাজশৃঙ্খলার দোহাই পেড়ে আমরা যতোই মদনভস্মের আয়োজন করি না কেন, প্রেম যে মানুষের একটা সহজ মানুষতা—এ কথাটুকু তো কোনোমতেই উড়িয়ে দেবার জো নেই, প্রেমের নামে যাঁদের তর্জনী সিধে, খোলা গলায় কবুল করাই ভালো যে, ঘরে-দোরে পুরু পর্দা টলমল করে টাঙিয়ে তাঁরাও প্রেমকথার পাঁচরঙে বিভোর হবার জন্যে বারোয়ারি হরিসভায় ভিড় করেন। কাজেই প্রেমকে অশোভনের খাতায় সাজিয়ে তাকে শিল্পের রংমহল থেকে বেমালুম খারিজ করবার মানে সেরা দৌলতটি কেড়ে নিয়ে শিল্পকে শৌখীন গরীবীয়ানার শিকার করে তোলা। তবু ভুললে চলবে না, অমনিধারা পদ্মরাগ-প্রেম শিল্পের নজরেও অশোভন হয়ে উঠতে পারে, যদি ঠিক জায়গাটিতে রাশ না টানা যায়। কারণ মাত্রাবোধের অভাব থাকলে প্রেমের আঁটোসাটো গড়নটা নিছক পানসে ন্যাকামিতে এলিয়ে পড়বে।

হাসি ব্যাপারেও একই কথা। হাসি জিনিসটা মোটেই অশোভন নয়, কারণ স্বভাবের উজ্জ্বল প্রকাশেই তার আনন্দ। তবে কথা হচ্ছে, হাসির মালমশলা খুঁজে না পেয়ে রুচির সীমা ভুলে

হাসির নামে যদি ভাঁড়ামি বিলি করা হয়, কিংবা শুকনো কিছু রসদ নিংড়ে হাসাতে গিয়ে হাসাবার করুণ চেষ্টাটুকুই যদি হাসির কারণ হয়, শিল্পের শানে তা অশোভন বৈকি। তার ওপর হাসির খাতিরে কাউকে খোঁচা মেরে জাগিয়ে দেয়াটা শিল্পের মতে শোভন, তাকে রাগিয়ে দেয়াটা নয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, সেই মাত্রাবোধের কথাই এসে গেলো। চলন যেমনই হোক, তার চালটি এবং চালনাটি গোড়া থেকেই ছকে না নিলে শেষটায় সবকিছু বেসামাল হয়ে অশোভনতায় গাঁজিয়ে যাবার আশঙ্কা আছে।

এখানে কেউ হয়তো বলতে পারেন, হুঁশিয়ার মাফিক মাত্রা টানাই যদি শিল্পে শোভনতার মাপকাঠি হয়, তবে ভূত-পেত্নী-দত্যি-দানো-হুরী-পরীর গল্প-ছবি মূর্তিগুলো নিশ্চয়ই অশোভন, কারণ মাত্রাকে ছাড়িয়ে গিয়ে আজগুবি হয়ে ওঠাই ওদের স্বভাব। আমি বলবো, জ্ঞানের জগতে ওরা আজগুবি হলেও ভাবের জগতে তা নয়। বস্তু-দেখা চোখ দিয়ে তখন আর ওদের দেখিনে, দেখি কল্পনার চোখে। । তাই ওরা বাঁধা পড়ে কল্পনার মাত্রায়। স্বাভাবিকতার যেমন যুক্তি আছে, তেমনি অছে অস্বাভাবিকতারও। এই অস্বাভাবিকতার যুক্তিই অমনিধারা শিল্পে মাত্রা টানার হুকুমদার। কাজেই মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়া বলতে যা বোঝায় ঠিক তেমনি কিছু ঘটে না; বস্তুর মাত্রাকে ছাড়লেও অ-বস্তুর মাত্রাকে মেনে চলে। ফলে বাঘা বাঘা ভূত, ডাকাবুকো দানো আর ফুরফুরে জলপরী-ফুলপরীদের কথা রোজদিনকার ধুলোমাটির তুনিয়ায় অবিশ্বাসের ব্যাপার হলেও ভাবের স্বর্গলোকে তাদের বিশ্বাস করে আনন্দ পাই বলেই শিল্পের দিক থেকে তারা কোনোমতেই অশোভন নয়।

অনেক সময় দেখা যায়, নানা যুগের পথ বেয়ে চলে-আসা কোনো ধারণাকে এড়িয়ে গিয়ে শিল্পী আনকোরা কোনো ধারণার আমদানি করেন, অমনি সাবেকী ধারণার মন্ত্রশিষ্যের দল নয়া-আমদানিকে অশোভন বলতে চান। আমি এরকম একপেশে মুরব্বিয়ানার বিরুদ্ধে। কারণ এমন কোনো চুক্তি যখন হয়নি যে, এতোদিনকার চলতি রীতিটা চিরদিনকার অনড় কানুন হয়ে থাকবে, তখন তার সাথে বনিবনা হয়নি বলে তারই নিক্তিতে মেপে নোতুন রীতিকে অশোভন বলা ঠিক হবে না। যাকে এতোকাল সুশ্রী বলে জেনে এসেছি তাকে যদি হঠাৎ কোনো শিল্পী কুৎসিত বলে বসেন তাহলে আমি চমকে যেতে পারি, মনে মনে আহত হতে পারি, কিন্তু কখনোই তাকে অশোভন বলতে পারি নে। শিল্পর নজর তাঁর নিজের মালিকানার ছাপ-মারা, তার ওপর আমার কোনো হাত নেই। বরং শিল্পীর অমনিধারা নজর ধরে যাবে কি ঝরে যাবে সেটুকু দেখবার জন্যে কৌতুহলী সহনশীলতা আমার সহায় হোক। এতোদিনের সুশ্রীকে কুৎসিত বলার পেছনে শিল্পী-মনের ভঙ্গিটি যদি জোরালোভাবে স্বাভাবিক হয়, তবে শিল্পের গরজে কুৎসিতকেও মেনে নেবো। কাজেই পূর্ণিমা-চাঁদকে পিয়ামুখচন্দা বলি, ঝলসানো রুটি বলি, কিংবা মড়ার মাথার খুলিই বলি—কিছু আসে যায় না; আসল কথাটা হোলো, শিল্পীর অনুভূতি শিল্পীর নিজের কাছে আর শিল্পের সাঁকো বেয়ে রসিকের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে কিনা। যদি তা না হয় তবে সুশ্রী-কুশ্রী সব কিছুকেই শিল্পের পটে অশোভন বলবো।

দেবব্রত চক্রবর্তী

বিনোদিনী দাসীর 'আমার কথা'—সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও নির্মাল্য আচার্য সম্পাদিত। কথাশিল্প প্রকাশ। ১৯ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য পাঁচ টাকা।

কথাটা কোথায় পড়েছিলাম মনে নাই। ক্লিওপেট্রা নাটকের অভিনয় দেখে একজন দর্শক বিস্ময়-বিমুগ্ধ কণ্ঠে বলেছিলেন, 'এত কামতৃষ্ণার মধ্যেও মানুষ কতই না বড়ো!' বিনোদিনীর আত্মজীবনী পড়তে পড়তে কথাটা আবার মনে পড়লো। তাঁর জন্ম বারবনিতার ঘরে, তিনি নিজেও হয়েছিলেন বারবনিতা। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে কৈশোর পর্যন্ত কোন উচ্চ আদর্শ তাঁর চোখে পড়েনি। তিনি দেখেছেন বাইজীর গানের আসর, খোলার ঘরে অবিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের কুশ্রী সংসার। তাতে শুধু ভয় ও বিস্ময় তাঁর মনে জেগেছে। অতি অল্প বয়সে তাঁর বিবাহ হয়েছিলো, কিন্তু স্বামীর ঘর করবার সুযোগ তাঁর কখনও হয়নি। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হয়ত 'অবস্থা গতিকে' নয়ত 'নানারূপ প্রলোভনের আকাঙ্ক্ষাতে' তিনি পুরুষের আশ্রিতা হলেন। একাধিকবার আশ্রয়দাতার বদলও হলো। অর্থাৎ বারাঙ্গনার জীবনই হয়ে দাঁড়ালো তাঁর ব্যক্তিগত জীবন। এইভাবে নীচু পরিবেশে নিরবচ্ছিন্ন কামতৃষ্ণার মধ্য দিয়ে চলতে চলতেও বিনোদিনী একটা মহৎ শিল্পী-সত্তার অধিকারী হয়েছিলেন। তিনি স্বীকৃতি পেয়েছিলেন সেকালের একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হিসেবে। একটা ছোটো জীবনের মধ্য থেকে এই মহৎ দ্বিতীয় জীবনের আত্মপ্রকাশ দেখে বলতে ইচ্ছা হয়—এত দেহবিলাসের মধ্যেও এই নারী কতই না বড়ো।

আসল কথা, দুটো শিল্পের সাধনা করেছিলেন—এক, জীবন-শিল্প; দুই, অভিনয়-শিল্প। এবং আমার মতে, এই দুই শিল্পের ক্ষেত্রেই তাঁর নিষ্ঠা অনুধাবন করার মতো। জীবন-শিল্পের অনুশীলনের সঙ্গে তাঁকে মৃৎশিল্পীর তুলনা করা যায়। মৃৎশিল্পী কাঁচা উপকরণ হিসেবে এক তাল কাদামাটি পেয়ে থাকেন। তারপর সেই কাদামাটি নিয়ে তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে করতে মূর্তি গড়ে তুলেন। যখন তাঁর সৃষ্টি সম্পূর্ণ হয়ে যায়, তখন কাঁচা উপকরণের সঙ্গে সেই মৃন্ময় শিল্পমূর্তির কতই না পার্থক্য দেখা যায়! বিনোদিনীও এক তাল কাদামাটির মতোই জীবনের কাঁচা উপকরণ মাত্র হাতের কাছে পেয়েছিলেন। তা নিয়ে 'বাঁদর' গড়াই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিলো, কিন্তু তিনি গড়তে চাইলেন 'শিব'। ফলে তাঁর মধ্যে একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিলো ছেলেবেলাতেই। খোলার ঘরের ভাড়াটেদের রুচিহীন নিম্ন জীবনচর্যা দেখে তাঁর মনে হতো, 'আমি তো কখনও এরূপ ঘৃণিত হইব না।' এই সঙ্কল্পের মধ্যেই ছিলো বিনোদিনীর নূতন জীবন গঠনের অঙ্গীকার। তাঁর অভিনেত্রী-জীবন সেই স্বপ্নকে সার্থক করার প্রতিশ্রুতি বহন করে এনেছিলো। তিনি সে-কথা বলতে গিয়ে নিজেই বলেছেন—'সেই বালিকা বয়সে সেই সকল বিলাসভূষিত লোকসমাজে সেই নূতন শিক্ষা, নূতন কার্য, সকলই আমার কাছে নূতন বলিয়া বোধ

হইতে লাগিল।' তিনি ভাল লেখাপড়া জানতেন না, তবে শেখবার বড়োই আগ্রহ ছিলো। অভিনয় করতে গিয়ে তিনি অনেক শিক্ষিত লোকের সংস্পর্শে এলেন, অনেক উচ্চ নাটকীয় চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হলেন। ফলে, তিনি বলেছেন, 'আমার মন…উচ্চদিকে উঠিতে লাগিল।' কিন্তু যৌবনে এলো সংকট, কামতৃষ্ণার তাড়না ও অসংখ্য প্রলোভনের যুগপৎ আলোড়ন। সেই সংকটের দিনে 'এদিকে আমার উচ্চবাসনা আমার আত্মবলিদানের জন্য বাধা দেয়, অন্যদিকে অসংখ্য প্রলোভনের জীবন্ত চাকচিক্য মূর্তি আমায় আহ্বান করে।' তবে কার্যতঃ কু-এর কাছে সু পরাজিত হয়—বিনোদিনী দেহবিলাসিনীতে পরিণত হন। কিন্তু সেই বারবনিতার জীবনেও তিনি কতকগুলি চরিত্র-নীতি অনুসরণের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। তাই বলেছেন—'আমি ঘৃণিত বারনারী হইলেও অনেক উচ্চশিক্ষা পাইয়াছিলাম, প্রতারণা বা মিথ্যা ব্যবহারকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতাম।' যে পুরুষ তাঁর শেষ আশ্রয় ছিলেন, তার মৃত্যুতে বিনোদিনীর অন্তরের নিদারুণ হাহাকারের মধ্যে সেই চরিত্রনিষ্ঠার চরম প্রকাশ দেখা যায়। একমাত্র কন্যার মৃত্যুতে তাঁর মাতৃত্বের বেদনাও যেন এক উচ্চমুখী চিত্তবৃত্তির সাক্ষ্য দিচ্ছে। কিন্তু এই নূতন জীবনায়নের সুমহান প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যেমনভাবে জীবন গড়বেন বলে তিনি ভেবেছিলেন, তেমনভাবে গড়তে পারেন নি। তার জন্য তিনি দায়ী করেছেন সমাজকে ও নিজেকে।

এবার বিবেচনা করা যাক বিনোদিনীর অভিনয়-শিল্পের কথা। রঙ্গমঞ্চে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চিন্তা হলো—'আমি কেমন করিয়া শীঘ্র শীঘ্র এই সকল বড় বড় অভিনেত্রীদের মত কার্য শিখিব।' তার জন্য তাঁর 'যত্ন ও চেষ্টার' অন্ত ছিলো না। অভিনয় হয়ে দাঁড়ালো তাঁর অনন্য স্বপ্ন। তিনি নিজেই বলেছেন—'আমি যখন বাড়ীতে খেলা করিতাম তখনও যেন একটা অব্যক্ত শক্তি দ্বারা সেই দিকেই আচ্ছন্ন থাকিতাম। বাড়ীতে থাকিতে মন সরিত না, কখন আবার গাড়ী আসিবে, কখন আমায় লইয়া যাইবে' তেমনি করিয়া নূতন নূতন সকল শিখিব, এই সকল সদাই মনে হইত।' তিনি ধীরে ধীরে বুঝতে পারলেন, নানা ধরনের চরিত্রে অভিনয় করার সময় নিজেকে যে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করতে হয়, তার জন্য অনেক উদ্যম, ধৈর্য ও অনুশীলনের প্রয়োজন। বিনোদিনীর সৌভাগ্য, শরৎচন্দ্র ঘোষ ও গিরিশচন্দ্র ঘোষের মতো শিক্ষক তিনি পেয়েছিলেন। তাঁদের কাছে তিনি শিখেছিলেন, 'সকল ভুলে তন্ময় হয়ে', যে চরিত্রে নেমেছেন সেই চরিত্র হয়ে অভিনয় করতে। এইভাবে শিক্ষা ও সাধনার গুণে অভিনয়ই তাঁর জীবনের সারসম্পদ হয়ে দাঁড়ায়। বিনোদিনী অল্পদিনের মধ্যে অভিনয়ে এতটা উৎকর্ষ লাভ করেন যে, একই নাটকে সাতটি ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েও তিনি দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করতে পেরেছিলেন। তারপর তিনি পেলেন শিল্পী-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার—বঙ্কিমের সাধুবাদ ও শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদ। বঙ্কিম মনোরমার ভূমিকায় তাঁর অভিনয় দেখে বলেছিলেন—'আজ, মনোরমাকে দেখিয়া আমার মনে হইল আমার মনোরমাকে সামনে দেখিতেছি।' চৈতন্যদেবের ভূমিকায় অভিনয়ের সময় তাঁর চৈতন্যময়তা দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন—'মা, তোমার চৈতন্য হোক'। এই সাধুবাদ ও আশীর্বাদের শিল্পমূল্য যে-কোন নটনটীর পক্ষেই অত্যন্ত আনন্দের বিষয়।

বিনোদিনীর এই দুই জীবন—ব্যক্তিজীবন ও শিল্পজীবন—একবার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাঁকে

চরম পরীক্ষায় ফেলেছিলো। সহকর্মীদের অনুরোধ ছিলো, নূতন থিয়েটার করতে তাঁদের সাহায্য করতে হবে। তাতে যদি বিনোদিনীকে ধনবান নূতন পুরুষের আশ্রয় নিতে হয়, তবু তা করতে হবে। অন্যদিকে বারবনিতা হলেও অন্যায়ভাবে একজনের আশ্রয় ত্যাগ করে অন্যজনের আশ্রয় গ্রহণ করতে তাঁর প্রবৃত্তি বাধা দিলো। এই সময়ে বিনোদিনীর চিত্ত-সংকট আমরা অনুমান করতে পারি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নাট্য-শিল্পের জন্য ব্যক্তিগত চরিত্র-নীতিকে তিনি বিসর্জন দিলেন। এ যেন নূতন করে জীবনকে বিকিয়ে দিয়ে শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার মহৎ প্রচেষ্টা। জীবন নিয়ে এমন ধারা পরীক্ষা করতে গেলে জীবনও প্রতিশোধ নিতে ছাড়ে না—তাই বোধ হয়, বিনোদিনীর শেষ জীবনটা ব্যর্থতার বেদনার মধ্যে কেটেছে।

বিনোদিনীর এই যে ব্যক্তিগত ও শিল্পগত জীবন তার কথা পড়ে খৃষ্টান দার্শনিকের মতো বলতে ইচ্ছা করে, বিনোদিনীর মধ্যেও একটা অমৃতসত্তা ছিলো। তিনি মর্ত্যকে না ছেড়েও স্বর্গের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর জীবনেতিহাসের একটা সাংস্কৃতিক মূল্য আছে। অভিধানকারেরা বলেন, শিক্ষা বা চর্চার দ্বারা লব্ধ উৎকর্ষের নাম সংস্কৃতি। সহজাত প্রবৃত্তিগুলিকে সুপরিচালনার মধ্য দিয়ে উন্নত করাই হচ্ছে সত্যিকারের সংস্কৃতি। বিনোদিনীর জীবনও সহজাত প্রবৃত্তিগুলিকে উন্নত করার প্রচেষ্টার দিক থেকে উল্লেখযোগ্য এবং সে-কারণে তার সাংস্কৃতিক মূল্যও আছে।

সম্পাদকদ্বয় অশেষ অনুসন্ধান ও পরিশ্রমের সাহায্যে বিনোদিনীর 'আমার কথা' পুনঃ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের প্রচেষ্টা এই কারণে বিশেষ প্রশংসনীয় যে, তাঁরা (১) একটি সংগ্রামবিক্ষুব্ধ নাটকীয় জীবনের শিল্প-স্বাদ লাভের সুযোগ নূতন করে আমাদের দিয়েছেন; (২) 'শুধু প্রতারণা-বিমুগ্ধ নরকপথে পদবিক্ষেপোদ্যতা কোনো অভাগিনীর' পক্ষে নয়, সকল চক্ষুষ্মান পাঠকের পক্ষেই শিক্ষাপ্রদ একখানা গ্রন্থের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন; (৩) বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের অভিনয়-কলার আনুপূর্বিক ইতিহাস রচনার পক্ষে অপরিহার্য একখানা আকর-গ্রন্থকে বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে উদ্ধার করেছেন এবং তার জন্য সম্পাদকদ্বয় আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।

গ্রন্থখানির মধ্যে বিনোদিনীর লিখিত (১) আমার কথা (২) আমার অভিনেত্রী জীবন (৩) ভূমিকা (৪) উপহার (৫) নিবেদন স্থান পেয়েছে। আর স্থান পেয়েছে গিরিশচন্দ্র লিখিত দুটি পরিচায়িকা—কেমন করিয়া বড় অভিনেত্রী হইতে হয়? এবং বঙ্গ-রঙ্গালয়ে শ্রীমতী বিনোদিনী, পরিশিষ্টে রয়েছে সম্পাদকদের দ্বারা প্রস্তুত—বিনোদিনী অভিনীত নাটক ও চরিত্রের তালিকা, বিনোদিনীর রচনাপঞ্জী বিনোদিনী লিখিত 'বাসনা' নামক কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ষোলটি কবিতা এবং কিছু গান। এই সূচী-পত্রের দিকে দৃষ্টি দিলেই বোঝা যায়, যথাসম্ভব তথ্য সংগ্রহ করে গ্রন্থটিকে পূর্ণাঙ্গ করে তুলতে সম্পাদকদ্বয় চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেন নি। সুসম্পাদিত গ্রন্থের যা বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত; এ গ্রন্থের তা আছে।

সম্পাদকের নিবেদন সুলিখিত। এতে বিনোদিনীর জীবন ও রচনাবলীর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের

বিচার-বিশ্লেষণ রয়েছে। সম্পাদকদ্বয় এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, 'আমার কথা' বিনোদিনীর স্ব-লিখিত আত্মচরিত্র। যদি তা-ই হয়, তবে বিনোদিনীর লিখনভঙ্গি ও ভাষাদর্শের অকুণ্ঠ প্রশংসা করতে হয় এবং তিনি যে বাঙলা লেখপড়া ভালই জানতেন তা স্বীকার করে নিতে হয়।., গ্রন্থখানির সাহিত্যিক মূল্য এবং 'আমার কথা' ও 'আমার অভিনেত্রী জীবন' নামক দুটি প্রবন্ধের ভাষারীতির পার্থক্য সম্বন্ধে সম্পাদকদ্বয়ের মন্তব্য ও গ্রহণযোগ্য। কবিতার ক্ষেত্রেও তিনি উপেক্ষণীয় নন। তবে বিনোদিনীর 'আমার কথা' মোটামুটি প্রশংসনীয় হলেও তাকে 'বঙ্গ সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আত্মজীবনীরূপে' অভিহিত করা একটু অতি সাহসের কথা। এই মন্তব্য না করা হলেও গ্রন্থখানির মূল্য কমে যেতো না।

বিনোদিনী আমাদের সাহিত্য ও নাট্যসংস্কৃতির ইতিহাসকারদের কাছে সুবিচার পান নি, এ অভিযোগ সম্পাদকদ্বয় বার বার উপস্থাপিত করেছেন। সাহিত্যের ইতিহাসে নাট্য-সাহিত্য একটা অংশ মাত্র জুড়ে থাকে এবং সেই কারণেই তাতে এমন কি শ্রেষ্ঠ নটনটীদের সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়ার সুযোগ থাকে না। নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসও সাধারণতঃ বিশেষ একটা form-এ লিখিত সাহিত্যের ইতিহাস রূপেই রচনা করা হয়, তাই অভিনয়কলা সম্বন্ধে প্রচুর তথ্য তাতে পাওয়া যায় না। পাশ্চাত্য দেশের সাহিত্য বা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসেও নটনটীদের সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পেয়েছি বলে মনে পড়ে না। তবে নাট্যশালার ইতিহাস মিশ্র শিল্পের (composite art) ইতিহাস বলে তার মধ্যে অভিনয় ও নটনটীদের সম্বন্ধে অনেক তথ্য আশা করা যায়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নাট্যশালার যে ইতিহাস রচনা করে গেছেন, তাতে অনেক ত্রুটি আছে সন্দেহ নেই, তবু এ ক্ষেত্রে তিনি একক অগ্রসর হয়ে যেটুকু কাজ করেছেন তার জন্য তাঁর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। আসল কথা, এ দায়িত্ব শুধু সাহিত্য-গবেষকদের নয়, তা বর্তমান কালের রঙ্গালয়কর্তৃপক্ষ ও অভিনেতৃ সঙ্ঘেরও বটে। প্রত্যেক রঙ্গালয়ের সঙ্গে একটি গবেষণা-কেন্দ্র যুক্ত থাকা উচিত এবং সচ্ছল নটনটীদের পক্ষে অর্থ-সাহায্য করাও সঙ্গত। তাহলেই বিনোদিনীর মতো বিস্মৃত নটনটীদের সম্বন্ধে সুবিচারের সুযোগ থাকবে। গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি।

জীবেন্দ্র সিংহরায়

Regd. No. C-315 Phone: 23-5155 June '65 (0.50) Central Regd. No. R.N.2602/57 SAMAKALIN

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমকালীন

ত্রয়োদশ বর্ষ ॥ আষাঢ় ১৩৭২

আনন্দে
উৎসবে...
প্রাত্যহিক প্রয়োজনে..
সবার মনোরঞ্জনে...
পরিনাসরমনীয়
কেশতৈল
কেশরঞ্জন
ক·বিরাজ এন্.এন. সেন এণ্ড কো প্রাইভেট লিমিটেড।

কিরণ
যেমন উজ্জ্বল তেমনি দীর্ঘায়ু
কিরণ ল্যাম্প পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ল্যাম্পগুলির সমকক্ষ। কারণ সর্বাধুনিক স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে সেরা কাঁচামাল থেকে এগুলি তৈরি। এবং এর পেছনে রয়েছে দীর্ঘ ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতাপ্রসূত কারিগরী দক্ষতা।
প্রস্তুতকারক : ভারত ইলেক্ট্রিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রীজ লিঃ
১৯, রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-১
এজেন্ট : দি ওরিয়েন্টাল মার্কেন্টাইল কোং লিঃ
কলিকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ দিল্লী কানপুর
KIRON

ত্রয়োদশ বর্ষ ৩য় সংখ্যা

আষাঢ় তেরশ' বাহাত্তর

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

ভাষার ভাষা

নবেন্দু সেন

মানুষ যেমন কথা বলে, মানুষের ভাষাও তেমনি কথা বলে। মানুষের মুখের ভাষায় যেমন হাসির খুশি থাকে, কান্নার ব্যথা থাকে, ঠিক তেমনি লিখিত শব্দগুলিও ভাষায় শব্দ ক'রে কাঁদে, হাসে, কথা বলে। মুখের কথায় যেমন মানুষ চেনা যায় লিখিত শব্দের ভাষায় তেমনি লেখক চেনা যায়। —মনের ভাব ভাষাতে প্রকাশিত করে মানুষ মুক্তি পায়। ভাষারও একটি বন্ধন-ব্যথা আছে, তার জন্য সেও মুক্তি চায়। মুক্তি দেয় তাকে হাসি, কান্না। এগুলি তার প্রয়োজন। যেখানে এর অভাব, রচনা সেখানে রচিত স্তূপভার। প্রকৃত শিল্পীর রচনায় একটি ভাষা থাকবেই। সে ভাষা বোঝা যায়, শোনা যায়, দেখা যায়। সে রচনা পাঠকের মুখোমুখি বসে কথা বলে, কখনো হাসে, কখনো কাঁদে, কখনো কলহ করে, কখনো বা গম্ভীর অধ্যাপকের মতো তত্ত্ব কথা বলে; আবার কখনো গান শোনায়, ছবি দেখায়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গদ্য শাখার স্বভাবটিই এমন গতিময়। ক'য়েকটি উদ্ধৃতি তুলে বিষয়টি দেখা যেতে পারে।

ক : 'আমাদের জামাই কালিআসিয়াছে রামমুনিকে নিতে। তাইতে শাকের ঘণ্ট স্থকতানি আর বড়া বাগুন ভাজা মুগের ডাইল ইলসা মাচের ভাজা ঝোল ডিমের বড়া আর পাকা কলার অম্ল হইয়াছিল।

কে রান্ধেছিল বড় বৌ না মেঝে বৌ। বড় বৌই রান্ধিয়াছিল। তিনি কুটনা বাটনা ক'রে দিয়াছেন। তোদের বৌ কেমন। রান্ধিতে-বাড়িতে পারে। হাঁ বুন সেই বৈ আর কে রান্ধে মেয়েরা কেহ এখানে নাই আপনি কাঁচা বাচা নিয়া লড়িতে পারি না।' ১

খ : 'এই বিশ্বের জন্ম স্থিতি নাশ যাহা হইতে হয় তিনি ব্রহ্ম। অর্থাৎ বিশ্বের জন্মস্থিতি

ভঙ্গের দ্বারা ব্রহ্মকে নিশ্চয় করি। যেহেতু কার্য্য থাকিলে কারণ থাকে কার্য্য না থাকিলে কারণ থাকে না। ব্রহ্মের এই তটস্থ লক্ষণ হয় তাহার কারণ এই জগতের দ্বারা ব্রহ্মকে নির্ণয় ইহাতে করেন।' ২

গ : 'এঁচোড়ের ঘণ্ট? বেশ, বেশ! শোধন করে নিতে হবে। সুপক্ক কদলী আর গব্য ঘৃত বাড়িতে হবে কি? আয়ুর্বেদে আছে—পনসে কদলং কদলে ঘৃতম্। কদলী ভক্ষণে পনসের দোষ নষ্ট হয়, আবার ঘৃতের দ্বারা কদলীর শৈত্যগুণ দূর হয়।...ওটা কিসের অম্বল বললে...কামরাঙা? সর্বনাশ, তুলে নিয়ে যাও। গত বৎসর শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে ঐ ফলটি জগন্নাথ প্রভুকে দান করেছি।' ৩

ঘ : 'কেবল নীল আকাশ এবং ধূসর পৃথিবী—আর তারই মাঝখানে একটি সঙ্গীহীন গৃহহীন অসীম সন্ধ্যা, মনে হয় যেন একটি সোনার চেলি-পরা বধূ অনন্ত প্রান্তরের মধ্যে মাথায় একটুখানি ঘোমটা টেনে একলা চলেছে; ধীরে ধীরে কত শত সহস্র গ্রাম নদী প্রান্তর পর্বত নগর বনের উপর দিয়ে যুগ যুগান্তর কাল সমস্ত পৃথিবী মণ্ডলকে একাকিনী ম্লাননেত্রে মৌনমুখে ক্লান্তপদে প্রদক্ষিণ করে আসছে।' ৪

ঙ : 'পথের দেবতা প্রসন্ন হাসিয়া বলেন—মূর্খ বালক, পথ তো আমার শেষ হয়নি তোমাদের গ্রামে ধানের বনে, ঠ্যাঙাড়ে বীরু রায়ের বটতলায়, কি ধলচিতের খেয়াঘাটের সীমানায়! তোমাদের সোনা ডাঙা মাঠ ছাড়িয়ে, ইছামতী পার হয়ে পদ্মফুলে ভরা মধুখালি বিলের পাশ কাটিয়ে, বেত্রবতীর খেয়ায় পাড়ি দিয়ে, পথ আমার চলে গেল সামনে, সামনে, শুধুই সামনে দেশ ছেড়ে দেশান্তরের দিকে সূর্য্যাস্তের দিকে, জানার গণ্ডী এড়িয়ে অপরিচয়ের উদ্দেশ্যে...

দিন রাত্রি পার হয়ে, জন্ম পার হয়ে মাস বর্ষ, মন্বন্তর, মহাযুগ পার হয়ে চলে যায়—তোমাদের মর্ম্মর জীবন স্বপ্ন শেওলা ছাতা দলে ভ'রে আসে, পথ আমার তখনও ফুরায় না...চলে...চলে... চলে এগিয়েই চলে...অনির্বাণ তার বীণা শোনে শুধু অনন্তকাল আর আকাশ...সে পথের বিচিত্র আনন্দ-যাত্রার অদৃশ্য তিলক তোমার ললাটে পরিয়েই তো তোমায় ঘরছাড়া করে এনেছি।' ৫

বাংলা গদ্যর সূচনার কাল (১৮০০ খ্রীঃ) থেকে আরম্ভ করে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত প্রসারিত বাংলা গদ্যর বিভিন্ন বিষয়ক মোট পাঁচটি উদ্ধৃতি তুলেছি এখানে। বিষয় বিভিন্ন হলেও প্রত্যেকটি উদ্ধৃতিরই ভাষা স্বভাব স্বতন্ত্র; এবং এদের এ ভাষা বোঝা যায়। বিশ্লেষণ করে দেখা যাক :

ক : অনুচ্ছেদের ভাষা যেন আমাদের সঙ্গে, মুখোমুখি বসে, অন্তরঙ্গতায় কথা বলছে। ঠিক যেন দেখা যাচ্ছে গ্রাম বাংলার কোন মা, মামী পুকুরঘাটে নিত্যকার অভ্যাসমত বাসনমাজার কিংবা কলসভরার অবসরে সাংসারিক সুখদুঃখের খবরাখবর নিচ্ছেন। পরস্পরের কথাবার্তায় ঠিক সেই গার্হস্থ্য উত্তাপটুকু এখনও অনুভব করা যাচ্ছে যেন। এত ভাষাময় প্রাণবন্ত কি করে একটা লিখিত ভাষা হতে পারে? হতে পারে। ভাষার প্রাণ ভাব, যেমন মানুষের প্রাণ তার হৃদয়। কিন্তু মানুষের বিবিধ অঙ্গ রক্তসঞ্চারিত হয়েই তো হৃদয় সম্পন্ন মানুষকে পূর্ণতা দেয়। তার ভাব ভাষায় প্রকাশিত হয়। ভাষারও হৃদয়, ভাব কে প্রাণময় করে ভাষার বিবিধ অঙ্গ। শব্দ, বাক্য, শব্দক্রম, ক্রিয়া, উচ্চারণের প্রয়োজনীয় বিরাম, দরকার হয় ভাষাকে প্রাণময় ক'রে তুলতে। রক্তসঞ্চালনের মত ভাষাঙ্গে ভাবপ্রবাহ তখনি শুরু হয়। এখানকার (কঃ অনুচ্ছেদের) ভাষায় এই ভাবপ্রবাহ কার্যকরী। প্রতিটি শব্দ, শব্দসজ্জা, ক্রিয়াপদ এই ভাবপ্রবাহ সৃষ্টিতে সক্রিয়।

'শাকের ঘণ্ট' 'বাগুন ভাজা' 'ইলসামাচ ভাজা'র মত বাঙ্গালী মুখের রসনাতৃপ্তকারী শব্দাবলীর স্বাভাবিক ব্যবহার আরো গার্হস্থ্যসুন্দর হয়ে উঠেছে। 'মেঝে বৌ', 'বড় বৌ', 'জামাই', 'বুন' প্রভৃতি বাঙ্গালী সর্বনামের সহজ ব্যবহারে। 'রান্ধিতে বাড়িতে', 'কুটনা বাটনা' প্রভৃতি ক্রিয়া ও ক্রিয়াত্মক বিশেষ্য'র অতি পরিচিত রূপ চর্চায় ভাষা শুধু মুখরই হয়ে ওঠেনি এখানে, প্রত্যক্ষবৎ হয়েও উঠেছে ; 'বড়া', 'ডিমের বড়া', 'বেগুন ভাজা', 'পাকা কলা'র, 'অম্ল' 'সুকতানি' ও যেমন চোখের ওপর ভাসতে থাকে ; ঠিক তেমনি 'কাঁচা বাচা' পরিবেষ্টিত 'বড় বৌ'কেও পড়শী কোন মাসীর সঙ্গে কথারত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যেন। ভাষাতাত্ত্বিক এ ভাষাকে 'colloquial' বল্লেও এ ভাষা বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় না। বাংলা গদ্যের সূচনাকালের এই ভাষা-ঐশ্বর্য নিঃসন্দেহে চিরকালীন। এ ভাষা মুখোমুখি বসে কথা কয়, অন্তরঙ্গ। কেরীর শিল্প স্বভাবটিই এমন আপনার।

খ : অনুচ্ছেদের ভাষার স্বভাবটি কিন্তু এত অন্তরঙ্গ নয়। যুক্তি বিদ্ধ, পাণ্ডিত্যপূর্ণ বেশী। 'লজিক' পড়া পাঠকের কাছে এ ভাষা, কার্ভেতরীড, জেভন্স, বা মিলের 'প্রোপোসিশন' থেকে টানা কনক্লুশন' বলে মনে হবে। এ-ভাষা লজিকের মত কথা বলে।

(i) সকল কার্যের কারণ থাকে (ii) ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণে জগৎ সৃষ্টি হয়

সুতরাং ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ জগৎ সৃষ্টিকার্যের কারণ। বাক্যবিন্যাসে স্থাপত্য কলার দৃঢ় ছাপ, চিত্রকরের তুলির টান অনুপস্থিত ; সঙ্গীতের কোন সুরও নেই। শব্দগুলি তাই অনলঙ্কৃত, ক্রিয়াপদ প্রায়ই 'সমাপিকা'। 'নিশ্চয় করি', 'নির্ণয় করি', 'কার্য', 'কারণ' প্রভৃতি ক্রিয়াপদ ও শব্দ ব্যবহারে ভাষার যুক্তিবিদ্ধ, প্রমাণপ্রীতির স্বভাবটিই প্রকটিত। যে ভাষার স্বভাব এমন, সে ভাষা-শিল্পীর মানসপ্রকৃতিও এমন যুক্তিবাদবিদ্ধ হওয়াই স্বাভাবিক। রামমোহন রায়ের শিল্পস্বভাবে এই শাসনই লক্ষিত হয়।

গ : অনুচ্ছেদে ভাষা হাসছে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এর হাসি পাঠক উপভোগ করতে পারে। 'এচোড়ের ঘণ্ট' করিয়ে নির্মল হাসির যে ঝলক দেখা দিয়েছিল 'শ্রীক্ষেত্রে' 'কামরাঙা' 'ফল' 'দান' করার সংবাদ পাওয়া পর্যন্ত সে হাসির তোড় বৃদ্ধিই পেয়েছে। শব্দগুলো এমন ভাবে সজ্জিত, দাড়ি, কমাগুলো প্রয়োজনমত পাঠকের হাসির স্রোত নিয়ন্ত্রণে এমন দক্ষ যে ভাষার হাসির খুশি পাঠকের মন ও চোখ উভয়কেই তৃপ্তি দেয়। চোখের সামনে যেন দেখা যাচ্ছে এক ভণ্ড, ব্রাহ্মণ খেতে বসেছেন (সম্ভবতঃ শিষ্য বাড়ীতে) এঁচোড়কে 'গাছপাঠা' বলা হয় ; ব্রাহ্মণের সে খাদ্য গ্রহণ করা অনুচিত ; কিন্তু ব্রাহ্মণ ঘোর 'প্রাকটিক্যাল' 'শোধন'বিদ্যায় পারদর্শী ব্রাহ্মণ। 'সুপক্ক কদলী' আর 'গব্য ঘৃতের' প্রয়োজন ঘোষণা করেন। গুরুপাক 'ঘৃতে'র স্বভাব বিনষ্টকারী 'কদলী' আর 'কদলী'র 'শৈত্যগুণে'র কথা মহিমা ব্যাঞ্জক 'আয়ুর্বেদ শাস্ত্র'র বচন আউড়ে, ভোজনে রত ব্রাহ্মণ এক নিমেষেই যেন পাঠক চক্ষে লোভ আর ভণ্ডামীর পরিচয় নিয়ে প্রত্যক্ষবৎ। শব্দসজ্জায় ভাষা এত স্বাভাবিক যে একটু এদিক ওদিক হলেই তা আহত হতে পারে। 'অম্বল' শব্দের পরিবর্তে 'চাটনি' শব্দ ব্যবহার করলেই বাক্যের তাৎপর্যটি বিনষ্ট হবার সমূহ সম্ভাবনা। 'শ্রীক্ষেত্রে' 'কামরাঙা' 'ফল' 'দান' করাটাই স্বাভাবিক এ ব্রাহ্মণের পক্ষে, 'সুপক্ক কদলী' 'দান' করলেই বিপদ হত। 'এঁচোড়ের ঘণ্টে'র পরিবর্তে যদি 'কাচাকলা সেদ্ধ' ব্যবহৃত হত সমগ্র অনুচ্ছেদটির হাসির স্বভাব যেত

বদলে। হাস্যরসস্নিগ্ধ পরশুরামের মত শিল্পী তা হ'তে দেন নি। ভাষার হাসির ফাঁকে ফাঁকে ভাষাশিল্পীর খুশিও উপচে পড়েছে। হাস্যরসবিমুগ্ধ পাঠক নির্মল মনে তা আস্বাদন করেছে। ভাষার হাসি ভাল লেগেছে।

ঘ: অনুচ্ছেদের ভাষা গান গেয়ে কাঁদে। চোখের জলে আর গানের সুরে বেদনবিদ্ধ আনন্দ দেয় পাঠককে। অনুভূতিভে নিবিড় এ ভাষার ঐশ্বর্য সুদূর প্রসারী। এ ভাষা সঙ্গীতের রাগ 'কোমল গান্ধারে'র হাহাকারে পূর্ণ। প্রতিটি শব্দ বেদনাময় সঙ্গীতের সুরে গঠিত। 'কেবল' 'নীল' 'আকাশ' 'ধূসর' 'সঙ্গীহীন' 'গৃহহীন' 'সন্ধ্যা' 'ম্লান নেত্র' 'মৌন মুখ' 'সোনার চেলি-পড়া' 'অনন্ত প্রান্তর' শব্দগুলি সুরসঙ্গতিতে সঙ্গীত সমৃদ্ধ। ল | ম | ন | ণ | শ | ষ | স | বর্ণগুলি স্বতঃই সঙ্গীতময়। এ ভাষা এই সঙ্গীতবর্ণে সংগঠিত। অনিবার্য ভাবে অনুপ্রাসের স্বাভাবিক সুর প্রবাহ ভাষাকে সুরসঙ্গতিতে সমৃদ্ধ করেছে। শব্দসজ্জায় বিশেষণ নির্বাচনেও শিল্পী অপূর্ব সার্থক। 'কোমল গান্ধারের' বিষাদময় ব্যাঞ্জনার অতলান্ত নিবিড়তা সৃষ্টিতে 'অনড়-প্রান্তর' 'অসীম সন্ধ্যা' 'যুগ যুগান্তর কাল' 'একাকিনী' 'ম্লান নেত্রে' 'মৌন মুখে' 'শ্রান্ত পদে' প্রভৃতি বিশেষণ ব্যবহার বিশেষ দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছে। কংক্রিট +এ্যাবষ্ট্রাক্ট এবং এ্যাবষ্ট্রাক্ট+কংক্রিট উভয় রীতির বিশেষণ গঠন-পদ্ধতিই লক্ষিত হচ্ছে, যেমন—

কংক্রিট+এ্যাবট্রাক্ট	অ্যাবষ্ট্রাক্ট+কংক্রিট
সঙ্গী + হীন	ধূসর + পৃথিবী।

সমগ্র অনুচ্ছেদটির ভাষা যে সুরসঙ্গতিতে পূর্ণ তার মূলে কেবল এই শব্দ-সজ্জার কলা নৈপুণ্যই সক্রিয় নয়, একটি কমা, একটি সেমিকোলন ; আর একটি পূর্ণচ্ছেদও সঙ্গীতের নীড়, গমক, মূর্ছনাও সৃষ্টি করেছে। যে শিল্পীর ভাষা এমনি সঙ্গীত সৃষ্টি করতে পারে, সে ভাষাশিল্পীর স্বভাবও যে সঙ্গীত শাসিত, সুরময়, কবিত্বে ভরা তা যেন বুঝতে এবং প্রত্যাশা করতে অসুবিধা হয় না। রবীন্দ্রনাথ তো সঙ্গীত আর কবিতার নিবিড় শিল্পীই ছিলেন।

ঙ: অনুচ্ছেদ।—মানুষ হাসে, কাঁদে, গায়, ছবি আঁকে, গল্প করে, কথা বলে। ভাবে তার জীবনের প্রকৃত সত্য কি? শেষ কোথায়? পূর্ণতা কোথায়? ভাষা ও ভাবে, ঠিক এমনি করেই ভাবে। ঙঃ অনুচ্ছেদের ভাষা এমনি করেই ভেবেছে। তার সে ভাবনা মানুষের জীবনের অনিবার্য অগ্রগমনের মত চলেছে। ক্রমাগত সামনে, শুধু সামনে চলেছে। যেমন করে অপুর মত সকল মানুষই কোন না কোন বাঁশবন, ঠ্যাঙারে বীরু রায়ের বটতলা, ধলচিতের খেয়া-ঘাট, সোনাডাঙার মাঠ সব ছাড়িয়ে, ইছামতী নদী ডিঙিয়ে দেশ থেকে দেশান্তরে, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তের দিকে আনন্দর পথে অনন্ত অভিসার যাত্রা করে, চলে, শুধু চলে ঠিক তেমনি এ ভাষাটিও চলেছে ক্রিয়াপদ আর শব্দগুলির ঘাট অতিক্রম করে, 'ছাড়িয়ে' 'পার হয়ে' 'পাশ কাটিয়ে' 'পাড়ি দিয়ে' 'সামনে' 'সামনে' 'শুধুই' 'সামনে' 'দিন রাত্রি পার হয়ে' 'চলে যায়' 'চলে'...... 'চলে'......'এগিয়েই চলে।' ক্রিয়াপদের রথচক্রে ভাষার এই চলন ধর্ম ভাষার জীবন স্পন্দনকে পাঠকের কাছে আরও মধুময় করে তুলেছে এই 'পথের' 'বিচিত্র' 'আনন্দ যাত্রা'র শব্দ সঙ্গীত':—'মর্মর জীবন স্বপ্ন', 'অদৃশ্য তিলক', 'পথের দেবতা', 'প্রসন্ন হাসি', 'মধুখালি বিল',

'বেত্রবতী', 'ইছামতী'। যেমন সমাস তেমনি বিশেষণ, পাঠককে 'অনির্বাণ বীণা'র সুরে 'ঘর ছাড়া' করে 'ললাটে' 'অদৃশ্য তিলক' পরিয়ে 'পথের' 'বিভিন্ন আনন্দ যাত্রা'র যাত্রী করে। বিভূতিভূষণ এই জীবনপথের পথিক ছিলেন।

ছবি আর রূপকল্প (Picture of Image) এক নয়। ৬ উদ্ধৃতিগুলির মধ্যে ছবিও আছে রূপকল্পও আছে। মানুষ যেমন ছবি আঁকে, রঙে, রেখায়; যেমনি রূপকল্প সৃষ্টি করে উপমার আশ্রয়ে, রূপকের আবরণে; ঠিক তেমনি ভাষাও ছবি আঁকে, রূপকল্প সৃষ্টি করে। (ক) অনুচ্ছেদে আর (খ) অনুচ্ছেদে ভাষায় ছবি আছে, রূপকল্প নেই। ছবিগুলিও কংক্রিট। চোখের'পরে যেন ডেকে ওঠে সদ্য ভাজা 'ইলসামাচ', 'বেগুন ভাজা' 'এঁচোরের ঘণ্ট' 'সুপক্ক কদলী' 'গব্য ঘৃত' 'কামরাঙার অম্বল'। (গ) অনুচ্ছেদটিতে একটিও ছবি বা রূপকল্প নেই। (ঘ) অনুচ্ছেদ ও (ঙ) অনুচ্ছেদে ছবিও আছে রূপকল্পও আছে। ছবিগুলি বৈচিত্র্যপূর্ণ, কখনো পুরোপুরি অ্যাবস্ট্রাক্ট, কখনো কম্পোজিশনের। যেমন 'ধূসর পৃথিবী', 'নীল আকাশ', 'অসীম প্রান্তর (abstruct) আবার কম্পোজিশনেও দেখুন 'সোনার চেলি-পরা বধূ; শুধু কংক্রিট ছবিও আছে যেমন: 'ধলচিতের খেয়াঘাট', 'পদ্মফুলে ভরা মধুখালির বিল'; বিশুদ্ধ এ্যাবষ্ট্রাক্ট আর্টও কত সুন্দর: 'সূর্যোদয় ছেড়ে সূর্যাস্তের দিকে, 'জানার গণ্ডী এড়িয়ে অপচিয়ের উদ্দেশ্যে'।

আর রূপকল্প? 'সোনার চেলি পড়া', 'একটুখানি ঘোমটা টানা' 'ম্লান নেত্রের' 'নতমুখী' 'শান্তপদ' 'বধূর সঙ্গে নির্জন "সন্ধ্যা"র উপমালোকে (চ) অনুচ্ছেদের ভাষার জীবন স্পন্দন অতুলনীয় কবিত্বপূর্ণ সঙ্গীত সমৃদ্ধ হয়েছে। প্রকৃতির উপমা বধূ। Abstruct + Concrete প্রকৃতির (Type) রূপকল্প এটি। (ছ) অনুচ্ছেদের 'পথের দেবতা'র 'পথচলা'র সঙ্গে 'অপু'র মত মানব জীবনের অনিবার্য পথ পরিক্রমণ, জীবনের অগ্রসরণের উপমালোকে ভাষার চলনধর্মিতা প্রকাশিত হয়েছে। ছবি আর রূপকল্প পরস্পর সমভাবাত্মক হয়েছে এখানে। বেত্রবতী, ইচ্ছামতী, সোনাভাঙামাঠ, পদ্মফুলে ভরা মধুখালি বিল, 'ধলচিতের খেয়া ঘাট' সব ছবিগুলিই এই রূপকল্পের জীবনপ্রসরণকে গুরুত্ব দিয়েছে। 'পথের দেবতার পথচলা'টা এ্যাবষ্ট্রাক্ট; কিন্তু পরিবেশনায় ছবিগুলির অস্তিত্ব কংক্রিট আর্টে রূপকল্পটিকে প্রকাশিত ক'রেছে। মূল উপমেয় মানুষের অনিবার্য জীবনাগ্রসরণটি এ্যাবষ্ট্রক্ট।

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাংলা গদ্য ভাষার প্রতিনিধি স্থানীয় গদ্য শিল্পীদের রচনার উদ্ধৃতি তুলে বক্ষ্যমান আলোচনাটি উপস্থিত করেছি। বাংলগদ্যর সেই সূচনার সময় যখন সাগর পারের মুচির পুত্র ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের (১৮০০ খ্রীঃ) অধ্যক্ষ পদে এসে বাংলা ভাষায় গ্রন্থ রচনা করলেন তখনকার সেই আদি বাংলা গদ্য ভাষার ভাষাটি পর্য্যন্ত কেমন সহজ বোধগম্য। বাংলা গদ্য ভাষার গল্প করার স্বভাবটি বহুকালের বলেই মনে হচ্ছে। মুখোমুখি বসে অন্তরঙ্গতায় যে ভাষা প্রায় জন্মলগ্ন থেকে গল্প বলতে অভ্যস্ত সে ভাষার ঐশ্বর্য'র স্বীকৃতি জন্মগত। অথচ আশ্চর্য! ভাষার এই বিশাল ঐশ্বর্যের ভাষা ভিত্তিক বিশ্লেষণ এখনো অবকাশের অপেক্ষা রাখে। যে ভাষা কাঁদায়, হাসায়, গান শোনায়, ছবি দেখায়; জীবনের প্রতি পদক্ষেপে সঙ্গরূপে কাছে দাঁড়ায়, সে ভাষার ভাষা বৈশিষ্ট্য জানবার এবং জানাবার একটা পবিত্র দায়িত্ব বোধ করি

বাংলা ভাষার জন্মগত অধিকার। ভাষার ভাষা বিচারের কলা কৌশল ও আজ নূতন হয়েছে ; সুযোগ আর সম্ভবনা ভরা বাংলা ভাষার বিশ্লেষণ আজ বাংলা সাহিত্যের একটা প্রয়োজন। 'পণ্ডিতী ভাষা', 'আলালী ভাষা' 'অক্ষয়ী গদ্য' বীরবলীয় ভাষা' রাবেন্দ্রিক ভাষা (বলতে হলে বলা উচিত 'রবীন্দ্র-ভাষা') প্রভৃতি ভাষা সম্পর্কীয় কথাগুলি একান্ত অর্থহীন হয়ে পড়ে যদি না এঁদের রচিত ভাষাগুলির ভাষা আমরা না বুঝতে পারি, না পড়তে পারি। কতকগুলো গঠিত বড় বড় স্মৃতিসৌধ দেখেই 'তাজমহল', 'কুতব' 'হুমায়ুন সৌধ'র রূপ বর্ণনা করার চেয়ে ঐ বড় বড় সৌধগুলির গঠনের মূলে টুকরো টুকরো নানা বর্ণের অমূল্য পাথর রয়েছে সে গুলিকে চেনা, জানার প্রয়োজন আগে ; তারাই একত্রে সমগ্র সৌধটি। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাই। অমুক অনুচ্ছেদটি (ধরা যাক ঘঃ অনুচ্ছেদটি) রোমান্টিসিজিমে রচিত, অমুক অনুচ্ছেদটি (ধরা যাক ঙ অনুচ্ছেদটি) মিস্টিসিজিমের চূড়ান্ত—প্রভৃতি মন্তব্য করার আগে ঐ সকল অনুচ্ছেদ গঠনকারী ভাষার উপকরণগুলি একবার পরীক্ষা করে দেখা উচিত যে, সেগুলির মধ্যে সত্যিই রোমান্টিসিজিমের বা মিস্টিসিজিমের কোন লক্ষণ আছে কিনা! কাঁচ দিয়ে ছবি বাঁধানো যায় কাঠ দিয়ে ছবির ফ্রেম তৈরী হয়। কাঠ দিয়ে ছবি বাঁধাতে গেলে আর কাঁচ দিয়ে ছবির ফ্রেম তৈরী করতে গেলে ছবি আর ছবির ফ্রেম দুটোই নষ্ট হয়। ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এই সিদ্ধান্তই গ্রাহ্য ; ভাষাই সাহিত্য সৃষ্টি করে, অতএব ভাষার পরিচয়েই সাহিত্যের পরিচয় উদ্ঘাটিত। আগে 'Facts' তারপর 'Theme'; 'Facts'ই 'Theme' কে গঠন করে ; সৃষ্টির এই নিয়মেই সকল কিছু গঠিত হয়। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেও এই নিয়ম কার্য্যকরী।

১। উইলিয়ম কেরী, কথোপকথন (১৮০১)। (দ্রষ্টব্য : নিখিল সেন, পুরোনো বই (১৯৬৪) পৃঃ ১৭।

২। রামমোহন রায়, বেদান্ত গ্রন্থ (১৮১৫)।

৩। পরশুরাম, গড্ডালিকা (১৩৩২—১৩০৯) পৃঃ ২৩।

৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ছিন্নপত্র ঃ পত্র সংখ্যা ১৭২। (১৮৯৫ খ্রীঃ ১৬ ডিসেম্বর)।

৫। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পথের পাঁচালী (১৩৩৫ সাল) পৃষ্ঠা ৩৫০।

৬। Every image is ultimately based on some kind of association between two terms.—ULLMANN STEPHEN, style in the French Novel (1956) P,211.

রবীন্দ্রনাথের চার অধ্যায় ঃ অতীন্দ্রনাথ

শুভব্রত রায়চৌধুরী

স্বভাবের মূলধন

"কী বলব বাবাজি, আমার যদি মেয়ে থাকত আর এমন লেখা যদি সে তোমার কলম থেকে বের করতে পারত তা হোলে সার্থক মানতুম আপন পিতৃপদকে।" (চা অ।৮৫) যার সম্বন্ধে কানাই গুপ্তের মতো অকাল্পনিক প্র্যাক্‌টিকাল লোকের মুখেও এই স্নেহমধুর প্রশস্তি সে অতীন্দ্রনাথ। আর, যে-লেখা প'ড়ে তার এই উচ্ছ্বাস সেটা অতীন্দ্রনাথের ডায়ারি। ডায়ারি-রাখা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ "পঞ্চভূত"-এ একটি প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য মন্তব্য করেছেন, "ভিতরে একটা লোক প্রতিদিন সংসারের উপর নানা চিন্তা নানা কাজ গাঁথিয়া গাঁথিয়া এক অনাবিস্কৃত নিয়মে একটি জীবন গড়িয়া চলিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ডায়ারি রাখিয়া গেলে তাহা ভাঙিয়া আর একটি লোক গড়িয়া আর একটি দ্বিতীয় জীবন খাড়া করা হয়।" (পঞ্চভূত।১০) স্বধর্মের ছাঁচে যখন নানা চিন্তা নানা কাজে গেঁথে গেঁথে জীবনকে সহজ স্বাভাবিক নিয়মে গড়ে তুলি, তখন ডায়ারির জীবন সেখানে বিসদৃশ কৃত্রিমতা। কিন্তু অতীন্দ্রের কাছে জীবনটাই সত্য, অন্যটা কৃত্রিম। ডায়ারির জীবনে প্রকাশ পেয়েছে তার ভাবের রাজ্য। কানাই গুপ্ত যথার্থ বলেছে, "কেবল ভাবের দিক থেকে এত ঘৃণা এত অশ্রদ্ধা, যে, তা কোনো পেন্সনভোগী মন্ত্রীপদপ্রার্থীর কলম থেকে বেরোলে রাজদরবারে তার মোক্ষলাভ হোতো।" (চা, অ,।৮৫) একদিকে বাস্তব জীবন যেখানে চিন্তায় কাজে স্বধর্মের কোনো ছাঁচ নেই, আর-একদিকে ভাবের রাজ্য যেখানে দৈনন্দিন কৃত্রিম অর্থহীন কর্মকলাপের নিরন্তর বিশ্লেষণ মূল্যায়ন। সত্তার এই দুস্তর মেরুবিভাগ অতীন্দ্রের ট্র্যাজেডি।

অতীন্দ্র চরিত্রে যেটা সকলের নজরে পড়ে সেটা তার স্বাতন্ত্র্যের বর্ণ-বৈচিত্র্য। এই 'এক বুনোনী' চরিত্রের মানুষটির প্রতি ইন্দ্রনাথের গভীর ঔৎসুক্য কারণ "ওর বিপদ ঘটাবার ডাইনামাইট আছে।" বটু তাকে ভয় করে কারণ অতীন "ওর থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জাতীয় বলে।" এলার কাছে সে "শ্যাওলার মধ্যে শতদল পদ্ম"। অতীন্দ্রের সাহিত্য প্রতিভার পরিচয় পেয়ে কানাই তো স্পষ্টই বলে ফেলল, "তোমাকে দলে জড়িয়ে ইন্দ্রনাথ ভায়া দেশের লোকসান করেছে।" চরিত্রবল, পৌরুষ, ব্যক্তিত্ব, প্রতিভার প্রতিশ্রুতি—স্বভাবের বিভিন্ন দিক দিয়ে অতীন্দ্রের স্বাতন্ত্র্য বিকীর্ণ হয়ে পড়ে। এলা যখন বলে "কারো মতো নও যে তুমি; মস্ত তুমি", তখন মনে হয় না কথাগুলির মধ্যে কোনো অত্যুক্তি আছে। অনেক গুণের আধার অতীন্দ্র—অলোকসামান্য তার প্রকাশ। কিন্তু চরিত্রচনার বৈশিষ্ট্যে এই অসাধারণতা সত্ত্বেও সে কখনো অতি-মানুষ হয়ে ওঠে নি। অতীন্দ্র ভুল করেছে, ভুল করে তুষের মতো জ্বলেছে, জ্বলতে জ্বলতে অধীর হয়ে মুক্তির আশায় উৎকণ্ঠ প্রতীক্ষায় দিন কাটিয়েছে। সে আমাদের কাছে অতি মানুষ নয়, এক অতি-আপন মানুষ যার সুখদুঃখ আশানিরাশা আমাদের মনে গভীর সুরে বাজে।

আপাতদৃষ্টিতে এমন একটা ধারণা হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে অতীন্দ্র অতি-মানুষ না হলেও

অনেকটা অপ্রাকৃত। কৌলিন্যবোধ, মনীষা, মানবিকতা, সৌন্দর্যপ্রেম, সত্যানুসন্ধিৎসা—এগুলি তার রুচিবোধের অলঙ্কার অন্তরের মূলধন। যে-কাজ এই মূলধনের উপর রাহাজানি করে, মানুষের শ্রেয়বোধকে দেউলে করে দেয়, অতীনের জীবনবাদে সে কাজ স্বধর্মদ্রোহী। অথচ, আশ্চর্য এই যে অতীন্দ্রই কিনা এমন এক কর্তব্যের পথে আমরণ চলার পণ রইল প্রাণপণ আঁকড়ে যে-পথে তার শ্রেয়বোধ প্রতিমুহূর্তে নির্যাতিত! সন্দেহ জাগে, রবীন্দ্রনাথ হয়তো একটা মতবাদকে প্রমাণ করবার জন্যই তাকে সন্ত্রাসবাদী দলের সঙ্গে শেষপর্যন্ত বেঁধে রেখে দিয়েছেন। ফলে, সেই মতবাদ যত-না প্রমাণিত হয়েছে তার চেয়ে বেশী আহত হয়েছে অতীন্দ্র চরিত্র।

অতীন্দ্রের ব্যক্তিত্বে একটা আন্তর্বৈষম্য আছে সে কথা অস্বীকার করা যায় না। করবার দরকারও নেই। কারণ, এই আন্তর্বৈষম্যই তার চরিত্রের গতি এনে দিয়েছে। রুচিপ্রবণতা তার স্বভাবের ধর্ম; আবার রুচিধর্মিতাই তাকে রুচিবিরুদ্ধ পথে টেনে নিয়ে গেছে দুর্নিবার আকর্ষণে। স্বভাবহননের গ্লানি তাকে নিত্য অঙ্কুশবিদ্ধ করেছে; অথচ এমনি করে স্বভাবকে মেরেই সে যেন তার স্বভাবকে নিয়ত রক্ষা করে চলেছে। এই দোটানার কঠিন সংঘাত থেকে উৎসারিত হয়েছে তার অনুভূতির তীব্রতা, ভাবলোকের কালবৈশাখী। আন্তর্বৈষম্যই অতীন্দ্রের চরিত্রে কালো-মেঘ-ভরা আকাশে পথ-দেখানো আলো: এমন অনুমান করা অসংগত হবে না।

ভাবপ্রবণ অতীন্দ্রের মধ্যে আমরা হৃদয়বৃত্তির ত্রিধারা দেখিতে পাই। সে সাহিত্য ভালোবাসে, ভালোবাসে মনুষ্যত্ব আর ভালোবাসে এলাকে। সাহিত্য তার মনের বিহার ক্ষেত্র, মনুষ্যত্ব জীবনের আদর্শ; আর সবার মূলে প্রেরণার উৎস হল এলা; জীবনযাত্রায় এই তিনের সমন্বয় ঘটবে এমন আশা তার ছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রে তারা অবচ্ছিন্নই রয়ে গেল। প্রেম, আদর্শ ও প্রৈতি—তারা প্রকাশ পেল পরস্পর-বিরোধী দিকে, বিকৃত পথে। আদর্শের সঙ্গে প্রৈত্রির মিলন ঘটল না, মিলন ঘটল না প্রৈতির সঙ্গে প্রেমের। ফলে, ছন্নছাড়া জীবনের অবশ্যম্ভাবী ট্র্যাজেডি ঘনিয়ে এল তার ভাগ্যে। অতীন্দ্রকে দেখলে Erich Heller-এর মত মনীষী নিশ্চয় বলতেন যে সত্যিকারের "disinherited mind"। যেন, হালভাঙা ও পালছেঁড়া নৌকার নিরুদ্দেশ যাত্রা।

এলার কাছে অতীন্দ্র নিজেকে "কথায় পাওয়া মানুষ" বলে বর্ণনা করেছে। সে কথা ভালোবেসে। ভালোবাসে তার মনের ছবিকে কথা কওয়াতে শৈশবের স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে অতীন্দ্র বলে, "যখন আমার বয়স অল্প, ভালো করে মুখে কথা ফোটেনি, তখন সেই মৌনের অন্ধকারের ভিতর থেকে কথা ফুটে ফুটে উঠছিল, কত উপমা কত তুলনা, কত অসংলগ্ন বাণী।" (চা, অ,।৭৪) জ্ঞানোন্মেষের শুরু থেকে এই যেন তার জগৎ, কথার জগৎ: আপন মনের রঙে রসে কল্পনায় উপমায় রচিত এক সুন্দর সৃষ্টি। এমন এক ভাবাত্মক মন দিয়ে বড় হয়ে অতীন্দ্র যখন সাহিত্যলোকে প্রবেশ করল সেখানে সে যেন আপন ঈপ্সিত রাজ্যের সন্ধান পেল; সে দেখল, "ইতিহাসের পথে পথে রাজ্য সাম্রাজ্যের ভগ্নস্তূপ, দেখলুম বীরের রণসজ্জা পড়ে আছে ভেঙে, বিদীর্ণ জয়স্তম্ভের ফাটলে উঠেছে অশথ গাছ; বহু শতাব্দীর বহু প্রয়াস ধূলার স্তূপে স্তব্ধ। কালের সেই আবর্জনারাশির সর্বোচ্চে দেখলুম অটল বাণীর সিংহাসন। সেই সিংহাসনের পায়ের কাছে যুগযুগান্তরের তরঙ্গ পড়ছে লুটিয়ে লুটিয়ে। (চা, অ,।৭৪) একদিকে ইতিহাসের ভঙ্গুর পৃথিবী,

আর একদিকে সাহিত্যের অবিনশ্বর অমরাবতী। কালের মধ্য দিয়েই ইতিহাসের ক্রমবিকাশ সম্ভব। অথচ, যা-কিছু কালের মধ্যে বর্তমান তার ক্ষয় অনিবার্য। জীবন যৌবন ধন মান—কি জাতিগত কি ব্যক্তিগত—সবই তো কালসমুদ্রের ভেসে-চলা প্রবাহ। আজকের বিরাট কীর্তি—কাল সে অশথ-ছায়া-ঢাকা ভগ্নস্তূপ। কালের প্রভাব কাটিয়ে যা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে একমাত্র তার সত্তাই হল শাশ্বত অবিনাশী। কালাতীত বলেই সেই সত্তা ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহ নয়। সাহিত্যই হল মানুষের সেই কালজয়ী প্রয়াস। তাই দেখা যায়, কত সিংহাসন গড়া হল কত ভাঙল। কিন্তু বাণীর সিংহাসন অক্ষয় অমর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কালসমুদ্রের তীরে। কালস্রোত যেন যুগযুগান্তরের তরঙ্গ দিয়ে সেই সিংহাসনের পদতল ধুইয়ে দিয়ে বয়ে চলেছে। মন চায় এমন সত্য যা ধ্রুব যা ধ্বংসলীলার উর্ধ্বে। কালাশ্রয়ী পরিবর্তমান ইতিহাসে সে সত্যের সন্ধান নেই, আছে কালজয়ী সাহিত্যে। অতীন্দ্রের কাছে সাহিত্য লৌকিক সংজ্ঞার দ্বারা পরিসীমিত নয়। সত্য-সুন্দর-শিব-বোধের অবিনশ্বর বাণীমূর্ত রূপ হল সাহিত্য। সাহিত্যলোকে তাই সে খুঁজেছিল তার জীবনসাধনার লক্ষ্য। এ কথা প্রকাশ পায় অতীনের একদা-লালিত আশায়, "কতদিন কল্পনা করেছি সেই সিংহাসনের সোনার স্তম্ভে অলঙ্কার রচনা করবার ভার নিয়ে এসেছি আমিও।" (চা, অ,।৭৪)

সাহিত্যানুরক্তি অতীন্দ্রের মনে যে কত গভীরে ঠাঁই পেয়েছে, তার আভাস পাওয়া যায় তৃতীয় অধ্যায়ে। ভুতুড়ে পাড়ায় পরিত্যক্ত পুরোনো দালানে অজ্ঞাতবাসকালে তার নিঃসম্বল নির্বান্ধব ফেরারী জীবনের সঙ্গী শুধু কতকগুলো বই—"কাব্য, তার কিছু ইংরেজী আর দুই একখানা বাংলা।" ভ্রষ্টজীবনের শেষ অঙ্কে পৌঁছেও অতীন এগুলির সাহচর্য ছাড়তে পারে নি, তার কারণ"...পাছে নিজের জাত ভুলি। ওরি বাণীলোকে ছিল আমার আদি বসতি। পাতা খুললেই পেন্সিলে চিহ্নিত তার রাস্তাগুলির নির্দেশ পাবে।" (চা, অ,।৯৬) চেনা জগৎ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে সে কর্মজীবনের যে-জগতে এসে পড়েছে সেটা তার কাছে অচেনা অদ্ভুত অকাম্য; সেখানে সে সত্যিই "misfit"।

এমন জগতে অতীন কেমন করে এসে পড়ল, সে প্রশ্নের উত্তর মেলে তার প্রেমের ইতিহাসে। সাহিত্যিক-ছাঁচে-ঢালা রোমান্টিক মন তার। যে-চোখ দিয়ে জগৎকে সে দেখেছিল তাতে রঙ—সাহিত্যের রঙ রোমান্সের রঙ। এলাও সেই রঙে রঙীন। "প্রহর শেষের আলোয় রাঙা" এক চৈত্রদিনে প্রথম যখন এলা তার জীবনে আবির্ভূত হল, সে এক অলৌকিক অভিজ্ঞতা যেন ভাগ্যলক্ষ্মী সৌন্দর্যের এক আশ্চর্য দান নিয়ে সহসা তার সামনে এসে দাঁড়াল। এমন "অপরিসীম ঐশ্বর্য প্রত্যক্ষ হবে ওর জীবনে, সে কথা এর আগে ও কখনই সম্ভব বলে ভাবতে পারে নি, কেবল তার কল্পরূপ দেখেছে কাব্যে ইতিহাসে; বারেবারে মনে হয়েছে দান্তে বিয়েত্রিচে নূতন জন্ম নিল ওদের দুজনের মধ্যে।" (চ, অ,।৮৮) তার প্রেম এবং বিপ্লবী জীবনের সূচনায় ছিল এই সাহিত্যিক নজিরের ইঙ্গিত।

প্রথম দর্শনেই প্রেমের উন্মেষ। অতীন্দ্র একা বসে ছিল খেয়াস্টীমারের ফার্স্টক্লাশ ডেক-এ বেতের কেদারায়—গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী, পাট-করা মুগার চাদর কাঁধে। এলা তখন জনসাধারণের

দলে, ডেক-প্যাসেঞ্জার। সেই দিনটিকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলবার প্রয়াসে অতীন্দ্র বলে : "হঠাৎ আমার পশ্চাদ্বর্ত্তী অগোচরতার মধ্য থেকে দ্রুতবেগে এসে পড়লে আমার সামনে। আজো চোখের উপর দেখতে পাচ্ছি তোমার সেই ব্রাউন রঙের সাড়ি ; খোপার সঙ্গে কাঁটায় বাঁধা তোমার মাথার কাপড় মুখের দুইধারে হাওয়ায় ফুলে উঠেছে। চেষ্টাকৃত অসঙ্কোচের ভান করেই প্রশ্ন করলে,—আপনি খদ্দর পরেন না কেন ?" (চা, অ,।৫২) এলার গলার সুরটি শুনেই অতীন্দ্রের "সর্বশরীর চমকে উঠল, সেই সুর আমার মনের মধ্যে এসে লাগল হঠাৎ আলোর ছটার মতো ; যেন আকাশ থেকে কোন এক অপরূপ পাখী ছোঁ মেরে নিয়ে গেল আমার চিরদিনটাকে।" (চা, অ,।৫৩) অতীন্দ্রের কথাগুলি তার অন্তর্বিপ্লবের এক মুখর বর্ণনা। এলার আবির্ভাব যেন তার চিরপরিচিত সত্তাকে মুছে ফেলে দিল। হঠাৎ-পাওয়ার আকস্মিকতায় তার 'পশ্চাতের আমি' যেন হারিয়ে গেল চিরতরে। শৌখীন বিলাসী অভিজাত অতীন্দ্র তার কাপড়ের তোরঙ্গ দেশব্রতা এলার পায়ে উজার করে ঢেলে দিয়েছিল ; আর সেই সঙ্গে দিয়েছিল তার ভবিষ্যৎকেও। পরিহাসছলে এলাকে সে বলেছে, "অপরিচিতা মেয়েটির অভাবনীয় স্পর্দ্ধায় যদি রাগ করতে পারতুম তাহোলে সেদিনকার খেয়াতরী এত বড়ো আঘাটায় পৌছিয়ে দিত না—ভদ্র পাড়াতেই শেষ পর্যন্ত দিন কাটত চলতি রাস্তায়।" (চা, অ;।৫৩)

অন্তর্বিপ্লবের প্রণোদনায় অতীন পা বাড়াল রাষ্ট্রবিপ্লবের পথে। সে এলাকে চেয়েছিল একান্ত করে পেতে। "তোমার সঙ্গে মিলতে চেয়েছিলুম, এইটে অত্যন্ত সহজ কথা। দুর্জয় সে লোভ। প্রচলিত পথটা ছিল বন্ধ। মরীয়া হয়ে জীবন পণ করলুম বাঁকা পথে। তুমি মুগ্ধ হোলে।" (চা, অ,।৭৩) প্রচলিত পথে ঈপ্সিত মানুষটিকে সম্পূর্ণ করে পাওয়া যখন শূন্য মনে হল তখন না-পাওয়ার অভাবটাকে সে পূর্ণ করতে চাইল এলার সান্নিধ্য দিয়ে। সহধর্মিতার মিলনবন্ধনের পরিবর্তে শুধু সহকর্মিতার বন্ধনহীন গ্রন্থী। সামান্য এই সাহচর্যের পাওয়া ; কিন্তু এইটুকু দিয়েই তার কবিমন স্বর্ণপ্রতিমা গড়েছে শূন্য মন্দিরে, আসঙ্গ লাভ করেছে কল্পনায় : "তোমার ঐ ছিপছিপে দেহখানি কথা দিয়ে দিয়েই মনে মনে সাজিয়েছি—তুমি আমার সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা, তুমি আমার সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা।" (চা, অ,।৭৫) এই বিদেহী পাওয়া এক দিকে যেমন তার মন ভরিয়ে দেবার প্রয়াস পেয়েছে, অন্যদিকে তেমনি তার না-পাওয়ার বেদনাকে তীব্রতর করে তুলেছে। না-পাওয়ার মূলে ছিল এলার পণ। তার ক্ষোভের আগুন সেই পণকে দহন করেছে অবিরাম ; তবুও তার অশান্ত অন্তর কিছুতেই ভুলতে পারে না, "আমি ভেঙেছি আমার স্বভাবকে, কুসংস্কারে অন্ধ তুমি ভাঙতে পারলে না তোমার পণকে যার মধ্যে সত্য ছিল না…"। (চা, অ;।১২৩)

অতীন্দ্র যদি বিশ্বাস করতে পারত যে, পণগ্রহণের মধ্যে কোনো যৌক্তিকতা আছে সত্য আছে, তবে হয়তো সে একটা আপস করে নিত। তার জীবনবাদ বলে, নারীর ধর্ম ভালোবাসা। যে-পণ ভালোবাসার পরিপন্থী, সে তো স্বধর্মনাশক। আর, স্বধর্মনিধনের মধ্যে আছে ধর্মচ্যুতি, আছে নীতিব্রাত্যতা। ব্রত যদি এমন হয় যে, তার উদ্‌যাপনের জন্য ভালোবাসার অস্বীকার বা উচ্ছেদ প্রয়োজন, তবে নারীর কাছে সেই ব্রত স্বধর্মবিরোধী। ভালোবাসা-বর্জিত কর্তব্যানুষ্ঠানের

আয়োজন আত্মদ্রোহিতার নামান্তর। তেমন আয়োজন প্রারম্ভেই আত্ম-অভিশপ্ত। শুধু তাই নয়, সেই ব্রত মানবতাবিমুখ। মানুষে মানুষে মিলন ঘটানোই মানুষের ধর্ম। ভালোবাসা হল মনমিলানো শক্তি। ক্ষুব্ধ রিক্ত বিপ্রলব্ধ অতীন্দ্র তাই এলাকে ধিক্কার না দিয়ে পারে্‌না, "অধার্মিক তোমার পণগ্রহণ, এ পণকে রক্ষা করাও প্রতিদিন তোমার স্বধর্মবিদ্রোহ।" (চা, অ,।৫৪)

নারীধর্ম সম্বন্ধে এলা-অতীন্দ্রের ধারণা ভিন্নমুখী। এলা মনে করত, মেয়েদের ভালোবাসা স্বভাবসংকীর্ণ। তারা কেবলি ক্ষুদ্র সংসারগণ্ডীর মধ্যে পুরুষকে বেঁধে রাখতে চায়। অথচ পুরুষের ধর্মই হ'ল কর্মক্ষেত্রের বিরাট পরিসরের মধ্যে পৌরুষপ্রতিষ্ঠার সাধনা। এলা বলে, "সাধনার ক্ষেত্রে পুরুষকে প্রমাণ করতে হয় তার শ্রেষ্ঠতা।" (চা. অ. | ৬৩) সুতরাং নারীর ভালোবাসা পুরুষের আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে প্রতিবন্ধক। নিঃস্বার্থ এলা অতীন্দ্রকে আপন আত্মকেন্দ্রিক চাওয়া-পাওয়ার আশ-পাশ থেকে মুক্ত রেখেছে তাকে দেশের কাজে এগিয়ে দিয়েছে নিঃসংকোচে কারণ দেশের বিরাট কর্মক্ষেত্রের অবাধ প্রসারে অতীন্দ্রের অলোকসামান্য ব্যক্তিত্ব পূর্ণ প্রকাশ লাভ করবার সুযোগ পাবে এই দৃঢ় বিশ্বাস তার ছিল। এ ধরণের যুক্তি অতীনের কাছে শুধু যে ভ্রান্ত তা নয়, অপমানকর বটে। এলার মনোভাবের মধ্যে এমন একটা তদারকী প্রবৃত্তি একটা অভিভাবকত্ববোধের আভাস পাওয়া যায় যেটা তার পৌরুষকে আহত করে। পুরুষ জানে কোনটা তার আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ। যে-পুরুষ তা জানে না, নির্দিষ্ট পথে চলবার ক্ষমতা যে-পুরুষের নেই, সে 'পুরুষ' নামেরই অযোগ্য। তেমন পুরুষ "নাবালক"—অতীন্দ্রের কাছে তারা "মায়ের খোকা", "স্ত্রীর খোকা" বই আর কিছুই নয়। "যেখানে পুরুষের পৌরুষ দুর্বল সেখানেই মেয়েরা নেবে আসে আর নাবায় নীচতার দিকে।" (চা. অ. | ৬৫)

যদিও সে "পূর্বপুরুষগত অভ্যাস"-এর উল্লেখ করেছে, অতীন্দ্রের কামনাকৌলীন্য কোনো orthodox বা সনাতনী নীতিবোধপ্রসূত ব'লে মনে হয় না। ভালোবাসার মধ্যে দেহজ কামনার প্রভাব অতীন অস্বীকার করে নি, বরং সে অসংকোচে বলেছে, "ভালোবাসা তো বর্বর! তার বর্বরতা পাথর ঠেলে পথ করবার জন্যে। পাগ্‌লাঝোরা সে, ভদ্রসহরের পোষ-মানা কলের জল নয়।" (চা. অ. | ৭৫) অতৃপ্ত বাসনার কশাঘাতে জর্জর হয়ে অতীন্দ্র ক্ষেদোক্তি করেছে "যৌবন যখন প্রথম এসেছিল তখনো মেয়েদের চিনি নি। কল্পনায় তাদের দুর্গম দূরে রেখে দেখেছি; প্রমাণ করবার সময় বয়ে গেল যে, তোমরা যা চাও তাই আমি। অন্তরে আমি পুরুষ, আমি বর্বর উদ্দাম। সময় যদি না হারাতুম এখনি তোমাকে বজ্রবন্ধনে চেপে ধরতুম, তোমার পাঁজরের হাড় টন টন করে উঠ্‌ত; তোমাকে ভাববার সময় দিতুম না, কাঁদবার মত নিশ্বাস তোমার বাকী থাকত না, নিষ্ঠুরের মতো টেনে নিয়ে যেতুম আপন কক্ষপথে।" (চা. অ. | ৭৬) এই যে পাগলাঝোরা passion এ তো একটা সহজাত মনোবৃত্তি, ভালোবাসাকে উর্বর শ্যামল-সুন্দর ক'রে তোলাই তার প্রবণতা। কিন্তু তাই ব'লে ভালোবাসায় যে কেবল দেহের প্রাধান্য তা নয়। প্রেম যেমন দেহহীন নয়, তেমনি আবার দেহসর্বস্বও নয়। দেহের অন্দরমহলে যে-মন আছে প্রকৃতপক্ষে প্রেম সেই মনকেই খুঁজে ফেরে। দেহের মূল্য আছে, তার কারণ দেহ একটি বিশিষ্ট মনের আধার। যেখানে ভালোবাসা অঙ্গের আঙ্গিনায় ঘুরে বেড়ায়, অন্তরের অন্তঃপুরে

প্রবেশ করতে পারে না, সেখানে তার রূপ পালটে যায়, সে স্বকীয় অর্থ হারিয়ে ফেলে। তখন সে ভোগবাসনায় ক্লেদাক্ত। বটুর মত মাংসপ্রধান চরিত্রেই তার প্রকাশ। দেহের সার্থকতা প্রস্ফুট হয়ে ওঠে ভালোবাসার দৈবস্পর্শে। যখন সে স্পর্শ লাগে প্রিয়জন বলে ওঠে, "আজু মঝু দেহ ভেল দেহ"। ব'লে ওঠে "অঙ্গ আমার অর্ঘের থলে | অরূপ ফুলে"। এমনি এক বিশ্বাসের উপরেই অতীন্দ্রের প্রেমের প্রতিষ্ঠা; এমনি এক প্রতীতিই তার কামনাকৌলীন্যের নিয়ন্তা। দেবতা যেমন জোর ক'রে অর্ঘ্য দাবি করে না, প্রেমিকও তেমনি গভীর আশায় বেদনায় প্রতীক্ষা করে কবে পাবে অর্ঘ্যের নিবেদন। অতীন্দ্রের মুখে যখন শুনি, "বসে বসে এক দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে ইচ্ছা করছিলুম ওই সুকুমার আঙুলগুলির ডগা দিয়ে স্পর্শসুধা পড়ুক ঝরে আমার দেহে মনে" (চা. অ. | ১০১), তখন সহজেই অনুমান করা যায় দেহ তার কাছে মাংসের সীমানা পেরিয়ে অনেক উর্ধ্বে উঠে গেছে যেখানে আছে অনন্ত প্রাণস্পর্শের সম্মান অমৃতের সন্ধান।

দেহের মাঝে দেহাতীতকে পাওয়া, রূপের রেখার সঙ্গে রসের রেখার মিলনসাধন--এই তো প্রেমের ধর্ম আর এই তার অলৌকিক বিপ্লবী শক্তির উৎস। Platonic love বলতে যা বোঝায়, এ তা নয়। প্লেটনিক প্রেমে দেহের স্থান নেই, দেহ তার কাছে অপবিত্র। কিন্তু যথার্থ প্রেম দেহকে অপবিত্র ব'লে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে ফেলে দেয় না, ভাবের রঙে রসে রাঙিয়ে তুলে তাকে অর্ঘ্যের মর্যাদা দান করে। দেহ তখন হয় বীণাযন্ত্র, প্রকৃত প্রেমিকার আঙুলের স্পর্শে সে ঝংকার দিয়ে ওঠে সুরে লয়ে তানে।

এই প্রসঙ্গে অমিত ও অতীন্দ্রের প্রেমের একটা তুলনা করা যেতে পারে। দুজনেই রোমান্টিক, কবিধর্মী; দুজনেই কথা দিয়ে সাজিয়েছে তাদের কল্পলোক যেখানে তারা প্রিয়াকে অবিরাম সৃজন ক'রে চলেছে। কিন্তু অমিতের প্রিয়া-সৃজন একেবারে আইডিয়ার রাজ্যে; অতীন্দ্র চেয়েছে আইডিয়া ও বাস্তবের সমন্বয় ঘটাতে। অতীন্দ্র Wordsworth-এর Skylark-এর মতো—"True to the kindred points of Heaven and Home"। 'ভালো মন্দ সকলি মিলায়ে' অমিত লাবণ্যকে সম্পূর্ণ ক'রে গ্রহণ করতে পারে নি ব'লেই বাস্তবের সংঘাতে অমিতের প্রেম দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল। প্রেম ও প্রয়োজন, সরোবর আর ঘড়ার জল—এ দুয়ের মধ্যে সমন্বয় ঘটল না। কিন্তু অতীন্দ্র এলাকে সম্পূর্ণ ক'রে চেয়েছিল, বাস্তবের মাঝে ঘর বাঁধবার স্বপ্ন দেখেছিল; প্রেম ও প্রয়োজনের মাঝে যে অসামঞ্জস্য বা বিরোধিতা থাকতে পারে সে কথা তার জীবনবাদ স্বীকার করে নি। অমিতের তুলনায় অতীন্দ্রের প্রেম পূর্ণাঙ্গ, সমন্বয়ধর্মী। হয়তো এ কথা বলা আরো যুক্তিসংগত হবে যে, ভাবের দিক থেকে অতীন্দ্রের প্রেম যে পূর্ণতা লাভ করেছিল বাস্তবে তাকে রূপায়িত করবার সুযোগ এল না তার জীবনে। অন্য দিকে, অমিতের জীবনে সুযোগ এসেছিল, কিন্তু অমিত সে সুযোগ স্বেচ্ছায় হারালো।

তার বিফল বাসনারাশির জন্য অতীন্দ্র দায়ী করেছে এলাকে। তাই এলার উপর তার দুর্জয় অভিমান। যখনি এলা ঐহিক জিনিস দিয়ে তার শূন্যতা ভরাতে চেয়েছে, সে প্রত্যাখ্যান করেছে নির্মম কঠোরতায়। অতীন্দ্রের দৈন্যদশা দেখে এলা অনুতপ্ত। সে মিনতি ক'রে "দোহাই তোমার, বারবার দোহাই দিচ্ছি, কথা রাখো, আমার কাছে টাকা নিতে সঙ্কোচ

কোরো না।" (চা. অ. | ৯৯) কিন্তু অভিমান-ক্ষুব্ধ অতীন্দ্র কিছুতেই ভুলতে পারে না, "যে চাওয়া নিয়ে অসঙ্কোচে তোমার কাছে হাত পাততে পারি তাকে ঠেকিয়ে দিয়ে তুমি পণের বাঁধ বেঁধেছ।" (চা. অ. | ১০০) সুতরাং এখন হাত পেতে কিছু নেওয়া এলার কাছ থেকে ভিক্ষে নেবারই নামান্তর। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে এলা যখন অনুনয় করে, "আবার বলছি, অন্তু, কিছু নাও আমার হাত থেকে, নাও আমার এই গলার হার", তখনো অতীন্দ্রের প্রত্যাখ্যান অটল: "কিছুতেই না।" সে জানায়, "এমন একদিন ছিল তখন যদি দিতে, পরতুম গলায়—আজ দিলে পকেটে, অন্নাভাবের গর্ত্তটার মধ্যে। ভিক্ষে নেবো না তোমার কাছে।" (চা, অ. | ১১৩)

এলার দেওয়া ঐহিক উপহারগুলি প্রত্যাখ্যান করে অতীন্দ্র না হয় আপনার আত্মসম্মানকে বাঁচালো। কিন্তু এলা যখন নিজেকে তার হাতে তুলে দিতে চাইল, তখন কেন সে তাকে প্রত্যাখ্যান করল? তার গুমোট জীবনে আলোবাতাস বলতে যদি কিছু থাকে সে তো এলা। তবু, এলা যখন তার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে মিনতি জানায়, "নাও আমাকে তোমার সঙ্গিনী করে," অতীন্দ্র কেন তাকে এড়িয়ে যায়, কেন বলে, "লোভ দেখিয়ো না, এলা। অনেকবার বলেছি আমার পথ তোমার পথ নয়।" (চা, অ,।১১৩) এ কি অভিমান? এ কি অহঙ্কার? কিংবা আরো গভীর কিছু? অতীন্দ্র মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে সে সত্য কথাই বলছে যখন সে এলাকে বলে, "আমার পথ তোমার পথ নয়।" অতীন্দ্রের পথ অন্ধকারের পথ। সে পথে আছে বিকৃতি, "বড়ো নামওয়ালা বড়ো ছায়াওয়ালা বিকৃতি"। তাদের সংস্পর্শে সুন্দর হয় অসুন্দর, সত্য হয় বিকলাঙ্গ, শিব হারায় আপন সুষমা। এলা হল অতীন্দ্রের ভালোবাসার ধন। তার জীবনে যা-কিছু শুচি-শুভ্র যা-কিছু সুন্দর যা-কিছু সত্য এখানে অবশিষ্ট আছে এলা তারই প্রতিভূ। পবিত্রতার এই শেষ নিদর্শনকেও আপন ক্লেদাক্ত কক্ষপথে টেনে এনে কলুষিত করবে নিজের হাতে? অতীনের পক্ষে তা অসম্ভব। তার পথ যদি ধর্মের হত, বিপদসংকুল হলেও সে পথে এলাকে সহধর্মিণী করে নিয়ে যেত নিঃসংকোচে। কিন্তু যেখানে বিকৃতি, যেখানে স্বধর্মনাশের অভিশাপ, সেই পথে প্রিয়জনকে সহচরী করা চলে না। তাই এলাকে প্রত্যাখ্যান করে অতীন বাঁচাতে চাইল এলার শুচিতাকে—এক কথায় তার প্রেমকে, এইটুকুই যে তার শ্রেয়বোধের শেষ আশ্রয়, তার স্বভাবের শেষ মূলধন।

বাংলা সাহিত্য প্রসঙ্গ

সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

উৎসসন্ধানে চর্যাপদ

বাঙলা সাহিত্যের উৎস-সন্ধানে চলে যেতে হয় প্রায় হাজার বৎসর আগেকার এক অর্ধপরিচিত বঙ্গদেশে। বাঙলা ভাষা এবং সাহিত্যেরও আদিরূপ বলে ধরা হয় যে রচনাকে 'চর্যাপদ'-নামে সেই সৃষ্টির অর্থবোধ, আমরা যারা বাঙলা ভাষা-ভাষী, আজ তাদের পক্ষেও নিতান্ত কঠিন, শুধু ভাবের রহস্যে-গূঢ়তায় নয়, ভাষার একান্ত প্রাচীনত্বে।

অবশ্য এই পদরচনাকালই যে বাঙলা ভাষার জন্মকাল এমন বলা সঙ্গত নয়। কেন না ভাষা জিনিসটা জীবের মতো হঠাৎ ভূমিষ্ঠ হয় না কোনো একদিন কোনো এক সময়ে অনতিস্ফুট অবস্থা থেকে ক্রমে ধীরে ধীরে সে অলক্ষ্যে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তাই তার আরম্ভ-সীমা নির্দেশ কঠিন নয়, অসম্ভব। শুধু এটুকু বলা চলে, যে-গোমুখী থেকে ভাষা-প্রবাহ ক্রম-উৎসারিত, চর্যাপদ সেই উৎসের খুব কাছাকাছি।

চর্যাপদের জন্মকাল মোটামুটিভাবে বলা যায় প্রায় হাজার বৎসর আগে, কিন্তু আরও একটু স্পষ্ট করে বলা উচিত আনুমানিক সপ্তম শতক থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত। আদিতম চর্যাপদ সপ্তম শতকেই রচিত হয়, আর এই ধারার অনুবর্তন চলে দ্বাদশ শতক অবধি।

মুনিদত্ত-নামে যে-মনীষী পদগুলি একত্রকারে 'চর্যাচর্য-বিনিশ্চয়' নাম দিয়ে সটীক সঙ্কলন করেন পদরচনার বহুদিন পর তাঁর আবির্ভাব (আনুমানিক ১৪ শতক)। তারপর বহু শতাব্দ ডিঙিয়ে এক অভাবিত ঘটনা ঘটল সেদিন। ১৯০৭ সালে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে চর্যা-পুথি সংগ্রহ করে বাঙলায় নিয়ে এলেন। বাঙলা সাহিত্যের আদি সৃষ্টি 'চর্যাপদ' দীর্ঘ-দিনের নির্বাসন-পর্ব শেষে আবার ঘরে ফিরে এল।

চর্যাপদের উত্তরাধিকার নিয়ে আজ বিতর্কের ঝড় উঠেছে। মাগধী, মৈথিলী, ওড়িয়া, অসমীয়া এ ভাষাগুলিরও প্রত্যেকটির দাবী এ পদ তারই প্রাচীন রূপ এবং সেই হেতু নিজস্ব সম্পত্তি। পণ্ডিতী কুরুক্ষেত্রে 'সমবেতা যুযুৎসবঃ'। যুক্তি ও তথ্য প্রত্যেকেরই হাতিয়ার। ভাষাচার্য সুনীতি-কুমার চর্যাপদ যে বাংলারই আদি রূপ তা প্রমাণেব জন্যে সচেষ্ট। তাঁর সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু হয়তো মাগধী, অসমীয়া, মৈথিলী, ওড়িয়ার দাবীও অনুপেক্ষণীয়। বস্তুত এই কথাটি স্মরণে রাখলেই সমস্যার সহজ মীমাংসা হয় যে, আজকের দিনে এই ভাষা-সাহিত্যগুলির মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান গড়ে উঠেছে, আজ থেকে হাজার বছর পিছিয়ে গেলে তার অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে যায়। আজকের এই সাহিত্য-স্রোতগুলি সুদূর কালে যে উৎসে ঐক্যলাভ করেছিল, সেই আদি উৎসের জননী পূর্বী-মাগধী। ফলত কারো দাবীই অগ্রাহ্য নয় এবং একথা মানা সুবুদ্ধির পরিচায়ক। এই পর্বেই সদ্য অপভ্রংশের খোলস-ছাড়া ভাষা স্বতন্ত্র চেহারায় প্রকাশিত হতে সুরু করেছে। নানা পদে নানা ভাষার ভ্রূণ-রূপ সুলক্ষ্য।

বাঙলাদেশে বৌদ্ধধর্ম নানা পালাবদল পেরিয়ে পাল রাজাদের আমলে যে অবস্থায় পৌঁছেছিল, তাকে সহজযান নাম দেওয়া হয়েছে। চর্যাপদের লেখকরা এই গোত্রের সাধক। তাঁদের সাধারণ স্বরূপ, গন্তব্য এবং তার পন্থা, পথিক-জনোচিত আচরণ—এই সব প্রসঙ্গ খর্বকায় পদগুলিতে বিভিন্ন পদকার বিচ্ছিন্নভাবে বলেছেন। বলাবাহুল্য, বিক্ষিপ্ত বচনের একত্রীকরণে একটি গূঢ় ঐক্য দুর্লক্ষ্য থাকে না। সেই ঐক্যেই সহজ সাধনার রূপ। চর্যাকার লুই, সরহ, শবর, কাহ্ন, শান্তি, ভুসুকু, চাটিল, ডোম্বী, ঢেণ্ঢন (নাম নয়, এগুলি সাধকজীবনের ছদ্মনাম বা গুপ্ত নাম) এবং আরো অনেকে সিদ্ধাচার্য সাধনার সরণীতে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিকে তাঁদের রচনায় প্রকাশ করে ভাবী পান্থের পথ নির্দেশ রেখে গেছেন। যদিও বৌদ্ধ, তবু এ সাধনধারা বহুলাংশেই, এমন কি এর বিশেষ পরিভাষা নিয়েই প্রাচীন ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার সঙ্গে রক্তসম্বন্ধের পরিচয়বাহী। বাংলা তথা ভারতীয় সাধনার ইতিহাসে এই পদগুলির বহুমূল্যতা সন্দেহাতীত, কিন্তু সে-আলোচনা আমাদের পরিসরের বাইরে। আমরা শুধু এইটুকু মনে রাখব যে চর্যাপদের পুথি দৈবদুর্বিপাকে বাঙলা দেশের সীমা পেরিয়ে নেপালে আশ্রয় নিলেও চর্যাপদের সাধনা এবং ভাবনার ধারা এ দেশ থেকে কস্মিনকালেও বিতাড়িত নয়। জাতীয় জীবনের সঙ্গে তার নাড়ীর সম্বন্ধ বস্তুত অবিচ্ছিন্ন। পুথির শুষ্ক পাতাগুলি নির্বাসিত হলেও বাঙলার জীবনপ্রবাহের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে এই ধারা যুগ থেকে যুগান্তরে বাহিত হয়ে এসেছে, কখনও দুর্লক্ষ্য অন্তর্লীন, আবার কখনও বা স্পষ্টভাবে লক্ষ্যগোচর। নাথ যোগীদের সাধনা বাউল সাধনা এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। নেপালে যেমন এখনও এর গানরূপ জীবন্তভাবে বর্তমান, আমাদের দেশে তেমনটি না হলেও, সে গানের ভাঙা ভাঙা টুকরো আজও খুঁজে পাওয়াযাবে বাঙলাদেশের মন্ত্রাবলীতে, গুণী রোজাদের ছড়া ও বচনে।

ভাষাতাত্ত্বিক দিক থেকে চর্যাপদগুলির দান যে অনেকখানি সে-কথা বলাই বাহুল্য। অপভ্রংশ যুগের পর বাঙলা ভাষার জন্ম ও অভিব্যক্তির আলোচনায় এগুলি আমাদের প্রথম আশ্রয়। সাহিত্যের ইতিহাসে এই কারণে চর্যাপদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অমিত। কিন্তু বিশুদ্ধ সাহিত্যিক দিক থেকে এর স্বয়ংসম্পূর্ণ মূল্য কতোটুকু সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। আমাদের আলোচনার আরম্ভে প্রচলিত মতকে আপাত-স্বীকৃতি জানিয়ে চর্যাপদকে বাংলা সাহিত্যের আদি সৃষ্টি বলেছি, কিন্তু সে নিতান্তই শিথিল অর্থে। প্রকৃতপক্ষে এগুলি যথার্থ সাহিত্য বা কাব্য নয়। পদ-পাঠে, তার বিষয়-পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তত্ত্বার্থদর্শী পুরুষের দর্শন এর উপজীব্য এবং এর অভিব্যক্তি দার্শনিক। এ মন্তব্যের কারণ নির্দেশ করতে গেলে কবি ও দার্শনিকের পার্থক্যটি একটু স্পষ্ট করে বুঝে নেওয়া দরকার।

সংবেদনশীল হৃদয়ে বিশ্বসংসার-দর্শনে যে ভাব জাগে, আন্তর প্রেরণায় সেই ভাবের রসময় প্রকাশেই কাব্য রূপ নেয়। ভাবের প্রকাশকই কবি। পক্ষান্তরে দার্শনিক ভাবের যথাযথ প্রকাশক নন। তাঁর অন্তর পৃথকভাবে ক্রিয়াশীল। তিনি আপন বোধ থেকে সৃষ্টি করেন সিদ্ধান্তের, অতত্ত্বার্থের সমালোচনা করেন। ভাবজ্ঞানের পর অভাব-নিরূপণের দ্বারা সিদ্ধান্তের সৃষ্টিতেই দর্শনের স্বরূপ। সুতরাং কবি ও দার্শনিকের বিষয় ভিন্ন। আর বিষয়-ভিন্নতাতেই নাম-ভিন্নতার উদ্ভব।

বৌদ্ধ সহজিয়া সাধক রচিত পদগুলি অবিমিশ্র বিশুদ্ধ দর্শন ; যেহেতু এগুলি দার্শনিক

চর্যাকারগণের সিদ্ধান্তের আধার। তাই কবির কাব্যে ভাবের যে সহজ প্রকাশ এবং সহজ সুরের সঞ্চরণ থাকে, যে আনন্দের প্রকাশ এবং রসের উৎস থাকে, এখানে তা অনুপস্থিত। এ রচনা পাঠে সত্যতত্ত্বের নির্দেশ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু কাব্যানন্দ জাগে না। যদিও চর্যাপদের শীর্ষে পটমঞ্জরী, বরাড়ী, মল্লার প্রভৃতি অক্ষর-সংখ্যা-ভিত্তিক ছন্দের প্রয়োগ ঘটেছে তথাপি চর্যাকে বিশুদ্ধ কাব্যনামে নামাঙ্কিত করা চলে না। দার্শনিক সিদ্ধান্তকে এখানে ছন্দের ছকে ফেলা হয়েছে মাত্র। সুরারোপে নয়, সহজ সুরের স্বতঃপ্রকাশেই কাব্যানন্দ জাগে। কাব্যের বহিরাকৃতির অনুকরণে কাব্যস্বরূপ ধরা যায় না, কাব্য-প্রাণের অভিব্যক্তিরূপে ঘটলেও নিছক রূপটাই কাব্য নয়। ভাব-রূপের সাযুজ্যে 'অধরা-মাধুরী' ধরা দেয় কাব্য-প্রাণ সেখানেই; তা না ভাবে, না রূপে, পরন্তু যুগলমিলনের সুবিহিত সুষমায়। ছন্দে লেখা হলেও রসোদ্বোধনে অসমর্থ আনন্দ-সম্বন্ধ-রহিত চর্যা কাব্য নয়। প্রকৃত কাব্য পালের নৌকোয় সুরের হাওয়ায় সহজে ভেসে চলে, দর্শনের বজরা অনেক সময় ছন্দোবন্ধের গুণে তেমনি চলার ভান করে, কিন্তু সে গুণ টানা চলে স্বতন্ত্র।

চর্যাপদ থেকে দু-একটি দৃষ্টান্ত নিয়ে বক্তব্যকে স্পষ্ট করা যাক ভুসুকুপাদের একটি রচনা:

রাগ বরাড়ী: নিসি অন্ধারী মুসা আচারা। কাল মুসা উহ ণ বাণ।
অমিঅ-ভখআ মুসা করঅ আহারা ॥ গঅণে উঠি করঅ অমিঅ পাণ ॥
মাররে জোইয় মুসা-পবণা তাব সে মুসা উঞ্চল-পাঞ্চল।
জেন তুটঅ অবণা-গবণা ॥ সদ্ গুরু-বো হে করহ নসা নিচ্চল ॥
ভব বিন্ধারঅ মুসা খণঅ গাতি। জবেঁ মুসা-এর আচার তুটঅ।
চঞ্চল-মুসা কলিআঁ শশক থাতী ॥ ভুসুকু ভনঅ তবেঁ বান্ধন ফিটঅ ॥

আর একটি। এর রচয়িতা সিদ্ধাচার্য তেণ্ঢণপাদ। রাগ পটমঞ্জরী:

টালত মোর ঘর নাহি পড়িবেষী। পিটা দুহিএ এ তিনা সাঁঝে ॥
হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী ॥ জো সো বুধী শোধ নিবুধী ॥
বেঙ্গ সংসার বডহিল জাঅ। জো যো চোর সোই সাধী ॥
দুহিল দুধু কি বেণ্টে ষামঅি ॥ নিতি নিতি ষিআলা ষিহে ষম জুঝঅ।
বলদ বিঅএল গবিয়া ঝাঁঝে। তেণ্ঢণপাত্রের গীত বিরলে বুঝঅ ॥

এ রচনা প্রাণে কি কোনো আন্দোলন জাগায়? বক্তব্য শুধু জ্ঞানের গোচরে আসে। কিন্তু তারই মধ্যস্থতায় লেখক ও পাঠকের সন্ধি ঘটে না।

চর্যাপদে পদকারগণ দার্শনিক তত্ত্বের প্রকাশে নানাচিত্রের সাহায্য নিয়েছেন, যা আহরিত পারিপার্শ্বিক থেকে—প্রাকৃত জীবন অথবা মানবসংসার অনেকে এই চিত্রধর্মিতায় সাহিত্য-লক্ষণের সন্ধান পান। বস্তুত সমকালীন সমাজ-জীবনের প্রতিবিম্ব হিসেবে সে-ছবির দাম থাকলেও সাহিত্যিক দিক থেকে তাকে মহার্ঘ মানবার হেতু নেই। সাহিত্যে চিত্র থাকে, কিন্তু চিত্রমাত্রই সাহিত্য নয়। চর্যাপদের সাহিত্যমূল্য বিচার করতে গিয়ে অনেক সময় এমন কথা বলি যে সমগ্রভাবে সব রচনা রসোত্তীর্ণতায় কাব্যস্তরে না পৌঁছালেও ইতস্তত পদখণ্ডে রস দেখা দিয়েছে। শব্দ বাছাইয়ের নৈপুণ্য, উপমার ব্যবহারে অথবা চিত্রকল্পরচনায় রচয়িতাদের কবিপ্রাণতার চকিত

পরিচয় উদ্ঘাটিত। উদারভাবে এ মন্তব্য জেনে নিতে বাধা নেই, যদিও বাস্তব সাহিত্যের বিচার এমন খণ্ড-বিচার নয়, কেননা সাহিত্যিক সৃষ্টি একটি অবিভাজ্য, অভিচ্ছেদ্য পূর্ণতা।

সার কথা, সিদ্ধান্তমূলক নেতিধর্মী দার্শনিক তত্ত্বের কঙ্কালে চেষ্টিত লাবণ্য-যোজনায় দর্শনের কাব্যত্বপ্রাপ্তি অসম্ভব। খাঁটি কাব্যের মতো তার 'আহ্বান নেই,' 'শুধু ছলনা আছে।'

বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে চর্যাপদের যে দাম তা ভাষা ও তত্ত্বগত, কাব্যগত নয়। সংস্কৃতে রচিত হলেও জয়দেবের গীতগোবিন্দম্ প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে সম্বন্ধে চর্যাপদের চেয়ে ঘনিষ্টতর। প্রাচীন বাঙলা গীতিকাব্য ধারার উৎস না হলেও প্রেরণার মূল জয়দেবের মধুর কোমলকান্ত পদাবলী। নানা দিক থেকে চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাস প্রমুখ কবিদের পূর্বসূরী জয়দেব। উত্তরকালের এই বাঙালী কবিরা গীতিকাব্যের আদর্শ চর্যাপদ থেকে পাননি এবং বাঙলা ভাষা চর্যাপদেই গীতিকাব্যিক রূপ নিয়ে ভাবীকালের কাব্যরচনার সার্থক ভূমিকা ঘটিয়ে দিয়েছে, এই পর্বেই বাঙলাকাব্য স্বর-স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত, এমন অনুমান অমূলক। পূর্বেই বলেছি চর্যাপদ কাব্য নয়, গীতিকাব্য তো নয়ই। সে হৃদয়-উৎসারিত রসাবেগের অতি সাবলীল ভঙ্গিমা এতে প্রত্যাশিত নয়। চর্যাপদে শুধু সুরু হলো ভাষার যাত্রা, গীতগোবিন্দে দেখা দিল শিল্পিত প্রকাশ-কৌশল ও রসের স্ফূর্তি। এই উপকরণ নিয়ে উত্তরকালে চণ্ডীদাস রচনা করলেন প্রথম বাঙলাকাব্য। তিনিই বাঙলা কাব্যসাহিত্যের আদি কবি।

কিন্তু সাহিত্য হিসাবে চর্যাপদের দাম কম হলেও এর তাত্ত্বিক গরিমা কম নয়। শাস্ত্রে আছে যাঁরা যোগসিদ্ধ পুরুষ, জীবনের এক বিচিত্র সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে ইহলোক ও পরলোক দুই দিককেই তাঁরা সমভাবে দেখতে পান। জীবনসন্ধ্যায় সমুপস্থিত সেই পুরুষেরা দ্বিদেশদর্শী। চর্যাকার সহজ সাধকেরা সেই সন্ধিস্থলবাসী। তাঁদের রচনা সান্ধ্য উপলব্ধির প্রকাশ। চর্যাপদের ভাষাকে এই কারণেই সন্ধ্যাভাষা বলা হয়। এ ভাষা তত্ত্বার্থদর্শী জীবনমুক্তির ভাষা, সহজ পুরুষের ভাষা। যে পরমার্থতত্ত্ববোধ, সহজ দৃষ্টির প্রকাশ চর্যাপদে ঘটেছে প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের আর কোথাও তার তুলনা নেই; না বৈষ্ণব সাহিত্যে, না শাক্ত সাহিত্যে। মঙ্গলকাব্যের প্রসঙ্গ উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। শুধু একমাত্র ব্যতিক্রম বাঙলা বাউল। প্রাগাধুনিক পর্বের বাঙলা সাহিত্যে শুধু বাউলই চর্যাকারের তত্ত্বদৃষ্টির অধিকারী। কিন্তু বাউল ও চর্যাপদে পার্থক্য আছে। সে পার্থক্য অভিব্যক্তিতে। বাউলগান বিশুদ্ধ দর্শন নয়, কাব্য। চর্যাপদ সুর-সংযোগে গীত বলেই গান-সমধারী, যদিও, পূর্বেই আলোচনা করেছি গানের প্রাণ তাতে নেই। বাউল শুধু গেয় সুরের আরোপণে গান নাম ধরে নি। সুর তার বাণীর অন্তরলোকে অধিষ্ঠিত, সে সুরবাহন। কিন্তু সে আলোচনা এখানে নয়। এখানে শুধু এইটুকু বলি যে, যে-জীবনবোধ ও সর্বদর্শন অর্থাৎ যে বিষয়-সম্পদ চর্যাপদে নিছক দার্শনিক প্রকাশ লাভ করাতে কাব্য বঞ্চিত হয়েছে, তা উত্তরকালে বাউলগানে কাব্যরূপে অবির্ভূত হওয়ায় বাঙলা কাব্য সুন্দর হয়েছে, সমৃদ্ধ হয়েছে। যে-উপলব্ধি চর্যায় সাধারণের হৃদয়-সম্বন্ধ-রহিত দার্শনিক তত্ত্বরূপে শুধু মাত্র সাধক-চিত্তের সম্পদ হয়ে বেষ্টনীবদ্ধ ছিল, তাই বাউলের সঙ্গীতরূপে উচ্ছ্বসিত রসধারায় সর্বজনচিত্তকে অভিসিঞ্চিত করে পরিব্যাপ্ত হল। বাঙলা ভাষার আদিসৃষ্টি চর্যাপদের দর্শন কাব্যরূপে সার্থক হল বাউলে এসে। বিরস তত্ত্ব-কাঠিন্য সুরের যাদুস্পর্শে প্রাণ পেয়ে যেন জেগে উঠল গানে শিলীভূত অহল্যার মতো।

সেকালের সঙ্গীতের আসর

দেবেন্দ্রনাথ মিত্র

আন্দাজ অর্ধশতাব্দী পূর্বে কলিকাতায় কতকগুলি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরে ঘুরিয়া যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলাম এবং তৎকালে মনে যে সমস্ত চিন্তার উদয় হইয়াছিল তাহাই বলিতেছি।

সে কথা বলিতে গেলে বাংলা দেশের তৎকালীন সাঙ্গীতিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। বর্তমান সময়ে আমরা দেখিতেছি মার্গ-সঙ্গীত ও অন্যবিধ সঙ্গীতের বহুল প্রচার হইয়াছে এবং তানসেন সদারঙ্গ, ভাতখাণ্ডে প্রভৃতি নাম দিয়া অনেক সঙ্গীতের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এমনকি বিশ্ব-বিদ্যালয়েও সঙ্গীতের একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু সেকালে সেরূপ ছিল না। সেকালে ওস্তাদগণ পৃথক পৃথক ভাবে সঙ্গীতের চর্চা করিতেন। তাঁহারা নিজ নিজ ঘরানার গানগুলিকে যক্ষের ধনের মত আগলাইয়া রাখিতেন এবং নাড়াবাঁধা সাকরেতগণ অনেক খিদমত করিবার পর তাহাদিগকে দু'একটা করিয়া গান দিতেন তাহাও আসল জিনিস দিতে চাহিতেন না! বর্তমান সময়ে দেখা যায়, সেই সমস্ত ওস্তাদগণ তাহাদের গুপ্তধন অন্ধকার ঘর হইতে বাহির করিয়া ফেলিয়াছেন এবং এক একখানা পুস্তক প্রণয়ন করিয়া তাঁহাদের সম্পদগুলি উজাড় করিয়া দিয়াছেন। এ বিষয়ে সঙ্গীত-নায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় পথপ্রদর্শক এবং সেজন্য তিনি আমাদের নমস্য।

এই গেল ওস্তাদদের অবস্থা। এক্ষণে শ্রোতাগণের কথা বলি। সাধারণ লোকের মধ্যে গানের প্রতি বিশেষ একটা আগ্রহ বলিয়া কিছু ছিল না। তাঁহাদের অধিকাংশের গানের রুচি ছিল না এবং কতকলোকের 'হাঁ, একটা গান শুনলে মন্দ হয় না' এই রকম ভাব। ধ্রুপদ শুনিলে তাঁহারা আঁৎকাইয়া উঠিতেন এবং ব্যঙ্গ করিতেন, কেবল নাছোড়বান্দাগুলাই ধ্রুপদ শিখিতে যাইত।

সাধারণ লোকের গানের সম্বন্ধে তৎকালে কিরূপ আগ্রহ ছিল তাহা কেহ পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলে এইভাবে পরীক্ষা করিতে পারিতেন। ধরা গেল একটি নিমন্ত্রণ বাটীতে একশতজন নিমন্ত্রিত ব্যক্তি আসিয়াছেন। একজন গায়ক গান করিতেছেন, তাঁহারা শুনিতেছেন। এই অবস্থায় একজন লোক বাড়ীর ভিতর হইতে আসিয়া 'পাতায় লুচী পড়েছে, গা তুলুন' এই কথা বলিয়া গেল। তখন ক'জন সেই গানের আসরে বসিয়া থাকেন এবং তন্মধ্যে ক'জনই বা সৌজন্য দেখাইবার জন্য গায়কটি যে গানটি গাহিতেছিলেন এবং যাহা আর দুই, তিন মিনিটেই শেষ হইয়া যাইত তাহা শেষ হইবার জন্য অপেক্ষা করেন তাহা দেখিতে পারিতেন।

এইবার তৎকালীন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরের কথা বলিতেছি। দেখা গিয়াছে গায়ক ও বাদকগণ আসরে বসিয়া তানপুরা ও মৃদঙ্গ বাঁধিতে আরম্ভ করেন। তাহাতে গায়ক বাদক ও শ্রোতা সমস্ত পক্ষেরই অসুবিধা। যন্ত্রের সুর বাঁধার অবস্থাটি অধিকাংশ শ্রোতার ভাল লাগে না বিশেষতঃ তানপুরাকে অনেকক্ষণ ধরিয়া চড়-চাড় মারিয়া 'সুশীল বালক' করাইতে হয়। শ্রোতাগণ স্বভাবতঃই এই সময় গল্প-গুজব করেন অথবা পান চুরুট খাইতে থাকেন এবং দেরী হইতেছে দেখিয়া বিরক্ত হন। এদিকে গায়ক বাদক তাঁহাদের কোলাহলে সুরটি ভালরূপে শুনিতে পান না, কাজেই যন্ত্রের সুর

বাঁধাতে বৈলক্ষণ্য রহিয়া যায়। আবার যন্ত্র ভাল বাঁধা না হইলেও সঙ্গীত কৃতকার্য হয় না, কারণ তানপুরা ও মৃদঙ্গের মধ্যে সামান্য শ্রুতির ব্যবধান থাকিলেও গান স্বভাবতঃ চড়া সুরে বাঁধা যন্ত্রটিকে অনুসরণ করে এবং অন্য যন্ত্রটা বেসুরা বোধ হইয়া যায়। অতএব যন্ত্রবাঁধা ব্যাপারটি পূর্ব হইতে শ্রোতার অগোচরে হইয়া যাওয়াই বাঞ্ছনীয়।

গাহিতে বসিয়া অনেক গায়ক দীর্ঘ সময় ধরিয়া রাগিনী 'আলাপ' করিতে থাকেন এবং তিনি আলাপের দ্বারা শাস্ত্রোক্ত মতে রাগিনীর রূপ বাহির করিতে পারিতেছেন কিনা যেন তারই পরীক্ষা দিতে থাকেন, আলাপ জিনিসটাতে তালের সাহায্য একেবারেই নাই, ইহাতে গানের কথা নাই অতএব ভাবের উদ্দীপনা নাই। ইহা কেবলমাত্র তা-না-না-না দের্ তোমনা প্রভৃতি কতকগুলি অর্থহীন কথার সমষ্টি মাত্র। সাধারণ শ্রোতা দীর্ঘকাল ধরিয়া 'আলাপ' শুনিতে চাহেন না এবং বাদকেরও এই সময়ের মধ্যে বাজাইতে না পাইয়া ধৈর্যচ্যুতি ঘটিতে থাকে। সাধারণ শ্রোতামহলে সাধারণ গায়কের রাগিনী আলাপ যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত হওয়া আবশ্যক। দেখা গিয়াছে, অসাধারণ গায়ক মাত্র দুই তিনটি তান মারিয়া রাগিনীর রূপ আনয়ন করিয়া অবিলম্বে গান ধরিয়া ফেলেন এবং গানের ভিতর দিয়াই রাগিনীর ইন্দ্রজাল দেখাইতে থাকেন। ইহাই বাঞ্ছনীয়।

হিন্দীগানের বিষয়বস্তু হিসাবে দেখা যায় অধিকাংশ হিন্দীগান কৃষ্ণরাধিকার প্রেমবিষয়ক এবং রচয়িতাগণের যাহা কিছু শক্তি তাহা এই একটি মাত্র বিষয়ে কতগুলি বিভিন্ন কথা বলা যাইতে পারে ইহার প্রয়াসমাত্রে পর্যবসিত। সেই শ্যাম, সেই কানাইয়া, সেই বংশী, সেই বৃন্দাবন, মথুরা, শ্যামলিয়া, সুরতিয়া প্রভৃতি কথা পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত হইতেছে। বৈচিত্র্য হিসাবে দেখা যায় কোনও গান আওরঙ্গজেব, মহম্মদ সা প্রভৃতি বাদশাগণের স্তুতি অথবা প্রকৃতির বর্ণনা। তৎকালে আমার মনে হইয়াছিল রাধাশ্যাম বিষয়ক একঘেয়ে গানগুলি কমাইয়া দিয়া অন্যরকমের বিষয়বস্তুর গানের সংখ্যা বেশী হওয়া উচিত।

আসরে কোনও কোনও শ্রোতা গায়ককে কোনও একটি বিশিষ্ট রচয়িতার অথবা কোনও একটি গানের প্রথম ছত্রটি নির্দেশ করিয়া সেই গানটি গাহিবার জন্য বরাত করেন। ইহাতে গায়ক মহা অস্বস্তিতে পড়িয়া যান। প্রথমতঃ প্রত্যেক গায়কের সমস্ত রকমের গান জানা থাকে না এবং থাকা অসম্ভব। একটা গানকে গলায় ঠিকমত তুলিতে গেলে দু'চার হাজার বার রেওয়াজ করিতে হয় সেজন্য বিপুল সংখ্যক গান একটা লোকের পক্ষে কৃতকার্যতার সহিত গাওয়া অসম্ভব। তাই দেখা যায় প্রত্যেক গায়ক অল্প সংখ্যক কিছু গান বাছিয়া লইয়া তাহাই রেওয়াজ করিয়া রাখেন এবং কৃতকার্যতার সহিত গাহিতে পারেন। আরও দেখা যায় সকল গায়কের কণ্ঠে সকল রকম রাগিনীর গান উত্তমরূপে বাহির হয় না। বিশ্বনাথ রাও বসন্ত রাগ ও ধামার তালে সিদ্ধ গায়ক ছিলেন সেজন্য তাঁহার 'মাধব মাধব মাধব' অথবা 'ভ্রমরারে ফুলি' গানগুলি তাঁহার কণ্ঠে যেরূপ মধুর শুনাইত অন্য গায়কের কণ্ঠে সেরূপ শুনাইত না। কিন্তু তাঁহাকে গোঁসাইজীর মত একটি দরবারী কানেড়া গাহিতে বলিলে তিনি হয়ত ততটা কৃতকার্যতার সহিত গাহিতে পারিতেন না।

আসরের মধ্যে কোনও শ্রোতা গায়ককে একটি বিশিষ্ট রাগিনীর গান গাহিতেও অনুরোধ করিতেন। অবশ্য যাঁহার রাগিনী বোধ আছে তাঁহার পক্ষে এরূপ অনুরোধ করা দূষণীয় নয় কিন্তু

অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইত এরূপ ধরণের অধিকাংশ লোক রাগ রাগিনীর কিছুই বোঝেন না। কেবল মাত্র দুই চারিটা রাগিনীর নাম শুনিয়াছেন এবং তাঁহারা যে ঐ কথাগুলি জানেন শুধু এই বিষয় জানাইবার জন্যই বোধ হয় ঐরূপ করিতেন। তাঁহারা হয়ত খাম্বাজ বরাত করিয়াছেন কিন্তু গায়ক সে স্থলে কানড়া মুলতান অথবা মালকোষ গাহিলেও তাঁহারা ভ্রম বুঝিতে পারিতেন না। তদপেক্ষা একটু উন্নত শ্রোতার হয়ত কতগুলি রাগিনীর ঠাট বাস্তবিকই জানা থাকে কিন্তু জ্ঞান নিতান্ত অগভীর। একটি গানে কোন কোন পরদা লাগিতেছে তাহা দেখিয়া তাঁহারা রাগিনী নির্ণয় করিতে চাহেন কিন্তু সমান ঠাট বিশিষ্ট রাগিনীগুলির মধ্যে যে সূক্ষ্ম প্রভেদ আছে তাহা তাঁহাদের অবিদিত। এরূপ অবস্থায় গায়ক বিভাস, বাগীশ্বরী অথবা সোহিনী গাহিলে তাঁরা যথাক্রমে ভূপালী সিন্ধু ও বাহার বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। এই সমস্ত কারণে তৎকালে আমার এই অভিমত ছিল যে গায়ককে কোনও নির্দিষ্ট রাগিনীর গান অথবা কোনও নির্দিষ্ট গান গাহিবার জন্য ফরমায়েস করা উচিত নয়, গায়ক নিজের খুশীমত গান ধরিবেন।

হারমোনিয়ম যন্ত্রটাকে তৎকালে সঙ্গীতের আসর হইতে বহিষ্কৃত করিবার কথা উঠিয়াছে এবং অনেক আসরে 'জেনানাকা চীজ' উল্লেখে বহিষ্কৃত করাও হইয়াছে। বেচারা হারমোনিয়ম তবে কোথায় যাইবে? ইহার স্থান কি তবে কেবলমাত্র ঐক্যতান বাদনেই থাকিয়া যাইবে? আমার তখন মনে হইয়াছিল ইহা লইয়া অধিক বাড়াবাড়ি করিবার প্রয়োজন নাই। আসল কথা এই যে উচ্চ শ্রেণীর হারমোনিয়মবাদক বিরল, সারা ভারতবর্ষ ঘুরিয়া দুই একটির অধিক পাওয়া যাইত না এবং এখনও পাওয়া যায় না। সেরূপ হারমোনিয়মবাদক স্বর্গীয় রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর কানাড়া আলাপের মত কঠিন জিনিসের সহিত কৃতকার্যের সহিত হারমোনিয়ম বাজাইতে পারিতেন। শোনীজীর হারমোনিয়ম বাজনা জীবনে একবার শুনিয়াছিলাম কিন্তু চোখে না দেখিয়া দূর হইতে বুঝিতে পারি নাই যে হারমোনিয়ম যন্ত্র হইতে এরূপ সূক্ষ্ম মধুর জিনিস বাহির হইতে পারে।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তাহারই কিছুদিন পরে কলিকাতার একটি আসরে ওস্তাদ ওঙ্কারনাথ ঠাকুর বলিয়া বসিলেন হারমোনিয়ম যন্ত্রে গানের সমস্ত রকম তান ও গলার সূক্ষ্ম কাজ বাহির হইতে পারে না। তখন শোনীজী পরলোকগমন করিয়াছেন তাঁহার সাকরেত মুন্নেশ্বর দয়াল কলিকাতাতেই আছেন। তিনি একথা অস্বীকার করিয়া ওঙ্কারনাথ ঠাকুরকে চ্যালেঞ্জ দিয়া বসিলেন। পরীক্ষা আরম্ভ হইল। ওঙ্কারনাথজী এক একটা কঠিন তান মারেন এবং মুন্নেশ্বর দয়াল সঙ্গে সঙ্গে তাহা হারমোনিয়মে বাজাইয়া অভ্রান্তভাবে দেখাইয়া দেন। ওঙ্কারনাথ পরাস্ত হইলেন। সে আসরে আমি থাকিতে পারি নাই বটে তবে আমি মুন্নেশ্বর দয়ালকে এক সময়ে নিজের বাড়ীতে আনাইয়া তাঁহার হারমোনিয়ম বাজনা শুনিয়াছিলাম। তিনি বিনয়ের সুরে আমাকে বলিলেন 'শোনীজী তাঁর হারমোনিয়মটা নিজের সঙ্গেই নিয়ে চলে গেছেন, আমাকে থোড়া কুচ্ দিয়ে গিয়েছিলেন।'

এ সম্বন্ধে তৎকালে আমার সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে শোনীজীর মত প্রকৃত হারমোনিয়মবাদক থাকিলে গানের সহিত হারমোনিয়ম অবশ্যই বাজানো চলে। সেরূপ বাদক না থাকিলে অন্ততঃ

পক্ষে হারমোনিয়মে সুরটা দিয়া রাখিলেও ভাল হয়।

তখনকার দিনে কলাবিদ্‌গণ সাধারণতঃ হিংসাপ্রবণ ছিলেন। তাঁহারা সাকরেতগণকে তাঁহাদের সমস্ত গানগুলি অথবা গীতবাদ্যের সমস্ত কৌশলগুলি শিখাইতে চাহিতেন না, নিজেদের কেরামতীর জন্যে কিছু না কিছু রাখিয়া দিতেন। কণ্ঠস্বর প্রকৃতির দেওয়া জিনিস এবং কোনও সাকরেত যদি সমস্ত গানগুলি শিখিয়া লয় এবং তাঁহার কণ্ঠস্বর ওস্তাদের অপেক্ষা মধুর হয় তাহা হইলে ওস্তাদের আর কদর থাকে না। আবার বাদক যদি তাঁহার ওস্তাদের সমস্ত বোলগুলি শিখিয়া লন এবং তাঁহার হাত ওস্তাদের অপেক্ষা মিষ্টি হয় তাহা হইলে ওস্তাদের আর কদর থাকে না। এই কারণে দেখা যায় অনেক ভাল ভাল গান ও তবলা মৃদঙ্গের বোল লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পণ্ডিত ভাতখাণ্ডে মহাশয়কেও সঙ্গীতের গবেষণা ব্যাপারে এই লইয়া অনেক ভুগিতে হইয়াছিল।

সঙ্গীত ব্যবসায়ীগণের মধ্যে 'ঘরানা' বলিয়া একটা জিনিস পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। গান সম্বন্ধে তৎকালে গোঁসাইজীর ঘরানা, বিশ্বনাথের ঘরানা, লছমীর ঘরানা, বিষ্ণুদিগম্বর, শিবা পশুপতি, বাদল খাঁ, আবদুল করিম খাঁ প্রভৃতির ঘরানা এবং বাজনা সম্বন্ধে কেশবলাল মিত্র, মুরারি গুপ্ত, আবেদ হোসেন, আতা হোসেন প্রভৃতির ঘরানা। ঘরানা অর্থে রীতি বা চালককে (Style) বুঝায়। এই ঘরানা-প্রীতি এত উৎকট যে এক ঘরানার ছাত্রকে দুই টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলিলেও তিনি নিজের অপেক্ষা অন্য ঘরানাকে উত্তম বলিয়া স্বীকার করিবেন না। এই ব্যাপার লইয়া আসরে অনেক বচসা হইত এবং মারামারি পর্যন্তও হইয়া যাইত এরূপ ঘটনাও বিরল ছিল না। এ ব্যাপারে তৎকালে আমার এই ধারণা হইয়াছিল যে সঙ্গীতজ্ঞগণের এই সংস্কারটা পরিহার করা উচিত। হোমিওপ্যাথি বড়, না এলোপ্যাথি বড় এ লইয়া ডাক্তারে ডাক্তারে লড়াই বাধিতে পারে কিন্তু যে রোগী সে কেবল আরোগ্য লাভ করিতেই চায়, সে এরূপ কলহের মধ্যে ঢুকিতে চায় না। তদ্রূপ ওস্তাতগণ ঘরানার কারণে লড়াই করিতে পারেন কিন্তু যিনি শ্রোতা তিনি যাহা উত্তম মনে করেন তাহাই গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন।

সঙ্গীতের আসরে গায়ক ও বাদকের মধ্যে একটা 'ঠকানো ঠকানি'র ব্যাপার পূর্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছিল এবং আমরা যখনকার কথা বলিতেছি তখনও ছিল। ভিন্ন প্রদেশে জন্মগ্রহণ, বয়সের তারতম্য, দাম্ভিকতা, আড়ম্বর দ্বারা সুনাম গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি নানা রূপ কারণবশতঃ এরূপ মানসিক প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়। ঠকাইবার বিভিন্ন প্রকার প্রণালী আছে, পুঁথি না বাড়াইয়া দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা দুই একটি নির্দেশ করিতে পারি। গায়ক হয়ত একটি গান বাস্তবিক পক্ষে ধামার তালে গাহিতেছেন। কিন্তু হাতে ইচ্ছাপূর্বক চৌতালের তাল দিতেছেন। বাদক হাতের তাল দেখিয়া চৌতালে মৃদঙ্গ বাজাইতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু 'সম' এর স্থানে 'ধা' আনিতে পারিলেন না, অতএব তিনি ঠকিয়া গেলেন। এক্ষণে বাদক যদি বহুদর্শী ও চতুর ব্যক্তি হন তাহা হইলে তিনি গানটা একটু শুনিয়া লইয়া চৌতালেই বোল ধরিলেন এবং সন্দেহস্থলে ৮৪ মাত্রার হিসাবে বোল ধরিয়া 'ধা' মিলাইয়া দিতে পারিলেন। আবার দেখা যায় হয়ত একজন গায়ক বিলম্বিত লয়ে একটি গান ধরিয়াছেন। তবলাবাদক তাঁহাকে শুধু বিলম্বিত লয়ের গায়ক মনে করিয়া ঠকাইবার উদ্দেশ্যে জলদ বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। এ অবস্থায় যদি ঐ গায়কের দ্রুতলয়ে

গাহিবার ক্ষমতা থাকে তাহা হইলে তিনি হয়ত একটা তিলানা এত জলদে ধরিলেন যে বাদক ততটা দ্রুত বাজাইতে পারিলেন না এবং ঠকিয়া গেলেন। গায়ক বাদকের মধ্যে যদি সহানুভূতি ও সহযোগিতা না থাকে তাহা হইলে সঙ্গীতের আসর রণস্থল হইয়া দাঁড়ায়।

এ তো গেল গায়ক বাদকের মধ্যের কথা। আবার দেখা যায় ঘরানা-প্রীতি ব্যতীত অন্যান্য কারণে গায়কগণের পরস্পরের মধ্যেও কলহ লাগে এবং ঠকানো ঠকানির ব্যাপার চলে। আমরা ইহারও দুই-একটি দৃষ্টান্ত দিতে পারি। একজন গায়ক হয়ত একটি বিশিষ্ট রাগিনী উত্তমরূপে গাহিতে পারেন এবং তিনি আসরে সেই রাগিনীর একটি 'আলাপ' করিয়া তানপুরাটা অন্য একটি গায়কের দিকে বাড়াইয়া দিলেন। সঙ্গীতের আসরের আদবকায়দা অনুসারে পরবর্তী গায়ককে গান ধরিতে হইলে সেই রাগিনীতেই গান ধরিতে হয়, কিন্তু তিনি হয়ত সে রাগিনীর গান ভালরূপে গাহিতে পারেন না, অতএব অপ্রস্তুত হইয়া গেলেন। আবার দেখা যায় এক একজন গায়কের কতকগুলি করিয়া নির্বাচিত গীত থাকে তাহাতে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন কিন্তু অন্য গানে তেমন নয়। এস্থলে অন্য একজন গায়ক তাঁহার সেই নির্বাচিত গানগুলি প্রথমে গাহিয়া ফেলিলে তিনি অসন্তুষ্ট হন ও ঠকিয়া যান। এতদ্ব্যতীত সঙ্গীতের ঔপপত্তিক অংশ লইয়াও কলহ লাগে। রাগ-রাগিনীর সময়ও ঠাট, বাদী-বিবাদী-সম্বাদী স্বর দমখম বাঁটের রীতিনীতি, দুর্গা মালগুঞ্জী শিব রঞ্জিনী প্রভৃতি নবাবিষ্কৃত রাগিনীর উৎকর্ষ অপকর্ষ প্রভৃতি লইয়াও মতভেদ হয়। সর্বোপরি, প্রত্যেক গায়ক নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ব্যতীত অন্য কোনও গায়কের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে চাহেন না বলিয়া বিনা কারণেও অনেক সময়ে বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়।

একটি বাংলা গানের ক্লাবে দেখিলাম সেখানে সুরের যন্ত্র অনেক প্রকার আছে বটে কিন্তু তালের যন্ত্র একটিও নাই এবং সেখানে রবীন্দ্র সঙ্গীত গাওয়া হইতেছে। ইহার কারণ তৎকালে বুঝিতে পারি নাই তবে কিছুকাল পরে বেদান্ত চিন্তামণি মহাশয়ের নিকট হইতে তাহার কারণ বুঝিতে পারিয়াছিলাম। কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথ (সম্ভবতঃ ১৯১৭।১৮ সালে) সঙ্গীতের মুক্তি বিষয়ে রামমোহন লাইব্রেরীতে এই মর্মে একটি বক্তৃতা করেন যে এমন অনেক গানের ছন্দ আছে যাহার উপযুক্ত তাল আমাদের শাস্ত্রে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না এবং তালের কড়াকড়ির দ্বারা গানের শ্বাসরোধ করিয়া দেওয়া হয়। তালবিহীন গান গাহিবার প্রেরণা বা সূত্র কবিগুরুর এই কথার মধ্যে কিনা বলা যায় না তবে সঙ্গীত পরিষৎ নামক বিদ্যালয় হইতে কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ বেদান্ত চিন্তামনি মহাশয় "হিন্দুসঙ্গীত ও কবিবর স্যার রবীন্দ্রনাথ" নামক পুস্তিকায় এ মন্তব্য শুধু যে তর্কের দ্বারা অপ্রমাণ করিয়াছেন তাহা নয়, এমন কি কবি সম্রাট যে সমস্ত গানের উদাহরণ দিয়াছিলেন সেই সমস্ত গানই শাস্ত্রোক্ত প্রতিমাভঙ্গ, কীর্ত্তি, বসন্ত, শ্রীশেখর তালে রামব্রহ্ম মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বারা সঙ্গত করাইয়া এবং সঙ্গীত সম্রাজ্ঞী যাদুমণি দেবী ও প্রফেসার যোগেন্দ্রকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা গাওয়াইয়া ব্যবহারিকভাবেও তাহার খণ্ডন দিয়াছেন এবং তাঁহার কথার পাল্টা জবাব এতাবৎ কেহ দিতে পারেন নাই। বেদান্ত চিন্তামনি মহাশয়ের সহিত আমার পরিচয় হইয়াছিল এবং কবি-সম্রাটের প্রতি আমার বিপুল শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও আমি তাঁহার অকাট্য যুক্তি সমর্থন না করিয়া পারি নাই।

এক্ষনে বেতালা গানের দোষ কী? আমাদের সঙ্গীত-শাস্ত্রকারগণ নৃত্য-গীত-বাদ্য এই তিনটি জিনিসকে সঙ্গীতের অঙ্গ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, "গীতং বাদ্যঞ্চ নর্তনঞ্চ সঙ্গীত মুচ্যতে"। অতএব এই শ্রেণীর গায়কগণ শাস্ত্রবচন মিথ্যা করিয়া গানকে বিকলাঙ্গ করিয়া দিয়াছেন এবং তবলা মৃদঙ্গের বোলের মাধুর্য শ্রবণ হইতে শ্রোতাগণকে বঞ্চিত করিয়া দিয়াছেন। সঙ্গত বিহীন গান খঞ্জের মত খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে চলে।

গান ও বাদ্যের মধ্যে কোনটি বড় এই লইয়াও একটা বৃথা তর্ক সময়ে সময়ে চলিতে দেখা গিয়াছে। আমাদের মতে, পুরুষের সহিত স্ত্রীর, মনের সহিত শরীরের যে সম্বন্ধ গানের সহিত বাদ্যেরও সেই সম্বন্ধ এবং যদিও ইহারা তুল্যমূল্য তথাপি ইহাদের কোন একপক্ষের প্রাধান্য স্বীকার করিলে যদি এ তর্কের অবসান হয় তাহা হইলে বাদ্য অপেক্ষা গানের প্রাধান্যই স্বীকার করিতে হয়। বাদ্যযন্ত্র না থাকিলেও গান বহুক্ষণ ভাল লাগে, কিন্তু গান না হইলে বাদ্য অধিকক্ষণ ভাল লাগে না। আরও দেখা যায় বাদক বাজাইতে আরম্ভ করিয়া গায়ককে সেই লয়ে গান ধরিতে আদেশ করিতে পারেন না, পক্ষান্তরে গায়ক যে লয়ে গান ধরিয়াছেন বাদককে সেই লয়ে বাজাইতে বাধ্য হইতে হয়।

গান গাহিবার নানারূপ কৌশল আছে, সাধারণ গায়কের গানে সেগুলি সহজেই বিশ্লেষণ করিয়া ধরিয়া ফেলা যাইতে পারে। কিন্তু অতি অল্পসংখ্যক কতকগুলি গায়ক আছেন তাঁহাদের কৌশলগুলি এত সুষুপ্ত যে যখনই আমরা কৌশলগুলি ধরিতে গিয়াছি তখনই তাহারা বাজীকরের স্বর্ণের মত আমাদের হস্তকে প্রতারিত করিয়াছে। তাঁহারাও সঙ্গীতশাস্ত্র মানেন কিন্তু তাহাদের সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা থাকে। সেই গান তাঁহারা যতবার গাহেন ততবারই আমরা মুগ্ধ কুরঙ্গের মত নিবিষ্ট চিত্তে শুনিতে থাকি এবং মুখের লালা গলাধঃকরণের অবকাশ পাই না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তাঁহারা চতুর্দিকে সুরের জাল বুনিয়া আমাদিগকে ফাঁদে ফেলিয়া দেন। সেই গায়কগুলিই দেশ ও কালের সীমা অতিক্রম করিয়া ফেলিয়াছেন এবং স্বর্গ ও মর্তের ব্যবধান লোপ করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহাদের গানের মাধুর্য বর্ণনা করিতে বাগ্মীতা মাথা নত করে এবং সমালোচনাও দরিদ্র হইয়া যায়। গায়কই আমাদের সাষ্টাঙ্গ প্রণামের অধিকারী। তাঁহারা যখন গান গাহেন তখন বাস্তবিকই মনে হয়—

আজি গাও মহাগীত মহা আনন্দে
বাজ মৃদঙ্গ মধুর ছন্দে
*　　*　　*
স্বর্গ নামিয়া আসুক মর্তে
স্বর্গে উঠুক ধরণী।　(দ্বিজেন্দ্রলাল)

নাট্যতত্ত্ব : শ্লেষাত্মক নাটক

সেদিন একটি নাটুকে দলের আত্মসমালোচনা সভায় হাজির থাকতে হয়েছিল। সদ্য অভিনীত দু'টি নাটকের অভিনয়ের দোষ ত্রুটি নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে শ্লেষাত্মক নাটকের অভিনয় রীতি তথা প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে আলোচনার সামান্য অবতারণার পরই অপ্রাসঙ্গিক বিধায় তা ত্যাগ করা এবং প্রাসঙ্গিক আলোচনায় চলে যাওয়ায় সে সম্বন্ধে চিন্তাটা পরিস্ফুট হতে পারে নি। সে বিষয়ে আত্মচিন্তা স্বরূপই প্রায় বর্তমান প্রবন্ধ রচনা করা হচ্ছে। আশা, চিন্তার ত্রুটি-বিচ্যুতি যোগ্যতর ব্যক্তি সংশোধিত করবার চেষ্টা করবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আজকের মানসে যে চিন্তার আবিলতা দেখা যাচ্ছে তাকে স্বচ্ছতর করার চেষ্টা করবেন।

মূল প্রশ্নটির দু'টি ভিন্নতর বিভাগ করা যায়, শ্লেষাত্মক নাটকের প্রয়োজনীয়তা ও তার অভিনয় রীতি।

প্রথমে, শ্লেষাত্মক নাটকের প্রয়োজনীয়তার কথাই ভাবা যাক। মানব সমাজে নানা ধরণের ত্রুটি-বিচ্যুতি সর্বদাই আছে এবং মানুষ এ ত্রুটি (বিশেষ করে অন্যের ত্রুটি) দূর করবার জন্য সদাই সচেষ্ট। শ্লেষাত্মক নাটক এ ত্রুটি দূর করার জন্য একটি শক্তিশালী হাতিয়ার একথা বললে বোধ হয় অন্যায় হবে না।

এ শ্লেষ কখনো কখনো যে ব্যক্তিগত প্রবণতার দ্বারা পরিচালিত হয় না এমন নয়। এ বিষয়ে সর্বপ্রধান দৃষ্টান্ত ইংরাজী সাহিত্যের দুই দিকপাল ড্রাইডেন আর পোপের ব্যঙ্গাত্মক কবিতাবলী। এতে তৎকালীন সমাজের অনেক মাতব্বরের ত্রুটি বিচ্যুতিকে ব্যঙ্গ তথা শ্লেষের কষাঘাতে সচকিত করা হয়েছিল। অর্থাৎ ব্যক্তিগত বিদ্বেষের ওপরেও সমাজ সংস্কারের কাজ কিছুটা করা হয়েছিল। সুতরাং শ্লেষাত্মক রচনা সমাজের ত্রুটি সংগঠনের জন্যই লেখা হয় এবং ঐ ধরণের নাটকও তার ব্যতিক্রম নয়।

তাহলে কথা দাঁড়াচ্ছে, শ্লেষাত্মক রচনার সব চেয়ে বড় প্রয়োজনীয়তা তার সমাজ সংস্কারক রূপের মধ্যে গৃহীত। সাধারণতঃ হাসির মধ্য দিয়ে এ কাজটা সমাধা করা হয় বলে সাধারণ সমাজ সংস্কারের চেয়ে এর কার্যকরী ক্ষমতা বেশি বলেই মনে হয়। অবশ্য ব্যক্তিগত প্রবণতাকে যতটা এড়াতে পারা যায় ততটাই এবিষয়ে সাফল্য লাভ অনায়াসসাধ্য হয়ে পড়ে। অনেক সময় এমন ঘটাও বিচিত্র নয় যে দক্ষ পরিচালক নাট্যকারের রচনা থেকে এই প্রবণতা সরিয়ে দিয়ে অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য মূলক রচনাকে আরো সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত করে তুলতে পারছেন। এ ধরণের ব্যাপার নাট্যজগতে হামেসাই ঘটেছে, ঘটছে এবং ঘটবে। অনেকে এমন মনে করে থাকেন যে এমন পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিবর্জনে নাট্যকারকে অশ্রদ্ধা করা হয়। কিন্তু নাট্যকার যত মহতই হন

না কেন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা মঞ্চের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্ক রহিত। কখনো কখনো আবার বিশেষ অভিনেতা বা অভিনেত্রীর সঙ্গে তাল রেখে নাটকের বিশেষ চরিত্র রচিত হয়ে থাকে, অন্যের ক্ষেত্রে সেই চরিত্রকে রূপায়ন করার সময় তার আংশিক পরিবর্তনাদি অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

অন্য প্রসঙ্গ এসে পড়ছে সুতরাং আমাদের আলোচ্য তত্ত্বে ফিরে যাই। সমাজ সংস্কার তথা সমাজের নানা ত্রুটি বিচ্যুতিকে ব্যঙ্গের কশাঘাতে সর্বজন সমক্ষে উপস্থিত করা শ্লেষাত্মক নাটকের প্রয়োজনীয়তার রূপরেখা এ তথ্য নিশ্চয় সকলে মেনে নেবেন। এখন এ কাজটি কি ভাবে করা যাবে ? অর্থাৎ চরিত্রগুলিকে কিভাবে উপস্থাপন করা হবে ?

সাধারণতঃ ব্যঙ্গের লক্ষ্য চরিত্রগুলি কোন ব্যক্তি বিশেষকে বেষ্টন করেই গড়ে ওঠে, শেষ পর্যন্ত তারা কিন্তু আর ব্যষ্টিবাচক থাকে না পুরোপুরি সমষ্টিবাচক হয়ে দাঁড়ায়। তিল তিল করে যেমন তিলোত্তমা গড়ে উঠেছিল তেমনি করে চরিত্রগুলি বিভিন্ন মানুষের মধ্য থেকে নিজেদের চরিত্রের এক একটি বৈশিষ্ট্যকে আহরণ করে থাকে। একটা দৃষ্টান্ত ধরা যাক, আমাদের দেশের বহু প্রচলিত নাটকে, পর্তুগীজ জলদস্যুরা মিশ্র ইঙ্গ-বঙ্গভাষায় কথা বলে থাকে এবং অসম্ভব জেনেও আমরা তা হজম করে থাকি। অথচ প্রকৃত বিচার করলে নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের লুঙ্গি পড়া চাটগাঁয়ী ভাষাভাষী রডা অনেক বেশি যথাযথ ছিল। তেমনি বাঙলা নাটকে ব্যবসায়ীকে নিয়ে ব্যঙ্গ করতে হলে ভুঁড়িওয়ালা মাড়োয়ারী করা হয় কারণ আমাদের মানসিক চিন্তায় অসাধু ব্যবসায়ী বলতে ঠিক ঐ ধরণের চিন্তাই প্রথম উদিত হয়। তথ্যত তা বলে না, বরং সাধারণ বুদ্ধি বলে ব্যবসায়ী যে কোন দেশের অধিবাসী হ'ক বা যে ধরণের চেহারাই হ'ক না কেন তার অসাধু হওয়া আটকায় না।

অথচ আমাদের কাছে শারীরিক তথা বাচনিক বিকৃতিটাই ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য বলে বিবেচিত হয়েছে বললেই সব বলা হয় না। প্রকৃত প্রস্তাবে এ ধরণের বিকৃতি গোষ্ঠীগত বৈশিষ্ট্যের দাবী জানাচ্ছে এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিরাও তা স্বীকার করে নিয়েছেন। কাজেই এই গোষ্ঠীগত রূপটাই প্রকাশ করা হয়ে থাকে অভিনীত চরিত্রের মাধ্যমে।

সুতরাং শ্লেষাত্মক কাহিনীর চরিত্রচিত্রণ প্রায় সর্বক্ষেত্রে কিঞ্চিত বিকৃত অভিনয়ের মাধ্যমেই রূপায়িত করা সমীচিন বলে মনে হয় এবং শ্লেষাত্মক নাট্যাভিনয়ের শ্রেষ্ঠ অভিনেতারা সাধারণতঃ ঐ ধরণই অনুসরণ করে থাকেন। কোন কোন ক্ষেত্রে এই বিকৃতিটাকে বাড়িয়ে প্রায় ভেঙচানোর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়ে থাকে। অভিনেতার মুন্সীয়ানার সবচেয়ে বড় পরিচয় এই ভেঙচানোকে যেখানে শিল্পকলা বলে বোধ হয় সেইখানে। এ প্রসঙ্গে ভিন্ন মাধ্যমের শিল্পী হলেও চার্লি চ্যাপলিনের নাম উল্লেখ করা যায়। অত্যন্ত সাধারণ করুণ বস্তুকেও হাসির ভেতর দিয়ে কেমন করে ফুটিয়ে তোলা যায় চার্লির সৃষ্ট চরিত্র মালায় তার অসংখ্য নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। খুঁটিয়ে দেখতে গেলে তাদের মধ্যে দোষ ত্রুটির অভাব নেই কিন্তু সামগ্রিকতার বিচারে এইসব দোষ ত্রুটির চেয়ে অনেক বড় কিছু একটা ফুটে ওঠে আর সেটাই মহৎ শিল্পী তথা শিল্পের লক্ষণ।

তবে একটা বিবাদের সম্ভাবনাকে মোটেই অস্বীকার করা যায় না। কোন এক সময়ে শ্লেষের তীক্ষ্ণতা গোষ্ঠিবাচক রূপ হারিয়ে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিদ্বেষে রূপান্তরিত হতে পারে। আর

তখনই ধরে নিতে হবে শ্লেষ সম্পূর্ণ অক্ষমতার পরিচায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কাজেই শ্লেষাত্মক অভিনয়ে স্ল্যাপষ্টিক ধরণের প্যাঁচ প্রয়োগ অতি সাবধানে করা দরকার। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্য একটা বিপদের সম্ভাবনা বর্তমান। সাধারণ ভাবে দর্শকরা মোটা ধরণের কাজই পছন্দ করে (নাট্যশালার ভাষায়, নেয়) এবং সেক্ষেত্রে অভিনেতারও মোটা কাজ দেখানোর প্রবণতা অস্বাভাবিক বলা চলে না। অথচ তাহলেই নাটকের মূলগত প্রকাশ ব্যাহত হবে।

অভিনয়ে ফাঁকি দিয়ে প্রশংসা পাওয়া আর চরিত্রকে পূর্ণ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টায় নিন্দিত হবার সম্ভাবনা এই দোটানার মধ্যে পাক খেতে খেতে এইজন্যই বারবার অভিনেতার ভুল হয়।

অভিনেতাদের সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য দর্শকদেরও যথেষ্ট দায়িত্ব আছে। তাঁদের বিচার বুদ্ধিকে জাগ্রত করে আসল আর নকলকে চিনে নিয়ে আসলকে প্রশংসা করতে না পারলে খাদ ক্রমেই বাড়তে থাকবে। অবশ্য আজকের এই ১৪ ক্যারাটি যুগে খাঁটি সোনা দেখার শক্তিই বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে এ তথ্য অস্বীকার করেত লাভ নেই। তবুও ওরি মধ্যে যতটা সম্ভব বিদগ্ধরসিক জনের তৎপর হওয়া একান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় প্রকৃত সৃষ্টি কিম্বদন্তীর বস্তু হয়েই থেকে যাবে।

এপর্যন্তও লেখার পর মনে হচ্ছে, ব্যক্তিগত ধারণাটা সম্ভবতঃ সুস্পষ্ট করতে পারিনি। এখন এর পরবর্তী পর্যায়ে এ সম্বন্ধে অন্যান্য রসিকজনের মতামতটা জানা গেলে ত্রুটিটা কোথায় সে বিষয়ে অবহিত হওয়া সম্ভব।

রবি মিত্র

ফরাসী উপন্যাস : ১৯৬৪

আমাদের অন্যান্য শিল্পকলার মত সাহিত্যও যে পশ্চিমাভিমুখী এ তথ্য রসিকজনের অপরিজ্ঞাত নয়। কিন্তু সেই পশ্চিমী চিন্তার কতটা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়? অভিজ্ঞজনে ইংরাজী সাহিত্যের সর্বাধুনিক আবির্ভাব ও তার গতি প্রকৃতির খোঁজ রাখেন, ইউরোপের অন্যান্য ভাষা সম্বন্ধে জ্ঞান অংগুলিমেয় জনের। অথচ ফরাসী ভাষা যে শুধু ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা তাই নয়, একদা ইউরোপের রসিক জন মাত্রেরই আলোচনার ভাষা ছিল ফরাসী। আজো পৃথিবীর ৩২টি রাষ্ট্রে কথ্যভাষা ফরাসী তার মধ্যে ২১টির রাষ্ট্রীয় ভাষাও বটে ও এছাড়া ২০টি রাষ্ট্রে বাধ্যতামূলক ভাবে ফরাসী শিখতে হয় এবং প্রায় ৬০টি রাষ্ট্রে অন্যতম বিদেশী ভাষা হিসাবে এর শিক্ষা ব্যবস্থা দেখা যায়।

শুধু বিদেশেই ফরাসী ভাষা তথা সাহিত্য সমাদর পায় যে এমন নয়, দেশেও শতাধিক সাহিত্য পুরস্কার ভাষার প্রতি দেশবাসীর আনুরক্তি প্রকাশ করে। প্রতি বছর নভেম্বর-ডিসেম্বরে পুরস্কার বিতরণের পালা স্থরু হয়।

১৯৬৪ তে প্রধান প্রধান পুরস্কারগুলি কে কে পেয়েছেন তার একটা আংশিক তালিকা জানা গেছে। ওদেশে নোবেল পুরস্কারের চেয়ে যে পুরস্কার বেশী মূল্যবান বলে বিবেচিত হয় সেই গঁকুর পুরস্কার এবার পেয়েছেন জর্জ কঁশন তাঁর লেখা সভাজ বইটির জন্য। বইটি বর্ণ সমস্যা নিয়ে লেখা। ঐ একই পুরস্কার প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থানাধিকারী জঁ-পিয়ের ফাই তাঁর লেকলুজ বইয়ের জন্য রনোদো পুরস্কার পেয়েছেন। পরবর্তী যে পুরস্কার গঁকুরের পরেই বলে বিবেচিত হয় সেই ফেমিনা পুরস্কার পেয়েছেন জঁ ব্লাজ্য আর তাঁর কাছে দ্বিতীয় স্থানাধিকারিণী মনিক ভিত্তিগ তাঁর লোপো-লোনাক্স বইয়ের জন্য মেদিসি পুরস্কার পেয়েছেন। এঁ্যাতেরাই পুরস্কার পেয়েছেন রনে ফারে আর প্রবীণ সাংবাদিক পলগুথ পৌরসভার বিশেষ পুরস্কার পেয়েছেন।

যাঁরা পুরস্কার পেয়েছেন আর যাঁরা পাননি তাঁদের মধ্যে কিছু একটা আকাশ-পাতাল প্রভেদ দেখা যায় না। সমালোচকদের পক্ষে কোনটি ভাল আর কোনটি ভাল নয় তা নির্ণয় করা খুবই কঠিন। বিষয়বস্তুর বিভিন্নতা প্রায় চোখেই পড়েনা আর হিসাব করলে দেখা যাবে প্রায় চরিত্রই হয় হতাশ প্রেমিক, নয় শখ করে ব্যভিচার করে, নয়ত সবাই ভুল বোঝায় একটার পর একটা সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে। তবে প্রবণতা বিচার করার সময় একই বাস্তব বা কল্পনা থেকে যাঁরা রচনাবস্তু সংগ্রহ করেছেন তাঁদের এক খাঁচায় পুরলে ভুল হবে। শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির শৈলী ও জীবনকে বিচারের বিশেষ দৃষ্টিভংগীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখা যায়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৪তে প্রকাশিত রচনাগুলি বিচার করা প্রয়োজন।

প্রথমেই যেটা নজরে পড়ে তাহল, কবিদের উপন্যাস লেখার আধিক্য। '৬৪তে চারজন সুকবি বিশেষ আকর্ষণীয় উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁদের উপন্যাসে সাধারণ ঔপন্যাসিকের চেয়ে বেশী কিছু আশা করা অন্যায় হবে না নিশ্চয়। তিনিও গল্প বলা বা চরিত্রগুলিকে পুতুল নাচ নাচিয়ে সমাপ্তির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইবেন না; তাঁর কাহিনী, তাঁর সৃষ্ট চরিত্র ও ঘটনা একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে। রবার্ট সাবাতিয়ের লিখিত দেসঁ সুর উ এওয়ের-এর ঘটনাবলীতে এক মধ্যবয়স্কের নিজেকে মূল্যায়নের আপ্রাণ চেষ্টা এবং তাকে যে সব বালকোচিত লোভের সম্মুখীন হতে হচ্ছে, তাই বিধৃত। এডুয়ার্ড গ্লিসাঁর ল্যেকোয়াত্রিয়েস সিয়েকল-এ আন্তিলের কৃষ্ণকায়দের জীবন যাত্রার ছুটি দিক বর্ণাঢ্য ভিত্তিচিত্রের মত উপস্থাপিত করা হয়েছে কিন্তু তার আড়ালে যে মানুষগুলি তাদের অতীতের মধ্যে বাঁচার অর্থ খুঁজছে তাদের ভয়াল যন্ত্রণাক্লিষ্ট আবেদন ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। যুদ্ধকালে বাছাই আর ব্যক্তিগত দায়িত্বের সমস্যাকে বর্ণনা করতে গিয়ে আলাঁ বসকেল্যে পেতিত ইতার্ণিতে গ্রন্থে বিবেকের কার্যকারণ ব্যাখ্যা করেছেন। আর লয় ম্যার্সঁ লার্গঁদ ছলা মিজেরিকর্দ-এ সেই খাদের ধারে নিয়ে গেছেন যেখানে চিন্তাশক্তির ক্ষয় সুরু হয় সংগে সংগে এটাও স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, অসম্ভবের রাজ্যে যতই ঘুরে বেড়ানো যাক তার দ্বারা পাগলামী কাটানো যায় না। চারটি লেখকের মানসিকতা ভিন্ন কিন্তু তাঁদের কাছে জীবনের অন্যদিকটা দেখাই প্রধান কাজ মনে হয়েছে আর তাও বাস্তব পর্যবেক্ষক রূপে নয় শিল্পীর মত স্থিরবিচারের জন্য।

কানে কানে বলা কথায় যে বীর্য প্রকাশ সম্ভব ফরাসী সাহিত্যিকরা যে তাতে খুবই পারংগম সে তত্ত্ব নতুন করে স্বপ্রকাশ হয়েছে যোসেক কাবানিসের ল্যে জিল ছলা লুই ও ক্রনোগে-লুসাকের ল্যে সার্লঁ ব্লু বই ছুটিতে। ১৮শ শতকের লাম্পট্যবাদীদের ইন্দ্রিয়-উত্তেজনার সংগে সংগে বুদ্ধিবৃত্তি ও বোধশক্তির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিকাশ ঘটানোর ঐতিহ্যের সংগে এঁদের বেশ একটা যোগাযোগ আছে বলেই মনে হয়। সমস্যা প্রকাশ রীতিতে ১৮শ শতক অনুসারী রবার্ট আঁদ্রের চিঠির আকারের উপন্যাস লা মেময়ের ভেইন ও আলবেয়ার কসারির ভলত্তেয়ারধর্মী কাহিনী লা ভায়োলেঁস এলা ডেরিসঁকে বলা চলে। নারী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে কিন্তু এ প্রবণতা কমই দেখা যায়। ক্রিশ্চিন ত্য রিভয়ের তাঁর ল্যে সুলতান-এ আধুনিক নর-নারী সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন। পুরস্কার প্রাপ্ত মনিক ভিত্তিগের প্রথম বই লোনোলোনাক্সে যৌবনের দ্বারদেশ থেকে নিজের দেখা শৈশব-কৈশোরের বিস্ময়কর জীবনটি সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

এছাড়া মিকেল দ্রয়েতের ল্যে রেতুর, ফ্রাঁস অদ্রের উন অ্যাবিচুড সি অ্যাঁসিয়েঁন ও জ্যাক নিউশমৌর ল্যে সার্লল ত্য নালিকোর্ণা উল্লেখ্য বই। স্বাভাবিক কারণেই এ আলোচনা অসম্পূর্ণ। তবে '৬৪র প্রবণতা ও পারস্পরিক সম্পর্কটা বোধ হয় রসিকজনের পক্ষে বোঝা খুব কষ্টকর হবে না। তবে এবার জনপ্রিয় স্বাভাবিকতাবাদ বা নব তরংগবাদ ইত্যাদি নাম দিয়ে উপন্যাসকে মোড়া কঠিন আর তাই সমালোচক তথা বিচারকদের কাজ কঠিনই ছিল। পুরস্কারের ফলাফল ভিন্নতর হলেও বিস্ময়ের কিছু ছিল না।

অসীমা মিত্র

সাহিত্যলোক বনাম বিজ্ঞানলোক

বর্তমান যুগে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের মধ্যে যে প্রতিযোগিতা চলছে তার শেষ কোথায় অথবা তার ফলই বা কি সে কথা বলা দুরূহ। সমাজের কাছে সাহিত্য বা বিজ্ঞান কোনটিই কম মূল্যবান নয়। সাহিত্য যেমন তার অন্তরকে পরিপুষ্ট করে, বিজ্ঞান তার গাঠনিক উন্নতির পরিণতি সাধন করে। এই দুই শক্তির লব্ধির (Resultant) দ্বারাই সমাজ জীবনের সমস্ত বিবর্তন সাধিত হচ্ছে। সংক্ষেপে সাহিত্য আমরা তাকেই বলব যার দ্বারা মানুষ তার মনোগত ভাবকে প্রকাশ করে অথবা জীবনে যেরূপ ঘটনা ঘটে তার অনুরূপ বর্ণনা দেয়। বিজ্ঞান অস্তিত্বের প্রকৃতিগত কারণ এবং সত্যগুলির বিশ্লেষণ করে এবং সেই সত্যের সাহায্যে সমাজের প্রয়োজন অনুযায়ী নূতন কিছুর অবতারণা করে।

সাহিত্যে-রসানুভূতি অন্য সব অনুভূতি থেকে পৃথক। এ অনুভূতি চিত্তের একটি স্বতন্ত্র কোঠায় অবস্থিত থাকে। সাহিত্যে যে বেদনার প্রকাশ থাকে তার সঙ্গে বাস্তব-জীবনের বেদনার মধ্যে কিছু ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। পুত্র-বিয়োগে মাতার যে ক্রন্দন বাস্তব-জীবনে আমাদের চিত্তকে দুঃখময় ক'রে তোলে, সাহিত্যে সেই ক্রন্দন আমাদের পার্থিব দুঃখ-কষ্টকে দূর করে। অ্যারিস্টট্ল্ এই প্রক্রিয়াকে ক্যাথার্সিস্ বলেছেন। এর দ্বারা সাহিত্য জাগতিক দুঃখ-বেদনার সীমাকে লঙ্ঘন ক'রে চিত্তে এক মধুর আনন্দ এনে দেয়। এখানেই মানুষের রসোপলব্ধি কাজ করে। এই উপলব্ধিকে চুলচেরা বিচারে বিশ্লেষণ করা যায় না। এটি মানুষের রুচিবোধ সৌন্দর্যবোধ, মানসিক ধারণ-ক্ষমতা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। এর আবেদন মানুষের—হৃদয়ের কাছে, বুদ্ধির কাছে নয়। কিন্তু বিজ্ঞানের আবেদন মূলতঃ বুদ্ধির কাছে, হৃদয়ের কাছে একেবারেই নয়। বিজ্ঞান যেখানে একটি পদার্থকে পদার্থ হিসাবে দেখে সাহিত্য সেখানে সেই পদার্থের মধ্যে অতীন্দ্রিয় একটি সত্তাকে খুঁজে পেতে সচেষ্ট হয়। বিজ্ঞানের কাছে নদীর জল লবণ ও খনিজ দ্রব্যাদির সংমিশ্রণে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের একটি যৌগিক পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই নয়; কিন্তু সাহিত্য সেই জলের উচ্ছল তরঙ্গে, তার কলতানে এক অভিনব সৌন্দর্যের সন্ধান পায়। বিজ্ঞানের কাছে মনুষ্য-জীবন শুধুই প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং চেষ্টা বা পুরুষকার—বৈজ্ঞানিকদের মতে এই বিদ্রোহ (rebel) এবং এই চেষ্টার (strugle) জন্যই মানুষ আজ এত—উন্নত হয়েছে; কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে সেই জীবনের একটা গভীর উদ্দেশ্য এবং আদর্শ বিকাশ পায়। বিজ্ঞান ও সাহিত্য দুই-ই মানুষের অনুভূতিলব্ধ কিন্তু তারা নিজস্ব ধর্মে উভয়ে উভয়ের বিপরীত। এ সম্বন্ধে সুবোধচন্দ্র সেন বলেছেন: "গণিত ও বিজ্ঞান অনেকটা অনুভূতিনিরপেক্ষ বটে; ইহারা শুধু বুদ্ধির দ্বারা পরীক্ষার দ্বারা অগ্রসর হইতে চায়; কিন্তু বিজ্ঞান ও গণিত প্রাণহীন আর সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ প্রাণচাঞ্চল্য।"

কবি বা সাহিত্যিকের সৃষ্টি এবং প্রজাপতির সৃষ্টির মধ্যে অনেকখানি সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। জীবন্ত বস্তুর প্রধান গুণ বিবর্তনশীলতা, লীলাচঞ্চলতা ও স্বাধীনতা। এই সত্যকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করবার কোন প্রয়োজন নেই, শুধু এইটুকু মনে রাখা প্রয়োজন যে প্রাণীজগতে যেই স্বাধীনতাদির সূচনা পাওয়া যায় তার পূর্ণ বিকাশ থাকে নরনারীর চরিত্রে। সাহিত্য সেই চরিত্রগুলিকেই প্রতিফলিত করে। প্রতিফলিত করে বলেই সাহিত্য-বহির্গত চরিত্রগুলির মতই সাহিত্যের অন্তর্গত চরিত্রগুলিও সজীব এবং লীলাচঞ্চল; যেই কারণে—বিবর্তনশীলও! আবার যেমন বাস্তব জীবনে মনুষ্য চরিত্র সম্পর্কে সব সময়ই অপ্রত্যাশিতের সম্ভাবনা থাকে, সাহিত্যের চরিত্রের ক্ষেত্রেও সেই অপ্রত্যাশিতের আশংকা রয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সাহিত্যের চরিত্রগুলি ক্রমবর্ধমান—তারা শুধু বিবর্তনশীলতার পরিচয় দেয় না রহস্যময়তারও পরিচয় দেয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক অবদানের ক্ষেত্রে এই গুণগুলির কোনটিই নেই—তার মধ্যে লীলাচঞ্চলতাও নেই। নীহারিকা-চক্র হতে আরম্ভ ক'রে আমাদের ঘরের বিজলীবাতি পর্যন্ত জড় জগতের যে কোন বস্তু যান্ত্রিক নিয়মের দ্বারা পরিচালিত। সুতরাং তারা কেউ-ই স্বাধীন হতে পারে না। বৈজ্ঞানিক অবদানের মধ্যে নূতনত্বের জৌলুসটুকুই আছে; সাহিত্যে নূতনত্ব থাকলেও জৌলুস নেই—তা বিশ্বপ্রকৃতির মতই সহজ সরল এবং স্বাভাবিক। বিজ্ঞান বিবর্তনের ইন্ধন জোগায় মাত্র, কিন্তু সাহিত্য বিবর্তনকে প্রকাশ করে।

সাহিত্য দুইটি ধারায় তার কার্য নির্বাহ করে: প্রথমতঃ এর প্রধান গুণ তীব্র অনুভূতি ও বিস্তৃত সহানুভূতি হওয়ার দরুণ সাহিত্য ব্যক্তি চিত্তকে বিগলিত করে; আবার তা ব্যক্তিগত ভূমিকা পরিত্যাগ ক'রে অসীম ও চিরন্তনের দিকে ধাবিত হয়। 'যোগ মনস্তত্ত্ব' থেকে আমরা জানতে পারি যে নিজের সম্বন্ধে, জীবন সম্বন্ধে, প্রকৃতির গূঢ় রীতি নীতি সম্বন্ধে যা কিছু জানবার তার সন্ধান একমাত্র চিত্তই দেয়, বুদ্ধি বা ইন্দ্রিয় নয়; চিত্তের মাধ্যমেই এ সকল বুদ্ধিগ্রাহ্য হয়। সাহিত্য সেই চিত্তকেই নাড়া দেয়, তার ফলে বিশ্ব-প্রকৃতিও জীবন সম্বন্ধে একটা সম্যক অনুভব লাভ হয়। আবার এই অনুভূতি যখন স্বানুভবের সীমাকে ছাড়িয়ে যায় তখন তা হয়ে ওঠে সার্বজনীন। কিন্তু বিজ্ঞান দ্বারা এই সূক্ষ্ম রহস্যোপলব্ধি অসম্ভব। বিজ্ঞান যদিও চাঁদে রকেট পাঠিয়ে যন্ত্রের সাহায্যে অনেক রহস্যের সন্ধান করেছে, কিন্তু সে সমস্ত রহস্যই স্থূল রহস্য—যা ছিল অজানা মানুষের চর্ম চক্ষুর অন্তরালে তাকেই বিশেষ করে সামনে মেলে ধরেছে বিজ্ঞান। সাহিত্য জীবন রহস্যকে উদ্‌ঘাটিত করে। ব্যক্তিগত জীবনের যা কিছু রহস্য, তার সুখে দুঃখে কর্মে জীবন-ধারণে যে রহস্য সাহিত্য সে সকল অপ্রত্যাশিত রহস্যের ব্যাখ্যা করে।

দ্বিতীয়তঃ সাহিত্য সাহিত্যিকের জীবনবেদ প্রকাশ করে। সাহিত্য শুধু অনুভবের অভিব্যক্তি নয় তার সঙ্গে বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তার সংযোগ আছে। সাহিত্যিকের রচনা থেকে তাঁর জীবন সম্বন্ধে ধারণা জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে সচেতনতা এবং পারিপার্শিক সমাজ ও বাতাবরণের প্রভাব স্পষ্টই—উপলব্ধি করা যায়। এক্ষেত্রে বিজ্ঞান একেবারেই অসফল—অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক অবদান থেকে বৈজ্ঞানিকের জীবনবেদ বিকাশ পায় না। ষ্টিফেনসনের এঞ্জিন বৈজ্ঞানিকের অনুভূতি, তার অবচেতন মনের খণ্ড খণ্ড চিত্র ইত্যাদি এ সব কিছুই প্রকাশ করে না।

বিজ্ঞান ও সাহিত্য দুই-ই সমাজের প্রতি কিছু না কিছু কর্তব্য সম্পাদন ক'রে থাকে। বিজ্ঞান সমাজকে অনেক কিছুই দিয়েছে যার সাহায্যে মানবজাতি আজ সভ্যতার চরম শিখরে উপনীত হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞান পৃথিবীর বুকে এমন অনেক কলঙ্ক লেপন করে গেছে যার জন্য মানবজাতি ইচ্ছে করলে ধ্বংসের দিকে খুব সহজেই এগিয়ে যেতে পারে। আণবিক বোমা একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যেই মানুষ সুসভ্য বলে গর্ব বোধ করে সেই মানুষ আবার নিজের দ্বারা নিজের ধ্বংসের জন্য সদা সশংকিত। সাহিত্যও সেই রকম যেমন সমাজের অন্তরকে পরিপুষ্ট করেছে তেমনি কলুষিতও করেছে। যে সাহিত্য মানুষের নিম্ন রুচি এবং মনোবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেয় সে আর যাই করুক মনকে উন্নত করে না এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞান এবং সাহিত্যের মধ্যে একটা সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়।

সাহিত্য যে সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে তা অনিন্দ্যসুন্দর। প্রকৃতির মধ্যে সচ্চিদানন্দের যেই সৌন্দর্য বিদ্যমান, সাহিত্যে সেই নিগূঢ় নিভৃত অব্যক্ত সৌন্দর্যকে প্রকাশ করবার প্রয়াস থাকে। তাই সাহিত্য সুন্দর। বিজ্ঞান সৌন্দর্যের সৃষ্টি করতে গিয়ে অসফল হয়েছে, কারণ আমাদের সৌন্দর্যোপলব্ধি বিজ্ঞান-সৃষ্ট পদার্থের স্থূল সীমার সঙ্গে সংপৃক্ত না থেকে তার অন্তর্নিহিত সত্তার মধ্যে নিমজ্জিত হতে পারে না। পদার্থের কৃত্রিমতা উপলব্ধির গতিকে বাধা দেয়। সাহিত্যের মধ্যে যে জীবনকে পাই, আমাদের উপলব্ধি সে জীবনকে অতিক্রম করে চলে যায় কোন এক অতীন্দ্রিয় লোকে অথবা ভাব লোকের নব নব শিখরে। সৌন্দর্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অসফলতা এই কথাটাই প্রমাণ করেছে যে ঈশ্বরের সমকক্ষ ভাস্কর বৈজ্ঞানিক নয়।

আধুনিক মানব-জাতির কাছে সাহিত্য বা বিজ্ঞান দুই-এরই মূল্য সমান। জীবনে যদি সাহিত্যই থাকত কেবল, থাকত শুধু কল্পনা, তবে জীবনটা জীবন নামে একটা কল্পনার বায়বীয় রূপ প্রতিষ্ঠিত হ'তো। আবার মানুষের মনে যদি সাহিত্যের উন্মেষ না হ'তো, আর বিজ্ঞান দ্বারাই যদি সে পরিচালিত হতো তবে বাষ্পীয় এঞ্জিনের মতই সে জীবন হ'তো যান্ত্রিক—তাতে গতি থাকত, কিন্তু প্রাণের সক্রিয়তা লোপ পেত। একথাও স্বীকার্য যে মানুসের মনে বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি উদ্ভব হ'য়েছিল বলেই সাহিত্যের সৃষ্টি হতে পেরেছে। এই মনোবৃত্তি 'তিনটি পদক্ষেপে কাজ করেঃ দর্শন, প্রয়োগ ও সিদ্ধান্ত। কোন কিছুর বিচার অথবা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই তিনটি প্রক্রিয়া একান্তই অবর্জনীয়। আর সাহিত্য মাত্রই—মননশীলতা—বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি আমাদের মনন-জগৎকে বিকশিত করে। আবার মানুষ যদি প্রকৃতির সৌন্দর্য-প্রলুব্ধ হয়ে ভাষার অবতারণা না করত তবে বিজ্ঞান কোথায় পড়ে থাকত জানি না। উপরন্তু, ভাষা-সৃষ্টির পিছনেও বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি কাজ করছে। এমনি ভাবে দেখতে পাই যে সাহিত্য ও বিজ্ঞান যদিও আলোছায়ার মত ধর্মগত বিপরীত, তারা একে অপরের পরিপূরকও। দুটোই কল্যাণময়। বিজ্ঞান ও সাহিত্য এমন দুটি সামাজিক সৃষ্টি যার প্রথমটি নিজে অকর্মক—এক ব্যক্তি অথবা ব্যক্তি সমষ্টির বুদ্ধি তার পিছনে কাজ করছে; এবং অপরটি সকর্মক—নিজে সকর্মক থেকে সমাজকে চালিত করে। এ দুটোর সংমিশ্রণেই মানব বিবর্তন সাধিত হচ্ছে এবং হয়ে আসছে।

শোভন গুপ্ত

সমালোচনা

রবীন্দ্রসংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ ॥ ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক: শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশ ভবন, ১৫ বঙ্কিম চাটুয্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯; পৃষ্ঠা—৬০৪ + চিত্র, মূল্য—২০৲

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জুলাই হইতে ২০শে অক্টোবর পর্যন্ত সাড়ে তিনমাস কাল ধরিয়া কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ মালয়দেশ, ইন্দোনেসিয়া (সুমাত্রা, বলি ও যবদ্বীপ) এবং শ্যামদেশ ভ্রমণ করেন। কবির এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের সভ্যতা এইসব দেশের সভ্যতাকে কি ভাবে প্রভাবিত করিয়াছে তাহার নিদর্শনগুলি দর্শন এবং এই অতীত সাংস্কৃতিকযোগের পুনরুজ্জীবন। দ্বীপময় ভারতে ভ্রমণকালে বলিদ্বীপীয় হিন্দু বংশধরদের নিকট বিশ্বকবি ভারত হইতে আগত 'মহাগুরু' নামে পরিচিত হন। সাফল্যের সহিত রাজোচিত মর্যাদায় কবিগুরুর এই দ্বীপময় ভারত পরিক্রমাকে 'মহাগুরু বিজয়' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

কবির দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ ভ্রমণের অন্যতম সঙ্গী ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন প্রথিত যশা অধ্যাপক ডাঃ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। কবির সঙ্গে ইতিপূর্বে যাঁহারা ভ্রমণে গিয়াছিলেন তাঁহারা সমস্ত তথ্য সংগ্রহ বা সংরক্ষণ করেন নাই, করিয়া থাকিলেও তাহা প্রকাশ করেন নাই। সুনীতিকুমার প্রতিদিনের ঘটনা রোজনামচায় লিখিয়া রাখিতেন। এই রোজনামচার ভিত্তিতে লিখিত তাঁহার এই ভ্রমণ বৃত্তান্ত (শ্যামদেশ ভ্রমণের বিবরণ ব্যতীত) 'দ্বীপময় ভারত' সুবিখ্যাত প্রবাসী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে তিন চার বৎসর ধরিয়া প্রকাশিত হয়। এই রচনা স্বয়ং কবিগুরুর বিশেষ প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল। কৈশোর-যৌবনকালে প্রবাসীতে 'দ্বীপময় ভারত' পাঠের সুখস্মৃতি এখনও বহু প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ পাঠকের মনে জাগরূক আছে। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে এই রচনাটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ও বিশেষ ভাবে আদৃত হয়। গত কুড়ি বৎরের মধ্যে এই পুস্তকটি পুনর্মুদ্রিত হয় নাই। বর্তমান পুস্তকটি শুধু 'দ্বীপময় ভারত' এর একটি নতুন সংস্করণ নহে, পুরাতন পুস্তকটি পরিমার্জিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে প্রকাশিত হইয়াছে এবং শ্যামদেশ ভ্রমণের বৃত্তান্তটুকুও ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে, ইতিপূর্বে এই অংশটুকু বিশ্বভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। সংযোজন ও পরিমার্জনের জন্য এই রচনাটির নূতন নামকরণও হইয়াছে। সুতরাং দীর্ঘদিনের ব্যবধানে প্রকাশিত এই রচনাটিকে একটি নূতন পুস্তক হিসাবেই গ্রহণ করা যাইতে পারে।

১৯২৭ এর যুবক অধ্যাপক সুনীতিকুমার বর্তমানে একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মনীষী এবং রবীন্দ্রনাথ মরলোক ত্যাগ করিয়াছেন। যবদ্বীপ, সুমাত্রা ও বলি বর্তমানে আর ডচদের অধীন নহে এখন ইহা স্বাধীন রাষ্ট্র ইন্দোনেসিয়া। এই পুস্তকে দ্বীপময় ভারতের যে সময়ের কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে সেই সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ এখন আর বর্তমান নাই, সুতরাং পুস্তকটির বর্তমান

তাৎপর্য ঐতিহাসিক ; রবীন্দ্রনাথের দ্বীপময় ভারত পরিক্রমার অতি নির্ভর যোগ্য বিবরণ হিসাবেও ইহার অপরিসীম গুরুত্ব আছে। দ্বীপময় ভারতের দেশগুলির সহিত প্রাচীন ভারতীয় হিন্দুজাতির রক্ত সম্পর্ক তথা সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ছিল, প্রাচীন ভারত এইসব দেশকে আপনার করিয়া লইয়াছিল, কবির দ্বীপময় ভারতপরিক্রমা অতীত ভারতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনেই সমাপ্ত হয় নাই, এই সাংস্কৃতিক বন্ধনের উজ্জীবনও তাঁহার আদর্শ ছিল।

এই পুস্তকটির বৈশিষ্ট্য ইহাই যে সুনীতিকুমার শুধু রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতেই ইহা লিপিবদ্ধ করেন নাই, রবীন্দ্রনাথ বহু সময়েই এই গ্রন্থের নেপথ্যে আছেন, নায়কের মতই তিনি শুধু প্রয়োজন সময়ে উপস্থিত আছেন অবশিষ্ট অংশে লেখক অপূর্ব লিপিকুশলতার সহিত পাঠকের মনকে দৃশ্য হইতে দৃশ্যান্তরে অথবা প্রসঙ্গ হইতে প্রসঙ্গান্তরে লইয়া গিয়াছেন। কোথাও তিনি অধ্যাপকের ভূমিকায় দ্বীপময় ভারতের উপর প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কোথাও বা স্থানীয় ইতিহাসের দিকটি আলোকিত করিয়াছেন। কোথাও তিনি অন্তরঙ্গ বয়স্যের ন্যায় পাঠকের সহিত বিশ্রম্ভালাপ নিরত, আবার কিছুক্ষণ পর দেখা যায় নিপুণ কথাশিল্পীর ভঙ্গিতে তিনি দ্বীপময় ভারতের অধিবাসীদের নানা সামাজিক রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহার বিষয়ে সরস আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ভ্রমণ প্রসঙ্গে উল্লিখিত চরিত্রগুলি বিশেষভাবে সিঙ্গাপুরের নামাজী, মোড়ল-মশাই, ডাঃ বাকে, ডাঃ খোরিস, তাম-চূড়, বস্, কালেনফেলস্, রাণী পাতিমা (হীরা মালিনী), পদণ্ডগতে রেসি (ঋষি) প্রভৃতিকে লেখকের বর্ণনায় পাঠক যেন মনশ্চক্ষেই দেখিতে পান। মহাগুরু বিজয়ের ইতিবৃত্ত পরিবেশন প্রসঙ্গে লেখক এই সময়ে কবি রচিত কয়েকটি কবিতা রচনার সূত্রও উল্লেখ করিয়াছেন [বিজয়লক্ষ্মী, বোরোবুদুর, বালী (সাগরিকা), সিয়াম প্রভৃতি]। এই তথ্যগুলি রবীন্দ্র কাব্যানুরাগীর পক্ষে বিশেষ মূল্যবান মনে হইবে।

দ্বীপময় ভারতের প্রাচীন কীর্তিতেও স্থানীয় অধিবাসীদের জীবনে ভারতের সভ্যতা কি ভাবে নিজের স্পর্শ রাখিয়া গিয়াছে তাহার পটভূমিকারূপে সুপণ্ডিত লেখক যবদ্বীপ ও বলিদ্বীপের ইতিহাসের মূলসূত্রগুলি একটি পৃথক অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন (খ—২, পৃঃ ২৯৯—৩১৯)। অধ্যায়ে প্রদত্ত তথ্যগুলি অতিশয় বৈচিত্র্যপূর্ণ ও কৌতূহলোদ্দীপক। অতীতে আমরা কত কি দিয়াছি তাহারই হিসাবের খাতা খুলিয়া আমরা সকলকে দেখাই, কত কি লইয়াছি সে ঋণ ভুলিয়া যাই। আমাদের এই ভারতীয় বা প্রাচীন হিন্দু সভ্যতা কত বিচিত্র উপাদানে গঠিত হইয়াছে তাহার সংবাদ আমরা রাখি না। সুতরাং এই আলোচনার প্রয়োজন আছে। ভাষাতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ধারায় সুশিক্ষিত লেখক স্বভাবতই নৃতত্ত্বেও নিপুণ। সংক্ষেপে তাঁহার মত এই যে ভারতের সর্বপ্রথম অধিবাসীরা ছিল নেগ্রিটো বা 'নিগ্রোবটু' ; ইহাদের পরে অষ্ট্রিক জাতীয় লোকেরা আসামের পথে ভারতে আর্যদের আসিবার বহু শতাব্দী পূর্বে আসিয়াছিল তাহারা মূলতঃ ইন্দোচীনের অধিবাসী ছিল।

ইহারা বাঙলা দেশ, উত্তর ভারত, পাঞ্জাব, গুজরাট ও দক্ষিণ ভারতেও ছড়াইয়া পড়ে। ইহাদের সংস্কৃতি ভারতে ছড়াইয়া পড়ে এবং ভারতের মৃত্তিকায় পরিপুষ্টও হয়। ইন্দোচীনবাসী অষ্ট্রিক জাতির অপর শাখা ক্রমশঃ যবদ্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশেও ছড়াইয়া পড়ে। এই

অষ্ট্রিক জাতির ভাষা ও সংস্কৃতি ভারতের পশ্চিম হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী, ইন্দোচীন, মালয় উপদ্বীপ, ইন্দোনেসিয়া হইতে পূর্বে পলিনেশিয়া পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল। এই অষ্ট্রিক জাতির অস্তিত্ব হেতু ভারত, ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়া অনেকটা একই সূত্রে গ্রথিত। অষ্ট্রিকদের পর দ্রাবিড়েরা ভারতে আসে ও ভারতে শুদ্ধ অষ্ট্রিক, শুদ্ধ দ্রাবিড় আর মিশ্র অষ্ট্রিক-দ্রাবিড় সভ্যতা গড়িয়া উঠে। অষ্ট্রিক আর দ্রাবিড়ের সভ্যতাই ভারতের সভ্যতার ভিত্তি—হিন্দু সভ্যতার কাঠামো এই ভাবেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহাদের পর ভারতে আসে সংহতি-কল্পনা ও উদ্ভাবনা শক্তি কুশলী কৃতকর্মা আর্য জাতি। আর্যদের সঙ্গে অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় জাতীয় লোকদের প্রথমে সংঘর্ষ হয়, আর্যদের ভাষা এই সব অনার্যেরা গ্রহণ করে এবং এই ভাবে উত্তর ভারতে হিন্দু জাতির ও হিন্দু ধর্মের উদ্ভব হয়। আমাদের পৌরাণিক আর তান্ত্রিক দেবদেবীর অনুষ্ঠান আর হিন্দু-দর্শন বহুল পরিমাণে অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় জাতিরই দান। উত্তর ভারতে গাঙ্গেয় উপত্যকায় এই মিশ্রণের ফলে যে সভ্যতা রূপ প্রাপ্ত হয় তাহা ক্রমশঃ সমগ্র উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে ব্যাপ্ত হয়।

ইহার পর এই সভ্যতা ইন্দোচীনে ও দ্বীপময় ভারতে বৌদ্ধ ভিক্ষু অথবা ভারতীয় হিন্দু রাজা, বণিক্ ও ব্রাহ্মণদের দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়। ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার যোগ কখনও লুপ্ত নাই, স্থল পথে ও জল পথে ভারতে উপনিবিষ্ট অষ্ট্রিক জাতি (সংস্কৃতে-নিষাদ) তাহাদের এই সব দেশবাসী জ্ঞাতিদের সহিত যোগাযোগ রাখিত। হিন্দুধর্ম ও সভ্যতা এই যোগাযোগ আরও সুদৃঢ় করিল। খৃষ্ট জন্মের পূর্ববর্তী শতকগুলিতেই এই সব দেশে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা এবং ব্রাহ্মণ্য ও হিন্দু সভ্যতা গিয়া পৌছায়। ভারত হইতে যে ঔপনিবেশিকেরা এই সব দেশে গিয়াছিল তাহারা প্রধানতঃ ছিল বাঙলা, গুজরাট, উড়িষ্যা ও দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী। দ্বীপময় ভারতে দক্ষিণী লিপিতে সংস্কৃত ভাষায় আনুমানিক খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে লিখিত কতকগুলি অনুশাসন পাওয়া গিয়াছে উহাতে ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক রাজাদেশে বৈদেশিক যজ্ঞানুষ্ঠানের উল্লেখ আছে। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে চৈনিক পরিব্রাজক ফা হিয়েন লিখিয়া গিয়াছেন যে যবদ্বীপে বৌদ্ধ সংখ্যা অল্প, ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বীরাই সেখানে সংখ্যা গরিষ্ঠ। সুমাত্রায়, মালয় উপদ্বীপে, যবদ্বীপে ও বলিদ্বীপে ভারত হইতে ব্রাহ্মণদের গমনের বহুবিধ সাক্ষ্য প্রমাণ আছে। সুমাত্রার শ্রীবিজয় রাজ্যের শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজারা খ্রীষ্টীয় অষ্টম-নবম শতকে ও তাঁহাদের পরে যবদ্বীপের স্বাধীন রাজগণ হিন্দু সভ্যতা তথা ভারত সভ্যতাকে মালয় উপদ্বীপে, সুমাত্রায় ও ফিলিপ্পীন দ্বীপপুঞ্জে ছড়াইয়া দেন। দ্বীপময় ভারতের যাবতীয় ভাষায় প্রচুর সংস্কৃত ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষার শব্দের অস্তিত্বই ইহার সাক্ষ্য দেয়। এই প্রভাবের ফলে, দ্বীপময় ভারতের অধিবাসীদের জীবনে—তাহাদের শিল্প, ধর্ম, রীতিনীতি ও মানসিকতায় ভারতীয় সভ্যতার ছাপ এখনও বর্তমান। শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজগণ ভারতবর্ষের সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ রাখিতেন। এই বংশীয় রাজা বলপুত্রদেব নবম শতাব্দীতে নালন্দায় একটি বৌদ্ধ মন্দির ও বিহার প্রতিষ্ঠা করেন ও তাহার ব্যয় নির্বাহের জন্য গ্রাম-ক্রয় করিয়া তাহা দান করেন—নালন্দায় প্রাপ্ত একটি তাম্র শাসনে ইহার উল্লেখ আছে। এই শৈলেন্দ্র বংশীয় জনৈক নৃপতিমধ্য যবদ্বীপে কতকগুলি অতি

সুন্দর বুদ্ধ মন্দির নির্মাণ করান, ইহা 'বর-বুদুর' (বুদুর গ্রামের বিহার) নামে খ্যাত, এই মন্দিরটি পৃথিবীর বাস্তু-শিল্পের একটি বিস্ময়কর নিদর্শন। শৈলেন্দ্র রাজগণ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন, নবম শতক হইতে সুমাত্রার এই রাজবংশের প্রতাপ যবদ্বীপে স্তিমিত হইতে থাকে ও যবদ্বীপে স্বাধীন হিন্দু রাজবংশের অভ্যুদয় হয়, ইঁহারাই মধ্য যবদ্বীপের প্রাম্বানানের বিরাট মন্দির শ্রেণী নির্মাণ করেন। এই মন্দিরগুলি হিন্দু সভ্যতার এক উজ্জ্বল নিদর্শন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের বিরাট বিরাট মন্দির এখানে অবস্থিত তাহারই নিকটে রহিয়াছে আরও শতাধিক ক্ষুদ্র মন্দির। প্রাম্বানানের মন্দির গাত্রে রামায়ণের ও কৃষ্ণলীলার চিত্রাবলী ক্ষোদিত আছে। বরবুদুর মন্দির গাত্রের বৌদ্ধ চিত্রাবলী ও প্রাম্বানান মন্দিরের রামায়ণ চিত্রাবলী ভারতের বাহিরে ভারত শিল্পের অপূর্ব মহিমার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। খ্রীষ্টীয় দশম শতকের পর দ্বীপময় ভারতের সভ্যতায় নিজস্ব জাতীয় বৈশিষ্ট্য আত্ম-প্রকাশ করিতে থাকে। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতক হইতে আরবের শ্রেষ্ঠী ও ধর্ম প্রচারকদের চেষ্টায় এই সব দেশে বিশেষভাবে যবদ্বীপে মুসলমান ধর্ম ব্যাপ্তি লাভ করে এবং আরও কিছুকাল পরে যবদ্বীপে মুসলমান রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা হয়। যবদ্বীপের অধিবাসীরা ধর্মে মুসলমান হইয়া গেলেও হিন্দু সংস্কৃতি সেই ধর্মের আবরণের মধ্যেও আত্মরক্ষায় সমর্থ হইয়াছিল। নবীন ইসলামের সঙ্গে হিন্দু সংস্কৃতির একটা সামঞ্জস্য সাধিত হওয়ায় যবদ্বীপের হিন্দু সংস্কৃতির উপর মুসলমান ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব পড়ে নাই, তবে যবদ্বীপীয় ঔপনিবেশিকদের সংস্পর্শে আসিয়া তাহা কিছু পরিমাণে বিকৃত হইয়াছে। বলীদ্বীপের হিন্দুরা বীরত্বের জন্য বিখ্যাত ছিল, ইহারা বলীর পূর্ব দিকস্থ লম্বক দ্বীপ জয় করিয়া মুসলমান ধর্মাবলম্বী শাসকদের উপরও দীর্ঘকাল ধরিয়া রাজত্ব করিয়াছিল। ডচ ঔপনিবেশিকরা বহু চেষ্টার পর বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে বলিদ্বীপে সম্পূর্ণভাবে অধিকার বিস্তৃত করিয়াছিল। বলিদ্বীপবাসীরা এখনও ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের উপাসক।

দ্বীপময় ভারতের প্রাম্বানান ও বোরোবুদুর দর্শনের বিবরণদান প্রসঙ্গে লেখকের যে মনোভাব প্রতিফলিত হইয়াছে তাহা উদ্ধৃতির লোভ সম্বরণ করা উঠিন। প্রাম্বানানের হিন্দু মন্দিরগুলি দর্শনের পর সুনীতিকুমার লিখিয়াছেন—"·········তখন মনে মনে কেবল ওঁ নমঃ শিবায় আর ওঁ নমঃ উমায়ৈ মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে মহাকবি কালিদাসের কথায় প্রণামমন্ত্র আওড়াচ্ছিলাম—'জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতী পরমেশ্বরৌ।'······এই তীর্থস্থানের অদৃশ্য দেবতার অবস্থান যেন আমাকে ঘিরে র'য়েছে—এই রকম একটা ভাব, আমার হিন্দু জাতির অপরিসীম ঈশ্বর নিষ্ঠার আর বিশ্বাত্মবোধের, তার চিন্তা আর চেষ্টার, তার সুষমা বোধের আর শিল্প বিজ্ঞানের এই অবিনশ্বর নিদর্শন দেখতে দেখতে আমায় অভিভূত করে ফেলছিল······। সুদূর যবদ্বীপে এই পুঞ্জীভূত পাথরের ভাঙা চোরা স্তূপের মধ্যে আমি যেন প্রাচীন ভারতের জ্ঞান ভক্তি আর কর্মের ত্রিবেণীর ধারায় মানসিক অবগাহন করে স্নিগ্ধ হ'লুম, পবিত্র হ'লুম।" (পৃঃ ৫৪০—১)

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বোরোবুদুর দর্শনকালে সুনীতিকুমারের বর্ণনাটি এইরূপ "বোরোবুদুরের মতন বিরাট শিল্প-নিকেতনের সৌন্দর্য সম্ভারের মধ্যে প্রাচীন ভারতের জীবন্ত প্রাণের স্পন্দনে সৃষ্ট এই অবিনশ্বর কীর্তির আবেষ্টনের মধ্যে দণ্ডায়মান, ভারতের শ্রেষ্ঠ রসস্রষ্টাদের মধ্যে অন্যতম

শ্রীরবীন্দ্রনাথ; যে ভারতের ঋষিদের, যে ভারতের বুদ্ধের সাধনার অনুপ্রাণনার ফলে এই বোরোবুদুর, এই প্রাম্বানান, সেই ঋষিদের সেই বুদ্ধের বাণী নবীন ভাবে যিনি জগতে প্রচার ক'রছেন, প্রাচীন ঋষিদের সেই অদ্ভুতকর্মা বংশধর রবীন্দ্রনাথ তিনি স্বয়ং সেখানে উপস্থিত। ......বোরোবুদুর,—রবীন্দ্রনাথ;—ভারতের শাশ্বত চিন্তা আর কল্পনা শক্তির দুই বিরাট প্রকাশ—এক দিকে ভাস্কর্য মণ্ডিত সৌধে, অন্যদিকে অলৌকিক কবি প্রতিভায়"। (পৃঃ ৫৫৯) [এই প্রসঙ্গে চিত্রবলী (১) দ্রষ্টব্য]

এই অপূর্ব গ্রন্থটি পাঠ করার পর পাঠকের মনে যে চিন্তার উদয় হয় পুস্তক সমালোচনা প্রসঙ্গে উহা অবান্তর হইলেও উহা আলোচনার অপেক্ষা রাখে। দ্বীপময় ভারতের সহিত প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতিগত সম্পর্কই নহে, রক্ত-সম্পর্কও বিদ্যমান ছিল। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই সম্পর্ক পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে যত্নশীল ছিলেন। বর্তমানে ঔপনিবেশিক শাসনমুক্ত স্বাধীন ইন্দোনেসিয়ায় ও ইন্দোচীনে এই সব দেশের প্রাচীন সংস্কৃতির সম্বন্ধে গবেষণার ক্ষেত্র ডচ্, ফরাসী ও অন্যান্য ইউরোপীয় পণ্ডিতদের নিকট সঙ্কুচিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে একেবারেই রুদ্ধ হইবার আশঙ্কা আছে। অক্লান্তকর্মা সুপণ্ডিত ইউরোপীয় গবেষকদের মাধ্যমেই দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে ভারতীয় সভ্যতার দিগ্বিজয়ের কথা বিশ্ববাসীর গোচরীভূত হইয়াছে। জানা গিয়াছে যে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বাতাবিয়ায় প্রতিষ্ঠিত এশিয়া মহাদেশের প্রাচীনতম বিদ্বৎসংস্থা Koninklijk Genootschap van Kunst en Weten schappen (রাজকীয় কলা বিজ্ঞান পরিষৎ)টি ইতিমধ্যেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ইন্দোনেসিয়ার অতীত ইতিহাস উদ্ঘাটনের দ্বারা প্রায় দুই শত বর্ষ কাল ধরিয়া এই পরিষৎ বিশ্ব সংস্কৃতির যে সেবা করিয়াছেন তাহার তুলনা বিরল। সম্ভবতঃ প্রগতিশীল স্বাধীন ইন্দোনেসিয় রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ এই ধরণের গবেষণা আর অগ্রসর হইতে দিতে চান না। কুড়ি তিরিশ বৎসর পূর্বে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণা ও সাংস্কৃতিক ভাব বিনিময়ের জন্য স্বয়ং সুনীতিকুমার, ডাঃ কালিদাস নাগ, ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল, ডাঃ প্রবোধ চন্দ্র বাগ্‌চি, ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতির চেষ্টায় ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রভৃতি মনীষীবৃন্দের পৃষ্ঠপোষকতায় যে বৃহত্তর ভারত পরিষদ্ (Greater India Society) প্রতিষ্ঠিত হয় তাহারও বর্তমানে অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে। পরাধীন ভারতে রবীন্দ্রনাথ, সুনীতিকুমার, কালিদাস নাগ, প্রবোধ বাগ্‌চি প্রভৃতির ঐকান্তিক চেষ্টায় দ্বীপময় ভারতের সহিত আত্মীয়তা স্থাপনের যে চেষ্টা হইয়াছিল স্বাধীন ভারতে সেই ধারা ক্ষীণ এমন কি অস্তিত্ব হীনও বলিতে পারা যায়। তিব্বতের মঠ গুহায় ভারতীয় মনীষার উজ্জ্বল সাক্ষ্য কত অমূল্য পাণ্ডুলিপি চীনা-সাম্যবাদীদের করাল গ্রাসে কবলিত হইয়া চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া গেল তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার "বৃহত্তর ভারত" রূপে বর্ণিত দেশগুলি ও বর্তমানে একটি আগ্রাসী রাজনৈতিক মতবাদের অনুকূলে শনৈঃ শনৈঃ ধাবমান্ হইতেছে। আশঙ্কা হয় যে এই মনোভাবের ফলে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির নিদর্শন গুলিই শুধু বিলুপ্ত হইবে না এই সব দেশের জাতীয় জীবন হইতেও ভারতীয় প্রভাবের রেশটুকুও অপসৃত করার দুশ্চেষ্টা কার্যকরী হইবে। পর শাসন মুক্ত সদ্য স্বাধীন ভারতের পররাষ্ট্র নীতি দ্বীপময় ভারতের দেশগুলির প্রতি বন্ধুত্ব ও সৌভ্রাত্রের হস্ত

প্রসারিত করিয়াছিল ইহার পশ্চাতে কোন সাম্রাজ্যবাদী অথবা ব্যবসাদারী মনোবৃত্তি ছিল না, দুর্ভাগ্যের বিষয় ইদানীং কালে আমাদের পররাষ্ট্র নীতি পরিবর্তিত না হইলেও এই সব দেশগুলির কোন কোনটির মনোভাব বর্তমানে ভারতের প্রতি সদিচ্ছার পরিচয় বহন করিতেছে না। অতীতে যাহাদের সহিত আমরা আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ ছিলাম বর্তমানেও তাঁহাদের সহিত আত্মীয়তার সম্পর্ক রাখা আমাদের অভিপ্রেত। স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্র নিয়ন্তারা এই পথেই অগ্রসর হইতেছেন ও হইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই প্রচেষ্টা শুধু রাজনৈতিক স্তরে আবদ্ধ থাকিলেই চলিবে না, সাংস্কৃতিক স্তরে দ্বীপময় ভারতের সহিত আমাদের যোগযোগ পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা অব্যাহত রাখিতে হইবে। ভারত রাষ্ট্র হইতে বৃত্তি দিয়া ইন্দোনেসিয়া, ইন্দোচীন প্রভৃতি দেশের ছাত্রদের ভারতের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা ও কাশী বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ, নব নালন্দা বিহার প্রভৃতিতে সংস্কৃত ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষা শিক্ষা দানের ব্যবস্থা এবং সংস্কৃতি বিষয়ে দ্বীপময় ভারতের বিদ্যালয়গুলিতে অধ্যাপক নিয়োগ প্রভৃতি প্রকল্প গ্রহণের বিষয় বিবেচনা যোগ্য। দ্বীপময় ভারতের সহিত মৈত্রী স্থাপন ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ফলে ভারতের রাজনৈতিক ও বৈষয়িক স্বার্থ ও অক্ষুন্ন থাকার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। রবীন্দ্রনাথের সাধনার ক্ষেত্র বিশ্বভারতীরও এই বিষয়ে অনেক কিছু কর্তব্য আছে। ভারত সরকারের একটি সাংস্কৃতিক যোগাযোগ দপ্তর আছে (Cultural Relations Department), তাঁহাদেরও এই বিষয়ে অবহিত হওয়া কর্তব্য।

আলোচ্য পুস্তকটির মত একটি তথ্য-সমৃদ্ধ, হৃদয়গ্রাহী, সুলিখিত কাব্য রসোপেত পুস্তক পাঠের সুযোগ দানের জন্য প্রকাশক পাঠক সাধারণের নিকট কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। পরিশিষ্টে সংযোজিত-চিত্রাবলী এবং রবীন্দ্র-রচনার পাণ্ডুলিপির ফটোগুলি এই পুস্তকটিকে অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত করিয়াছে। বইটি ব্যক্তিগত সংগ্রহ ও পাঠাগারগুলিকে সমৃদ্ধ করিবে সন্দেহ নাই।

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

সাহিত্যের কথা ॥ চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী, কলিকাতা-১২ ছয় টাকা।

বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের আসরে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজস্ব বিশিষ্ট সাহিত্যচিন্তা, ঋজু বক্তব্য পরিবেশনা উৎসাহী সাহিত্য-পাঠকের সবিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'সোনার আলপনা' বা 'গ্রন্থবার্তা' গ্রন্থদ্বয়ে তাঁর বিদগ্ধ মানসিকতা, তৎসহ এক অন্তর পরিবেশ রচনার মাধ্যমে সাহিত্যিক তথ্য ও তত্ত্ব নিবেদনে যে আশ্চর্য রসসম্মিলন ঘটেছে তা তুলনা রহিত। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বর্তমান 'সাহিত্যের কথা' গ্রন্থে বিশ্ব-সাহিত্যের মাধ্যমে বিশ্বমানবকে প্রকাশ করবার প্রয়াস বিশেষ লক্ষ্যণীয়: 'বিশ্ব-সাহিত্যের সুস্পষ্ট কোন সংজ্ঞা দেওয়া চলে না। বিশ্ব-সাহিত্য বললেই আমাদের মনে পড়ে এমন এক সাহিত্যের কথা যা বিশেষ দেশ বা জাতির গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ নয়, এবং যার আবেদন পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র অনুভূত হবার মত গুণসম্পন্ন। এই বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতটাই

বিশ্ব-সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা বড় লক্ষণ।' এবং 'জাতীয় সাহিত্যকে উপেক্ষা করে বিশ্ব-সাহিত্য সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে না। বরং জাতীয় সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটলেই বিশ্ব-সাহিত্যের উন্নতি সম্ভব। গ্যেটে বিদেশী পণ্যের বাজারের সঙ্গে বিশ্ব-সাহিত্যের তুলনা করেছেন। প্রত্যেক দেশ তার সর্বোৎকৃষ্ট পণ্যদ্রব্য বিদেশের বাজারে প্রেরণ করে। দেশের সম্মান এবং বাণিজ্য প্রসারের জন্য পণ্য-দ্রব্যের উৎকর্ষের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হয়। অন্য দেশের সঙ্গে তুলনায় পণ্য দ্রব্য নিকৃষ্ট প্রমাণিত হলে ক্রেতা পাওয়া যাবে না। তেমনি ক্রমাগত সাধনার ফলে রচিত জাতীয়-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলি বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে মর্যাদা লাভের দাবী করতে পারে।…বিশ্ব-সাহিত্য ভাববিনিময়ের আন্তর্জাতিক বাজার, পৃথিবীর বিভিন্ন সংস্কৃতির মিলনকেন্দ্র। জাতিগত ও ভাষাগত বিভেদের উপর বিশ্ব-সাহিত্য মিলনের সেতু রচনা করে। বিশ্ব-সাহিত্য আলোচনা করলে দেখা যাবে বাহ্যিক কতকগুলি পার্থক্যের অন্তরালে মানুষের মনের কাঠামো সর্বত্রই এক। বিশ্ব-সাহিত্য এই মূলগত ঐক্য প্রকাশ করে বৃহৎ মানবসমাজ গড়ে তুলতে সহায়তা করবে।' এবং তৎসহ 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা ভৌগলিক ব্যবধান দূর করবে, কিন্তু মনের সেতু রচনা করবে সাহিত্য। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কীর্তিগুলি বহুল প্রচারিত হলে দেখা যাবে, সকল দেশের মানুষের জীবনই প্রায় অনুরূপ সুখ-দুঃখ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার দ্বারা চালিত। বিশ্ব-সাহিত্য এই সত্যকে সর্বসাধারণের উপলব্ধির মধ্যে এনে দিলে নতুন যুগের সূচনা হবে বলে আশা করা যায়।'

সাহিত্যের কথা গ্রন্থটিতে সাহিত্যের নানাবিধ প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে লিখিত মোট পঁচিশটি প্রবন্ধ সঙ্কলিত হয়েছে ; ক্লাসিক সাহিত্যের ক্রান্তিকাল, শিল্প ও সাহিত্যে একরূপতার অভিশাপ, সমকালীন সমালোচনা এবং সমালোচনার মান, তৎসহ সাহিত্যে বাস্তবতা, বাস্তবতার প্রতিক্রিয়া, সাহিত্য ও রাজনীতি ইত্যাদি প্রবন্ধাবলীতে সাহিত্যের অতি প্রয়োজনীয় প্রশ্নাবলী নিয়ে যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনায় অবতীর্ণ হয়েছেন শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

'আমেরিকান সাহিত্যে ভারত'. 'ইংরেজী সাহিত্যে ভারত', এবং 'জার্মান সাহিত্যে ভারত' প্রবন্ধত্রয় আলোচ্যগ্রন্থে একটি বিশেষ ভাবসূত্রে গ্রথিত। বিদেশী সাহিত্যিক কবিদের চোখের আলোয় ভারত কা ভাবে উপস্থিত তার এক বিশিষ্ট তথ্য সমৃদ্ধ পরিচয় পাঠক উক্ত প্রবন্ধ ত্রয়ে আবিষ্কার করতে পারবেন :

'ইমার্সন, থোরো এবং হুইটম্যান বিশ্বাস করতেন যে, ভারতের অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে পরিচিত হলে অর্থের জন্য উন্মত্ততা হয় তো কমবে।' এবং পাশাপাশি, পরবর্তীকালে 'কিপলিং-এর রচনায় ভারত-বিদ্বেষ এবং বিশেষ করে হিন্দু-বিদ্বেষ সুস্পষ্ট।…আমেরিকান সাংবাদিক মিস ক্যাথারিন মেয়োর 'মাদার ইণ্ডিয়া' ভারতের বিরুদ্ধে কুৎসার এক অপূর্ব দলিল।'

'ভারতের সঙ্গে ইংরেজ লেখকদের পরিচয় বিশ্লেষণ করলে, একটি কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রোমান্টিক যুগের যে-সব কবিদের আমরা বিদ্রোহী এবং স্বাধীনতার পূজারী বলে জানি এবং যাঁদের কাব্য স্কুল কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে শতাব্দীকাল যাবৎ পড়ে আসছি, তাঁরা ভারতের জন্য সামান্যই সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন।' বলাবাহুল্য, আসলে তৎকালীন আদর্শবাদী কবিরাও জাতীয় স্বার্থের

ধ্যান ধারণা ও প্রভাব থেকে নিজেদের উর্দ্ধে তুলতে পারেন নি। এবং আশ্চর্য এই যে, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, বায়রণ, শেলী প্রমুখ তথাকথিত আদর্শবাদী স্বাধীনতাপ্রেমী কবিদের স্বদেশবাসী ভ্রাতাগণ বহু শতাব্দীর সভ্যতাসমৃদ্ধ ভারতের স্বাধীনতা হরণ করাতেও তাঁরা কিন্তু একবিন্দুও অশ্রুপাত বা সহানুভূতি প্রকাশ করা কর্তব্য হিসেবে সেদিন গণ্য করেন নি। উক্ত আদর্শবাদী নৈতিক স্বাধীনতাকামী কবিকুলের সমসাময়িক কবি টমাস ক্যামবেল এবং কুপারের কবিখ্যাতি স্বল্প অথচ ভারতের দুর্ভাগ্যের জন্য তাঁদের হৃদয়ের যে অকুণ্ঠ সমবেদনা তাঁদের কাব্যে প্রতিভাত তা যে কোনো ভারতবাসীকে উৎসাহে প্রদীপ্ত করে। এডমণ্ড বার্ক কিন্তু তারও আগে ভারত সম্পর্কে শ্রদ্ধা পোষণ করে এসেছেন। ওয়ারেন হেস্টিংসের কার্যকলাপ এবং তাঁর বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের পার্লমেন্টে উপস্থাপিত অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি সেদিনের ভারতবর্ষ সম্পর্কে মত ব্যক্ত করেছিলেন: '...I challenge the world to show, in any modern European book, more true morality wisdom than is to be found in the writing of Asiatic men in high trust...'। বর্তমান প্রবন্ধে লেখক বিখ্যাত শিকারী-গ্রন্থকার জিম করবেটের নাম উল্লেখ করতে পারতেন। জিম করবেটের রচনা প্রথমত প্রথমশ্রেণীর সাহিত্যিক উপাদানে সমৃদ্ধ এবং পরন্তু তাঁর লেখার মূল কেন্দ্র ভারতীয় আরণ্যক জীবন এবং সাধারণ ভারতীয় সমাজ। বিশেষত তাঁর 'মাই ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে অপেক্ষাকৃত সাধারণ দরিদ্র ভারতবাসীর (যাঁদের সংস্পর্শে এসে তিনি প্রীত ও মুগ্ধ হয়েছিলেন) প্রতি এক উদার মমতা, এবং ভারতের প্রতি যে অকৃত্রিম অনুরাগ, শ্রদ্ধা প্রকাশ লাভ করেছে তা বোধকরি অনেক স্বদেশীয় লেখকের কলমেও স্বতস্ফূর্তভাবে প্রবাহিত হয় না।

'জার্মান সাহিত্যে ভারত' প্রবন্ধটিও শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গবেষণাধর্মী রচনারীতির পরিচায়ক। এই পর্যায়ে ফরাসী সাহিত্যে ভারতের কথা তিনি লিপিবদ্ধ করলে পর্যায়ক্রমটি মনে হয় পূর্ণাঙ্গ হতো।

বর্তমান গ্রন্থের অন্যান্য প্রবন্ধাবলীর মধ্যে আলবেয়ার কামু এবং টমাস মান প্রসঙ্গে দু'টি তৎসহ 'বিশ্ব সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধ এক অন্যতর রচনাদর্শে বিশিষ্ট। উক্ত প্রবন্ধাবলী চিত্তরঞ্জনবাবুর একান্ত নিজস্ব শিল্পাদর্শের ফসল। কিন্তু পাশাপাশি সাহিত্য পত্রিকা, সাহিত্যিক ধাপ্পা, প্রতিভা ও পাগলামি পাঠ্য হিসেবে রম্য কিন্তু একান্ত ভাবে তথ্য নির্ভর বলে গ্রন্থের অন্যান্য বিশিষ্ট প্রবন্ধাবলীর আসরে অপেক্ষাকৃত ম্লান। সাহিত্য ও রাজরোষ, বলা বাহুল্য, তথ্য পরিবেশনায় অত্যন্ত পরিশ্রমের স্বাক্ষর বহন করে তথাপি বাঙালী পাঠক উক্ত প্রবন্ধপাঠে হয়তো কিঞ্চিৎ অনুৎসাহিত হবেন ইংরেজি গ্রন্থের বিপুল তালিকার পাশাপাশি রাজরোষে পতিত বাংলা বা অন্যান্য ভারতীয় গ্রন্থের স্বল্প নামোল্লেখে। তবু প্রবন্ধটির মধ্যে যে সুপ্রচুর উপাদান রয়েছে তা পাঠে গবেষক পাঠক উপকৃত হবেন।

আফ্রিকার কৃষ্ণবর্ণ ও য়ুরোপের শ্বেতবর্ণ যে সৃষ্টির ক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন তার পরিচয় গ্রন্থকার বর্তমান গ্রন্থের কয়েকটি রচনামালায় বিধৃত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। বলা বাহুল্য, আলোচ্য গ্রন্থে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মনন-সঞ্জাত সাহিত্য এবং বহু বিচিত্র ও বিভিন্ন মেজাজের সাহিত্যিকের সমাবেশ ঘটেছে।' তথাপি এই গ্রন্থে নানা উল্লেখযোগ্য বিদেশী সাহিত্যালোচনার পাশাপাশি

অন্যান্য প্রাচ্যদেশীয় সাহিত্য-প্রসঙ্গ কিংবা ভারতীয় সাহিত্যের নানা দিক নিয়ে কিছু আলোচনা কিন্তু পাঠক হিসেবে আমরা আশা করেছিলাম। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় গুণী লেখক এবং এ বিষয়ে বিশেষ যোগ্য বলেই তাঁর নিকট আমাদের এই প্রত্যাশা। তথাপি, বলা যেতে পারে, 'সাহিত্যের কথা' অত্যন্ত তথ্য সমৃদ্ধ এবং জিজ্ঞাসু সাহিত্য পাঠককে নিঃসন্দেহে গভীরে আকর্ষণ করবে।

পরিশেষে একটি বক্তব্য: সম্প্রতিকালে একই নামে একাধিক গ্রন্থ প্রকাশ যেন একটা রেওয়াজে পরিণত হতে চলেছে। জানিনা একই নামের ভিড় সাহিত্যের আসরে লেখকদের অনবধানবশত ঘটে কিনা? তবে মনে হয় তা হয়তো নয়। কিন্তু তা যদি না হয় তবে বলতে হবে গ্রন্থের নামকরণে দীনতা আশ্রয় নিয়েছে। যতদূর জানি অল্প কিছুকাল পূর্বে প্রকাশিত সাহিত্য প্রাসঙ্গিক আর একটি গ্রন্থেরও এই একই নাম দেখেছি। অবশ্য সেজন্য যদিও এই গ্রন্থের কোনো মূল্যহানি ঘটে না, তবে পাঠক হিসেবে আমাদের প্রাপ্তিযোগের তালিকায় নতুন আর একটি গ্রন্থ-নাম যুক্ত হবার কোনো সুযোগই লাভ করে না। বর্তমান 'সাহিত্যের কথা'র গ্রন্থসজ্জা লোচনসুখকর॥

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

ঝক্ ঝকে দাঁত
আর সুন্দর হাসি
SADHANA DASAN
আয়ুর্বেদীয় মতে তৈরী আদর্শ দাঁতের মাজন
সাধনা
দশন

Regd. No. C-315 Phone : 28-5155 July '65 (0.50) Central Regd. No.

সমকালীন

ত্রয়োদশ বর্ষ ॥ শ্রাবণ ১৩৭২

পশ্চিম দিনাজপুর

জেলা গেজেটিয়ার

সম্পাদক : **যতীন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্ত** আই. এ. এস্.

মুল্য : ১৫ টাকা পৃষ্ঠা : ২৫৯

পশ্চিমবঙ্গের জেলা-গেজেটিয়ার্স-এর যে নতুন সিরিজ বের হচ্ছে এ বইখানি সেই সিরিজের প্রথম। সতেরটি পরিচ্ছেদে পশ্চিম দিনাজপুর জেলার যাবতীয় প্রামাণ্য তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে এই বইটিতে। বইটি প্রকাশ করেছেন : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্টেট এডিটর, ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স।

॥ প্রাপ্তিস্থান ॥

অধীক্ষক, সরকারী মুদ্রণ
৩৮, গোপাল রোড
আলিপুর, কলিকাতা—২৭

সরকারী প্রকাশন বিক্রয় কেন্দ্র
নিউ সেক্রেটারিয়েট
১, কিরণশঙ্কর রায় রোড, কলিকাতা—১

W. B. (I & P. B) Ad-D 4736/65

টর্চ রাখা দরকার
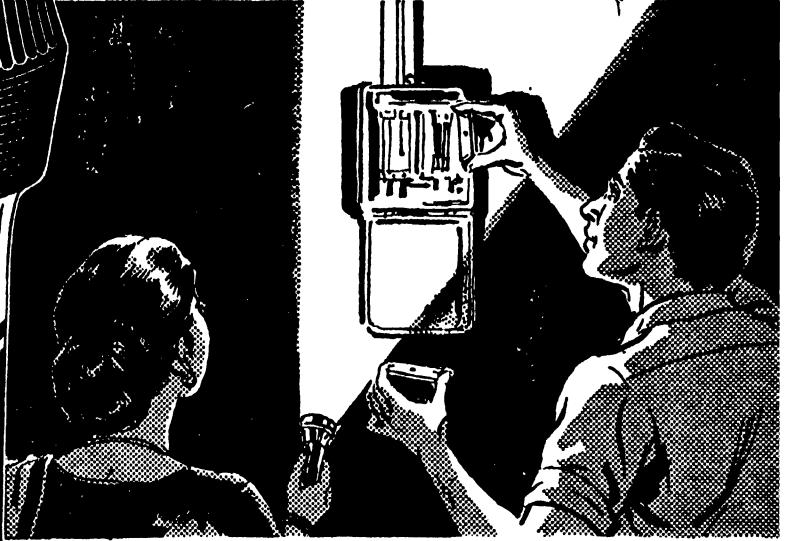
◀ এভারেডী
টাইপ নং ৪৫৪১
(নীচের দিক থেকে
ব্যাটারী ভরতে হয়)
দাম মাত্র
৩.৭৫ পয়সা
৯৫০ ব্যাটারী—
মাত্র ৫৬ পয়সায়
একটি। কর আলাদা।

প্রায়ই এমন সব ঘটনা ঘটে, যখন 'এভারেডী' টর্চ থাকলে ভারি সুবিধে। কখন কি দরকার পড়ে বলা যায় না। 'এভারেডী' টর্চটা এমন জায়গায় রাখবেন যেন হাত বাড়ালেই পান।

* এভারেডী' বাজারের সেরা টর্চ।
* আর কোন টর্চই এত ভাল কাজ দেয় না, এত বেশী দিন যায় না।
* এর জোড়বিহীন মজবুত কেস অ্যালুমিনিয়ামে তৈরী যাতে কথনো মরচে পড়ে না।
* 'এভারেডী' টর্চে লাগানো থাকে নির্ভরযোগ্য 'এভারেডী' সুইচ এবং বিশেষ ধরনের রিফ্লেক্টর যাতে আলো খুব জোরদার হয়।
* বিশ্ববিখ্যাত 'এভারেডী' ব্যাটারী ব্যবহার করুন, তাতে আলো হবে সবচেয়ে জোরালো, চলবে সবচেয়ে বেশী দিন।
* আজই দেখেশুনে পছন্দ মত 'এভারেডী' টর্চ কিনুন।

টর্চ • ব্যাটারী • বাল্‌ব • ম্যান্টল

ইউনিয়ন কারবাইড ইণ্ডিয়া লিমিটেড

JWTUC 2138

সুলেখা
ড্রইং এর
কালি
সুলেখা
প্রতিদিনের প্রয়োজনে
সুলেখা
ফাউণ্টেন পেন-এর
কালি
অ্যাডসল
অফিস
পেস্ট
ও গাম
সিকুর্যারিটি
সিলিং
ওয়াক্স
সুলেখা
স্ট্যাম্প প্যাড
সুলেখা
ওয়ার্কস্ লিমিটেড
সুলেখা পার্ক, কলিকাতা—৩২
Progressive/SW 34

ত্রয়োদশ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

শ্রাবণ তেরশ' বাহাত্তর

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

বাংলা সাহিত্য প্রসঙ্গ

সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মরুগ্রাস ঃ তুর্কী আক্রমণ কাল

হাজার বছর আগে বাঙলা সাহিত্যের যে ক্ষীণ ধারাটি উৎসভূমি থেকে ধীরে ধীরে বইতে আরম্ভ করেছিল, কিছুদূর এগিয়েই হঠাৎ এক বিরাট বন্ধ্যাযুগের মরুবালুরাশির মধ্যে সেটি হারিয়ে গেল। তার অস্তিত্বের ধারাকে কয়েক শতক আর খুঁজে পাওয়া গেল না। বিরুদ্ধ ভাগ্য বাঙলাদেশে মর্মান্তিক দিন তুর্কী আক্রমণের কাল। অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা, বিদেশী, বিভাষী, বিধর্মী সৈন্যদলের সদর্প পদক্ষেপ, লুটতরাজ, উৎপীড়ন অগ্নিসংযোগ বাঙলার স্বাভাবিক জীবনকে বিপর্যস্ত, লণ্ডভণ্ড করে এক অভাবিত দুর্দিনের সৃষ্টি করল। বাঙলার উত্তর, মধ্য ও পশ্চিমাঞ্চলের মানুষ অভ্যস্ত শান্ত পরিমণ্ডল থেকে মুহূর্তে উদ্বেগসঙ্কুল অজানা পরিবেশে স্থানান্তরিত হয়ে গেল। ত্রয়োদশ চতুর্দশ শতাব্দ তুর্কী অভিযান-কাল, বাঙলা সাহিত্যের তমসাচ্ছন্ন অধ্যায়। চর্যাপদ থেকে উত্তরকালের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন তারই মাঝখানে প্রায় দু'শ বছরের বিস্তীর্ণতায় চোখ বুলিয়ে গেলে সৃষ্টিচিহ্নহীন ধূধূ শূন্যতাই প্রকট হবে।

তথাপি অনুমান দেশ-জোড়া রাষ্ট্রিক তাণ্ডবের প্রবল প্রাতিকূল্য সত্ত্বেও সৃষ্টির কাজ একেবারে ঘুমিয়ে ছিল না। এবং এ কল্পনাও অসঙ্গত নয় যে, দুর্যোগের দাপাদাপি তর্জন গর্জনে বাঙলার বায়ুমণ্ডল যখন সংক্ষুব্ধ, তখনো রুদ্ধদ্বার গৃহবেষ্টনীর মধ্যে কবিপ্রাণ বাঙালী ভূর্জপত্রে, তুলটে লেখনী চালনায় নিমগ্ন। হয়তো সে সব পুথির পাতা শত্রু কবলিত হয়েই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কতো কাব্যের চারা মাথা তুলতে গিয়েই সময়ের উষ্ণশ্বাসে শুকিয়ে ছাই হয়েছে। আমাদের এ অনুমান নিষ্কারণ নয়। দেখা যায় পঞ্চদশ শতাব্দ থেকে বৈষ্ণব সাহিত্য ও পাঁচালী কাব্যের যে

ধারাগুলি বহমান, সেগুলির প্রথম আবির্ভাব রীতিমতো পরিণতির স্বাক্ষর নিয়ে, যা অকল্পনীয়। তাই নেপথ্যবিধানে আস্থা জাগে এবং আঁধার যুগের সাহিত্য চর্চা ও সৃষ্টির এক কাল্পনিক সম্ভাব্য রূপ মনে আনা কঠিন হয় না। বেশ অনুমান করতে পারি ইতিমধ্যেই কবি জয়দেবের মধুর কোমলকান্ত পদাবলীর রসাভিসিঞ্চনে বাঙালী চিত্ত শুধুমাত্র নন্দিত না হয়ে আপনার মধ্যে উদ্দীপ্ত সৃষ্টি-ইচ্ছার সংবেগ অনুভব করেছে। সম্পন্ন না হলেও হয়তো বৈষ্ণব কাব্যের বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত রূপাভাস দেখা দিয়েছে। উত্তরকালের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের মতো পূর্ণাঙ্গ একটি কাব্য এই অনুমিতির সমর্থক। বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য প্রাথমিকতার দ্বিধাগ্রস্ত জড়িমা নিয়ে আসে নি। এর মধ্যে এমন একটি পরিপক্ক পরিণতি চোখে পড়ে যা আদি সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত নয়। মনে হয় এই পর্বেই মোটামুটি একটি পথ তৈরী হয়ে গেছে এবং বড়ু পূর্বগামীর বিচরিত পথে বেশ বলিষ্ঠ পদক্ষেপেই প্রাগ্রসর।

মঙ্গলকাব্যের সম্পর্কে এ অনুমান সঙ্গততর। সেখানেও কাব্যরূপের সমগ্রতা হয়তো আগে দেখা যায় নি, কিন্তু তার কাহিনী উপকাহিনীগুলি খণ্ড খণ্ড আকারে যে গড়ে উঠতে আরম্ভ করেছে, তা বলা যায়। বস্তুত মঙ্গলকাব্য একের সৃষ্টি নয়। জনজীবনে এর জন্ম, লোকমানসে এ গল্পের ভূমি জেগে উঠেছে ধীরে ধীরে। প্রথম দিকে দ্বীপের মতোই বিচ্ছিন্ন, পরে একত্র হয়ে মহাভূখণ্ডের সৃষ্টি। সেই একত্রীকরণের ভার নিয়েছেন উত্তরকালের প্রতিভাধর কবি, যাঁদের হাতে এগুলি বৃহৎ কাহিনীর অঙ্গীভূত, সংহত, সাজসজ্জায় সম্পূর্ণ। মঙ্গলকাব্য-কাহিনী দ্বিজ। তার প্রথম জন্ম দেশের মাটিতে, সেখানে সে নৈর্ব্যক্তিক। দ্বিতীয় জন্ম কবির কাব্যে; সেখানে তার গায়ে ব্যক্তি-মুদ্রা। অবশ্য মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যে সে মুদ্রা বড়োই অস্পষ্ট।

কথারম্ভে যাকে বলেছি অন্ধকার বা বন্ধ্যাযুগ, দেখা গেল সেই আঁধারে দৃষ্টি চালালে কিছু কিছু দেখা যায়। কিন্তু সে চর্মচক্ষে-নয়, কল্পনায়, অনুমানে, পরোক্ষ প্রমাণের জোরে। তাই নামাঙ্কনকে অসঙ্গত বলা নিষ্প্রয়োজন। আজ দূরকালের প্রেক্ষনিকায় দু'শ বছরের ইতিহাস সৃষ্টিহারা, নিষ্ফল। 'তুর্কী আক্রমণের কাল' এই অবাঞ্ছিত, অবান্তর নামে আমাদের সাহিত্য-ইতিহাসের একটি পর্বকে চিহ্নিত করতে হল, এ দুঃখেরই কথা। তবু এই ভেবে সান্ত্বনা, ঐ আপাত শূন্যতার মধ্যেই ভাবীকালের সার্থক সৃষ্টির অঙ্কুর প্রচ্ছন্ন ছিল, দূরের আলোকে আজ যা দুর্লক্ষ্য।

বড়ু চণ্ডীদাস ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকাব্য

'চণ্ডীদাস'—বহু উচ্চারিত নামটি বাঙালী মাত্রেরই অতি চেনা। কিন্তু আজ পণ্ডিতজনের গবেষণার ফলে 'চণ্ডীদাস-সমস্যার' গোলোক-ধাঁধায় বিভ্রান্ত পাঠকের কাছে এ নামও রহস্যময় ঠেকে। চণ্ডীদাস-বহুত্বে এখন সঠিক সংখ্যার হদিশ পাওয়া শক্ত। 'বড়ু' 'দ্বিজ', 'দীন'—নান্নুর, ছাতনা, কেতুগ্রামবাসী—প্রাক চৈতন্য, চৈতন্যোত্তর—বাঙলা সাহিত্যে আজ নানা চণ্ডীদাসের ভীড়। সমস্যার জটিল অরণ্যে পাঠকের পথ হারানো বিচিত্র নয়, বিশেষত যখন গবেষকের গবেষণায় জট ক্রমবর্ধমান। কে জানে হয়তো ভবিষ্যতে কোন তীক্ষ্ণদর্শী অথচ সহজবুদ্ধি-সম্পন্ন বিশেষজ্ঞের স্বচ্ছ

দৃষ্টির আলোতে জটিলতা কেটে গিয়ে সমস্যা তার সমাধান খুঁজে পাবে।

আমরা গবেষক নই। সুতরাং নিখুঁত নেপথ্যবার্তা নিষ্প্রয়োজন। দূরের ঘাট থেকে বহু শতাব্দী পেরিয়ে কালের খেয়ায় সাহিত্যের যে ফসল বর্তমানের তীরে এসে পৌঁছেচে, সেই ফসলগুলিই আমাদের লক্ষ্য। নামের সমস্যাকে একটু পাশ কাটিয়ে চলাই আমাদের ইচ্ছা। অবশ্য কবিকে একেবারে বাদ-দিয়ে নিছক কাব্যালোচনায় 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি'—নীতির ঔচিত্যে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক। সে সন্দেহ আমাদেরও আছে। তবু প্রভূততর বিভ্রান্তির আশঙ্কায় এই আপাত-নিরাপদ পন্থাই গ্রহণ করা গেল।

বিশেষজ্ঞ না হয়েও দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকাব্য চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত বিপুল পদাবলী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। প্রথমত কবির নাম ও কাব্যের চরিত্র-পরিচয় স্বাতন্ত্র্য-সূচক। দ্বিতীয়ত এর কাহিনী, রসের স্বাদ, ভাষা ও কাব্য কৌশল পদাবলী থেকে একেবারেই আলাদা। স্বভাবতই কাব্য-পাঠে ধারণা হয় বড়ু চণ্ডীদাস পদাবলী-কার চণ্ডীদাস থেকে পৃথক এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পদাবলী সাহিত্যের দল-ছাড়া।

বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের কাঁকিল্যা গ্রামের গোয়ালঘরের মাচা থেকে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বল্লভ যে ধূলিমলিন পুঁথিখানি উদ্ধার করলেন তাতে চণ্ডীদাস সম্বন্ধে বহুদিনের চলতি ধারণায় আর সেই সঙ্গে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটা ওলট-পালট হয়ে গেল।

পদাবলী সাহিত্যের মাঝখানে আচমকা এমন এক রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক অথচ অভাব্য কাব্য-কীর্তি প্রকাশিত হয়ে পড়ল যা কদাপি পদসাহিত্যের জ্ঞাতি নয়। পুঁথির শুকনো পাতায় আশ্রয় নিলেও শ্রুতি ও স্মৃতি-বাহিত বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে জনমানসের সম্বন্ধ সজীব সম্বন্ধ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এমনিভাবে জীবন্ত হৃদয়ের মধ্যে স্থান পেয়ে উত্তরকালের দিকে পাড়ি জমাতে পারে নি। কী এক অজ্ঞাত কারণে তার সঙ্গে জনজীবনের সম্পর্ক হঠাৎ ছিন্ন হয়ে গেছে। ১ আলোকজ্জ্বল, শ্রোতৃসমাকীর্ণ গানের আসর থেকে ঠিক কবে যে সে চিরবিদায় নিয়ে অন্ধকার অজ্ঞাতবাস সুরু করেছে, আজ তা অনুমান করাও কঠিন। কতকাল পরে হঠাৎ বিশ শতকের সন্ধানী দৃষ্টির তীব্র আলোক-রশ্মি গিয়ে পড়ল গ্রাম্যগোশালার মাচায়, বিস্মৃতির আস্তরণ থেকে বাঙলা সাহিত্যের হারাননিধিকে উদ্ধার করে নিয়ে এল।

এ কাব্য আজ যাদুঘরের আদরের সামগ্রী। পদাবলীর মতো এর বর্তমান-রূপ নেই, যার মধ্যে প্রাণের স্পন্দন শোনা যায়। আধুনিক জীবনের রসরুচিকে তৃপ্ত এমন কি স্পর্শ করারও ক্ষমতা থেকে সে বঞ্চিত। সে শুধু অতীতের সাক্ষী। বাঙলা বৈষ্ণব সাহিত্যের এক অদৃষ্টপূর্ব প্রাগৈতিহাসিক আদিম অতিকায় রূপ আমরা এর মধ্যে পাই, কালের সঙ্গে যে চলতে পারে নি; অতি স্থূল আদি রসের এই কাব্যখানি বিষম-উপাদান-মিশ্রিত খণ্ড-গ্রথিত বিচিত্র ভঙ্গিমা নিয়ে চলার পরেই বিবর্তনের আদি পর্বে অদৃষ্ট এর কপালে বর্জনের ছাপ এঁকে দিয়েছে। আজ হঠাৎ অন্ধকারের গর্ভ থেকে এতগুলি শতাব্দীর পর এর মুক্তি ঘটতেই অনুসন্ধিৎসুর দল চারদিকে ভিড় করে পাঁজি পুথি মিলিয়ে এর, জন্মলগ্ন ও গোত্রের সন্ধান আরম্ভ করবে এ আর বিচিত্র কি।

বড়ু চণ্ডীদাস যে আদি চণ্ডীদাস এবং প্রাক্ চৈতন্য যুগের কবি আজ এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ

নেই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা চর্যা-পরবর্তী মধ্যযুগীয় বাঙলা ভাষার নির্দশন হিসাবে মূল্যবান। পুথিটির জন্ম পরে হলেও কাব্যের জন্ম যে অন্তত পঞ্চদশ শতকের মধ্যেই একথা বলতে বাধা নেই। বড়ু চণ্ডীদাস বাশুলী সেবক, পণ্ডিত এবং সম্ভবত প্রবীণ! কিন্তু গীতি কবি তিনি নন। বড়ুর কাব্যরূপ বড়ো বিচিত্র। জন্মখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড থেকে আরম্ভ করে বংশী ও বিরহ খণ্ড পর্যন্ত বহুখণ্ড-বিভক্ত কাব্যটি একটি আখ্যানের ধারাবাহিক বর্ণনা। শুধু কাহিনী-কাব্য নয়, এর মধ্যে বেশ একটু নাটকীয়তার আমেজ আছে। সংলাপ, দৃশ্য-সন্নিবেশ, ঘটনা-সংযোজন এবং প্রতিবেশ রচনায়। আর নাটকীয়তা আছে গল্পের দ্বন্দ্বে, পাঠকজনকে উৎসুক রাখার সুনিপুণ ভঙ্গিটিতে, গল্পের আরম্ভেই যার বীজ উপ্ত। কাহ্ন, চন্দ্রাবলীরাহী এবং বড়ায়ি এই ত্রয়ী কাব্যনাট্যের চরিত্র। কবি হলেও বড়ু চণ্ডীদাস নাট্যকার-সুলভ নেপথ্যবর্তিতার আশ্রয় নিয়েছেন। পাত্র পাত্রীর কণ্ঠে-তাঁর কণ্ঠস্বর শোনা যায় না। নিজেকে তিনি রেখেছেন দ্রষ্টার দূরত্বে।

ইতিহাস কী বলে জানি না, কিন্তু কাব্য-পাঠে মনে হয় বড়ু একজন প্রবীণ, অভিজ্ঞ, বিদগ্ধ, বহুদর্শী-কবি। কাব্য রচনায় তাঁর ভূমিকা নির্মম। কেননা শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের মতো এমন একটি মর্মান্তিক কাহিনীকে তিনি অবিচলিত নিষ্ঠায় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আঁকতে পেরেছেন। কাব্যশেষে রাধাহৃদয়ের আর্তিও তাঁর স্বভাব-সুলভ বিষয়মুখী ভঙ্গিতেই আঁকা হয়েছে। লাঞ্ছিতা চন্দ্রাবলী রাহীর বিপর্যস্ত জীবনের অবাঞ্ছিত অসহায় পরিণতি যেখানে কাব্যশেষে রূপ পেয়েছে সেই বিরহখণ্ডে রাধা-চিত্তের মর্মান্তিক আক্ষেপের মধ্যেও তাঁর সমবেদনার প্রকাশ নেই, আছে শুধু নাট্যকারের একাত্মীভবন। আপনাকে বিবিক্ত রেখেও নাট্যকার যে অনুভূতি-বলে পাত্রপাত্রীর সঙ্গে সাময়িক অর্থাৎ সৃষ্টি কালীন অভিন্নতা লাভ করেন, যেন সূক্ষ্ম শরীরে পাত্রপাত্রীর দেহে ক্ষণকালের জন্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে তাদের সুখ দুঃখকে স্বীয় অভিজ্ঞতার বৃত্তে নিয়ে আসেন।

বড়ু চণ্ডীদাস করুণ কাব্যনাট্যের নিষ্করুণ স্রষ্টা। তাঁর কাব্যের শেষ দুটি খণ্ডকে সমগ্র কাব্যের নাট্য লক্ষণ-বিরোধী গীতিকাব্যিক প্রকাশ মনে করার কোন কারণ নেই। ও দুটি অদৃশ্য মঞ্চের পুরোভূমিতে পরিত্যক্ত, নিঃসঙ্গ নায়িকার বিলাপোক্তি মাত্র। মূল নাটবেরই অঙ্গ, ব্যত্যয় নয়। পুঁথিটি খণ্ডিত। কাব্যশেষে কী ঘটেছিল, তা নিয়ে নানা জল্পনা কল্পনা সম্ভব। তবে যে-আকারে আমরা একে পেয়েছি, তা থেকে মনে হয় পুঁথি খণ্ডিত নায়িকাও খণ্ডিতা, কিন্তু কাব্য সম্পূর্ণ, খণ্ডিতা নায়িকার হাহাকারেই কাব্যের নিশ্চিত সমাপ্তি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বাঙলা সাহিত্যের প্রথম কাব্য এবং প্রথম বিষাদান্ত কাব্য। বৈষ্ণব পদাবলীর অতি সূক্ষ্ম মনোলীলা, মহৎ প্রেমের মহৎ দুঃখ এতে নেই। এর ঘটনা স্থূল, উপজীব্য অতি স্থূল দেহবিলাস। সেকালে প্রচলিত স্থূলরসের লৌকিক কাহিনীই এর প্রধান উপাদান। তার সঙ্গে বৈষ্ণব প্রসঙ্গ (যা ভাগবতানুসারী নয়) অর্থাৎ কৃষ্ণের ঐশ্বর্য রসের কিছু গল্প এবং রাধাকৃষ্ণের প্রণয়-লীলা মাহাত্ম্যকে অদ্ভুত কৌশলে মিশিয়ে দেবার চেষ্টা হয়েছে। সংস্কৃত শ্লোকের সূত্রগুলি (যা লেখকের পাণ্ডিত্যের পরিচিতি) কাহিনী-চিত্রের সংযোজক। স্থানে স্থানে জয়দেব গীতগোবিন্দের অনুবাদ কাব্যকে কৌলীন্য দিয়েছে। আবার তারই সঙ্গে এসে জুটেছে শ্রীকৃষ্ণ-মুখে যোগসাধনার কথা। সব জড়িয়ে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন এক বিচিত্র রূপের খিচুড়ি, এর রসের ভিয়ানও বড়ো বিচিত্র। তবে প্রাধান্য যে-আদিরসের

তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রস-মূর্তি পায় নি, লালসার রূপ চিত্রণেই সীমায়িত। চন্দ্রাবলী রাহীর প্রতি কাহ্নের একটি বেশ মোটারকমের আসক্তিই আগাগোড়া এর আসল বিষয়। এই স্থূলতাই, মনে হয়, উত্তরকালের বাঙালী শ্রোতার সূক্ষ্ম শ্রুতি চেতনা ও রস চেতনায় অপাংক্তেয় বলে বিবেচিত হয়েছে। কাব্যের প্রচার-বৈরল্য যার ফল। তা না হলে চিত্র ও চরিত্র সৃষ্টির নিপুণ ক্ষমতায়, দৃশ্য বিন্যাসের সার্থক কৌশলে, নাটকীয় রসের সুচতুর মিশ্রণে এবং যা সব চেয়ে আকর্ষণীয় মানব-মানবী হৃদয়ের অসাধারণ বিশ্লেষণে বড়ু চণ্ডীদাসের কবি প্রতিভার তুলনা নেই। বড়ু মহৎ প্রতিভার অধিকারী, কিন্তু সে প্রতিভা মহৎ বিষয়ের আশ্রয় না পেয়ে প্রত্যাশিত ফল-লাভে অসমর্থ। কাব্যে অমহৎ বিষয়ের অবতারণা যে অন্যায় এমন বলি না। বরং তার রূপায়ণে কবিধর্মের চ্যুতি ঘটে, অতি নৈতিকতার এই বুলিই অশ্রদ্ধেয়। কিন্তু সমস্ত ক্লিন্নতা পেরিয়ে একটি উন্নীত পরিণাম, যা সুস্থ ফলশ্রুতির জনক, নীতি নয়, কাব্য-নীতির দিক থেকেই প্রত্যাশিত। বড়ুর কাব্যে সেই উত্তরণ নেই। এখানে শুধু-উৎকট রিরংসা, ভ্রষ্ট জীবনের ছন্দোহীনতা, মর্মবিদারক হাহাকার। এ গান কোন সমে এসে পৌঁছয় নি। ট্র্যাজেডির মধ্যেও একটি সম থাকে। সেখানেই তার কাব্যরূপের সার্থকতা। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ট্র্যাজেডি নয়।

বড়ুর রচনা রাধাকৃষ্ণ-বিষয়াশ্রিত কাব্যলোকে এক বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ড। উত্তরকালের রচনার সঙ্গে একে কায়ক্লেশেও মেলানো যায় না। এর নায়িকা চন্দ্রাবলী রাহীর বিরূপ মনের প্রচণ্ড অনীহা, নায়ক কাহ্নের হৃদয়-সম্বন্ধহীন অশুচি সংসর্গের আবিলতা, বৈষ্ণব কাব্যের ভাবানুবন্ধ থেকে অনেক দূরের জিনিস। এখানে নায়ক নায়িকার অবাঞ্ছিত সম্বন্ধে কেবল বেসুরই বেজেছে, সঙ্গীত জেগে ওঠে নি। শুধু একবার কাব্যের অন্তিম পর্বে প্রাণ-আকুল-করা বাঁশীর সুরের কথা এসেছে। চন্দ্রাবলী রাহীর মুখে শুনি—

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর বে আকুল মন।···

কোন্ জনা তা আমরা জানি না। চন্দ্রাবলী রাহীও না। একথা নিশ্চিত বংশীবাদক শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের কাহ্ন নয়। কালিন্দী নদীর কূলে বাঁশীর প্রাণ-গলানো সুর একদিন জেগেছে। উত্তরকালের পদাবলীর কবিরাই তার সন্ধান জানেন। অবাঞ্ছিতের কামনার আগুনে আত্মাহুতি দিয়ে, সর্বস্ব খুইয়ে যে হতভাগিনী অকূলে ভাসল, তারই অন্তরের অচরিতার্থ সুকুমার আকাঙ্ক্ষাগুলি প্রেম-কালিন্দীর কূলে বাঁশীর সুরের স্বপ্ন দেখেছে। বিড়ম্বিত, ব্যর্থ জীবনের 'দুরাশার সুখের স্বপন'। চন্দ্রাবলী রাহীর এই পরম বেদনার গীতোচ্ছ্বাসটিই বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যকে অবশেষে কিঞ্চিৎ মহিমা দান করেছে। কাব্যের সর্বব্যাপী সুরহীনতার সীমায় এই একটুখানি সুরের আকাঙ্ক্ষা ঘনান্ধকার মেঘের প্রান্তে শীর্ণ রূপালি রেখার মতো একটি করুণ ক্ষীণ দীপ্তির ঈষৎ আভাস জাগিয়েছে।

১। বড়ুর কাব্যের অন্যতম উপাদান লৌকিক গান অর্থাৎ ঝুমুরের প্রচলন এখনও বাঁকুড়া-মানভূম অঞ্চলের গ্রাম্য জীবনে অব্যাহত আছে; কিন্তু সে বৈষ্ণব-বিষয়-অসম্পৃক্ত স্বতন্ত্র জিনিস।

রবীন্দ্রনাথের চার অধ্যায় ঃ অতীন্দ্রনাথ

শুভব্রত রায়চৌধুরী

স্বভাব হননের গ্লানি

Ancient Meriner-এর সঙ্গে এক জায়গায় যেন অতীন্দ্রনাথের মিল আছে। পাপবিদ্ধ বিবেকবোধের কশাঘাতে সে-ও জর্জর। সে হত্যা করেছে স্বভাবকে, বিসর্জন দিয়েছে স্বধর্মকে ঃ এই তার ক্ষমাহীন পাপ, এই তার অবিস্মরণীয় গ্লানি। দুঃসহ গ্লানিবোধ যেন অতীন্দ্রের গলায় হাপ-ধরানো ফাঁসের মতো চেপে বসেছে। এই গ্লানির কথা বার বার ব'লে অতীন হয়তো ফাঁসটাকে একটু আলগা করতে চায়, একটু যেন নিশ্বাস নিতে পারে।

মাঝে মাঝে মনে হয় এই গ্লানিবোধ অতীন্দ্রের একটা মানসিক দুর্বলতা। আত্মনিন্দা তার চেতনার গভীরে যেন obsession-এর আকার নিয়েছে। এলার মনেও সে কথা জাগে। তাই তো আত্মনিন্দাপ্রবণতার নিন্দা ক'রে এলা অতীনকে সস্নেহে সান্ত্বনা দেয়, "অন্তু, আত্মনিন্দা বাড়িয়ে তুল্‌ছ কল্পনায়। নিষ্কামভাবে যা করেছ তার কলঙ্ক কখনোই লাগবে না তোমার স্বভাবে।" (চা. অ. | ১২৫) কিন্তু এই প্রবোধবাক্য অতীন্দ্রের কাছে অর্থহীন। যার ব্যক্তিত্বের মূলধন ছিল স্বভাবের গৌরব, স্বভাবহননের গ্লানি তার কাছে অসহনীয় বেদনা ঃ "স্বভাবকেই হত্যা করেছি, সব হত্যার চেয়ে পাপ। কোন অহিতকেই সমূলে মারতে পারি নি, সমূলে মেরেছি কেবল নিজেকে।" (চা. অ. | ১২৫) আপন আরব্ধ কর্মের ইতিহাস সমীক্ষণ ক'রে অতীন্দ্রনাথ শুধু একটি জিনিস দেখতে পায়। সে স্বভাবহন্তা, সে স্বধর্মনাশী।

স্বভাব এবং স্বধর্ম—এরা দুটি পরস্পরাশ্রয়ী ধারণা। স্বধর্ম গ'ড়ে ওঠে স্বভাবের পক্ষপুটচ্ছায়ায়। আবার, স্বভাব বিকাশলাভ করে স্বধর্মপালনের মধ্য দিয়ে। স্বধর্ম বলতে যা বোঝা যায় সে মানুষের আদর্শ। ব্যাপকতম অর্থে আদর্শ একটি idea—তার কাজ ব্যক্তিমানসে সংহতি আনা, ব্যক্তিত্বের পূর্ণতা সাধনে প্রেরণা দেওয়া। ব্যক্তিত্বের তিনটি দিক আছে—ভাব ভাবনা এবং ইচ্ছাশক্তি। এরা যদি বিভিন্ন লক্ষ্যের দিকে ছুটতে থাকে তবে ব্যক্তিত্বের মাঝে নেমে আসে ঝড়ের তাণ্ডব। সমাজে সেই বিপর্যয়ের উদাহরণ মিলবে অসংখ্য। আদর্শের উদ্দেশ্য হ'ল, ভাব-ভাবনা-ইচ্ছাকে একই সূত্রে গাঁথা, সমন্বয়ের মন্ত্রে উজ্জীবিত করা, একই জীবনলক্ষ্যের অভিমুখে নিয়ে যাওয়া। আদর্শ ইচ্ছাশক্তিকে চালিত করে। ইচ্ছা হ'ল কর্মোদ্যমের অঙ্কুশ। প্রত্যেক মানুষকেই কর্মের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ খুঁজতে হয়। সুতরাং মানুষমাত্রই একটা-না-একটা আদর্শ অনুসরণ ক'রে চলে। সেই আদর্শ ভ্রান্ত কি সত্য, সু কি কু, সে প্রশ্ন পরের কথা। আগে চাই একটা আদর্শ, কারণ সে-ই তো ইচ্ছাশক্তি জাগিয়ে কর্মের প্রেরণা জোগায়। আদর্শ-প্রণোদিত পথে চলাই আত্মপ্রতিষ্ঠার সাধনা। তারপর যদি প্রমাণ হয়, তার আদর্শের মধ্যে ত্রুটি ছিল তখন শুরু হবে ইচ্ছার সঙ্গে ভাব-ভাবনার বিরোধ; তখন তার আত্মবিকাশের পথ হবে দ্বন্দ্ব বন্ধুর। অতীন্দ্রের জীবনেও সেই দ্বন্দ্ব। তার স্বভাবসম্মত আদর্শকে

স্বধর্মপালনের পথ জেনে সে একাগ্রচিত্তে যাত্রা শুরু করেছিল। অবশেষে ভুল তার ভাঙল। তখন সে বিক্ষিপ্তমনা উদ্দেশ্যহীন।

অতীন্দ্রের আদর্শের মূল কথা হ'ল বৈচিত্র্যবান আত্মশক্তি। সুন্দর-অসুন্দর, সত্য-অসত্য, ন্যায়-অন্যায় শিব-অশিব—এদের ভেদাভেদজ্ঞান এবং সত্য-সুন্দর-শিবের পথ অনুসরণ করবার ক্ষমতা : এরাই হ'ল আত্মশক্তির প্রাণ। সেই শক্তি ভয়ে হার মানে না, পীড়নে হার মানে না। "পাথরের দেয়ালে মাথা ঠুকে" মরে তবু "তুড়ি মেরে উপেক্ষা" করে "সেই হৃদয়হীন দেয়ালটাকে"। যে উপায়বিহীন তাকেও আত্মশক্তি প্রেরণা জোগায় শক্তিমানের বিরুদ্ধে লড়বার; দুর্বলকেও সম্মান দেয় সবলের সমকক্ষ হবার। সে লড়াই সাহসের লড়াই, কাপুরুষতার নয়। আত্মশক্তির প্রেরণাতেই মানুষ বলতে পারে "আমি ভয় করব না ভয় করব না।" মুক্তিসংগ্রামের চারণকবি মুকুন্দ দাসের ভয়ভাঙানো স্বদেশী গানের কথা মনে পড়ে, "ফুলার, আর কি দেখাও ভয়। দেহ তোমার অধীন বটে। মন তো অধীন নয়।" এই যে আত্মার স্বাধীনতা—শত পীড়নেও যার পরাজয় নেই—এর নৈতিক শক্তির কাছে অন্যায়কারীর পাশব শক্তি মাথা নোয়াবে : "যার ভয়ে ভীত তুমি, সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে।" এই মৌলিক বিশ্বাসের উপর অতীন্দ্রের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত। তাই তার মুখে শুনতে পাই, "নিশ্চিত জানতুম আমার কথা হেসে উড়িয়ে দেবে, রেগে বিদ্রূপ করবে, তবু ওদের বলেছি অন্যায় অন্যায়কারীর সমান হোলেও তাতে হার, পরাজয়ের আগে মরবার আগে প্রমাণ করে যেতে হবে আমরা ওদের চেয়ে মানবধর্মে বড়ো—নইলে এত বড়ো বলিষ্ঠের সঙ্গে এমনতরো হারের খেলা খেলছি কেন?" (চা. অ. | ১০৮)

মানবধর্মীর কাছে দেশের একটা বিশিষ্ট সংজ্ঞা আছে; তার দেশাত্মবোধ সেই সংজ্ঞার বৃন্তেই প্রস্ফুট হয়ে ওঠে। দেশের এই বিশিষ্ট সংজ্ঞার বিশ্লেষণ পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের **মানুষের ধর্ম**-এ : "মানুষের দায় মহামানবের দায়, কোথাও তার সীমা নেই। অন্তহীন সাধনার ক্ষেত্রে তার বাস। জন্তুদের বাস ভূমণ্ডলে, মানুষের বাস সেইখানে যাকে সে বলে তার দেশ। দেশ কেবল ভৌমিক নয়, দেশ মানসিক। মানুষে মানুষে মিলিয়ে এই দেশ জ্ঞানে জ্ঞানে, কর্মে কর্মে। যুগযুগান্তরের প্রবাহিত চিন্তাধারায় প্রীতিধারায় দেশের মন ফলে শস্যে সমৃদ্ধ। বহু লোকের আত্মত্যাগে দেশের গৌরব সমুজ্জ্বল। যে-সব দেশবাসী অতীতকালের, তাঁরা বস্তুত বাস করতেন ভবিষ্যতে। তাঁদের ইচ্ছার গতি কর্মের গতি ছিল আগামী কালের অভিমুখে। তাঁদের তপস্যার ভবিষ্যৎ আজ বর্তমান হয়েছে আমাদের মধ্যে, কিন্তু আবদ্ধ হয় নি। আবার আমরাও দেশের ভবিষ্যতের জন্য বর্তমানকে উৎসর্গ করছি। সেই ভবিষ্যৎকে ব্যক্তিগতরূপে আমরা ভোগ করব না। যে তপস্বীরা অন্তহীন ভবিষ্যতে বাস করতেন, ভবিষ্যতে যাঁদের আনন্দ, যাঁদের আশা, যাঁদের গৌরব, মানুষের সভ্যতা তাঁদেরই রচনা। তাঁদেরই স্মরণ করে মানুষ আপনাকে জেনেছে অমৃতের সন্তান; বুঝেছে যে, তার দৃষ্টি তার সৃষ্টি তার চরিত্র মৃত্যুকে পেরিয়ে। মৃত্যুর মধ্যে গিয়ে যাঁরা অমৃতকে প্রমাণ করেছেন তাঁদের দানেই দেশ রচিত। ভাবীকালবাসীরা, শুধু আপন দেশকে নয়, সমস্ত পৃথিবীর লোককে অধিকার করেছেন। তাঁদের চিন্তা, তাঁদের কর্ম, জাতিবর্ণনির্বিচারে সমস্ত মানুষের। সবাই তাঁদের সম্পদের উত্তরাধিকারী। তাঁরাই প্রমাণ করেন, সব মানুষকে নিয়ে, সব মানুষকে

অতিক্রম ক'রে, সীমাবদ্ধ কালকে পার হয়ে এক-মানুষ বিরাজিত। সেই মানুষকেই প্রকাশ করতে হবে, শ্রেষ্ঠ স্থান দিতে হবে বলেই মানুষের বাস দেশে। অর্থাৎ, এমন জায়গায় যেখানে প্রত্যেক মানুষের বিস্তার খণ্ড খণ্ড দেশকালপাত্র ছাড়িয়ে—যেখানে মানুষের বিদ্যা, মানুষের সাধনা সত্য হয় সকল কালের সকল মানুষকে নিয়ে।" (রবীন্দ্ররচনাবলী, ২০শ | ৩৭৯-৮০) মানুষ যেখানে খণ্ড বিভিন্ন অবচ্ছিন্ন, সেখানে সে দেহের জীব। দেহের সংকীর্ণতাকে অতিক্রম ক'রে সকল মানুষের দিকে ধাবিত হওয়া—এই হ'ল আত্মার সাধনা। ভৌমিক সীমায় আবদ্ধ দেশ ক্ষুদ্র খণ্ড বিচ্ছিন্ন; দেশের আত্মার সাধনা এই ক্ষুদ্রতা খণ্ডতার ভৌমিক সীমানা পার হয়ে "সকল কালের সকল মানুষকে" লাভ করা। অতীন্দ্রের দেশপ্রেম এমনি এক মানবিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ। তাই প্রচলিত অর্থে patriot বলতে যা বোঝায়, সে তা নয়। সে বলে, "আমি আজ স্বীকার করব তোমার কাছে,—তোমরা যাকে পেট্রিয়ট বলো আমি সেই পেট্রিয়ট নই। পেট্রিয়টিজমের চেয়ে যা বড়ো তাকে যারা সর্বোচ্চ না মানে তাদের পেট্রিয়টিজম্ কুমীরের পিঠে চ'ড়ে পার হবার খেয়া নৌকো।" (চা. অ. | ১১০) পেট্রিয়টিজমের চেয়ে যেটা বড়, সেটা হ'ল "সব মানুষকে নিয়ে, সব মানুষকে অতিক্রম করে, সীমাবদ্ধ কালকে পার হয়ে এক-মানুষে"র উপলব্ধির আকৃতি। কিন্তু সারা পৃথিবী জুড়ে যে-পেট্রিয়টিজমের উত্তপ্ত অগ্নি সাধনা চলেছে তার মধ্যে এই মানবিক আদর্শের প্রেরণা নেই। এই অভাবটাই অতীন্দ্রকে ব্যথিত করে, "দেশের আত্মাকে মেরে দেশের প্রাণ বাঁচিয়ে তোলা যায় এই ভয়ঙ্কর মিথ্যে কথা পৃথিবীসুদ্ধ ন্যাশানালিষ্ট আজকাল পাশবগর্জনে ঘোষণা করতে বসেছে, তার প্রতিবাদ আমার বুকের মধ্যে অসহ্য আবেগে গুম্‌রে উঠছে—এই কথা সত্যভাষায় হয়তো বলতে পারতুম, সুরঙ্গের মধ্যে লুকোচুরি ক'রে দেশ উদ্ধার চেষ্টার চেয়ে সেটা হোতো চিরকালের বড়ো কথা। কিন্তু এ জন্মের মতো বলবার সময় হোলো না। আমার বেদনা তাই আজ এত নিষ্ঠুর হয়ে উঠছে।" (চা, অ. | ১১১)

এমন একটা মানবিক আদর্শে যার মন অনুশীলিত, সে কেন রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে যোগ দিল এ প্রশ্ন সহজেই মনে আসে। অবশ্য প্রেমের প্রেরণা ছিল সে কথা অনস্বীকার্য। কিন্তু শুধু যে কেবল প্রেমের তাগিদেই সে আন্দোলনের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছিল, তা নয়। মুক্তিসংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে তার আদর্শ পূর্ণতা লাভ করবে এমন এক আশার আহ্বান তার প্রাণে জেগেছিল। দান্তে ও বিয়েত্রিচের জীবনে কি তাই ঘটে নি? প্রেম এবং আদর্শের অপরূপ সমন্বয়ে এক ঐতিহাসিক সার্থকতার সম্ভাবনা দেখেছিল তার রোমান্টিক মন। যেন ভাগ্যলক্ষ্মীই তার উপর ন্যস্ত করেছে ইতিহাসের আলোকস্তম্ভ রচনা করবার গুরু দায়িত্ব। অতীন্দ্র চেয়েছিল, সত্যবীর্য গৌরবের পথ দিয়ে অন্যায়ের অবসান ঘটাবে, উপক্রত মানুষের আত্মশক্তিকে জাগিয়ে মানবধর্মের জয়বাণী ঘোষণা করবে। কিন্তু স্বপ্ন তার ভাঙল যখন সে দেখল কোন নৈতিক শক্তি পরীক্ষায় তারা নামে নি; তারা অন্যায় দিয়ে অন্যায়কে রোধ করতে চেয়েছে, মিথ্যা দিয়ে কপটতা দিয়ে হিংসা দিয়ে মিথ্যা-কপটতা-হিংসার উচ্ছেদ সাধন করতে উদ্যত হয়েছে। সে দেখল, তার চারিদিকে "মুখোশপরা চুরি-ডাকাতি খুনোখুনির অন্ধকার"। যেখানে এমন আত্মশ্রদ্ধার অবলোপ, সেখানে সত্যবীর্য গৌরবের আলোকস্তম্ভ রচনা করা সম্ভব নয়। অতীন্দ্র স্পষ্ট অনুভব করে, "মিথ্যাচরণ,

নীচতা, পরস্পরকে অবিশ্বাস ক্ষমতালাভের চক্রান্ত, গুপ্তচরবৃত্তি একদিন তাদের টেনে নিয়ে যাবে পাঁকের তলায়।" (চা. অ. | ১১০) ধর্মহীন কৌরবপক্ষের পরাজয় আসন্ন, এই সত্য মহাবীর কর্ণের দিব্য দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল; তিনি বলেছিলেন, "হেরিতেছি শান্তিময় শূন্য পরিণাম।" অতীন্দ্রও বুঝতে পেরেছিল, "আত্মার সর্বনাশ ঘটিয়ে অবশেষে আজ সে দেখছে কোন যথার্থ ফল নেই এতে, নিঃসংশয় পরাভব সামনে।" (চা. অ. | ৮৯) মুক্তি নেই এই সম্ভাবনার হাত থেকে : "সব মানুষের সামনেই ধর্মক্ষেত্রে ধর্মযুদ্ধ আছে, সেখানে মৃতো বাপি তেন লোকত্রয়ং জিতং। কিন্তু অন্তত আমাদের ক-জনের জন্যে এ যাত্রায় সেক্ষেত্রের পথ বন্ধ। এখানকার কর্মফল এখানেই নিঃশেষে চুকিয়ে দিয়ে যেতে হবে।" (চা. অ. | ১১০) যে-পরাভবের নিঃসংশয় প্রতীক্ষায় অতীন দিন গুনছে সে যদি শুধু বাহিরের পরাভব হ'ত, তাহ'লে হয়তো তার মূল্যায়ন সম্ভব ছিল। কিন্তু এ যে আত্মার পরাজয়। তার কোন সার্থকতা নেই। "পরাভবেরও মূল্য আছে কিন্তু আত্মার পরাভবের নয়, যে-পরাভব টেনে আনল গোপনচারী বীভৎস বিভীষিকায়, যার অর্থ নেই; যার অন্ত নেই।" (চা. অ. | ৮৯) এই আত্মার পরাজয়ই অতীন্দ্রের দুঃসহ আত্মগ্লানির উৎস।

আমাদের এই যন্ত্রযুগকে বস্তুতান্ত্রিক ব'লে অভিহিত করা হয়। অভিধাটি সার্থক। 'বস্তু'কে আমরা সহজেই বুঝতে পারি—গাড়ী বাড়ী আসবাবপত্র টাকাপয়সা এক কথায় William James যাকে "bitch goddess success" বলেছেন তারই নিশানবাহক পদার্থগুলি—এরা বেশ মোটা-সোটা জিনিস। এগুলির জন্য যখন ছুটি তখন আমাদের মনে হয় না আমরা কোনো ছায়ার পিছনে ছুটছি। এই বস্তুগুলির আকর্ষণে যারা ঘুরে বেড়ায়, তাদের চিনতে কোন কষ্ট হয় না; তাদের অন্বেষণটাও আমাদের কাছে 'বাস্তব' ব'লে মনে হয়। তাই সন্দীপ-মধুসূদন জাতীয় মানুষেরা আমাদের কাছে বাস্তব। কিন্তু নিখিলেশ-অতীন্দ্র : তারা বিভ্রম জাগায়, কারণ তারা যে-জিনিসগুলির পিছনে ছুটছে সেগুলি আমাদের জানাশোনা 'বস্তু' নয়, শুধু idea মাত্র। Idea থেকে যে ট্র্যাজেডি আসে, সেটা আমাদের কাছে অবাস্তব ছায়ালীন ভাবপ্রবণতা ব'লে মনে হয়। তাই অতীন্দ্রের ট্র্যাজেডিকে আমরা অবাস্তব মনে করি। অতীন্দ্র আদর্শবাদী। আদর্শ তার কাছে একটা ব্যঞ্জনামাত্র নয়, কেবল একটা সুবিধাবাদী প্রায়োগিক উপায়মাত্র নয়। আদর্শ তার অন্তরের সত্য, অস্তিত্বের অর্থ। টাকার পিছনে ছুটতে ছুটতে হঠাৎ যে-মানুষ একদিন শেয়ার মার্কেটে মার খেয়ে গেল, তার হাহাকার যেমন বাস্তব, অতীন্দ্রের আদর্শ-ভ্রংশতার দুঃখ তার চেয়ে কিছুমাত্র কম বাস্তব নয়। শেয়ার মার্কেটে জীবনের সঞ্চয় ঢেলে দিয়ে দেউলে হবার দুঃখ আমরা বুঝতে পারি, কিন্তু আদর্শের মধ্যে মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে দেউলে হয়ে যাওয়ার সর্বহারা বেদনা আমাদের বস্তুবাদী বোধের কাছে কেমন যেন অবোধ্য মনে হয়।

অতীন্দ্রের সামনে একটি মাত্র মুক্তির পথ ছিল—দলত্যাগ। সেখানেও সেই স্বভাবের বাধা। অতীন্দ্রের হয়ে এলা যখন ইন্দ্রনাথের কাছে মুক্তি-প্রার্থনা জানায়, ইন্দ্রনাথ তখন তাকে বুঝিয়েছিল, "আমি নিষ্কৃতি দেবার কে? ও বাঁধা পড়েছে নিজেরই সঙ্কল্পের বন্ধনে। ওর মন থেকে দ্বিধা কোন কালেই মিটবে না, রুচিতে ঘা লাগবে প্রতিমুহূর্তে, তবু ওর আত্মসম্মান ওকে নিয়ে যাবে শেষ পর্য্যন্ত।" (চা. অ. | ২৯) কথাগুলি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। এলা যখন তাকে

জীবনের পথে ফিরে আসবার জন্য আকুল অনুরোধ জানায়, তখন অতীন্দ্র তার নিরুপায় অক্ষমতা প্রকাশ ক'রে বলে, "তীর লক্ষ্য হারাতে পারে, তূণে ফিরতে পারে না।" (চা. অ. | ১১২) দুঃখের সঙ্গে সে স্বীকার করে, "পথ আমার নয়, আমিই পথের। গলার ফাঁসকে গলার গয়না কেউ বলে না।" (চা. অ. | ১১৪)

যে-কারণে অতীন দল ছাড়তে পারল না, সেটা তার চরিত্রের এক দৃপ্ত বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত দেয়। দলকে যখন আপন চিন্তাধারা আপন আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত করতে পারল না, তখন কেন দল ছেড়ে সে চ'লে গেল না—এলা অতীন্দ্রের কাছে সে কথা জানতে চায়। অতীন্দ্র উত্তর দেয়, "আর কি ছাড়তে পারি? তখন যে শাস্তির নিষ্ঠুর জাল সম্পূর্ণ জড়িয়ে এসেছে ওদের চারদিকে। ওদের ইতিহাস নিজে দেখলুম, বুঝতে পেরেছি ওদের মর্মান্তিক বেদনা, সেইজন্যেই রাগই করি আর ঘৃণাই করি, তবু বিপন্নদের ত্যাগ করতে পারিনে।' (চা. অ. | ১০৯) এই সহচর-আনুগত্য তার এক মহানুভাবক একনিষ্ঠতার নিদর্শন। সে সমালোচনা করবে তিরস্কার করবে ঘৃণা করবে তাদের "শোচনীয় আন্তরিক দুর্গতি"-কে কিন্তু তবু তাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করতে পারবে না। এরা বিপন্ন, এরা হারছে মরছে। হারছে মরছে ব'লেই এদের উপর অতীনের গভীর সহানুভূতি। মহাবীর কর্ণের কথাই মনে পড়ে, কুন্তীকে তিনি বলেছিলেন, "যে পক্ষের পরাজয় সে পক্ষ ত্যজিতে মাত কোরো না আহ্বান।" হেরে-যাওয়া পক্ষকে পরিত্যাগ করা এক সুবিধাবাদী মনোবৃত্তির পরিচায়ক—বীরের স্বভাবে তার স্থান নেই। এমনিভাবে তিলে তিলে তার স্বভাবকে হত্যা ক'রে অতীন্দ্র তার স্বভাবকে রক্ষা করবার প্রাণান্তকর সাধনায় লেগে রইল।

জীবনের শেষ প্রান্তে যেখানে সে এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে মৃত্যুই একমাত্র মুক্তির পথ। মৃত্যুর মধ্যে আছে অসীম ক্ষমা, অনন্ত মুক্তি। কিন্তু তাই ব'লে মৃত্যুকে অতীন কখনো পালাবার পথ ব'লে মনে করে নি। সে বন্দী হয়ে আছে জীবনের ছোট্ট একটি আগল-দেওয়া আলোবাতাস-হারা কক্ষে। সেখানে আছে, শুধু অন্ধকার বিকৃতির ভ্রুকুটি, আছে খণ্ডতা-অসম্পূর্ণতার ত্রুটি। অতীন্দ্রের রুদ্ধশ্বাস প্রাণ স্বপ্ন দেখে অনন্ত প্রসারের যেখানে সে ডানা-মেলে-দেওয়া আনন্দের সন্ধান পাবে। তার বর্তমান জীবনে মৃত্যুই সেই অনন্তের নিশানা। এলার মৃত্যুদূত অতীন এলাকে বোঝায় মৃত্যুতত্ত্ব: "জীবনটা জালিয়াৎ, সে অনন্তকালের হস্তাক্ষর জাল ক'রে চালাতে চায়। মৃত্যু এসে হাসে, বঞ্চনার দলিলটা লোপ করে দেয়। সে হাসি নিষ্ঠুর হাসি নয়, বিদ্রূপের হাসি নয়, শিবের হাসির মতো সে শান্ত সুন্দর হাসি, মোহরাত্রির অবসানে।' (চা. অ. | ১১৯) পলে-পলে-অনুভূত অনিশ্চয়তার দিশেহারা বেদনার মধ্যে অতীন্দ্র খুঁজে মরে নিশ্চয়তার শান্তি। মৃত্যু ছাড়া সেই নিশ্চয়তা কোথায়! "মৃত্যু সব চেয়ে নিশ্চিত—জীবনের সব গতিস্রোতের চরম সমুদ্র, সব সত্য মিথ্যা ভাল মন্দর নিঃশেষ সমন্বয় তার মধ্যে।" (চা. অ. | ১২০) ব্যর্থ জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে মৃত্যুর সীমাহীন সার্থকতা অতীন্দ্রকে গভীরভাবে আকর্ষণ করে। যে-মৃত্যুতত্ত্ব এলার কাছে ব্যাখ্যাত হয়, তার লক্ষ্য শুধু এলার মৃত্যুপ্রস্তুতি নয়। প্রকৃতপক্ষে সে অতীন্দ্রের অন্তরতম প্রার্থনার বাণী।

অতীন্দ্রের উপর এলা-হত্যার ভার কেন পড়ল, এ কথা মনে জাগতে পারে। এটা কি শুধু কাহিনীর নাটকীয় পরিসমাপ্তির জন্য ? বস্তুত, কাহিনীর জন্য যতটা না হোক, অতীন্দ্র চরিত্রের পরিপূর্ণতার জন্য ঘটনাটির প্রয়োজন ছিল। অতীন্দ্রের কাহিনী বেদনাময় আত্মবিনাশের ইতিকথা। সর্বনাশের যে ধাপে সে এসে পৌঁছেছে যেখানে চুরি-ডাকাতির টাকা দিয়ে তাকে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হচ্ছিল। একদা রুচিবান সৌখীন বিদগ্ধ যুবকটির কাছে এর চেয়ে আর কি বেশি গ্লানিকর লজ্জাকর অবস্থা হ'তে পারে ? কিন্তু তখনো যেন শেষ ধাপটি বাকি : হত্যা। লক্ষ্যলাভের প্রয়োজনে সংঘটিত হত্যাকে সন্ত্রাসবাদ গর্হিত মনে করে না; কিন্তু মানবধর্মীর কাছে হত্যা অমার্জনীয় পাপ। সেই পাপ যেদিন অতীন্দ্রের হাত দিয়ে অনুষ্ঠিত হ'ল, সেদিন যবনিকা পড়ল তার চরিত্রের উপর। হুইসিলের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে তাই অতীন্দ্রের কাহিনীও শেষ হ'ল। অতীন শুধু এলাকেই হত্যা করল না, আপন আত্মার 'পরেও চরম আঘাত হানল। দলের প্রতি আনুগত্যের শেষ প্রমাণ দিল দলবিদ্বেষী অতীন্দ্রনাথ তার জীবনের অন্তরতম প্রেয় ও শ্রেয়কে খুইয়ে। আত্মহননের এক বিস্ময়কর ছবি—গভীর বেদনায় রক্তিম।

কর্তব্যপরায়ণতা অতীন্দ্র চরিত্রের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। যত কঠিন হোক, যত রূঢ় যত অপ্রিয় হোক না কেন, কর্তব্যের আহ্বান তার কাছে অমোঘ। দলের আদেশ মানবার অঙ্গীকার ক'রেই সে দলে যোগ দিয়েছিল। সুতরাং আদেশ পালনে ব্যতিক্রম ঘটে নি কখনো। যখনি ডাক পড়েছে, সে সাড়া দিয়েছে দৃঢ়চিত্তে—এলার অনুনয়-বিনয়ও তাকে আটকে রাখতে পারে নি। এই নিয়ে এলা অনুযোগ করেছে, "তুমি ধন্য অস্তু! যেমনি আমার বাড়ীতে আসা নিষেধ হোলো অমনি সেটা তো মেনে নিতে পারলে।" (চা. অ. | ৯০) অতীন তার উত্তরে বলে, "ওটা আমার স্বাভাবিক স্পর্দ্ধা। প্রচণ্ড ইচ্ছে আমাকে অজগর সাপের মতো দিনরাত পাক দিয়ে দিয়ে পিষেছিল তবু তাকে মানতে পারলুম না। ওরা আমাকে বলে সেন্টিমেণ্টাল, মনে ঠিক করে রেখেছিল সঙ্কটের সময় প্রমাণ হবে আমি ভিজে মাটিতেই তৈরি। ওরা ভাবতেই পারে না সেন্টিমেণ্টেই আমার অমোঘশক্তি।" (চা. অ. | ৯০)

আপাতদৃষ্টিতে অতীন্দ্র চরিত্রে একটা ত্রুটি ধরা পড়ে। সে যে নিজে পণধর্মী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পণ করেছে দলের অনুশাসন মানব; সেই পণ রক্ষা করতেই হবে—এই তার আত্মসম্মানের অনুশাসন! আপন পণধর্মিতাকে অতীন নানা যুক্তিতর্ক দিয়ে সমর্থন করেছে, কিন্তু এলার পণধর্মিতার বেলায় ছোটে সমালোচনার তপ্ত প্রস্রবণ। দলের অনুশাসন যেমন তার কাছে অনুপেক্ষণীয়, এলার কাছেও তেমনি। অথচ দুঃখভোগের আত্মকেন্দ্রিক বেদনায় অতীন সে কথা সম্পূর্ণ ভুলে যায়। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, এলার প্রতি তার তিরস্কার পণধর্মিতার জন্য নয়—অধার্মিক পণকে ধর্ম ব'লে ভ্রান্তবুদ্ধি একাগ্রতার সঙ্গে আঁকড়ে ছিল, তাই। আপন পণ সম্বন্ধে অতীনের কোন মোহ কোন আকর্ষণ ছিল না; ছিল শুধু একটা বিতৃষ্ণাবোধ একটা অন্তঃসঞ্জাত বাধ্যবাধকতাবোধ। এলার উপর তার অভিমানের কারণ হ'ল, ভুলটাকে ভুল ব'লে ভড়ংটাকে ভড়ং ব'লে স্বীকার করবার মতো বিচারবুদ্ধির স্বচ্ছতা কেন সে হারিয়ে ফেলেছিল, কেন সে বোঝে নি পণের সার্থকতা নির্ভর করে ধর্মবোধের উপর।

বিকৃতির আত্মগ্লানি, পরাজয়ের লজ্জা, স্বভাবভ্রংশতার অনুতাপ, ব্যর্থতার পুঞ্জীভূত বেদনা —অতীন্দ্রের জীবনের এই আকাশ-অন্ধ-করা কালো পটভূমিকায় তার ভালবাসা এক বিচিত্র-মধুর মেঘ-ছেঁড়া আলোর মায়া জাগায়। এলা-অন্তুর জীবনে, অতীন ঠিকই বলেছে, "ভোলবার যোগ্য ভারি ভারি দিনই তো বহুবিস্তর,'। (চা· অ. | ১২৬) যে-দিনগুলি স্মরণীয়, তারা সংখ্যায় অতি অল্প। কিন্তু তারাই তাদের জীবনকে ভ'রে রেখেছে নিরভিযোগ স্নিগ্ধ-সুন্দর ভালবাসার সুষমায়। এই দু-একটি দিনের কথা তাদের কাছে অমূল্য, কারণ বিরাট না-পাওয়ার মাঝে এই দিন-ক'টিই নিবিড় পাওয়ার অমলিন স্মৃতি বহন ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। সেই পাওয়া ক্ষণিক। কিন্তু অতীন্দ্র তাকে হৃদয়ের রসে রাঙিয়ে এক অন্তহীন অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতার পর্যায়ে উন্নীত করেছে। তাই অতীন কেবলি ফিরে যায় তাদের প্রথম দেখার দিনটিতে যেদিন তারা এক-চমকের চিরপরিচয়ের বিস্ময়ে অভিভূত; ফিরে যায় তার এক জন্মদিনে যেদিন এলার কাছ থেকে পেয়েছে তার প্রথম চুম্বন, তার আদরের ডাক "অন্তু"। বাস্তবের শূন্যতার মাঝে অতীন রচনা করে এক মধুর মরীচিকার বাসর ঘর যেখানে অক্ষয় হয়ে থাকে তাদের ভাবের মিলন। তার মনের গহনে কোথাও যেন একটা সান্ত্বনার সুর বাজে :

"যা পেয়েছি সেই মোর অক্ষয় ধন
যা পাইনি বড় সেই নয়।
চিত্ত ভরিয়া রবে ক্ষণিক মিলন
চির বিচ্ছেদ করি জয় ॥"

চিরবিচ্ছেদের শূন্যতা। তারই উপর অতীন কেবলি ছোট্ট কয়েকটি পাওয়ার রঙ বুলিয়ে এক সমগ্রতার অখণ্ড ছবি এঁকেছে। প্রেমের ধর্ম, সৃষ্টি করা : অপূর্ণতার মধ্যে পূর্ণতার আভাস জাগানো। দুরপনেয় বিরহের বুকে মিলনের বাসর ঘর রচনা করা—এই তো বাহিরে-ব্যর্থ অতীন্দ্রনাথের অন্তরে-সার্থক সৃষ্টি।

উত্তর বঙ্গের লোক-সঙ্গীত ঃ ভাওয়াইয়া গান

শ্রীমন্তকুমার জানা

মর্তপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ মাটি-ঘেঁষা মানুষের কল্যাণপ্রসূ বিচিত্র কর্মকে সমস্ত ক্ষয়-ক্ষতির উর্ধ্বে চিরকালের একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিস বলে শ্রদ্ধানম্র সানন্দ স্বীকৃতি দিয়েছেন। যারা হাটবাট, মাঠ-ঘাটের মানুষ; মাটির সঙ্গে যাদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ—যারা "বীজ বোনে, পাকাধান কাটে,' —ঘরে, মাঠে, বনে, নদীতে নানা কাজ করে—তাদের কর্মের উপর ভিত্তি করেই সমস্ত সংসার এগিয়ে চলেছে। কর্মের সাথে সাথে তাদের নিতান্ত সহজ সরল ছোটখাটো সুখদুঃখ আনন্দ বেদনামিশ্রিত বিচিত্র রসানুভূতির সৃজনকার্যও নিঃশব্দে নিভৃতে চলেছে। বাংলার লোক-সাহিত্যগুলি তার প্রমাণ। বাংলার লোক-সাহিত্যের মধ্যে অল্প শিক্ষিত গ্রাম্য কবির ভাবভাবনার আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত গ্রাম্য-জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখের অন্তরঙ্গ প্রতিচ্ছবিও ফুটে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি প্রণিধান-যোগ্য :

"জনপদে যেমন চাষ-বাস এবং খেয়া চলিতেছে। সেখানে কামারের ঘরে লাঙলের ফলা, ছুতারের ঘরে ঢেঁকি এবং স্বর্ণকারের ঘরে টাকা-দামের মোটরি নির্মাণ হইতেছে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে একটা গঠন-কার্যও চলিতেছে—তাহার বিশ্রাম নাই। প্রতিদিন যাহা বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন খণ্ড খণ্ড ভাবে সম্পন্ন হইতেছে সাহিত্য তাহাকে ঐক্যসূত্রে গাঁথিয়া নিত্যকালের জন্য প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিতেছে। গ্রামের মধ্যে প্রতিদিনের বিচিত্র কাজও চলিতেছে এবং তাহার ছিদ্রে ছিদ্রে চিরদিনের একটা রাগিনী বাজিয়া উঠিবার জন্য নিয়ত প্রয়াস পাইতেছে।' ১

এই জন্যই গ্রাম্য সাহিত্যের আবেদন সর্বসাধারণের কাছে খুব ব্যাপক ও গভীর।

বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকসঙ্গীতের মধ্যে সুর, ভাব, ভাষা ও আঞ্চলিক পরিবেশগত স্বতন্ত্র ধর্ম পরিলক্ষিত হয়। কবিগান, পূর্ববঙ্গগীতিকা, ময়মনসিংহ গীতিকা, ভাটিয়ালী, বাউল সঙ্গীত প্রভৃতি তাদের মধ্যে অন্যতম। ব্যাপক প্রচারের ফলে এই সমস্ত লোকসঙ্গীত বহুজন পরিচিত। তার তুলনায় উত্তর বঙ্গে ভাওয়াইয়া গানের আলোচনাও প্রচার খুব বেশী হয় নি।

ভাওয়াইয়া কুচবিহারের বিশিষ্ট পল্লী-সঙ্গীত। এই সঙ্গীত কুচবিহারের অল্পশিক্ষিত শ্রমিকশ্রেণী মানুষের অন্তরস্থিত স্বাভাবিক কবিত্বশক্তি থেকে উত্থিত। অন্যান্য লোক-সঙ্গীতের মত ভাব, ভাষা, পরিবেশ ও সুরের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে ভাওয়াইয়া নূতন মর্যাদা পাবার অধিকারী। বর্তমানে কুচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমায় ভাওয়াইয়া গানের চর্চা খুব বেশী। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের পূর্বে এই জেলার সীমা যখন আসাম, জলপাইগুড়ি এবং রংপুর অঞ্চলে বিস্তৃত ছিল তখন সে সব অঞ্চলেও এই গানের প্রচার ছিল। বর্তমানে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি অঞ্চলেও এই গানের কিছু কিছু প্রচার আছে। তা এই প্রচারগত ব্যাপ্তির দিক থেকে একে কুচবিহারের সঙ্গীত না বলে উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত নামে অভিহিত করাই সমীচীন।

ভাওয়াইয়া বহু পুরাতন গান। এর উৎপত্তি কোন সময় সঠিক কিছু জানা যায় নি।

মোটামুটি ভাবে বলা চলে ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে এই গানের প্রচলন সুরু হয়েছে। কুচবিহারের মহারাজ নরনারায়ণের সময়ে (১৫৩৩—'৩৪ খৃঃ—১৫৮৭) এই সঙ্গীত প্রচলিত ছিল। তার প্রমাণ সেই সময়ে রচিত রামায়ণ এবং অন্যান্য কাহিনী থেকে ভাওয়াইয়ার পরিচয় পাওয়া যায়।

কুচবিহারের বংশের ইতিহাস থেকে আরও জানা যায়, মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণের সময়ে (১৮৬২—১৯১১) ভাওয়াইয়া সঙ্গীত বিশারদগণ বৃত্তি পেতেন। তখনকার দিনের খান ও পাতান (জাতি মুসলমান) চাউলিয়া, (হিন্দু) চকোরপতি (মুসলমান) ভাওয়াইয়া বিশারদ ছিলেন। এরা উল্লিখিত রাজার নিকট হতে বৃত্তি পেতেন।

১৯৩৭ সালে সুরেন বসুনিয়া (বাড়ী কুচবিহার শহরে) এই গানের প্রথম রেকর্ড করেন। তিনিই শিক্ষিত মহলে সর্বপ্রথম ভাওয়াইয়ার প্রচার করেন। তার কয়েকমাস পরে আব্বাসউদ্দিন আহাম্মদ (২) এই গানের রেকর্ড করেন এবং তার সঙ্গে যোগ দেন দোতারা—যাদুকর শ্রীটগর অধিকারী। (৩) পরে অন্যান্য গায়কও রেকর্ড করেন।

যদিও এই গান খুব প্রাচীন, তবু এই গানের কোনো সুনিশ্চিত পুস্তক পাওয়া যায় নি। কোনো গানেই রচয়িতার নামোল্লেখ নেই—স্রষ্টা অজ্ঞাত, সৃষ্টি বেঁচে রয়েছে।

ভাওয়াইয়ায় শিল্পকর্ম দেখা যায় না; ভাষা অমার্জিত, পারিপাট্যবিহীন, মিলপ্রয়োগে সৌষম্য নেই। উপমা-অলংকারের মাধুর্য এবং সুরের লক্ষণীয় স্বাতন্ত্র্যই এর প্রাণবস্তু। এই গানের বিশেষত্ব দরদ ও গলা-ভাঙ্গানি। এক সুরে গান গীত হওয়ার সময় সুর-প্রবাহকে হঠাৎ ভেঙ্গে পূর্ববর্তী প্রবাহে উঠে যাওয়ার কৌশলটি আয়ত্ত করা খুব সহজ নয়। এই ধরণের গলাভাঙ্গানি অন্য গানে দুর্লভ। এই সঙ্গীতের প্রধান যন্ত্র দোতারা; সানাইয়ের সাহায্যেও এই গানের ভাব-ব্যঞ্জনা পরিস্ফুট হয়। তালযন্ত্রের মধ্যে সাধারণতঃ জুরি (করতাল) ব্যবহৃত হয়। এতে ছয়, সাত, আট ও ষোল মাত্রার গান পাওয়া যায়, কিন্তু বারো মাত্রার একতলা গান নেই।

ভাওয়াইয়া গানের বিষয়বস্তুগত বৈচিত্র্য আলোচনার পূর্বে ভাওয়াইয়া শব্দের উৎপত্তি এবং অর্থগত তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। অনেকের মতে ভাওয়াইয়া শব্দটি বাউদিয়া বা বাওয়াইয়া থেকে এসেছে। বাউদিয়া—বাউলিয়া—বাওয়াইয়া—ভাওয়াইয়া। বাউদিয়া শব্দের অর্থ বাউণ্ডুলে ভবঘুরে, ছন্নছাড়া। উত্তরবঙ্গের কিছুসংখ্যক ভূমিহীন লোক সঙ্গীতকে উপজীব্য করে জীবিকা নির্বাহ করে। প্রত্যেক হাটবারে এরা দোতারা নিয়ে হাটে গিয়ে গান গাইতে থাকে লোকেরা ভিড় করে গান শুনে আর যে যার খুশিমত কিছু কিছু পয়সা দিয়ে চলে যায়। বাওয়াইয়া সম্প্রদায়ের গীত গানগুলির নাম ভাওয়াইয়া। বাওয়াইয়াদের মধ্যে অনেকে এমন দরিদ্র আছে যে, তাদের একবেলা আহার জুটে, লেংটি পরে লজ্জা নিবারণ করে। একটি গানে এদের নিদারুণ দুঃস্থ অবস্থার চিত্র ফুটে উঠেছে। দুর্গোৎসবে চারদিকে আলোকসজ্জা মানুষের আনন্দকোলাহল, কিন্তু ভাওয়ালিয়ার মনে নিরানন্দের অন্ধকার—

ও মোর ভাওয়াইয়া রে
চতুর্দিকে জ্বলে সুরজ বাতি
তোমরা কেন বল আধার রাত্তি হে,

হায়, হায়, পরান বোঝা কতদিন বইবেন ভাই—
ও ভাই মোর ভাওয়াইয়ারে
ওরে একবেলা তোমার অন্ন জোটে হে
পিন্ধনো তোমার কাপড় কোঠেরে।
হায় হায়, খালি পরিতেন লেংটি সব সার
ভাই মোর ভাওয়ালিয়ারে ॥

কেহ বলেন ভাবাইয়া থেকে ভাওয়াইয়া এসেছে। ভাব—ভাও; ভাবাইয়া—ভাওয়াইয়া। উত্তরবঙ্গের আধিক্য ও নৈপুণ্য বোঝাতে শব্দের শেষে 'আইয়া' প্রত্যয় যুক্ত হয়। যে ভাল কাজ করে তাকে বলা হয় 'করাইয়া লোক'। যে ভালো খায় সে 'খাওয়াইয়া লোক'। তেমনি যে খুব ভাবের কারবার করে সে ভাওয়াইয়া লোক বা ভাওয়ালিয়া। যাতে ভাবের প্রাচুর্য রয়েছে—তা ভাওয়াইয়া। ভাওয়াইয়া গানে গ্রাম্য কবির ভাবানুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত অকৃত্রিম অভিব্যক্তি ঘটেছে। সামগ্রিক অর্থের দিক থেকে এই ব্যাখ্যাই সমধিক যুক্তিনিষ্ঠ ও গ্রহণযোগ্য।

লোক সঙ্গীতের সামগ্রিক সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে হলে পূর্বাহ্নে তার পরিবেশ ও মানুষের জীবনযাত্রা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ও পূর্ণ পরিচয় থাকা অত্যাবশ্যক। রবীন্দ্রনাথের মতে—

'বাংলা জনপদের মধ্যে ছড়া-গান-কথা আকারে যে সাহিত্য গ্রামবাসীর মনকে সকল সময়েই দোল দিতেছে তাহাকে কাব্য হিসেবে গ্রহণ করিতে গেলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে সমস্ত গ্রাম, সমস্ত লোকালয়কে জড়াইয়া লইয়া পাঠ করিতে হয়; তাহারাই ইহার ভাবোচ্ছন্দ এবং অপূর্ণ মিলকে অর্থে ও প্রাণে ভরাট করিয়া তোলে। গ্রাম্য-সাহিত্য বাংলার গ্রামের ছবির, গ্রামের স্মৃতির অপেক্ষা রাখে; সেই জন্যই বাঙালীর কাছে ইহার একটি বিশেষ রস আছে।' ৪

ভাওয়াইয়া গানের সাথে কুচবিহারের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জনজীবনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য রয়েছে। নদীমাতৃক দেশ কুচবিহার; তোর্ষা, মানসাই, সুতমুকা, ধরলা প্রভৃতি নদী এঁকে বেঁকে এ দেশের মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে। উত্তরে হিমালয়ের শাখা-প্রশাখা প্রহরীর ন্যায় দণ্ডায়মান। ঋজু দীর্ঘ বৃক্ষের ছায়ায় স্নিগ্ধ এই দেশ, মাটি সর্বদা প্রায় রসে সিক্ত। গানেও এই মৃত্তিকার শ্যামল গন্ধটুকু ছড়ানো—কোথাও রুদ্রতা নেই। জনসাধারণ খুব সরল প্রকৃতির, অতি সাধারণ এদের বেশভূষা। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই ঘরে বাইরে কাজ করে। জীবনধারণের জন্য এরা বিভিন্ন প্রকার জীবিকা গ্রহণ করেছে। সাধারণতঃ কৃষিজীবিরা ধান, পাট, তামাক, সরিষা প্রভৃতির চাষ করে। কেউ কেউ মহিষ পালন করে এদের বলে মহিষাল; সকাল বিকাল এরা নদীর চরে মহিষ-চরায়। এ ছাড়াও আছে গাড়ীয়াল—এরা পাটকাঠি, শুকনা কাঠ, ধান প্রভৃতি গাড়ীতে করে শহরে (সাধারণ লোকেরা শহরকে বন্দর বলে) নিয়ে যায় বিক্রি করতে। অনেকে ফাঁদ পেতে কপোত, বক প্রভৃতি পাখী ধরে—নিজেরা মাংস খায় এবং বাজারে এই সমস্ত পাখী বিক্রি করে।

এরা ধর্ম প্রাণ জাতি। রামায়ণ, মহাভারত, মনসামঙ্গল, বৈষ্ণব পদাবলীর কাহিনী ও কাব্যরসে পরিপুষ্ট এদের জীবনচেতনা। এ দেশে হিন্দুশাস্ত্রের প্রায় সব দেবদেবীর পূজা-অর্চা, উৎসবাদি, প্রচলিত থাকলেও এরা মুরলীধারী মদনমোহনের পরম ভক্ত। সংসারের নূতন কর্মে

ও অনুষ্ঠানাদিতে সর্বাগ্রে এরা মদনমোহনকে নির্মাল্য অর্পণ করে। জেলার প্রধান প্রধান স্থানে মদনমোহনের মন্দির আছে।

ভাওয়াইয়া গানের আলোচনার পূর্বে মানুষ ও তার পরিবেশকে বিস্মৃত হলে চলবে না। জীবনরসে সমুচ্ছল ভাওয়াইয়ায় একটি জেলার সমস্ত জনপদের অনুপম প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

ভাওয়াইয়া মূলতঃ দেহকেন্দ্রিক লৌকিক প্রেমসঙ্গীত এবং এর পরাকাষ্ঠা বিরহমূলক রসে। অধিকাংশ প্রেম সঙ্গীতে নদীর উল্লেখ রয়েছে অর্থাৎ বিরহ বিলাপের করুণ ধ্বনি নদীর পাড়েই বেশী পরিস্ফুট হয়। প্রেম-বিরহ ছাড়াও বাৎসল্য, হাস্য, শান্ত, সখ্য প্রভৃতি রসের বিশিষ্ট ধর্মে ভাওয়াইয়া বৈচিত্র্য ও ব্যাপ্তি লাভ করেছে।

ভাওয়াইয়ার সুরের বৈশিষ্ট্য তার প্রবল আকর্ষণীয় শক্তি। গোধূলি-সন্ধ্যার শান্ত পরিবেশে কিংবা পূর্ণিমার জ্যোৎস্না রাত্রে তামাক ও সরিষা খেতে দোতারা বাজিয়ে যখন পল্লী-গায়করা গান করে তখন যুবক-যুবতী চঞ্চল ও উতলা হয়ে ওঠে; জানা-অজানা, পাওয়া-না-পাওয়ার এক বিমিশ্র ভাব অনবরত চিত্তে দোলা দিতে থাকে।

ভাওয়াইয়ার প্রেমবিরহমূলক গানগুলির বক্তা প্রায় নারী। কোন এক কুমারী কোন এক যুবকের চোখে পড়েছে। যুবক বারে বারে প্রেম নিবেদন করছে. কিন্তু কুমারী সাড়া দেয় না, কারণ, সে প্রেম করতে চায় না। কুমারী তার সখীদের বলছে—

মুই পীরিতি করিস না
টোরির চ্যাংড়া ছাড়েন না,
দিয়ে যায় পীরিতির বায়না ॥

এদিকে কুমারীর রূপযৌবন যুবকের মনে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। না পাওয়ার বেদনায় যুবক অস্থির—পাগল-প্রায়। আর যুবতী সব শুনে সব জেনে, না-শুনা, না-জানার ভান করে, এটা আরো মর্মান্তিক। যুবক বলছে—

ও কি জানিয়াও জানেন না
ও কি শুনিয়াও শুনেন না,
জ্বালাইয়া গেইলেন মনের আগুন
নিভাইয়া গেইলেন না।
ও তোর নয়নের কাজল—
তিলেক দণ্ড না দেখিলে
মন মোর হয় পাগল।

যেখানে মনের মিল, সেখানে বাবরীচুলওয়ালা প্রেমিক-প্রেমিকার খোঁপা খুলে চুল এলিয়ে দিচ্ছে। প্রেমিকা অভিমানের সুরে বলছে—

কুন বাবরী আওলা
আউলাইল মোর ঘারুয়া খোঁপা
আউলাইল আউলাইল রে।

এই কথা প্রেমিকের অসন্তোষের কারণ হয়েছে। কিন্তু প্রেমিকা ভুল করেনি। প্রেমের পরে যার সঙ্গে একসূত্রে সমস্ত জীবনের ভালোমন্দ, সুখদুঃখ জড়িত হবে—তার মনে সে কিরূপ স্থান পেয়েছে এটা তো দেখা দরকার। প্রেমিক যখন অভিমানের স্বরূপ বুঝতে না পেরে চলে যেতে উন্মুখ, তখন কুমারী নিজেকে ধরা দিল—

বন্ধু রাগ করিছেন কেনে,
গোঁসা করিছেন কেনে
গলার মালা বদল হবে
আস্‌ছে শনিবারে।

মিলনমূলক প্রেমসঙ্গীতগুলিতে স্বামী-স্ত্রী ও প্রেমিক-প্রেমিকার গভীর আন্তরিকতা ফুটে উঠেছে। দুপুরবেলায় স্বামী নদীতে স্নান করতে যাবে। স্ত্রী তাকে নিষেধ করছে। নদীর জল অত্যন্ত ঘোলা, আর স্নানের সময় গলার-মালা হারিয়ে গেলে স্বামীর ভাই নাই যে, খুঁজে সেটা তুলবে। স্বামীর মা-বাপও নাই যে, সেটার জন্য ভাববে, কাঁদবে! স্ত্রী তাই বলছে—

নদী না যাইও রে বইদর
নদীর না ঘোলারে ঘোলা পানী।
নদীর বদলে বইদর বাড়ীতে গাও ধনরে
বইদর, মুই নারী তুলিয়া দব পানী।
এক লোটা ঢালিতে বইদর দুই লোটা তুলিতে রে।
বইদর খসিয়া পড়িলে গলার মালা
বাপ নাইরে ভাবিবে মাও নাই রে কাঁদিবে রে
ভাই নাই রে তুলিয়া দেবে মালা।
মানসাইর ওপারে বইদর
রাজহংস পঙ্খী পড়ে রে···
বইদর পঙ্খীর গলায় গজমতিহি মালা ;
পঙ্খীর কান্দনে বইদর বাড়ীঘর মোর না রয় মনেরে।
বইদর পরাণটা মোর উঁরাও বাঁইরাও করে রে।

ঝড় জলের অন্ধকারে প্রেমিক এসেছে প্রেমিকার দুয়ারে। দুর্যোগের মধ্য দিয়ে আমার জন্য প্রেমিকার মন শঙ্কাকুল। কারণ বিপদ ঘটার অনেক সম্ভাবনা ছিল। তাই বলেছে—

দেওয়া পড়ে হিরিম-ঝিরিম
ফোটাত ভিজে গাও।
সাইঞা বায়া আইসেন বন্ধু রে
বন্ধু খোঁপাত মোসেন পাও।
বেত বাড়ী খান দোলাও দোলাও
তাতে বাঘের ভয়,

তুমি কেনে আইলেন বন্ধু রে,
মুই না গেলেন হায়।
দোতারা ডাঙ্গাইয়া বন্ধু
বনে বনে যাও।
আড়ালত থাকিয়া বন্ধু রে,
বন্ধু মোর না মনটা খাও।

ভাওয়াইয়ায় চমৎকারিত্ব সৃষ্টি হয়েছে বিরহমূলক সঙ্গীতে। স্বামী বিহনে নারীর যৌবন ও রূপের কোন মূল্য নেই। তাই সঙ্গীহীন একক জীবনে নারী বিলাপ করছে। এই নারীর বিয়ে হয়নি বা স্বামী বিদেশে। নারী জীবনের নৈরাশ্য ও হৃদয়-বেদনা এর মধ্যে ধ্বনিত হয়েছে।—

ওকি পতিধন পান বাঁচে না যৈবন জ্বালায় মরি
আকাশে নাইরে চন্দ্র কি করিবে তারা রে—
যে নারীর সোয়ামী নাই রে দিনত আন্ধিয়ার রে।
খোপেতে নাইরে কইতর কি করিবে খোপে
যে নারীর সোয়ামী নাইরে কি করিবে রূপে।
বিলেতে নাইরে মৎস্য বগা কেনে পড়ে,
ওই মতো নারীর যৈবন উরাও বাঁইরাও করে রে।

কোন দুঃস্থ পিতা টাকার লোভে পাগল ব্যক্তির সাথে কন্যার বিয়ে দিয়েছেন; দুর্ভাগিনী নারীর আত্মবিলাপ সেখানে খুব করুণ ও মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে।

ওকি এবার আসিয়া সোনার চান মোর যান দেখিয়ারে—
আইলত ফোটে আইল কাসিয়া
দোলাত কান্দে ওলা,
ওহোরে বাপে মায়ে বেচায়া খাইচে—
সোয়ামী পাগেলা রে।
কোরা কান্দে কুরি কান্দে, কান্দে বালি হাঁস
ওহোরে বনের হরিণী কান্দে ছারি মুখের ঘাস রে।

কালার গান নামে প্রেমমূলক আর এক প্রকার ভাওয়াইয়া গান আছে। এই প্রকার গানে বৈষ্ণব পদাবলীর ছায়াপাত ঘটেছে। শ্রীকৃষ্ণ কাজল-ভোমরা বন্ধু, কালো নেয়ে, গরুর রাখাল প্রভৃতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। বৈষ্ণবভাব পরিপূরিত দেশের গ্রাম্য কবিরা মানুষের দেবতাকে নিজেদের মত এই সংসারের একান্ত কাজকর্মের মানুষ করে নিয়েছে। তাই কালার গানে অপ্রাকৃত বৃন্দাবনলীলার কামগন্ধহীন 'নিকষিত হেম' প্রেম নেই—তাতে মানুষের চিরায়ত জীবনতৃষ্ণার কামনা-বাসনাই প্রতিধ্বনিত। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেই।

১। মেঘে চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেছে, নদী হুলুস্থুলু, ঝড় আসতে বেশী দেরী নেই, নদী পার হতে হবে শীঘ্র, রাধা কৃষ্ণকে বলছে—

ও কি ওরে কাজেলা নাইয়া
নিদানে করেন পার।
দেওয়ায় কইর‍্যাছে আন্ধিয়ার;
এলুয়া কাশিয়ার ফুল।
নদী হইচে কানাই হুলুস্থুলু রে।
যে মোকে করিবেন পার
পার বদল দেঁও মোর গালার হার রে।
ওকি ওরে কাজেলা নাইয়া,
পার করিলে যৈবন করিম দান

২। রাধা কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য সর্বদা আকুল, অথচ কালাচাঁদ নিষ্ক্রিয়; রাধার মতে কালা চাঁদ ঠিক প্রেম জানে না। রাধার মনোবেদনা এই—

প্রেম জানে না অসিক কালাচাঁদ
ঝরিয়া থামে মহন।
কতদিনে হবে মোর বন্দুর দরিসন।
বন্ধু রে নদীর ওপারে তোমার বাড়ী
যাওয়া আইসায় অনেক দেরী।
যাব কি—রব কি সদাই করে মনা।
হাটিয়া যাইতে নদীর জল
খাটলাউ কি খুটলাউ কি খালাউ খালাউ করে রে—
হায় হায় পানের বন্ধু রে।
বন্ধুরে একেলা ঘরত পড়িয়া থাকং পালংক ওপরে,
পাশ ফিরিতে মরাই পালং—
কেরৎ কি কুরুৎ কি কেঁরাউ কেঁরাউ করে রে।
বন্ধুরে তোমার আশাত বসিয়া থাকং বটবিরিক্ষের তলে,
মন মোর উঁরাও বাঁইরাও করে—
ভাদর মাসি দেওয়ার ঝরি টাপ্পাস কি টুপ্পাস কি
সমসমাইয়া পড়ে রে।
হায় হায় পানের বন্ধু রে ॥

৩। রাধা নদীর ঘাটে স্নান করতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের কালো রূপে আর বাঁশীর সুরে একেবারে আহত। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর সুর সামান্য জিনিস নয়—তা—হাসি কান্নার এক মিশ্র আনন্দানুভূতিতে হৃদয় পরিপূর্ণ করে তোলে।—

ও মোর কালা বন্ধুরে, ও মোর কালিয়া বন্ধু রে
তোক নদীর ঘাটত দেখি আইসং আবার দেখা দেন রে।

তোর কালা দেহের রূপ যৈবন
জ্বালাইছে মোকে মনের মধ্যে আসি,
তোর হাতের বাঁশী চক্ষুত ঝরায় নদীর পানি,—
মুখত ফোটায় হাসি ॥

এই রকম বহু কালার গান আছে, দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই। সমস্ত কালার গানের বিষয়বস্তু এক—নদী নেয়ে, পারঘাটের-যাত্রী, খেয়া পারাপার প্রভৃতি। গানগুলির মধ্যে চিত্রকল্প সৃষ্টি হয়েছে—তার বৈশিষ্ট্য এই যে, হয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা মানবমনের বিরহ বেদনায় পটভূমি কৃষ্ণাভ।

দ্রুতলয়ের একপ্রকার লঘু ভাওয়াইয়া আছে, তার নাম চটকা। একটির পরিচয় দিচ্ছি। নব বিবাহিত স্ত্রী স্বামীর ঘরে এসে জানতে পারলো—স্বামী আগে বিয়ে করে ছিল। মৃতপত্নীর খাড়ু দেখিয়ে এবং আরো অনেক ধাপ্পা দিয়ে তাকে ভুলিয়েছে। ব্যক্তিত্বসম্পন্না নারী রেগে-মেগে বকতে থাকে—

নাক-ডাঙ্গড়ার বেটাটা, চোখ-ডাঙ্গরার নাতিটা
মোক ভুলাল মোকভুলাল সতের খাড়ু দিয়া।······ইত্যাদি।

এ ছাড়া, হাস্যরসাত্মক বহু ভাওয়াইয়া আছে। সেগুলিও বেশ উপভোগ্য। মশার কামড়ে কোন এক নারী বিরক্ত না হয়ে বেশ এক চোট হেসে নিয়েছে। মশার ভয়ে সে বাপেরবাড়ী গেছে, আর পিছু পিছু মশাও গেছে প্রেম করতে।

মশা পেটকোনা তোর ডিম ডিমডিম করে,
মশার ভয়েতে মুই গেনু বাপার বাড়ী,
আহা রে বাউদিয়া মশা বেড়ায় টারি টারি।
মশার ভয়েতে মুই গায়ে দিনু কাঁ্যাথা
কানের কাঠাত আসি মশা কয় পিরীতের কথা রে।
মশার ভয়েতে মুই ঘরে দিনু ধুমা,
গালত পড়িয়া মশা খায় পিরিতের চুমা রে।
মশা পেট-কোনা তোর ডিম ডিমডিম করে॥

বাৎসল্য রসের গানও দু'একটি পাওয়া যায়, তবে তা রামায়ণের কাহিনী আশ্রিত। লক্ষণ শক্তিশেলে পড়েছে, রামবিলাপ করছে ভাইয়ের জন্য—

পান সখীরে কোনদিন ভাঙ্গিবে চাঁদের বাজার,—
অযোধ্যায় ছাড়িনু পিতা বনত হারানু সীতারে।
পান সখীরে লঙ্কাত আসিয়া হারানু লক্ষণ ভাই।
বাপ গেইলে বাপ পাব, মা গেইলে মাও মেলব
ভাই গেলে না পাব পানের ভাই।

গাড়ীয়াল ও মহীষাল বিষয়ক গানের মধ্যে নারীর বিচ্ছেদ বেদনাজাত সুগভীর আন্তরিকতা ফুটে

উঠেছে। গাড়ী নিয়ে স্বামী শহরে গেছে কর্মব্যপদেশে, স্বামীর ফেরবার পথ চেয়ে চেয়ে একাকিনী নারী দুঃখের জ্বালায় বনফুলের মালা গাঁথে, আর বলে—

ওকি গাড়ীয়াল ভাই কতই রই আমি পন্থের দিগে চাইয়ারে।
যেদিন গারিয়াল উজান যায়, নারীর মন মোর
উড়িয়া যায় রে গাড়ীয়াল ভাই।
ও কি গাড়ীয়াল ভাই হাকানরে গাড়ী তুই শিলমারীর বন্দরে।
ও কি কবরে দুখ্‌সের জ্বালা আহা গাড়ীয়াল ভাই
গাথিয়া বহন মালা রে।
ওকি গাড়ীয়াল ভাই, কতই কান্দি মুই নিধুয়া পাথারে।

মহিষাল মহিষের পাল নিয়ে নদীর চরে গেছে, বাড়ীতে স্ত্রী একা। বিরহিনী নারী বলছে—

ও কি ভইষ চরাণ মইষাল বন্ধু রে,—
মইষাল ছাড়েন গাবুয়ালী।
তোমরা কেনে যাইবেন মইষাল
মোকে এলায় ছাড়ি মইষাল রে।......ইত্যাদি।

ভাওয়াইয়া কবিরা জীবনের উপরিতলেই শুধু বিচরণ করেন নি; জীবনের গভীরতম প্রদেশেও তাঁরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। শান্ত রসাশ্রিত দেহতত্ত্বমূলক আধ্যাত্মিক গান প্রচুর রয়েছে। মানুষের জীবন ভঙ্গুর,—কোন মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়বে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। পদ্মপাতার জলের মতোই মানুষের জীবন টলটলায়মান। ভাওয়াইয়া কবি গাইছে—

ওকি ওরে মানুষের দেহা
এ জীবনের নাইরে আশা
কখন চ্যাতন কখন হয়েরে মরা।
ভাই বল ভাতিজা বল সম্পত্তির ভাগী
তুই জীবন ছাড়িয়া গেলে, দিবে গাঙ্গের ভাটি।
পদ্মপাতায় জলরে যেমন টলমল করে
ওই মতো মানুষের দেহা কভু ভাঙ্গি পরে রে।
ও কি হায় হায় মানুষের দেহারে।

পরপারের ডাক আসা-মাত্রই সকলকে চলে যেতে হবে এ পৃথিবী ছেড়ে, একমুহূর্তও কারুর দেরী সইবে না। সুতরাং সংসারের মুল্যবান ধাতুর প্রতি মানুষের আকর্ষণ মায়া-মমতা সবই অর্থ হীন—

সোনার খাট পালঙ্ক রে রবে পড়িয়া
ভাই বল, বন্ধু বলরে কারবা গুরু কে।
ছাড়রে মন ভবের খেলা, পশ্চিমে ডুবিল বেলা রে
বেলা ডুবিলে হইবে আন্ধিয়ার রে।......

অন্তিমকালে একমাত্র আশ্রয় জগদীশ্বর শ্রীহরির নামকীর্তন। তাই ভাওয়াইয়া কবির আত্মনিরীক্ষা—

'হরি হরি বল মন বদনে।'

আরেকটি গানের আলোচনা করে আমরা প্রবন্ধ শেষ করছি। বক-শিকারের মত একটা তুচ্ছ ঘটনাকে অবলম্বন করে ভাওয়াইয়া কবি অনুপম সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন। বক-শিকারীর ফাঁদে ধরা পড়েছে, বকী খবর পেয়ে উপস্থিত হয়েছে। পরস্পর পরস্পরকে দেখে কাঁদছে। একজনের তো মৃত্যুর আর বেশি দেরী নাই, শেষবারের মতো দয়িতাকে দেখে নিচ্ছে। আর একজন শুধু স্মৃতি নিয়ে বাকী জীবনটা একাকী কাটাবে,—সেও দয়িতকে এই শেষবারের মতো দেখে নিচ্ছে—

ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দেরে
ফান্দ পাতিছে ফান্দুয়া ভাইয়া পুঁটি মাছ দিয়া,
ওরে মাছের লোভে বোকা বগা পড়ে উড়াল দিয়া রে—
ফান্দে পড়িয়ারে বগা করে হায় হায়,
ওরে আহা আহারে দারুণ বিধি সাথী ছাইড়্যা যায়।
ফান্দে পড়িয়ারে বগা কান্দেরে।
উড়িয়া যায়রে চকোয়ার পঙ্খী বগীক বলে ছাড়ে,
ওরে তোমার বগা বন্দী হইছে ধরলা নদীর পাড়ে।
এই কথা শুনিয়ারে বগী দুই পাখা মেলিল,
ওরে ধরলা নদীর পাড়ে যাইয়া দরশন দিল রে।
হায়রে বগিক দেখিয়া বগা কান্দে,
বগাকে দেখিয়া বগী কান্দে। ৫

এখানে জীবনরস ও আধ্যাত্মিকতা মিশে একাকার হয়ে গেছে। পক্ষীজীবনের অব্যক্ত মর্মযন্ত্রণার অভিব্যক্তির মধ্যে মুক্তি-পিপাসু মায়াবদ্ধ মানবাত্মার ক্রন্দন ধ্বনিত হয়েছে,—একথা বললে বোধকরি অন্যায় হবে না।

---

(১) লোকসাহিত্য (দ্বিতীয় সং), গ্রাম্য সাহিত্য পৃ—৫৬

(২) কুচবিহারের তুফানগঞ্জ শহরে এঁর বাড়ী ছিল। ইনি বহু ভাওয়াইয়া গানের রেকর্ড করেন। কিছুকাল ইনি ঢাকা রেডিও কেন্দ্রের স্টেশন ডিরেক্টর ছিলেন। বছরদুই হ'ল ইনি মারা গেছেন। এঁর কন্যা ফারদৌসী বেগম মাঝে মাঝে ঢাকা রেডিও-কেন্দ্রে ভাওয়াইয়া গেয়ে থাকেন।

(৩) ইনি জন্মান্ধ ছিলেন, বাড়ী দিনহাটায়। দোতারাতে ইনি ঢোলের বাজনা বা যে কোনো ধ্বনি তুলতে পারতেন। সেইজন্য ইনি দোতারা-যাদুকর নামে অভিহিত হন।

(৪) লোকসাহিত্য (দ্বিতীয় সং) গ্রাম্য সাহিত্য, পৃঃ ৫৭

(৫) তুলনীয়—কাহেরে ঘিনি মিলি অচ্ছহু কীস
বেঢ়িল হাক পড় অ চৌদীস ॥
অপনা মাংসেঁ হরিণা বৈরী
খনহ ন ছারঅ ভুসুকু অহেরি ॥
তিন ণ চ্ছুপই হরিণা পিবই না পাণী
হরিণা হরিণীর নিলঅ ন জানী ॥
হরিণী বোলঅ হরিণা সুন হরিআ
এ বন চ্ছাড়ী হোহু ভান্তো ॥

দ্রঃ সুকুমার সেন—চর্যাগীতি পদাবলী (১৯৫৬), পৃ-৫৪

বি দে শী সা হি ত্য

মার্কিনী সাহিত্যে এডগার অ্যালান পো একটি উজ্জ্বল নাম। যুগপৎ অন্যতর মানসিকতার গল্প এবং পাশাপাশি হৃদয়নন্দিত কাব্যের জন্য পো বিশিষ্ট। এবং বলা যেতে পারে বহু বিচিত্র ভাবনা, প্রতি-ভাবনাময় চিন্তন ও রহস্যময় ব্যক্তিত্বের জন্য অ্যালান পো পাঠক সমাজে বহু বিতর্কিত-ও বটে। সমগ্র মার্কিনী সাহিত্যে একমাত্র এডগার অ্যালান পো সম্পর্কে পাঠক ও আলোচকদের মধ্যে যতো তর্কজাল বিস্তারিত হয়েছে ততো বোধ হয় আর কারো প্রসঙ্গে নয়। 'Edger Allan Poo is the most complex personality in the entire gallary in American authors. No one else fuses, as he does, such discordant psychologi al attributes, or offers to the world an appearance so various. No one else stands at the center of a mystery so profound. Howthorne, Melville and Faulkner are, by comparison with Poe, easy enough to classify, while Edwards, Cooper and Hemingway emerge with crystal clarity. Poe resists easy interpretation and broad generalization' : Vincent Buranelli.

অ্যালান পো এবং তাঁর সাহিত্য জিজ্ঞাসাকে কেন্দ্র করে বিশেষত বিগত কয়েক দশকে আমেরিকায় প্রচুর গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তা ছাড়া নানা ভাবে গবেষণারও উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। অ্যালান পো সংক্রান্ত সর্বাধুনিক গবেষণার ফলশ্রুতি বর্তমান 'এডগার অ্যালান পো' নামক গ্রন্থটি। কর্ম ও চিন্তার এক অন্যতর বিবর্তন-ভাবনা কী রহস্যে তাঁর সাহিত্যে সঞ্চারিত তৎসহ অ্যালন পো কেন সর্বদেশ ও কালের পাঠকের আগ্রহের বিষয় তার এক তত্ত্ব সম্বলিত সাহিত্যাশ্রয়ী ব্যাখ্যা বর্তমান গ্রন্থে বিশিষ্ট আদর্শে প্রতিভাত। অ্যালান পো'র উৎসাহী পাঠক আলোচ্য গ্রন্থে তাদের প্রিয় সাহিত্যিক সম্পর্কে নানা জিজ্ঞাসার উত্তর পাবেন। প্রাবন্ধিক ভিনসেন্ট বুরেনেল্লি বর্তমান গ্রন্থে এক দুর্লভ নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে পো-র সাহিত্য ভাবনার মীমাংসায় ব্রতী হয়েছেন। সাতটি পৃথক নিবন্ধে অ্যালান পো'র সাহিত্য চিন্তার গবেষণাধর্মী আলোচনা উৎসাহী পাঠককে গভীরে টানবে। গ্রন্থটির আর একটি মূল্যবান সংযোজন বর্তমান লেখক সম্পর্কিত নোট এবং বিশিষ্ট প্রসঙ্গ নির্দেশ, পরন্তু অ্যালান পো সংক্রান্ত সুনির্বাচিত মন্তব্যবাহক গ্রন্থপঞ্জী ॥

Edgar Allan Poe. By Vincent Buranelly. New York : Twayne Publishers, Inc. pp. 158.

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

পেশাদারী নাট্যশালা ১৩৭১

কাসাণ্ড্রার জীবনের সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি হ'ল তার ভবিষ্যত দর্শন সত্য হওয়া। দিনের পর দিন ট্রয় ধ্বংস হচ্ছে, তার ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে একে একে প্রিয়জন প্রাণ হারাচ্ছে—এ অবস্থার জ্বালা কাসাণ্ড্রা কেমন ভোগ করেছে এ তথ্য আমাদের অনেকেই বোধ হয় অনেকবার অনুভব করেছি। নিজের যে কথা একদিন অন্যের কাছ থেকে বিদ্রূপমাত্র লাভ করেছিল আজকে তা সত্য হতে চলেছে, তাতে আনন্দ যতটা পাওয়া যায় তার চেয়ে যা না হলে খুসী হতাম তা সত্য হতে ওঠার বেদনাটাই বড় হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

১৯৫০ থেকে বাংলার পেশাদারী নাটকে যে প্রাচুর্যের জোয়ার এসেছিল আলোচ্য বছরে তাঁর ভাঁটার টান অতি আশাবাদীরও নজর এড়ায় নি নিশ্চয়। ১৩৭১কে কোন একটি প্রতীকের মাধ্যমে যে কোন নাট্যমোদী যদি রূপায়িত করতে চান তো থিয়েটার সেণ্টারের অগ্নিকাণ্ডকে বেছে নেওয়াই সমীচীন হবে। সাধারণভাবেই দক্ষিণ কলকাতায় নাট্যশালার প্রাণধারণ প্রায় অসম্ভব। কেন এমন হয় তার যুক্তিনির্ভর তথ্য আবিষ্কার করা প্রায় অসম্ভব।

ঐ অঞ্চলের সৌখীন অর্ধসৌখীন গোষ্ঠির খুব খারাপ চলে না একথা গত কয়েক বছরে সপ্রমাণিত হয়ে গেছে কিন্তু পুরোপুরি পেশাদারী গোষ্ঠি যে চলে না কালিকা থিয়েটারের অবলুপ্তি তা সপ্রমাণ করেছে। ইদানীংকালে থিয়েটার সেণ্টার ও শৌভনিক গোষ্ঠির প্রচেষ্টায় তা পূর্ণ বিচার করার সম্ভাবনাকে উজ্জ্বলতর করছিল। ঠিক এই অবস্থায় থিয়েটার সেণ্টারের অগ্নিকাণ্ড সমস্ত ব্যাপারটাকেই অনিশ্চিত করে দিল। (পরবর্তী খবরে মনে হচ্ছে দক্ষিণ কলকাতার নাট্যশালার ওপর শনির দৃষ্টি লেগেছে। বর্তমানে শৌভনিকের মুক্ত অঙ্গন মঞ্চের ওপর উচ্ছেদের খড়্গ সমুদ্যত। কয়েকদিন বাস্তহারা থাকবার পর পুরানো পরিবেশে ফিরে গেলেও কতদিন সেখানে তাঁরা টিকে থাকতে পারবেন এ খবর প্রশ্নচিহ্ন হয়েই রইল। দক্ষিণ-পশ্চিম কলকাতায় নতুন একটি নাট্যশালা পিয়াসী ১৩৭১য়েই সুরু হয়েছিল। বৎসরান্তেই তার দরজা রুদ্ধ হয়ে গেল।)

উত্তর কলকাতার, প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালাগুলির অবস্থাও আগের মত নেই এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। স্টারের পূর্বতন নাটক 'তাপসী' তিন শতাধিক রজনী অভিনীত হবার পর অন্য নাটক সুরু হয়েছে, বিশ্বরূপাতেও পূর্বতন নাটক 'লগ্ন' অপসৃত, রঙমহলেও তাই। মিনার্ভায় আলোচ্য বছরে নতুন কোন নাটকের মঞ্চায়নই হয় নি।

অবশ্য মঞ্চে নতুন নাটক সুরু করার একটা সুবিধা এই যে নাট্যকারেরা নতুন নাটক মঞ্চায়নের সুযোগ পাওয়ায় নতুন নাটক লেখার ঝোঁক বাড়ে। ইদানিং কিন্তু ঝোঁকটা অন্য দিকে পড়ছে। মৌলিক নাটকের চেয়ে ভাবানুবাদ নাট্যরূপ ইত্যাদির সংখ্যাই ক্রমবর্ধমান। (এ প্রবন্ধ যখন

পাঠকরা পড়বেন তখন নিয়মিত অভিনীত ৫টি নাটকের মধ্যে মাত্র একটি মৌলিক নাটক, বাকীগুলি হয় উপন্যাসের নাট্যরূপ না হয় ভাবানুবাদ, নয় তো প্রাচীন নাটক। একটির জাত নির্ণয় কঠিন। তার কাহিনী একজনের নাট্যরূপ দ্বিতীয়ের এবং প্রথম আবার সেটিকে সম্পাদনা করেছেন)। ফলে নাট্যকারদের এখনো একমাত্র আশ্রয় সৌখীন বা অর্ধ সৌখীন সম্প্রদায়। এদের সাধ থাকিলেও সাধ্য নেই কাজেই নিয়মিত অভিনয় করবার জন্য এঁরা অনেক সময়েই পুরানো নাটক বাছেন।

নাট্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে যে বন্ধ্যাত্ব বহুদিন থেকে প্রকাশিত হচ্ছিল বর্তমান বছরেও তা অব্যাহতই ছিল। দর্শক মনোরঞ্জন ছাড়া নাটকগুলি সমকালীন সমাজের কোন সমস্যা নিয়ে যে আলোচনা করেনি তা নয় কিন্তু সেগুলির মূল্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিতান্তই তাৎক্ষণিক, কালাতীত সৃষ্টির কোন আভাস এখনো পাওয়া যায়নি। বোধ হয় মহৎ স্রষ্টার জন্য এখনো অপেক্ষাই করে যেতে হবে।

নাট্য আংগিক সম্বন্ধে নানা আলোচনা সত্ত্বেও তার প্রাধান্য আজো সুপ্রতিষ্ঠিত। বিশেষ করে বিশ্বরূপার লগ্ন নাটকের ক্ষেত্রে আংগিকটাকেই সর্বস্ব করার একটা ঝোঁক দেখা গিয়েছিল। সিনেমাস্কোপের অনুকরণে থিয়েটারস্কোপ প্রচলনের কথাই বার বার করে ঘোষণা করা হয়েছিল অথচ সাধারণ বহু স্তর মঞ্চত্ব পরিকল্পনা কিভাবে চওড়া পরদার বিকল্প হতে পারে তা বোধগম্য হ'ল না। ত্রিস্তর বা বহুস্তর সৃষ্টি তো আগেও বাংলা মঞ্চে দেখা গেছে কেবলমাত্র নামটি ব্যবহার করা হয় নি বলেই কি তাদের পূর্বসূরীতার দাবী নস্যাৎ হয়ে যাবে? রসিকজনের নীরবতার জন্য মনে হচ্ছে ভবিষ্যৎ নাট্যইতিহাসে তাই হবে। (মজার ব্যপার এই যে, লগ্নর আংগিক সর্বস্বতার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় প্রতিবাদ বিশ্বরূপার পরবর্তী নাটক হাসির বিজ্ঞপ্তি মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে।)

অভিনেতা-অভিনেত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রের প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের নেবার ঝেঁকটাও অব্যাহত আছে। ফলে মঞ্চাভিনয়ের উন্নতি যে ব্যাহত হচ্ছে, এই সহজ কথাটা কেউ যে কেন বুঝছেন না তা এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য! চলচ্চিত্র শিল্পীরাও এর দ্বারা একমাত্র আর্থিক ছাড়া অন্য কোন দিক থেকে লাভবান হচ্ছেন না অপর দিকে মঞ্চেরও ক্ষতি হচ্ছে। কারণ আগে অভিনয়ে সফল হবার জন্য যে নিরলস সাধনা প্রথা ছিল আজ তা কিম্বদন্তীতে পর্যবসিত।

এছাড়া আর একটা ভয়াবহ ব্যাপারের সূত্রপাত ঘটেছে। নাট্যশালায় অভিনয় দক্ষতার চেয়ে বড় কথা মালিকের প্রীতিভাজন হওয়া—এ তথ্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে অভিনয়, নাটক তথা মঞ্চের সমূহ সর্বনাশ। অথচ হাওয়া সেই দিকেই বইছে। এখনি সাবধান না হলে ভবিষ্যত সর্বনাশকে নিরোধের কোন আশাই নেই।

এ বিষয়ে, না শুধু এ বিষয়ে কেন নাট্যশালার সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি দূরীকরণের জন্য রসিকজন যদি অবহিত না হ'ন তবে অদূর ভবিষ্যতে নাটক একমাত্র সংগ্রহশালা বা কোষগ্রন্থের মধ্যেই পাওয়া যাবে। এ অমংগল আসার আগেই যদি সাবধান না হওয়া যায় তো ভবিষ্যৎও অন্ধকার।

তবে বার বার বাংলা নাট্যশালা অবলুপ্তির প্রান্ত থেকে সাফল্যের উচ্চ শিখরে যেমন অবলীলাক্রমে উঠেছে তাতে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ হতাশ হবার কোন কারণ নেই বলেই মনে হয়। কিন্তু ধূমাৎ বহ্নি বিবেচনা করে সাবধান হওয়া বোধহয় ভালই। রসিকজন এ বিষয়ে কি বলেন?

রবি মিত্র

রুশ সাহিত্যে রোঁমান্টিসিজমের ক্ষীণস্রোত

রোমান্টিসিজম এমনই এক ধর্ম যা বিভিন্ন সময়ে প্রতি দেশেরই কতিপয় লেখককে প্রভাবান্বিত করে থাকে। অনেক সময় তা বিপুল ভাবে মানুষের চিন্তাধারাকে আচ্ছন্ন করে থাকে। আর তা স্বাভাবিক, যেহেতু সর্বকালেই মানুষের কাছে রোমান্টিকতার এক বিশেষ আবেদন আছে। যারা অতি বাস্তবতার পক্ষপাতী, তারাও একসময় ব্যাকুলিত হয়ে ওঠে রোমান্টিক ভাব আস্বাদনের জন্য।

অতি বাস্তবতার পূজারী রাশিয়াতে রোম্যন্টিসিজম কখনো ছিল কিনা তা নিয়ে অনেকে ভাবছেন। একদল মানুষ বলেন সেখানে ভাবপ্রবণতার বালাই নেই। এ উক্তি নিঃসন্দেহে ভ্রান্তিমূলক। রোমান্টিক ভাবধারার ইতিহাস নিয়ে পর্যালোচনা করবার সুযোগ এখানে সীমিত, একারণেই ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের রোমান্টিসিজম-এর সঙ্গে রাশিয়ার ভাবধারার তুলনা প্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে হয় না। কবে, কোন সময়ে রাশিয়াতে রোন্টিকতার আন্দোলন সুরু হয়েছিল তার সঠিক ইতিহাস পাওরা শক্ত। কারণ, উনবিংশ শতাব্দীতেও সেখানে ক্লাসিসিজম অর্থাৎ প্রাচীন কালের শ্রেষ্ঠ রচনাবলীকে আদর্শরূপে গ্রহণ করবার প্রবণতা অস্পষ্ট ছিল না। ফলে এই শতকে বহু রুশ লেখকের রচনায় যেমন 'পৌরাণিকতার' প্রভাব অতিক্রম করবার প্রয়াস সুস্পষ্ট, তেমনি মধ্যপন্থীদের সংখ্যাও ছিল যথেষ্ট। সে যাই হোক, অষ্টাদশ শতকের অস্তপ্রায় অংশে রাশিয়াতে ক্লাসিসিজম-এর আবেষ্টনী থেকে মুক্ত হবার জন্য সুদৃঢ় প্রচেষ্টা সুরু হয়। বোধহয় কারামজিন-ই প্রথম যিনি রুশ-সাহিত্যে সর্বপ্রথম সেন্টিমেন্টালিজম বা ভাবপ্রবণতার আমদানী করেন। এর ফলে সাহিত্যের আকাশে নতুন রং ধরলো। মানবমনের নানা অনুভূতি, তার সুন্দর ভাবনা, কল্পনা স্থান পেল কবি সাহিত্যিকের রচনায়।

অনুসন্ধানের ফলে জানা গেছে কবিতায় নয়, প্রথমে গদ্য রচনায় অর্থাৎ গল্প-উপন্যাসের মাধ্যমে সেন্টিমেন্টালিজম তার স্থান করে নিল রুশ সাহিত্যের দরবারে। অনতিবিলম্বেই তার ছোঁয়াচ লাগল কাব্যের কুঞ্জবনে। স্বদেশীয় সাহিত্যে বিদেশীয় কল্পনার রঙ আনতে সচেষ্ট হলেন অনেক রুশলেখক। উনবিংশ শতকের প্রারম্ভে ভ্যাসিলি আন্দ্রেয়েভিচ জুকোভস্কি ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের রোমান্টিক লেখকের রচনা অনুবাদ করলেন নিজের ভাষায়। আরম্ভ হলো প্রাক-রোমান্টিসিজম-এর অধ্যায়। জুকোভস্কির অক্ষয় কীর্তি ১৮০২ সালে গ্রে'র সুবিখ্যাত 'এলিজি' (Gray's Elegy) রুশ ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করলেন। ইংরেজী ও জর্মান কবিদের কাব্য থেকে অজস্র কবিতা রুশভাষায় রূপান্তরিত করে মরসুমী ফুলের ফসল ফলালেন তিনি। গ্রে, জেমস্ টমসন, সাদে, স্কট, মুর, বায়রন, উইল্যাণ্ড, বার্জার, শীলার, গ্যেটে প্রভৃতি খ্যাতিসম্পন্ন কবি-সাহিত্যিকের রচনার সৌরভে ভরে উঠেছিল রুশ সাহিত্যের আঙিনা। কেবলমাত্র সার্থক অনুবাদের মধ্যেই নয়, মৌল

কাব্য রচনাতেও তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর সুপরিস্ফুট। ১৮২০ সাল পর্যন্ত চললো জুকভস্কির নেতৃত্ব কবিতার রাজ্যে। ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে এলো তাঁর প্রখ্যাতি—প্রাক্-রোমান্টিকতা থেকে জন্ম নিল রোমান্টিকতা আর নেতৃত্বের ভার নিলেন বিখ্যাত রুশ লেখক পুশকিন। তবে একথা অনস্বীকার্য যে জুকভস্কিই সর্বপ্রথম রুশ সাহিত্যে এনেছেন রুশীয় রোমান্টিক কাব্যের ভাষা, তা যেমন ঋজু, তেমনি তেমনি পরিমার্জিত। সেখানকার কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রচলনও তিনি করেছেন। জীবনের সায়াহ্নে উপনীত হয়ে তাঁর কাব্যে যেন স্ব-প্রবর্তিত মেদুরতা রইল না, যেন পশ্চাতে ফিরে অবগাহন করলেন ক্লাসিক রসের সরোবরে। ১৮৪৮ সালে তিনি অনুবাদ করলেন পারস্য মহাকাব্য 'রুস্তম ও সোহরাব'। ১৮৪৮-৪৯ সালে তাঁরই হাতে ষষ্ঠমাত্রিক তালে অনুদিত হলো 'ওডেসি' মহাকাব্য।

প্রাক-রোমান্টিক পর্ব রোমান্টিক ধর্মানুসারী হলেও যেন তার মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় এই রসের আস্বাদন করা গেল না। সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভাবনা, অনুভূতির কথা প্রকাশিত হলেও রচনার পরিধি যেন পরিসীমিত। তা অনৈসর্গিক ও মধ্যযুগীয় অলৌকিক কহিনীর প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারে নি। হয়ত একারণেই প্রাক-রোমান্টিক পর্ব থেকে পূর্ণাবয়ব রোমান্টিকতার রূপান্তরণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে হতে পারে নি। এই রূপান্তরণের সাহায্য করেছে অন্যদেশীয় প্রভাব।

১৮২০ সালের গোড়ার দিকে রাশিয়াতে বায়রন ও সেক্সপীয়রের প্রভাব প্রবল হয়ে উঠলো এবং সেই সঙ্গে প্রাক রোমান্টিকতা তার জাতাশৌচ মুক্ত হয়ে রোমান্টিসিজমের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করলো। পুশকিন পাঠকের শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠলেন।

১৮৩০ সালের পূর্বে রাশিয়ার যে সব সাহিত্য সৃষ্ট হয়েছে তাদের 'প্রকৃত রোমান্টিক' সংজ্ঞায় অভিহিত করা যায় না বললেই চলে। তবে একথা সত্য যে এর ধারা এখানে ক্ষীণপ্রায়—১৮৪০ সালের শেষের দিকে তার স্রোত ক্ষীণতর হতে থাকে। রুশ সাহিত্যের বাগিচায় রিয়লিজম প্রবেশ করে রোমান্টিক ভাবধারার সমাপ্তি টানতে সুরু করে। এই টানাপোড়নের মধ্যেও একজন লেখক যশের সুমেরুতে উঠেছিলেন—তিনি গোগোল। আশ্চর্যের কথা তাঁকে রিয়লিষ্টিক প্যাটার্নের লেখক বলে দাবী করা হয়। অথচ গদ্য রচনায় তাঁর মত রোম্যান্টিক লেখক রাশিয়ায় দ্বিতীয় কেউ হয়েছেন বলে মনে হয় না। আগেই বলা হয়েছে রুশ সাহিত্যে 'রিয়লিজম'-এর আন্দোলন চলছে। এই আন্দোলন সুস্পষ্ট আকারে দেখা গেল ১৮৫০ সালে অনেকটা গোগোলিয় রচনার প্রতিক্রিয়া রূপে।

পুশকিনের 'দি জিপসিজ,' 'বোরিস গোডুনভ,' 'লিটল্ ট্র্যাজেডিস,' 'দি ষ্টোন গেষ্ট,' 'দি কভেটাস নাইট,' 'দি কুইন অব স্পেডস (গল্প),' 'টেলস অব বেলকিন' ইত্যাদি গ্রন্থ পৃথিবীর সাহিত্যে অমর হয়ে আছে।

এই প্রসঙ্গে দুজন বড়ো রুশীয় কবির নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চার্য—তাঁরা হলেন লারমনতভ্ এবং তাযুতচেভ। পাভলভ, বুকতর্ভ, ডাল প্রভৃতি রুশ লেখকের রচনায় মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র শ্রেণীর প্রাণধারণের গ্লানির কথা, তাদের আশা-নিরাশা, দ্বন্দ্ব, সংগ্রামের বিচিত্র কাহিনী স্থান পেতে লাগলো—অঙ্কুরিত হলো রিয়লিজমের বীজ।

অমিয়কুমার মজুমদার

রবীন্দ্রনাথের জীবনবেদ ॥ সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার। বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা-৬। মূল্য পাঁচ টাকা।

বিশ্ববন্দিত মানবধর্মী মনীষা Dr. Albert Schweitzer রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলেছেন: "This completely noble and harmonious thinker belongs not only to his own people but humanity." রবীন্দ্র-প্রতিভার আবেদন যে দেশ-কাল ছাড়িয়ে সর্বদেশের সর্বকালের মানুষের কাছে পৌঁছয় তার কারণ কবির জীবনবাদের অদ্ভুত সমন্বয়ী শক্তি। তাঁর চিন্তাধারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাগরসংগম। Dr. Schweitzer যথার্থ বলেছেন: "In Tagore's magnificent thougt symphony the harmonies and modulations are Indian. But the themes remind us of those of European thought." একদিকে ভারতের সংজ্ঞা-নির্ভর অমৃতংগম আত্মদর্শন, আর-একদিকে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানভিত্তিক জীবনধর্মী মানবদর্শন: এই দুই ভাবধারার মধ্যে বৈষম্য আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু কবির ক্রান্তদর্শী মনীষা দুটি আপাতবিরোধী জীবনবাদের সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে এমন এক অভূতপূর্ব মানবতাবাদ সৃষ্টি করল যেখানে মানুষ খুঁজে পাবে তার অস্তিত্বের অভিনব অর্থ, জীবনের নূতন সার্থকতা।

দুঃখের বিষয় এই যে, নির্ভীক সংস্কারমুক্ত মননের আলোয় সেই মানবতাবাদের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয়নের প্রচেষ্টা এখনো যেন দ্বিধাজড়িত। রবীন্দ্র-সমীক্ষা আজও দুটি পরস্পর বিচ্ছিন্ন অচলায়তনের গণ্ডীর মধ্যে প্রতিফলিত। একটি হল নিঃসমাজ অধ্যাত্মচিন্তা, আর-একটি নিরধ্যাত্ম সমাজচিন্তা। কিন্তু এরা তো এমন দেওয়াল-তোলা দুটি খণ্ডরাজ্য নয়। বস্তুত, এদের পারস্পরিক অনুপ্রবেশই রাবীন্দ্রিক জীবনবাদের বৈশিষ্ট্য। তবু কেন এই দ্বিখণ্ডতা? তার একটা সম্ভাব্য উত্তর হ'ল রবীন্দ্রমানসের মূল্যায়নে সমন্বয়ী দৃষ্টিকোণের অভাব! সমন্বয়ী দৃষ্টি বলে, রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মবাদ এবং মানবতাবাদ পরস্পরবিরোধী নয়; তিনি একটাকে কুলীন বানিয়ে আর-একটাকে ব্রাত্য করেন নি; বরং তারা এমন একান্তভাবে পরস্পরাশ্রয়ী যে, একটিকে হৃদয়ঙ্গম করতে হলে অপরটিকে উপেক্ষা করলে চলবে না। এখানেই তাঁর প্রতিভাদীপ্ত কৃতিত্ব। আর এই কারণেই Dr. Schweitzer তাঁকে "hurmonious thinker" বলে অভিহিত করেছেন।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার সমন্বয়ধর্মী সত্যটিকে যুক্তিনিষ্ঠ রূপ দেবার দুঃসাহসিক সাধনায় নেমেছেন। তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয় হল: "লেখকের মতে রবীন্দ্রনাথের মানবপ্রেমই তাঁর সমগ্র সৃষ্টি এবং জীবনদর্শনের মূলসুর। কবির জীবনে একেবারে গোড়া থেকেই বিশ্বপ্রকৃতির সাথে একাত্মার অনুভূতি এবং মানুষের প্রতি ভালোবাসা এই দুইটি, বা প্রকৃত প্রস্তাবে একটিই, প্রবৃত্তি সমস্ত সৃষ্টির মর্মকোষরূপে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করেছে। গোড়ার দিকে সেই মানব প্রেম ছিল

অধ্যাত্মবাদের রঙে রঙীন। তারপর ক্রমশঃ জীবনের অভিজ্ঞতা এবং চিন্তার পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে তা উত্তরোত্তর বাস্তবধর্মী হয়ে উঠেছে। প্রথম জীবনে তিনি যে অন্তরসত্যের সন্ধান করেছিলেন তা ক্রমে মূর্ত হয়ে উঠেছে মানবসত্যরূপে।" (৪ পৃঃ) সুতরাং রাবীন্দ্রিক অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে মানবতাবাদের কোনো বিরোধ নেই; প্রকৃতপক্ষে একটির ক্রমবিকাশের পরিণতিই হল আর একটির উদ্ভবে। কবির একটি উপমা ব্যবহার করে বলা চলে, নদী যেমন প্রতিক্ষণেই সমুদ্র হয়ে সমুদ্রকে পায় তেমনি তাঁর অধ্যাত্মবাদও মানবমুখী হয়েই আপন সার্থক পরিপূর্ণতা লাভ করে। কেমন করে এটা সম্ভব হল? কবিমানসে উপনিষদতত্ত্ব যে বিশেষ রূপে প্রতিভাত হয়েছে তারই আলোচনা করে গ্রন্থকার এই প্রশ্নটির উত্তর দিয়েছেন। তাঁর উত্তর হয়তো সনাতনধর্মী সমীক্ষার কাছে বেসুরো লাগতে পারে। কিন্তু সে দোষ গ্রন্থকারের নয়। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি অসনাতনী মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

"The men who are cursed with the gift of the literal mind are the unfortunate ones who are always busy with their nets and neglect fishing." Liternal mind কেবলি শব্দের জালে জড়িয়ে পড়তে থাকে। ফলে এ কথা সে ভুলে যায় যে রসের সাগরে জাল ফেলাটাই আসল উদ্দেশ্য মহাপঙ্কক-প্রতিম অভিধানপন্থীর বিচারবিশ্লেষণ তাই সার্থক রচনার প্রকৃত রসোপলব্ধির পরিপন্থী। শ্রীযুক্ত মজুমদার সম্বন্ধে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, তাঁর দৃষ্টি মাছ ধরার দিকেই; জাল নিয়ে তিনি জড়িয়ে পড়েন নি।

গ্রন্থকার রবীন্দ্র অধ্যয়নে নূতন দৃষ্টিকোণের প্রস্তাবনা করেছেন। এই নূতন দৃষ্টিকোণের লক্ষ্য হ'ল কবিমানসের একটি অখণ্ড চিত্র ফুটিয়ে তোলা। যে-কোনো প্রতিভার সামর্থ মূল্যায়ন নির্ভর করে তাঁর সামগ্রিক জীবনদর্শনের পূর্ণোপলব্ধির উপর। জৈবিক জীবনের মতো আত্মিক জীবনেরও ক্রমবিবর্তন আছে; হাঁ এবং না-র সংঘাতের ভিতর দিয়ে ক্রমস্ফুট সমন্বয়ী সত্যের দিকে এগিয়ে চলা তার লক্ষ্য। এই গতিধর্মী ক্রমবিকাশকে খণ্ডে খণ্ডে ভাগ ক'রে বিচার করতে গেলে বৈষম্যের ভ্রূকুটি দেখা দেবে নানা স্তরে সন্দেহ নেই। কিন্তু সমন্বয়ী দৃষ্টির সর্বগ আলোয় যখন চিন্তাধারার সামগ্রিকতা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, তখন তথাকথিত বৈসম্যের বহিরাবরণ খসে পড়ে; ভাবমণ্ডলের আঙ্গিক অখণ্ডতার মধ্যে সক্রিয় অংশ হয়ে সেই বৈষম্যগুলি সার্থকতা লাভ করে। বহুমুখী রবীন্দ্ররচনাবলীর অফুরন্ত ভাণ্ডারে এমন অনেক মতামত আছে, সমগ্র হ'তে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখলে যাদের স্ববিরোধী ব'লে মনে হয়। কিন্তু সমন্বয়ী দৃষ্টির দীপ-দেখানো সমগ্রতায় এই বিভ্রান্তিকর বৈষম্য সুসমঞ্জস হয়ে ওঠে। প্রত্যেক সৃজনী প্রতিভার অন্তরে দেখা যায় একক জীবনজিজ্ঞাসা : মানুষের পরম শ্রেয় কি? রবীন্দ্রনাথেরও সেই একই প্রশ্ন। এই মৌলিক জীবন-জিজ্ঞাসার পটভূমিকায় যদি রবীন্দ্রদর্শন সমগ্রভাবে পর্যালোচনা করা যায়, তবেই তাঁর ভাবমণ্ডলের অর্থবহ ঐকতান আমাদের প্রাণে সাড়া জাগাবে। এমনি এক আদর্শে অনুপ্রাণিত ব'লে গ্রন্থকার-প্রস্তাবিত নূতন দৃষ্টিকোণের মাঝে অভাবিত ফলশ্রুতির সম্ভাবনা দেখতে পাওয়া যায়।

রবীন্দ্র-সমীক্ষায় নূতন দৃষ্টিকোণের প্রয়োজনীয়তা আজকের দিনে অত্যন্ত ক'রে অনুভূত হওয়া উচিত। শিল্পসমাজের ক্রমবিবর্তন মানুষকে এখন এমন এক জায়গায় নিয়ে এসেছে যেখানে

দেখা যায় বাহিরের ঐহিক বৈভব-প্রাচুর্য এবং অন্তরের আত্মিক্ দেউলিয়া-অবস্থা। এ যুগের মানুষ "Acquisitive Society"-র একজন শ্রান্তিহীন "Status seeker"। "Affluent Society"-র সোনার হরিণ তার অভীপ্সার একমাত্র ধন, তার মানমর্যাদা কৃতিত্বের অভিজ্ঞান। সোনার হরিণের আশায় সংসারক্ষেত্রে তার রাত্রিদিন বিরামহীন প্রতিদ্বন্দ্বিতার লড়াই। যার লড়াই করবার ক্ষমতা যত বেশি, তার ভাগ্যে সমাজের হাততালি ততো মুখর। এটা যেন নেশার মত তাকে পেয়ে বসেছে —এই হাততালির লোভটা। ফলে, সে আজ কেবল একটা "One-Dimensional Man"। সে আজ "Lonely Crowd"-এর বৈচিত্র্যহীন অংশ হয়ে "ক্ষীণ অর্থহীন অস্তিত্বের" ভার বহন ক'রে চলেছে। অন্তরের বিরাট নিঃসঙ্গতা—শূন্যতার হাহাকার সে ঢেকে দিতে চায় কোলাহলমুখর উত্তেজনায় আর ট্র্যাংকুইলাইজারের আত্ম-অচেতন সান্ত্বনায়। যে competitive সমাজব্যবস্থায় প্রতিপলে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য মানুষকে লড়াই ক'রে চলতে হয়, সেখানে সে আশৈশব শেখে, "সাবধান! তোমার প্রতিবেশ তোমাকে ঘা মারবার জন্য তৈরি হয়ে আছে। অন্যমনস্ক হয়েছ কি মরেছ।" এ থেকেই বোঝা যায় মানুষ কেন আজ anxiety neurosis-এর বলি। প্রতিথযশা মার্কিন শিল্পসমাজবিজ্ঞানী Dr. Elton Mayo এ যুগের মানুষের একটি মর্মগ্রাহী বর্ণনা দিয়েছেন: "All individuals regard the world as hostile. The majority take up the attitude: 'the world is hostile. I must be careful.' The remaining are rebellions. Their attitude is: 'The world is hostile. Let me attack it.'" একদল আঘাত করবার জন্য উন্মুখ, আর-একদল আঘাত খাবার ভয়ে উদ্‌ভ্রান্ত। লড়াই-তত্ত্বের এই তো কানুন। এমন অস্বাভাবিক অন্তর্বর মানসিক অবস্থায় যথার্থ সহযোগিতার সম্ভাবনা, আন্তরিক প্রীতির সম্বন্ধ, পারস্পরিক বিশ্বাস ও মৈত্রীর প্রভাব কেমন ক'রে ফলতে পারে? আর, তা পারে না ব'লেই আমরা আজ প্রত্যেকেই Leibnitz-এর "windowless monad"-এ পরিণত হয়েছি। বাহিরে সহযোগিতা-সৌহার্দ্যের মনভোলানো ভার্নিশ; ভিতরে প্রত্যেক হ'তে প্রত্যেকে বিচ্ছিন্ন, প্রত্যেকে অন্তরে নিঃসঙ্গ। অধুনাতন প্রগতিশীল চিন্তাধারায় এই আন্তর্ব্যক্তিক বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা-নিঃসঙ্গতা সন্দেহ-অবিশ্বাস হিংসা-কলহের সমস্যা মূর্ত হয়ে উঠেছে। তাই নূতন জীবনবাদের প্রয়োজন এত বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে। মানুষ যেন উৎকণ্ঠ প্রতীক্ষায় জানতে চাইছে, কে তাকে শ্রেয়ান্বেষণের পথে নূতন দিগ্‌নির্দেশ দেবে। যাঁর কণ্ঠে আমরা শুনেছি "The history of the growth of freedom is the history of the perfection of human relationship", সেই রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে যুগ-কাঙ্ক্ষিত নবজীবনবাদের সন্ধান পাবো—এই আমাদের বিশ্বাস।

শ্রীযুক্ত মজুমদারের রচনায় আমাদের বিশ্বাসের একটি যুক্তিগ্রাহ্য স্বীকৃতি ও সমর্থন মিলেছে। রবীন্দ্রমানসের ক্রমবিকাশের ধারা বিশ্লেষণ ক'রে গ্রন্থকার দেখিয়েছেন কেমন ক'রে কবি তাঁর মানবতাবাদে পৌঁছেছেন। বিংশ শতাব্দীতে মানবতাবাদ নানা রূপ পরিগ্রহ করেছে। Elton Mayo-র industrial humanism, Julian Huxley-র evolutionary humanism, Teilhard de chardin-এর outological humanism, Albert Schweitzer-এর ethico-historical humanism: মানবদর্শনের এতাদৃশ চিন্তাধারার সঙ্গে এ যুগের পরিচয় ঘনিষ্ঠ। দেখা যায়, সকলের

সমস্যাই মূলে এক—ব্যষ্টি ও সমষ্টির আত্মিক সমন্বয় সৃজন করা, এমন সমন্বয় যেখানে ব্যষ্টি পূর্ণবিকশিত এবং সমষ্টি সুরময় ঐকতান। মানবধর্মী চিন্তাজগতে রবীন্দ্রনাথের মানবদর্শন এক বিশিষ্ট আসন দাবী করে, কারণ কবির জীবনবাদে ব্যক্তি ও সমষ্টি, এক ও বহুর সমন্বয় একটি তাৎপর্যপূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে।

এ কথা সর্বজনবিদিত যে, কবির জীবনদর্শনের মর্মস্থলে আছে উপনিষদের বাণী। কিন্তু শুধু উপনিষদের বাণী বললে সবটা বলা হ'ল না। উপনিষদের বাণীর মধ্যে বৈচিত্র্য আছে। সেখানে যেমন হাঁ-ধর্মী মতের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, তেমনি আবার না-ধর্মী মতেরও অভাব নেই। তাই উপনিষদের একই উৎস হ'তে অদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের মতো দুই বিপরীতধর্মী ভাষ্যের আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিল। অদ্বৈতবাদের কাছে জগৎ-জীবাত্মার ব্যবহারিক সত্তা আছে কিন্তু পারমার্থিক সত্যতা নেই। অপর দিকে, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অচিৎ চিৎ এবং ঈশ্বর এই তত্ত্বত্রয়কেই মৌলিক সত্য ব'লে স্বীকার করেছেন। তবে এদের মধ্যে চিৎ এবং অচিৎ-এর সত্তা নির্ভর করে ঈশ্বরের উপর। দেহ যেমন আত্মা-নির্ভর, জগৎ ও জীবও তেমনি ঈশ্বরনির্ভর। সুতরাং পারমার্থিক দিক থেকে জগৎ ও জীবের সত্যতা আংশিক। রবীন্দ্রনাথের চোখে উপনিষদ কিন্তু এক নূতন আলো নিয়ে দেখা দিল। জগৎ জীবন জীবাত্মা—তারা যে শুধু মৌলিক সত্য তাই নয়, পরমপুরুষের সত্যতার জন্যই তাদের সত্য হওয়া প্রয়োজন। সুতরাং তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে বললেন, "আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর। তোমার প্রেম যে হ'ত মিছে।" এমনি ক'রে কবি উপনিষদ তত্ত্বের স্ববিরোধী মতামতের মধ্যে এক জীবনধর্মী সমন্বয় আবিষ্কার করলেন। তাঁর প্রজ্ঞায় মিলন ঘটল এক-এর সঙ্গে বহুর। তিনি গতির সঙ্গে স্থিতির, অংশের সঙ্গে সমগ্রের, নিকটের সঙ্গে দূরের, মৃত্যুর সঙ্গে অমৃতের, অশান্তির সঙ্গে শান্তির, সীমার সঙ্গে অসীমের এক প্রাণময় একাত্মতা উপলব্ধি করলেন। উপনিষদতত্ত্বের শুকিয়ে-আসা ডালে ডালে রবীন্দ্র প্রতিভা নবমূল্যায়নের সঞ্জীবনী সুধা সিঞ্চন ক'রে নূতন প্রাণ জাগিয়ে তুলল।

এই নবমূল্যায়নের প্রকৃতি কি, কেমন ক'রে তার বিকাশ-প্রকাশ ঘটল, শ্রীযুক্ত মজুমদার সে কথা কবির জবানীতেই উপস্থাপিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঐক্যের সন্ধানী। তাই তাঁর চোখে ব্যক্তও যেমন সত্য, তেমনি অব্যক্তও সত্য। একটাকে পরিহার ক'রে বা একতরফা জোর দিয়ে কখনও পূর্ণ সত্যে পৌঁছনো যায় না। তাদের সামঞ্জস্য হতেই উৎসারিত হয় প্রকৃত সত্য। শ্রীযুক্ত মজুমদার যথার্থই বলেছেন: "এই সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টার মধ্য দিয়েই উপনিষদীয় ঐক্যতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর ধারণা উজ্জ্বলরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।" (২১ পৃ:) রাবীন্দ্রিক সামঞ্জস্যের স্বরূপ নির্ধারণের প্রয়াসে গ্রন্থকার কবির অব্যক্ত প্রীতির প্রতি যেমন অঙ্গুলিনির্দেশ করেছেন, তেমনি আবার তাঁর ব্যক্তমুখীনতাও যথাযথ স্বীকৃত হয়েছে। অনির্বচনীয় অব্যক্তের দিকে প্রকাশ-জগতের অভিসার যেমন কবির অনুভূতিতে ধরা পড়েছে, তেমনি আর-একদিকে তিনি দেখতে পেয়েছেন ফুলের পাপড়িতে পাখীর পাখায় মেঘের রঙে মানবহৃদয়ের লাবণ্যে নিজেকে প্রকাশ করবার জন্য অব্যক্তের আকুতি। এই পারস্পরিক মিলনের সুগভীর অভীপ্সা থেকেই উদ্ভিন্ন হয়েছে বৈচিত্র্যবান অদ্বৈতের রসময় প্রকাশ। তাই অংশও যেমন সত্য, সমগ্রও তেমনি সত্য। কেননা, কবির

ভাষায়, "সমগ্রবিহীন অংশ ঘোর অন্ধকার এবং অংশবিহীন সমগ্র আরও ঘোর অন্ধকার।"

রবীন্দ্রনাথের জীবনবেদের সবচেয়ে কৌতূহলজনক প্রশ্ন হ'ল, কেমন ক'রে তাঁর সামঞ্জস্যধর্মী অধ্যাত্মবাদ ভাববাদী দার্শনিকতার শিখর থেকে মানবতাবাদের সবুজ মাটিতে নেমে এল। গ্রন্থকার সুপ্রযুক্ত উদ্ধৃতির সাহায্যে কবির ব্রহ্মতত্ত্ব ও মানবদর্শনের মধ্যে যোগসূত্রটি আবিষ্কার করার সাধু উদ্দেশ্যে আত্মনিয়োগ করেছেন। জগৎ-বিমুখতার নাম যদি আধ্যাত্মিকতা হয় তবে কবির মতে সে শুধু আধ্যাত্মিক বিলাসিতা। ব্রহ্মকে স্বীকার করার অর্থই হ'ল সংসারকে স্বীকার করা। "জ্ঞানে ভোগে এবং কর্মে ব্রহ্মকে স্বীকার করলেই তাঁকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করা হয়। সেইরূপ সর্বাঙ্গীণভাবে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিবার একমাত্র স্থান সংসার—এই আমাদের কর্মক্ষেত্র, এই আমাদের ধর্মক্ষেত্র, এই আমাদের ব্রহ্মের মন্দির।" কবি বরঞ্চ "মুগ্ধভাবে সংসারের কর্মনির্বাহ" করা শ্রেয় মনে করেন, কিন্তু কর্ম পরিহার ক'রে "কেবল আত্মার আনন্দের জন্য ব্রহ্মসম্ভোগের চেষ্টা" তাঁর কাছে আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতার নামান্তর। এই কর্মবাদ কবির জীবনবেদে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ আসন পেয়েছে। কর্মসাধনাই তাঁর কাছে একমাত্র সাধনা। মঙ্গলকর্ম সাধনই আমাদের রিপুর সঙ্গে বন্ধন ছিন্ন করে মুক্তির পথ দেখায়। "কর্মের দ্বারা আমরা ব্রহ্মের অভ্রভেদী মন্দির নির্মাণ করিতে থাকিব, ব্রহ্ম সেই মন্দির পরিপূর্ণ করিয়া বিরাজ করিতে থাকিবেন।' মানুষ যেখানে আপন কর্ম-সাধনার মধ্য দিয়ে তার মনুষ্যত্ব বিকাশ করতে পারে সেখানেই ব্রহ্ম প্রকাশিত। এইটেই আধ্যাত্মিক সাধনার কেন্দ্রকথা। "সকলের সঙ্গে আমরা মিলতে পাচ্ছি, অল্পে অল্পে সমস্ত বিরোধ কেটে যাচ্ছে—মানুষের সঙ্গে মিলনের মধ্যে, সংসারের কর্মের মধ্যে, ভূমার প্রকাশ প্রতিদিন অব্যাহত হয়ে আসছে।" আমিত্বের মর্ত্যসীমা চূর্ণ করে মানুষ যখন বাইরে এসে দাঁড়ায় তখনি তো দেবতার অমর মহিমা দেখা দেয়। "আমার মধ্যে অন্যের এবং অন্যের মধ্যে আমার বাধা প্রত্যহই কেটে যাচ্ছে।" এই মানুষে মানুষে ঐক্য স্থাপন করাই মানুষের ধর্ম—এই তার ব্রহ্মসম্ভোগের পথ। সভ্যতার অর্থ-ই হল একত্র হওয়ার আদর্শ। যা-কিছু ভেদবুদ্ধিসঞ্জাত কবির কাছে তা সভ্যতাহীনতার প্রতীক, জনপ্রিয় ধর্মতন্ত্রের ছাপ থাকলেও। কবিমানসের এই দিকটার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে শ্রীযুক্ত মজুমদার একটি উল্লেখযোগ্য মন্তব্য করেছেন: "মোহ এবং মূঢ়তার দ্বারা সত্যের চারিদিকে প্রাচীর গড়ে তোলার চেষ্টার ফলে দেখা দেয় মানুষের মনে ও সমাজে বিকৃতির অভিশাপ।" (৭২ পৃঃ) এই অভিশাপের হাত থেকে কবি সমাজকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন। চেষ্টা করেছিলেন মানুষকে সত্যিকারের মুক্তিমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করতে।

রবীন্দ্রনাথের মানবদর্শন তাঁর গানের মতোই অপূর্ব সুর-সমন্বয়: সুদূর তার সঞ্চার, গভীর তার আবেদন, বিচিত্র তার প্রাণশক্তি। এমন মানবতাবাদের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা একটি অধ্যায়ের সীমিত পরিসরের মধ্যে সম্ভব নয়। সেই কারণেই হয়তো শ্রীযুক্ত মজুমদার কবির মানবদর্শনের ব্যাপক আলোচনায় ব্যাপৃত হন নি। ফলে, আমরা শুধু কবির মানবসংগীতের রেশটুকু পাই, পুরো গানটাকে পাই না। তবু বলব, এই রেশের মধ্যেই গ্রন্থকার যে ভাবসমৃদ্ধির আভাস ফুটিয়ে তুলেছেন, তা নিশ্চয় গভীরতর চর্চার প্রেরণা দেবে।

লেখকের বিশ্লেষণ পদ্ধতি সম্বন্ধে একটা কথা বলা প্রয়োজন। কবির জবানীতে রবীন্দ্রমানসের

বিকাশধারা অনুধাবন করবেন, এইটেই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। সুতরাং উদ্ধৃতির প্রাদুর্ভাব ঘটবে, সে কথা অস্বীকার করা যায় না। আর, এ-ও স্বীকার করতে হবে যে লেখক কর্তৃক আহৃত প্রত্যেকটি উদ্ধৃতই তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু তাই বলে উদ্ধৃতির অরণ্যে লেখকের ভাষ্য যদি খুঁজে বেড়াতে হয়, তবে সেটা মননশৈলীর একটা আঙ্গিক দুর্বলতা বলে প্রতিভাত হবে। মনে হয়, গ্রন্থকার যদি উদ্ধৃতিগুলির সারাংশ-অনুলেখনে এবং বিশ্লেষণে আরও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতেন, তবে রবীন্দ্র-জীবনবেদের সামগ্রিক রূপটি স্পষ্টতর হয়ে উঠত। প্রারম্ভেই যে বলিষ্ঠ বস্তুনিষ্ঠ ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ-সমন্বয়ের প্রতিশ্রুতি আমরা পাই, সেটাই গ্রন্থকারের কাছে আমাদের পুরো-পাওয়ানার দাবীকে উন্মুখ করে তোলে।

একটা বিষয়ে গ্রন্থকারের যুক্তিধর্মিতা কিছুটা অন্তর্বিরোধী হয়ে পড়েছে। তিনি অনেক জায়গায় রবীন্দ্রনাথের সংগ্রামী চেতনার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যার দাদাঠাকুর চরিত্র বলে, "আমাদের রাজার আদেশ আছে, ওদের পাপ যখন প্রাচীরের আকার ধরে আকাশের জ্যোতি আচ্ছন্ন করতে উঠবে তখন সেই প্রাচীর ধূলোয় লুটিয়ে দিতে হবে ; যার শোণপাংশু-যুবকের দল অচলায়তনের "দরজা আকাশের সঙ্গে দিব্যি সমান করে" দেয় ; যার কারিগরদের যৌথশক্তি যক্ষপুরীর বন্দীশালা ভেঙে ফেলে, যিনি তাসের দেশের যান্ত্রিক জীবনে নিঃশ্বাস্‌বায়ুর প্রাণ-চাঞ্চল্য জাগিয়ে তোলেন—সংগ্রামী চেতনা তাঁর জীবনবেদের একটি দৃপ্ত লক্ষণ এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। লেখকের যুক্তিসংগত অভিমত হল ঃ "তিনি (রবীন্দ্রনাথ) বলেছেন যে মানুষের সবচেয়ে বড়ো স্বভাব হচ্ছে মেনে না নেওয়া। সে বিদ্রোহী, তাই সে জীবের ইতিহাসে এত বড়ো গৌরবের আসন দখল করেছে।" (১৭০ পৃঃ) অথচ তিনিই আবার পরে বলেছেন ঃ "...রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে একটা দুর্বলতা ছিল। গণসংগ্রাম সম্বন্ধে তাঁর মনে ছিল একটা বড় রকমের ভীতি। জনজাগরণের জন্য গঠন-মূলক কর্মসূচী গ্রহণের চেয়ে বেশীদূর অগ্রসর হতে তাঁর আপত্তি ছিল।'' (১৮৪ পৃঃ) এই দ্বিবিধ অভিমতের মধ্যে যে অসংগতি দেখা যায় তার উৎপত্তি হল "সংগ্রাম'' শব্দটির দ্বিবিধ অর্থপ্রয়োগ হতে। তথাকথিত গণ-আন্দোলন সম্বন্ধে কবির আপত্তি ছিল সন্দেহ নেই। তবে তার কারণ "ভীতি'' নয়। ভাবালুতার বাস্পাচ্ছন্ন জনোচ্ছ্সনকে জনজাগরণ বলে স্বীকার করে নিতেই তাঁর আপত্তি ছিল। সুতরাং লেখক যে বিশিষ্ট অর্থে "সংগ্রাম'' শব্দটি শেষের দিকে ব্যবহার করেছেন, সেই অর্থ রবীন্দ্রমানসে ঠাঁই পায় নি। কবির জীবনবেদে সংগ্রাম তখনি প্রকৃত সংগ্রাম যখন তার লক্ষ্য কেবলমাত্র বাহিরের পরিবর্তন নয়, অন্তর্নিহিত সর্বজনীন মানুষটির জাগরণ। আসল সংগ্রাম অন্তরে। জৈবিক প্রবৃত্তির নীচতা, ক্ষুদ্রতা, ভেদবুদ্ধির ঈর্ষা-অবিশ্বাস-হানাহানি, নগদ-নারায়ণের ক্রীতদাসত্ব—এদের মারণ-আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা, এক কথায় আত্মশক্তির অনুশীলন—এইটেই যথার্থ সংগ্রাম। যে-সংগ্রামের পালা শুধু বাহিরে, তার লক্ষ্য মূলত এক শাসক সম্প্রদায়ের জায়গায় আর এক শাসকসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু জনসাধারণ ? যারা সংগ্রাম করল ? তাদের মুক্তি কোথায় ? তারা তো শেষ পর্যন্ত "পুনর্মূষিকো ভব" ; গড্ডালিকায় গা ঢেলে "কর্তার ইচ্ছায় কর্ম'' করে চলাই যেন তাদের চিরন্তন বিধিলিপি। জনজাগরণের দিক থেকে বাহিরের সংগ্রামের এই বন্ধ্যতার কারণ হল, আশু

ফল-লাভের লোভে আত্মশক্তি-বিকাশের প্রশ্নটাকে বেমালুম উপেক্ষা করা। ব্যক্তিপুরুষ যদি অন্তরের সংকীর্ণতা জয় করতে না পারে তবে সমষ্টিপুরুষের কণ্ঠে কেমন করে সহযোগিতার নূতন সামগান ধ্বনিত হবে! সুতরাং আত্মসংকীর্ণতার গণ্ডী অতিক্রমণের মধ্য দিয়েই মানবমনে যথার্থ সক্রিয় সমাজ-চেতনার অভ্যুদয় ঘটবে। আত্মশক্তিশীল সমাজচেতনার সাধনাই হল কবির গঠনমূলক ভাবধারা বা কর্মবাদের বুনিয়াদ। এই সাধনার কঠিন সমস্যাকে এড়িয়ে গিয়ে কেবলমাত্র বাহিরের সংগ্রামের সাহায্যে সহজ ফললাভের চেষ্টা, কবির ভাষাতেই বলা চলে, "কুমীরের পিঠে চড়ে নদী পার হওয়ার" মতোই নিস্ফলা। বিপ্লববাদী ও রাবীন্দ্রিক সংগ্রামী চেতনার এটাই হল গুণগত প্রভেদ।

পরিশেষে, শ্রীযুক্ত মজুমদারের কাছে একটা অনুনয় আছে। বাংলা বইএর প্রতি Printers Devil এর আসক্তি সুবিদিত। আলোচ্য গ্রন্থখানিও বাদ পড়ে নি। এখানেও Printers Devil তার অশোভন অনুরাগের বেশ কিছু সাক্ষর রেখে দিয়েছে। ভবিষ্যতে গ্রন্থকার এই সাক্ষরগুলিকে মুছে ফেলবেন আশা করি। যিনি ছাপার ভুলকে সযত্নে পরিহার করে চলতেন সেই রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে রচিত কোনো গ্রন্থে ছাপার ভুল বেদনাদায়ক অন্যমনস্কতার পরিচায়ক। এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে শ্রীযুক্ত মজুমদার মহাশয়ের বইখানি রবীন্দ্র সমীক্ষার রাজ্যে নূতন আলোর চরণধ্বনি। এই চরণধ্বনি সর্বতোভাবে নির্ভুল হোক এটাই আমাদের ঐকান্তিক কামনা।

শুভব্রত রায়চৌধুরী

বনানীকে কবিতাগুচ্ছ ॥ গণেশ বসু। কবিপত্র প্রকাশ ভবন। সিগনেট বুকশপ পরিবেশিত। কলিকাতা-১২। মূল্য দুই টাকা।

এখন এমন একটা সময়, যখন যে কোন শিল্পকর্মে হাত দেবার আগে তরুণ শিল্পীকে কোন না কোন পূর্ব নির্ধারিত পন্থা মেনে নিতে হয়। এমন কি মেনে নিতে হয় কোনও সংগঠন, বা আধা সংগঠনের কর্তৃত্ব। শিল্প-ব্যবসাসাপেক্ষ বা কমার্শিয়ালাইজড্ হবার ফলে যা হবার তাই হয়েছে এবং জনমাধ্যম mass midia গুলি যেহেতু এখন প্রায় সাধারণ্যে রুচি নিয়ামক হয়ে পড়েছে সেজন্য ব্যাপ্ত জনরুচির সুপাচ্য 'শিল্প' রচনা ছাড়া এখন তরুণ শিল্পীর সামনে যেন কোন পথ মুক্ত নেই। আপাত-দৃষ্টিতে যাঁদের এই দাসত্বের বিরোধী বা বিদ্রোহী মনে হয়, তাঁরাও সংগঠনের টুকরো রুটির দাক্ষিণ্যে বশংবদ বনে যায়। এমন স্থবিরতা, স্থাণু ও পৌণপনিকতার জগতে তরুণ শিল্পীকে যেন অন্যান্য জীবিকার মত তাঁর শিল্পকর্মকেও জীবিকা বলেই মেনে নিতে হয়েছে। এর ফলে যা হবার তাই হয়েছে। কারখানায় তবু ট্রেড ইউনিয়ন গঠিত হয়, কিন্তু শিল্পের জগতের সংস্থাগুলি কখনই ল্পীদের স্বার্থে Countervailing Power-হিসাবে কাজ করতে পারে না।

এখন বাংলা দেশের সাহিত্যকর্মগত সংগঠনের কেষ্টো-বিষ্টুদের কবিতা বিষয়ে মনোভাব কী?

কবিতা এমন হবে, যা কিনা সোজা কথায় পাঠকের মধ্যে ঢুকে যাবে এবং তৎক্ষণাৎ তার শিল্পগত প্রভাব নিশ্চিহ্ন হবে, কিন্তু কিছু যৌন প্রতীকের দাগ পাঠকের মনে থাকবে। বুর্জোয়া জগতের সাহিত্যকর্মের অন্যতম মূল লক্ষণই হল নারীকে রমণমূল্যে চিহ্নিত করা, এবং তাবৎ রমণীকেই পুরুষ আসঙ্গে দেখানো, এবং তাদের মনহীন দেহ পসারিণী করে চিত্রণ। আমাদের এ দেশেও যেমন, ওদিকে পশ্চিম দেশেও তেমনি অপরাধ, যৌনতা ইত্যাদি নিয়ে ব্যক্তি মানুষকে মৌলিক মূল্যে অপরাধী ও যৌনতা সর্বস্ব বলে এস্টাব্লিসমেণ্ট স্থিরীকৃত করতে চায়। তাই তরুণ কবির সাহিত্যের চালটাও ঠিক এমনি। আমি বাংলা দেশে একাধিক তরুণ গল্পকার ও কবির মুখে শুনেছি, 'ভীষণ অসৎ হতে হবে, ভীষণ অসাধু হতে হবে।' কোন বিষয়ে যদি প্রশ্ন তোলা যায়, তাঁরা বলবেন 'আসলে একাজকে fun হিসাবে নেওয়াই ভালো।' এসব কথা শুনতে চমৎকার, কিন্তু ভারী খারাপ লাগে এঁদের বাংলা দেশের রাজনীতি ও সাহিত্যের ও গুণ্ডাবাজদের অনুচর হিসাবে দেখতে। সুতরাং মানুষকে আপন মর্যাদায় যদি কোন কবি ভাস্বর করেন, প্রেমকে বিশ্ব-হার্মনির অন্যতম পন্থা বলে গণ্য করেন—তবে মুহূর্তেই আমরা চমকিত হই, বিস্মিত হই, এবং কবি-ব্যক্তিত্ব যে এখনও অনেকভাবে establishment-এর বিপ্রতীপ রয়েছে মনে করে উৎসাহিত হই।

'বনানীকে কবিতাগুচ্ছ' নামের একটি ছোট কাব্যগ্রন্থ পড়ে এসব কথা আমার মনে হয়েছে। এর লেখকও কবিতার বাজারে একেবারে তরুণ। কবিতাগুলি প্রায় একই কেন্দ্র, অর্থাৎ প্রেমসন্ধানী। কিন্তু প্রেম বলতে আমাদের দেশে যেমন মিষ্টি প্রেমের কবিতা, যৌন সর্বস্বতা, নারীর তথাকথিত পসারিণী চরিত্র চিত্রণ ইত্যাদি দেখা যায়, কবিতাগুলি স্বাদে তেমন নয়। উপরন্তু শব্দ ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য, চিত্রকল্প রচনার বৈচিত্র্য এবং ক্রিয়াপদ ভাবনার নূতনত্ব আমাকে ব্যক্তিগতভাবে খুবই আনন্দিত করেছে।

প্রসঙ্গত কবিতার শরীর বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত মনোভাব এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো। ভাস্কর যেমন তাঁর মূর্তিকে এমন একটি রূপ দেন, যার ফলে কোন অংশই প্রক্ষিপ্ত বা অপ্রয়োজনীয় বোধ হয় না, তেমনি কবিতাকে সজীব স্বরূপে বা organic অঙ্গ সংস্থাপনে গড়ে তুলতে হয়। সে জন্য কিছু শিল্পগত নিয়ম মেনে নিতে হয়। আসলে শিল্পী ঐ নিয়মের অধীনেই স্বাধীন। যেমন নাগরিকের স্বাধীনতা সংবিধান সম্মত, কবিকেও তেমনি কিছু নিয়ম মানতে হয়। মাঝে মাঝে মৌলিক বিপ্লবে যেমন দেশের সংবিধান কাঠামো বদলায়, তেমনি কবিতাও বহু নতুন নিয়মের অধীনে এসে পড়ে, পুরানো নিয়ম পূর্ণভাবে আর থাকে না। কিন্তু রাষ্ট্র যে-রূপই নিক, সে একটি সংগঠন, তেমনি সংগঠনের মৌলিক নিয়মাবলী তাকে অনুসরণ করতেই হয়। বিপ্লব ও মৌল মূল্যে বিধৃতি—এই উভয়ই শিল্পের অন্বিষ্ট। ফলে, নতুন ছন্দভাবনা, পর্ব নিরূপণ, ব্যঞ্জনা সংস্থাপন যেমন কবির সহযাত্রী তেমনি ঐতিহ্যগত ভাবে প্রাপ্ত বিষয়গুলির মূল্যায়নও এক্ষেত্রে অতি প্রয়োজনীয়। প্রসঙ্গত পুরাতন কাব্যগত শব্দ যথা এ বে, হেথা, মোর…এমত বহু শব্দকে নতুন চোখে দেখা প্রয়োজন। বাংলা দেশের ক্রিয়াপদের স্থবিরতা 'করে, হয়' প্রভৃতিকে উত্তীর্ণ হতে বিশেষ্যকে ক্রিয়াপদে রূপান্তরণ, নামধাতু প্রয়োগ ইত্যাদি চিন্তা করা ভালো। জীবনানন্দ দাশ এ বিশিষ্টতাকে খুব ভালো করে দেখার চেষ্টা করেছেন। প্রচলিত আসঙ্গেও হতেছে, ঘুমাতেছে প্রভৃতি শব্দের

প্রয়োগ বহুক্ষেত্রেই বাকভঙ্গীকে উন্নীত করেছে। ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে যেরূপ, শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও অনুরূপ উদার হওয়া ভালো। কবির নিকটে এমন কোন পূর্ব নির্দেশিত সর্ত নেই যে তাঁর কবিতার ভাষা হলদিয়া বন্দরের বা খড়্গপুরের রেলকলোনির ভাষা হতে হবে। তিনি পুরাতন শব্দকে নতুন ব্যঞ্জনায় তাড়না করবেন, বিদেশী শব্দকে উপযুক্ত জায়গায় সন্নিবেশ করে কবিতার শব্দসম্পদ, অন্বেষণ ও ব্যঞ্জনা ব্যাপ্ত এবং | অথবা গভীরতর করবেন। আর যদি সম্ভব হয় প্রচলিত চিত্রকল্পের মধ্যেও নতুন কায়দা আনবেন এবং তার পাশে একেবারে টাকশালের ঝকঝকে পয়সাটির মত পুরাতন ঘসা চিত্রকল্পের পাশে নতুন চিত্রকল্পের বৈপরীত্যের চমকে ভাবনাটি পাঠকের মধ্যে প্রসারিত করে দেবেন। আমি কখনই মনে করি না একমাত্র শুধুমাত্র প্রচলিত ও লোকমুখে ব্যবহৃত, সংবাদপত্রে ধর্ষিত শব্দগুলিই কবিতার শব্দসম্ভার। তাহলে কবিতা না লিখে কেবলমাত্র সাংবাদিকতা বা রাজনৈতিক বক্তৃতার কাজই কবিযশপ্রার্থীর লক্ষ্য হওয়া উচিত।

'বনানীকে কবিতাগুচ্ছ' কবিতার বইটিতে শব্দ ও ক্রিয়াপদ ব্যবহারের আমার মতের উল্লিখিত গুণগুলি বর্তমান। কবি গণেশ বসুর সমবয়সী কবিদের একাংশ ছন্দের অধীনে স্বাধীনতা আর যখন মানতে চাইছেন না; কবিতা শরীরের organic স্বরূপ যখন তাঁদের নিকট ধিকৃত যখন এমন কী বানান ও শব্দকে লোকমুখে উচ্চারিত ধনির মত 'স্বাভাবিক' [কোন অঞ্চলের স্বাভাবিক ?] করে আনতে চাইছেন : তখন একেবারে তাঁদের উল্টো, একেবারে উল্টোদিকে পদক্ষেপ সত্যই বিস্ময়কর মনে হয়।

গণেশ বসুর কবিতাগ্রন্থটির উৎসর্গ পত্রের পংক্তিটিই তাঁর কাব্যভাবনার অন্যতম সূত্র 'আমরণ যে রহিবে অশ্রুময় হৃদয়ে আমার'। বলা বাহুল্য এ পঙ্‌ক্তিতেই ক্রিয়াপদ ও শব্দ ব্যবহারের বিশিষ্টতা লক্ষ্য করা যায়।

এ-বইখানির কবিতাগুলির প্রায় সব কয়টিই কোন প্রণয়িণীর প্রতি স্বগত ভাষণ এবং সব কবিতাগুলিই বিচ্ছেদ প্রসূত। বিচ্ছেদ ও বিরহ—এ ধরণের শব্দ বোধহয় আর পাঠকদের ভালো লাগে না, কেননা, সাম্প্রতিক কবিতায় এত বেশি সঙ্গম, বিছানা, শয্যা এবং ইত্যাদি ইত্যাদির ছড়াছড়ি—তখন এ শব্দগুলি প্রায় প্রাগৈতিহাসিক বলে ভ্রম হয়। কবি তাঁর প্রিয়তমার বিস্মরণে নিজে যদিও চলে যেতে চান তবুও প্রেমের স্মৃতি তাকে ঐশ্বর্যময় করে তুলবে, এমন আশা করেন। বলার পদ্ধতিটি একেবারে অন্য রকমের, যথা—

১। কেননা এখন সবারে ভুলিতে হয় পৃথিবীতে ; যদি কভু আসে চামেলী গোলাপ জুঁই সকলেরি ঝরিবার বেলা কে আর নিভৃতে রাখে চিরকাল তাদের স্মরণ।

২। হায় যেখানে আমার ছিন্নপাল তরীখানি বাঁধা আছে……

৩। প্রেমহীন বৃক্ষের মতন একাকী দাঁড়ায়ে রবো গোধুলির বুকের শোণিতে।

৪। ভুলে যাবো নারী জ্যোৎস্নার নীলাভ রোদ কিংবা কোন বনহরিণীর অলস চিতল-আঁশা করতলে।

৫। শুদ্ধ বেদনার জলস্রোতে নন্দনের পারিজাত পুষ্প ভেসে যায় পদাঘাতে তোমাদের।

৬। বড়ো ভালোবাসি আমি ভাস্করিত গোলাপের উজ্জ্বল শোণিমা।

আমার মনে হয়, উদ্ধৃত ছটি অংশই কবিকে আপনার বাচনস্বরূপে প্রকাশ করে।

গণেশ বসুর কবিতাগ্রন্থটিতে জীবনধারাটি বহুবার নদীর সঙ্গে, জীবন-নৌকার সঙ্গে, শিল্প গোলাপের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। অর্থাৎ সব কবিতাগুলিই যেহেতু প্রেমের আর্তিতে মুখর— বলা যেতে পারে এই তরুণ কবি নতুন কবিতার গড্ডলধারায় হারিয়ে যান নি। অন্য বহু তরুণ যখন রমণীর প্রতারণাকে মুখ্য করে পৃথিবীর দিকে তাকান, তখন গণেশ বসু পৃথিবী ও সমাজের ম্লানতার জন্যই প্রেমের পরাজয় দেখেন। প্রসঙ্গত পঞ্চম উদ্ধৃতিটি উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়। কবি প্রেম ও শিল্প এক কেন্দ্রে আনতে চেয়েছেন। শিল্পই প্রেম এবং প্রেমই শিল্প।

কবির জীবন অনুভবের গভীর ব্যঞ্জনা বিধৃত দুটি উদ্ধৃতি দিয়ে কবি গণেশ বসুর যাত্রা-পথ শুভ হোক কামনা করে যতি টানি, প্রসঙ্গত বলি, কবি প্রেম ছাড়া পৃথিবীর অন্যবিধ সুরগুলিকেও নিয়ে পরীক্ষা করুন এবং ছন্দ ও শব্দের অন্যবিধ পরীক্ষাও তাঁর অন্বিষ্ট হোক।

১। অনিন্দ্য শিল্পের খোঁজ মেলে যদি কোন দিন বলিব তাহারে
তোমারি লাগিয়া আমি নিরন্তর বাঁচিয়া রয়েছি
সুদূর প্রবাসে আহা, এইখানে বিষাদের মলিন আঁধারে
তোমার সহস্র নামে স্মৃতিময় হৃদয় ভরেছি।

বড়ো ভালোবাসি আমি ভাস্বরিত গোলাপের উজ্জ্বল শোণিমা
যেখানে তোমার মুখ আলোকিত অপূর্ব অদ্ভুত,
তুমি তো জানো না হায় হৃদয়ের মর্ম জ্বালা প্রবল প্রতিমা
নির্জনে কেমন কাঁদে স্বর্গচ্যুত শান্ত মেঘদূত।

মনে হবে এ-সময় পৃথিবী বেদনাতুর তোমার বিহনে
বিষাদে ডুবিয়া যাবে মানুষের নম্র ভালোবাসা
তবে কে জাগিয়া রবে জলস্থল অন্তরীক্ষে পবিত্র স্মরণে?
তুমিহীন এ-জগতে গভীর তামাসা।

অনিন্দ্য শিল্পের খোঁজ যদি পাই এইখানে বলিব তাহারে
কিছুই চাহি না আমি, চাহি শুধু ভালোবাসা, বনানী তোমারে।

২। আমরণ সে রহিবে অশ্রুময় হৃদয়ে আমার,
বিষণ্ণ প্রেমিক জানি এই কথা বলে
নিভৃতে মিলিয়ে যায় অন্ধকারে, করুণা সবার
শেষ হয় পৃথিবীর অস্তশোকে, মৃত্যু তার হলে

কিছুই রহে না জানি, সব কিছু বড় স্মৃতিময়
মনে হয় শুন্যতায়, তুমিহীন কাটে না সময়,

তরুণ সান্যাল

কোন মূর্তি ভালবাসি ॥ কাজল ঘোষ। গ্রন্থজগৎ। প্রকাশক—দেবকুমার বসু। ৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা। দাম—দু' টাকা।

'কোন মূর্তি ভালবাসি' কাজল ঘোষের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। নামবিহীন মোট ২৮টি কবিতা এতে স্থান পেয়েছে। ঐ কবিতাগুলির মধ্যে বক্তব্যের দিক থেকে "প্রেম"-এর প্রাধান্য স্পষ্ট হলেও, কাব্যগ্রন্থের নামকরণ অনুযায়ী এ কথাই বলতে হয় যে কবি কাজল ঘোষ যে কোন মূর্তিকে কবিতার ভাবমূর্তি হিসাবে ভালবাসেন সে সম্বন্ধে দ্বিধাহীনভাবে কিছু বলা দুরূহ। তবুও কবিতাগ্রন্থটি পড়ে একথাই মনে হয়েছে যে কবির ভাবনাগুলি সম্ভবত প্রেমকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে।

বইটিতে অন্ত্যানুপ্রাস যুক্ত ছন্দের কবিতার সংখ্যা অত্যন্ত কম। বাকী কবিতাগুলির অধিকাংশই অন্ত্যানুপ্রাসবিহীন। এগুলির কয়েকটি যদি ছন্দ অনুযায়ী আবৃত্তি করতে হয় তবে ছন্দ পতনের ত্রুটি সহজেই কানে ধরা পড়ে। যেমন ২নং কবিতার ২য় পংক্তিতে 'সন্ধিনী গোধূলিতে—কবিতাটিকে যদি তানপ্রধান ছন্দে লেখা বলে মনে করা হয় তবে 'সন্ধিনী গোধূলিতে' এই শব্দদুটির ব্যবহারে একটি মাত্রা বেশী হয়ে যাওয়ায় সহজেই তা শ্রুতিতে ব্যঘাত সৃষ্টি করে। ঐ কবিতার ৮ম পংক্তিতেও ঐ ত্রুটি ঘটেছে। এ ছাড়াও আরো অনেক ত্রুটিপূর্ণ পংক্তিই উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তবে এই স্বল্পপরিসরে তা সম্ভব নয়। এই কাব্যগ্রন্থটিতে ছন্দ বৈচিত্র্য-নিদর্শনেরও অভাব আছে। যদিও এতে দু'একটি ভালো ধ্বনিপ্রধানছন্দে লেখা কবিতা রয়েছে (যেমন ১ ও ১৯ সংখ্যক) তবুও অধিকাংশ লেখাই প্রকাশরীতির দিক দিয়ে কেমন যেন একঘেঁয়ে বলেই মনে হয়।

শব্দ নির্বাচনে কবির কিছু শব্দের প্রতি গভীর মমতা আছে বলে মনে হয়। কয়েকটি কবিতায় কবির শব্দ-ব্যবহার ভালোই লাগে কিন্তু কোথাও কোথাও আবার তা অত্যন্ত বেসুরো ও দুর্বল বলে মনে হয়। ২য় কবিতায় 'সন্ধিনী' শব্দটি যে কেন ব্যবহার করা হল তা বোঝা গেল না। ৯নং কবিতায় 'অপেক্ষিছে' শব্দটি অত্যন্ত দুর্বল বলে মনে হয়। ২২ নং কবিতায় 'চন্দ্রিমা' শব্দটি শ্রুতিকটু লাগে। ২০ নং কবিতায় 'গভীর রসনা' কিভাবে যে 'আলোর উর্দ্ধে আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত করে' তাও বোঝা গেল না। মোটকথা কবিতাগুলি পড়ে মনে হয় যে কবি শব্দ ব্যবহারে খুব সাবধানী নন। তাই অনেক ভালো পংক্তিও যেমন তিনি এই বইয়ে রচনা করেছেন তেমনি স্বকৃত অসাবধানতা দোষে তিনি অনেক ভালো পংক্তিকে দুর্বলও করে তুলেছেন।

রূপকল্পের ব্যবহারে কাজল ঘোষ খুব বেশী উৎসুক বলে মনে হল না। তাই কবিতাগুলিতে

রূপকল্পের সংখ্যা কম। তবুও কয়েকটি কবিতায় সুন্দর কয়েকটি রূপকল্প তিনি সৃষ্টি করেছেন—

সাগরের নীল জলে ছায়া ভাসে মৃত মরালীর (৩ নং কবিতা)
পরিশ্রান্ত মানুষের ছায়া ঘরে ফেরা বিহঙ্গের মত (৪ নং)
আমি কোনো শিশুর স্বভাব নিয়ে
চোখে ধরি রঙীন কাগজ। (১৬ নং)

কিংবা, কেননা মনেতে জানি ভালবাসা রমণীর মত। (২:)

এছাড়াও অনেক ভালো রূপকল্প এই গ্রন্থের বিভিন্ন কবিতায় তিনি এঁকেছেন। আর সেজন্য প্রশংসাই তাঁর প্রাপ্য।

সমস্ত বইটি পড়ে অনেক ত্রুটি চোখে পড়লেও কাজল ঘোষ যে কবি মনের অধিকারিণী তা অবশ্যই স্বীকার করতে হয়। ১, ৫, ৭, ৮, ১৬, ১৯, ২৩, ২৪, ২৮ এই কবিতাগুলিই তার প্রমাণ স্বরূপ। তবুও, দুঃখের সঙ্গে এ কথা বলতেই হয় যে 'কোন মূর্তি ভালবাসি, কাব্যগ্রন্থ সম্ভাবনায় উজ্জ্বল কিন্তু সামগ্রিক আবেদনের বিভায় মণ্ডিত নয়। এই কাব্যগ্রন্থে কাজল ঘোষকে কবি হিসাবে খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু মনে হয় যে অভিজ্ঞতা, অভ্যাস, সাবধানতা ইত্যাদির মাধ্যমে তিনি বোধহয় পরবর্তী কাব্যগ্রন্থে আরো অনেক পরিণত ও সার্থক কবি হিসাবে পাঠকের সামনে উপস্থিত হবেন। তাই পরিণতিও সার্থকতার অভিমুখে অগ্রসরমান কবির কাব্যগ্রন্থ হিসাবে 'কোন মূর্তি' ভালবাসি' নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য।

সজল বন্দ্যোপাধ্যায়

তিনবেণী ॥ কল্যাণী দত্ত। প্রকাশক—দুর্গা দত্ত ! ৪১সি এস. পি. মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬। মূল্য দেড় টাকা।

কণ্ঠস্বর ॥ মুকুল গুপ্ত। গ্রন্থজগৎ। ৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট। কলকাতা-১২। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

তিনবেণীতে মোট আটাশটি কবিতা আছে। চার লাইনের ছোট কবিতা অটোগ্রাফ এবং পঞ্চশিলের মত বড় কবিতাও রয়েছে। প্রত্যেকটি কবিতা ভাল লাগে। ছোট ছোট কবিতাগুলি মনে হয় যেন পালিস করা হীরার টুকরো। ভূমিকায় কবি যে-সব কথা বলেছেন সেগুলো অবান্তর। কবির প্রতি, রোজনামচা, শ্রীমতী চৌধুরী এবং কপালকুণ্ডলা এই চারটি কবিতার মধ্যে কবিমানসের যে ছবি ফুটে উঠেছে তাতে আশা করি আরো প্রচুর কবিতা এবং ভাল কবিতা তাঁর কাছে আমরা পাব। শেলি, মির্জা গালিব, দশকুমারচরিত ইত্যাদি কবিতাও অনবদ্য। পড়তে পড়তে মনে হয় কবির মনে যেন নিজের ক্ষমতার ওপর একটা অহেতুক সন্দেহ আছে। কিন্তু যে কবি লিখতে পারেন, 'আমাকে দিয়েছ রাজা অগ্নিবর্ণ উজ্জ্বল শৃঙ্গার' তাঁর কল্পনা শক্তি মনে হয় অপরিসীম। 'কেতুন দেশী রাজপুতানী রাণী', 'হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে জাগোরে ধীরে' ইত্যাদি তাঁর ক্ষমতারই

স্বাক্ষর। দশকুমারচরিত অনবদ্য। 'মনিকুট্টমে রচনা করেছে দ্বিতীয় অমরাবতী'—উপমা প্রাচীন হলেও উজ্জ্বলতা একটুও মলিন হয় নি। 'কৌমারহর চৈত্রক্ষণা'য়—অদ্ভুত সুন্দর লাইন। কবি সুধীন দত্তের হাতে এত সুন্দর লাইন পেয়েছি কিনা মনে পড়ে না। পাণিনি, কাদম্বরী, শেলি, মির্জা গালিব ইত্যাদি, কবিতাগুলি সমালোচনা বটে। কিন্তু তবু অদ্ভুত সুন্দর।

নীলের পাঁচালী কবিতাটি এই সঙ্কলন থেকে বাদ দেওয়া উচিত ছিল। তাছাড়াও কবিতাটিতে Her moarphroditic amivalence রয়েছে; ফলে কবিতাটি দুর্বল হয়ে পড়েছে। নিজের প্রতি এটা নির্মম অবিচার এবং এর ফলে কবিতা কোনদিন কবিতা হয় না।

কপালকুণ্ডলা কবিতায় অধ্যাপক বিপুল বসু বিপুল বপু হলে মন্দ হত না। পঞ্চশিখ কবিতাটি ভাল। একটু বেশি বড় হয়ে গেছে। তিনবেণী ভাল লেগেছে।

কণ্ঠস্বর-এ সব সমেত সাতান্নটি কবিতা আছে। সূচীপত্রের পর চারলাইনের যে উদ্ধৃতি রয়েছে এর কোন অর্থ বুঝতে পারলাম না। কারণ এই চারটি লাইনের সঙ্গে মেলালে বইয়ের বাকি সাতান্নটি কবিতাই প্রহেলিকা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে এ উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন।

কবির কবিতাগুলি বেশিরভাগই দুর্বোধ্য। চিন্তাধারার অস্পষ্টতাই এর জন্য দায়ী মনে হয়। ছাপার ভুলও বেশ পীড়াদায়ক। মনে হয় কবিতাগুলি পরিমার্জিত করে দ্বিতীয় সংস্করণ করতে পারলে হয়তো ভাল হবে। এছাড়াও আরেকটি জিনিস প্রয়োজন। কোন কিছু ছাপার আগে নিজের পরিচিত এবং শ্রদ্ধেয়জনদের পড়ে শোনান, তাদের সঙ্গে আলোচনা করা এবং সেইমত পরিমার্জিত করলে যে ফল পাওয়া যায় সে কথা বোধহয় কেউ চিন্তা করেন নি।

'শবযাত্রীদল,' 'নতজানু,' এবং 'মারমুখ' যেন বেশ কয়েকবার ব্যবহার করা হয়েছে।

অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আনন্দে
উৎসবে...
প্রয়োজনে..
সবার মনোরঞ্জনে..
কেশতৈল
কেশরঞ্জন

ত্রয়োদশ বর্ষ ॥ ভাদ্র ১৩৭২
সমকালীন

পরিকল্পনার জন্যই স্বাধীনতা

স্বাধীনতা শুধু একমাত্র রাজনীতির লক্ষ্যই নয়, এর মানে হচ্ছে আমরা যেভাবে বাঁচতে চাই তার জন্য স্বাধীনতা, আমাদের দারিদ্রের উন্নতি সাধন করা এবং নিশ্চলতাকে সচল করা।

দেশকে উন্নত করার জন্য আমাদের শাসনতন্ত্রে বহুমূল্য আদর্শ আছে। এরই অনুধাবন করে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা লোকের দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান প্রয়োগ করা ও সঞ্চয় করতে সক্ষম করায় সাহায্য করেছে।

শেষের তিনটি পরিকল্পনা আমাদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করেছে—খাদ্যশস্যের সঙ্গে সঙ্গে টাটকা সব্জীর ফলন বাড়িয়েছে, শিল্পের উৎপাদন তিন গুণ বর্দ্ধিত করেছে ; পাঁচ দফায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বাড়ানো হয়েছে। সমস্ত পর্য্যায়ে শিক্ষা সংক্রান্ত সুবিধাদি বর্দ্ধিত হয়েছে। ১৯৫১ সালে যখন প্রাথমিক পর্য্যায়ে (৬ থেকে ১১ বছরের মধ্যে) ছেলেমেয়েরা স্কুলে যেত তাদের হার ছিল শতকরা ৪০% এখন তা শতকরা ৮০% তে পৌঁছেচে। উন্নততর চিকিৎসা বিধান এবং রোগের বিরুদ্ধে আক্রমনের ফলে দেশে ম্যালেরিয়া রোগের প্রকোপ কমেছে এবং মানুষের আয়ু ৩২ বছর থেকে ৫০ বছর অবধি বেড়েছে।

পরিকল্পনা মানেই অগ্রগতি

এর জন্য কাজ করুন ও সঞ্চয় করুন

DA 65/219 Bengali

ঝক্ ঝকে দাঁত
আর সুন্দর হাসি
SADHANA
DASAN
আয়ুর্বেদীয় মতে তৈরী আদর্শ দাঁতের মাজন
সাধনা
দশন

ত্রয়োদশ বর্ষ ৫ম সংখ্যা

ভাদ্র তেরশ' বাহাত্তর

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

ছোট পরিবার মানেই সুখী পরিবার

ছেলেমেয়েদের জন্য চাই শিক্ষা, উপযুক্ত আহার ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ। সেজন্য অভিজ্ঞ বাবা-মায়েরা তাঁদের লালন পালন করার মত ক্ষমতা অনুযায়ী সন্তান জন্ম দিতে চান।

জন্ম নিয়ন্ত্রণের কয়েকটি উপায় আছে, কিন্তু এর মধ্যে সবচেয়ে নতুন ও উৎকৃষ্ট উপায় হচ্ছে 'লুপ'—যা বছরের পর বছর ধরে নিরাপদে ও নিশ্চিন্ততায় ব্যবহার করা যায়। এ বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়।

এই সম্পর্কে জানতে হ'লে আপনার নিকটতম **কল্যাণমূলক পরিকল্পনা কেন্দ্রে** গিয়ে অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস-চিন্তা ও বাঙালী-সমাজ-মন

অলোক রায়

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে ইংরেজী-ভাবনার সংস্পর্শে ও সংঘাতে সমাজের উপর তলার শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে যে জাগরণ লক্ষিত হোলো, তার সঙ্গে য়োরোপীয় রেনেসাঁসের সাদৃশ্য যৎসামান্য। তবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, বাংলাদেশে ইংরেজী-শিক্ষিত যুবসম্প্রদায় পাশ্চাত্য ভাব সংঘাতে চঞ্চল হয়ে ওঠে, তাদের চিন্তায় ভাবনায় জাগরণের উন্মাদনা অত্যন্ত স্পষ্ট। এই-জাগরণই চিত্তকে বহুমুখী তথা বহির্মুখী করে তোলে। উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে অতীত ইতিহাসের প্রতি কৌতূহল, তথ্যাবিষ্কারে শ্রমস্বীকার, যুক্তিনিষ্ঠ মন নিয়ে প্রাচীনকে বিচার প্রভৃতি এই জাগরণেরই প্রত্যক্ষ ফল এবং অন্ততঃ এই একটি ক্ষেত্রে ইতালীয় রেনেসাঁসের অতীত-চারণার সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী জাগরণের সাদৃশ্য আছে। ইতালীয় রেনেসাঁসে 'হিউম্যানিজমের' বিকাশ প্রকৃত পক্ষে আধুনিক অর্থে মানবতা বা মানবপ্রেম নয়। রেনেসাঁসের ঐতিহাসিক "হিউম্যানিজমের" ব্যাখ্যায় লিখেছেন, "The major concern of the humanists was an educational, cultural programme based on the study of the classical Greek and Latin authors. In dealing with these texts they elaborated methods of historical and philological criticism which contributed greatly to the later developments of these disciplines." (The Renaissance Philosophy of man ; ed. by Ernst Cassirer, Paul. Oskar Kristeller & John Hernan Randoll, J. R,)

অবশ্য উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ভারতবর্ষের অতীত রাজনৈতিক ইতিহাস আবিষ্কারে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় এবং প্রত্নলিপি ও মুদ্রাঙ্কনের অর্থোদ্ধারে প্রথম এগিয়ে আসেন

য়োরোপীয় পণ্ডিতেরা। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধ থেকেই ভারতীয় ঐতিহাসিকেরা গবেষণা কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ কয়েকজন প্রত্নতাত্ত্বিক নূতন তথ্যাবিষ্কারে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক ছিলেন না, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস-বোধ ও অতীত-চারণা তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করা গেল। তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাস, বিশেষ করে বাঙালীর ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখলেন এবং বাঙালী জাতিকে অতীত সম্বন্ধে আগ্রহী করে তুললেন, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রথম শিক্ষা—বাঙ্গালীর ইতিহাস' (১৮৭৪) নামে ক্ষুদ্র স্কুল পাঠ্য গ্রন্থকে অবলম্বন করেই বঙ্কিমচন্দ্রের জাতির প্রতি সেই হৃদয়োদ্বেল আহ্বান, 'বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালীর ভরসা নাই, কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিব, আইস আমরা সকলে মিলিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের অনুসন্ধান করি।'

স্বীকার করাই ভালো, বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে উনবিংশ শতাব্দীতে ইতিহাস-চর্চা করা হয়েছে এবং শুধু আমাদের দেশে নয়, য়োরোপেও এই যুগের ঐতিহাসিকদের, '···point of view is usually an obvious matter of Patriotism or party." ইংরাজ ঐতিহাসিকদের ভারত-চর্চা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আত্মমহিমা ও আত্মগৌরব-চালিত। কখনো প্রজা-শাসনের উপায় হিসাবে শাসিত দেশ সম্বন্ধে আগ্রহ। অবশ্যই নিছক জ্ঞানপিপাসা এবং সত্যাবিষ্কারের প্রয়াস একেবারে ছিল না তা বলা যায় না, তবে স্বভাবতই বিদেশীর পক্ষে এই প্রয়াস অনেক সময়েই সীমাবদ্ধ সাফল্য লাভ করেছে। কিন্তু ভারতীয়দের মধ্যে ইতিহাসবোধ জাগ্রত হয় য়োরোপীয়দের রচনাপাঠ এবং উদ্যোগদর্শনে। সুতরাং তাঁদের প্রত্যক্ষ কৃতিত্ব সামান্য হলেও পরোক্ষ প্রভাব দূর প্রসারী। ভারতীয়রা যখন ইতিহাস চর্চায় মনোযোগ দিলেন, তখন তাঁদের মধ্যে জ্ঞানপিপাসা ও সত্যাবিষ্কারের প্রেরণা ছিল না তা নয়, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে যখন এই প্রয়াস লক্ষিত হোলো, তখন দেশাত্মবোধের উন্মাদনা তাঁদের রচনাকে বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত করে তুললো। বলাবাহুল্য দেশাত্মবোধের প্রেরণায় লেখা রচনা যে তথ্যসম্ভারে ঊনতা লাভ করবে, এমন কোন কথা নেই। লিভির (৫৯খ্রীঃ পূঃ—১৭ খ্রীষ্টাব্দ) রোমান প্রজাতন্ত্রের ইতিহাস একই সঙ্গে স্বদেশানুরাগ এবং তথ্যপ্রিয়তার উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস-চর্চা তাই উদ্দেশ্য প্রেরিত সন্দেহ নেই, কিন্তু তাতে অগৌরবের ও কিছু নেই। ঐতিহ্যানুরাগের সঙ্গে মিলেছিল অতীত রহস্যময় বর্ণাঢ্য যুগের রোমান্টিক সৌন্দর্য্য পিপাসা এবং প্রবন্ধে ও উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র যখন অতীতকে অবলম্বন করেন তখন তার মধ্যে রেনেসাঁস এবং রোমান্টিক যুগের প্রাচীনানুরক্তি প্রকাশ পায়। কিন্তু শুধু দেশকে ভালবাসা নয়, শুধু মোহময় অতীতকে খুঁজে পাওয়া নয়, সেই সঙ্গে বর্তমান-চেতনাও বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস-চর্চার কারণ। তিনিও জানতেন, 'Conscious present is the consciousness of the past.' এবং দেশকে জানতে হলে অতীত ও বর্তমানের যুগ্মপটেই স্থাপন করতে হবে। বর্তমানের সঙ্গে যোগ হারালে অতীতের কোন মূল্য নেই। অতীত যেখানে বর্তমানের সঙ্গে যুক্ত সেখানেই তা তাৎপর্য্যপূর্ণ।

আসলে "ইতিহাস" সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি বিশেষ ধারণা ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র যখন বলেন,

স্টুয়ার্ট, মার্শমান, লেথব্রিজ প্রভৃতির লেখা বাঙলার ইতিহাস গ্রন্থতে "বাঙলার ঐতিহাসিক কোন কথা আছে কি? আমাদিগের—বিবেচনায় একখানি ইংরেজী গ্রন্থেও বাঙ্গালার প্রকৃত ইতিহাস নাই। সে সকলে যদি কিছু থাকে, তবে যে সকল মুসলমান বাঙ্গালার বাদশাহ, বাঙ্গালার স্থবেদার ইত্যাদি নিরর্থক উপাধি-ধারণ করিয়া, নিরুদ্বেগে শয়ন করিয়া থাকিত, তাহাদিগের জন্ম মৃত্যু গৃহবিবাদ এবং খিচুড়িভোজন মাত্র। ইহা বাঙ্গালার ইতিহাস নয়, ইহা বাঙ্গালার ইতিহাসের এক অংশও নয়।" তখন এই উক্তির মধ্য দিয়ে শুধু ইংরেজ ঐতিহাসিকদের প্রতি কটাক্ষ বা মুসলমান শাসকদের প্রতি ব্যঙ্গ প্রকাশ পায়নি, প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র এখানে "ইতিহাস" সম্বন্ধে তাঁর বিশিষ্ট ধারণাই প্রকাশ করতে চেয়েছেন। রাজা-রাজড়ার জীবনবৃত্তান্ত দেশের ইতিহাস নয়। সমগ্র জাতির সঙ্গে যার যোগ নেই, তা সমগ্র দেশের ইতিহাস নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়, "কোন দেশের ইতিহাস লিখিতে গেলে সেই দেশের ইতিহাসের প্রকৃত যে ধ্যান, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা চাই, এই দেশ কি ছিল? আর এখন এই দেশ যে অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে, কি প্রকারে কিসের বলে এ অবস্থান্তর প্রাপ্তি, ইহা আগে না বুঝিয়া ইতিহাস লিখিতে বসা অনর্থক কালহরণ মাত্র।" (বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ)। বর্তমানের সঙ্গে অতীতের যোগের কথা এখানে স্পষ্ট করে বলেছেন এবং রাজা-রাজড়ারা এই যোগসূত্র নন, দেশের সাধারণ মানুষই প্রকৃত যোগসূত্র। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের "বাঙ্গালার ইতিহাস" গ্রন্থের প্রশংসাসূত্রে বঙ্কিমচন্দ্র নিজের ধারণাকে স্পষ্টতর করেছেন, "ইহা কেবল রাজগণের নাম ও যুদ্ধের তালিকামাত্র নহে; ইহা প্রকৃত সামাজিক ইতিহাস।'' বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস-চিন্তা তাই তাঁর সমাজ-চিন্তার সঙ্গে যুক্ত।

"নানাভাবে প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা করা যায়—প্রাচীন মুদ্রা, মূর্তি, পুঁথি-পুস্তক, লিপিলেখ, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ভগ্নাবশেষ, ভূগর্ভ হইতে খনিজ সৌধ শিলা সীল সরঞ্জাম ভূষণ বেশ অলঙ্কার প্রভৃতি উপকরণ সমূহের যুগপৎ বা পৃথক ব্যবহার দ্বারা। বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানতঃ প্রাচীন গ্রন্থাদির উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহার প্রত্নতথ্য নির্মাণ করিতেন।" (হীরেন্দ্রনাথ দত্ত: প্রত্নতাত্ত্বিক বঙ্কিমচন্দ্র; দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র—পৃঃ ১৫৫)। বলাবাহুল্য উনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্কিমচন্দ্র যখন ইতিহাস আলোচনা করেছেন, তখনো এদেশের অতীত ইতিহাস তথ্য-সমৃদ্ধ হয়ে উঠেনি। সারনাথ, সাঁচী, তক্ষশিলা, পাহাড়পুর, বেসনগড়ের শিলালিপি তখনো ঐতিহাসিকের তথ্যনির্ধারণে সহায়তা করেনি। ফার্গুসন, কানিংহাম, রাজেন্দ্রলাল মিত্র অবশ্য তখন থেকেই চেষ্টা করেছেন প্রত্নলেখ উদ্ধারের সাহায্যে ইতিহাস রচনার এবং যে সকল ক্ষেত্রে তা পাওয়া গেছে বঙ্কিমচন্দ্র সেখানে তাঁদের সিদ্ধান্ত সর্বদা মান্য করেছেন। আদর্শবাদ বা আবেগাতিশয্য বঙ্কিমচন্দ্রকে কখনোই তথ্যবিমুখ করেনি। আসলে উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে যে "বৈজ্ঞানিক ইতিহাস" রচনার প্রয়াস দেখা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

প্রাচীন গ্রন্থের সাক্ষ্য প্রমাণাদির উপরই বঙ্কিমচন্দ্রকে অধিক নির্ভর করতে হয়েছিল। "বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার" প্রবন্ধে বাঙলাদেশের সামাজিক ইতিহাস লেখবার প্রথম উদ্যম। স্বভাবতই এ ব্যাপারে

শতপথ ব্রাহ্মণ, মহাভারত এবং মনুসংহিতার বিবরণ তিনি গ্রহণ করেছেন এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নির্দেশিত সাল তারিখকে তিনি প্রামাণ্য বিবেচনা করেছেন।" "বাঙ্গালীর উৎপত্তি" প্রবন্ধে তথ্যের জন্য সেন্সাস রিপোর্ট এবং ডালটনের "Ethnology of Bengal" গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। কোন গ্রন্থ উল্লেখের সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র কখনোই অন্যের উদ্ধৃতি সহায় করে গ্রন্থ পরিচয় দিতেন না। তিনি নিজে সেই উদ্ধৃতিটি ভালো করে পড়ে বিচার-করে, তবেই তা থেকে প্রমাণ উদ্ধার করতেন। শুধু সংস্কৃত গ্রন্থাদি নয়, মেগাস্থিনিস বা মিন্‌হাজউদ্দীন রচনার ইংরেজী অনুবাদেরও তিনি সাহায্য নিয়েছেন। ম্যাকেঞ্জির সংগ্রহ-তালিকা, হাণ্টারের গবেষণা এবং ভাষাতত্ত্ব পর্য্যালোচনায় জোন্‌স্, প্লেচর ও ম্যাক্সমূলরের গ্রন্থাদি তিনি পড়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক প্রবন্ধে শ্লেগেল, লাসেন, বেন্‌ফী, স্পিজেল, রেনা, পিক্তা, মুর প্রভৃতি য়োরোপীয় ভারততত্ত্ববিদ্‌দের মতামতের উল্লেখ আছে। অর্থাৎ তাঁর হাতের কাছে যতখানি তথ্য ছিল, তিনি তাঁর সদ্ব্যবহার করেছেন। অনেকক্ষেত্রে সেযুগের অসম্পূর্ণ ইতিহাস তাঁর আলোচনার ক্ষেত্রকে সীমাবদ্ধ করেছে, এবং আধুনিক যুগে তা মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। যেমন সেন ও পাল রাজাদের সম্বন্ধে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের গবেষণার উপর তিনি নির্ভর করেছেন, কিন্তু আধুনিক গবেষণা রাজেন্দ্রলালের অনেক সিদ্ধান্তকেই নাকচ করেছে। এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র নিরুপায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের কতকগুলি বিশ্বাস বর্তমানে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। যেমন, সপ্তদশ অশ্বারোহীর বঙ্গবিজয় কাহিনীর অলীকতা, কিংবা বাঙালী মিশ্র জাতি, কিংবা মোগলযুগে বাংলার দুর্দশা। বলাবাহুল্য এ সকলক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রকে অসম্পূর্ণ তথ্যের সঙ্গে নিজের অনুমান শক্তিকে মেলাতে হয়েছিল। এবং ইতিহাস-রচনার পক্ষে এই ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও অনুমান একান্ত প্রয়োজন। "বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা" প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস জিজ্ঞাসা স্পষ্টতঃ কয়েকটি বিশেষ ধারায় চিহ্নিত হতে দেখি ; (১) বাঙ্গালী জাতি কোথা থেকে উৎপন্ন হল ? (২) পাল ও সেন রাজ্য কেমন করে একীকৃত হলো ? এবং মুসলমান কর্তৃক জয় পর্য্যন্ত এই হিন্দু শাসনের স্বরূপ কি ছিল ? (৩) তুর্কী আক্রমণের ফলাফল ও অবশিষ্ট স্বাধীন বাংলার অবস্থা কি ছিল ? (৪) পাঠান শাসনের সঙ্গে বাংলার রাজগণের সম্পর্ক কি ? (৫) ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলাদেশে নবজাগরণের প্রেরণা ও স্বরূপ কি ? (৬) বাংলা ভাষার উদ্ভব কোথা থেকে ? (৭) মোগলকর্তৃক বাংলাদেশ জয়ের ফলাফল কি ?

এই প্রসঙ্গগুলি বঙ্কিমচন্দ্র স্বতন্ত্রভাবে অনেক সময় আলোচনা করেছেন। এবং অন্ততঃ কয়েকটি প্রসঙ্গের যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা করতেও সক্ষম হয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাদেশের একটি ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করতে চেয়েছিলেন ; "বিবিধ প্রবন্ধের" ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলিকে সেই গ্রন্থের খসড়ারূপে গ্রহণ করলে ভুল করবো না। নানা অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্রের চেষ্টা সে যুগের পক্ষে অত্যন্ত প্রশংসনীয় ছিল, এবং তাঁর সাফল্য আংশিক হওয়া সত্ত্বেও তথ্যানুসন্ধান ও তথ্যবিশ্লেষণে তাঁর কৃতিত্ব স্বীকার্য্য।

তথ্যানুসন্ধান এবং তথ্যবিশ্লেষণ আপাতদৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

বলে মনে হয় বটে, কিন্তু ঐতিহাসিকও ইতিহাসের মতই দেশকালপাত্রের সীমায় আবদ্ধ, ফলে ইতিহাস-গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব সুমুদ্রিত। বিখ্যাত ঐতিহাসিক জে, বি, বিউরি প্রসঙ্গতঃ মন্তব্য করেছেন; 'Only such things as dates, names, documents can be considered purely objective facts. The reconstraction, which involves the discovery of cause and motives, which is the historian's business to attempt, depends on subjective elements, which can not be eliminated; Further, he can only realize, fully and vitally, the time in which he lives; this is really, however unconsciously, the starting—point of his travels in the ages of the past; he inevitably takes present values and modern measure with him; and the conscious allowances which he makes for difference of conditions cannot remove, though it may disguise or mitigate, this limitation of his mind." (Introduction; The Autobiography of Edward Gibbon. Oxford, 1907, p. xiv) বঙ্কিমচন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীর জিজ্ঞাসা এবং প্রত্যয় য়োরোপানুরাগ ও দেশাত্মবোধ, মানসচাঞ্চল্য ও আত্মস্থিতি এই যুগসঙ্কটের প্রেক্ষাপটে অবস্থান করে ইতিহাস পর্য্যালোচনা করেছেন। ফলে তাঁর ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলি স্বভাবতই কিছু পরিমাণে যুগচিহ্নিত। অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্র যে আদর্শবাদের দ্বারা যুগ-পথিকের গৌরব অর্জন করেছেন, সেই আদর্শবাদের প্রতিফলনও তাঁর প্রবন্ধে অনিবার্য।

দৃষ্টান্তস্বরূপ "বাঙ্গালীর বাহুবল" প্রবন্ধটির উল্লেখ করতে পারি। অতীত ইতিহাস পর্য্যালোচনায় প্রমাণিত হয়, "পূর্বকালে বাঙ্গালীরা যে বাহুবলশালী ছিলেন, এমত কোন প্রমাণ নাই।" কিন্তু শুধু এইজন্য প্রবন্ধটি লেখা হয়নি। আদর্শবাদী বঙ্কিমচন্দ্র বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ নিয়েই বেশী চিন্তিত এবং তাঁর সুনিশ্চিত ধারণা "যদি কখন (১) বাঙ্গালির কোন জাতীয় সুখের অভিলাষ প্রবল হয় (২) যদি বাঙ্গালি মাত্রেরই হৃদয়ে সেই অভিলাষ প্রবল হয় (৩) যদি সেই প্রবণতা এরূপ হয় যে, তদর্থে লোকে প্রাণপণ করিতে প্রস্তুত হয়, (৪) যদি সেই অভিলাষের বল স্থায়ী হয়, তবে বাঙ্গালির অবশ্য বাহুবল হইবে।"

কিংবা "ভারতকলঙ্ক" প্রবন্ধে ভারতবর্ষের পরাধীনতার কারণ অনুসন্ধান প্রসঙ্গে ভারতবাসীর মধ্যে স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তার ও জাতিপ্রতিষ্ঠা আকাঙ্ক্ষার অভাব নানা ঐতিহাসিক তথ্যদ্বারা প্রতিপাদিত হলেও, এই দুটি গুণ যে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভারতবাসীর একান্ত প্রয়োজনীয় তা বলাই লেখকের মূল উদ্দেশ্য। "ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা" প্রবন্ধেও লেখকের মীমাংসা এই যে, অতীত ভারতবর্ষের তুলনায় "আধুনিক ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীস্থ লোকের অবনতি ঘটিয়াছে, শূদ্র অর্থাৎ সাধারণ প্রজার একটু উন্নতি ঘটিয়াছে।" এখানে বঙ্কিমচন্দ্র সমন্বয়-ইচ্ছুক। অতীতের ভালো এবং বর্তমানের ভালো অংশটুকু মেলাতে হবে ভবিষ্যতের ভালোকে সম্পূর্ণতর করার জন্য।

জাতীয় চরিত্রগঠন এবং স্বাধীনতার স্বপ্ন বঙ্কিমচন্দ্রের মনে যে আবেগ সৃষ্টি করেছিল, ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলির তাই সঞ্চারী ভাব। ইংরেজ ঐতিহাসিকদের ভারতবর্ষের ইতিহাস

রচনায় আবেগের প্রয়োজন ছিল না। নিছক তথ্যানুসন্ধান এবং কদাচিৎ পক্ষপাতদোষে ব্যঙ্গোক্তি এই রচনাগুলিতে প্রকাশ পেয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাস রচনার আদর্শের জন্য অবশ্যই য়োরোপীয় ঐতিহাসিকদের দ্বারস্থ হয়েছিলেন, কিন্তু যুগগত এবং ব্যক্তিগত কারণেই তিনি সর্বদা পাশ্চাত্য মহাজনদের পদানুসরণ করতে পারেননি। তথ্যানুশীলনে তাঁর আগ্রহ কম নয়। কিন্তু তথ্যের জন্যই তথ্যানুশীলন তাঁর লক্ষ্য নয়। তথ্য এখানে আদর্শ প্রতিপাদনের সহায়ক। ঐতিহাসিক সত্য এখানে ব্যবহারিক সত্যের যোগেই সার্থক। উনবিংশ শতাব্দীর জার্মান ঐতিহাসিকদের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের এইখানে প্রেরণাগত সাদৃশ্য।

ঐতিহাসিক প্রবন্ধের সাহিত্যিক মূল্য আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু সাহিত্য রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়েই বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রবন্ধগুলি লেখেননি। ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কারই লেখকের উদ্দেশ্য। অথচ ইতিহাস রচনার-রীতি পদ্ধতি গ্রহণে বঙ্কিমচন্দ্র অস্থির। ফলে বক্তব্যের সীমিত তাৎপর্য্য, কিংবা স্ববিরোধ অনেক সময়ে অনিবার্য হয়েছে।

অবশ্যই আবার বলি, উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এই বাধা ছিল অনতিক্রম্য। "বাঙ্গালীর উৎপত্তি" প্রবন্ধটির সম্ভাবনা ছিল সবচেয়ে বেশী। "আর্যামীর" অন্ধতা সে যুগে বহু বিস্তার লাভ করেছিল, সে সময়ে ভাষাতাত্ত্বিক এবং নৃতাত্ত্বিক গবেষণার সাহায্যে "বাঙালী অমিশ্রিত বা বিশুদ্ধ আর্য নহে"—এই সিদ্ধান্ত মুক্ত দৃষ্টি ও যুক্তি প্রিয়তার নিদর্শন। "প্রথম কোল বংশীয় অনার্য, তারপর দ্রাবিড় বংশীয় অনার্য, তারপর আর্য, এই তিনে মিশিয়া বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি হইয়াছে"—একথা আধুনিক ঐতিহাসিকও স্বীকার করেন। হয়তো নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় এর সঙ্গে আদি নিগ্রিটো এবং পরবর্তী মোঙ্গলীয় জাতির মিশ্রণ যুক্ত হবে। বঙ্কিমচন্দ্র মিশ্রণকে মেনেছেন, কিন্তু তার মধ্যে যেখানে সীমারেখা টেনেছেন, সেখানেই গোলযোগ। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস "ব্রাহ্মণ অমিশ্রিত এবং বিশুদ্ধ আর্য সন্দেহ নাই" এবং "বাঙ্গালী শূদ্রের কিয়দংশ অনার্য্য সম্ভূত হইলেও অপরাংশ আর্য বংশীয়। কেহ বিশুদ্ধ আর্য, যেমন অম্বষ্ঠ, কায়স্থ; কেহ আর্য অনার্য উভয় কুল জাত; যেমন চণ্ডাল।" বলাবাহুল্য অমিশ্রিত বা বিশুদ্ধ আর্য বাংলাদেশে আছে, একথা যতখানি অভিমান প্রসূত, ততখানি নৃতাত্ত্বিক প্রমাণ সম্মত নয়।

উচ্চাভিমানের নিদর্শন অন্যত্রও আছে। "ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা" প্রবন্ধে প্রাচীন ভারতবর্ষের পরাধীনতা সত্ত্বেও উচ্চশ্রেণীস্থ লোকের সুখ বঙ্কিমচন্দ্রকে অতীত সম্বন্ধে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়েছে এবং বর্তমানে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং উচ্চশ্রেণীস্থ লোকের অবনতি ঘটিয়াছে, শূদ্র অর্থাৎ সাধারণ প্রজার একটু উন্নতি ঘটিয়াছে।"

পরাধীনতার সমর্থনে বঙ্কিমচন্দ্র যে কথাগুলি বলেছেন সেগুলিও স্ববিরোধীমনোভাবের পরিচয়। তিনি বলেছেন "পরাধীনতার একটি প্রধান ফল ইতিহাসে এই শুনা যায় যে, পরাধীন

জাতির মানসিক স্ফূর্তি নিবিয়া যায়। পাঠান শাসনকালে বাঙ্গালীর মানসিক দীপ্তি অধিকতর উজ্জল হইয়াছিল।" (বাঙ্গালার ইতিহাস)। এবং এরই সঙ্গে শুনবো। "ইংরেজ ভারতবর্ষের পরমোপকারী।…যে সকল অমূল্য রত্ন আমরা ইংরেজের চিত্তভাণ্ডার হইতে লাভ করিতেছি, তাহার মধ্যে দুইটির আমরা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিলাম—স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা এবং জাতি প্রতিষ্ঠা। ইহা কাহাকে বলে, তাহা হিন্দু জানে না।" (ভারতকলঙ্ক)। বলাবাহুল্য পরাধীনতা এবং স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা, মানসিক স্ফূর্তি এবং জাতি প্রতিষ্ঠা,—এদের সুদূর বিস্তারী ফলাফল আলোচনার সুযোগ—"বিবিধ প্রবন্ধ" গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র পান নি ॥

রবীন্দ্রনাথের চার অধ্যায়ঃ ইন্দ্রনাথ চরিত্র

শুভব্রত রায়চৌধুরী

চার অধ্যায় রচনার প্রায় বছর পনেরো ষোলো আগে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "পরম সত্যকে আমি কোনো নামের দোহাই দিয়া খণ্ডিত করিতে চাই নাই, ইহাতে আমার ধর্মনীতিকে নিজ্‌ঝে ও ট্রীটস্কের ইংরেজ ও এ দেশী শিষ্যগণ দুর্বলের ধর্মনীতি ও মুমূর্ষুর সান্ত্বনা বলিয়া অবজ্ঞা করিতে পারেন।" (কালান্তর/১০৭) এই অবজ্ঞার উত্তরেই হয়তো উত্তরকালে কবি সবল-নীতির একটি বলিষ্ঠ প্রতিনিধি সৃষ্টি করলেন। ইন্দ্রনাথ সেই প্রতিনিধি'।

ইন্দ্রনাথ কি বাস্তব? নাটক নভেলে আমরা সচরাচর বাস্তবকে খুঁজি। তাই অন্যান্য চরিত্রের মতো ইন্দ্রনাথের বেলাতেও আমাদের মনে স্বাভাবিক প্রশ্ন জাগে, সে কি অগ্নিযুগের কোনো এক সম্ভাব্য বিপ্লবীর নেতার বাস্তব প্রতিকৃতি? 'বাস্তব' বলতে আমরা তথ্যের অনুকৃতিকেই বুঝি। এ কথা শুরুতেই আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে যে, এই সংজ্ঞা অনুযায়ী ইন্দ্রনাথ বাস্তব নয়; তার মধ্যে কোনো সন্ত্রাসবাদী দলনায়কের প্রতিবিম্ব খুঁজতে গেলে আমাদের চেষ্টা বিফল হবে। ইন্দ্রনাথ চরিত্রের সাহিত্যিক মূল্য বাস্তবতায় নয়, সত্যতায়।

ইন্দ্রনাথ শক্তিমন্ত্রের উদ্‌গাতা। শক্তিমন্ত্রের মধ্যে এক অদ্ভুত মাদকতা আছে। অনেক প্রতিভার কাছে তার আকর্ষণ অনপেক্ষণীয়। ইতিহাসের পাতায় তারা শোণিত-রক্তিম স্বাক্ষর রেখে গেছে। ইন্দ্রনাথ তাদেরই জীবনবাদের এক উজ্জ্বল চিত্রকল্প।

শক্তিতত্ত্বের নানা ভাষ্য। নীট্‌শের মনীষা এই তত্ত্বকে এক অনবদ্য ভাবগম্ভীর কাব্যময় দার্শনিক রূপ দিয়েছে। তাঁর মতবাদের বৈশিষ্ট্য হল, শুষ্ক রুদ্র নির্মোহ নিষ্করুণ সাধনমার্গের নির্দেশ। নীট্‌শবাদের দাবি মানুষের অসাধারণত্বের কাছে; সে যেন মানুষকে চ্যালেঞ্জ জানায় "পারবে কি এই অসাধারণত্বের সাধনায় উত্তীর্ণ হতে?" যার উত্তর হবে নেতিবাচক, সে লক্ষকোটি মানুষ নামধেয় জীবের মাঝে একটি মাত্র সংখ্যা বই আর কিছুই নয়—আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ তার চিররুদ্ধ। কিন্তু যার প্রতিভায় আছে অগ্নিদীপ্ত সাহস ও শৌর্য, নীট্‌শে-নির্দিষ্ট দুর্গম সাধন-মার্গের অভিযাত্রী হবার যোগ্যতা একমাত্র তারই; সে ই শুধু যথার্থ মানুষ বলে পরিগণিত হতে পারে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হতে নীট্‌শের দর্শন যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল তার মূল কারণ হল, প্রতিষ্ঠাহীন প্রাণধারণের গ্লানি-মলিন মানুষের কাছে তাঁর এই অভিনব অসাধারণত্বের দাবির রোমান্টিক আবেদন কেবল যে ইউরোপকে প্রভাবিত করেছিল তা নয়, পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত অনেক ভারতবাসীর মনেও আলোড়ন জাগিয়েছিল।

আত্মপ্রশস্তি প্রসঙ্গে নীট্‌শে বলেছিলেন, "I am not a man, I am dynamite." এই উক্তিটি যদিও তাঁর স্ফীতকায় অহমিকার অভিব্যক্তি, এর মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায় তাঁর অন্তরতম অভিলাষের ইঙ্গিত। তিনি চেয়েছিলেন, প্রচলিত ভাপসা ঘুণধরা শ্যাওলা-পড়া সাবেকী সমাজ ব্যবস্থার ভিৎটাকে তাঁর শক্তিতত্ত্বের আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্যে ভেঙে চুরে গুড়িয়ে দিতে। তিনি

কল্পনা করেছিলেন শক্তিমন্ত্রে-দীক্ষিত এমন এক শূর-অধ্যুষিত সমাজ, এক বীরভোগ্যা বসুন্ধরা, যেখানে গড্ডালিকাপ্রবাহের দৈনন্দিন ঈর্ষা-কলহ-ক্ষুদ্রতার কালিমা নেই। গড্ডালিকাধর্মী সাধারণ মানুষের উপর নীট্সের কোনো আস্থা বা প্রীতি ছিল না। তাঁর শক্তিবাদে জনসাধারণের কোনো ঠাঁই নেই। তিনি বলেছেন, "Life is a fountain of delight, but when the rabble also drinks all wells are poisoned.' যারা জনতার পর্যায়ভুক্ত, তারা দুর্বল সংকীর্ণচেতা ঈর্ষাপরায়ণ পরশ্রীকাতর প্রতিভাদ্বেষী। তাদের একমাত্র লক্ষ্য হল উপরকে নীচে নামানো, উর্ধ্বগতিকে প্রতিহত করা। অতএব, যে-সমাজব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের প্রতিপত্তি, সেখানে প্রতিভা অবদমিত, প্রগতির পথ রুদ্ধ ; সেখানেই ধুয়ো ওঠে, 'সকল মানুষ সমান'। তিনি স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন, "I do not want to be confused will those preachers of equality, nor taken for one of them. For justi:e speaks thus to me. 'Men are not equal.' নীট্শের আদর্শ সমাজে দুর্বলের অত্যাচার নেই, প্রতিভাহীনের ঈর্ষা-কুলষিত উৎপীড়ন নেই, নেই পরশ্রীকাতরের প্রতিহিংসার উন্মাদনা। সে সমাজে বাস করবার অধিকার আছে কেবল প্রকৃত মানুষের। নীট্শের চোখে প্রকৃত মানুষ একমাত্র সে-ই যার মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠে Will to Power। মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিকে প্রকাশ করার নামই প্রতিভা। আপন শক্তি সম্বন্ধে সচেতনতা প্রতিভার লক্ষণ। মানুষের ইতিহাস প্রতিভার বৈপ্লবিক অভ্যুদয়ের কাহিনী।

বিবর্তনে নীট্শের কোন বিশ্বাস ছিল না। তাঁর মতে, বর্তমান যুগের মানুষ এক বিষম দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হয়েছে। আত্মরক্ষার একটিমাত্র পথ—এক নূতন সভ্যতা ও সংস্কৃতির আশু প্রবর্তন। শিক্ষাদীক্ষার বিবর্তমান মাধ্যমে এই নবযুগের অভ্যুদয় ঘটানো সম্ভব হবে না। এর জন্য চাই এক নূতন শাসকশ্রেণীর আবির্ভাব, যে শ্রেণী গঠিত হবে উন্নততর প্রতিভাদীপ্ত বলদৃপ্ত মানুষ নিয়ে। এটা অবশ্যই দুরূহ সাধনার পথ। কিন্তু নীট্শে তাঁর ভাবশিষ্যদের কাছ থেকে দুরূহ সাধনার নিষ্কম্প নিষ্ঠা আশা করেন ; কারণ তারা অসাধারণ, অনমনীয় তাদের দৃঢ়তা, দুর্জয় তাদের বীর্যপ্রমাণের আগ্রহ। তাদের সম্বন্ধে তিনি বলেছেন :

"The type of disciples—to such men as concern me in a way I wish suffering, desolation, sickness, ill-treatment, indiguities of all kinds. I wish them to be acquainted with profound self-contempt, with the martyrdom of self-distrust, with the misery of the defeated : I have not pity for them ; beacuse I wish them to have the only thing which to day proves whether a man has any value or not, the capacity of sticking to his guns." কঠিনতম ব্যাঘাত, দুঃসহ দুর্দৈব, দুঃখ নিন্দা অপযশ সব কিছু তাদের মাথায় ঝরে পড়বে, তবু কর্তব্যের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা তবু হাল না ছাড়ার দৃঢ়তা। এমন দুঃখে-নিন্দায় অবিচলিত নিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন ভাবালুতার মোহমুক্তি। যা হৃদয়কে দুর্বল করে, সংকল্পকে ঘোলাটে করে, তা শক্তিসাধনার পরিপন্থী। এমন অনেক মন-ভেজানো হৃদয়বৃত্তি আছে বর্তমান সমাজে যেগুলিকে সত্ত্বগুণের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। স্নেহ প্রেম মায়া-মমতা, সনাতনী ন্যায়-অন্যায়-বোধ—এগুলি জনগণমানসে কীর্তিত হয়ে থাকে। কিন্তু নীট্শের

শক্তিতত্ত্বে তারা মেয়েলী প্যানপ্যানানি ছাড়া আর কিছুই নয়। তাদের স্যাঁতসেঁতে প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়াই শক্তিব্রত মানুষের একমাত্র লক্ষ্য। শক্তি সাধককে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেছেন, "I reckon overcoming of pity as noble." দুরন্ত নির্ভীকতা, আরাম-বিমুখতা, কঠিন সংকল্প-নিষ্ঠা, অটল আত্মসংযম—এই বীরোচিত গুণগুলিকে সম্বল করে মানুষকে অসাধারণত্বের সাধনায় ব্রতী হতে হবে।

প্রতিভা-বিকাশের দুরূহ সাধনায় মানুষ যেদিন সফল হবে, সেদিন সে হবে অমিত শক্তির অধিকারী, সেদিন তার মানুষ নাম সার্থক। শুধু তাই নয়, সেদিন সে তার 'মানুষত্ব'কে জয় করে Superman রূপে প্রকাশ পাবে। সে তখন নরশূর—সাহস ও আত্মবীর্যের প্রতিমূর্তি। তার সংজ্ঞা দিয়ে নীট্‌শে বলেছেন, "A 'Superman' is a man who has 'overcome' man—that is, himself." প্রথম দর্শনেই Superman-এর রূপটি ত্রাসের সঞ্চার করে। কী কুলিশকঠোর অদ্ভুত নির্বেদন শুষ্ক রূঢ় বজ্রবাঁধা ব্যক্তিত্ব! তিনি জানতেন সেকথা, তাই বিদ্রূপ করে বলেছেন, "Your souls are so unfamilar with what is great that the Superman would be fearful to you in his goodness! And you wise and enlightened men, you would flee from the burning sun of wisdom in which the Superman joyfully bathes his nakedness.,' এই কুলিশকঠোর ভয়ংকরতাই নীট্‌শের কাছে প্রকৃত মানবীয় আদর্শ। শৌর্যের সাধনা—সে তো আর ভাবের বাসরশয্যা নয়। যে বড়, সে-ই তো ভয়ংকর। "Terribleness belongs to greatness; let us not deceive ourselves."—এই তাঁর মন্ত্রণা।

নীট্‌শের আমলে শক্তিতত্ত্বের আর-একজন জনপ্রিয় ভাষ্যকার হলেন ট্রিট্‌স্‌কে। তাঁর চিন্তাধারায় অবশ্য নীট্‌শের দার্শনিক গভীরতা বা খরতাপ সত্যানুসন্ধিৎসার সাক্ষাৎ মেলে না। এক উগ্র জাতীয়বাদী রাষ্ট্রনীতির সংকীর্ণ পরিপ্রেক্ষিতেই ট্রিট্‌স্‌কে-বাদ আখ্যাত হইয়াছে। তখন ছিল গরমপন্থী জাতীয়তাবাদী আদর্শের রাষ্ট্রিক সম্প্রসারণের যুগ। ইউরোপে যারা সেই আদর্শের বুদ্ধিজীবী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, ট্রিট্‌স্‌কে তাঁদের অন্যতম।

রাষ্ট্র এবং ক্ষমতা: ট্রিট্‌স্‌কের কাছে এরা অভিন্নহৃদয়। জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠাই রাষ্ট্রিক সত্তার একমাত্র উদ্দেশ্য। এই প্রতিষ্ঠার জন্য ক্ষমতার অনুশীলন একটিমাত্র পথ। তাই, ক্ষমতা-প্রিয়তা রাষ্ট্রনীতির মূলমন্ত্র। ক্ষমতাপ্রিয়তার সঙ্গে কতকগুলি লক্ষণ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তারা হল: নির্মম উচ্চাভিলাষ, অনমনীয় সংকল্পশক্তি। ট্রিট্‌স্‌কে ইতিহাসকে এই ক্ষমতা অনুশীলনের প্রয়াস বলেই মনে করেন। তাঁর কাছে "The features of history are virile. unsuited to sentimental or feminine nature." সারা ইতিহাস শুধু জাতির শক্তিপরীক্ষার খেলা। সেখানে দুর্বলের কোনো আসন নেই। তিনি বলেছেন, "The ruling nations are not so much the races rich in mental endowment, but rather those whose peculiar gift is force of character." যতই আত্মিক উৎকর্ষ লাভ করুক না কেন, জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে সে উৎকর্ষের কোনো সার্থকতা নেই। কারণ, জাতিকে তথা রাষ্ট্রকে শেষ পর্যন্ত শক্তির সাহায্যেই জয় করে নিতে হবে স্থান, স্বীকৃতি ও সম্মান।

এই শক্তিভিত্তিক জীবনবাদের পরিপ্রেক্ষিতে ইন্দ্রনাথের ব্যক্তিমানস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, একদিক থেকে সে নীট্‌শের ভাবশিষ্য। তার আদর্শের সঙ্গে Snperman-এর আদর্শের প্রকৃতিগত সাদৃশ্য আছে। আবার, ট্রিট্‌স্‌কের প্রভাবও বেশ স্পষ্ট। সবলনীতির 'পরে ইন্দ্রনাথের বিশ্বাস সেই প্রভাবের ফল। কি বিদেশে কি দেশে, সেই যুগে উগ্র জাতীয়তাবাদীরা বিশ্বাস করতেন, একমাত্র মাংসপেশীর জোরই হল জাতীয় ঐতিহাসিক মর্যাদার পরিমাপ।

ইন্দ্রনাথ জ্ঞানী গুণী মানী কৃতবিদ্যপুরুষ। "দেশের ছাত্ররা তাঁকে মানত রাজচক্রবর্তীর মতো। অসাধারণ তাঁর তেজ, আর বিদ্যার খ্যাতিও প্রভূত।" (চা. অ.) ইউরোপ থেকে সে সায়ান্সে খ্যাতি অর্জন করে এসেছে। যোগ্যতা অনুসারে "যথেষ্ট উঁচুপদে প্রবেশের অধিকার তাঁর ছিল; য়ুরোপীয় অধ্যাপকদের প্রশংসাপত্র ছিল উদার ভাষায়।" (চা. অ. | ১৪) এ হেন ইন্দ্রনাথ অত্যন্ত আত্মাভিমানী হবে, তাতে আর আশ্চর্য কি। অহংকার তার শোভা পায়। সুদূর বিদেশে সে খ্যাতি ও সাফল্য লাভ করতে পেরেছে। সেই কৃতিত্ব সম্পূর্ণ তার পুরুষকারের। কুল, দৈব বা অনুগ্রহের আনুকূল্য তার সাফল্যের পথকে মসৃণ করে দেয় নি।

জ্ঞান গুণ চরিত্রবল রূপ—সকলের সম্মিলিত প্রভাবে ইন্দ্রনাথ এমন এক ঋজু লৌহকঠিন ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়েছে "যার মধ্যে আছে একটা কঠিন আকর্ষণশক্তি। যেন একটা বজ্র বাঁধা আছে সুদূর ওর অন্তরে, তার গর্জন কানে আসে না, তার নিষ্ঠুর দীপ্তি মাঝে মাঝে ছুটে বেরিয়ে পড়ে।" (চা. অ. | ২০) অদ্ভুত তার আত্মসংযম—"কড়া কথা বলতে বাধে না কিন্তু হেসে বলে; গলার স্বর রাগের বেগেও চড়ে না, রাগ প্রকাশ পায় হাসিতে।" (চা. অ. | ২১) ইন্দ্রনাথের "দৃষ্টিতে কঠিন বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, ঠোঁটে অবিচলিত সংকল্প এবং প্রভুত্বের গৌরব।" অটল তার আত্মবিশ্বাস। লোকের কাছে অনায়াসে দুঃসাধ্য রকমের দাবি করতে পারে; সে জানে তার দাবি সহজে অগ্রাহ্য হবে না। ইন্দ্রনাথ দলপতি; সাধারণের কাছ থেকে সে যেন বহুদূরে এক অগম্য শিখরে বিরাজ করে; তার চারিদিকে দুর্বোধ্যতার রহস্যজাল। "কেউ জানে তার বুদ্ধি অসামান্য, কেউ জানে তার শক্তি অলৌকিক তার 'পরে কারো আছে সীমাহীন শ্রদ্ধা, কারো আছে অকারণ ভয়।" (চা. অ. | ২১)

এমন একজন পুরুষসিংহ যদি দেশে ফিরে জীবিকার পথগুলিকে বন্ধ দেখতে পায়, তার মানসিক প্রতিক্রিয়া অনুমান করা কঠিন হবে না। ইউরোপ প্রবাসকালে ইন্দ্রনাথ একজন "পলিটিক্যাল বদনামী"র সংশ্রবে এসেছিল। এই ঘটনাটি স্বদেশে তার চাকরী পাওয়ার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। আপন দেশেই জায়গা মিলল না তার। অথচ সে নিশ্চিত জানত, "অন্য যে-কোনো দেশে সম্মান লাভের শক্তি" ছিল তার প্রচুর। অবশ্য শেষ পর্যন্ত "বিদেশী সুপারিশে" একটা অধ্যাপনার কাজ জুটল বটে, কিন্তু সেও এক "অযোগ্য অধিনায়কের অধীনে! অযোগ্যতার সাথে ঈর্ষা থাকে প্রখর, তাই বৈজ্ঞানিক গবেষণার চেষ্টা উপরওয়ালার হাত থেকে ব্যাঘাত পেতে লাগল পদে পদে।" (চা. অ. | ১৪) এখানে জনান্তিকে বলা যেতে পারে, কবির এই মন্তব্যের মধ্যে অধুনাখ্যাত পরিহাস-বিজল্পিত Parkinson's Law নামধেয় তত্ত্বটির কি এক সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়? অযোগ্যতা আর ঈর্ষা মিলে যে মারাত্মক রোগটির উৎপত্তি হয়,

Prof Parkinson তার নাম দিয়েছেন "Injelititis."। এই রোগের লক্ষণ বর্ণনাপ্রসঙ্গে অনুপম চাঁচাছোলা ভাষায় তিনি বলেছেন : "If the head of the organisation is second rate, he will see to it that his immediate staff are third-rate, and they will, in turn, see to it that their subordinates are fourth-rate." একটি প্রামাণিক তত্ত্ব সন্দেহ নেই! ইন্দ্রনাথের যুগেও যেমন সত্য ছিল, আজও তাই! যাই হোক অযোগ্য অধিনায়কের অধীনে "অধ্যাপনার চিরাভ্যস্ত চাকা ঘুরিয়ে" জীবনটাকে পেনশনের দরজায় কোনরকমে পৌঁছে দেওয়া—এমন স্যাঁতসেঁতে ইচ্ছে ইন্দ্রনাথের মত আত্মাভিমানী উচ্চাভিলাষী প্রতিভাবান পুরুষের মনে কখন প্রশ্রয় পেতে পারে না। তার প্রমাণ পাওয়া যায় কানাই গুপ্তের কাছে যখন সে বলে, "ওরা চারদিকের দরজা বন্ধ করে আমাকে ছোট করতে চেয়েছিল, মরতে মরতে প্রমাণ করতে চাই আমি বড়ো।" (চা, অ. | ৩৯)

ছোট জায়গায় তাকে মানায় না, ছোট কাজের জন্য তার জন্ম নয়, বিরাট সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি আছে তার প্রতিভায়—ইন্দ্রনাথের এই আত্মপ্রত্যয় সুদৃঢ়। প্রকাণ্ড কর্মক্ষেত্রই তার ব্যক্তিত্ববিকাশের একমাত্র স্থান। প্রাত্যহিকের বাঁধাধরা নির্জীব জীবনে তার পথিকৃৎ পুরুষকার কখনো আত্মতৃপ্তির পথ খুঁজে পাবে না। রাষ্ট্রবিপ্লবের ঐতিহাসিক বিক্ষোভের মাঝে সে খুঁজে পেল তার শক্তি সাধনার যজ্ঞভূমি, আত্মপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র। ইন্দ্রনাথের এই বড়ত্বের স্বপ্ন ও সাধনা : এটা নীট্‌শের Superman এর চরিত্রগুণ। তাই দেখা যায়, যা-কিছু সাধারণ তার প্রতি ইন্দ্রনাথের তাচ্ছিল্যভরা ঔদাসীন্য। দুর্বল নমনীয় পেলব চরিত্রের প্রতি তার নির্মম অবজ্ঞা। তারা কাপুরুষ, তাদের জীবনের কোনো সার্থকতা নেই। অমন ব্যক্তিত্বহীন বীর্যহীন জীব সাধনার পথে বিঘ্ন। পথ হতে তাদের সরিয়ে ফেলার মধ্যে নিষ্ঠুরতা থাকতে পারে, কিন্তু নীতিভ্রংশতা নেই। শক্তি-উপাসনার দীক্ষা শুরু হয় নিষ্ঠুরের সাধনায় "শক্তির গোড়ায় নিষ্ঠুরের সাধনা, শেষে হয়তো ক্ষমা।" (চা. অ. | ১৯) শক্তিতত্ত্বের ভাষ্য শুনতে শুনতে বিহ্বল হয়ে এলা ইন্দ্রনাথকে বলে, "আপনি নিষ্ঠুর!" এতে কিন্তু ইন্দ্রনাথ বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না; তার নিষ্ঠুরতার সমর্থনে যুক্তি দেখায়, "কেন না মানুষকে যে বিধাতা ভালবাসেন তিনি নিষ্ঠুর, জন্তুকেই তিনি প্রশ্রয় দেন।" (চা. অ. | ২২) নীট্‌সের উক্তি মনে আসে, "There is nothing so merciless as the mercy of God." শিষ্যদের প্রতি ইন্দ্রনাথের নির্দেশ "দয়ামায়ার জলাজমি পেরিয়ে গিয়ে শক্ত ডাঙায়" দাঁড়াতে হবে। সেখানে অনুকম্পা প্রেম স্নেহ মমতা এই ভাবালু হৃদয়বৃত্তিগুলির প্রবেশাধিকার নেই। কর্তব্যসাধনের প্রয়োজনে নির্মমতা বাঞ্ছনীয় এবং সংগত। "দয়ামায়া বিসর্জন দেবার স্বপক্ষে গীতার নজির দেখিয়ে ইন্দ্রনাথ এলাকে উপদেশ দেয়, "শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই কথাটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন। নির্দ্দয় হবে না কিন্তু কর্তব্যের বেলা নির্ম্মম হোতে হবে।" (চা, অ. | ১৮) বিপদ যে কোনো দিক থেকে যে কোনো সময়ে আসতে পারে। "সমস্ত নিদারুণ সম্ভাবনা প্রত্যহ কল্পনা করে নিজেকে প্রস্তুত রাখতে হবে।" এই প্রস্তুতির একটা কঠিন পরীক্ষা হল—যা কিছু প্রিয়, প্রয়োজন হলে, নির্মোহ মন নিয়ে তাকেও বিনাশ করা। এই পরীক্ষায় এলার যোগ্যতা যাচাই করবার জন্য ইন্দ্রনাথ তাকে সোজাসুজি প্রশ্ন করে, "যদি কখনো সে (অতীন) আমাদের সকলকে বিপদে ফেলে, তাকে নিজের হাতে মারতে পারো না?" (চা. অ. | ২৯)

ইন্দ্রনাথের শুষ্ক রুদ্র জীবনবাদে দু'একটা কমনীয় হৃদয়বৃত্তির যে একেবারে ঠাঁই নেই তা নয়। কিন্তু যে-মুহূর্তে সে হৃদয়বৃত্তি কর্তব্যবোধকে ঘোলাটে করে দেবে, তখনি তা গর্হিত অপরাধ। প্রেম সম্বন্ধে ইন্দ্রনাথের ধারণাকে এই পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার করতে হবে। নারী শক্তিরূপিণী। শক্তির সাধনায় নারী প্রেরণার উৎস। তাদের উদ্দেশে সে বলে, "তোমরা বলে থাকো—মেয়েরা মায়ের জাত, কথাটা গৌরবের নয়। মা তো প্রকৃতির হাতে স্বতই বানানো। জন্তুজানোয়াররাও বাদ যায় না। তার চেয়ে বড়ো কথা তোমরা শক্তিরূপিণী, এইটেকেই প্রমাণ করতে হবে দয়ামায়ার জলাজমি পেরিয়ে গিয়ে শক্ত ডাঙায়। শক্তি দাও, পুরুষকে শক্তি দাও।" (চা. অ. | ১৯) মেয়েরা প্রেরণার উৎস বলেই ইন্দ্রনাথ তাদের দলে টেনে এনেছে। এটা তার আগুন নিয়ে খেলা। কানাই গুপ্ত যখন জানতে চায় এলার মত সুন্দরীকে কেন সে দলভুক্ত করল, ইন্দ্রনাথ উত্তর দেয় "কানাই, এতদিনে আমাকে তোমার বোঝা উচিত ছিল। আগুনকে যে ভয় করে সে আগুনকে ব্যবহার করতে পারে না। আমাদের কাজে আগুনকে বাদ দিতে চাইনে।" (চা. অ. | ৩৭) নেভানো মন নিয়ে দেশের সেবা চলে না, এটা ইন্দ্রনাথের কাছে একটা মৌলিক স্বীকার্য। সেইজন্যই মেয়েদের হাতের রক্তচন্দনের ফোঁটার প্রয়োজন ; সেই ফোঁটা ছেলেদের মনে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। "আমরা কামিনীকাঞ্চনত্যাগী নই। যেখানে কাঞ্চনের প্রভাব সেখানে কাঞ্চনকে অবজ্ঞা করিনে, যেখানে কামিনীর প্রভাব সেখানে কামিনীকে বেদীতে বসিয়েছি।" (চা. অ, | ২৬) কিন্তু বেদীতে বসে কামিনী যদি অসম্বৃত ব্যবহার শুরু করে, যদি কর্তব্যে প্রেরণা না দিয়ে মন-পোড়ানোর কাজে ব্যাপৃত হয়, তখন সেই কামিনীবিশেষ বিপজ্জনক এবং অবশ্য বর্জনীয়। ইন্দ্রনাথের কাছে ভালোবাসার সার্থকতা কর্তব্যসাধনের প্রেরণায়, আত্মসুখসন্ধানী ভোগলিপ্সায় নয়। সুতরাং ভালবাসাও এক শুষ্ক রুদ্র-রূপের সাধনা যা কেবল অসাধারণ ব্যক্তিমানসের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু এই উত্তুঙ্গ আদর্শের চূড়া থেকে ভালোবাসা যখন নেমে আসে সংসারলিপ্সার সমতলভূমিতে, তখন সে হৃদয়দৌর্বল্যের উৎস। তখন সে একটা ছোঁয়াচে রোগের সমগোত্রীয়। সুকুমার ছেলেটি দলের অমূল্য সম্পদ। তাকে ভালোবাসে উমা। পাছে উমার মোহমুগ্ধ ভালোবাসা সুকুমারের "মতো উঁচুদরের পুরুষের মনে বিভ্রম" ঘটায়, তার জন্য ইন্দ্রনাথ উমার বিয়ের স্থির করে ফেলল নিষ্কণ্টক ভালোমানুষ ভোগীলালের সঙ্গে। কারণ, "জঞ্জাল ফেলবার সবচেয়ে ভালো ঝুড়ি বিবাহ।" এলা জানতে চায়, এ কি ভালোবাসার শাস্তি। ইন্দ্রনাথ তাকে বুঝিয়ে দেয়, "ভালোবাসার শাস্তির কোনো মানে নেই। তা হোলে বসন্ত রোগ হয়েছে বললেও শাস্তি দিতে হয়। কিন্তু গুটি বেরোলেই ঘর থেকে বের করে রোগীকে হাঁসপাতালে পাঠানোই শ্রেয়।" (চা. অ. | ২৩) ছোঁয়াচে রোগের স্পর্শে দলের ভিতরে হৃদয়দৌর্বল্যের ব্যাধি অবাধ্য হয়ে বিস্তার লাভ করে, এ কোন্ দলপতির কাছেই বা কাম্য।

শক্তিসাধনার অন্যতম লক্ষ্য হল সাধারণ মানুষের মধ্যে অসাধারণ শক্তির সঞ্চার করা। সাধারণ জীবনের রুটিন-বাঁধা পৌনঃপুনিকতার মধ্যে যখন দুঃসাধ্য-সাধনের আহ্বান পৌঁছায় তখন এক অলৌকিক সাড়া জাগে—ছোট্ট নদীর বুকে যেন সমুদ্রের ডাক। ঘরের কোণের ভীরু দুর্বল শান্তিপ্রিয় মানুষও দুর্বার হয়ে ওঠে সেই ডাকে। এমন করে ডাকবার ক্ষমতা ছিল ইন্দ্রনাথের।

সাধারণের মধ্যে অসাধারণকে সৃষ্টি করতে পারত তার সম্মোহনী শক্তি। কানাই গুপ্তের কাছে অহংকার করে সে বলে, "তোমাকে বাইরে থেকে একদিন দেখতে ছিল সামান্য কিন্তু তোমার অসামান্যকে আমি প্রকাশিত করেছি। রসিয়ে তুললুম তোমাদের, মানুষ নিয়ে এই আমার রসায়নের সাধনা।" (চা. অ. | ৩৯) তার আহ্বান যে সাধারণ মানুষের মর্মস্থলে গিয়ে পৌঁছয় তার কারণ, তাদের কাছে সে কাঙালের মত কিছুই চায় না। সে তাদের ডাক দেয় "অসাধ্যের মধ্যে, ফলের জন্যে নয়, বীর্যপ্রমাণের জন্যে।" (চা. অ. | ৪০) ইন্দ্রনাথের বিশ্বাস, "দাবীর জোরেই দাবী সত্য হয়।" তাই তাদের কাছে সে যখন বীর্যপ্রমাণের দাবি জানায়, তারা সংকটের কল্পনা ছেড়ে সংকোচের বিহ্বলতা কাটিয়ে আলস-শয়ন-বিলগ্ন আত্মসুখের মোহজাল ছিন্ন করে ছুটে আসে, প্রমাণ করতে চায় তারাও বীর। তখন ক্ষয়-ক্ষতি দুঃখ-দুর্যোগ তাদের দমিয়ে রাখতে পারে না ; মৃত্যুকেও তারা উপেক্ষা করে হাসিমুখে।

ইন্দ্রনাথের কাছে এই ঘুম-ভাঙানিয়া কাজটাই বড় বলে মনে হয়। নিত্য যার অপমান-অবহেলা, সেই পরাধীন দেশের বুকে মরবার মতো সাহস ও শক্তি সঞ্চার করার চেয়ে বড কাজ আর কি হতে পারে। "গোলামি-চাপা এই খর্ব্ব মনুষ্যত্বের দেশে মরার মতো মরতে পারাও যে একটা সুযোগ।" (চা. অ. | ৩৯) তন্দ্রালস মনকে জাগিয়ে দেবার পরে কি হবে, ইন্দ্রনাথের কাছে সে প্রশ্ন অবান্তর। হার কি জিৎ, তা বিচার করবে ইতিহাস। ইতিহাস গতিচঞ্চল। সেখানে উত্থান আছে পতন আছে, হার আছে জিৎ আছে—কিন্তু ঘুমিয়ে থাকা নেই। যে সময় সারা পৃথিবী জুড়ে ইতিহাসের হিসাবনিকাশ চলেছে পুরোদমে, তখন শুধু আমাদের দেশটাই "সৌভাগ্যের চির সত্ব নিয়ে ইতিহাসের উঁচু গদীতে গদিয়ান হয়ে বসে থাকবে পরাভবের সমস্ত কারণগুলোর গায়ে সিঁদুর চন্দন মাখিয়ে ঘণ্টা নেড়ে পূজো করতে করতে" !—সে হয় না। ইন্দ্রনাথ এই ভেবে তৃপ্ত যে আত্মতুষ্ট সুষুপ্ত দেশটার বুকে সে এক ঐতিহাসিক জাগরণের প্রাণচাঞ্চল্য এনে দিয়েছে। এখানেই তার কাজ শেষ।

কিন্তু যারা জাগল, যারা দুঃসাধ্য সাধনের ব্রত গ্রহণ করল, তাদের আছে ফললাভের আশা জয়ের স্বপ্ন। কানাই গুপ্তের মুখে তাদের আশা আকাঙ্ক্ষার গোপন কথাটা শুনতে পাওয়া যায় : "ফলের লোভ যে আছে আমাদের, তোমার না থাকতে পারে। তোমারি দালালদের মুখে একদা শুনেছিলুম Elixir of life হয়তো মিলতে পারে। তোমার সর্ব্বনেশে রিসার্চ্চের চক্রান্তে গরীব আমরা ধরা দিয়েছি নিশ্চিত আশারই টানে, অনিশ্চিতের কুহকে নয়। তুমি এটাকে দেখছ জুয়োখেলার দিক থেকে, আমরা দেখছি ব্যবসার সাদা চোখে।" (চা. অ. | ৩৮) এই ফললোভী মনোবৃত্তি ইন্দ্রনাথের কাছে অসহনীয়। যারা যোগ দিয়েছে মরণপণ সাধনায়, তাদের মন হবে নিষ্কাম। নিশ্চিত পরাজয় জেনেও যদি তারা সংগ্রামে নামতে পারে তবেই তাদের প্রচেষ্টা যথার্থ মহত্বের গরিমায় ভাস্বর হয়ে উঠবে। ইন্দ্রনাথের জীবনবাদের যে একটা নিঃস্পৃহ নির্মোহ নৈর্ব্যক্তিকতা আছে তার প্রধান কারণ, কর্মফলের প্রতি গভীর অনাসক্তি। সাধনাটাই বড়, কর্মটাই প্রধান, সংগ্রামই সত্য। তারপর "মা ফলেষু কদাচন"। সাধারণ জীবনে ফললাভের লোভই হল সমস্ত কর্মের আদিম প্রেরণা, অধ্যাবসায়ের অঙ্কুশ। ফলের আশা যখন পরাহত হয়, তখন সাধারণ মানুষ

রিক্তমনা নিরুৎসাহ নিশ্চেষ্ট নির্জীব। কিন্তু যারা এগিয়ে এসেছে বীর্যপ্রমাণের অনন্যসাধারণ সাধনায় তাদের কাছে সাধনাই প্রথম ও শেষ কথা ; দুরূহ প্রচেষ্টার উদ্দীপনাই তাদের একমাত্র প্রবর্তনা। বিপ্লবের গহনজটিল ঘনপিচ্ছিল পথচলাতেই তাদের আনন্দ। সে পথের শেষ কি আছে, এমন প্রশ্ন তো আত্মঘাতী। ফলের আশাই তো হৃদয়দৌর্বল্য। ইন্দ্রনাথ বিশ্বাস করে, তার শিষ্যেরা ফলচিন্তা বিসর্জন দিয়েই বিপ্লবের পথে পা বাড়িয়েছে। তারা কি জানে না এটা হারের খেলা! নিশ্চিত পরাজয় জেনেও তারা বিপর্যয়ের পথে পা বাড়িয়েছে শুধু অসাধারণ বীর্যপ্রমাণের দাবিতে। এখানেই তাদের মহত্ত্ব। ফললাভের স্থূল স্পর্শে আবিল হয়ে ওঠে এই মহত্ত্ব। ইন্দ্রনাথ কানাই গুপ্তকে তিরস্কার করে বলে, "তোমরা কি খোকা! মাঝ-দরিয়ায় যে জাহাজের তলা গিয়েছে সাত জায়গায় ফাঁক হয়ে, কেঁদে কেটে মন্ত্র পড়ে কর্ত্তার দোহাই পেড়ে তাকে বাঁচাতে পারবে?" (চা. অ. | ৪১) এমনতরো হারের খেলায় মহিমা কোথায়? ইন্দ্রনাথ সে মহিমার এক অপরূপ সুন্দর ছবি আঁকে, "তোমরা ক-জন জেনে শুনে সেই ডুবো জাহাজেই ঝড়ের মুখে সাংঘাতিক পাল তুলে দিয়েছ, তোমাদের পাঁজর কাঁপেনি। এমন যে-কজনকে পাই ডুবতে ডুবতে তাদের নিয়েই আমাদের জিত। রসাতলে যাবার জন্যে যে-দেশ অন্ধভাবে প্রস্তুত তারি মাস্তলে তোমরা শেষ পর্যন্ত জয়ধ্বজা উড়িয়েছ, তোমরা না করেছ মিথ্যা আশা, না করেছ কাঙালপনা, না কেঁদেছ নৈরাশ্যে হাউ হাউ করে। তোমরা তবু হাল ছাড়োনি যখন জলে ভরেছে জাহাজের খোল। হাল ছাড়াতেই কাপুরুষতা—বাস্, আমার কাজ হয়ে গেছে তোমাদের যে-ক'জনকে পেয়েছি তাদেরই নিয়ে।" (চা. অ. | ৪১)

এমন ঘুম-ভাঙানো ভয়-তাড়ানো হাল না ছাড়া নিষ্কাম কর্মোদ্যমের মধ্যে কি কোনো যৌক্তিকতা আছে? এ কথা অস্বীকার করা চলে না যে, প্রত্যেক বিপ্লবীকেই নির্মোহ হতে হয়। বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের সাফল্যকামনায় বিপ্লবী যে-পথ বেছে নেয় সে-পথ নীতির দিক থেকে শ্রেয় কি না এই প্রশ্ন সম্বন্ধে বিপ্লবী সম্পূর্ণ উদাসীন। তার বিশ্বাস ends justify means সম্বন্ধে শুচিবোধের মোহ থাকলে তার পক্ষে গোপন বীভৎসতার পথে চলাচল অসম্ভব। কারণ, সনাতন নীতিবোধের ভিজে নরম মাটির উপর দিয়ে বিপ্লবের রথ চলতে পারে না। নিষ্ঠুরের সাধনায় নির্মোহ মন অপরিহার্য। কিন্তু এ মোহাবসান শুধু কি কেবল means-এর বেলাতেই প্রযোজ্য—ends-এর বেলায় নয়? বিপ্লবীর ধ্রুবতারা—লক্ষ্যে পৌঁছনো তা যেমন করেই হোক না কেন। লক্ষ্যই তার কাছে একমাত্র আরাধ্য বিগ্রহ, একাগ্রচিত্ত সাধনার একমাত্র বিষয়। লক্ষ্যলাভ অনিশ্চিত, এমন নৈরাশ্যব্যঞ্জক মনোভাব তার কাছে কখনোই আমল পেতে পারে না। হারজিতের প্রশ্নটা তাই বিপ্লবীর কাছে বড় : আজ না হয় হার হল, কিন্তু কাল জিত অবশ্যম্ভাবী। এই আশা বিপ্লবীর মনে অনির্বাণ জ্বলে। এ বিষয়ে কোনো বিপ্লবীই ইন্দ্রনাথের মতো নির্মোহ নৈর্ব্যক্তিক হতে পারে না। বাস্তবতার দিক থেকে ইন্দ্রনাথের চরিত্রে এটা একটা ত্রুটি।

সত্যের দিক থেকে বিচার করলে কিন্তু ইন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী যুক্তিসংগত বলেই বোধ হবে। পথ সম্বন্ধে নির্মোহ কিন্তু লক্ষ্য সম্বন্ধে মোহমুগ্ধ—বিপ্লবদর্শনের এটা একটা আন্তঃবৈষম্য। সমস্ত মন প্রাণ ভরে উঠল লক্ষ্যের চিন্তায়, সব আশা আকাঙ্ক্ষা বেড়ে উঠল লক্ষ্যকে ঘিরে, উন্মত্ত উদ্দীপনায়

মানুষ ছুটল লক্ষ্যের অভিমুখে ডাইনে বাঁয়ে দৃষ্টি না দিয়ে। তারপর সে জানল, পরাজয় সুনিশ্চিত—সে নেমেছে আশাহীন কর্মের উদ্যমে। সেই পরিস্থিতিতে তার প্রতিক্রিয়া অনুমান করা কঠিন নয়। ভাঙা আশার ছড়িয়ে-পড়া টুকরোগুলো তখন তার পায়ে বিঁধবে প্রতি পদক্ষেপে। সেটা তার আত্মিক মৃত্যুর মুহূর্ত।

ভাবাবেগের দ্বারা প্রাণিত আন্দোলনে অনেক সময়েই অপমৃত্যু ঘটে। আবেগের আগুন যখন নিভে যায়, উৎসাহ তখন জলুনী-শেষের ছাই। এমন অপমৃত্যুর দৃষ্টান্ত ইতিহাসে অনেক আছে। ঐতিহাসিক ও মনস্তাত্ত্বিক সত্য সম্বন্ধে ইন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ অবহিত। তাই সে চেয়েছে বিপ্লবদর্শনের আন্তর্বিরোধিতাকে দূর করে তাকে যুক্তিবাদের শক্ত মাটিতে প্রতিষ্ঠিত করতে। সেইজন্য তার বিপ্লববাদে মোহের স্থান নেই কোথাও—না পথের বেলায় না লক্ষ্য লাভের আশায়। ইন্দ্রনাথ যথার্থই নিষ্কাম কর্মের উদ্যোক্তা। যেখানে ইন্দ্রনাথের সত্যকারের জোর, সেইখানেই তার বিপ্লববাদের অভিনবত্ব। তার জোর কোথায় সে কথা কানাই গুপ্তকে বোঝাতে গিয়ে ইন্দ্রনাথ বলে, "আমি অবিচার করব না, উন্মত্ত হব না, দেশকে দেবী বলে মা মা বলে অশ্রুপাত করব না, তবু কাজ করব, এতেই আমার জোর!" (চা. অ. | ৪৩) তার শিষ্যদের সামনে ইন্দ্রনাথ তুলে ধরেছে বীর্যপ্রমাণের আদর্শ, যে আদর্শ ভাবাবেগের হিস্টিরিয়া নেই, ফলাফলের লোভ নেই, হার-জিতের প্রশ্ন নেই—আছে শুধু কঠিন সাধনার নিষ্কম্প সংকল্প। জয়ের লোভে নয়, কানাই গুপ্ত যাকে বলে "দেউলে হবার Sublime আকর্ষণ। সেই আকর্ষণই তাদের নিষ্কাম কর্মযোগের প্রেরণা জোগায়। এই অভিনব বিপ্লববাদের কাছে ঘৃণা রাগ ইত্যাদি প্রবৃত্তিগুলি দুর্বলতার প্রতীক। শত্রুর 'পরে রাগ করে প্রতিহিংসার নেশায় উন্মত্ত হয়ে আঘাত হানতে গেলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে হয়। এ যেন মাতাল হয়ে লড়াই করতে নামা। "যে জোয়ান মদ খেয়ে চোখ লাল না করলে লড়তে পারেই না, সেই গ্রাম্যকে আমি অবজ্ঞা করি। রাগের মাথায় কর্তব্য করতে গেলে অকর্তব্য করার সম্ভাবনাই বেশি।" (চা. অ. | ৪২) লোকচরিত্র-অভিজ্ঞ ইন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে এই সত্যটি স্বতঃসিদ্ধ। তাই তার অনুশাসন : শত্রুকে নির্মোহ মন নিয়েই মারতে হবে, "রাস্তায় পাথর পড়ে থাকলে তার বিরুদ্ধে হাতিয়ার চালাই যেমন করে, অপ্রমত্ত বুদ্ধি নিয়ে।" (চা. অ. | ৪৩) বিদেশী শত্রু ভালো কি মন্দ, সে প্রশ্ন বাহ্য। "ওদের রাজত্ব বিদেশী রাজত্ব, সেটাতে ভিতর থেকে আমাদের আত্মলোপ করছে—এই স্বভাববিরুদ্ধ অবস্থাকে নড়াতে চেষ্টা করে" আমরা আমাদের মানবস্বভাবকে স্বীকার করি। এটাই হল মুক্তি সংগ্রামের মর্মকথা; প্রতিহিংসার চরিতার্থতা নয়। এই প্রসঙ্গে, নিম্নমুখী চিত্তবৃত্তির প্রতিহিংসাপরায়ণতার সমালোচনা করে নীট্‌শে যে উপদেশ দিয়েছেন সেটা উল্লেখযোগ্য : "Thus, however, I advise you, my friends : Mistrust all in whom the urge to punish is strong."

শত্রুকে ঘৃণা করব না, ফলের আশা ছেড়ে দেব—তবে কোন্ প্রেরণায় সংগ্রাম চালাবো বিরাট ক্ষতিকে স্বীকার করেও? ইন্দ্রনাথের একটিই উত্তর : দুরূহ সাধনার নিষ্ঠুর সৌভাগ্যের আহ্বানে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুন যুদ্ধ করেছিলেন জয়ের আশা নিয়ে নয়, যুদ্ধ করাটা ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য বলে। ইন্দ্রনাথের আশা, তার বিপ্লবী শিষ্যেরা তারই মতো বিশ্বাস করবে, "ঐতিহাসিক মহাকাব্যের

সমাপ্তি হতে পারে পরাজয়ের মহাশ্মশানে। কিন্তু মহাকাব্য তো বটে।" (চা. অ. | ৩৯)

ইন্দ্রনাথ এবং অতীন্দ্রেনাথের মধ্যে এক জায়গায় মিল পাওয়া যায়। দুজনেই বিশ্বাস করে তাদের প্রচেষ্টা শুধু হারের খেলা। যার সঙ্গে গায়ের জোরের পরীক্ষায় নেমেছে, মল্লযুদ্ধে তাকে হারানো সম্ভব নয়। কিন্তু এই পরাজয়ের মূল্যায়নে তাদের মধ্যে আকাশপাতাল তফাৎ। অতীন্দ্রের কাছে এই পরাজয়টা গ্লানিকর, শুধু পরাজয় হিসেবে নয়—আত্মার পরাভব বলেই। কিন্তু ইন্দ্রনাথ মনে করে এই পরাজয়টাই বড়, কারণ তার মধ্য দিয়েই গোলামি-চাপা দেশটার আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠা পাবে—"পরাভবের আশঙ্কা আছে বলেই স্পর্দ্ধা করে তাকে উপেক্ষা করে আত্ম-মর্যাদা রাখতে হবে। আমি তো মনে করি এইটেই আজ আমাদের শেষ কর্তব্য।" (চা. অ. | ৪৪)

ইন্দ্রনাথ একটি অনন্য সাধারণ চরিত্র সৃষ্টি। অহিংসা—শান্তি—সৌভ্রাতৃত্বের কবি যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং অনুকম্পা নিয়ে হিংসাশ্রয়ী বিপ্লবের মূল্যায়ন করেছেন, তা কেবল রবীন্দ্রনাথের মতো এক অতলান্তিক মহানুভাবক মানবিক চেতনার পক্ষেই সম্ভব। মৃত্যু যাদের ভ্রুকুটি করেছে অবিরাম তবু যাদের বুক কাঁপেনি, শিকলভাঙার পণ নিয়ে আরাম তুচ্ছ করে যারা দেশের আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেদের অকাতরে উৎসর্গ করেছে—তাদের মৃত্যুঞ্জয়ী সাহসের পিছনে একটা আদর্শের দুর্বার প্রেরণা আছে এ কথা স্বীকার করেছেন। এবং সেই আদর্শকে সংবেদনশীল মন দিয়ে রূপায়নের প্রয়াস পেয়েছেন। বিপ্লবীর ভুলের মধ্যেও যে নিবাত-নিষ্কম্প আদর্শনিষ্ঠার বিষাদগম্ভীর মহিমা আছে, তা বলিষ্ঠ রেখায় রূপায়িত হয়েছে ইন্দ্রনাথের চরিত্রে। চার অধ্যায় যে পক্ষপাত-দোষদুষ্ট সাহিত্যকীর্তি নয়, ইন্দ্রনাথ তার সুসংগত সুসম্বদ্ধ দৃষ্টান্ত।

প্রাচীন বাঙলা কাব্যে ত্রিধারা

সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাচীন বাঙলা কাব্য প্রধানত তিনটি ধারায় প্রবাহিত। মঙ্গলকাব্য, পদাবলী (বৈষ্ণব, পরে শাক্ত), আর তথাকথিত অনুবাদ-কাব্য। এ-ছাড়া অবশ্য আরও দু-একটি ধারা আছে। সংখ্যা আর আয়তনে বিপুল মঙ্গলকাব্য বাঙলা সাহিত্যের অনেকখানি জুড়ে আছে। জুড়ে থাকারই কথা। কেননা এর কারবার সমকালীন জীবন নিয়ে। তথ্যবহুল এ রচনাগুলি তৎকালীন বাঙালী জীবনের বস্তুধর্মী ইতিবৃত্ত, কবিতার আকারে লেখা। একে কথাসাহিত্যই বলা যায়। সেকালের সৃষ্টি বলেই অনিবার্যভাবে ছন্দোবন্ধে লিখিত। একাল হলে রচিত হতো বিশুদ্ধ গদ্যে। তার মানে এই নয় যে সব মঙ্গলকাব্যই সর্বাংশে গদ্যাত্মক। কিছু কাব্যের ছিটেফোঁটা সুবিপুল রচনার এখানে ওখানে অবশ্যই আছে। কবিবিশেষের রচনায় বলিষ্ঠ কল্পনা এবং সাবলীল স্বতস্ফূর্ত রসাবেগের রীতিমতো পরিচয়ও পাওয়া যায়। তবু সমগ্রভাবে মঙ্গলকাব্য গদ্যগন্ধী। মন্থর পয়ার ছন্দ তার স্বভাবসুলভ ভারবহন ক্ষমতায় বিপুল বিষয়ের বোঝা বয়ে নিয়ে এসেছে।

মঙ্গলকাব্য প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙালী জন জীবনের ইতিহাস। সেকালের ভাগ্যবিড়ম্বিত বাঙালী জাতির জীবন-বিপর্যয় এতে রূপ পেয়েছে। সমগ্র কাব্যধারায় জাতীয় জীবনের এক অন্ধকারাচ্ছন্ন সুদীর্ঘ পর্ব স্তরে স্তরে রূপায়িত। একদিকে তুর্কীর আগমনে শোচনীয় মর্মান্তিকতা, অন্যদিকে সমাজের অঙ্গে অঙ্গে রোগের আক্রমণে চারিত্রশক্তির একান্ত পরাভব, সব জড়িয়ে এক ম্লান, মসীলিপ্ত অধ্যায়। ঘরেবাইরে সেই প্রভূত অমঙ্গলের ছবি 'মঙ্গলকাব্য' নাম নিয়ে প্রকাশিত। অদৃষ্টের পরিহাস একেই বলে। ঘা-খাওয়া, ঘুণধরা জীবন দিকে দিকে ভয় ও বিভীষিকার ছবি দেখেছে। সেই ভয় সেই বিভীষিকাই জন্ম দিয়েছে মধ্যযুগের অজস্র অর্বাচীন দেবদেবীর। চণ্ডী, মনসা, শীতলা, ষষ্ঠী, দক্ষিণ রায়, ওলাবিবি। প্রত্যয়হারা দুর্বল চিত্তের পরাশ্রয়ী বৃত্তিই এঁদের জন্মের মূলে। অস্থিরমতি দেবতার রোষ এবং তোষ জীবনের বিনাশ এবং সমৃদ্ধির মূলে এই বোধটাই মঙ্গলকাব্যের সর্বত্র প্রকাশিত। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে নায়ক কালকেতুর 'কপাট বিশাল বুক', কিন্তু সে বুকে প্রত্যাশিত বলিষ্ঠ হৃৎস্পন্দনের বড় অভাব। তার 'দুই বাহু লোহার শাবল' কাল্পনিক দেবীর স্বেচ্ছাচারের সামনে দীনভাবে কৃতাঞ্জলিবদ্ধ। মঙ্গলকাব্যের জটিল অরণ্যে মানুষ-নামধারী জীবগুলি মনুষ্যত্বহারা, দুর্বল পশুর মতোই অন্ধকারে বিচরণশীল। শুধু সেই অন্ধকারের মধ্যে একটি প্রবল পুরুষের দৃপ্ত ব্যক্তিত্বের সন্ধান মেলে যার শির-দাঁড়া সোজা ছিল। আবিল ভাবকতার গদগদ ভাষণের ভীড়ে তার একক কণ্ঠের বজ্রনির্ঘোষ কানে আসে। মনসামঙ্গলের চাঁদসদাগর সেকালের সর্বব্যাপী ভীরুতার মূর্ত প্রতিক্রিয়া। যেন কাব্যকারের লেখনীমুখে সে-যুগের অবমানিত শ্রেয়বোধ এবং অবদমিত পুরুষকারের বিদ্রোহী চরিত্ররূপে অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব। কিন্তু আমাদের ভাগ্যদোষে সে পুরুষ যুগের অতি সাবধানী ভীরু চিত্তের সমর্থনলাভে বঞ্চিত। তাই এমন একটি চরিত্রকেও কাব্যশেষে লাঞ্ছিত ও ধিকৃত হতে দেখা যায়। শৈব চন্দ্রধরের অশিব শক্তির বিরুদ্ধে

বিদ্রোহকে দেবী মনসা অর্থাৎ একচক্ষু একদেশদর্শী সমাজ ক্ষমা করে নি, স্পর্ধিত ধৃষ্টতা বলেই গণ্য করেছে।

মঙ্গলকাব্য বিপুলায়তন। সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্র এমনকি দৈনন্দিন জীবনের ব্যবসা-বাণিজ্য, আহার বিহার, শিক্ষা-দীক্ষা, সাজসরঞ্জাম, আচার আচরণ কিছুই এতে বাদ পড়ে নি। এ কাব্য জাতীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এক একটি মঙ্গলকাব্য যেন এক একটি ভারবাহী বজরা। এমনি অসংখ্য বজরা সেকালের প্রভূত তথ্য বহন করে একালের ঘাটে এসে পৌছেচে। সেই তমসাচ্ছন্ন যুগে কেমন বরে নানা বিশ্বাস, নানা আচার নানা ধর্ম পরস্পরের সঙ্গে একাকার হয়ে এক বিচিত্র বিমিশ্রতার স্থষ্টি করেছে। মঙ্গলকাব্যে তার কৌতূহলদ্দীপক ছবি পাওয়া যায়। তাই এ কাব্যের যে দাম তা বস্তুত ততোখানি কাব্যিক নয়, যতোখানি ঐতিহাসিক।

গীতিকাব্যধারাই প্রাচীন ও মধ্যযুগের (আসলে পুরো বাঙলা সাহিত্যেরই) প্রধান ধারা। এক একটি জাতির এক একটি বিশেষ মানসপ্রবণতা থাকে। বাঙালীর প্রবণতা গীতিকাব্যের দিকে। এই ভাষায় তার মনের কথা, প্রাণের কথা যেমন করে বলা হয়, তেমন আর কোনো ভাষায় নয়। অতি দূর কাল থেকেই এই প্রবণতাটি ধরা পড়েছে তার সাহিত্যে। অনেকে বলেন চর্যাপদ থেকেই। চর্যাপদ গীতিকাব্য নয়, ছন্দোবন্ধ পদ্যে দর্শন তত্ত্বের বাণী। বাঙালীর গীতি-প্রাণতার প্রথম পরিচয় মেলে প্রাকৃত সাহিত্যে। তারপর গীতগোবিন্দে। জয়দেবই বাঙলা গীতিকাব্যসাহিত্যের প্রেরণার উৎস, উত্তরকালের বাঙালী গীতিকবিদের আদিপুরুষ।

আমরা বলেছি মঙ্গলকাব্য বাঙালী-জীবনের ইতিহাস। সে ইতিহাস অনেকটাই বহিরঙ্গীয়। অন্তরঙ্গ ইতিহাসকে পাই গীতিকাব্যে। বহির্জীবনের অজস্র আঘাত সংঘাতে নাড়া খেয়ে বিচিত্র ক্রিয়াকর্মে সাড়া দিলেও বাঙালী যেন অনেকটা অন্তরবাসী। নিজের নিভৃত হৃদয়ের মধ্যেই সে বাস করে বেশি। তাই গীতিকাব্যেই তার প্রাণের খাঁটি পরিচয়টি মেলে। শুধু ব্যক্তিজীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডীতে নয়, জাতীয় জীবনের বৃহৎ বেষ্টনীতে বড় বড় ঘটনাগুলি তার অন্তরে যে আলোড়ন তুলেছে, তার সার্থক চিহ্ন পড়েছে গীতিকাব্যেই, অন্যত্র নয়। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব যখন মৃত বাঙলার মাটিতে উজ্জীবনের নতুন জন্ম আনল, তখন সেই বিপুল জীবনোচ্ছ্বাস গীতিকাব্যের স্ফটিক-স্বচ্ছ দর্পণে যেমনটি প্রতিফলিত হয়েছে, আর কোথাও তেমন হয় নি। ইতিহাসের সেই মহা অধ্যায়টির নাড়ীর স্পন্দন এ কাব্যেই শোনা যায়।

বিষয়টিকে আর একদিক থেকে দেখা যাক। মঙ্গলকাব্যে সমকালীন বাঙালীজীবনের প্রতিবিম্ব, আর বৈষ্ণবসাহিত্য চিরকালীন বাঙালীমনের প্রতিমূর্তি। প্রথমটিতে দুর্দৈবপীড়িত জীবনের জড়ত্বের বন্ধনটাকেই রূপ দেওয়া হয়েছে, দ্বিতীয়টিতে প্রকাশ পেয়েছে মুক্তি অভীপ্সা। অব্যবহিত পারিপার্শ্বিক যে সামাজিক অবস্থা, তাকে উল্লঙ্ঘন করে এক বিরাট আনন্দের ও মুক্তির ক্ষেত্রে উপনীত হওয়াই এর লক্ষ্য। দিকে দিকে অন্যায়ের উচ্ছৃঙ্খলতায় সহস্র সমূলক ও অমূলক শঙ্কায় যে-জীবন দুর্বল ও পঙ্গু, কাল্পনিক ইচ্ছাময়ী শক্তির চরণে আত্মোৎসর্গ করে দিয়ে যে ত্রাণ চেয়েছে, মঙ্গলকাব্যে তারই ইতিবৃত্ত রচিত। পক্ষান্তরে বৈষ্ণব পদাবলী মুক্তিকামী মুক্তিপ্রিয় মনের আনন্দ-বিহার। এখানে মানুষ দুর্বল নয়, দুর্জয় শক্তি সে নিজের মধ্যেই আবিষ্কার করেছে, যার

উৎসভূমি প্রেম, দুটি মানুষের সম্বন্ধে যার জন্ম। এবং এই মানুষই প্রেমের আলোতে সমস্ত বিশ্বকে দেখেছে, দেখেছে ঈশ্বরকে। বৈষ্ণবকাব্য মঙ্গলকাব্যের একেবারে উল্টো পিঠ। একটিতে রহস্যময় দেব-দেবীর অনিশ্চিত অনুগ্রহ, অন্যটিতে লীলাময় দেবতার সুনিশ্চিত অনুরাগ। একটিতে শঙ্কাজটিল জগতে মহত্তমের শাসন; অন্যটিতে প্রেমের জগতে আনন্দরূপের লীলা। নিরীক্ষার এই পার্থক্য কী অঘটনই না ঘটাল। যাঁর কাছে ভয়ে ভয়ে স্তাবকতা চলত গদগদ চাটুবাক্যে, তাঁকেই অসঙ্কোচে অনায়াসে ভক্তাধীন বলে রায় দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা রইল না। সঙ্গে সঙ্গে দূরদর্শী বুদ্ধিমানের অতিভক্তি সাধকহৃদয়ের সহজ ভক্তিতে এবং ফলাকাঙ্খ পূজা অহৈতুক আত্মনিবেদনে রূপান্তরিত হল। মঙ্গলকাব্যে যে দেবতাকে অপার ঐশ্বর্যের প্রভূত ক্ষমতার অতি দূর রাজত্বে নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল, সমস্ত ঐশ্বর্য কেড়ে নিয়ে বৈষ্ণবকাব্য তাকেই কাঙাল করে ছাড়ল। এ এক দুঃসাহসী ব্যাপার। মঙ্গলকাব্যের ঐশ্বর্যপ্রিয়তা বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় চরম দীনতাকে মহিমান্বিত করে তুলল।

সমকালীন মহিমাহীন ম্লান জীবনের পঙ্কস্তর থেকে এই যে ঊর্ধ্বায়ন আমরা বৈষ্ণব সাহিত্যে লক্ষ্য করি, পূর্বেই উল্লেখ করেছি, এর সগোত্র না হলেও অনুকূল ভাবনার আভাস মঙ্গলকাব্যেরই একটি প্রান্তভাগে দেখা গেছে। গৌরবহীন জীবনের গুমোট আবহাওয়ায় হাঁপিয়ে ওঠা প্রাণের অস্বস্তি ও অধৈর্য নিয়েই দেখা দিয়েছিল বণিক চন্দ্র ধর, যে সমকালীন জীবনের যবনিকায় আচ্ছন্ন, কালের পুচ্ছগ্রাহী মানুষ নয়, সত্য, স্বতন্ত্র মানুষ। সেও মঙ্গলকাব্যিক পরিমণ্ডলের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া। কিন্তু সেখানে বৈষ্ণবকাব্যের মতো সহজ প্রয়াণ নেই। থাকার কথাও নয়। কেন না সে তো বদ্ধ জটিল জীবনের ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত সুরের জগৎ নয়, প্রাণপণ চেষ্টায় প্রান্তবর্তী হলেও ঐ অনভিপ্রেত জীবনের কঠিন বৃত্তেই বদ্ধ। তাই প্রতিক্রিয়া এখানে দেব-মানবের মধুর সুস্থ সম্বন্ধে উত্তীর্ণ হতে পারে নি, শুধু প্রচণ্ড বিদ্রোহে ফেটে পড়েছে। এক দিকে মূক মূঢ় বশ্যতার অসহজ, অবাঞ্ছিত সম্বন্ধ, অন্যদিকে প্রেমের তৃপ্তিময়, শান্তিময় বাঞ্ছিত সহজ সহযোগ, চন্দ্র ধরের দ্রোহবুদ্ধি এই দুই কোটির মাঝখানটিতে অবস্থিত, উভয় প্রান্ত থেকেই সমান দূরবর্তী।

সেকালের বাঙালী জীবনকে জানতে গেলে মঙ্গলকাব্য ও পদাবলী এই দুইকে মিলিয়ে দেখা দরকার। অনিশ্চয়তার আশঙ্কায় ভীত, সন্ত্রস্ত মানুষের চিত্তদৈন্য, মঙ্গলকাব্যে যার প্রকাশ, তা সত্য। তাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে 'আরও সত্য' এই যে, রাষ্ট্রিক, সামাজিক অকথ্য অত্যাচার ও বিচিত্র বিক্ষোভের মধ্যেও বাঙালী চিত্তের একটি স্বাধীন স্বরাট রূপ ছিল, মানব প্রেমে ভগবৎ প্রেমে যে উদ্‌বোধিত, উদ্‌বেজিত হয়েছে। একদিকে মঙ্গলকাব্যের তুচ্ছ প্রাত্যহিকতার অনুজ্জ্বল জীবনযাত্রার ছবি, অন্যদিকে বৈষ্ণব কাব্যের অমিত আস্পৃহার উদাত্ত সঙ্গীত, উভয়ের যুগ্মরূপে এক বিসঙ্গত সত্য প্রকাশমান যার মধ্যে যুগ-স্বরূপ পূর্ণ প্রতিফলিত।

তৃতীয় ধারা 'অনুবাদ কাব্য'। নামকরণটা অবশ্যই অসঙ্গত। কেন না এ সাহিত্য আদপেই অনুবাদ নয়, অনুবাদ থেকে নিতান্তই দূরের জিনিস। তবু আমরা প্রচলিত অনৃত ভাষকেই মেনে নিলাম, অন্যথায় আখ্যান কাব্যে মঙ্গলকাব্য-শাখা থেকে পৃথক করে চিহ্নিত করার সহজ সুযোগ হারাতে হবে। মঙ্গলকাব্যগুলি অর্বাচীন কাহিনী নিয়ে লেখা, আর এগুলি প্রাচীন

সংস্কৃত সাহিত্যের পুরাতন পরিচিত কাহিনীর বাঙলায় নব রূপান্তর।

কাহিনীকাব্যের এ দুই ধারার তফাৎ কম নয়। আগেই বলেছি মঙ্গলকাব্যগুলি সমকালীন সমাজ জীবনের ছবি। অনুবাদ ধারায় সেই জীবন একেবারেই ছায়া ফেলেনি এমন নয়; তবু এর অভিমুখিতা স্বতন্ত্র। দীনতায় ডুবে যাওয়া বাঙালী ভারতের প্রাচীন কাহিনীর মধ্যে জীবনের শ্রেয়কে, ধ্রুবকে সন্ধান করার যে চেষ্টা করেছিল, যুগ যুগ-সঞ্চিত মহৎ মূল্যবোধকে সামনে তুলে ধরে বাঁচার প্রয়াস পেয়েছিল। এ রচনায় তারই স্বাক্ষর দেখতে পাই। অর্থাৎ এ সাহিত্যও পদাবলীর মতো সমকালীন অবস্থার অনুগামী মাত্র না হয়ে তাকে অতিক্রমণের জন্যে সচেষ্ট। পার্থক্য এই, পদাবলীতে ক্রান্তির স্বর্গলোক স্ব-সৃষ্ট বা স্ব-আবিষ্কৃত। আর এ সাহিত্যের স্বর্গ-সন্ধান ভারতবর্ষীয় শাশ্বত সাধন লোকে, জীবনের গভীরে যুগ যুগ-প্রবাহিত জীবন-রসের ফল্গু স্রোতে।

বাঙলা রামায়ণ মহাভারত কস্মিনকালেও সংস্কৃতের অনুবাদ নয়, ভাবানুবাদও নয়। অনুকরণ বা অনুসরণও নয়। এ পুঁথিগুলির সঙ্গে প্রাচীন সংস্কৃতকাব্যের কোনো অব্যবহিত যোগ নেই। ব্যাস বাল্মীকির রচনা-নিসৃত রসধারা জাতীয় জীবনে শ্রুতি, স্মৃতি, অনুধ্যানের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে এসেছে যুগের পর যুগ। ক্রমে সেই রস জাতির রক্তের সঙ্গে মজ্জার সঙ্গে মিশে জীবনের মাটিকে উর্বর করেছে। বাঙলা কাব্যগুলি সেই মাটি থেকেই উদ্ভূত তাই এতে বাঙালী জীবনের ধ্বনিও শুনতে পাই, শুধু প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যের প্রতিধ্বনি নয়।

প্রাচীন বাঙলাকাব্যের ত্রিধারায় বিশেষ বিচারে মঙ্গলকাব্যকে স্বতন্ত্র রেখে পদাবলী ও অনুবাদ কাব্যকে এক পংক্তি ভুক্ত করা গেল। শেষ দুই শাখার সামান্য লক্ষণ ভক্তিরস বা ভক্তিবাদ। ভক্তির যে-সুরটি বেজেছে ভাগবতে, রামায়ণে, মহাভারতে, তাকেই চরমরূপে পাই পদাবলীর মধ্যে। এখানে যেন সুরের ঠিক তরঙ্গটি, ঠিক পর্দাটি ধরা পড়েছে। মঙ্গলকাব্য ভক্তিমূলক কাব্য নয়। ওতে বর্ণচোরা ভয় ভক্তির ছদ্মবেশ পরেছে। তবু চিনতে ভুল হয় না। ওর মোটা তারের ঝঙ্কার বেপর্দায় বেসুর বাজিয়ে সহজেই বুঝিয়ে দেয় অনুবাদ পদাবলীর সুর থেকে সে দূরের জিনিস।

বিদেশী সাহিত্য

বলা বাহুল্য, মহৎ রচনামাত্রই দেশ ও কাল, কোনো বর্ণ বা কোনো বিশেষ অনুশাসনের পরিখায় আবদ্ধ থাকতে পারে না। পৃথিবীর যা কিছু মহৎ সৃষ্টি, বিশেষত যা সাহিত্য ও শিল্পকলায় অন্তর্ভুক্ত তার চিরকালই সর্বদেশ, সর্বভাষাভাষী, সর্বকালের রসপিপাসুর অভিনিবেশ দাবী করে।

সুখের কথা, কিছুকাল ধরে ইউনেস্কো দেশ ও কালোত্তীর্ণ কিছু কিছু সাহিত্য ইংরেজিতে অনুবাদ ও প্রকাশের ব্যাপারে সহায়তা করছেন। এ জাতীয় একটি উদ্যমের সার্থক রূপায়ন হলো: 'Poems of solitude.' সংকলিত গ্রন্থটি ধ্রুপদী চীনা কবিতার ইংরেজি অনুবাদ। অনুবাদ করেছেন Jerome ch'en এবং Michael Bullock.

সুবিদিত যে প্রাচীনকাল থেকেই চীন দেশে চিত্রকলার হাত ধরে কাব্যকলাও পাশাপাশি উন্মেষ লাভ করেছে। চীনা কবিতার চিত্রধর্মীতা অপরূপ চিত্রকল্প, সাঙ্গীতিক ছন্দদোলা এবং তৎসহ নাতিদীর্ঘ অবয়বে নিপুণ রেখা চিত্রের সম্মিলন ইত্যাদি তার সহজ সুষমার জন্যই পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করে। চীনা কবিতায় গীতিময়তা, দার্শনিকতা, প্রেমের রহস্য, নিত্যদিন বা সময়ের দুঃখ-সুখের অনুভূতি, নির্জনতা, নিসর্গের প্রতি আত্মনিবেদন কাব্য পিপাসু মাত্রেরই অভিনিবেশ দাবী করে:

The sorrow in your heart
it betrayed by a few grey hairs.
Life is like empty mountain ranges
Where snow awaits your visits :
Yet you make your solitary retreat
by the path in the wilderness.'

(Life—Li Yiu.)

এবং, 'On the lonely mountain
I meet no one,
I hear only the echo
of human voices.
At an angle the sun's rays
enter the depths of the word,
And shine
upon the green moss.'

—(The Deer Enclosure—Wang wei)

কিংবা,

'Flowers and weeds bloom before my eyes :
White and pink like a girl's cheek.
To think that, during the night, they will wither ;
Why not marry them to the west wind,
Without bothering a match-maker ?'

—(Backyard,—Li Ho.)

আবার,

'Being sleepless at midnight,
I rise to play the lute.
The moon is visible through the curtains
And a gentle breeze sways the cord of my robe.
A lonely wild-goose cries in the wilderness
And is echoed by a bird in the woods.
As it circles, it gazes
At me, alone, imbued with sadness.'

—(Poems of my Heart—Juan Chi)

চীনদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের পটভূমি সুপ্রাচীনকালের। এবং সেজন্য নানাকারণেই তাদের সামাজিক জীবন প্রবাহের সমান্তরাল রাজনৈতিক জীবনচর্যার প্রতিচ্ছায়াও অনিবার্য কারণে কবিতার আন্তর-ধর্মকে আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিল। এবং বলা বাহুল্য, একদা ঐ দেশে রাজকীয় প্রতিষ্ঠালাভের জন্য নির্দ্ধারিত পরীক্ষাসূচীর মধ্যে কাব্য-রচনা ছিল অন্যতম বিশিষ্ট বিষয়। অবশ্য, ব্যক্তিক জীবনচর্যার মহত্তর প্রেরণা থেকে কাব্যিক জাগরণ ঘটে থাকলেও সেদিনের রাজানুগ্রহ কিন্তু চীনদেশের কাব্য ও চিত্রকলার উন্মেষের অন্যতম সহায়ক। বিশেষত তাং রাজত্বকালের ভূমিকা এক্ষেত্রে স্মরণীয়, যেহেতু চীনা কাব্য ও চিত্রকলা 'burst Forth and reached perfection under the T'angs.' এবং তখন 'A promising start was made with the study of rhymes and tones, and the terms Even Tones and Oblique Tones were invented. Much thought was given to the theory and principle of poetics, with the result that a network of rules and regulations was woven and imposed on poetry. The so-called Modern slyles thus began.'

চীনা কবিতার সঙ্কলন ইতোপূর্বেও নানা ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু যেহেতু চীনা ভাষা ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, সেহেতু উক্ত ভাষার প্রাণস্পন্দন, কাব্যিক ব্যঞ্জনা, প্রয়োগ রীতির ঐতিহ্য, সঙ্গীতময় ছন্দের কারুকর্ম সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকে উৎকৃষ্ট অনুবাদ, মূলের সুষ্ঠু রূপায়ন এক কঠিন ব্যাপার। কিন্তু সুখের বিষয় বর্তমান 'Poems of Solitude' সঙ্কলনটি সেদিক থেকে পাঠকের মনে উৎসাহের সঞ্চার করবে। চীনা কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে বিশেষ মিল প্রকরণ এবং চিত্ররূপময় ধ্বনি ব্যঞ্জনা তা কাব্যিক স্বচ্ছন্দে

বর্তমান সঙ্কলনের অনুবাদদ্বয় উপস্থিত রাখতে যত্নবান হয়েছেন। চীনা কবিতা অনুবাদের ক্ষেত্রে ইতোপূর্বে রবার্ট পেইন গদ্যের বাহনকে যে কারণে স্বীকার করেছেন সে পথে বিচরণ করেও বর্তমান অনুবাদকদ্বয় যথাসম্ভব যথাযথ মূল কাব্যিক চরিত্রকে অনুবাদের মধ্যে উপস্থিত করতে সক্ষম হয়েছেন—অনুবাদকদ্বয়ের এ বিশেষত্ব অবশ্যই উল্লেখ্য। তবে 'Poems of Solitude' সঙ্কলনে চীনা কবিতার ঐতিহাসিক গতি প্রবাহের প্রামাণ্য চরিত্র অনুপস্থিত। অবশ্য চীনা কবিতার প্রামাণ্য ধারাচিহ্ন নিবেদনের অবকাশ নেই বর্তমান সঙ্কলনে, এবং বলাবাহুল্য, যেহেতু নামকরণের মধ্যেই সঙ্কলনটি তার বিশেষিত কাব্যভাবনার আলোকিত সত্তায় প্রতিভাত। চীনা কাব্যেতিহাসের মধ্যযুগীয় পর্বের (২১০ খৃষ্টাব্দ থেকে ৯১৮ খৃষ্টাব্দ) ছ'জন বিশিষ্ট কবির শুধুমাত্র নিঃসঙ্গতা, নির্জনতা সম্পর্কিত প্রায় একশত কবিতা' বর্তমান সঙ্কলনে স্থান লাভ করেছে। সঙ্কলন-গ্রন্থটিতে যে সমস্ত কবির কবিতা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তাঁরা হলেন : জুয়ান চি (২১০—২৬৩); পাও চাও (৪১৪—৪৬৬); ওয়েং ওঈ (৬৯৯—৭৫৯); পি'ই টি (৭১৪—?); লি-হো (৭৯১—৮১৭) এবং লি-উ (৯৩৭—৯৭৮)। উল্লিখিত কবিদের সময়কাল থেকে সহজেই বোঝা যাবে যে এঁরা পরস্পর সমকালীন বা বিশেষ কাব্যভাবনাদর্শাশ্রয়ী-গোষ্ঠীর কবি নন। এবং তা না থাকা সত্ত্বেও একটি জায়গায় এঁদের লক্ষণীয় মিল ছিল। তা হলো হৃদয়ে নিঃসঙ্গতা জাগরণের কাল নিরপেক্ষ অনুভব।

'...They are not therefore contemporaries, nor do they form a school. They share a mood, subtle and infinitely variable, that gives them each a place in this collection.'

যতদূর জানা যায়, চীনা কাব্যে চিত্ররূপময় নির্জনতা-প্রেমী উপরিউক্ত কবিকুলের পাশে ঐ একই সময়কালে আরো কয়েকজন কবি ছিলেন—যাঁদের রচনা সমগ্রের মধ্যে থেকে মনে হয় নির্জনতা বিষয়ক কিছু রচনা সংগ্রহ হয়তো অসম্ভব ছিল না। তাঁরা হলেন কবি লি পো (৭০১—৭৬২), চেন জু-আং (৬৫৬—৬৯৮), পো-চু-ই (৭৭২—৮৪৬) এঁদের উপস্থিতিতে, মনে হয়, সঙ্কলনটির নির্জন সংসার রচনা আরো ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠতে পারতো। সুপরিকল্পিত এই অনুবাদ-গ্রন্থের * কবি-পর্বের প্রারম্ভে ইতিহাস নির্ভর যে কবি পরিচিতি সংযোজিত হয়েছে সেটি পাঠককে কবি ও তাঁর বিশেষ মানসিক প্রতিবেদনের রস আহরণে সহায়তা করে।

* **POEMS OF SOLITUDE** : Translate from the chinese by Jerome chen and Michael Bullock. (UNESCO collection of Representative works (Chinese Series). Albert—Schuman Limited, London. 25s.

রবার্ট আর্নেস্ট স্পীলার আধুনিক আমেরিকান সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক। কিছুকাল পূর্বে তাঁর সম্পাদনায় আমেরিকান সাহিত্যে প্রাসঙ্গিক যে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে সেটি হলো : 'এ টাইম অব হার্ভেস্ট : আমেরিকান লিটারেচার'* । গ্রন্থটি বর্তমানে আমেরিকান সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি বুঝতে উৎসাহী পাঠকের বিশেষ সহায়ক। বিগত উনিশ শ' দশ সাল থেকে

উনিশ শ' ষাট সাল—দীর্ঘ অর্দ্ধ শতাব্দীর আমেরিকান সাহিত্যের বিভিন্নমুখী স্রোতধারাকে তিনি কাব্য, নাটক, উপন্যাস, সমালোচনা প্রভৃতি সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগানুক্রমিকভাবে পর্যালোচনা করতে প্রয়াসী হয়েছেন বর্তমান গ্রন্থে।

শ্রীযুক্ত রবার্ট আর্নেস্ট স্পীলারের তথ্য অনুসন্ধানী বিশ্লেষণের আলোকে পাঠক অর্দ্ধশতাব্দীর সিঁড়ি বেয়ে আধুনিক আমেরিকান সাহিত্যর কাননে সহজেই প্রবেশ করতে পারবেন। গ্রন্থকার স্পীলারের আমেরিকান সাহিত্যের ফসলের কালের যে পরিচয় বর্তমান গ্রন্থে বিধৃত হয়েছে তা যুক্তিনিষ্ঠ তথ্যসমৃদ্ধ; আবেগের তাড়নাকে তিনি সযত্নে পরিহার করতে তৎপর হয়েছেন। গ্রন্থের প্রবন্ধাবলী একদা মার্কিন বেতার সাহিত্য-আসরে পর্যায়ক্রমে প্রচারিত হয়েছিল।

* **A TIME OF HARVEST** : AMERICAN LITERATURE (1910—1962) Edited by Robert Ernest Spiller. (Hill and wang, New York, 173PP.)

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

পারলাগেরভিস্ট : জীবন ও শিল্প

এমন এক-একজন সাহিত্যিক আছেন যিনি কোলাহল পূর্ণ জনস্রোতের উপরিতলে স্থান লাভ করেন না, যাঁকে ডুবুরীর পোশাক পরে সমুদ্রের ঘূর্ণাবর্তের গভীরে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে ঝিনুকের মধ্যে মুক্তা সন্ধান করতে হয়। পারলাগেরভিস্ট সেই মুক্তাস্বরূপ বিশ শতকের কবি-নাট্যকার-ঔপন্যাসিক। সোচ্চার দ্বন্দ্ব-সংকুল যুগপটে থেকেও নিরুচ্চার ধ্যানমগ্ন দার্শনিকের প্রজ্ঞা-প্রভায় তিনি উদ্ভাসিত। আকাশে লক্ষ হীরার মতো নক্ষত্ররাজির মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্রকে যেকোন জ্যোতির্বিজ্ঞানী নির্দেশ করতে পারেন—কিন্তু পরিবেশের জটিলতায় বেতাল হয়ে যখন তিনি কূপের মধ্যে পরেন, তখন তাঁর নির্দেশনাও হোঁচট খায়। বর্তমানে আমাদের দেশে তাঁর আলোচনার নীরবতা অনেকটা কূপে পড়ে যাওয়া জ্যোতির্বিজ্ঞানীর মতোই।

পারলাগেরভিস্ট ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে মে তারিখের সুইডেনের 'ভক্সজো' (voxjo)-র লুথারান (খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকারী সম্প্রদায়) পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথাগত শিক্ষার মাধ্যমে লাগেরভিস্টের বিস্ময়কর প্রতিভার তেমন কোন স্ফুরণ হয় নি—এ কথা সত্য; তবে এই শিক্ষাকালেই তিনি নিজেকে কিছু কিছু প্রকাশ করার প্রথম সুযোগ পান। এই শিক্ষা গ্রহণের জন্য 'আপশালা' (upsala)-য় তাঁকে ১৯১১-১২ খ্রীষ্টাব্দের অধিক থাকতে হয় নি। ১৯১৩ সাল থেকেই তিনি সাহিত্যের আসরে এলেন পুরোপুরিভাবে। তাঁর জীবনীকারের ভাষায়—'...he plunged into a literary life that embraced all forms? এই সাহিত্যের আসরই হল তাঁর প্রাণ—তাই অন্যক্ষেত্র তাঁকে তেমন আকর্ষণ করে নি, আর কোন ক্ষেত্রই তাঁকে বেশী দিন আটকে রাখতে পারে নি। বাইশ বছরের যুবক লাগেরভিস্ট সাহিত্য-আসরে এসেই অনায়াসে নিপুণ 'চিত্রকরের' স্থান নিলেন। সমালোচক বলেছেন, পারলাগেরভিস্ট উনিশ শতকীয় অন্তর্মুখীনতা থেকে গীতিকাব্যকে এক জ্যামিতিক পদ্ধতিতে শাব্দিক শিল্প ও চিত্র শিল্প মণ্ডয়নের মাধ্যমে মুক্তি দিলেন। এর পরবর্তী অধ্যায়ে লাগেরভিস্ট রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে উৎসাহী হলেন। সেখানেও তাঁর শক্তি স্ট্রিণ্ডবার্গের 'অভিব্যক্তিবাদ'কে শ্রদ্ধা জানিয়ে নতুন ভাবনার চিরস্থায়ী চিহ্ন এঁকে দিল।

তারপর তিনি শিল্পের প্রতিটি স্তরে নিজ শক্তির বিশিষ্ট স্বাক্ষর অংকন করতে লাগলেন। সেই বিরামহীন যাত্রার মশাল আজও চুয়াত্তর বছরের বৃদ্ধ লাগেরভিস্ট অনির্বাণ দীপ্তিতে রাখতে পেরেছেন। তাঁর সাহিত্যকর্ম প্রসঙ্গে একজন সমালোচক এক জায়গায় জানিয়েছেন যে, লাগেরভিস্ট প্রজ্ঞাময় জগতের প্রায় সমস্তই সঞ্চয় করেছেন। তাঁর কণ্ঠে ফুটে উঠেছে নতুন দৃপ্ত দৈববাণী (যা নাকি তাঁর জন্মসূত্রে লব্ধ)। তিনি হলেন ধ্রুপদীভঙ্গীর নৈতিক কাহিনীর প্রবক্তা।

১৯২৩—৪০ সাল পর্যন্ত বিখ্যাত 'রয়াল একাডেমি অব্ এইটিন'-এর একজন অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য হিসেবে লাগেরভিস্ট পরিচিত ছিলেন। কোন অনিবার্য কারণবশতঃ তাঁকে সে পদ ত্যাগ করতে হয়। প্রায় সেই সময় থেকে তিনি স্বদেশীয় সাহিত্যে আধুনিকতার বিপ্লব সঞ্চার করলেন। তাঁর এই বিপ্লবের সৌকর্য সমস্ত পৃথিবী স্বীকার করে নিয়েছে—যদিও কিছু সংশয় এবং দোলা নিয়ে।

কাব্য, নাটক, গল্প, উপন্যাস নিয়ে তাঁর সাহিত্যকর্ম নিঃসন্দেহে বিপুল এবং প্রতিটি সাহিত্যকর্ম তাঁর এই আধুনিকতা-সূত্রপাতকারী বিপ্লবের অঙ্গীভূত; তাঁর সাহিত্যসম্ভারের কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য ও আলোড়নকারী গ্রন্থের নাম করতে চাই, যার প্রত্যেকটি আধুনিক-সাহিত্য-আন্দোলনে নোতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার এক একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

উপন্যাস—দ্য ইটারন্যাল স্মাইল (১৯২০), দ্য হ্যাঙ্গম্যান (১৯৩৩), দ্য ডোয়ার্ফ (১৯৪৪), বারাব্বাস (১৯৪৯), দ্য সিবিল (১৯৫৬)।

ছোট গল্প—ইভিল টেলস্ ১৯২৪), ইটারন্যাল স্মাইল অ্যাণ্ড আদার স্টোরিজ (১৯৫৪) দ্য ম্যারেজ ফিস্ট অ্যাণ্ড আদার স্টোরিজ (পরবর্তীকালে)।

নাটক—দ্য হ্যাঙ্গম্যান (১৯৩৪—উপন্যাসখানির নাট্যরূপ), দ্য ম্যান উইদাউট সোল (১৯৩৬), দ্য সিবিল (১৯৫৭—এখানাও উপন্যাসের নাট্যরূপ)।

কাব্য—অ্যাঙ্গুইস (১৯১৬), সঙ্গস্ অব হার্ট (১৯২০), কলেক্টেড্ পোয়েমস্ (১৯৪১) ইভিনিং ল্যাণ্ড (১৯৫৩)।

তাঁর গভীর জীবনদর্শন এবং মানবিকবোধের স্বীকৃতি নোবেল পুরস্কার সমিতি দিলেন ১৯৫১ সালে প্রভু খ্রীষ্টের হত্যাকারীর জীবনের ওপর এক পৌরাণিক পটপ্রেক্ষাতে লিখিত 'বারাব্বাস' উপন্যাসখানির মাধ্যমে। লাগেরভিস্ট পৌরানিক এবং লোক-কাহিনীর প্রতি একটু বিশেষ উৎসাহী। তাঁর সাহিত্য-জীবনের প্রথম পর্বের উপন্যাস 'ইটারন্যাল স্মাইলে' যদিও শৈশব স্মৃতির প্রতি গভীর নিষ্ঠার প্রকাশ ঘটেছে তবুও লোককাহিনীই তার ভিত্তি। এ ছাড়া আরো অনেক গ্রন্থ এর উদাহরণ।

সম্প্রতি সমালোচকরা লক্ষ্য করেছেন যে আধুনিক ছোট গল্পে ঘটনা ক্রমশঃ বিন্দু-প্রতিম হয়ে যাচ্ছে। মনে হয়, সেদিন প্রায় আগত যেদিন ছোট গল্পের আঙ্গিকের সঙ্গে কবিতার আঙ্গিকের তেমন কোন পার্থক্য থাকবে না। এ-কালের ছোট গল্প কবিতার কত কাছাকাছি এসেছে তার উদাহরণ লাগেরভিস্টের 'প্রেম ও মৃত্যু' (Love and Death)। সমালোচক চিহ্নিত এই ছোট গল্পটির আক্ষরিক অনুবাদ পাঠকের সামনে রাখছি। আশাকরি এর ফলে লাগেরভিস্ট সম্পর্কে পাঠক অধিকতর উৎসাহে দীপিত হবেন। 'একদিন সন্ধ্যেবেলায় আমি পথে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম আমার প্রিয়ার সঙ্গে। একটা অন্ধকার বিষণ্ণ বাড়ীর পাশ দিয়ে যখন আমরা চলেছি, তখন হঠাৎ দ্বারমুক্ত হয়ে গেল আর তমসার ভিতর থেকে জনৈক কন্দর্প (cupid) একখানি পা বাইরে বাড়িয়ে দিলে। সাধারণ শিশু কন্দর্প সে নয়; একটি বিরাট পেশল পূর্ণবয়স্ক মানুষ—সর্বাঙ্গ তাঁর রোমশ তাকে দেখতে কোন অসভ্য তীরন্দাজের মতো। একটা কদাকার ধনুকে তীর যোজনা করে আমার বুকের দিকে লক্ষ্য করল সে। তীর ছুড়ল—সেটা এসে আমার বুকে বিদ্ধ হল; তারপরই সে

পা-খানা সরিয়ে নিলে আর অন্ধকার দুর্গের মতো সেই বাড়ীটার দরজা বন্ধ করে দিলে। আমি লুটিয়ে পড়লাম। আমার প্রিয়া এগিয়ে চলল। মনে হ'ল, প্রিয়া আমার পড়ে যাওয়াটা দেখতে পাইনি। যদি দেখত তাহলে নিশ্চয় থেমে দাঁড়াত, আমার জন্য কিছু করতেও পারতো হয়তো। প্রিয়া এগিয়ে চলে গেলো। খুব সম্ভব ব্যাপারটা সে জানতেই পারল না। আমার রক্ত একটা নর্দমার পথ, বেয়ে অনেকখানি পর্যন্ত তাকে অনুসরণ করল—তারপর যখন পথে কেউ রইল না, তখন রক্তের ধারাটা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। (নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : "সাহিত্যের ছোট গল্প' থেকে গৃহীত,)

আবার লাগেরভিস্টের কাছে এমন অনেক গল্পই পাওয়া যাবে যার ঘটনা ব্যঞ্জনার সূক্ষ্ম কারুকর্মে শোভিত। অনুরূপ একটি অসাধারণ গল্পের সংক্ষিপ্ত রূপ তুলে ধরছি :

মিঃ স্মিথ তার প্রণয়িনীর সঙ্গে হোটেলের ছাদে তারায় ভরা আকাশের নীচে সান্ধ্য ভোজন শেষ করে রোমান্টিক আনন্দে নিজেদেরকে ভরিয়ে তুলতে লিফটে করে চলেছে। তারা লিফটের ছোট্ট জায়গাটিতে কাব্যময় যৌবন-জীবন এবং প্রেমের আলোচনায় মশগুল হয়ে উঠল। 'And the lift went down down to the hell'।

তারা হঠাৎ দেখল তারা এক নরকে এসে উপস্থিত হয়েছে এবং সে জায়গাটিকে রোমান্টিক যৌবন-সুখের স্থান বলে মনে করল। সেখনকার প্রেত-নেতাও তাদের একথা বোঝাল এবং জানাল যে এ জায়গাকে আধুনিক জগতের উপযোগী করে তোলার জন্য তারা খুব সচেষ্ট। মিঃ স্মিথ এবং তার প্রণয়িনী এ-কথা শুনে প্রেত-নির্দিষ্ট একটি ঘরে খুব হৃষ্টমনে এসে প্রবেশ করল। তারপর তারা যখন সেখনে রতি সুখ-মগ্ন তখন হঠাৎ একজন হিমশীতল প্রেত এসে উপস্থিত হল। মিঃ স্মিথের প্রণয়িনী আবিষ্কার করল সেই প্রেতটিই তার স্বামী—আরভিড্। সে দেখল তার স্বামী আত্মহত্যা করে এই যমপুরীতে এসেছে। মিঃ স্মিথের প্রণয়িনী দর্পণে নিজের মুখ দেখে চমকে উঠল। সে আর ঐ জায়গায় থাকতে পারল না।

ব্যবসাদার স্মিথ এতসব বুঝল না। সে তার প্রণয়িনীকে অনুসরণ করে লিফটে চড়ে বসল ওপরে যাওয়ার জন্য। বিদায়ের সময় প্রেত-নেতার নিমন্ত্রণ পেল তারা। লিফট উঠতে লাগল ওপরে। মিঃ স্মিথের প্রণয়িনী মিঃ স্মিথের চুম্বনের গাঢ়তায় ভুলে গেল নিজের মুখ। আবার মগ্ন হল ভালবাসাবাসির কথায়।

এই গল্পটি আধুনিক মুখোশধারী সভ্যতাকে চাবুক মারার দীপ্র স্পর্ধা রাখে। তাই সমালোচকরা তাঁর প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত। আধুনিক সমাজ ও জীবনের পক্ষে লাগেরভিস্ট একান্ত উপযোগী। একদিকে তাঁর সাহিত্যে আছে নতুনত্বের আমেজ, অনাবিল সঙ্গীত-মুখর কাব্যের আস্বাদ অন্যদিকে আছে জীবনের নগ্ন-নশ্বররূপ।

তাঁর সম্পর্কে একজন সমালোচকের মন্তব্য প্রসঙ্গত স্মরণীয় : লাগেরভিস্ট স্বয়ং যেমন প্রচারবিমুখ, তেমনি জীবনের প্রথম পর্বের অভিব্যক্তিবাদের দিনগুলি থেকেই তিনি এমন এক মননবাদের প্রতিনিধিস্বরূপ উপস্থিত হয়েছেন, যা আধুনিক প্রচারমুখীনতার সব পন্থাগুলি থেকে বহু দূরে রয়ে গেছে এবং রয়ে গেছে এক দূরত্ব-নিলীন সম্মানের সঙ্গে।'

বস্তুতই শিল্প-সমস্যার এমন কোন দিক প্রায় নেই বল্লেই চলে যার অর্থ উদ্ধারে এবং সমাধানে পারলাগেরভিস্ট ব্রতী হন নি। সে সব সমস্যা তাঁর কাছে শুধু তত্ত্বমাত্র নয়; নাটকে, ছোট গল্পে, কবিতায় অথবা আধ্যাত্মিক রচনাধারার ব্যবহারিক পথে তিনি তাকে সপ্রমাণ করেছেন। প্রচণ্ড যন্ত্রণা থেকে এক পবিত্র চন্দন স্পর্শে, সর্ব-নৈরাশ্যহারী সেই মৌলিক আনন্দে উত্তীর্ণ হতে তাঁকে এক দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে হয়েছে। তাঁর সাহিত্যের উপাদান—(১) প্রাথমিক বিদ্রোহ থেকে এমন এক সহৃদয় গ্রহণে যা কখনোই নিছক নেতিকরণে পর্যবসিত হয় নি। (২) যুক্তি মিশ্রিত এক প্রবল ধর্মানুভূতি। (৩) মানুষের ভাগ্যের মর্মমূলে অবস্থিত এক নীতির অস্তিত্বে বিশ্বাস।

এই প্রসঙ্গে স্বতোই আন্দ্রেঁ জিদের বিখ্যাত কয়েকটি উক্তি স্মরণে আসে: It is the measure of Lagerkvist's success that he has managed so admirably to maintain his balance on a tight rope which stretches accross the dark alayss lying between the world of Reality and the world of Faith.'

আবার অন্য একজন সমালোচক বলেছেন, 'যদি লাগেরভিস্ট পাশ্চাত্য পাঠকের পক্ষে সহজে অধিগম্য কোন ভাষা তাঁর রচনার বাহন-স্বরূপ নিয়োগ করতেন, তাহলে নিঃসন্দেহে তিনি আমাদের কালের একজন পথিকৃৎরূপে প্রশংসিত হতেন। তিনি সেই সব মুষ্টিমেয় অথচ অপরিহার্য ব্যক্তিদেরই একজন যিনি এই হীন তিমিরাচ্ছন্ন পৃথিবীর ওপর দিয়ে আমাদের পদযাত্রাকে পরিচালিত করতে পারেন—একলা নির্ভয়ে মশাল জ্বেলে।'

বস্তুত, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার সমসাময়িক সর্বাধিক তাৎপর্যময় সৃষ্টিগুলির সঙ্গে যাঁর সাহিত্যকৃতি সমপদবীর অধিকারী, সেই উল্লেখযোগ্য মানুষটির মূল্যায়ন একই সঙ্গে লোভনীয় এবং দুরূহ।

শিশির মজুমদার

উর্ধাকাশ ও বিজ্ঞানী শিশিরকুমার

শ্যামলা এ ধরণীর বিপুল হস্তকে চন্দ্রাতপের মত বিশাল আকাশের অসীম বিস্তৃতি বহু কবিকে দিয়েছে কল্পলোকের পথে অবাধ বিচরণের সুযোগ। বহু দার্শনিক আকাশের সোপানে সোপানে গিয়ে হাজির হয়েছেন বিশ্বরহস্যের গভীরে। শিল্পী গ্রহণ করেছে এর চিত্রকল্প রূপটি; সুরসাধক এর ধ্রুপদী স্তব্ধতা, বৈজ্ঞানিক কিন্তু এর সবকটি ভাবেরই সাহায্য গ্রহণ করলেন। বৈজ্ঞানিকের গবেষণাগার বিজ্ঞানসাধকের হাতে কল্পনার মুক্তি (originality of supposition) চিত্রকল্পরূপ (Geometrical figure-এর) মাধ্যমে আকাশ রহস্যকে সফলতার পথে এগিয়ে নিয়ে একে ধ্রুপদী স্তব্ধতায় প্রতিষ্ঠিত করল, মহাকাশ সমস্যার যথার্থই সমাধান ঘটল।

পৃথিবীকে বেষ্টন করে বাতাসের স্তর গণ্ডী রচনায় যেন বসুন্ধরাকে পাহারা দিতে ব্যস্ত, ভূপৃষ্ঠের এই বায়ুমণ্ডল তার চামর দোলাবার রেশ উপরের আকাশে ছড়িয়ে দিয়েছে। এর

উপযোগিতা অবশ্যই আছে, এরই সাহায্যে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করে আমরা জীবনধারণ করি। আমরা যখন কথা বলি, তখন আমাদের স্বরযন্ত্র যে শব্দের কম্পন সূচনা করে, সেই কম্পনের রেশকে শ্রোতার কানের পর্দায় পৌঁছে দেয় ও এই বাষ্পই; তা ছাড়া বাতাসের স্তর আছে বলেই সূর্য থেকে যে সমস্ত বিভিন্ন শক্তিশালী রশ্মিমালা নির্গত হয় তার মৃত ফাঁদ থেকে আমরা রেহাই পাচ্ছি। তাই একথা সকল দেশের বৈজ্ঞানিকই স্বীকার করলেন যে বায়ু মণ্ডলের বিভিন্ন স্তরের গঠন রহস্য' ও স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য যদি বিশ্বের দরবারে উদ্ঘাটিত না হয় তবে সভ্যতা অনেকখানি পিছিয়ে থাকবে। বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীর দল একযোগে জানতে চাইলেন উপরের দিকে আকাশ কতটা বিস্তৃত। বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় চলল এর পরীক্ষা নিরীক্ষা। পদার্থ বিদ্যা, গণিত বিদ্যা এবং ভূতত্ব বিদ্যা ভ্রাতৃত্বের আলিঙ্গনে বদ্ধ হলো সাফল্যের চরম শীর্ষে আরোহণ করবার জন্যে। সার্থকতার লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে এরা স্ব স্ব পক্ষে অগ্রসর হলেও লক্ষ্যের বিষয়বস্তু এদের সকলেরই এক।

দেখা গেল, বায়ুমণ্ডলটাকে যদি স্তরে ভাগ করে ফেলা যায়, তবে গবেষণার পক্ষে অনেকটা সুবিধে হয়। কারণ অবশ্য স্পষ্ট, কোনও সম্পূর্ণ সমস্যার সমাধান একেবারে করা খুবই অসুবিধার কথা। কিন্তু সম্পূর্ণ সমস্যাটিকে যদি কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়, তবে তার সমাধান খুবই সহজসাধ্য হয়. এই সমস্যা লাঘবের উদ্দেশ্যে বায়ুমণ্ডলটিকে চারটি স্তরে ভাগ করা হল। প্রথম স্তরটি পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে। এর নাম ট্রপোস্ফিয়ার। দ্বিতীয়টির অবস্থিতি প্রথমটির থেকে কিছু দূরে তবু এও পৃথিবীর কাছেই অবস্থিত; এর নাম ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ার। এরা পৃথিবীর কাছাকাছি বলে এদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা সম্ভব হয়েছে। ফলে এদের বহু তত্ব জানা গিয়েছে। এই বায়ুস্তরের সঙ্গেই পার্থিব জীবনের যোগাযোগ। আর ঝড়, বৃষ্টি তুষারপাত ইত্যাদি যে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সঙ্গে আমরা বিশেষভাবে পরিচিত তা কিন্তু ঘটে নীচের স্তরেই। এদের সম্বন্ধে পৃথিবী জানলো অনেক কিছু। কিন্তু যে মানুষ একদিন জ্ঞান আর বার্দ্ধক্যের প্রান্তসীমায় পৌঁছিয়েও উদাস কণ্ঠে ঘোষণা করল: মনে হয় আমি যেন সাগর সৈকতে দাঁড়িয়ে নুড়ি কুড়োচ্ছি—সামনে আমার সীমাহীন সাগর—ওর তল কোথায়! তার অনুসন্ধিৎসার সমাপ্তি কি এত সহজেই আসতে পারে? চলল তাই উর্ধাকাশ সম্পর্কীয় বিস্তৃততর তথ্য আহরণের অভিযান। উচ্চ বায়ুমণ্ডলের সুবিস্তীর্ণ অঞ্চল মানুষকে কৌতূহলী করল। এই অঞ্চলকে দুটি ভাগে বিভক্ত করলেন বিজ্ঞানীর দল। আয়নোস্ফিয়ার আর এক্সোস্ফিয়ার নাম দিলেন তাদের। লক্ষ্য করা গেল মেরুজ্যোতি, বেতার তরঙ্গের প্রতিফলন, চৌম্বক ঝটিকা এবং এ ছাড়াও এমনি ধরণের আরও বিভিন্ন ব্যাপার আয়নোস্ফিয়ার আর এক্সোস্ফিয়ারের জগতে ঘটে থাকে।

প্রস্তুত হল বিভিন্ন ধরণের আধুনিক স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি। বিচিত্র প্রণালীর মাধ্যমে এগিয়ে যেতে লাগল এঁদের মহৎ আদর্শ চিহ্নিত অগ্রসরমান পদক্ষেপ। এগিয়ে চলল সভ্যতা এক বিরাট সম্ভাবনাকে সামনে রেখে। দেখা গেল আয়নোস্ফিয়ারের সীমানা বলে চিহ্নিত 'এ' 'ডি' 'ই' এফ—১ এবং এফ—২ আয়ন আর ইলেকট্রন দিয়ে গঠিত। এখন এই ইলেকট্রনের ঘনত্বের উপর নির্ভর করে এর বিভিন্ন অংশ থেকে বিভিন্ন দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট বেতারতরঙ্গের প্রতিফলন।

'আয়নোস্ফেরিক রেকর্ডার' এর কাজে সাহায্য করল। এরই সাহায্যে আয়নোস্ফিয়ার অঞ্চলের ইলকট্রনের ঘনত্ব নির্ণয় করা হল। এ ছাড়া কৃত্রিম উপগ্রহও এই কাজে সাহায্যে আসছে। আয়নোস্ফিয়ার অঞ্চলের বায়ু কণিকার ঘনত্ব যত বেশী হবে এই উপগ্রহের গতিও ততই হ্রাস পাবে। কাজেই কৃত্রিম উপগ্রহের গতির হ্রাসের পরিমাণ দেখে বলা সম্ভব হবে আয়নোস্ফিয়ার অঞ্চলের বায়ুকণা কতখানি ঘন। চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে বেতার ধ্বনির দ্বারাও উর্ধাকাশ গবেষণার জটিলতা অনেকখানি লাঘব হয়েছে।

এই সব উপাদানকে সঙ্গী করে এবং জ্ঞান প্রজ্ঞা আর মহৎ প্রচেষ্টাকে সম্বল করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিক দল যখন সমস্যা সমাধানের চেষ্টা এবং আরও নূতন তথ্য জানবার আশায় গবেষণা কার্য চালাতে আরম্ভ করলেন, প্রাচীন সংস্কৃতি ও শিক্ষার মূর্ত প্রতীক ভারতবর্ষ তাতে সাড়া দিতে ইতস্তত বোধ করল না। ভারতের মধ্যে যে বিজ্ঞানবীর এই ডাকে সাড়া দিলেন, তিনি হলেন অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র। তাঁর ছাত্রপ্রতিম সহকর্মীদের নিয়ে তিনি বহুকালব্যাপী যে গবেষণা কার্য চালালেন তারই ফলশ্রুতিরূপে দেখা দিল তাঁর দীর্ঘায়তন পুস্তক "The Upper Atmosphere." আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করল বইটি, বইয়ের লেখকও। বিশ্বের বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে সমাদর আসতে লাগল। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বিজ্ঞানী এ্যাপলটন সাহেব লিখলেন—"এটি মহাকাশের বাইবেল"। এত সুন্দর আর সংক্ষিপ্ত প্রশংসা আর কি হতে পারে।

অধ্যাপক মিত্রের এই কাজে সাড়া দেওয়ার পেছনে একটি পরোক্ষ কারণ লুকিয়ে আছে বলে আমি মনে করি। কারণ তিনি তার জীবনের পূর্ববর্তী অধ্যায়ে যে বিষয়গুলি নিয়ে গবেষণা করছিলেন, সেগুলি উর্ধাকাশ বহির্ভূত হলেও উর্ধাকাশ সম্পর্কীয় গবেষণার ক্ষেত্রে সেগুলির ঋণ অপরিশোধ্য। উচ্চ বায়ুমণ্ডল সম্বন্ধে জানবার প্রাথমিক পদক্ষেপে এই গবেষণা সাফল্যের পক্ষে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে।

অধ্যাপক মিত্র তাঁর জীবনের প্রথম পর্বে আলোক সংক্রান্ত গবেষণায় গভীর আত্মনিয়োগ করেন। স্লিট জাতীয় বাধার জন্য আলোর প্রতিক্রমণ বিন্যাস পাওয়া যায়, অর্থাৎ এই বাধার ফলে আলোর রশ্মি সোজা না পরে একটু বেঁকে যায়। এই জাতীয় প্রতিক্রমণ বিন্যাসের সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। কিন্তু বিজ্ঞানীর রহস্যান্বেষণী দৃষ্টি আরও গভীরে যেতে চায়। সে জানতে চায় গভীর হতে গভীরতর সত্যকে। অধ্যাপক মিত্রের তাই গবেষণার বিষয় হল যে স্লিট জাতীয় বাধার ফলে আলোকের প্রতিক্রমণ বিন্যাস পাওয়া যায়, সেই স্লিটের জ্যামিতিক গঠনে যদি কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তবে কেমন ধরণের ত্রুটি থাকলে স্লিটের কেমন ধরণের পরিবর্তন সাধিত হওয়া সম্ভব তা লক্ষ্য করা।

শুধু প্রতিক্রমণ বিন্যাসই আলোর সব নয়, এর বর্ণেরও বিশ্লেষণ করা দরকার। যে বাণী একদিন আলোকে স্বাগত জানিয়ে উদ্দাত্ত ধ্বনিতে উচ্চারিত হয়েছিল "তমসো মা জ্যোর্তিগময়" সে বাণী মিথ্যা অথবা বাতুলতার নামান্তর নয়। এর মধ্যে লুকিয়ে আছে শুভ্র-সরল-স্বচ্ছ প্রকাশমান আলোর ধ্রুববর্ণের প্রতি একটি সসম্ভ্রম শ্রদ্ধা। এই বর্ণের বিশ্লেষণ করা তাই বৈজ্ঞানিকের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মেটালেন অধ্যাপক মিত্র। আমরা জানি, আলো থেকে যে

বর্ণালি রশ্মি নির্গত হয়, তা বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ সমষ্টি। আলোকের বর্ণালী বিশ্লেষণ করতে হলেই তাই এই সব তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পরিমাপ নির্ধারণ করা অপরিহার্য। অধ্যাপক মিত্র এই জাতীয় কতকগুলি দৈর্ঘ্যের পরিমাপ করেন তামার নিকট অতি বেগুনি অংশে (২০০০—২৬০০ A)।

আলোক সংক্রান্ত গবেষণা ছাড়াও অধ্যাপক মিত্র আরও অনেক বিষয় নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, গ্যাসীয় মোক্ষণ সংক্রান্ত গবেষণা, রেডিও ভাল্‌ভ, সার্কিট বিষয়ক গবেষণা ইত্যাদি।

আয়নোস্ফিয়ার অঞ্চলে আয়ণ আর ইলেকট্রনের সঙ্গে সংঘাত হলে এবং এদের সঙ্গে তড়িৎ আর চৌম্বক ক্ষেত্রের সংযোগ সাধিত হলে যে সব ভৌতিক প্রক্রিয়ার উদ্ভব হতে পারে সে সম্বন্ধে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে হলে গ্যাসীয় মোক্ষণ সংক্রান্ত গবেষণাকে প্রাধান্য দিতেই হবে। রেডিও ভালভের সঙ্গেও এই গ্যাসীয় মোক্ষণের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক।

উপরের আলোচনাগুলি যদি বিশ্লেষণমূলক পর্যবেক্ষণ করি, তবে উচ্চ বায়ুমণ্ডলের গবেষণায় শিশিরকুমার মিত্র কেন আত্মনিয়োগ করলেন তার একটা সুস্পষ্ট কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে। কারণ আগেই বলেছি তাঁর উচ্চ বায়ুমণ্ডলের বহির্ভূত গবেষণাগুলি তাঁর প্রাথমিক প্রস্তুতির পথ সুগম করেছে। যার ফলে তিনি দ্বিগুণ উৎসাহের সঙ্গে সাফল্যের শীর্ষদেশে পৌঁছতে পেরেছিলেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর ধৈর্য, অবিচল নিষ্ঠা অসীম আত্মবিশ্বাস যে কোন বিজ্ঞান সাধকের আদর্শ হয়ে থাকবে।

সুধীনকুমার মিত্র

স্বদেশ চিন্তা ॥ অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়। প্রতিমা পুস্তক। কলিকাতা—৯। মূল্য পাঁচ টাকা।

পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে এখনও অনেক বিদেশী মনীষী ভারতবর্ষকে লক্ষ্য করে বিস্ময় প্রকাশ করেন। বেদ-পুরাণ ও উপনিষদের পলিমাটিতে গড়ে ওঠা ভারতবর্ষের যে সম্পূর্ণ আলাদা একটা রূপ আছে, এ কথা তাঁরা স্বীকার না করে পারেন না। বিগত শতাব্দীতেই বিশ্বের চতুর্দিকে তার মহিমময় শাশ্বত আলোকরশ্মি বিকীরণ করেছে সমধিক। রামমোহন—বিদ্যাসাগর—মাইকেল বঙ্কিমচন্দ্র—বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষ বিশ্বের কাছে আজও বিস্ময়ের বস্তু।

পৃথিবী যেভাবে চলে ভারতবর্ষ সেভাবে চলে না। আজও সে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে অগ্রসর হয়ে চলেছে। যখনই এই বৈশিষ্ট্য বা স্বাতন্ত্র্যের পথ থেকে ভারতবর্ষ কিছুমাত্র সরে দাঁড়িয়েছে, তখনই এসেছে তার জীবনে বিপর্যয়। বিপর্যস্ত ভারতকে নিজস্ব মহিমায় পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত করতে আবির্ভূত হয়েছেন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঋষিকল্প মনীষী। ইতিহাসের পাতা উল্টে গেলে এসব ঘটনা কারো অজানা থাকে না।

ভারতবর্ষের একটি সুদীপ্ত মহান রূপ আছে, যে রূপে ভারতবর্ষ বিশ্বের অন্যান্য দেশ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও পৃথক হয়ে পড়েছে। ভারতবর্ষ যেন ধ্যানরত সৌম্য সুশান্ত এক সন্ন্যাসী। অবিশ্রান্ত জনসংঘের জড় পেষণ থেকে নিজেকে মুক্ত করে সে একাকিত্বের সাধনা করেছে, সুন্দর ও শান্তির ধ্যানাসন তৈরী করেছে চিরদিন। রাজনৈতিক দলাদলি বা প্রতিযোগিতার তীব্র সংঘর্ষ ও ঈর্ষা-কালিমার পঙ্কিলতায় যে কখনও ডুবে যায়নি, বরং সে-সবের ঊর্ধ্বে থেকে এক অত্যুজ্জ্বল আদর্শকে পালন করেছে। কর্মের বহু বিচিত্র বাসনা ও চাঞ্চল্য, জনতার নির্মম আঘাত ও জিগীষার অদম্য উত্তেজনা থেকে ভারতবর্ষ সর্বদা নিজেকে বিবিক্ত রাখতে পেরেছে বলেই এক অসীম শান্তি ও পরম মুক্তির পথে, আনন্দময় ব্রহ্মোপলব্ধির সাধনায় এগিয়ে গেছে। ভারতবর্ষের এই মুক্তি সাধনার মধ্যে আছে বিরাটতম মনুষ্যত্ব ও মহান্ সত্যের আদর্শ। এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ মানুষের আত্মিক উন্নতি যেমন সুন্দর তেমনি শ্রদ্ধেয়। ভারতবর্ষ তাই কখনও সংগ্রামপরায়ণ হয়নি। তার ধর্ম, কর্ম, গৃহ হয়নি কখনও আবিল ও উদ্‌ভ্রান্ত। ঐক্যনির্ণয়, মিলন-মৈত্রী সাধন এবং শান্তি ও স্থিতির মধ্যে পরিপূর্ণ পরিণতি ও মুক্তি লাভের পরম সার্থকতাতেই ভারতবর্ষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও গৌরবময়। রবীন্দ্রনাথ এই ভারতবর্ষকেই বলেছেন, মহামানবের তীর্থক্ষেত্র। পরম মনুষ্যত্ববোধে উদার মহিমায় সমুন্নত এই ভারতবর্ষের রূপধ্যান করে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করেছেন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমিয়রতন মুখোপাধ্যায় তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত 'স্বদেশ চিন্তা' নামক অমূল্য গ্রন্থে।

বাংলাদেশে সুধী পাঠক সমাজে অমিয়রতনের পরিচয় অজানা নয়। কবি হিসেবে তিনি খ্যাতি অর্জন করলেও প্রবন্ধকারের পরিচয়েও আমাদের কাছে তিনি অনুজ্জ্বল নন। সাম্প্রতিক

বাংলা সাহিত্যে গদ্য রচনা, বিশেষতঃ গভীর মননিষ্ঠ ও মৌলিক চিন্তাসমৃদ্ধ প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে অমিয়রতন বরণীয় গদ্যশিল্পী। তাঁর গদ্য রচনায় নিজস্ব একটি 'ষ্টাইল' বর্তমান। অমিয়রতনের এমন একটি ঘরোয়া অন্তরঙ্গ বাণীভঙ্গি আছে যে তাদ্দ্বারা চিন্তাগর্ভ জটিল বিষয়ও অতি সহজবোধ্য হয়। তথ্য-তত্ত্ব সমন্বিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ জ্ঞানের পরিচয় প্রতিটি প্রবন্ধে থাকলেও শিল্পী মনের সংযত প্রকাশে তাঁর রচনা রসগর্ভ শিল্প-কর্মেরই মর্যাদা পেয়েছে। অমিয়রতনের বিশিষ্ট কবিমনের সাক্ষরও তাঁর গদ্য রচনায় পরিলক্ষিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ অমিয়রতনের গদ্যের অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

'মাটি ও আকাশ, দেহের কর্মশক্তি ও মনের ধর্মসাধনা—দুয়ের সমন্বয়ে পূর্ণ জীবন। মাটিতেই ফুল ফোটে জানি, কিন্তু তাকে ফুটিয়ে তোলার পথে জলের মমতা চাই, আলোর আনন্দই চাই। আর বলতে কি হবে, জল নামে মেঘের আকাশ থেকে, আলো আসে সূর্যের মহাকাশের মহিমায়?' (মাটি ও আকাশের গান, পৃং ১০৭) 'স্বদেশ-চিন্তা' অমিয়রতনের পরিণত চিন্তার ফসল। এই গ্রন্থে মোট উনিশটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে :—বিশ্ব-রাজনীতি : ভারতবর্ষ; বস্তুবাদীদের উদ্দেশে আমরা; বস্তুজীবনে ব্রহ্ম; রবীন্দ্রচিন্তায় ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মবাদ; আধুনিক ভারতের ধর্মচিন্তা; বিবেকানন্দের সাধনা; এবার ফিরাও মোরে; আধুনিক কবি সমাজ; মাটি ও আকাশের গান; আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র; জীবন সাধনার অধ্যাপক : রামেন্দ্রসুন্দর; মহাত্মার ধর্ম; ধর্ম না রিলিজন, হিংসা না প্রেম; প্রেমের নতুন সমাজতন্ত্র; প্রেমবাদ : জাতীয় সমস্যা; প্রেম : জীবনের সত্য, রিয়ালিটি; ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য; স্মরণীয় আশুতোষ : জাতীয় সংহতি; আণবিক যুগে অহিংসা।

দু-একটি প্রবন্ধ ছাড়া প্রায় সব কটি প্রবন্ধেরই মূল সুর এক। ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য, সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ে প্রবন্ধগুলি সমুজ্জ্বল। সনাতন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূলে আছে মিলনমূলক ঐক্যসাধনা। বিচিত্র বা বহুর মধ্যে ঐক্য স্থাপন করতে হলে চাই সর্বাগ্রে ঐক্যানুভূতি। নিত্য বিরোধ বা দ্বন্দ্বে সর্বদাই ব্যস্ত এই পৃথিবী। বহুধা বিভক্ত এই মহাবিশ্বের মধ্যে অন্তর্লীন মিলনের সন্ধান করে যখন আপন মনে তা উপলব্ধি করা তা সম্ভব হয়, তখনই ঘটে ঐক্যানুভূতি। মিলনমূলক এই ঐক্যের সাধনাই ভারতবর্ষ বহুবিধ বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে আজও করে আসছে। ভারতের এই সাধন চিন্তার প্রবাহ উপনিষদের যুগ থেকে আজকের বিবেকানন্দ—রবীন্দ্রনাথ—অরবিন্দ—গান্ধীর যুগ পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন গতিতে যেভাবে চলেছে তার সম্যক রূপচিত্র অমিয়রতন 'স্বদেশ-চিন্তা'র বিভিন্ন প্রবন্ধে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। 'বিশ্ব-রাজনীতি : ভারতবর্ষ' প্রবন্ধে অমিয়রতন লিখেছেন—

'ভারতবর্ষ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী—কিন্তু মনে রাখতে হবে, ভারতবর্ষের গণতন্ত্র আত্মিক সাম্যকে অস্বীকার করে না, মৈত্রীর সম্বন্ধকে রাজনৈতিক কূটকৌশলের অধীন করে ভারতবর্ষ কখনও জয়লাভ করতে চায় না। শান্তিপূর্ণ সহাধিবাসের সুন্দর নীতি (Policy of Peaceful Co-existence) ভারতবর্ষের হৃদয় থেকেই সমুৎসারিত হয়েছে। যে-যার নীতি ও আদর্শ অনুসারে বাঁচুক—কিন্তু নিজেও বাঁচতে চাই—এই হচ্ছে ভারতবর্ষের প্রার্থনা।' (পৃঃ ১৯)

ভারতবর্ষের শাশ্বত বাণী ও মন্ত্রমাধুর্যে শ্রীমণ্ডিত অমিয়রতনের 'স্বদেশ-চিন্তা' গ্রন্থটি প্রতিটি স্বদেশানুরাগী পাঠকের কাছে যে বিশেষভাবে সমাদৃত হবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

অধীর দে

মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরকাল ॥ কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত। রূপা এ্যাণ্ড কোং। কলিকাতা-১২ দাম ছয় টাকা।

নামেই অনুমেয়, বইটি সাহিত্য আলোচনা গ্রন্থ। বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু সমালোচনা থাকলেও, উদ্দেশ্যবিরহিত আলোচনাই গ্রন্থকারের মূল লক্ষ্য। কিরণশঙ্করবাবু কবি হিসাবে সুপরিচিত। সংবেদনশীলতা তাঁর কবিস্বভাবের অনায়াসলব্ধ গুণ এবং পেশায় অধ্যাপক হওয়ায় হৃদয় বিহ্বলতার উর্দ্ধে তথ্যনিষ্ঠার প্রাধান্য প্রবন্ধগুলিতে লক্ষ্যণীয়। সমগ্র গ্রন্থের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ-শাখায় বিনোদিনী, দামিনী, বিমলা এই ত্রয়ী চরিত্র আলোচনা কলেবরবৃদ্ধির সহায়ক হলেও মনে হয় পরিহারযোগ্য অংশ। এগুলি বহু পঠিত গ্রন্থের চরিত্র এবং পরীক্ষার্থী ছাত্রের জন্য শুভার্থী অধ্যাপকের রচনামাত্র। স্মরণ রাখা দরকার উপন্যাস ও ছোট গল্পের প্রতি সাধারণ পাঠকের একটি অতি স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। পড়ার আনন্দেই পাঠক অন্ততঃ উপন্যাস পড়ে। পণ্ডিতী বিশ্লেষণ অপেক্ষা সাধারণ হৃদয়বৃত্তির দ্বারাই চরিত্রগুলির ভালমন্দ বিচার করা যায়। সেটা ন্যায়বিচারও বটে।

কিন্তু এই চরিত্র-বিশ্লেষণ প্রচেষ্টা সমগ্র গ্রন্থের অতি সামান্য অংশ। সমগ্র পুস্তকটি একাধিক সাহিত্য-প্রবন্ধের সংগ্রহ। প্রবন্ধগুলি পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত নয়, বিষয়বস্তুর মধ্যে একের সঙ্গে অপরের মিল খুঁজে পাওয়া দায়। কিন্তু এহো বাহ্য। বস্তুতঃ বিষয়গত বৈচিত্র্যই প্রবন্ধগুলিকে রমণীয় করে তুলেছে। আলোচনার মধ্যে কোথাও একদেশদর্শীতায় পরিচয় নেই এবং ব্যক্তিগত জীবনে কবি হওয়া সত্বেও নিজের কোন বিশিষ্ট সেন্টিমেণ্টকে জোর করে অপরের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা অনুপস্থিত।

মাইকেলের মেঘনাদবধ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের তরুণ বয়সের অকপট সত্যভাষণ ও উত্তর জীবনে অগ্রজ-নিন্দার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ শ্রদ্ধানিবেদনের আতিশয্য—দুটিই তিনি উপস্থাপিত করেছেন এবং নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে বসিয়ে রেখে বুদ্ধদেব বসুর উদ্ধৃতি দিয়ে পাঠককে নিজ মতামত নির্দ্ধারণের সুযোগ করে দিয়েছেন। 'উত্তরকালের চোখে রবীন্দ্রনাথ' আর একটি উদার দৃষ্টিপাত। রবীন্দ্রনাথের মত দুকূলপ্রসারী দিগন্ত বিস্তারী প্রতিভার কণামাত্র নিজ ভূমিতে সেচন করে তাঁর সমসাময়িক ও উত্তরকালের কবিরা প্রচুর ফসল ফলিয়েছেন। ফসল গোলাজাত হয়েছে, আবার পরবর্তী ঋতুতেও নির্ঘণ্ট অনুসারে পুনরায় নিজ জমিকে উর্বর করার জন্য সেচন করা হয়েছে সেই

অপার অসীম জলধারা। কিন্তু কোনদিন সেই প্রাণোচ্ছলা স্রোতস্বিনীর গভীরতার পরিমাপ করা হয়নি। গ্রন্থকার ঠিকই বলেছেন, "প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী যাবৎ রবীন্দ্র প্রতিভা সম্বন্ধে এদেশীয় পাঠক সমাজের সচেতনতা ভাবালুতার সমার্থবাচক এবং উপলব্ধির গভীরতার বদলে অর্বাচীন উচ্ছ্বাসই দীর্ঘকাল যাবৎ রবীন্দ্র সাহিত্য প্রীতির আন্তরিক নিদর্শনরূপে বিজ্ঞাপিত হয়েছে।" এই অশোভন অবস্থা মেনে নিয়েও গ্রন্থকার নিপুণ হাতে বাছাই করে সেকাল ও একালের কবিদের রবীন্দ্র-অর্ঘ পাশাপাশি সাজিয়েছেন। এতে তুলনামূলক বিচারের কাজ সহজ হয়। যদিও এবাছাই অসম্পূর্ণ এবং রবীন্দ্র স্তুতিকারদের মত রবীন্দ্র বিরোধীদেরও যে স্বল্পায়ু ভূমিকা ছিল তার কথা গ্রন্থকার উল্লেখ করেননি। রবীন্দ্র বিরোধী মহলের সবাই খুব দুর্বল নয়। অন্ততঃ সমসাময়িক কালের দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে হলে তাঁদের সমালোচনার (যা ধোপে টেকেনি) অংশ বিশেষও উদ্ধৃত করা দরকার। যতদূর মনে পড়ে, ডঃ আদিত্য ওহদেদার তাঁর রবীন্দ্র সাহিত্য সমালোচনার ধারা গ্রন্থে বিরোধী পক্ষের বক্তব্য বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন।

"সাহিত্য-চিন্তায় ধূর্জটিপ্রসাদ" গ্রন্থের অন্যতম মূল্যবান সংযোজন। প্রচুর গুণগ্রাহী এমন কি খুব সচেতনভাবে তাঁর রচনাপদ্ধতি অনুকরণকারীর সংখ্যা কম না হওয়া সত্ত্বেও ধূর্জটিপ্রসাদ আজও সর্বাধিক অনালোচিত ব্যক্তি। সবুজপত্রের যুগে তার লেখকবৃন্দ বৈদগ্ধের সঙ্গে ষ্টাইলের যে সমাহার ঘটিয়েছিলেন, ইওরোপীয় সমসাময়িক চিন্তার আলোকে বাছ-বিচার করবার যে প্রবণতা তাঁদের রচনাদিকে বুদ্ধিজীবীদের কাছে অপরিহার্য করে তুলেছিল—তার অনুশীলন পরবর্তীকালেও চলেছে। পার্থক্য এই, এখনকার লেখকদের অনেকেই তাঁদের মার্জিত রুচিকে এত অধিক মার্জিত করে পরিবেশনের চেষ্টা করছেন যে চেষ্টা প্রায় স্ববারির পর্যায়ে গিয়ে ঠেকছে। আত্মসংযম বীরবলী রচনার প্রধান গুণ। সামান্য কিছু শব্দের সুনিপুণ প্রয়োগ, "বর্তমানের চঞ্চল এবং বিক্ষিপ্ত মনোভাব সকলকে সংক্ষিপ্ত ও সংহত করে প্রতিবিম্বিত করাই" এর বৈশিষ্ট্য। সংক্ষিপ্ত শব্দ প্রয়োগের অর্থ ভাষাকে নিরাভরণ করা নয়—এ তত্ত্ব যিনি বীরবলী রচনা পড়েননি তাঁকে বোঝানো দায়। ধূর্জটি প্রসাদের সাহিত্যচিন্তার উন্মেষ হয়েছিল সেই সবুজ-পত্রের যুগে এবং তিনি সেই ধারাকে শিক্ষিত বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক জীবনে প্রবাহিত করে প্রাচ্য-চিন্তাধারার ঐক্য সাধনে ব্রতী হয়েছিলেন। স্মরণীয় যে, তখনও মস্কো থেকে মার্কসবাদী চিন্তাধারা এদেশীয় বুদ্ধিজীবীর মনকে প্রবলভাবে আচ্ছন্ন করেনি এবং ফ্রান্সই ছিল সংস্কৃতির মক্কা।

মধুসূদন-রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরকাল শুধু যে সুচিন্তিত প্রবন্ধের সমষ্টি তাই নয়, পাঠান্তে পাঠককে নূতন দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করতেও সাহায্য করবে।

চণ্ডী লাহিড়ী

তবু বসন্তের জন্য ॥ অলকেন্দু শেখর পত্রী ॥ পরিবেশক : সিগনেট বুক শপ। ১২ বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দু' টাকা ॥

আধুনিক বাংলা কাব্যের আসরে 'তবু বসন্তেয় জন্য' একটি নতুন কাব্যগ্রন্থ; প্রণেতা অলকেন্দুশেখর পত্রীও বলা যেতে পারে, একেবারে নবাগত। বর্তমান গ্রন্থে স্বল্প আয়তনের মধ্যে মোট আঠারোটি কবিতা সঙ্কলিত হয়েছে। শ্রীযুক্ত অলকেন্দুশেখরের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য, তিনি এক অন্যতর কাব্যিক রীতির আশ্রয় নেবার চেষ্টা করেছেন; ছন্দ কারুকর্মের অনিবার্য অথচ প্রথাসিদ্ধ পথকে এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেছেন। অবশ্য সর্বত্র তাতে যে তিনি সুফল লাভ করেছেন সেকথা আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

'তবু বসন্তের জন্যে' কাব্যগ্রন্থে বুদ্ধির পাঁয়তারা অনুপস্থিত—সাধারণ কাব্যপাঠকের নিকট সেটি বিশেষ আগ্রহের বস্তু। তবে জীবনের প্রতি যে অন্যতর দর্শন কবি আজকের রোমান্টিকতার মধ্যে সঞ্চারিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন সেটি আরও অধিক বয়সের অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি হিসেবে দেখতে পেলে পাঠকের আরো খুশির কারণ ঘটতো বলেই আমাদের বিশ্বাস। যেহেতু একই সঙ্কলনের অন্যত্র তারুণ্যের বিশেষ বিশেষ লক্ষণাবলী পাঠকের দৃষ্টি এড়াতে পারে না। কবি নিবেদন করেছেন: 'রক্তের জন্যে। রক্তের ভিতরে। 'রক্ত' আর 'রক্তাক্তের' মধ্যে দিয়েই সব কবিতাগুলির জন্ম।' এবং 'পরে: জীবন পেয়েছি বলেই সংগ্রামকে মেনে নিতে হয়েছে। আর এই সংগ্রামের পথে পারস্পরিক দুটি দ্বন্দ্বের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে: একদিকে—স্বপ্ন সাধ আর স্বাদ: অন্যদিকে—ভাঙ্গন ক্ষরণ আর মরণ: এ-দুটি দ্বন্দ্বের উপর দাঁড়িয়েছে আমার 'তবু বসন্তের জন্যে'। সুখের কথা, বর্তমান কবির কাছে জীবন শুধু আবেগ নয়, বস্তুর আরাধ্য—সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জনের বস্তু:

> 'তবু বসন্তের জন্যে
> আবার সংগ্রাম
> আবার বাঁচবার জন্যে
> সংগ্রামের ভেলা ভাসে···
> লখিন্দরের
> যে রক্ত দোলে বার বার
> বেহুলাকে ঘিরে।'

কবির অনুভূতি ঘিরে এক যন্ত্রণা কাতর সংগ্রামী মন বিদ্যমান—বক্তব্যের যোগফলে সম্পদ আছে কিন্তু আবেগাশ্রয়ী মনের প্রাধান্য বর্তমান থাকায় ভিতরের শক্তি সংযমহীনতায় পর্যবসিত হয়েছে ক্ষেত্র বিশেষে। অবশ্য কবিজীবনের সূত্রপাতেই এতখানি আশা আমরা করবো না, যেহেতু মনে হয় বর্তমান রচনাবলী বর্তমান কবির প্রথম পর্যায়ের ফসল।

'তুটি গোলাপের দ্বন্দ্বে', 'রক্তের ঘরে', 'বুকের কাছে', 'এই ঘরে', 'কবিতা প্রসঙ্গে,' 'রবীন্দ্রনাথ' ইত্যাদি কবিতাগুলি কবির বলিষ্ঠ অনুশীলনতার স্বাক্ষর। কবিতার জন্যে কবির হৃদয়ের প্রতিবেদন পাঠক হৃদয়কে অচিরেই স্পর্শ করবে :

'হায়রে কবিতা দগ্ধতা !
কোথায় মিলবে স্নিগ্ধতা
কবিতার বুকে
বুক রেখে শুধু অশ্রুপাত।'

কিংবা,

'হায়রে কবিতা রক্তপাত!
কোথায় মিলবে গভীর রাত
বুকে
বুক রেখে অশ্রুপাত' ইত্যাদি।

ইন্দ্রনীল সেন

আমার মৃতমুখ ও অন্যান্য কবিতা : নির্মল মিত্র। আঁসাবল্, ৬৮/১, সূর্য সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯।

দর্পিত প্রহরে : শিবেন চট্টোপাধ্যায়। দাম : ২ টাকা।

সমুদ্রের দিকে : অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়। দাম : ২'৫০ টাকা প্রকাশক : গ্রন্থজগৎ, ৬, বংকিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২।

সম্ভবত এটি কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ। গ্রন্থটিতে মোট ৫টি দীর্ঘ কবিতা আছে। বিষয় বস্তু মূলতঃ প্রেম। বইটি পড়ে কবির ক্ষমতা আছে নিঃসন্দেহে স্বীকার করতে হয়। কিন্তু নানা বিজ্ঞানের তথ্যে ও পারিভাষিক এবং ইংরাজী শব্দের অত্যাধিক প্রয়োগে তিনি কবিতাগুলিকে অনেকাংশে খণ্ডিত করেছেন। 'ইউকা ও প্রনিউবা আছে', 'হারমাট্টানও নিরত হয়; ব্লিজার্ডের তাড়া খাওয়া পাখি।' এই ধরণের পংক্তি তার কবিতায় আরো অনেক আছে। আবার তার সঙ্গে সঙ্গে এই ধরণের মগ্ন ও অনুভবে নিবিড় পংক্তিও আছে—'একটি নারীর উপমা খুঁজতে, খুঁজতে | আপাততঃ আমি মৃত্যুর সম্মুখে এসে উপস্থিত।' কিংবা, 'কিছুক্ষণ হল স্বপ্নে আমি আমার মৃতমুখ | দেখে নিয়েছি। | আমার সেই মুখের কোথাও | আমি কোন ক্ষোভের রেখা দেখতে পেলাম না।' কবি এই গ্রন্থটিকে 'পরীক্ষামূলক' বলে অভিহিত করেছেন। জানি না ঐ ধরণের শব্দ প্রয়োগই কবির কাছে কবিতাগুলিকে পরীক্ষামূলক করে তুলেছে কিনা। যদি তাই হয় তবে ঐ স্বেচ্ছাকৃত, সচেতন পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন বলে মনে করি না। আর যে ত্রুটি কবিতাগুলোকে বিকলাঙ্গ করেছে, তা যদি কবির স্বেচ্ছাকৃত না হয় তবে এ কথাই প্রমাণ হয় যে কবির কবিতার

কান এখনও তৈরী হয়নি। ধ্বনিবোধ কবির এখনও অনায়ত্ত। বইটিতে 'ভালবাসা দিগন্তের মত', ও 'আমার মৃতমুখ' নিঃসন্দেহে ভালো কবিতা। আঙ্গিকের দিক থেকে সব কবিতাগুলিই ছন্দোগত ভাবে অ-বিচিত্র। সেজন্য স্থানে স্থানে একঘেঁয়ে লাগে। বইটির শেষে একটি পরিশিষ্ট আছে। সেটি কবির ব্যবহৃত দুর্গম শব্দগুলির মানে বই। সেখানে তিনি তার কবিতার একটি অংশ বুঝতে হলে 'Hoyle দ্রষ্টব্য' বলে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি যে এই সমস্ত অনেক কিছু জানেন তা বোঝা গেল। তবে তাঁর কবিতায় যখন ক্ষমতার স্বাক্ষর অনুপস্থিত নয়, তখন আমার অনুরোধ, তিনি কবিতায় অনুভবকে স্থান দিন। পাণ্ডিত্য প্রকাশের জন্য বরং অন্য ধরণের বই লিখুন।

"দর্পিত প্রহরে" কাব্য গ্রন্থটিতে মোট ২৫টি কবিতা স্থান পেয়েছে। 'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহ দহন লাগে, তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে।' (রবীন্দ্রনাথ)। এই হচ্ছে কবির কাব্যভাবনার মূলসুর। কবির ঈশ্বরবিশ্বাসী মন বিশ্বাস করে যে দুঃখ-গ্লানি-যন্ত্রণা সমস্ত কিছু অতিক্রম করে 'অমৃতের সন্তান' মানুষ অমৃতময় আনন্দলোকে একদিন উপনীত হবে। সেজন্য কবিকে দুঃখ রিক্ত করে না। কোথাও, কোথাও দুঃখ-সমর্পিত হলেও (যেমন—'ভাঙা ঘরের হাহাকারে, প্রান্তরের অন্ধকারে ইত্যাদি কবিতা) মূলতঃ নৈরাশ্যের তীব্র নিষ্ঠুরতায় কবি বিধ্বস্ত নন। তাই তিনি বলেন, 'কারণ | ঝড়ের মুখে শিঙা ফুঁকে দূর পাহাড়ের পথ ভেঙে | এখনি এগিয়ে আসবে | রাজার স্বর্ণরথ। (ঝড়ের চূড়ায়) কিংবা, 'ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ মন্ত্র কাঁপে | বৃষ্টির স্নায়ুতে' (হাঙরের মুখে দাঁড়িয়ে)। চিত্রকল্প রচনায় কবি দক্ষ। শব্দ চয়নেও দর্পিত যৌবন-প্রহরের দর্পোত্তাপ অনুভব করা যায়। 'আমার রাজার চিঠি' কবিতাটি সত্যই একটি সুন্দর কবিতা। তবে ছন্দের বিভিন্নতা তাঁর কবিতায় অনুপস্থিত। তাছাড়া রচনার স্থানে স্থানে কবি খানিকটা অপরিমিত এবং বক্তব্য পেশে স্থানে, স্থানে তিনি অত্যধিক স্পষ্ট হওয়ায় কবিতার রহস্যময়তার সংকেত প্রদর্শনে তাঁর কবিতা স্থানে স্থানে অপারগ। তবুও 'এহ বাহ্য'। কারণ তাঁর কবিতা মনকে অন্যত্র নিয়ে যায়, অনুভবকে জাগরিত করে। আর সেজন্য সৎকবিতা পাঠক মাত্রই এই গ্রন্থটিকে সমাদৃত দেখলেই খুসী হবে।

'সমুদ্রের দিকে' কবির দ্বিতীয় কাব্য গ্রন্থ। এতে মোট ৩২টি কবিতা আছে। অরুণবাবুও দুঃখে-ভেঙে পড়া মানসিকতার পরিপন্থী। তবে ইনি অধিকতর লৌকিক ও সমাজ সচেতন। কবি পৃথিবীকে ভালবাসেন। যেখানে, "ছিমছাম ঘরে, তুলতুলে বউ, | ফুটফুটে মেয়ে, রঙচঙে জামা পরা…॥"—সেখানে কবির মন পড়ে থাকে। প্রেমের কবিতায় কবির অনুভব সাড়া দেয়। (তার মুখ)। পৃথিবীর পরিবর্ত্তন কবি বুঝতে পারেন। (রূপকথা)। জন্ম-মৃত্যুর ভাবনাতে —ও কবি অনিচ্ছুক নন। ('আদিম সেই লোকটা', 'কবরে')। কিন্তু কবির অনুভবগুলো মাঝে মাঝে বড্ডো বেশী মধ্যবিত্ত বলে মনে হয়। তখন তিনি কবিতার সার্থকগন্তব্য অন্যতর অলৌকিক জগতে আমাদের নিয়ে যেতে পারেন না। তার ছন্দের প্রতি অতি আসক্তি ও মাঝে মাঝে কবিতাকে লঘুতা প্রদান করে। অপ্রযুক্ত শব্দ-চয়ন এবং বক্তব্য প্রকাশের ঋজুতা নয়,

সহজতা কবিতাগুলিকে গভীরতা বঞ্চিত করে। সমুদ্রের দিকে, সেই আদিম লোকটা, কবরে, তার মুখ; কবিতাগুলি এ গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য কবিতা। প্রথম গ্রন্থের চেয়ে এ গ্রন্থে কবি অনেক পরিণত। আশা করি যে সমুদ্রের দিকে কবি এখন চলেছেন সেই সমুদ্রের গভীরতায় কবির পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ আমাদের অনুভবকে মগ্ন করবে। লৌকিক জগতের সুখ-দুঃখে তখন অলৌকিক রহস্যের মুখচ্ছবি ফুটে উঠবে।

সজল বন্দ্যোপাধ্যায়

Regd. No. C-315 Phone : 23-5155 September '65 (0.50) Central Regd. No. R.N.2602/57 SAMAKAL

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমকালীন

ত্রয়োদশ বর্ষ ॥ আশ্বিন ১৩৭২
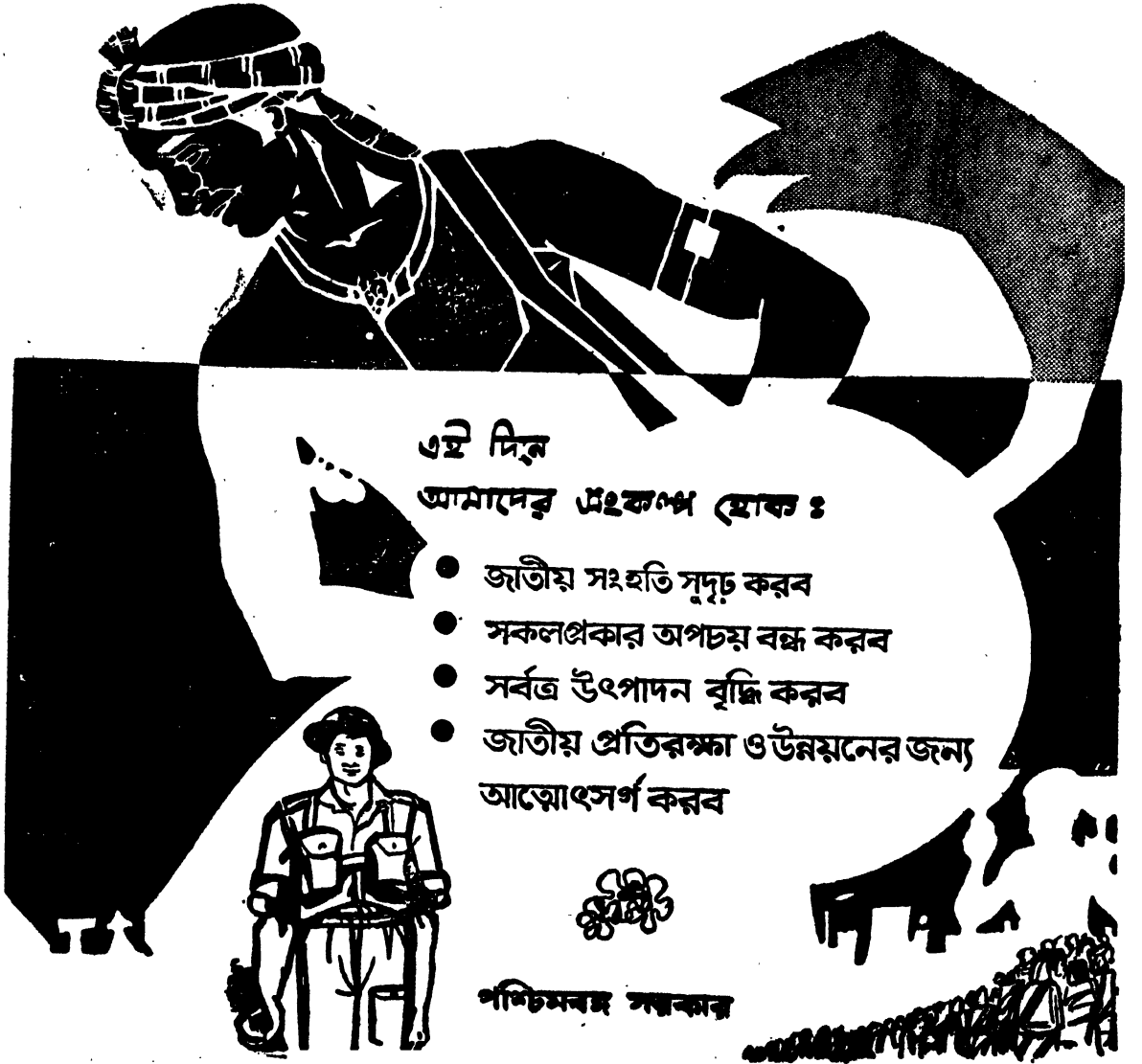
এই দিন
আমাদের সংকল্প হোক ঃ
জাতীয় সংহতি সুদৃঢ় করব
সকলপ্রকার অপচয় বন্ধ করব
সর্বত্র উৎপাদন বৃদ্ধি করব
জাতীয় প্রতিরক্ষা ও উন্নয়নের জন্য
আত্মোৎসর্গ করব
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আনন্দে
উৎসবে
প্রাত্যহিক প্রয়োজনে..
সবার মনোরঞ্জনে..
পরিমাসরমনীয়
কেশতৈল
কেশরঞ্জন
ক. বিরাজ এন্. এন্. সেন এণ্ড কো. প্রাইভেট লিমিটেড।

ROHTAS
ROHTAS INDUSTRIES LIMITED
DALMIANAGAR, (BIHAR)
RPC-RI/P:349

YELLOW LABEL
LIPTON'S TEA
LIPTON'S

QUALITY RUBBER PRODUCTS .....
OUR SPECIALITY
PATHASATHI
&
PATHABIR
CYCLE TYRE & TUBE
A.R.P
1 INSERTION SHEET
2 RUBBER TUBE & HOSE
3 V BELT
4 HORN-BULB
5 SOLE-HEEL
6 TRI-CYCLE RUBBER PARTS
7 SPONGE PAD
8 PEDAL
9 SADDLE-TOP
10 BRAKE-RUBBER
11 PLAY BALL
12 BLADDER
13 HOT-BAG
14 RUBBER CLOTH
15 ERASER
STOCKISTS ALL OVER INDIA
ASSOCIATED RUBBER & PLASTIC WORKS
CALCUTTA • DUM-DUM

ত্রয়োদশ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

আশ্বিন তেরশ' বাহাত্তর

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

বয়সটাই সব নয়… অতীত ঐতিহ্যের মূল্য নিঃসন্দেহে অসামান্য, তবু শুধুমাত্র তাই সম্বল করে কোন প্রকারে দিনপাত করতে আমরা চাই নি। বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে যে সব প্রতিষ্ঠান শিল্পায়নের দ্বারা দেশকে আত্মনির্ভর করার পুণ্য ব্রত নিয়ে পদক্ষেপ করেছিল সেই পথিকৃৎদের মধ্যে মার্টিন বার্ন সংস্থা অন্যতম। সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিচক্ষণতা এবং ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সর্বজনগ্রাহ্য সূত্রগুলি যথাযথভাবে অনুসরণ করাই আমাদের সিদ্ধিলাভের মূল মন্ত্র। আমরা কখনও স্থিতাবস্থার সঙ্গে আপোস করি নি, কিংবা উৎপাদনের পরিমাণ না বৃদ্ধি করে পণ্যদ্রব্যের চাহিদা স্বতঃই প্রসার লাভ করবে এমন আশাও পোষণ করি নি। আমাদের বিশ্বাস বর্তমানে যে সমৃদ্ধি এবং সুষম অখণ্ডতা আমরা লাভ করেছি তা সম্ভব হয়েছে এই সব কারণেই। যতটুকু সুনাম আমরা অর্জন করতে পেরেছি সর্বপ্রযত্নে তা রক্ষা করতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

বয়সটাই সব নয়…

মার্টিন বার্ন গোষ্ঠীর অন্তর্গত শিল্প-প্রতিষ্ঠান :

দি ইণ্ডিয়ান আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানি লিমিটেড : বাৎসরিক দশ লক্ষ টন ইস্পাত তৈরী হয় এঁদের বার্নপুর কারখানায়। বার্নপুর বর্তমানে উৎপাদন শক্তি আবার দ্বিগুণ করার দ্বিপর্বযুক্ত এক নতুন পরিকল্পনায় ব্যস্ত। কুলটিতে এঁদের ঢালাই কারখানাটি কমনওয়েলথের মধ্যে সর্ববৃহৎ। এই কারখানার উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি ও নতুন কর্মপদ্ধতি প্রয়োগে এঁরা সর্বদাই সচেষ্ট।

দি ইস্কো স্ট্যানটন পাইপ অ্যাণ্ড ফাউণ্ড্রি নামে সম্প্রতি এই কোম্পানির অন্তর্গত একটি নতুন প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন করা হয়েছে—এঁদের কারখানাটি হল উজ্জয়িনীতে। অতি আধুনিক পদ্ধতিতে স্পান পাইপ ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক জিনিস এখানে তৈরী হবে।

বার্ন অ্যাণ্ড কোম্পানি লিঃ—হাওড়া : গোড়াপত্তন ১৭৮১ সালে। ভারতের প্রথম ঢালাই কারখানা—মালগাড়ি প্রভৃতি নানাবিধ রেলওয়ে সামগ্রী এবং ইস্পাতের বড় বড় কাঠামো ইত্যাদি প্রস্তুতকারক।

বার্ন অ্যাণ্ড কোম্পানি লিঃ রিফ্র্যাকটারি গোষ্ঠী : চারটি রাজ্যে অবস্থিত আটটি কারখানা—যাবতীয় রিফ্র্যাকটারি সামগ্রী প্রস্তুতকারক। ইস্পাত কারখানা, বিজলী উৎপাদন কেন্দ্র, রেলওয়ে—এক কথায়, যেখানেই ফার্নেস ব্যবহার করা হয় সেখানেই বার্ন কোম্পানির রিফ্র্যাক্টারির প্রয়োজন।

দি ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগন কোম্পানি লিঃ, সাঁত্রা : একান্তভাবে মালগাড়ি নির্মাণে অগ্রণী প্রতিষ্ঠান। বস্তুত এদেশে মালগাড়ি নির্মাণ শিল্পের প্রধান উদ্যোক্তা বলা চলে। বর্তমানে এখানে ভারী শিল্প ও মোটর গাড়ির জন্য স্প্রিং, ফোর্জিং, স্ট্যাম্পিং প্রভৃতিও প্রস্তুত হয়।

দি হুগলি ডকিং অ্যাণ্ড এঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানি লিঃ : ১৮১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত। শিপ বিল্ডিং ইয়ার্ড, ড্রাই ডক ইত্যাদি সর্ববিধ ব্যবস্থাসম্পন্ন জাহাজ তৈরি ও মেরামতের কারখানা।

রবার্ট হাড্সন (ইণ্ডিয়া) লিঃ : ছোট রেলের নানাবিধ সামগ্রী প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানগুলির অগ্রণী। বিবিধ খনিজ শিল্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

লাইট রেলওয়ে কোম্পানি : ভারতের প্রথম ছোট রেল প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম—চারটি রাজ্যে ছ'টি রেলওয়ে প্রতিষ্ঠান।

ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোং : বিজলী উৎপাদন ও সরবরাহের কয়েকটি অগ্রণী প্রতিষ্ঠান। উত্তর ও মধ্যপ্রদেশের বিস্তৃত অঞ্চলে বিজলী উৎপাদন ও সরবরাহ করে।

দি জন বার্ন ক্রেন কোম্পানি লিঃ—ম্যাঞ্চেস্টারের জন্ ক্রেন কোম্পানির সহযোগিতায় হস্তচালিত ও বিদ্যুৎচালিত ওভারহেড ট্রাভলিং ক্রেন প্রস্তুতকারক। চেনপুলি ব্লকও প্রস্তুত করে।

রেরোল বার্ন লিমিটেড : ইংলণ্ডের এ, রেরোল অ্যাণ্ড কোম্পানি লিমিটেড-এর সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত এই কারখানায় বিশেষ ধরনের ইলেক্ট্রিক সুইচগীয়ার তৈরী হবে।

মার্টিন বার্ন লিমিটেড

কলিকাতা নয়াদিল্লী বোম্বাই কানপুর পাটনা

মুঘল ফরমান

নারায়ণ দত্ত

"পরদিন দরবারে বসিয়া, আম-দরবার খুলিবার আগে, নিভৃতে মবারককে ডাকিয়া বাদশাহ বলিলেন, 'এক্ষণে তোমার সকল অপরাধ আমি মার্জনা করিলাম। কেননা, তুমি আমার জামাতা। আমার জামাতাকে নীচপদে নিযুক্ত রাখিতে পারি না। অতএব তোমাকে দুই হাজারের মনসবদার করিলাম। পরওয়ানা আজি বাহির হইবে।" (রাজসিংহ—বঙ্কিমচন্দ্র)

সম্রাট তো বলেই খালাস কিন্তু পরওয়ানা—আইন-ই-আকবরী যাকে সনদ বলেছে এবং সাধারণতঃ যাকে ফরমান বলা হয়—সেই হুকুম তামিল করতে মুঘল আমলাদের কি কষ্টসাধ্য প্রথার মধ্যে দিয়ে যেতে হত—সেটা সত্যি দেখবার মত। আজকাল কথায় কথায় রেডটেপিজিম—সরকারী কাজে লাল ফিতার অভিযোগের কথা শোনা যায়। কিন্তু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে এই দস্তুর ইংরাজ আমলের কিছু নতুন আমদানি নয়। এই ঐতিহ্য মুঘল আমলের। আর জাল জোচ্চুরি প্রভৃতি ব্যাধির হাত থেকে বাঁচবার জন্যে মুঘল সরকারের এইটে ছিল মস্ত দাওয়াই। এছাড়া উপায় বা কি ছিল!

মুঘল আমলাতন্ত্রের এই ফরমান জারির আদলটা বুঝিয়ে বলতে গেলে দরবারের কয়েকটা রেওয়াজের কথা আগে বলতে হয়। এর বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে মুঘল শাসন ব্যবস্থার আকর গ্রন্থ—আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীতে। তাতে বলা হয়েছে দরবারের বা যে-কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে সম্রাটের আদেশ, কথাবার্তা, এমনকি চলনবলন পর্যন্ত নিখুঁতভাবে রিপোর্ট করবার জন্যে দরবারে কিছু লোককে পোষা হত। এদের বলা হত ওয়াকিনবিশ। মুঘল দরবারের এই রিপোর্টারদের সংখ্যা ছিল সর্বসাকুল্যে চোদ্দ। অর্থাৎ সপ্তাহে দুজন দরবারে হাজিরা দিত। সম্রাট

যা বলতেন বা করতেন বা মুঘল আমীর-উজিররা সম্রাট সমীপে যা যা নিবেদন করত নির্জলা বিশ্বস্ততায় সবই তাদের খাগের কমলের ডগায় হুবহু লেখা হয়ে যেত। আবুল ফজল বলেছেন— সম্রাটের প্রাত্যহিক গাত্রোত্থানের কাল, আমীর মনসবদারদের নিয়োগ, ইনাম বা পুরস্কার দেওয়া, নজরানা বা পেশকাশ, বিশেষ ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, সৈন্যদলের কুচকাওয়াজ, হাতিশালা বা ঘোড়াশালা পরিদর্শন এবং সর্বোপরি এইসব উপলক্ষে সম্রাটের মন্তব্য ঘুরে ঘুরে টুকে রাখত মুঘল ওয়াকিনবিসরা। কাকডাকা সকাল থেকে গভীর রাত্রে লাস্যময়ী নর্তকীর নুপুর নিক্কণ শুনে কখন যে বাদশা নিদ্রার কোলে ঢলে পরবেন—এক সময়ে তাঁকে মুঘল হারেমের দুগ্ধফেননিভ শয্যায় সমর্পণ করা হবে—মুঘল রিপোর্টারদের নিদ্রাজড়িত চক্ষে তাও তাদের ডায়ারিতে লিখে রাখতে হত। সেকালের কোন প্রেস কমিশন সেই জোড়্কলম রিপোর্টারদের এই দুর্ভাগ্যের হাত থেকে বাঁচাতে পারত না!

সে যাই হোক, ওয়াকিনবিশদের লেখা এই ডায়ারির খবরদারি করত সেদিনের দরবারের কোন সম্ভ্রান্ত আমীর বা রেশালাদার; আর তাঁর দস্তখতকরা সেই রোজনামচা পেশ করা হত সম্রাটের কাছে। তাঁর অনুমোদন পেলে সেগুলি পাঠান হত কেরানীদের কাছে। তারা প্রত্যেকটা হুকুমের, প্রত্যেকটা ঘটনাকে আলাদা করে একটা নকল করতেন। এই নকলে তাদের সই করতে হত। আজকাল যেমন সকল অফিসের চিঠির 'অফিস কপিতে' দস্তখত করেন 'ডিলিং ক্লার্ক', তেমনি আর কি! কেরানীদের সই-এর পর তাতে সই করত পরবঞ্চী এবং মীর আরজ (১)। সবশেষে সই করত সেই আমীরটি সম্রাটের অনুমোদনের জন্য মূল ডায়ারিটি যিনি সম্রাটের সমীপে পেশ করেছিলেন। এই নকল করা আদেশপত্রগুলিকে বলা হত ইয়াদদস্ত এবং এরপর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা দপ্তরের হাতে সেগুলি তুলে দেওয়া হত যথাবিহিত করার জন্যে।

সম্রাটের সীলমোহর যে আদেশগুলিতে লাগত না তাদের বলা হত 'পরবঞ্চ'। জরুরী ব্যাপার মানে জায়গির দেওয়া, মনসবদারের পদে নিয়োগ অর্থাৎ সম্রাট আরঙজেব মবারক খাঁকে যে আশ্বাস দিয়েছিলেন তার পরওয়ানা বার করবার জন্যে মুঘল আমলাদের আরও জটিল ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে যেতে হত। আর তারই জন্যে দরকার হত সেকালের মুঘল অফিস। একপাল নকলনবিশ। সুন্দর তাদের হস্তাক্ষর। মুক্তোর মত। আর 'প্রেসি' বা ভাবসংক্ষেপ করতে তাদের জুড়ি মেলা ভার। কম কথায় ঝরঝরে ভাষায় বৃহৎ ব্যাপার তারা লিপিবদ্ধ করত। হংসের মত ইয়াদদস্তের দুধ থেকে জল ফেলে সারটুকু গ্রহণ করত তারা। ইয়াদদস্তটা এই অফিসেই জমা পড়ত। তার সংক্ষিপ্তসার ওয়াকিনবিশ, রিশলাদার, (২) মীর আরজ এবং দারোগার সই সহযোগে এই অফিস থেকেই বার হত। এর নাম তখন তালিকা। তালিকা লিখত তালিকানবিশ। আর খুঁটিয়ে দেখত এই তালিকায় সবশেষে যেন রাষ্ট্রমন্ত্রীর সই থাকে। ব্লকম্যান অনূদিত আইন-ই-আকবরীর সূত্রে কেমন যেন মনে হয় এই তালিকার শেষ স্বাক্ষরটি থাকত মুঘল যুবরাজের। লক্ষ্য করবার মত যে এই তালিকাতেও পরবঞ্চের মত সম্রাটরা সই করতেন না। অন্ততঃ মুঘল আমলাতন্ত্র তার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি। করেনি কেননা রাষ্ট্রের সত্যিকারের গুরুতর ব্যাপার এর আওতায় আসত না।

এখন এই গুরুতর ব্যাপারগুলি কি ? সম্রাটের সীলমোহর যাতে যাতে দরকার তার দীর্ঘ তালিকায় সম্রাট-সখা আবুল ফজল তাঁর আইন-ই-আকবরীতে লিখেছেন—যে নিয়োগের ব্যাপারে বিশেষ করে মহামাত্য বা উজিরিআনা, সদর বা আইনমন্ত্রী, মীর বক্সী বা একালের প্রতিরক্ষামন্ত্রী, প্রাদেশিক শাসনকর্তা, আমীর-উল-উমরা, যুবরাজের শিক্ষক এবং মনসবদার নিয়োগের ব্যাপারে সম্রাটের সীল ছিল অপরিহার্য। এই সব চাকরীর ব্যাপার ছাড়া জায়গির দেওয়া, দান খয়রাত বা প্রাত্যহিক সেবাব্রত বা অন্যান্য কল্যাণ কর্মের জন্যে চাকরান দেওয়া (সয়ুরঘাল) বা জমি মঞ্জুর করার জন্যও সম্রাটের সীলমোহর দরকার হত।

আর এই ফরমান 'ইস্যু' করার জন্যে যে সব রীতকরণের মধ্যে দিয়ে যেতে হত তা স্বাভাবিক কারণেই যথেষ্ট দীর্ঘসূত্রী। কোন নিয়োগের সনদের কাগজপত্র অবশ্য দেওয়ান, বকসী এবং সাহিব-ই-তৌজী বা সাময়িক হিসাবরক্ষকের হাত দিয়ে পার হত। তারও আগে এইসব সরকারী আদেশের তালিকাটি জায়গিরের হিসেবপত্র যিনি রাখতেন সেই দেওয়ান-ই-জায়গিরের কাছে পাঠান হত। যদি সামরিক কৃতিত্বের জন্য এই জায়গির কবুল করা হয়ে থাকে তবে কাগজপত্র মীর বক্শী বা মুঘল প্রতিরক্ষামন্ত্রীর দফতরে পাঠিয়ে দেওয়া হত। মীর বক্সীর কাজ হত যাকে এই জায়গির দেবার হুকুম হয়েছে সে এই নিয়োগের সব সর্তাদি পালন করে কিনা সেটা বিচার করে মতামত দেওয়া। মীর বক্সী এইসব ব্যাপারে ছিল সেকালের যাকে বলে 'রেকমেণ্ডিং অথরিটি'। প্রকারান্তরে সুপারিশ করা তাঁর কাজ। শুধু তাই নয় মীর বক্সী এই তালিকাটি তাঁর দপ্তরে রেখে দিতেন। আর তার বদলে একটা সার্টিফিকেট দিতেন। এই সরকারী 'সংসালেখ'টির মুঘল নাম ছিল সরখাত। এতে মীর বক্সী ভাবী জায়গিরদারের মাসমাহিনাটি লিখে তাঁর সীলমোহর এঁটে দিতেন। এই সরখাত যেত বক্সীদের হাত ঘুরে স্বয়ং দেওয়ানের কাছে। দেওয়ান এই হিসেব থেকে প্রার্থীর মাস মাহিনার হিসাব কষে আবার সম্রাটের সমীপে সেটি নিবেদন করতেন।

এই সরখাত পড়ে সম্রাট তাঁর প্রথম আদেশের পুনর্বিবেচনা করতেন। অন্ততঃ তার সুযোগ পেতেন বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন। এর পরও সম্রাট যদি হ্যাঁ বলেন যদি লেখেন 'নভী-সন্দ' (লিখে ফেলা হোক) তবেই দেওয়ান তাঁর দপ্তরের করনিকদের কাছে সম্রাটের আদেশ মত জায়গীরদানের একটি ফরমান মুসাবিদা করবার হুকুম দেন। এই ফরমানের নক্সা আঁতি পাঁতি পরীক্ষা করে দেখে তবে সেই কাঁচা দলিল পাকা করা হত। আইন-ই-আকবরীর ঐতিহাসিক বলছেন—যে সনদ বা ফরমানের বাইরের দিকে মার্কা বা সীলমোহর পড়ত পর পর চারটে—সংশ্লিষ্ট দপ্তর, দেওয়ান, বক্সী ও দেওয়ানের হিসাব রক্ষকের। এরপর ফরমানটি পাঠান হত দেওয়ানের কাছে তার সই-এর জন্যে। এই মূল্যবান কাগজটিকে তখন বলা হত—তালিকা-ই-তান।

এই তালিকাটিকে এর পর পাঠান হত সাহিব-ই-তৌজী বা সাময়িক বিভাগের হিসাব রক্ষকের কাছে। তিনি সেইটি রেখে দিতেন এবং তার বিশদ বিবরণ লিখতেন ফরমানে। তারপর দিতেন সীলমোহর আর সই। সেটা করত মুঘল মুস্তাফী। তারও সই। তারও সীলমোহর। মুস্তাফীর হাত থেকে ফরমানটা যেত নাজিরের কাছে—তারপর বক্সী, তারপর দেওয়ান। তাদের

সীল ও সইসাবুতের পর কাগজটা যেত ভকিল বা প্রধানমন্ত্রীর কাছে। তাঁর সীল ছাপ পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটা গোলাকধাঁধার—একটা জটিল ব্যবস্থার শেষ সীমায় আসা গেল বলে মনে করা যেতে পারে।

তবে যখন যুবরাজ, প্রাদেশিক শাসনকর্তা, ফৌজদার বা প্রাদেশিক দেওয়ানের কাছে কোন অনুমতি পাঠাবার জন্যে ফরমাস করা হত তখন ভকিলের পর সম্রাট স্বয়ং সই করতেন বা সীলমোহর দিতেন এবং প্রয়োজনবোধে ফরমান সংশোধন করতেন। সরকারী আমলাদের অবগতির জন্যে জানান যেতে পারে, বহুব্যস্ত সম্রাটরাও এই সংশোধনের জন্যে সরকারী আমলাদের কখনও হম্বিতম্বি করতেন না। চন্দ্রভান ব্রাহ্মণ সম্রাট শাহজাহানের আমলের বিবরণে লিখেছেন কেরানী বা কর্মচারীদের ভুলভ্রান্তি সম্রাটরা লক্ষ্য করলে কোনরকম কটু মন্তব্য করতেন না। বাদশাহী মেজাজ কিছুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করত না। কেবল সেই সব ভ্রমগুলি শুধরে দিত। মুনসীরা ফের সেগুলি ঠিক করে লিখত।

দানধ্যানের জন্যে জমি দেওয়ার যে ফরমান জারি করা হত সেটা মুস্তাফির অডিটের পর যেত ধর্ম সম্বন্ধীয় দপ্তরে। সেখানে রেজিস্টারে সেটির বিবরণ লেখা হত। তারপর সেটায় সদর বা আইনমন্ত্রীর স্বাক্ষরের পর মুখ্য দেওয়ানের সই নেওয়া হত।

মনে করা যাক—প্রসন্ন সম্রাট কারও কৃতিত্বে খুশি হয়ে বললেন—তাকে হাজার রুপেয়া ইনাম দিতে। নাটক নবেলে দেখা যায় বান্দা হাজির—কোষাখানা থেকে অমনি হাজার টাকা নিয়ে এসে সেই ভাগ্যবানকে দিয়ে দেওয়া হল। মুঘল ঐতিহাসিকদের মতে এর জন্যেও ফরমান জারি করতে হত। সেই বিশেষ ফরমানের নাম—ফরমান-ই-সবতি। এই সব সনদের বেলায় সাধারণ ফরমানের প্রশস্ত ব্যবস্থাই অনুসরণ করা হত তবে নাজিরের দস্তখতের পর সেটা ঘুরে যেত দেওয়ান-ই-বুতুয়াতের দপ্তরে। এই দেওয়ান ছিলেন সরকারী কারখানা ও কোষাখানার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। এখানে বক্সী ও দেওয়ানের হাত ঘুরে মীর সমনের কাছে এর সীলমোহরও সই হত। এই ফরমানে প্রধানমন্ত্রী বা ভকিলের সই হবার আগে এই সরকারী দপ্তরের বহু আমলার হাত ঘুরে যেত এবং সব সময়েই সরকারী সরখতটা এই ফরমানের খসড়াটার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া থাকত যাতে যারই প্রয়োজন হত তিনিই সেটা মিলিয়ে খতিয়ে দেখতে পারতেন।

কিন্তু জাতকাঠে সব ফরমানের ওপরে হচ্ছে ফরমান-ই-বায়াজী। এইসব ফরমান তখনই দেওয়া হত যখন ব্যাপারটা তড়িঘড়ি, গুরুতর এবং গোপনীয়। যখন গুপ্ত কোন আদেশ এমনকি সরকারী সব আমলাদের না জানিয়ে পাঠাতে হত তখনই স্বয়ং সম্রাটের সীলমোহর করা এই বিশেষ ফরমান। আর এই জাতের ফরমান বাইরে থেকে দেখলেই বোঝা যেত। কেননা ফরমানের কাগজটা অনেক কটা ভাঁজ করে ফেলে তারপর সেই ভাঁজ করা ফরমানের মাঝামাঝি আবার একটা ভাঁজ করে দু-মুখ সমান করে এই মুখ আটকে একটা কাগজের গ্রন্থি বেঁধে দেওয়া হত। আর তারপর সীলমোহর। এই কাগজের গ্রন্থি যাতে না খুলে যায় তার জন্যে ব্যবহার করা হত পিপুল প্রভৃতি গাছের আঠা। আইন-ই-আকবরীতে বলা হয়েছে সেই আঠা মোমের মত লেগে থাকত যার ফলে জলে ধুয়ে বা আগুনে না পুড়িয়ে সেই কাগজ খোলবার উপায় ছিল না। সে যাই হোক—

এই ফরমান তখন সোনার কাপড়ে তৈরী একটা থলির মধ্যে রেখে দেওয়া হত পত্রবাহকদের। যেমন যেমন গুরুত্ব থাকত ফরমানের, তেমনি হত বাহক। খুব জরুরী ব্যাপারের আদেশ বহন করে নিয়ে যেত স্বয়ং মনসবদাররা। আহেদী বা সাধারণ ফৌজকে পর্যন্ত এই কাজে পাঠান হত। এই ফরমান যার উদ্দেশে পাঠান হচ্ছে—সে কি ভাবে গ্রহণ করবে আবুল ফজল তারও ফিরিস্তি দিয়ে বলেছেন যে বাহকের বেশ কিছুটা কাছ পর্যন্ত এগিয়ে এসে বার বার তসলিম করে সে ফরমানটি নেবে। তারপর সেটি নিজ শিরদেশে স্থাপন করে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করবে এবং তারপর পদবী অনুযায়ী পত্রবাহককে দেবে পুরস্কার।

বলাবাহুল্য এই সব দীর্ঘসূত্রী বিধিব্যবস্থা থেকে মুঘল আমলাতন্ত্র সম্বন্ধে একটা বিরূপ মনোভাব গড়ে ওঠা স্বাভাবিক। মুঘল মহাফেজখানার কাগজপত্রে এমন সব ঘটনার উল্লেখ রয়েছে যাতে দেখা যাচ্ছে প্রয়োজনবোধে মুঘল আমলাতন্ত্র আশ্চর্য দ্রুততার সঙ্গে কাজ করতে পারত। শাজাদা খুরম তখন দাক্ষিণাত্যে। সেখান থেকে এক জরুরী বার্তা এল একদিন সম্রাট জাহাঙ্গীরের কাছে। তাতে নিবেদন করা হল, তাঁর পরামর্শ মত একটা ফরমান যেন জারি করা হয় বিজাপুররাজ আদিল খাঁর নামে। দেখা যাচ্ছে শাহজাহানের এই আবেদন সম্রাটের কাছে পত্র প্রাপ্তির দিনেই পেশ করা হয় এবং সেইদিনই ফরমানের মুসাবিদা করার হুকুম হয়। সেই মুসাবিদা সেইদিনই সম্রাটের কাছে হাজির করা হয় এবং সম্রাটের মঞ্জুর করা সেই ফরমান সেইদিনই ভালো করে লিখে ফের সম্রাটের সই হয় এবং পরদিনই সেটা দাক্ষিণাত্যের রাজার উদ্দেশে পাঠান হয়। শুধু তাই নয়, এই ধরনের বায়াজী ফরমান এমনভাবে ভাঁজ করা হত যাতে পত্রের উদ্দিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া কেউই সেটা পড়তে পারত না। সেই কারণ এই ফরমানের সঙ্গে তার একটি প্রত্যয়িত নকলও শাহজাদার কাছে পাঠানর কাজ সেই সঙ্গেই সম্পন্ন করা হয়। আরও কথা আছে। সম্রাট জাহাঙ্গীর শুধু সেই ফরমানের 'ড্রাফট্' দেখে দেন নি, তার ওপরে দু-লাইনের একটি বয়েৎ লিখে দিয়েছিলেন—

শুদী জে ইলটিমাস-ই-শাহ-ই-খুররম
ব ফরজানদি-ই-মা মশুর-ই-আলম।

অর্থাৎ—শাহ খুরমের অনুরোধে তুমি হলে
সারা পৃথিবীতে আমার পুত্র বলে খ্যাত।

তবে এ থেকে মুঘল আমলাতন্ত্রকে রেড টেপিজিমের অপবাদ থেকে মোটেই অব্যাহতি দেওয়া যায় না। কেননা ব্যাপারটা সম্রাটের ও যুবরাজের এবং এর মধ্যে জড়িত মুঘল সম্রাটদের চিরকালের সমস্যা—দাক্ষিণাত্য।

রাজকার্যে এই দীর্ঘসূত্রিতার একটা সাফাই গেয়েছেন আবুলফজল। তাঁর বক্তব্য জাল জোচ্চুরির হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে এইসব প্রথার প্রয়োজন ছিল। ফাদার মনসরেট বলছেন যে ফরমানে সম্রাটের সীলমোহর পড়তে কমসেকম আটদিন দেরী হত। আর—'During this eight days' interval, every document is most carefully examined by the confidential counsellor and by the king himself, in order to prevent error and fraud. This is done with special care in the case of gifts and concessions conferred by the royal favour.'

তবে এমন ফরমানের খবরও পাওয়া যায় যখন সম্রাট নিজেই সেই ফরমান মোটামুটি বা কয়েকটা লাইন লিখতেন। জাহাঙ্গীর তাঁর পারস্যের রাষ্ট্রদূতকে দেওয়া এক ফরমানের ওপরে একটি ফার্সী বয়েৎ-এ লিখেছিলেন—

ব সুইয়াৎ ফরিসতাদঅম বুএ খেশ
কে আরম তুরা জুদতর সুএ খেশ।

অস্যার্থ— তোমার কাছে আমি আমার সুগন্ধ পাঠিয়েছি
তোমাকে আমার কাছে শীঘ্র টেনে আনতে।

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন এই ফরমান পাঠাবার কয়েকদিন আগেই সম্রাট তাঁর প্রিয় গোলাপ আতর (নূরজাহাঁর তৈরী?) ইতরি-জাহাঙ্গিরী পাঠিয়েছিলেন পারস্যের মুঘল রাজদূতকে। তুঝুকে সম্রাট লিখছেন সেই সূত্রেই এই ফার্সী বয়েৎ রচনায় উদ্বুদ্ধ হয় তিনি। লাহোরীর বাদশানামার কল্যাণে জানা যায় যে রাজস্থানে শাহজাহানের সাফল্যে খুশি হয়ে সম্রাট দীর্ঘ একটি ফরমান আগাগোড়া স্বহস্তে লিখে পাঠান পুত্রকে। তুঝুক-ই-জাহাঙ্গিরীর পাতায় এমনি কয়েকটি সম্রাটের নিজের লেখা ফরমানের কাহিনী রয়েছে এবং সেইসব ফরমান লাভের সৌভাগ্য শুধু যুবরাজদেরই নয়—তাঁর পুত্রোপম বিজাপুরের আদিল খাঁর ভাগ্যেও ঘটেছিল।

পিতার এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই বোধ করি প্রত্যেক ফরমানে কিছু না কিছু হাতে লিখে দিতেন শাজাহান। আমল-ই-শালির মতে সমস্ত ফরমানটা স্বয়ং লেখাটাও একটা তাঁর রেওয়াজের মধ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। শাহজাহানের অন্যতম সৈন্যাধ্যক্ষ মুজফফর খাঁর সংগ্রহের অনেক কয়েকটিই ফরমান সম্রাটের স্বয়ং লিখিত।

কিন্তু এ গেল একদিক। একটি মেরুও বলা যায়। কেননা, অপর মেরুতে এমন একটি ব্যবস্থা রয়েছে যার ফলে সেই ফরমানগুলিতে সম্রাটের সই বা সীলমোহরের কোনরকম প্রয়োজনই হত না। এমনকি এই সব ফরমান সম্রাটকে দেখান পর্যন্ত হত না। এই ফরমানগুলি ছিল যুবরাজ বা বেগমদের মাসিক তন্‌খা, মোল্লা, মুয়াজ্জিন প্রভৃতির বৃত্তি, আহদীদের ও সরকারী কারখানার কোন কোন কর্মচারীদের মাসমাহিনা এবং বারগীর ঘোড়াদের চানার জন্যে খরচের টাকা। [বারগীর ঘোড়া হচ্ছে এক বিচিত্র মুঘল ব্যবস্থা। বারগী বলত সেকালে সেইসব সমর্থ ব্যক্তিদের যাদের সামরিক বৃত্তির পারদর্শিতা স্বীকার করে নেওয়া হত কিন্তু তাদের ঘোড়া রাখবার দরকার হত না। এদের ঘোড়া রাখবার আয়োজন ছিল আলাদা সরকারী ঘোড়াশালে। এখান থেকে দরকারের সময় তাদের ঘোড়া সরবরাহ করা হত। এই বিশেষ ঘোড়াশালের খাদ্যসামগ্রীর ব্যয় বরাদ্দের কথা এখানে বলা হয়েছে—লেখক] এইসব খাতে বরাদ্দ মঞ্জুর করার জন্যে মুঘল কোষাখানা থেকে সালিয়ানা নূতন করে সনদ বা ফরমান দাবী করা হত না। বড় বড় বিভিন্ন বিভাগীয় উজিরের সই ও সীল করা হুকুমানুযায়ী মাইনা বা বেতন দিয়ে যাওয়া হ'ত। মুসরিফ বা সেকালের মুঘল এ্যাকাউন্ট্যান্ট রসিদ লিখে রাখত তার উপর মঞ্জুরীর মার্কা দিত দেওয়ান বাহাদুর। তারপর সেটা অডিট করত মুস্তাফিরা। তারপর ধাপে ধাপে নাজির, দেওয়ান ও মীর সমানের হাত ফেরত হয়ে কোষাখানায় যেত টাকাটা দেওয়ার জন্যে। এইসব ফরমানগুলিকেও বলা হত পরবঞ্চ। এদের সঙ্গে

আসল ফরমানদের এক নজরে যে পার্থক্য ধরা পড়ে সেটা হচ্ছে সুরুর দুটো লাইন। তুহরা—ফরমানের শুভারম্ভের লাইন দুটো সংক্ষিপ্ত। কিন্তু পরবঙ্কে সেটা থাকত না।

এই প্রসঙ্গে আরও যে সব সরকারী হুকুমনামায় সম্রাটের সীলমোহর দরকার হত না সেগুলির কথা এসেই পড়ে। সেগুলির মধ্যে 'সরখতের' কথা আগেই বলা হয়েছে। এছাড়াও এই সংক্ষিপ্ত তালিকায় রয়েছে—সরকারী ক্রয় বিক্রয়ের রসিদ, মূল্য তালিকা, বিভিন্ন রাজ্য থেকে তহশিলদার প্রভৃতিদের পাঠান টাকার ফিরিস্তি (আর্জনামচা); করার নামা বা রায়তদের সংগ্রহকারীদের রাজস্ব কাছ থেকে পাওয়া অর্থের তালিকা এবং মুকশা—বা মুস্তাফিদের কাছ থেকে নেওয়া তহশিলদারের টাকার জমা খরচের হিসাব।

কিন্তু মুঘল সনদ ও ফরমানের আলোচনায় মুঘল সীলমোহরের সম্বন্ধে কয়েকটা কথা না বললে চলে না। কেননা এই সীলমোহরই মুঘল রাজকার্যের অধিকাংশ নিয়মিত করত। ভারতবর্ষের মুঘল সাম্রাজ্যের উপর মুঘল রঙমহালের সুগভীর প্রভাব প্রতিপত্তির অন্যতম কারণ বোধ করি এই যে-সব চেয়ে প্রয়োজনীয় সীলমোহর—উজকটি থাকত বেগমসাহেবদেরই কব্জায়। এই প্রথা নূরজাহানপ্রণয়ী জাহাঙ্গীর নন, সম্রাট আকবরই চালু করে গিয়েছিলেন।

সেকথা যাক। আইন-ই-আকবরী পাঁচরকম সীলমোহরের কথা বলেছেন। প্রথম ধরনের শীলমোহর আকারে ছোট, গোল। ফরমান-ই-সরতি জারী করার সময় এই সীলমোহর দিতে হত। কাজেই প্রকারেই নয় প্রয়োজনেও প্রথম। আর-এক প্রকার বড় সীলমোহর ছিল। এটিও আকারে গোল তবে বেশ বড়। এর ভেতরে গোল গোল করে সম্রাটদের সাত পুরুষের নাম ক্ষোদাই করা থাকত। এই সীলমোহর পড়ত বিদেশী রাজশক্তির সঙ্গে পত্রালাপের সময়। ব্যাফিনের আঁকা স্যার টমাস রোর ম্যাপের এক কোণে এই সীলমোহর আঁকা দেখা যায়। এছাড়া একটা চৌকো সীল ছিল। আর একটা সীলের চারিদিকে একটা কবিতা লেখা থাকত—

রাস্তি মুজিব-ই-রাজা-ই-খুদা আশত—
রুস ন দিদাম কে গুম শ্যুদ অজ রহ-ই-রাস্ত
মানে— ঈশ্বরকে খুশি করতে হলে চাই ন্যায়পরায়ণতা
সোজা পথে হারিয়ে যেতে আমি কাউকে দেখিনি।

এছাড়াও মুঘল অন্দর মহলের জন্যে ছিল আলাদা সীলমোহর।

তবে এইসব সীলমোহরের চেয়েও মানে বড় ছিল সম্রাটদের পাঞ্জা। আকবরের আমলে ফরমানে পাঞ্জার ব্যবহারের কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই। সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মচরিতে তাঁর পিতৃদেবের এক পাঞ্জার কথা বলেছেন। সেটি কোন ফরমানে নয়। একটি গাছের গুড়িতে আঁকা। দৌলতবাদ পরগণায় শেখুপুরা গ্রামের সেই ঐতিহাসিক গাছের গুড়িতে তলা থেকে পৌণে চার গজ উঁচুতে আকবর বাদশা তাঁর হাতের রেখা এঁকে দেন। পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণ করে সম্রাট জাহাঙ্গীর সেই গাছের আট গজ উঁচুতে তাঁর পাঞ্জা এঁকে দেন। পাছে মহাকালের নির্মম শাসনে সেই রেখা মুছে যায়—দুটি পাথরে সেই দুই পাঞ্জার নকল করিয়ে সেখানে গেঁথে দেওয়া হয়। আর তার তলায় চারিদিকে গেঁথে দেওয়া হয় একটি মণ্ডপ।

তবে ফরমানে পাঞ্জা ব্যবহারের কথা জাহাঙ্গীরের এই আত্মচরিতেই প্রথম লক্ষ্য করা যায়। ষোলশ চৌদ্দ সালের কথা। উদয়পুরের রাণা শাহজাহানের সঙ্গে সন্ধির শর্ত হিসেবে দাবী করলেন সম্রাটের পাঞ্জা। এবং এই দাবী জাহাঙ্গীর মেনে নেন। শাহজাহান নিজেথেকেই এই পাঞ্জা দেন বিজাপুরের সুলতান আদিল খাঁকে। এবং সন্ধির শর্তাদি সংক্ষেপে একটা ফরমানের বদলে একটা স্বর্ণ পাত্রে লিখে সুলতানের প্রতি সম্রাটের অসীম স্নেহের নিদর্শন হিসেবে সেটা তাঁকে উপহার দেওয়া হয়।

সিধৌরের রাজার কাছে সম্রাট শাহজাহানের দেওয়া একটি ফরমান আছে। সেটির ছবি ঈ-বি হাভেল সাহেব তাঁর 'হ্যাণ্ডবুক টু আগরা এ্যাণ্ড তাজ' গ্রন্থে ছেপেছেন। সেটি থেকে সেকালের মুঘল ফরমানের আদর্শটা খুব ভালোভাবে বোঝা যায়। দেখা যায় তাতে ফরমানের দক্ষিণে থাকত পাঞ্জা। তার মাথায় উঝুক সীলমোহর। বামে তুখরা বা শুভারম্ভের প্রথম দু-লাইনের সংক্ষিপ্ত রূপ।

ওয়ারেন হেস্টিংস একবার এই মুঘল রাজতন্ত্রকে বলেছিলেন 'ম্যাগনিফিসেণ্ট মেসিনারি'। মুঘল ফরমানের এই বিচিত্র ব্যবস্থা থেকে সেই 'মেসিনারি'র আদলটা মোটামুটি বোঝা যায়। সেটা ম্যাগনিফিসেণ্ট কিনা, তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। সংশয় আছে। তবে সেই ট্রাডিসন থেকে আজও যে ভারতবর্ষ অব্যাহতি পায়নি, সাড়ে তিনশো বছরেও না, সেটা নিঃসন্দেহ। সবিনয়ে সেটা স্বীকার না করে উপায় নেই।

(১) 'পরবঞ্চ' বলত সম্রাটের সই না করা হুকুমের কাগজকে। যারা পরবঞ্চ লিখত তারাই পরবঞ্চী। আর মীর আরজ বলত তাদেরই যারা মুঘল দপ্তরে বহুবিধ আর্জি বা আবেদনের সর্বাধ্যক্ষ বা ইনচার্জ ছিল।

(২) রিসালদার সাধারণতঃ বলে পদাতিক বাহিনীর নায়ককে। দরবারের রুটিন মাফিক যাদের হাজিরা দিতে হত, সেই সব আমীরদেরও রেসালা বলা হত কথনও সখনও। ঐতিহাসিকদের মতে এখানে তাদের কথাই বলা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের চার অধ্যায় : রচনাশৈলী

শুভব্রত রায়চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথের এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট-প্রবণতা সুবিদিত। তাঁর গল্পে উপন্যাসে কাব্যে প্রবন্ধে গানে চিত্রে এই প্রবণতার পরিচয় আছে অজস্র। যে গতিময় বৈচিত্র্য রবীন্দ্র রচনার অনুপমেয় বৈশিষ্ট্য তার একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হ'ল এক্‌স্‌পেরিমেণ্টের প্রতি কবির আকর্ষণ। রসসৃষ্টির বহুমুখী সাধনায় কবির প্রতিভা ভাবে ভাষায় ভঙ্গিমায় ব্যঞ্জনায় নব নব প্রকাশপথ রচনা করেছে। তাঁর প্রতিটি কীর্তি তাই এক স্বকীয় আত্মতার মর্যাদা দাবি করে সাহিত্যের দরবারে। চার অধ্যায়ের মধ্যেও আমরা কবির সেই এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট-প্রিয়তার আভাস পাই। তাই, যেমন ভাবের দিক থেকে তেমনি আঙ্গিকের দিক থেকেও উপন্যাসখানি একটি অভিনব সাহিত্যকীর্তি।

চার অধ্যায় একটি ছোট উপন্যাস। ছোট উপন্যাস রবীন্দ্রনাথ আরও লিখেছেন। বরং শেষের দিকে ছোট উপন্যাসের প্রতিই তাঁর পক্ষপাতিত্ব দেখা যায়। বস্তুত **যোগাযোগ**-এর পর তিনি আর বড় উপন্যাসে হাত দেন নি। কিন্তু ছোট উপন্যাসের রাজ্যেও চার অধ্যায়ের স্থান স্বতন্ত্র। কাহিনী বিস্তারের ভঙ্গিমা বিচার করলেই সে কথা প্রতীত হবে।

কাহিনী সাজানো হয়েছে চারটি অধ্যায়ে। এই অধ্যায় ক'টি ছাড়া অবশ্য একটি ভূমিকাও আছে যেখানে এলার অতীত জীবন বর্ণিত হয়েছে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে, চারটি অধ্যায় মূলত চারটি 'দৃশ্য'। কানাই গুপ্তের চায়ের দোকান, এলার শয়নকক্ষ, অতীন্দ্রের অজ্ঞাত বাসস্থান, এলার বাড়ীর ছাদ। সেই সঙ্গে এটাও চোখে পড়ে যে, প্রত্যেকটি অধ্যায় একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিন্যস্ত। প্রথম অধ্যায়ের ঘটনাকাল বেলা প্রায় তিনটে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ের উদ্বোধন অপস্রিয়মান অপরাহ্ণে এবং শেষ অধ্যায় সংঘটিত হয় রাতে। দৃশ্য এবং কালের বর্ণনায় ফুটে উঠেছে একটি নিটোল চিত্রপট। ছিন্নপ্রায় চটের পর্দা, বিসদৃশ চায়ের পাত্র, দেশবন্ধুর মূর্তি-আঁকা খাতা, তাঁতে-বোনা সতরঞ্চ, ব্লটিং প্যাড, পরিত্যক্ত পুরনো পূজোর দালানের সামনে শ্যাওলা-পড়া রাবিশ, মাটির ভাঁড় দিয়ে ঢাকা জলের কলসী, এক ছড়া কলা, এনামেল-উঠে-যাওয়া বাটি; যতই তুচ্ছ হোক না কেন, কোনো বস্তুই অপ্রাসঙ্গিক ব'লে উপেক্ষিত হয় নি। ফলে, তারা সবাই মিলে আমাদের সামনে এক পরিচিত আবেষ্টনীর সমগ্রতা সৃষ্টি করে।

দৃশ্য ক'টির তাৎপর্য এই যে, মূল কাহিনীটি উন্মোচিত হয়েছে তাদের সীমিত পরিসরের মধ্যে। সে পরিসরের বাইরে যাবার প্রয়োজন হয় না। নেপথ্যে যা কিছু ঘটছে তার খবর পাওয়া যায় চরিত্রগুলির জবানীতেই। কে চিরকুট নিয়ে এল, তার সঙ্গে আমাদের চাক্ষুষ পরিচয় ঘটে না: অতীন্দ্রই জানিয়ে দেয়। বাল্‌ব্‌গুলো খুলে নীচতলা অন্ধকার ক'রে রেখে আসে অতীন: সে খবর তারই মুখ থেকে শুনি। চরিত্র ক'টি আমাদের চোখের সামনেই আসা-যাওয়া করে, যা-কিছু বলবার আছে বলে, যা-কিছু করবার আছে করে। এর ব্যতিক্রম যে দু' একবার ঘটে নি তা নয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে অতীন্দ্র এলার ঘর ছেড়ে রাস্তায় নেমে আসে,

চলতি ট্রামে লাফিয়ে ওঠে। শেষ অধ্যায়ে সে এলাকে নিয়ে শোবার ঘর ছেড়ে ছাদে যায় আবার ঘরে ফিরে আসে। কিন্তু এই দু' একটি ব্যতিক্রমের জন্য কাহিনীর দৃশ্যনির্ভরতা কোথাও ব্যাহত হয় নি। দৃশ্য-নির্ভরতা নাটকীয় লক্ষণ। সে দিক থেকে চার অধ্যায় নাটকধর্মী রচনা।

আর-একটি বিষয়ে এই গ্রন্থটির নাট্যধর্মিতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কাহিনী উদ্‌ঘাটনে ডায়ালগের প্রাধান্য। চরিত্র ক'টির আশা আকাঙ্ক্ষা আনন্দ বেদনা জীবনাদর্শ—সব কিছুই তাদের কথা বলার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। ঘটনা এবং চরিত্র বিশ্লেষণে লেখক যেন আগাগোড়াই নেপথ্যনিবাসী। নাটক এবং উপন্যাস—দুয়েরই কাজ গল্প বলা। তবে দৃশ্য-নিবদ্ধ চরিত্রদের কথোপকথনের মাধ্যমে গল্প বলা নাটকেরই রীতি। এই দুই বৈশিষ্ট্য—দৃশ্য-বিভাগ এবং ডায়ালগ-নির্ভরতা—এদের জন্যই চার অধ্যায় এক স্বতন্ত্র শ্রেণীর উপন্যাস ব'লে পরিগণিত হবার দাবি রাখে। একে যদি নাটকধর্মী উপন্যাস বলা যায় তবে সঠিক অভিধা দেওয়া হবে। নাটকধর্মী উপন্যাস বলতে বোঝা যায় এমন রচনা যার পটভূমিকায় আছে উপন্যাসোচিত অবাধ প্রসারের মন্থর ইঙ্গিত; আর সেই বিস্তীর্ণ পটভূমিকায় প্রতিবিম্বিত হয় নাটকের সীমায়িত সম্ভাবনার গতিময় উন্মেষ। ঠিক যেমন, উপন্যাসধর্মী নাটকে পাওয়া যায় নাটকের সীমিত পরিসরের মধ্যে উপন্যাসের সুদূরপ্রসারী বিশ্লেষণাত্মক বিস্তার। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে, Eugene O'neil-এর **Great God Brown** বা **Strange Interlude.**

চার অধ্যায় বিপ্লবের কাহিনী, কিন্তু বৈপ্লবিক কার্যকলাপের যথাযথ প্রতিচ্ছবি নয়— এমন একটা অভিযোগ শোনা যায় কোনো কোনো মহলে। এই প্রসঙ্গে একটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। কাহিনীটি কি তথ্যনির্ভর না সত্যনির্ভর? সাহিত্যে তথ্য ও সত্যের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতবাদ সুবিদিত। সে মতবাদ Naturalism নামক সাহিত্যবাদের অনুবর্তী নয়। তথ্যনির্ভর হ'লেই রচনা সত্যসন্ধানী বা রসময় হয়ে উঠবে এ কথা কবি বিশ্বাস করতেন না। সাহিত্যের উদ্দেশ্য সত্যসৃজন, তথ্য প্রতিবিম্বন নয়। তিনি বলেছেন, "সাহিত্যে ও আর্টেও একটি ব্যাপক ভূমিকা আছে। সাহিত্যে ও আর্টে কোনো বস্তু যে সত্য তার প্রমাণ হয় রসের ভূমিকায়। অর্থাৎ সে বস্তু যদি এমন একটি রূপরেখা গীতের সুষমা-যুক্ত ঐক্য লাভ করে, যাতে ক'রে আমাদের চিত্ত আনন্দের মূল্যে তাকে সত্য ব'লে স্বীকার করে, তাহোলেই তার পরিচয় সম্পূর্ণ হয়। তা যদি না হয় অথচ যদি তথ্য হিসাবে সে বস্তু একেবারে নিখুঁৎ হয়, তা হলে অরসিক তাকে বরমাল্য দিলেও রসজ্ঞ তাকে বর্জন করেন।" (সাহিত্যের পথে/২২) V. S. Pritchett যাকে "fact-fetishism" ব'লে আখ্যা দিয়েছেন, রবীন্দ্রোপন্যাসের আদিম যুগেই তার চিহ্ন পাওয়া যায়; তারপর আঙ্গিক ও আত্মিক ক্রমবিবর্তনে এই fact-fetishism তিরোহিত হয়েছে কবির উপন্যাসরাজ্য থেকে।

সত্য হ'ল অখণ্ড ঐক্যের আদর্শ। যখন বলি সাহিত্য সত্যান্বেষী তখন এই কথাটাই বুঝি যে, সাহিত্য এক অখণ্ড ঐক্যের আদর্শ খুঁজে ফেরে। বহুবিচিত্র ঘটনার দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা নিয়ে আমাদের বাস্তব জীবন। কিন্তু এই রাশি রাশি ঘটনাপুঞ্জ নিছক ঘটনা হিসেবে খণ্ড বিচ্ছিন্ন সামঞ্জস্যহীন অসম্পূর্ণ। তারা বাস্তব বটে কিন্তু সত্য নয়। পাড়ার মুদীর সঙ্গে

আমাদের প্রাত্যহিক জানাশোনা লেন-দেন, সে আমাদের বাস্তব জীবনের অঙ্গীভূত। তার সম্বন্ধে আমাদের তথ্যনির্ভর অভিজ্ঞতা বলে, সে সোজা লোক নয়, সুযোগ পেলেই ভেজাল দেয় মাপে কমায় দাম নেয় বেশী। তার এই দীনতা এই বিকৃতি তথ্যের দিক থেকে বাস্তব হ'লেও সত্য ব'লে স্বীকৃত হ'তে পারে না। কারণ, আমরা যেটুকু জেনেছি সে তো তার সম্পূর্ণ আত্মিক পরিচয় নয়। আর, তা নয় ব'লেই আমাদের জানা তথ্যসম্মত হ'লেও সত্য নয়। মানুষটিকে জানা আমাদের তখনি সত্য হবে যখন সে আমাদের মনে সম্পূর্ণরূপে অখণ্ড রূপে অনুভূত হবে। সত্যের লক্ষ্য হ'ল অখণ্ডতার ঐক্য। সত্য সক্রিয় কারণ খণ্ডতার মধ্যে অখণ্ডতা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য বিচ্ছিন্নতার মধ্যে যোগসূত্র বিকৃতির মধ্যে সৌন্দর্য রচনা করবার ক্ষমতা তার আছে। যখন বলা হয় সত্য সাহিত্যের উপজীব্য তখন এটাই বোঝানো হয় যে, সাহিত্য গোটা মানুষটাকে সৃষ্টি করে—তার বহির্দৃষ্ট খণ্ডতা-অসংগতি-বিকৃতিময় অসম্পূর্ণ রূপকে নিপুণ শিল্পীর মতো নিটোল সুষমায় মণ্ডিত ক'রে তোলে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "মানুষ আপনার দৈন্যকে, আপনার বিকৃতিকে বাস্তব জানলেও সত্য বলে বিশ্বাস করে না। তার সত্য তার নিজের সৃষ্টির মধ্যে সে স্থাপন করে।...বস্তুত, প্রাত্যহিক মানুষ তার নানা জোড়া-তাড়া-লাগা আবরণে, নানা বিকারে কৃত্রিম; সে চিরকালের পরিপূর্ণতার আসন পেয়েছে সাহিত্যের তপোবনে, ধ্যানের সম্পদে।" (সাহিত্যের স্বরূপ/৫৮) এই যে পরিপূর্ণতার রূপ—এ তো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়; ইন্দ্রিয় দিয়ে কখনো সম্পূর্ণকে জানা যায় না। সাহিত্যে যে পরিপূর্ণ মানুষটির সাক্ষাৎ পাই, তার জৈবিক পরিচয় গৌণ; আমরা উপলব্ধি করি তার আত্মিক সত্তাকে, যে-সত্তা প্রাত্যহিক ঘটনার মধ্যে আমাদের অগোচরে প'ড়ে থাকে। সাহিত্যের মানুষ তাই বাস্তব নয়, বাস্তবের প্রতিবিম্বও নয়। সে সত্য। তার মধ্য দিয়ে আমরা নিজেদের আবিষ্কার করি, জানতে পারি, চিনি।

মানুষের আত্মিক সত্তাকে রূপ দেবার প্রয়াসেই চার অধ্যায়ের সার্থকতা। আত্মিক সত্তার প্রাণস্পন্দন জোগায় idea. Idea বলতে বোঝায় আমাদের ভাব ও ভাবনার সেই মিলনমন্ত্র যা আমাদের আত্মাকে কোনো এক অন্তর্গূঢ় অভাব সম্বন্ধে গভীরভাবে সচেতন ক'রে তোলে, সেই অভাব মোচনের উদ্দেশ্যে প্রেরণা জোগায়। চরিত্র মূল্যায়নে নিছক বাহিরের ঘটনা আমাদের সাহায্য করে না, বরং সৃষ্টি করে খণ্ডতা-বিচ্ছিন্নতার ধূম্রজাল যার আড়ালে মানুষের আত্মিক সত্তার পরিচয় গোপন র'য়ে যায়। কিন্তু যে-ideaর প্রেরণা কর্মোদ্যমের মূলে, তাকে যদি বুঝতে পারি তবে ব্যক্তি পুরুষের কর্মকলাপের অর্থ সহজবোধ্য হয়ে ওঠে; তার আত্মিক পরিচয়ের রহস্যরূপ উদ্ঘাটিত হয় আমাদের মানসচক্ষে। এই কারণে চার অধ্যায়ে ঘটনার স্থান অতি গৌণ। এমন কি, যে-কয়েকটি ঘটনার সাক্ষাৎ মেলে তারা বাস্তব কি না তথ্যসম্মত কি না সে প্রশ্নও বাহ্য। বিপ্লবীরা অমন ক'রে হুইসিল বাজিয়ে সংকেত করত কি না, কানাই গুপ্তের চায়ের দোকানের মতো rendezvous তাদের ছিল কি না, অজ্ঞাতবাসের জন্য কোনো জীর্ণ পরিত্যক্ত পূজোর দালানে আশ্রয় নেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব কি না—এই প্রশ্নগুলি ইন্দ্রনাথ-অতীন্দ্র-এলার চরিত্রকে হৃদয়ংগম করবার জন্য প্রয়োজনীয় নয়। যে-idea ইন্দ্রনাথকে

দুঃসাধ্যের সাধনায় মাতিয়ে তুলেছিল, যে-idea অতীন্দ্রনাথকে আত্মহননের বেদনায় উদ্‌ভ্রান্ত করেছিল, যে-idea এলাকে দ্বিধা-বিভক্ত পথের মুখে দাঁড় করিয়েছিল—সেই ideaই হ'ল চার অধ্যায়ের প্রাণস্পন্দন। ঘটনার অন্তরালবর্তী সক্রিয় ideaর রূপ ধরা পড়েছে ব'লেই চরিত্রগুলির আত্মিক পরিচয় উন্মোচিত হয়েছে। এইটেই চার অধ্যায়ের যথার্থ সাহিত্যিক মূল্য।

এই প্রসঙ্গে আর-একটি কথা উল্লেখযোগ্য। উপন্যাসখানিতে যা বলা হয়েছে তার চেয়ে না-বলা অংশটি আয়তনে অনেক বড়। অলিখিত অংশের বাহুল্যের জন্য লিখিত অংশের মর্মোদ্ধারে বাধা উপস্থিত হয়, এ কথা কেউ কেউ মনে করেন। যে বৈপ্লবিক আন্দোলন কাহিনীর বিষয়বস্তু, তার সম্বন্ধে দু' একটি ইঙ্গিত দিয়েই বিরাট পটভূমির কাজ সারা হয়েছে। এই উনোক্তি-দোষের জন্য কাহিনীটি শেষ পর্যন্ত সুবোধ্য রূপ পরিগ্রহ করতে পারে নি, এমন অভিমত শোনা যায়। এখানে প্রথমেই স্বীকার ক'রে নেওয়া প্রয়োজন যে, বৈপ্লবিক আন্দোলনের কাহিনী লিখিবার জন্য চার অধ্যায়ের প্রবর্তন নয়। রবীন্দ্রনাথ একটা **পথের দাবী** বা **For Whom The Bell Tolls** লিখতে বসেন নি। সুতরাং এই কাহিনীতে বিপ্লবাত্মক কার্যকলাপের বিবরণের অভাব নিয়ে অভিযোগ করলে কবির প্রতি অন্যায় করা হবে। তিনি যা লিখেছেন, তার পরিপ্রেক্ষিতেই রচনাটির বিচার বাঞ্ছনীয়।

চার অধ্যায় মানস জগতের কাহিনী, এ কথা আগে বলা হয়েছে। মানস জগতের বৈচিত্র্য অশেষ; বহির্জগতের বৈচিত্র্য থেকেও বহুধা ও নিগূঢ়। বাহিরের বৈচিত্র্য ইন্দ্রিয়-অধিগম্য ব'লে সহজগ্রাহ্য। কিন্তু মানস জগতের বৈচিত্র্য ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। সে শুধু সামগ্রিক অনুভূতির বিষয়। তাই তার মাঝে এমন এক আকর্ষণ আছে যা সাহিত্যিক মনকে মায়াবী সোনার হরিণের মতো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎটার বাইরে টেনে নিয়ে যায়; অরূপলোকের অসীমতাকে রূপের সীমার মধ্যে সৃজন করার সাধনায় সাহিত্যকার মগ্ন হয়ে যায়। এ যেন ছোট্ট শিশির বিন্দুর বুকে সূর্যের ধরা দেওয়া। এই জন্যই সাহিত্যের ভাষা, কবির ভাষায়, "জ্ঞানের ভাষা নয় হৃদয়ের ভাষা, কল্পনার ভাষা।" জ্ঞানের ভাষা একান্তই শব্দনির্ভর। প্রত্যেক শব্দের এক বিশিষ্ট অভিধান-নির্দিষ্ট অর্থ আছে। এই অর্থ স্বভাবতই সীমায়িত, তথ্যকে নির্দেশ করাই তার কাজ। কিন্তু সাহিত্যস্রষ্টা শব্দের অর্থ সীমাকে প্রসারিত ক'রে দেয়; তার চেষ্টা সীমাকে ছাড়িয়ে শব্দের ভিতর দিয়েই অসীমতাকে প্রকাশ করা। সাহিত্যের ভাষায় তাই কত ইসারা কত কৌশল কত ভঙ্গী। জ্ঞানের ভাষার সাহায্যে কোনো অনুভূতিকে সর্বকালীন সর্বজনীন অনুভূতির সামগ্রী ক'রে তোলা যায় না। কিন্তু সাহিত্যের ভাষার সেটাই হ'ল লক্ষ্য। এই বৈশিষ্ট্য বর্ণনাপ্রসঙ্গে কবি বলেছেন, "'খুশি হয়েছি' এই কথাটা বোঝাতে লাগে সুর, লাগে ভাবভঙ্গি। এই কথাকে সাজাতে হয় সুন্দর ক'রে, মা যেমন করে ছেলেকে সাজায়, প্রিয় যেমন সাজায় প্রিয়াকে, বাসের ঘর যেমন সাজাতে হয় বাগান দিয়ে, বাসরঘর যেমন সজ্জিত হয় ফুলের মালায়। কথার শিল্প তার ছন্দে, ধ্বনির সংগীতে, বাণীর বিন্যাসে ও বাছাই কাজে।" (সাহিত্যের স্বরূপ/২) এমনি ক'রে সুরে ছন্দে উপমায় শব্দের মাঝে ইন্দ্রধনুর বর্ণসমারোহ যখন ফুটে ওঠে, তখন তার অর্থ অভিধানের চৌকাঠ পেরিয়ে পৌঁছে যায় অনুভূতির সীমানাহারা রাজ্যে।

অনুভূতির অন্তরে একটা অসাধারণতা আছে; তাকে ব্যক্ত করবার উদ্দেশ্যে সাহিত্যের ভাষারও অসাধারণতার সাধনা। এই সত্যকে বোঝাবার জন্য রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "ভাবের সাহিত্য মাত্রেই এমন একটা ভাষার সৃষ্টি হয় যে-ভাষা কিছুবা বলে কিছুবা গোপন করে, কিছু যার অর্থ আছে, কিছু আছে সুর। এই ভাষাকে কিছু আড় ক'রে বাঁকা ক'রে, এর সঙ্গে রূপক মিশিয়ে, এর অর্থকে উলট-পালট ক'রে তবেই বস্তুবিশ্বের প্রতিঘাতে মানুষের মধ্যে যে ভাবের বিশ্ব সৃষ্ট হোতে থাকে তাকে সে প্রকাশ করতে পারে।" (সাহিত্যের পথে/৬৯) জ্ঞানের ভাষায় সাধারণতা আছে; সেই কারণে তাকে অনেক বলতে হয়। তবু কোনো বস্তু সেখানে পূর্ণতার অনুভূতি নিয়ে সৃষ্ট হয় না। কিন্তু সাহিত্যের ভাষার অসাধারণত্বই যেন এক নিমেষে নির্দিষ্ট ভাবকে সর্বজনের অনুভাবের বিষয় ক'রে তুলতে পারে। এই প্রসঙ্গে I. A. Richards-এর একটা মন্তব্য মনে পড়ে, "Language logically and scientifically used cannot describe a landscape or a face. To do so it would need a prodigious apparatus of names for shades and nuances for precise particular qualities. These names do not exist, so other means have to be used." এই "Other means" হ'ল কথার ছন্দ ধ্বনির সংগীত বাণীর বিন্যাস, কিছু বলা কিছু না-বলা, রূপকের কিছু রঙ, অর্থের স্থিতিস্থাপকতা। কেবলমাত্র Botanyর বিষয়বস্তু হ'য়ে থাকলে পলাশ-চাঁপা আমাদের অনুভূতির রাজ্যে অকিঞ্চিৎকর হয়ে বেঁচে থাকত। কিন্তু যেই কবির সোনার কাঠির পরশ লাগল তাদের 'পরে অমনি তারা "কিছু পলাশের নেশা / কিছু বা চাঁপায় মেশা" হয়ে আমাদের অনুভূতির রাজ্যে প্রাণের সাড়া জাগিয়ে তোলে, তখন মন সুরে সুরে রঙে রসে জাল বুনতে শুরু করে।

কবির এই পূর্ণতাসৃজনের ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতার কথা অতীন্দ্রের মুখে সুন্দর প্রকাশ পেয়েছে। এলার একটি মধুর ছবি আঁকে অতীন: "ঐ যে তোমার দুই-একগুছি অশিষ্ট চুল আলগা হয়ে চোখের উপর এসে পড়েছে, দ্রুত হাতে তুলে তুলে দিচ্ছ; কালো পাড়-দেওয়া তসরের সাড়ি, ব্রোচ নেই কাঁধে, আঁচলটা মাথার চুলে বিঁধিয়ে রাখা, চোখে ক্লান্ত ক্লেশের ছায়া, ঠোঁটে মিনতির আভাস, চারিদিকে দিনের আলো ডুবে এসেছে শেষ অস্পষ্টতায়। এই যা দেখছি এইটিই আশ্চর্য সত্য, এর মানে কী, কাউকে বুঝিয়ে বলতে পারব না, কোনো এক অদ্বিতীয় কবির হাতেই ধরা দিতে পারল না ব'লে এর অব্যক্ত মাধুর্যের মধ্যে এত গভীর বিষাদ।" (চা. অ./১০৫) এখানে এলার যে নিরুপম ভাবময় চিত্রটি সমগ্রতা নিয়ে ফুটে উঠেছে, সে শুধু কেবল সাহিত্যের ভাষার আভাস-ইঙ্গিত ভাবের সৃজনী ক্ষমতায়। Anatomy-র সাত সমুদ্র, Aestheticsএর তেরো নদী পেরিয়ে গেলেও এলার এই অবিস্মরণীয় মূর্তির আভাসটুকুও ধরা পড়বে না কোথাও।

জ্ঞানের ভাষায় ও সাহিত্যের ভাষায় যে-পার্থক্য, সেই পার্থক্য আবার সাহিত্যের মধ্যেও গদ্যে এবং পদ্যে অনুভূত হয়। তার কারণ, পদ্যে 'Other means-এর স্বাধীন সঞ্চরণ। কিন্তু গদ্য এবং পদ্যের মধ্যে যে ব্যবধান, বিশ্বকবির যাদুস্পর্শে সেই পারস্পরিক সীমারেখাও যেন

ক্রমশ লীন হয়ে গেছে তাঁর সাহিত্যে। **শেষের কবিতার** কাব্যধর্মিতা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে কবি গদ্য ও পদ্যের সম্বন্ধ নিয়ে একটি অভিনব মন্তব্য করেছেন, "এখানে আমার প্রশ্ন এই, আমরা কি এমন কাব্য পড়ি নি যা গদ্যের বক্তব্য বলেছে, যেমন ধরুন ব্রাউনিঙে। আবার ধরুন, এমন গদ্যও কি পড়ি নি যার মাঝখানে কবি কল্পনার রেশ পাওয়া গেছে। গদ্য ও পদ্যের ভাশুর-ভাদ্র বউ সম্পর্কে আমি মানি না। আমার কাছে তারা ভাই আর বোনের মতো, তাই যখন দেখি গদ্যে পদ্যের রস ও পদ্যে গদ্যের গাম্ভীর্যের সহজ আদান-প্রদান হচ্ছে তখন আমি আপত্তি করি নে।" (সাহিত্যের স্বরূপ/৩৯) প্রকৃতপক্ষে, রবীন্দ্রনাথের গদ্য সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারা অনুধাবন করলে এই সত্যই প্রতিভাত হয় যে, সেখানে গদ্যের গাম্ভীর্যের সঙ্গে পদ্যের বিচিত্র রসমাধুর্য সংমিশ্রিত হয়ে এক অতুলনীয় রচনাশৈলীর উদ্ভব ঘটেছে। সেই রচনাশৈলীর একমাত্র লক্ষ্য, অসীম অরূপ মানসলোককে শব্দের সীমার মধ্যে রূপায়িত করা। **শেষের কবিতা**-য় আমরা যে গদ্যরচনারীতির অভিব্যক্তি দেখতে পাই, চার অধ্যায়ে তা এক রসসমৃদ্ধ পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

চার অধ্যায়ের মানস জগতে আছে অস্তমিত আশা আকাঙ্ক্ষার রক্ত-রাঙা বিষণ্ণ-সুন্দর বর্ণালী, ভাবভাবনার উদ্বেল তরঙ্গোচ্ছ্বাস, অন্তর্বহ্নির লেলিহান দাহন, অসম্পূর্ণ নৈবেদ্যের বেদনা। এক ইন্দ্রিয়-অনধিগম্য অপ্রত্যক্ষ লোক মূর্ত হয়ে উঠেছে শব্দের বৈচিত্র্যে, উপমার ইঙ্গিতে, রূপকের আভাসে, বর্ণনার দ্যুতিতে। অদৃশ্য মায়া, অনির্দেশ্য মাধুর্য, অভাবিত অনুভূতির স্পর্শ—এই নিয়ে অপ্রত্যক্ষ জগৎ আমাদের অন্তর্লোকে সত্য হয়ে ওঠে। অতীন্দ্রের সঙ্গে আমাদেরও যাত্রা সেই "দীপহীন অপ্রত্যক্ষের দিকে" যেখানে আছে এলা-অন্তুর "মরীচিকার বাসরঘর", যেখানে নিষ্ফল দিনগুলি "ছায়ামূর্তি নিয়ে ঘুরে বেড়ায় কল্পলোকের দিগন্তে।" প্রতিটি শব্দ তাৎপর্যময়, ভাবে-রসালো, উপলব্ধির বিষয়। তারা প্রত্যেকে অপ্রত্যক্ষ জগতের দূতী; তাদের ধ্বনিতে সুরে ছন্দে ইঙ্গিতে আছে সেই জগতের মায়ালিখন। যদি কোনো ইঙ্গিত কোনো সূক্ষ্ম রেখার ইসারা আমাদের দৃষ্টিহীন স্থূলতার কাছে হারিয়ে যায়, যদি কোনো মীড় আমাদের শ্রবণহীন প্রাণে সাড়া না পায়, তবে কাহিনীর রসসম্ভার যেন 'অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্'--তার অবিশ্লেষ্য সমগ্রতার রূপ খণ্ড বিচ্ছিন্ন অসম্পূর্ণ অনাদৃত হয়ে প'ড়ে রইবে। তাই এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে, চার অধ্যায় অভিনব মর্মস্পর্শী কাব্যধর্মী গদ্যরচনা। চার অধ্যায় পাঠ কবিতা পাঠের মতোই—শর্ট কাটের কোনো উপায় নেই।

সঘন রাত্রির মসীমাখা ছায়াঘেরা প্রসারিত পটভূমি। তারই বুকে দুটি পথহারা খ'সে-পড়া তারার রুদ্ধশ্বাস হাহাকার। তাদের রাত্রি-শেষের প্রতীক্ষা হ'ল অভিশপ্ত ব্যর্থ। কিন্তু ধন্য তাদের জাগরণ, ধন্য তাদের ক্রন্দন। গভীর নিশীথলগ্নে যদি মোহিনীর আলাপ জেগে ওঠে, তার সকরুণ সুরমূর্ছনায় অনিদ্র চিত্ত কি আলোর প্রার্থনা শুনতে পায় না?

আমাদের কাছে চার অধ্যায় সেই আলোর প্রার্থনা।

গীতিকবি রজনীকান্ত

কমল

"...আমি আইন ব্যবসায়ী, কিন্তু আমি ব্যবসা করিতে পারি নাই। কোন্ দুর্লঙ্ঘ্য অদৃষ্ট আমাকে ঐ ব্যবসায়ের সহিত বাঁধিয়া দিয়াছিল ; কিন্তু আমার চিত্ত উহাতে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। আমি শিশুকাল হইতে সাহিত্য ভালবাসিতাম, কবিতার পূজা করিতাম, কল্পনার আরাধনা করিতাম : তাই লইয়া আমার চিত্ত জীবিত ছিল। সুতরাং আইন ব্যবসায় আমাকে সাময়িক উদরান্ন দিয়াছে, কিন্তু সঞ্চয়ের জন্য অর্থ দেয় নাই।"

—দুই বিপরীতধর্মী চিত্তবৃত্তির ভাবসম্মিলন কোনক্রমেই সম্ভব হয়নি। কবিপ্রতিভা আইন ব্যবসায়ী রজনীকান্তকে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করেছিল। তার পরিণতিতে এসেছিল দারিদ্র্য, চরম দুঃখ এবং বেদনাভরা দিনগুলি। তাঁর সুখের সংসার অকালে মৃত্যুর পদচিহ্নে মলিন হয়ে গিয়েছিল। মাত্র পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে কবি মারা যান (জন্ম ১৮৬৫ খৃঃ, ২৬শে জুলাই মৃত্যু ১৯১০ খৃঃ, ১৩ই সেপ্টেম্বর)।

উনিশ শতকের বাঙালী জীবনে সামগ্রিক বিপ্লব এসেছিল পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে। জীবনযাত্রায় যে মন্থরতা, চিন্তাভাবনায় যে দৈন্য—জীবনে স্থবিরতার সূচনা করেছিল, তার ভিত্তি-ভূমিতে প্রচণ্ড আঘাত লাগে। সাহিত্য ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ এক বিস্তৃততর ক্ষেত্র অধিকার করে নেয়। প্রগতি ও পশ্চাদপসরণের বিচিত্র সংঘর্ষেই জীবনের লক্ষ্য অনেকখানি পরিবর্তিত হয়। ডিরোজিও তথা হিন্দু কলেজ সনাতন বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করেছিল। যে রেনেশাঁস য়ুরোপীয় সভ্যতায় এনেছিল আমূল বিবর্তন, বিগত শতকের বাঙালী জীবনে তার পদসঞ্চার হলেও, পদক্ষেপ ঘটেনি।

একালে বাঙালী জীবনের গভীরতর ভাব ব্যঞ্জিত হল গীতিকাব্যে। আশা আকাঙ্খা দ্যোতিত হোল এই ধারা পথে। মানুষের মনের নিবিড় সত্যের প্রকাশ ঘটল গীতিকাব্যে। রবীন্দ্রনাথই তার সার্থক-সম্ভব-কবি। বৈষ্ণবকাব্য গীতিকাব্য হলেও আধুনিক গীতিকাব্যের সঙ্গে তার বৈষম্য প্রকরণগত এবং ভাবগত। রবীন্দ্রনাথ তাকে এক নিঃসীম সৌন্দর্যলোকে প্রণায়িত করলেন। সেই আলোকের ঝরণাধারায় পরিস্নাত হয়ে বিগত শতকের বহু কবি বাঙলার সাহিত্যাকাশকে উজ্জ্বল করেছিলেন।

উনিশ শতকের বাঙলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগে প্রধান রূপকার ছিলেন—বঙ্কিমচন্দ্র-মধুসূদন-নবীনচন্দ্র-হেমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ। রজনীকান্তের কাব্যসাধনার কালপরিধি হোল উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে বিশ শতকের প্রথম দশক, অর্থাৎ কবির মৃত্যুকাল পর্যন্ত। যে উদ্দামতা চাঞ্চল্য ও পরিবর্তনের মধ্যে রজনীকান্তের আবির্ভাব—তার থেকে অনেক দূরলোকবাসী ছিলেন কবি। তিনি ছিলেন স্থৈর্যের প্রতিমূর্তি অধ্যাত্মলোকবাসী।

ফলতঃ, রজনীকান্তের গীতিকবিতা উনিশ শতকের বিশিষ্ট ভাবনায় চিহ্নিত নয়। অন্তরের

পরম এক আর্তি তাঁর কাব্যে প্রস্ফুট। কবিভাবনায় বেদনাবিধুর চিত্তলোকের রোমান্টিক বেদনার্দ্রতা সেকালের যুগভাবনায় প্রেক্ষিত না হলেও, তাও স্বতন্ত্রলোকাশ্রয়ী। গীতিকাব্যের ইতিহাসে রজনীকান্তের অবদান পূর্ব নিরূপিত। তাঁর আধ্যাত্মিকপ্রেম, স্বদেশবন্দনা, রসিক মানসিকতা বাঙলা কাব্যজগতে বিস্ময়সূচক প্রতিভা। মাত্র কয়েকটি গানে সমস্ত দেশকে তিনি আপন করে নিয়েছিলেন। রজনীকান্তের কবিদৃষ্টির মধ্যে কোন কৃত্রিমতা ছিল না। যে আন্তরিকতায় তাঁর কাব্যলক্ষ্মী প্রসাধিত, আধুনিক সাহিত্যে তার পরিচয় অসম্পূর্ণ। কবিকে জীবনের প্রারম্ভ থেকে দারিদ্র্যের সঙ্গে চরম সংগ্রাম করতে হয়েছে মৃত্যুকাল পর্যন্ত। কখনও তাঁর ভগবৎচিন্তা, তাঁর স্বাধীন ভাবনা পথবিচ্যুত হয়ে বিকৃতরূপ নেয় নি। জীবনের প্রারম্ভ থেকে সমাপ্তি একই সূত্রে গ্রথিত। জীবিতকালে যে সম্মান, দেশবাসীর যে অভিনন্দন পেয়েছেন, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যেন তা পরিসমাপ্ত। খ্যাতির যন্ত্রণা থেকে তাঁর মৃত্যুর যন্ত্রণা বেশী। যা তিনি দান করেছেন সরস্বতীর পাদমূলে, প্রতিদানে সে তুলনায় পেয়েছেন নগণ্য। জীবনের দুঃখ আনন্দমাখা চালচিত্র, মাতৃত্বের মহিমময় উচ্ছ্বাস রজনীকান্তের কাব্যে প্রোজ্জ্বল। গার্হস্থ্য জীবনের পরম নির্ভরতা ও আর্তি এবং পার্থিব সংসারের কোলাহল কবিকে মুক্তির অনুসন্ধানে তাড়িত করেছিল। তিনি চেয়েছিলেন, জীবনের পরম স্বার্থকতায় উত্তরণ।

রজনীকান্ত পূর্বসূরীদের পথে অগ্রসর হলেও তাঁর সৃষ্টি স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। কখনও প্রভাবিত হননি। সমসাময়িক ঘটনাকে অবলম্বন করে যেমন কবিতা রচনা করেছিলেন, তেমনি ভগবৎ চিন্তায় মুক্তি খুঁজেছিল তাঁর কবি মন। তাঁর সাহিত্যকৃতির সবই পদ্যে রচিত, অধিকাংশ গান। নীতি-কবিতা লিখেছিলেন। কান্ত কবি ভক্তিমূলক গান রচনায় অধিকতর পরিমাণে সার্থক। তাঁর গান তিন শ্রেণীর স্বদেশী গান, ভক্তিমূলক গান এবং হাসির গান।

সেকালের সকল কবিই স্বদেশ বন্দনামূলক কবিতা লিখেছিলেন। যুগপ্রবাহে কবিরা স্বীয় মাতৃভূমিকে নতুন করে উপলব্ধি করেছিলেন। মাতৃভূমির বন্ধনদশা তাঁদের প্রশান্তচিত্তে অশান্ত ঢেউ তুলে ছিল। রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের পথেই রজনীকান্তের স্বদেশী গানগুলি লিখিত। কান্তকবির গানে ওঁদের প্রভাবও বিশেষভাবে চোখে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন গীতধর্মী, দ্বিজেন্দ্রলাল বক্তৃতা বিলাসী। রজনীকান্তে দুটি রূপই বর্তমান :

শ্যামল-শস্য-ভরা !
(চির) শান্তি-বিরাজিত, পুণ্যময়ী ;
ফল-ফুল-পূরিত, নিত্য-সুশোভিত,
যমুনাসরস্বতী-গঙ্গা-বিরাজিত।...

সাম গান-রত-আর্য-তপোবন,
শান্তি-সুখান্বিত কোটী তপোধন,
রোগ-শোক-দুখ-পাপ-বিমোচন।

ওই সুদূরে সে নীর-নিধি—
যার তীরে হের, দুখ-দিগ্ধ-হৃদি,
কাঁদে, ওই সে ভারত, হায় বিধি !

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই ;
দীন-দুঃখিনী মা যে তোদের
তার বেশী আর সাধ্য নাই।
ঐ মোটা সুতোর সঙ্গে, মায়ের
অপার স্নেহ দেখতে পাই ;
আমরা, এমনি পাষাণ, তাই ফেলে ঐ
পরের দোরে ভিক্ষে চাই।

ঐ দুঃখী মায়ের ঘরে, তোদের
সবার প্রচুর অন্ন নাই,
তবু, তাই বেচে কাঁচ, সাবান মোজা,
কিনে কল্লি ঘর বোঝাই।
আয়রে আমরা মায়ের নামে
এই প্রতিজ্ঞা ক'রব ভাই ;
পরের জিনিস কিন্‌বো না, যদি
মায়ের ঘরের জিনিস পাই।

রজনীকান্তের এই গান স্বদেশী-আন্দোলনকে তীব্র নাড়া দিয়েছিল। বাঙলার ঘরে ঘরে কান্ত কবির নাম ছড়িয়ে পড়েছিল। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি লিখেছিলেন : "কান্ত কবির 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' নামক প্রাণপূর্ণ গানটি স্বদেশী সঙ্গীত-সাহিত্যের ভালে পবিত্র তিলকের ন্যায় চিরদিন বিরাজ করিবে। বঙ্গের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত এই গান গীত হইয়াছে। ইহা সফল গান। যে সকল গান ক্ষুদ্র-প্রাণ-প্রজাপতির ন্যায় কিয়ৎকাল ফুলবাগানে প্রাতঃসূর্যের মৃদু কিরণ উপভোগ করিয়া মধ্যাহ্নে পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া যায়, ইহা সে শ্রেণীর অন্তর্গত নয়। যে গান দৈববাণীর ন্যায় আদেশ করে এবং ভবিষ্যদ্বাণীর মত সফল হয়, ইহা সেই শ্রেণীর গান। ইহাতে মিনতির অশ্রু আছে,—নিয়তির বিধান আছে। সে অশ্রু, পুরুষের অশ্রু—বিলাসিনীর নহে। সে আদেশ যাহার কর্ণগোচর হইয়াছে, তাহাকেই পাগল হইতে হইয়াছে। স্বদেশী-যুগের বাংলা-সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের 'আমার দেশ' ভিন্ন আর কোন গান ব্যাপ্তি, সৌভাগ্য ও সফলতায় এমন চরিতার্থ হয় নাই। তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে নির্দেশ করি।" রজনীকান্ত হাসপাতালের শেষশয্যায় লিখেছিলেন : যেদিন 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' গান লিখে দিলাম, আর এই কলিকাতার ছেলেরা আমাকে আগে করে procession বের ক'রে এই গান গাইতে গাইতে গেল, সেদিনের কথা মনে ক'রে আমার আজও চক্ষে জল আসে।"

ভক্তি ও সাধনমার্গের দেশ এই বাঙলা। এর একটা ঐতিহ্য রয়েছে। সুপ্রাচীন কাল থেকে সঙ্গীতের মধ্য দিয়েই ভক্তের আকুতি ভগবানের দুয়ারে গিয়ে পৌঁছিয়েছে। আত্ম-সমর্পিত প্রাণ ভক্তের মনোবাঞ্ছা বৈষ্ণব শাক্ত বাউল প্রভৃতি পদ ও গানের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। এ একটি স্বতন্ত্র ধারা। এই ধারায় রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব ভাবুক মনও একদা প্রবাহিত হয়েছিল। রজনীকান্তও এই ধারাকে অনুসরণ করেছিলেন। খুব সম্ভব তাঁকে প্রভাবিত করেছিলেন কাঙাল হরিনাথ বা ফকিরচাঁদ বাউল। তাঁর অন্তরের ভগবৎ প্রেম স্বাভাবিকভাবেই উৎসারিত হয়েছে। স্বতঃ ধারায় স্বীয় অকৃত্রিম আকুতিকেই ব্যক্ত করেছে। ঈশ্বরে তাঁর বিশ্বাস ছিল নিঃসংশয়িত। তাই মৃত্যুর যন্ত্রণায় কাতর হয়েও সমস্ত কিছু হাসি মুখে বরণ করে নিতে পেরেছিলেন। সেখানে দ্বিধা সংকোচ ছিল না ব'লেই কবি বলতে পেরেছিলেন :

কেন বঞ্চিত হব চরণে ?
আমি, কত আশা ক'রে বসে আছি,
পাব জীবনে, না হয় মরণে !
আহা, তাই যদি নাহি হবে গো,—
পাতকি-তারণ-তরীতে, তাপিত
আতুরে তুলে' না লবে গো ;
হ'য়ে পথের ধূলায় অন্ধ,
এসে, দেখিব কি খেয়া বন্ধ ?

তবে, পারে ব'সে "পার কর" ব'লে, পাপী
কেন ডাকে দীন-শরণে ?
আমি শুনেছি, হে তৃষাহারি !
তুমি, আপনা হইতে হও আপনার,
যার কেহ নাই, তুমি আছ তার ;
এ কি, সব মিছে কথা ? ভাবিতে যে বৃথা
বড় বাজে, প্রভু, মরমে !

* * * * *

তুমি, নির্মল কর, মঙ্গল করে
মলিন মর্ম মুছায়ে ;
তব, পুণ্য কিরণ দিয়ে যাক্, মোর
মোহ কালিমা ঘুচায়ে।
লক্ষ্য—শূন্য লক্ষ বাসনা
ছুটিছে গভীর আঁধারে,
জানিনা কখন্ ডুবে যাবে কোন্
অকুল-গরল পাথারে !
প্রভু, বিশ্ব বিপদ হন্তা,
তুমি দাঁড়াও রুধিয়া পন্থা,

তব শ্রীচরণতলে নিয়ে এস, মোর
মত্ত বাসনা গুছায়ে
আছ, অনল-অনিলে, চিরনভোনীলে,
ভূধর সলিলে, গহনে।
আছ, বিটপিলতায়, জলদের গায়,
শশি তারকায় তপনে,
আমি, নয়নে বসন বাঁধিয়া
ব'লে আঁধারে মরিগো কাঁদিয়া ;
আমি দেখি নাই কিছু, বুঝি নাই কিছু,
দাও হে দেখায়ে বুঝায়ে।

রজনীকান্তের হাসির গানে অন্যতম অনুপ্রেরণা ও আদর্শ ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল। ভক্তিসংগীত এবং স্বদেশপ্রেমমূলক সংগীত রচনা করতে গিয়ে সমাজের যত প্রকার অসংগতি তাঁর চোখে পড়েছিল, তা তাঁকে ব্যথিত করেছিল। তাদের নিয়ে তিনি তীব্র বিদ্রূপ প্রকাশ করেছেন হাসির গানে। পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণ এবং আমাদের সামাজিক ভণ্ডামিগুলি তিনি হাসির গানে উপাদান রূপে ব্যবহার করেছেন। মৌতাত, জেনে রাখ, তিনকড়ি শর্মা, পুরোহিত, দেওয়ানী হাকিম, ডেপুটি, উকিল এই কবিতাগুলি নামের মধ্যে বিষয়বস্তুর পরিচয় দেয়। ইংরেজি ও বাঙলা মিলিয়ে তিনি বিদ্রূপ প্রকাশ করে তীব্র হাসির উতরোল তুলেছিলেন একদা। ইংরেজী শেখা বাঙালীর উচ্ছৃঙ্খলতা দেখে তাদের চরিত্র প্রকাশ করেছেন এইভাবে :

পড়ে A, B, C, D, খায় বার্ডস আই,
মুখে বলে, "মাইরি যাদু ! মরে যাই !"
মায়ের উপর চটা, বউকে বলে "ভাই",
টেড়ির পাখ্না মাথে, চোখে চশমা আঁটা।
মায়ের স্বত্ব কেবল গুদোম-ভাড়া পাবেন,
old idiot বাপ্‌টা ব'সে খাবেন

গিন্নী ? হ্যাঁ-হ্যাঁ, ব'সে মাসোহরা লবেন,
কোমল করে কভু সয় কি বাট্‌না বাঁটা ?
কলা-মুলো-খেকো মুনিগুলো ভ্রান্ত,
ক'রে গেছেন যত fallacious সিদ্ধান্ত,
ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহ নিতান্ত,
প্রকাণ্ড foolery পৌত্তলিকতাটা।

কলমা শাস্ত্রে উদ্ধার করেন হিন্দু nation
ইঙ্গ-বঙ্গ-মিশ্র অদ্ভুত conversation,
অঙ্গ শৌচে জল নেয়া botheration,
গুরুদেবটা ছুঁচো, পুরুত পাজি বেটা।

উঠিয়ে দেয়া উচিত বিবাহ-পদ্ধতি
সন্ধ্যা-গায়িত্রীর হয় না সদর্থ-সঙ্গতি,
বক্তৃতা হাততালি, জাতীয় উন্নতি,
বুঝলি না রে কান্ত, কপালের দোষ সেটা।

হাল্কা হাসির কবিতাও লিখেছিলেন। ভোজন বিলাসীর উৎকট ভোজন কল্পনা নিয়ে লিখেছিলেন :

যদি, কুমড়োর মত,　চালে ধ'রে রত
পান্‌তোয়া শত শত ;
আর, স'রষের মত,　হ'ত মিহিদানা
বুঁদিয়া বুটের মত !...
যদি তালের মতন　হ'ত ছ্যানাবড়া,
ধানের মত চ'সি।..
আর, তরমুজ যদি,　রসগোল্লা হ'ত
দেখে প্রাণ হত খুসি !...

যেমন, সরোবর মাঝে,　কমলের বনে,
কত শত পদ্ম পাতা,
তেমনি, ক্ষীর-সরসীতে,　শত শত লুচি,
যদি রেখে দিত ধাতা।...
যদি, বিলিতে কুম্‌ড়ো　হ'ত লেডিকিনি,
পটোলের মত পুলি ;
(আর) পায়েসের গঙ্গা　বয়ে যেত, পান
ক'র্ত্তাম দু-হাতে তুলি'।...

সকলি ত' হবে　বিজ্ঞানের বলে,
নাহি অসম্ভব কর্ম ;
শুধু, এই খেদ, কান্ত　আগে ম'রে যাবে,
(আর) হবে না মানব জন্ম।...

'বুড়ো বাঙ্গাল' নামে একটি ঈষৎ শ্লেষ মিশ্রিত কবিতায় রজনীকান্ত পূর্ব বঙ্গের ভাষা ও ব্যক্তি চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছেন। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর মনোরঞ্জনে বিব্রত বৃদ্ধের উক্তি :

বাজার হুদ্দা কিন্যা আইলা, ঢাইলা দিচি পায় ;
তোমার লাগে কেম্‌তে পারুম, হৈয়্যা উঠ্‌চে দায়।
আর্‌সি দিচি, কাহই দিচি, গাও মাজনের হাপান দিচি,
চুল বান্দনের ফিত্যা দিচি, আর কি ছ্যাওন চাও ?
বেলোয়ারী চুরি দিচি, পাছা-পাইর‍্যা কাপর দিচি,
পিরান দিচি মজা কৈর‍্যা দিবার লাগচে গায় !
উলের জুতা দিচি আইল্যা, কিসের লাইগ্যা মন্‌ডা পাইন্যা ?
ওজন কৈর‍্যা ব্যাবাক দিচি, পরাণ দিচি ফায়।
বুরা বুরা কৈয়্যা ক্যাবল, খ্যাপাইয়া ক্যান্ কোরচ্ পাগল ?
যহন বিয়্যা কোর্‌চ, ফেলবো ক্যামতে ? কৈয়্যা দাও আমায় ?

শ্লেষ বিদ্রূপ আর পরিহাসে কয়েকটি কবিতা আশ্চর্য আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। 'খিচুড়ী' কবিতায় কবি বলেছেন :

করো, বাইশ রোজা, একাদশী, হইয়ে স্থচি ;
খেয়ো শুকতনী ও ফাউলকারি, বিস্কুট ও লুচি ;
চাই, টিকিটে মজুবুত, যেন ফোঁটায় থাকে যুত,
ক'রো, ইদ, মহরম, চড়ক, আর দোল, হইয়ে নিষ্কাম।
হুইস্কিতে তিল তুলসী করিয়ে অর্পণ,
'জগৎ তৃপ্ত' ব'লে গিলে ক'রো পিতার তর্পণ,
ক'রে কৃষ্ণে নিবেদন, ক'র্‌বে বীফষ্টিক্ ভোজন ;
রেখো বদ্‌না, কমোড, কোশাকুশী আদি সরঞ্জাম।
খেয়োনা প্রকাশ্যেতে আতপান্ন গোপনে ফাউল ;
খোদার নামে দরবেশ সেজো, হরিনামে বাউল।
দীনকান্ত বলে ভাল, নিধির বলিহরি যাই !
এই অপূর্ব খিচুড়ী খেয়ে, আমি ত' গেলাম !

ঐতিহাসিক গবেষণা অবলম্বনে আশ্চর্য কৌতুকরসের সমাবেশ করেছেন 'পুরাতত্ত্ববিৎ' কবিতায় :

রাজা অশোকের কটা ছিল হাতী,
টোডরমল্লের কটা ছিল নাতী,
কালা পাহাড়ের কটা ছিল ছাতি,
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে করেছি জাহির।
আকবর শাহা কাছা দিত কিনা,
নূরজাহানের কটা ছিল বীণা,
মন্থরা ছিলেন ক্ষীণা কিম্বা পীনা,
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যা করেছি জাহির।

ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মাঝখানে কোথাও কোথাও তীব্র সহানুভূতির প্রকাশে কবির স্বতন্ত্র মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজের অসামঞ্জস্য কবি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার অন্তরবেদনাকে হাসি ও অশ্রুতে ফুটিয়ে তুলেছেন। সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বনে কান্ত কবির রচনা সংখ্যা কম ছিল না। এর কোথাও কোথাও স্বদেশ প্রেমের পরিচয় সুস্পষ্ট। 'মিলন' কবিতায় তিনি বলেছেন :

আয় ছুটে ভাই, হিন্দু-মুসলমান !
ঐ দেখ ঝর্‌ছে মায়ের দু-নয়ান।
আজ, এক ক'রে সে সন্ধ্যা-নমাজ
মিশিয়ে দে আজ, বেদ কোরাণ !

থাকি একই মায়ের কোলে, করি
একই মায়ের স্তন্য পান।

* * * * *

আমরা পাশাপাশি, প্রতিবাসী,
দুই গোলারি একই ধান।

রজনীকান্তের নীতি কবিতাগুলি একদা স্কুলপাঠ্য গ্রন্থে সংকলিত হোত। বর্তমানে এগুলি পাঠের প্রতি বিশেষ কারো ঔৎসুক্য নেই। রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা'র আদর্শে রচিত এই কবিতাগুলি কবির মৌলিক চিন্তা ও জীবনদর্শনের সুস্পষ্ট পরিচয় জ্ঞাপক। চরিত্রগঠনে এই ধরণের কবিতার মূল্য নিঃসন্দেহে স্বীকার্য। একটি কবিতা :

মহাবীর শিখ এক পথ বহি' যায়,
পথ-পার্শ্বে কুষ্ঠরোগী পড়িয়া ধরায় ;
বেদনায় হতভাগ্য করিছে চীৎকার,
ক্ষত স্থান বহি' তার পড়ে রক্তধার।
দেখিয়া বীরের মনে দয়া উপজিল,
শিরস্ত্রাণ খুলি তার ক্ষত বাঁধি দিল ;
শিরস্ত্রাণ কহে, "মাথে ছিলাম নগণ্য,
কুষ্ঠীর চরণে প'ড়ে হইলাম ধন্য।

সম্বাদ কৌমুদী ও রামমোহন

অমিয়কুমার মজুমদার

রামমোহনকে আধুনিক প্রাচ্যের প্রথম জাগ্রত মানুষ বলে অভিহিত করা যেতে পারে। অর্থহারা আচারের স্বপ্নজালে জড়িত ভারতের আলো যখন প্রায় নিবে এসেছিল, নিজের সত্য পরিচয় যখন নিজের কাছেই আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিল। সেই আত্মবিস্মৃত প্রদোষের অন্ধকারে জ্ঞানের দীপালোক নিয়ে আবির্ভূত হলেন রামমোহন রায়। ভারতের সেদিনকার ইতিহাস অগৌরবের কালিমায় আবৃত। নতুন কালের জন্যে তার কোন বার্তা নেই, সে ঘরের কোণে বসে জপ করছে মৃত যুগের মন্ত্র। ভারতব্যাপী সেই অজন্মার দিনে রামমোহন এসেছিলেন সত্যের ক্ষুধা নিয়ে। জ্ঞানের আলোকে স্বদেশের জড়তার নাশ করেছিলেন নানা ভাবে—বিভিন্ন তার পন্থা। এবং প্রতিটি পথে তিনি বিচরণ করেছেন সিদ্ধ সাধকের মতো।

রামমোহনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি সংবাদপত্র প্রকাশ। বাংলাদেশে প্রথম সাপ্তাহিক পত্র 'সমাচার দর্পণ' ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। শ্রীরামপুরের মিশনারীদের প্রচেষ্টায় এই পত্র প্রকাশিত হয়। এর দু'-এক মাস আগে ঐ মিশনারীদের পরিচালনায় 'দিগ্‌দর্শন' নামে মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। এটি খৃষ্টান ধর্ম প্রচারকারীদের হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করবার হাতিয়ার হলো। এর প্রতিবিধানের জন্য কলকাতার শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায় বাংলা সাময়িকপত্র প্রকাশের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠলেন। প্রতিষ্ঠা হলো 'সম্বাদ কৌমুদী' পত্রিকার। যদিও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারাচাঁদ দত্তের নাম পত্রিকার সম্পাদকরূপে মুদ্রিত, তাহলেও একথা সকলেই জানতেন এই পত্রিকার মুখ্য ব্যক্তি ছিলেন রামমোহন স্বয়ং। তিনি নিজে নিয়মিত প্রবন্ধাদি রচনা করে মিশনারীদের কটূক্তির উপযুক্ত জবাব দিতেন। 'সম্বাদ কৌমুদী'তে তাঁর বক্তব্য যেমন সমাজবিপ্লবী, তেমনি গতিশীল। নামে সম্পাদক যিনিই থাকুন, সকলেই এমনকি ইংরেজরাও জানতেন রামমোহন নিজেই এর সম্পাদক।

রামমোহনের বিশিষ্ট বন্ধু পাদ্রী অ্যাডাম বলেছেন। "He (Rammohun) established, conducted two native papers, one in Persian and the other in Bengali, and made them the medium of much valuable Political information to his countrymen." ১

'সমাচার দর্পণ' পত্রিকার প্রথম দিকে ঐ কাগজে এমন কতগুলি 'প্রেরিত পত্র' প্রকাশিত হয়, যাতে হিন্দু শাস্ত্রের যুক্তিহীনতা প্রভৃতি বিষয়ে কটাক্ষ থাকত। ১৮২১ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর (২০শে অগ্রহায়ণ, ১২২৮) তারিখে 'সম্বাদ কৌমুদী' প্রকাশিত হলে ২২শে ডিসেম্বর তারিখে 'সমাচার দর্পণে'র সম্পাদক এই প্রসঙ্গে লিখেছিলেন: 'এই মাসে সম্বাদ কৌমুদী নামে এক বাঙ্গালি সমাচার পত্র মোং কলিকাতাতে প্রকাশ হইয়াছে এবং তাহার তিন সংখ্যা পর্য্যন্ত ছাপা হইয়াছে ইহাতে আমরা অধিক আহ্লাদ প্রাপ্ত হইয়াছি যেহেতু দর্পণ বল কিম্বা কৌমুদী বল অথবা প্রভাকর বল যাহাতে এতদ্দেশীয় লোকেদের জ্ঞান সীমা বিস্তার হয় তাহাতে আমরা তুষ্ট…।'

'সম্বাদ কৌমুদী' প্রথমে প্রতি মঙ্গলবারে এবং ১৬শ সংখ্যা থেকে (১৬ই মার্চ ১৮২২) মঙ্গলবারের পরিবর্তে শনিবারে প্রকাশিত হতো। পৃষ্ঠা সংখ্যা আট। দাম—মাসিক দু'টাকা।

কৌমুদীর প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত বঙ্গীয় পাঠকবর্গের প্রতি নিবেদনে স্পষ্ট ক'রে জানানো হয় যে ধর্ম-নীতি ও রাষ্ট্র বিষয়ক আলোচনা, আভ্যন্তরীণ ঘটনাসমূহ, দেশ-বিদেশের সংবাদ ও জ্ঞাতব্য তথ্য-সম্বলিত প্রেরিত পত্র প্রকাশিত হবে। এক কথায় লোকহিত সাধনই এই সংবাদপত্র প্রচারের প্রধান লক্ষ্য। বিশেষ প্রয়োজনীয় পারিবারিক সংবাদও এখানে থাকত। পত্রিকার প্রস্তাবনায় একথা বিশেষভাবে বলা হয় যে দেশের কল্যাণের জন্যই এই পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। এ ছাড়া লর্ড হেষ্টিংস যে পরিমাণে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান করেছিলেন, তার জন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়েছিল। আরো বলা হয়েছিল অন্যান্য পত্রিকায় পারস্য, হিন্দুস্থানী ও ইংরেজী ভাষায় লিখিত অনুবাদযোগ্য প্রবন্ধ এখানে বাংলায় অনুবাদ ক'রে প্রকাশ করা হবে। দেশীয় লোকদের বিশেষ কোন কষ্ট বা তাদের প্রতি বিশেষ কোন অত্যাচার উপস্থিত হলে তা সম্মানের সঙ্গে গভর্ণমেন্টের গোচর করা হবে। রাজা রামমোহন রাজনীতি, ধর্মনীতি, বিজ্ঞান, ইতিহাস সকল বিষয়েই লিখতেন। 'সম্বাদ কৌমুদী'র শিরোদেশে নিম্নলিখিত শ্লোক মুদ্রিত হ'তো—

'দর্পণে বদনং ভাতি দীপেন নিকটস্থিতং,
রবিণা ভুবনং তপ্তং কৌমুদ্যা শীতলং জগৎ' ২

'সম্বাদ কৌমুদী'র জন্মতারিখ নিয়ে মতবিরোধ হতে পারে যদিও প্রায় সকলেই এর জন্মতারিখ ১৮২১ সাল ধরে নিয়েছেন। অনুসন্ধানে জানা গেছে কৌমুদীর প্রথম প্রকাশ কাল ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাস অর্থাৎ ১২২৬ বঙ্গাব্দ। লঙ্ সাহেব বাংলা পুস্তকের যে তালিকা প্রণয়ন করেন, তার মধ্যে এর প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। এই পত্রিকা সংস্কৃত প্রেসে ছাপা হ'তো। রাজা রামমোহনের গ্রন্থাবলীতে এই পত্রিকার প্রথম প্রচারারম্ভ ১৮২০ খৃষ্টাব্দ লেখা হয়েছে। আবার ১৩০৩ সালের ফাল্গুন মাসের 'জন্মভূমি' পত্রিকার 'সহমরণ' প্রবন্ধে ১৮২১ খৃষ্টাব্দ আছে। দুটিই ভুল। যেহেতু যে লঙ্ সাহেবের লিপি রামমোহন রায়ের গ্রন্থ প্রকাশকদের আশ্রয়স্থল, সেখানেই ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের কথা লেখা হয়েছে। 'কলিকাতা ক্রিশ্চিয়ান অব্জারভার' পত্রে ১৮৪০ সালের আগে বিগত জীবন যে সব পত্রিকার তালিকা ছাপা হয়েছে তাতেও কৌমুদীর প্রকাশকাল ১৮১৯। 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রের ত্রয়োদশ খণ্ডের ১৫৯ পৃষ্ঠায় লেখা আছে ১৮২৩ সালে কৌমুদী প্রথম প্রকাশিত হয়। এ মতটিও নিঃসন্দেহে ভ্রান্ত। যাই হোক, ১৮১৯ সালে প্রকাশিত বা ১৮২১ সালে প্রকাশিত সম্বাদ কৌমুদীর কোন সংখ্যা আজ পাওয়া যায় না।

'সম্বাদ কৌমুদী' প্রচারের দশ বছর আগে প্রায় ১৮১০ সাল থেকেই রামমোহন সহমরণ আন্দোলনে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। কৌমুদী প্রকাশিত হলে তিনি তাকে তাঁর আন্দোলনের উপযুক্ত ক্ষেত্র মনে করলেন। ফলে সহমরণের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ 'সম্বাদ কৌমুদী'তে প্রকাশিত হতে থাকল। এতে পত্রিকার অন্যতম প্রকাশক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষুব্ধ হন। ত্রয়োদশ সংখ্যা পর্যন্ত (২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৮২২) তিনি পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন, তারপরে পদত্যাগ ক'রে নতুন পত্রিকা প্রকাশে ব্রতী হন। এ সম্বন্ধে 'সম্বাদ তিমিরনাশক' লিখেছেন, "(পত্রিকা প্রকাশের) দুই তিন

মাস গতে দত্তদের এক সুসন্তান শ্রীযুক্ত হরিহর দত্ত ঐ কাগজের এক সহকারী হইলেন ইহাতে তাঁহার মনোগত কথা ব্যক্ত করিতে বাঞ্ছা করিলেন অর্থাৎ সহগমনের প্রতি তাহার কটাক্ষ করার মত এজন্য তাঁহার বন্দ্যোপাধ্যায় বাবুর সহিত অনৈক্য হইলে তিনি ঐ কাগজ প্রকাশক ছিলেন তাদৃশ কথা লেখাতে ধর্মহানি এবং হিন্দুসমাজে মানহানি জানিয়া কৌমুদী ত্যাগ করিয়া ঐ সালের ফাল্গুনে চন্দ্রিকা নামক কাগজের সৃষ্টি করেন ইহাতে কৌমুদী ও চন্দ্রিকায় ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল।" ৩

রামমোহন নিজেই যে এর গুপ্ত সম্পাদক ছিলেন সেকথা 'Enquirer' এর ভাষাতেই স্পষ্টভাবে পরিব্যক্ত।

'The cowmoody set up by Baboo Rammohun Roy, to counteract the force of chundrika, has been engaged in treating on general Subjects, taking liberal views of them, though coming only as far as half the way on religion and politics.' ৪

১৮২১ সালের প্রথম আট সংখ্যায় যে যে প্রধান প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়েছিল তার তালিকা—

প্রথম সংখ্যা: অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করবার জন্যে গভর্ণমেণ্টের কাছে প্রার্থনা। এ ছাড়া এক কৃপণ রাজার গল্প ও ছিল।

দ্বিতীয় সংখ্যা: (ক) সংবাদ পত্রের সাহায্যে বাঙ্গালার উপকারিতা

(খ) চিৎপুর রোডে জল-সেচন করবার জন্যে চাঁদা তোলার প্রয়োজনীয়তা

(গ) গুরুভক্তি

(ঘ) উত্তরাধিকার প্রাপ্তির বয়স পনের থেকে বাইশ হওয়ার ইঙ্গিত।

(ঙ) কৃপণদের প্রতি বিদ্রূপোক্তি। যারা কৃপণ তারা দানে অসমর্থ, অথচ তাদের মৃত্যুর পর প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হয়।

তৃতীয় সংখ্যা: (ক) শব দাহ করবার জন্য আরো প্রশস্ত স্থানের জন্য সরকারের কাছে আবেদন এবং খৃষ্টানদের সমাধিস্থান বিশালতর করবার চেষ্টা সম্পর্কে ইঙ্গিত।

(খ) চাউলের রপ্তানি বন্ধের জন্য আন্দোলন, যেহেতু চাউল হিন্দুদের প্রধান খাদ্য।

(গ) গরীবের সাহায্যের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসালয় স্থাপন করবার জন্য রাজপুরুষদের কাছে প্রার্থনা।

(ঘ) দেব-প্রতিমা নিরঞ্জনের সময় ইংরেজদের তীব্রগতিতে গাড়ী চালানোর প্রচণ্ড প্রতিবাদ।

চতুর্থ সংখ্যা: (ক) নেটিভ ডাক্তারের ছেলেরা ইয়োরোপীয় ডাক্তার দ্বারা শিক্ষাপ্রাপ্ত হন, এবিষয়ে উত্তেজনা।

(খ) কুলীনদের বিবাহের দোষ

(গ) ধনী লোকের অর্থের অপব্যয় ও শিক্ষায় সামান্য মাত্র ব্যয় হয়।

পঞ্চম সংখ্যা: (ক) অচিরোদ্ভাবিত নাটকের অসৎপথে প্রবর্তন

(গ) কাপ্তেন বাবুদের অপকীর্তি

ষষ্ঠ সংখ্যা: (ক) স্বদেশ গমনোদ্যত প্রধান বিচার পতির সম্মানার্থে চন্দ্রকুমার ঠাকুর যে নৃত্য ও ভোজ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন তার বর্ণনা

(খ) পাঁচ বছরের হিন্দু বালকের ইংরেজী ও বাংলায় পারদর্শিতা

(গ) বিদ্যাশিক্ষার সুবিধা সম্পর্কে আলোচনা

(ঘ) আগ্রার তাজমহলের বিবরণ

(ঙ) সত্যপরায়ণতা

(চ) ইয়োরোপীয় চিকিৎসকদের কাছে বাঙ্গালী যুবকদের শিক্ষানবিশী।

(ছ) গরীবের শবদাহ করবার জন্য চাঁদা সংগ্রহের প্রস্তাব

(জ) অসহায়া হিন্দু বিধবাদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য অর্থ সঞ্চয়ের অনুষ্ঠান।

সপ্তম সংখ্যা ঃ (ক) শবদাহ ঘাটে এক চোরের অত্যাচার

(খ) চাকরদের প্রশংসা করা উচিত কি না—এ বিষয়ে আলোচনা

(গ) কাঠের দুর্মূল্যতা—কিছুদিন আগে টাকায় দশমণ জ্বালানি কাঠ বিক্রী হতো প্রবন্ধে একথাই উল্লেখ করা হয়েছে।

(ঘ) ইংরেজী পড়ার আগে বালকদের বাংলা ব্যকরণে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

অষ্টম সংখ্যা ঃ (ক) পাখীতে মানব শিশু নিয়ে যাওয়ার সংবাদ

(খ) হিন্দুদের স্থাপত্যবিদ্যা

(গ) কলিরাজার যাত্রা নামে নতুন নাটকের অভিনয়

(ঘ) অভয়চরণ মিত্রের নিজ অভীষ্টদেবকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দান

(ঙ) কলকাতার ধনী বাবুদের কাছে কোন শিক্ষিত ব্রাহ্মণের অসমসাহসিক কাজের বিবরণ।

১৮৫৪ সালে স্কুলবুক সোসাইটি 'বঙ্গীয় পাঠাবলী' নামে যে বই বের করেন তার মধ্যে 'সম্বাদ কৌমুদী'র কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। রাজনারায়ণ বসুর প্রকাশিত রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলীর মধ্যে সম্বাদ কৌমুদীর কয়েকটি প্রবন্ধ উদ্ধৃত হয়েছিল। প্রবন্ধগুলি হলো :—

(১) 'বিবাদ ভঞ্জন'—এটি ১৮২৩ সালের কৌমুদীতে প্রকাশিত

(২) অয়স্কান্ত অথবা চুম্বকমণি

(৩) মকর মৎস্যের বিবরণ

(৪) বেলুনের বিবরণ

(৫) মিথ্যাকথন

(৬) বিচারজ্ঞাপক ইতিহাস

(৭) ইতিহাস।—এগুলি ১৮২৪ সালের সম্বাদ কৌমুদীতে প্রকাশিত হয়।

সত্বাধিকারী ও সম্পাদক হরিহর দত্ত পত্রিকার আর্থিক উন্নতিতে হতাশ হয়ে অবসর গ্রহণ করলেন। তখন মিলিটারি বোর্ড অফিসের কেরাণী শাঁখারিটোলার গোবিন্দ চন্দ্র কোঙার 'সম্বাদ কৌমুদী' পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। ২৪ সংখ্যক কৌমুদীতে (১:মে, ১৮২২) পাঠকদের প্রতি বিদায়ী সম্পাদক হরিহর দত্তের বিদায়বাণী এবং বর্তমান সম্পাদক গোবিন্দ চন্দ্র কোঙারের নিবেদন মুদ্রিত হয়েছিল। এই নতুন ব্যবস্থাপনাতেও কৌমুদী বেশি দিন টিকল না। চার মাস পরে বন্ধ হয়ে গেল। হিন্দুদের কতগুলি প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে, বিশেষতঃ সতীদাহের বিরুদ্ধাচরণ করায়

কৌমুদী জনসাধারণের বিরাগ ভাজন হয়। সর্বোপরি রক্ষণশীল দলের মুখপাত্র ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সমাচার চন্দ্রিকা'তে কৌমুদীর বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন করাতেও তার গ্রাহক সংখ্যা অনেক কমে যায়।

১৮২৩ সালের ৭ই আগষ্ট আবার সুদিন এল। এবারে সম্পাদক হলেন আনন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ৮নং জোড়াসাঁকো থেকে এ পত্রিকা প্রকাশিত হ'লো। সরকার নতুন আইন অনুসারে লাইসেন্স মঞ্জুর করলেন। মুদ্রাকর ও প্রকাশক হলেন গোবিন্দচন্দ্র কোঙার।

এর পরও 'সম্বাদ কৌমুদী' প্রায় দশ বছর বেঁচে ছিল। এই দশ বছরের মধ্যে দু'তিন বার পরিচালকের পরিবর্তন হয়। ১৮২৪ সালের পত্রিকায় যত বিবরণ ছিল তার মধ্যে কয়েকটি 'ক্যালকাটা রিভিউ' থেকে উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

(ক) এক মুচীর স্ত্রী একসঙ্গে তিন ছেলে প্রসব করে। এতে সম্পাদক আশ্চর্য হয়ে লিখেছিলেন তীর্থ ভ্রমণ এবং ব্রত নিয়মের ফলে দেহপাত ক'রে কত ধনীর স্ত্রী সন্তান লাভে বিফল হন, ফলে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। অথচ এই দরিদ্রের ঘরে একই সঙ্গে তিন পুত্র জন্মালো।

(খ) চীৎপুরের এক নারীর বৃত্তান্ত আর এক প্রস্তাবে মুদ্রিত হয়। এই নারী সন্ন্যাসিনী —সন্ন্যাসীর স্ত্রী। তাঁর পরলোকগত স্বামীর সঙ্গে জীবিতাবস্থার তাঁকে মাটিতে পুঁতে ফেলার বিবরণ বিবৃত হয়। সে সময় সন্ন্যাসীদের এই ধরণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা ছিল।

(গ) কোন বাঙ্গালীর আঠারো বছরের এক কন্যা নিমতলা ঘাটে সাঁতার দিয়ে গঙ্গা পার হয়।

(ঘ) শ্রীরামপুরে এক ব্রাহ্মণ লোকের ভাগ্যগণনার জন্য উপস্থিত হয়। তিনি বলেন যে তিনি গুপ্ত রত্নোদ্ধারেও সমর্থ। একাজের জন্য একজন তাঁকে কুড়ি টাকা দিতে স্বীকার করে। উক্ত লোক কার্যান্তরে গেলে ব্রাহ্মণ পিতলের একখানা রেকাব মাটির মধ্যে পুঁতে ফেলে। সেখানে সাহেবরাও উপস্থিত ছিলেন। গণক সাহেবকে ঐ পিতলের রেকাবটিই গুপ্তধন বলে নির্দ্দেশ করলেন। অন্যেরা তাঁর চাতুরী ধরে ফেললেন। অর্থাৎ তিনি নিজে কিছুক্ষণ আগে এটি মাটিতে পুঁতেছিলেন একথা প্রকাশ হয়ে পড়ল। সকলে মিলে ব্রাহ্মণকে হাতে পায়ে বেঁধে পথে ফেলে দিলেন।

(ঙ) হাতপুর পরগণায় এক সাপ ধরা পড়ে। তার গর্জনে চারদিক বিকম্পিত হয়।

(চ) তারকেশ্বরে এক সন্ন্যাসী এক নরহত্যা করেন। সংবাদে প্রকাশ সেই নিহত লোকটি সন্ন্যাসীর স্ত্রীর সঙ্গে অবৈধ সম্বন্ধে লিপ্ত ছিল।

(ছ) কলকাতার জগন্নাথ ঘাটে এক সন্ন্যাসী দক্ষিণ চরণ উর্ধ্বে স্থাপন করে দিনরাত্রি সেইভাবে কাটান। এ অতি কৃচ্ছ্র সাধনার কাজ।

২৬ সংখ্যা সম্বাদ কৌমুদীর প্রসঙ্গ সূচী৫ :—১, ২, ৩। বিজ্ঞাপন ৪। সরকারী সভাসমিতি ৫। অযোধ্যার নবাব নতুন ধরণের মুদ্রার প্রচলন করেন ৬। আজিমাবাদে ডাকাতি ৭। খোসপুরে ডাকাতি ৮। পিতামাতার অনবধানতায় এক শিশুকে শেয়াল মেরে ফেলে। ৯। ১৮২২ সালের ১৫ই মে তারিখে প্রচণ্ড ঝড়, বৃষ্টি ও বজ্রপাত হয়। ১০। কুলিবাজার ঘাটে এক স্বর্ণকারকে হাঙরে কামড়ায়। ১১। খিদিরপুরে এক সেপাইকে অ্যালিগেটর (কুমীর বিশেষ) তাড়া করে। ১২। কাষ্টম হাউস ঘাটে একটি হাঙর জালে ধরা পড়ে। ১৩। বলাৎকার বা ধর্ষণের সংবাদ

১৪। রিষড়ার কাছে এক নৌকাডুবি হয়। এতে চারজন ইংরেজ, তুজন বেয়ারা ও মাঝি ছিল। ১৫। কয়েকটি কৌতুকপ্রদ ঘটনা ১৬। এক লোভী ও তুজন ধার্মিক ব্যক্তির এক কাহিনী। গল্পের মর্মার্থ ও বিবৃত হয়। ১৭। ইছাপুরে এক অগ্নিকাণ্ডে অনেক লোক নিহত হয়। ১৮। ১৯শে মে ১৮২২ সালে মুঙ্গেরে এক নৌকাডুবিতে ৬৪ জন লোক ডুবে মারা যায়। ১৯। বাঁশ বেড়িয়াতে এক নারকেল চোরের স্নিপুণ কৈফিয়ৎ।

২৯ নং সংখ্যা সম্বাদ কৌমুদীর প্রসঙ্গ সূচী :—৬

১। বড়বাজারের ব্যাঙ্ক লুট।

২। বেলিয়াঘাটাতে বগি গাড়ি চালানোর সময়ে প্রবল বাতাসে গাড়ীর ভদ্রলোক দূরে ছিটকে যান।

৩। ২৪-পরগণার অন্তর্গত চিংড়ি ঘাটাতে তুটি ছেলে পুকুরে ডুবে মারা যায়।

৪। ভবানীপুরে কোন ছেলেধরা ন'বছরের এক মেয়ে হত্যা করে।

৫। যশোহরে নীল চাষের ক্ষতি।

৬। গোহাটার কয়েকজন গরু বিক্রেতার কাছ থেকে জোর করে ট্যাক্স তোলার জন্যে খিদিরপুরের এক দারোগার বিচার হয়।

৭। মাসেন্দ গ্রামে এক বাঘ মারা হয়।

৮। বৰ্দ্ধমানে মাতা কর্তৃক শিশুপুত্র হত্যা। ঘুমের সময় মায়ের ডান বুকের চাপে শিশুর শ্বাসরুদ্ধ হয় এবং মারা যায়।

৯। বাটারভিয়াতে মড়ক।

১০। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছে এমামবাগে তুজন মুসলমান ঘর চাপা পড়ে মারা যায়।

১১। বৃন্দাবন যাত্রার পথে এগারোটি নৌকা ডুবি হয়।

১২। এক বেপরোয়া নাগর এক বেশ্যার গালে কামড়ে দেয়। এ কাহিনীর বিবরণ।

১৩। ইংলণ্ডে ইতুর ধরার জালে এক চোর ধরা পড়ে।

১৪। এক ব্যক্তি তার কৃত পপের প্রায়শ্চিত্ত করে।

১৫। কৌমুদীর বিরুদ্ধ বাদীদের সম্পর্কে আলোচনা।

১৬। সমাচার চন্দ্রিকার সম্পাদকের প্রতি বিদ্রূপ বর্ষণ।

১৭। এলাহাবাদে একজন লোক তার বন্ধুর সঙ্গে বিশ্বাস ঘাতকতা করে। সংবাদে প্রকাশ এই বিশ্বাসঘাতকের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু বাণিজ্য উপলক্ষে পাটনা যাবার সময় তার স্ত্রীকে এর তত্ত্বাবধানে রেখে যায়। ১৮২২ সালে বাংলাদেশে লবণের তুর্মূল্যতা ও তুষ্প্রাপ্যতা ঘটে। এ বিষয়ে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য কোন পত্রপ্রেরক সম্বাদ কৌমুদীর সম্পাদকের কাছে এক চিঠি পাঠান। চিঠিখানা 'ক্যালকাটা জার্নালে' ছাপা হয়। সে সময়তেও যে চিন্তাধারার মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি ছিল তা এই চিঠিখানা থেকে প্রমাণিত হয়। চিঠিখানা উদ্ধৃত করছি। ৭

"To the Editor of Sungbad Cowmoody
Sir,

By kindly insisting the following short subject in your Cowmoody, in order to make it known to the public, you will oblige men.

We hear of the sufferings of destitude persons from the late scarcity of salt, and to some of their troubles we also are eye—witnesses, as among the great many poor people living in krishnagar, soorool, and other places near the woods, those who purchased two chittaks for their daily consumption, owing to the scarcity of salt, one now obliged to do with half a chittak, and in that again to infuse mud, and thus to content them selves. In those places where ten thousand maunds of salt had been sold, perhaps not even five maunds can be disposed of, now that the price of salt has been so much raised. More over we think, that if some merchant should take into those countries korkoch salt, then the common Puga salt would not be sold in those places. However that be, this circumstance in every day proving more and more trouble some to the indigent, miserable and poor people."

রামমোহন প্রায় প্রতি সপ্তাহে সম্বাদ কৌমুদীতে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ রচনা করতেন। জ্ঞান বিজ্ঞান, পুরাতত্ব প্রভৃতি বিষয়ে পত্রিকা পূর্ণ থাকত। প্রবন্ধের ভাষা হতো প্রাঞ্জল। ফলে তা জনসাধারণের খুব উপকারে আসত। রামমোহন জ্ঞান বিজ্ঞানের নানা প্রবন্ধ সহজ সরল ভাবে রচনা করে কৌমুদীতে প্রকাশ করতেন যাতে সাধারণ মানুষ তার জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করতে পারে। বাংলা রচনাকালে যে ব্যাকরণ মানতে হয় বলতে গেলে তাও রামমোহনের কীর্তি। এ বিষয়ে মতবিরোধ আছে। রামমোহন রায় সম্পর্কে ঈশানচন্দ্র বসু মন্তব্য করেছেন, "জ্ঞানগর্ভ অমিশ্র সাহিত্য রচনাতেও তাঁহার নৈপুণ্য ছিল। রামমোহন গদ্য রচনার বৈয়াকরণিক নিয়ম প্রথম নির্দ্ধারণ করতে এবং কৌমুদীতে এই সকল প্রবন্ধ লেখাতে তাঁহাকে বর্তমান বাংলা গদ্য সাহিত্যের স্রষ্টি কর্তা বলিতে হইবে।'[৮]

সম্বাদ কৌমুদীতে 'সহমরণ সংবাদ' নামে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, পরে তা গ্রন্থাকারে বেরয়। ১৮২৯ সালের জুলাই মাসের 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' প্রশংসা সহকারে তার উল্লেখ করা হয়।

"আমরা জানিলাম সহমরণ সংক্রান্ত এই ক্ষুদ্র বাংলা গ্রন্থখানি কোন বাংলা সংবাদপত্রে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। রামমোহন রায়ের পুস্তকের দ্বিতীয়বার প্রকাশে জনসাধারণের মহোপকার সাধিত হইবে।" এই পত্রিকা সম্বাদ কৌমুদী। তাহলে এখানেও লক্ষ্য করা যায় যে সম্বাদ কৌমুদীর প্রকাশকাল ১৮১৯ হতেও পারে।

'সম্বাদ কৌমুদী' প্রগতিশীল পত্রিকা হওয়ার জন্য তার স্থায়ীত্ব বেশিদিন রইল না। প্রায়ই পত্রিকা বন্ধ হতে থাকে। আনন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পর সম্পাদকরূপে হলধর বসুর নাম পাওয়া

যায়। ১৮২৯ সালের ১৯শে ডিসেম্বর তারিখে 'বঙ্গদূত' নামে এক সাপ্তাহিক পত্রে 'সম্বাদ কৌমুদী'র সম্পাদকরূপে হলধর বসুর নাম পাওয়া যায়।

১৮৩০ সাল থেকে সম্বাদ কৌমুদীর চাহিদা বৃদ্ধি হয় কিছুদিনের জন্য। ফলে তা দ্বি-সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত হয়। ঐ সালের ৩০শে জানুয়ারী 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশ—'সম্বাদ কৌমুদী এখন সপ্তাহে দুইবার প্রকাশ হইতেছে।' আগেই বলা হয়েছে সম্বাদ কৌমুদীর জনপ্রিয়তা সাময়িকভাবে বাড়ে। একটি পত্র তার প্রমাণ। পত্রটি ১৮৩০ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী 'সম্বাদ কৌমুদী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

'শ্রীযুত যথার্থবাদী কৌমুদী প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু,

চন্দ্রিকা প্রকাশকের কি বুদ্ধি প্রকাশ তাহা লিপিদ্বারা প্রকাশকরণে অসমর্থ যেহেতু কএক নূতন অনুমানের সৃষ্টি করিয়াছেন যে পূর্ব পূর্ব গ্রন্থকারেরা ধুম দৃষ্টি করত অগ্নির অনুমান অবম্প্রকারাদির পরিবর্তে তবলার চাটীর শব্দ গ্রহণে জবনকরণক বাদ্যোদ্যম অনুমান করিয়াছেন যে হউক এবম্ভুতানুমানে চন্দ্রিকাকারের পূর্বনিবাস সেখপাড়াপ্রযুক্ত পূর্বস্থাকা সর্বদাই স্মরণ হয় যেমত লোকে কহে যে আকরে টানে যাহা হউক বেদ পাঠাদি শ্রবণে ব্রাহ্মণের দোষ অব্রাহ্মণেই কহিয়া থাকে এবং শাস্ত্রে আছে যে কলিতে বেদের নিন্দা অনেকেই করিবেন অতএব এই দুই মতে চন্দ্রিকাকার নির্দোষী তবে পাঠানন্তর ঈশ্বর বিষয়ক গীতোপলক্ষে যবণকরণক বাদ্যোদ্যমে যে দোষানুভব করিয়াছেন তাহাতে কেবল মহাভারতীয় 'রাজন সর্ষপমাত্রাণি পরচ্ছিদ্রাণি পশ্যতি। আত্মনো বিল্বমাত্রাণি পশ্যন্নপি নপশ্যতি, এই শ্লোক স্মরণ হইল কেননা দুর্গোৎসব রাসযাত্রা প্রভৃতিতে যবনীর নৃত্যগীতাদি এবং ইংরেজের মদ্যমাংস ভোজনাদিতে কোন দোষ দৃষ্টি করেন না বরঞ্চ তৎপক্ষে চক্ষুমুদ্রিত করিয়া মনের দ্বারা কল্পনা করেন কেবল ব্রহ্মসমাজের দোষ সর্বদা দেখিয়া থাকেন একি আশ্চর্য যদিৎস্যাৎ বেদপাঠান্তর গান উপলক্ষে যবনকরণক বাদ্যোদ্যম হইয়া থাকে তাহাতেও দ্বেষ প্রযুক্ত কিম্বা শাস্ত্রমতে দোষ স্থির করিয়াছেন অনুমান করি শাস্ত্রমতে না হইবেক যেহেতুক শাস্ত্রে সমাজ স্থান নীচস্পর্শে দোষভাব লিখিয়াছেন।''

সম্বাদ কৌমুদী প্রগতিশীল পত্রিকা ছিল তা আগেই বলা হয়েছে। দেশের কোথাও কোন উন্নতি হলে তাঁরা তা সবিস্তারে প্রকাশ করতেন। ১৮ই জুন, ১৮৩১, ৫ই আষাঢ়, ১২৩৮ তারিখের 'সম্বাদ কৌমুদী' পত্রিকায় এ ধরণের এক সংবাদ প্রকাশিত হয়।

"নূতন পাঠশালা।...সংপ্রতি পরম্পরায় অবগত হইলাম যে শ্রীযুত রসিকচন্দ্র মল্লিক শিমুলিয়াতে হিন্দু ফ্রি স্কুল নামে বিনাবেতনে এক বিদ্যামন্দির স্থাপন করিয়াছেন প্রায় ৮০ জন বালক ঐ স্থানে শিক্ষাকরণার্থে গমন করিয়া থাকেন তথায় কেবল পুস্তকের অর্দ্ধমূল্য লন আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম যে ইহারা বিদ্যা উপার্জন করিয়া আপনার দেশের উপকার জন্য কি শ্রম করিতেছেন...।"

রামমোহনের বিলেত যাবার পর তাঁর বড় ছেলে রাধাপ্রসাদ রায় কিছুদিন 'সম্বাদ কৌমুদী' পরিচালনা করেছিলেন। ১৮৩২ সালের ২১শে জানুয়ারী তারিখে 'সমাচার দর্পণে' এ সম্বন্ধে সংবাদ প্রকাশিত হলো—'এক্ষণে শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়ের পুত্র শ্রীযুত বাবু রাধাপ্রসাদ রায় কৌমুদী

নামে কাগজ করিতেছেন। ঐ কাগজের গ্রাহক সতীদ্বেষী কএক মহাশয়েরা আছেন শুনিয়াছি তাহার ব্যয় নিমিত্ত শ্রীযুত বাবু কালীনাথ মুন্সী ১৬ টাকা আর শ্রীযুত বাবু দ্বারিকানাথ ঠাকুর ১৬ টাকা দেন ইহাতেই তাহার জীবনোপায় হইতেছে নচেৎ কৌমুদী এতদিনে কোন স্থানে মিলাইয়া যাইতেন...।' ৯

এ সংবাদ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় দ্বিসাপ্তাহিক পত্রিকারূপে বেশিদিন বেঁচে থাকা সম্ভব হয়নি। উপরন্তু দেশীয় জনসাধারণের কুসংস্কার সম্বাদ কৌমুদীর প্রগতিশীল মতকে সমর্থন না করায় পত্রিকার পক্ষে টিকে থাকা দুঃসাধ্য হয়ে উঠল। সর্বোপরি রামমোহন রায় বিদেশে চলে যেতে 'সম্বাদ কৌমুদী'র অবস্থা হাল ভাঙা নৌকোর মত হলো।

১৮৩২ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তারিখের 'সমাচার দর্পণে' কৌমুদীর এক বিজ্ঞপ্তি উদ্ধৃত হয়।'

'সর্বজনকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাইতেছে যে পূর্বে কৌমুদীর লেখক ও সাহায্যকারী যিনি ছিলেন তেঁই কোন আবশ্যকতাতে বাধিত হইয়া ঐ কর্ম হইতে অবসর প্রাপ্ত হইয়াছেন এক্ষণে তাঁহার পরিবর্তে নবীন লেখক ও সাহায্যকারী এই ডিসেম্বর মাসের প্রথম হইতে হইলেন...।

কালক্রমে স্তব্ধ হয়ে গেল 'সম্বাদ কৌমুদী'। দেশের জনসাধারণকে উন্নত চিত্ত করবার রামমোহনের আর এক প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হলো না। তা না হোক, পরবর্তীকাল তাঁর এই প্রয়াসকে সশ্রদ্ধ চিত্তে গ্রহণ করে কৃতার্থ হয়েছে।

১। 'A lecture on life and Labours of Rammohun Roy' By W. Adam Page 20.

২। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির প্রবন্ধ থেকে গৃহীত, 'নব্যভারত', বৈশাখ, ১৩০৪।

৩। 'সম্বাদ তিমির নাশক' থেকে ২১শে জানুয়ারী ১৮৩২ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত।

৪। Enquirer: 'The Bengali News papers', Asiatic Journal. Apr. 1833 (Asiatic Intelligence-Cal. P 9).

৫। Calcutta Journal থেকে লেখক কর্তৃক অনূদিত।

৬। News from Sungbad Cowmoody: Calcutta Journal, June 21, 1822, Page 723. লেখক কর্তৃক অনূদিত।

৭। Published on June 18, 1822, at Calcutta Journal.

৮। রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী: ঈশানচন্দ্র বসু প্রকাশিত; পৃ ৮১১—৮১২।

৯। 'সম্বাদ তিমিরনাশক' থেকে উদ্ধৃত।

এ শতাব্দী কার?

সুনীলকুমার নাগ

পৃথিবী আজ মালিকানার সমস্যা নিয়ে নিরতিশয় বিব্রত। এ সমস্যাটা ব্যক্তি-মানুষের পক্ষে যতোটা সত্য; পরিবার, গোষ্ঠী, জাতি বা রাষ্ট্রর পক্ষেও তার চাইতে কিছুমাত্র কম নয়। প্রতিক্ষণ এ সমস্যাটার একটা ফয়সালা করবার জন্যে যে প্রচেষ্টা, যা সংগ্রামেরই নামান্তর—তার মধ্যেই প্রকটিত হয় আমাদের চরিত্র, সৃষ্ট হয় মানুষের ইতিহাস।

একদিন কিন্তু পৃথিবীতে মালিকানার এ সমস্যা ছিল না, সে অনেক কাল আগের কথা, মানুষের অন্ধকারময় জীবনের কথা। তারপরে যেদিন আমাদের পূর্বপুরুষ আলোক প্রাপ্ত হলো, যেদিন সুরু হলো বর্তমান সভ্যতার—মালিকানার এ সংগ্রাম বলতে গেলে সেই মুহূর্ত থেকেই সুরু হলো। পৃথিবীতে কিছুই চিরস্থায়ী নয়; তাই মনে হয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে আজকের দিনে পৃথিবীতে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, জাতিতে জাতিতে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যে হৃদয়হীন প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা যাচ্ছে, একদিন হয়ত এর লোপ, ঘটতে পারে। আবার দেখা দিতে পারে মালিকানা প্রতিষ্ঠার অভিলাষ মুক্ত মানব সমাজ। তবে সেদিন মানুষের জীবন আবার অন্ধকারে ছেয়ে যাবে নাকি আজকের তুলনায় উজ্জ্বলতর আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে তা নিশ্চয় করে বলা রাষ্ট্রনীতি বা ইতিহাসের দুরূহতম প্রশ্ন।

যাই হ'ক, মালিকানার এই যে সংগ্রামটা আজকের দিনে পৃথিবীতে চলছে, এটা মূলতঃ স্থূল বস্তু নিয়ে। জায়গা জমি, রাজ্য (space) এবং বিত্ত-সম্পত্তি, ধন-দৌলত (property and riches) হলো এই সংগ্রামের বিষয়। কিন্তু স্থূল বস্তু নিয়ে এই সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে আর একটা সংগ্রামও চলে আসছে মানব সভ্যতা বিকাশের প্রথম থেকেই—সে হলো মানুষের ভাবজগতের মালিকানার সংগ্রাম, কালের (Time) মালিকানার সংগ্রাম। বর্তমানে আমরা এই শেষোক্ত কালের মালিকানার জন্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা তারই বিষয় আলোচনা করব।

বাল্মীকি, বেদব্যাস, হোমার, বুদ্ধদেব, যীশুখৃষ্ট প্রভৃতি প্রত্যেকেই তাঁদের নিজ নিজ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ পুরুষ তো ছিলেনই। এঁদের কারো কারো প্রভাব কার্যকরভাবে পরবর্তী এক, দুই এমন কি পাঁচ শতাব্দী পর্যন্ত সঞ্চারিত হয়েছে। এ কথা স্বচ্ছন্দে বলা যায় যে হোমার যেমন খ্রীষ্টপূর্ব দশম বা একাদশ শতাব্দীর মালিক ছিলেন, বুদ্ধদেবও তেমনি খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর মালিক ছিলেন। অর্থাৎ কিনা, এই বিশেষ দু'টি শতাব্দীতে মানুষের ভাবজগতে এঁদেরই প্রভাব সর্বাধিক দেখা গেছে।

আবার এটাও দেখা গেছে যে সৃজনী প্রতিভার অধিকারী ব্যক্তি-বিশেষের দানকে মানুষ সর্বান্তঃকরণে যে যুগের বা যে শতাব্দীর পক্ষে যুগান্তকারী কিছু বলে মনে করতে পারে নি, তখন গোষ্ঠী বা এক-একটা গোটা দেশের ভাবগত অবদানকে সে যুগের মানুষের শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সমসাময়িক মানুষ ব্যাপারটা বুঝতে না পারলেও পরবর্তী কালের মানুষ সম্পূর্ণভাবেই বিচার-বিশ্লেষণ করে বুঝতে পেরেছে কারা কোথায় কি কারণে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী

হয়েছিল। আর আজকের দিনে ত প্রাচীন ইতিহাসের যে কোনও মনযোগী ছাত্রের পক্ষেও সব জিনিসটা পরিষ্কার। গোষ্ঠী বা দেশগত ভাবে যখন মানুষের ভাবজগতের তুঙ্গে পৌছানো গেছে, তখনই আমরা দেখেছি বৈদিক যুগ, গ্রীক যুগ, রোমক যুগ প্রভৃতি কথা চালু হয়েছে।

আজকের মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানে যত শক্তির অধিকারীই হয়ে থাকুক না কেন, আমাদের ফেলে-আসা দিনগুলির ভাবধারণা-ক্রিয়া-কর্ম প্রভৃতির কথা যথার্থভাবে মানুষকে জানবার জন্যে একান্ত প্রয়োজনীয়। দৃঢ়ভাবে দু'পায়ে দাঁড়াবার আগে ব্যক্তি-মানুষের পক্ষে হামাগুড়ি দিয়ে চলাটা যেমন কোনদিন কোনোমতেই এড়ানো সম্ভব হয়নি, ঠিক তেমনি তার চিন্তার ব্যাপারেও অতীতের যে স্পর্শ তার চিন্তায় একবার লেগে যায় তার হাত থেকে কোনোকালেই সে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারে না।

অতীতের প্রতি আমাদের এই যে ঋণটা, এটা আমরা স্বীকার না করলেও অতীতের সেই ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না—যদিও আমাদের পক্ষে একটা বেদনাদায়ক মিথ্যাচারণ হয়ে যায়। ভার্জিনিয়া উলফ একসময় লিখেছিলেন যে আদি গ্রীক নাট্যকার এস্‌কাইলাস তাঁর সব ক'খানা নাটকে মোট যে কথা বলে গেছেন (অর্থাৎ কাহিনী বাদ দিয়ে তার মধ্য থেকে জীবন-সম্পর্কে যে বক্তব্য আমরা পাই) সেই পরিমাণ বক্তব্য এ যুগের অনেক লেখক একটিমাত্র কবিতা কিম্বা ছোট গল্পের মধ্যে প্রকাশ করতে সমর্থ। আমরা কিন্তু এ জাতীয় ধারণার বিরোধী। কোনো চিন্তাকেই তার বিশেষ কাল থেকে বিচ্ছিন্ন করে এনে পরবর্তী কালের কোনো কিছুর সঙ্গে তুলনা করা যায় না।

মানুষ প্রথম যেদিন বিদেশ ভ্রমণ স্বরু করেছিল সেদিন তার চিন্তা জগতের একটি প্রধান দ্বার উন্মুক্ত হয়েছিল বলা চলে। কারণ, সেইদিন থেকেই মানুষেরা পরস্পরের চিন্তা বিনিময় করতে শিখেছিল। ভাবধারণার আদানপ্রদানের ফলে মানুষের চিন্তায় এবং কর্মে যে কী বিরাট পরিবর্তন ত্বরান্বিত হয় তার প্রমাণ আমাদের বর্তমান যুগ। বিজ্ঞানই হক, আর দর্শনই হক বা কাব্য-সাহিত্যই হক—সভ্য পৃথিবীর কোন জায়গায় কোনও শ্রেষ্ঠ বা মৌলিক চিন্তা আজকের দিনে কয়েক ঘণ্টা বা কয়েক দিনের মধ্যেই সমগ্র মানবজাতির অধিকারে চলে যেতে পারে—বেতার এব বোমযানের কৃপায় পত্র-পত্রিকা এবং ছাপানো বইয়ের মাধ্যমে এটা সম্ভব হচ্ছে। হাজার বি দু'হাজার বছর আগে ঠিক এই রকম একটা ব্যপার ঘটতে সময় লাগতো কয়েক শ' বছর।

পায়ে হেঁটে, অশ্ব বা অশ্বেতরকে বাহন করে বা পালতোলা জাহাজে মানুষ সহস্রাধিক বছ ধরেই ভ্রমণ করছে সন্দেহ নেই। কিন্তু তার ফলে ভাবের আদান প্রদান যৎসামান্য যা ঘটতো ত মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো। প্রাচীন গ্রীসের দু'চার জন দার্শনিক ভারতবর্ষে তৎকালীন ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন বলে জানা গেছে—যেমন পিথাগোরাস এ হেরাক্লিটাস। এর ফলে ওঁরা দু'জন হয়ত বা নিজেদের চিন্তার কিছুটা সমৃদ্ধি ঘটাতে সক্ষ হয়েছিলেন ; কিন্তু ভারতের তাতে কিছুই লাভ হয় নি—কারণ, ভারতের তৎকালীন চিন্তানায়কে ওঁদের বা দেশের বাইরের অন্য কারো চিন্তার সঙ্গেই পরিচিত ছিলেন না। তাই এ কথা ব যায় যে স্বচ্ছন্দে যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা আরম্ভ হবার পর থেকে অর্থাৎ স্টীম এঞ্জিন আবিষ্ক

হবার পর থেকে পৃথিবীতে মানব সভ্যতার যথার্থই একটা নতুন যুগের সৃষ্টি হয়েছে।

ভারতবর্ষ বিগত চার পাঁচ হাজার বছর ধরে কখনো স্রেফ ঘুমিয়ে কাটিয়েছে; কখনো বা কয়েকটা শতাব্দী একটানা কর্মচাঞ্চল্যের মধ্যে কাটিয়েছে। কিন্তু ভারতবাসী যখন কাজে ব্যস্ত, তখনও দেখা গেছে কর্মক্ষেত্র তার খুবই সীমাবদ্ধ। দেশের সীমার বাইরে তারা কদাচিৎ পা বাড়িয়েছে। ভলতেয়ার তাঁর philosophy of Historyতে ভারতবাসীর এই ঘরকুনো স্বভাবের এই কারণ দেখিয়েছেন যে ভারতের উর্বরা জমিতে সবসময়েই এতো প্রচুর ফসল ফলতো যে ভারতীয়েরা কখনই পররাজ্য আক্রমণ করতে বাধ্য হয়নি। কাজেই, বিদেশের দু' চারজন অতিমাত্রায় আগ্রহশীল ব্যক্তি ছাড়া ভারতের কাব্য, ধর্ম, দর্শন বা রাষ্ট্রনীতি একমাত্র বৌদ্ধধর্ম ছাড়া ভারতের বাইরে অজ্ঞাতই থেকে গেছে স্বচ্ছন্দে যাতায়াতের যুগ আরম্ভ হবার পূর্ব পর্যন্ত। আর আমাদের এমনই ভাগ্য যে এই যুগ আরম্ভ হবার প্রায় গোড়া থেকেই আমরা আমাদের দেশের রাজনৈতিক অধিকার হারিয়ে বসেছি। কাজেই রেঁনেসার পরে পশ্চিমের চিন্তাজগতে যে নতুন উদ্দীপনা এবং নূতনত্ব দেখা দেয় তাতে ভারতবর্ষের কোনো অবদান সেই—পরাজিত জাতির ভাবধারণাও পরাজয়ের গ্লানিতে ম্লান হয়ে যায়। সুতরাং বর্তমান যুগ বলতে আমরা যা বুঝি তা প্রধানত ইয়োরোপের অবদান—ভাবিক এবং ব্যবহারিক দু'দিক দিয়েই।

রেঁনেসার পর থেকে ইয়োরোপের জাতিগুলি পরস্পরের ভাবধারণা আদান-প্রদান করতে করতে যথার্থভাবে আধুনিক যুগের সৃষ্টি করেছে ফরাসী বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে। এ সময়কার, অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর মানুষের চিন্তাধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ফরাসীদের প্রভাবই সর্বাধিক ছিল। তাই অষ্টাদশ শতাব্দীকে কথায় বলে ফরাসীদের শতাব্দী। ষোড়শ শতাব্দীর ব্যাবলে বা মঁতেইনকে মানুষ পুরোপুরি বুঝে উঠবার আগেই সপ্তদশ শতাব্দীতে দেখা দিয়েছিলেন ডেকার্ট, কর্নেই, মলিয়ের, র‍্যাসিন, লেসেজ প্রভৃতি। আবার এঁদের প্রভাব কাটিয়ে উঠবার আগেই অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী দেশে ভলতেয়ার, রুশো, বোমার্শে, দিদেরো, রোবসপিয়ের, সন্ত সাইমন ও ফোরিয়ার প্রভৃতি আবির্ভূত হলেন। বলা বাহুল্য যে এঁদের মধ্যে যে কোনও একজনের চিন্তাই যেমন-তেমন একটা যুগ সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট। আর এঁরা সবাই কিনা আবির্ভূত হলেন একই যুগে একই শতাব্দীতে। কাজেই যা সৃষ্টি হলো সে হলো একটা দারুণ অস্থিরতা। ধর্ম ও দর্শন, নীতি ও রুচি, নরনারীর পারস্পরিক সম্পর্ক, রাষ্ট্রনীতি—প্রভৃতি সমস্ত কিছু সম্পর্কে চিন্তাধারার চরম অস্থিরতার চূড়ান্ত প্রকাশ আমরা দেখতে পাই ফরাসী বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। কাজ করতে করতে যেমন কাজের দক্ষতা আসে চিন্তার বেলায়ও ঠিক তেমনিই ঘটে থাকে। রুশো যথার্থই বলে গেছেন যে মানুষ সাধারণত চিন্তা করতে চায় না, কারণ নিজে নিজে চিন্তা করাটা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। সচরাচর চিন্তা করতে সে আরম্ভ করে কেবল যখন সে বাধ্য হয়। কিন্তু একবার চিন্তা করতে আরম্ভ করলে তার আর নিস্তার নেই। চিন্তার কাজটা তাকে চালিয়ে যেতে হবেই (Once a thinker, always a thinker).

ফরাসী বিপ্লবের পর থেকে সাইমন, ফেরিয়ার, পুধন বা কোঁতে সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে যে মত প্রচার করতে আরম্ভ করেছিলেন তা' দু'তিন দশকের মধ্যে ভ্রান্ত বলে পরিত্যক্ত হলেও প্রধানত

৫

এঁদের চিন্তাই সাধারণ শিক্ষিত মানুষের মনে একটা মারাত্মক চিন্তার বীজ রোপন করতে সক্ষম হয়েছিল। তা' হলো এই যে বিশেষ কোন রাজবংশ যদি কোন দেশের শাসন কার্যের একমাত্র অধিকারী না হয়, তা হলে বিশেষ একটি অর্থনৈতিক কাঠামোই বা সমাজের একমাত্র পথ হবে কেন ?

উনবিংশ শতাব্দীর সুরুতে দেখা যায় তদানীন্তন পৃথিবীর সভ্যসমাজের সর্বাপেক্ষা উন্নতিশীল মহাদেশ অর্থাৎ ইয়োরোপের চিন্তাধারা তিনটি প্রায় সমান শক্তিশালী তথা প্রয়োজনীয় দিক চিন্তানায়কদের আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। প্রথমত জার্মানীর দর্শন। ফ্রান্সের ডেকার্ট, হল্যাণ্ডের স্পিনোজা, বৃটেনের লক, বার্কলি ও হিউমের পর জার্মানীর লাইবনিজ, কাণ্ট, ফিকটে, হেগেল, শেলিং ও শ্লিয়ারমেকার প্রভৃতির দার্শনিক বিচারও বিশ্লেষণ সমগ্রভাবে বিশ্বরহস্য তথা বিশেষভাবে মানবজীবন সম্পর্কে পর্যালোচনা করবার এক অভূতপূর্ব প্রেরণা দেয় মানুষকে। দ্বিতীয়তঃ বৃটেনের অর্থনীতি ও রাজনীতি এবং তৃতীয়তঃ ফ্রান্সের সাম্যবাদ। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদের ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যায় যে মানুষের চিন্তার এই তিনটি ধারা যেন পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগোচ্ছে। মানুষের সামাজিক ক্রমবিকাশ হয়ত এইভাবেই চলতো যদি না চতুর্থ আর একটি শক্তি এর পথে প্রতিবন্ধকরূপে দেখা দিতো। প্রতিবন্ধক কথাটি আমরা ইচ্ছে করেই ব্যবহার করলাম। কারণ, প্রথমে চতুর্থ এই শক্তিটিকে মানুষ তার সামাজিক উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক বলেই মনে করতো। এ শক্তিটি হলো বিজ্ঞান। ১৮৫৯খৃঃ অব্দে চার্লস ডারুইন-এর Origin of species প্রকাশিত হয় এবং তার বারো বছর পরে প্রকাশিত হয় তাঁর The Descent of Man. স্থূল বস্তু নিয়ে সংগ্রামের ক্ষেত্রে এ্যাটম বা হাইড্রোজেন বোমা যা করছে, ভাবজগতের মালিকানার সংগ্রামে ডারুইনের এই বইখানাও ঠিক তাই করেছিল বিগত শতাব্দীতে। তাই, মানুষের চিন্তাধারার ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে অনেক প্রখ্যাত ঐতিহাসিক যখন উনবিংশ শতাব্দীকে Darwin's Century বলেন তখন সে বিষয়ে দ্বিমত দেখা দেয় না। কারণ, ঐ বই দু'খানা বাস্তবিকপক্ষে মানুষের হাজার হাজার বছর ধরে প্রচলিত অনেক বিশ্বাস ও ধারণার মূলে ঘুণ ধরিয়ে দিয়েছিল। এতকাল মানুষ নিজেকে বিশ্বচরাচরে ভগবানের এক "বিশেষ" উদ্দেশ্যমূলক সৃষ্টি হিসেবে যে বিশিষ্টতার অধিকারী বলে মনে করতো—এবার সে চিন্তায় দেখা দিল শৈথিল্য, বিশ্বাসে দেখা দিল ভাঙন। কাজেই এ হেন ডারুইনকে একটা শতাব্দীর ভাবজগতের মালিকানা দিতে আর বাধা কোথায় ? সত্যি, উনবিংশ শতাব্দীর মালিক ছিলেন ডারুইন।

কিন্তু তারপর ?

তারপর আমাদের এই বিংশ শতাব্দী। বিংশ শতাব্দীর দুই তৃতীয়াংশ সময় প্রায় পূর্ণ হয়ে এলো, কিন্তু এমন ব্যক্তি কে বা কোথায় যিনি ডারুইনের মতো এককভাবে এ শতাব্দীর মালিকানা দাবী করতে পারেন ? কোথায় ভাবজগতের সেই অদ্বিতীয় মৌল স্রষ্টা, আর সকলের চিন্তা, যার কাছে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হবে ?

আজকের বিজ্ঞান যেন ম্যাজিকের মতো মনে হয়। সত্যি কথা বলতে কি, সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, বিজ্ঞানী নয়, এ রকম অসাধারণ মানুষের কল্পনাকেও বিজ্ঞান এ যুগের দ্বিতীয়ার্ধের সুরু থেকেই আকছার হার মানাচ্ছে। জন ডিউই তাঁর Philosophy and Civilization গ্রন্থে

জিনিষটা সম্পর্কে প্রথম বিশদ আলোচনা করেছিলেন যে বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে মানুষের শিল্প-সাহিত্য, দর্শন, নীতিবোধ বা সাধারণ মননশক্তি মোটেই তাল রেখে চলতে পারছে না। আমাদের মনে হয় যে বর্তমান পৃথিবীর সর্বত্র যে একটা সর্বগ্রাসী সঙ্কট দেখা দিয়েছে তার মূল কারণ আমাদের এই অক্ষমতার মধ্যেই নিহিত আছে।

এ অক্ষমতা অস্বীকার করা ভুল এবং অন্যায়। এ অক্ষমতা স্বীকার করে নিয়ে তার উর্ধ্বে উঠবার জন্যে মানুষ যতদিন না সচেষ্ট হবে, ততদিন পৃথিবীর এ সঙ্কট কাটবে না। ততদিন বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান-সমৃদ্ধ সুন্দর পৃথিবীর বুকে ষোড়শ, সপ্তদশ বা অষ্টাদশ শতাব্দীর সর্বৈব অচল সমাজব্যবস্থা ও নীতিবোধ এবং মরচে-পড়া রাজনীতির শকট নিয়ে টানা হেঁচড়া চলবে। ততদিন পদে পদে মানুষের উন্নতির গতিরোধ হবে এবং লক্ষ লক্ষ, বা কে জানে হয়ত কোটী কোটী নিরপরাধ, সুস্থ সবল মানুষকে অকালে মতলববাজ এবং অক্ষম রাজনীতিবিদদের ভুলের মাশুল স্বরূপ প্রাণ হারাতে হবে। দু'শ কি একশ' বছর তো দূরের কথা, বিশ এমন কি দশ বছর আগেকার বিজ্ঞানকেও দশ বছর পরের বিজ্ঞান হার মানাচ্ছে। কিন্তু ভাবজগতে তেমনটি হচ্ছে কৈ! সেদিনের রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ, ইবসেন, হুগো, টলস্টয়, জোলা, ডষ্টয়েভস্কি, মার্কস, ডিকেন্স, শ বা আরো আগের শেলী, কীটস, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, মিলটন, গ্যয়টে বা শেক্সপীয়ার তো দূরের কথা তিন হাজার বছর আগের হোমার বা তারো আগের বাল্মীকিকেই বা কে হারাতে পারছেন? এ যুগের ব্রাডলী তাঁর Appearance And Reality প্রসঙ্গে নিজেই লিখেছিলেন যে একটি কবিতার পরে যেমন আর একটি কবিতা, রচিত হয় এবং রচনার অধিকতর মাধুর্য এবং উৎকর্ষ দেখে পাঠক মুগ্ধ হয়, আমার এ দর্শনও তেমনি একটি রচনা যা আমার বিশ্বাস, অদূর ভবিষ্যতেই উৎকৃষ্টতর কোনও দর্শন রচনার কাছে সানন্দে হার মানবে। হায় রে! অর্ধ-শতাব্দী হতে চললো, তবু ব্রাডলীকে হার মানাবার যোগ্য দর্শনচিন্তাবীর কোথায়?

জীবনটা চলমান। এ চলার কাজটা অস্বীকার করা শুধু উন্নতি বা প্রগতিবিরোধীই নয়, সর্বনাশকরও বটে। এমন কি এটা মানুষের আত্মঘাতেরও কারণ হতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে, এখন পর্যন্ত এ শতাব্দীর যা অবস্থা তাতে এ যুগকে মানব সমাজের আত্মহত্যার সম্ভাবনাপূর্ণ যুগ বললে বোধ হয় খুব ভুল বলা হয় না।

ফিজিক্স, কেমেস্ট্রি, বোটানি, জুলজি, জিওলজি প্রভৃতি বিজ্ঞানের নানা বিভাগে মানুষ যতই উন্নতি করতে সমর্থ হোক না কেন, তাতে সমগ্রভাবে মানুষের বিশেষ কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না, যদি না সামাজিক জীবনে বিজ্ঞান-লব্ধ এই জ্ঞানকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়। আজকের পৃথিবীর যা মূল সমস্যা সে হলো সামাজিক জীবনে বিজ্ঞানের এই প্রয়োগ পদ্ধতির সমস্যা। এই প্রয়োগ-পদ্ধতি সম্বন্ধে অসংখ্য মত ও পথ আছে, সেগুলির পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য খুব বেশি নয়, অন্ততঃ গোড়াতে অর্থাৎ শিল্প-ভিত্তিক সভ্যতার সুরুতে খুব বেশি ছিল না। এ সম্বন্ধে মানুষের প্রথম প্রচণ্ড খটকা লাগে মার্কস-এঙ্গেলস-এর Manifesto of the Communist party প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে (১৮৪৮)। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত মানুষের দুঃখদুর্দশা দেখে দরদী চিন্তাবীরগণ নানা ধরণের বইপত্র রচনা করতে লাগলেন। সে সমস্ত যেন পুধনের

Philosophy of Poverty-র মধ্যে একটা সামগ্রিক রূপ পেলো। কিন্তু মূল সমস্যার সমাধান তাতে হলো না। এ সমস্তের উত্তরে তো বটেই এবং মূল সমস্যার সমাধানের দিকে আরও এক পা এগিয়ে মার্কস রচনা করলেন Poverty of Philosophy; অর্থাৎ কিনা দুঃখদুর্দশার জন্যে দর্শন নয়, দর্শনের দৈন্য মোচন করতে হবে। এই থেকে সুরু করে শেষপর্যন্ত মার্কস এবং এঙ্গেলস গত শতাব্দী' শেষ হবার আগেই দেখা গেল জার্মানীর দর্শন, ইংলণ্ডের অর্থনীতি ও রাজনীতি, ফ্রান্সের সাম্যবাদ এবং তা ছাড়া গোটা মানবজাতির ইতিহাস মন্থন করে মানুষের সামাজিক সমস্যার সমাধান করবার জন্যে যে সিদ্ধান্তে এসে পৌছলেন অন্য সকলের চাইতেই তা ভিন্ন। মানুষের আত্মিক সমস্যা সমাধানের জন্যে ওঁরা কোন ফরমুলা দিলেন না—বললেন যে সামাজিক সমস্যার সমাধান হলে ওটার সমাধান খুবই সহজ হয়ে পড়বে। এ সবের মোট ফল হলো এই যে প্রথমে যা মনে হয়েছিল নিছক একটা খটকা, পরে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক শেষ হবার আগেই দেখা গেলো সন্দেহ এবং অসন্তুষ্টির চোরা পথে দ্রুত এবং অলক্ষিতে এগোতে এগোতে মানুষের অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক এবং সামাজিক—এক কথায় বলতে গেলে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রচলিত ধারনার মূলেই ভাঙন ধরিয়ে দিয়েছে। প্রথমে যে জিনিষটি মনে হয়েছিল একটা পাথর কুঁচি, পরে দেখা গেল তা নয়, ওটা দেখবার ভুল; আসলে ওটা হিমালয়ের-সগোত্র। মানুষের ভাবজগৎ আজকের দিনে সম্পূর্ণভাবেই এই হিমালয়ের দু-পাশে বিচ্ছিন্ন, বিভক্ত।

আমাদের স্থুলজগতের হিমালয়টির আরাম বিরামের একটা নির্দিষ্ট জায়গা আছে, কিন্তু ভাবজগতের হিমালয়ের চরিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ হিমালয় চলমান। ককেশাসই বলুন, আর পুর্ব জার্মানী, উত্তর কোরিয়া' ম্যাকমোহন লাইন বা উত্তর ভিয়েৎনামই বলুন এর কোনটাই ভাবজগতের এ হিমালয়ের স্থায়ী ঠিকানা নয়। এ হিমালয় প্রতি মুহূর্তে চলমান। এ হিমালয় আজ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। দেশে দেশে, সহরে সহরে, গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায়, ঘরে ঘরে, এমন কি ঘরের মধ্যেও আজ এ হিমালয় ছড়িয়ে পড়েছে।

মার্কস যদিও গত শতাব্দী শেষ হবার আগেই মারা যান। কিন্তু তাঁর ধারণাবলী কার্যকর ভাবে ফলপ্রসব করতে সুরু করে এ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে—আমরা রুশ বিপ্লবের কথা বলছি। এহেন মার্কসকে এ শতাব্দীর মালিকানা দেবার প্রস্তাব একেবারে উড়িয়ে দেবার মতো নয় নিশ্চয়ই। যদিও জানি যে এক শ্রেণীর চিন্তাবিদগণ মার্কসকে বিংশ শতাব্দীর মালিকানা দিতে থাকে বলে এক পায়ে খাড়া হবেন—কিন্তু আমরা বলবো: অপেক্ষার প্রয়োজন আছে। রুশ বিপ্লবের পর থেকে অসংখ্য রাজনৈতিক ঘটনাই ঘটে গেছে; তার মধ্যে অন্যতম প্রধান হলো মার্কসবাদীগণ কর্তৃক মহাচীনের রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা অধিকার। চীনের কম্যুনিষ্টগণের হাতে মার্কসবাদের পক্ষে যেভাবে সামরিক বলপ্রয়োগের প্রমাণ পাওয়া গেছে তাতে মনে হয় আজকের দিনের মানুষের চিন্তায় মার্কসের আর সে আসন নেই ঠিক যেমনটি পনরো কি বিশ বছর আগে ছিল। মার্কসবাদ আজ তৈমুর, চেঙ্গিস, আলেকজান্দার বা নেপোলিয়ন কিম্বা হিটলারের মতো একটা রাজ্য-সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয়েছে। এই পথেই মার্কসের শেষ হবে। না কি আবার ভাবগত বিশুদ্ধতা ফিরে পাবেন তা সত্যি নিশ্চয় করে বলা যায় না। তবে এ শতাব্দী কালের

ভাবজগতের অন্যতম শক্তিশালী দাবীদার যে মার্কস সে বিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে না। আগামী ৩৫ বছর তাঁর ভাগ্য নির্ধারণ করবে। এবং এই ৩৫ বছরে ঘটনার যে মহা প্লাবন বইবে পৃথিবীতে তা বোধহয় বিগত ৩৫ শত বছরেও ঘটে নি।

এখন পর্যন্ত এ শতাব্দীতে এমন অনেকেই জন্মেছেন পৃথিবীতে, পৃথিবীর নানা দেশে যাঁরা অন্য যে কোনো বিগত শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করলে একটা গোটা শতাব্দীকালের মালিকানা অনায়াসেই পেতে পারতেন। কিন্তু এ শতাব্দীতে নানা দিকে মানুষের কর্মতৎপরতা, তথা চিন্তা-ধারণা এমন ব্যাপকভাবে বেড়ে গিয়েছে, যে যাঁরা প্রকৃতই বেশ লক্ষণীয় নিজস্ব চিন্তার অধিকারী নন তাঁরা প্রায় ঐতিহাসিকের নজরেই পড়েন না।

বিংশ শতাব্দী হলো এক কথায় সংঘাতের যুগ। কেবল সশস্ত্র সংঘাতই নয়, ভাবিক সংঘাতও বটে। বিগত পাঁচ হাজার বছর ধরে মানুষ যা ভেবেছে তার প্রায় প্রত্যেকটি ধারার বাহক বর্তমান পৃথিবীতে পাওয়া যাবে। কথায় বলে যে মানুষ কোনো কিছুই একেবারে পরিত্যাগ করতে পারে না, কোনো বিশ্বাসই একেবারে মুছে যায় না তার স্মৃতি থেকে। চরম অজ্ঞানতাপূর্ণ কুসংস্কারের জন্যেও এমন চমৎকার যুক্তি সাধারণ শিক্ষিত মানুষও দেখাতে পারে যে যুক্তি-বিজ্ঞানের অধ্যাপক মহাশয়ও বিস্মিত হয়ে পড়েন। একদিকে যেমন মানুষ আজ স্পুটনিক ওড়াচ্ছে, চাঁদে পৌছবার পরিকল্পনাটি নিখুঁত করতে ব্যস্ত, মহাকাশের লক্ষ আলোকবর্ষ দূরের নক্ষত্রের সঙ্গে রাডার সংযোগ স্থাপনে চেষ্টিত; ঠিক তেমনি আবার অন্যদিকে অনেক মানুষই হয়তো কোনো মারাত্মক ব্যাধি সারাবার জন্যে একটি মাদুলী ধারণ করে নিশ্চিন্তে বসে থাকে। এর মধ্যে কিন্তু একটা জিনিষ বেশ প্রচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে, তা'হলো বিজ্ঞানের কাছে সমস্ত কিছুর পরাজয়। কারণ, যিনি মাদুলী ধারণ করেন বা তার পরামর্শ দেন তিনিও সেজন্যে একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেন। এটা বিজ্ঞানের জয় বৈকি। আজ সবকিছুই scientific ভাবে পুনর্গঠনের চেষ্টা চলছে—scientific Religion, scientific Politics, sceince of Phychology, science of Education ইত্যাদি। এক শ' বছর আগেও কিন্তু এ সবগুলি দর্শনের অন্তর্ভূক্ত ছিল। যাই হক, আমাদের এ আলোচনার আপাততঃ একটা পরাসমাপ্তি ঘটানো প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

মার্কসের দাবী আমরা এখন পর্যন্তও স্বীকার করছি না। কিন্তু, তা হলে এ শতাব্দী কালের মালিকানা দেবার মতো আর কোনো চিন্তাবীর এবং ভাবস্রষ্টা আমরা পাচ্ছি কি? এ শতাব্দীতে কখনো না কখনো জীবিত ছিলেন বা গত শতাব্দীতেই দেহত্যাগ করেছেন এ রকম ক'জন আজকের মানুষের চিন্তায় বেঁচে আছেন? প্রথমেই রুশিয়ার কথা ধরা যাক। রুশিয়ার লেলিন, টলস্টয়, গোর্কি, শেখভ এখনও বিলক্ষণ জীবিত আছেন। তারপর উঠতে পারে জর্মন জাতি-গোষ্ঠীর কথা। স্পেঙ্‌লার, মান, হেসে, আইনস্টাইন, ফ্রয়েড, এ্যাডলার, য়ুঙ্গ, ওপেনহাইমার ও কম জীবিত নন। বৃটেনের ইয়েটস্‌, শ, মম, রাসেল, হাক্‌সলী, গলসওয়ার্দী, ওয়েলস, এরস্টার, ব্রাডলী, বোসাঙ্ক এবং এলিয়টের রচনাও সারা পৃথিবীতে শ্রদ্ধার সঙ্গে পঠিত হয়; ফরাসীগোষ্ঠীর বার্গসঁ, রোঁলা ফ্রান্সে, সার্ত্র কামু এবং মেতরলিঙ্কও আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র; ইতালীর পিরান্দেলো এবং ক্রোচে; উত্তর ইয়োরোপের ইবসেন, স্ট্রিণ্ডবার্গ এবং ল্যাক্‌সনেস এবং আমেরিকার পাউণ্ড, সিনক্লেয়ার লুই, আপটন

সিনক্লেয়ার, ও নীল, ফকনার, বাক এবং হেমিংওয়ে—মোটামুটিভাবে পশ্চিমী দুনিয়ার এরাই হলেন এমন সমস্ত ব্যক্তি পূর্ব দুনিয়ায় যাঁদের অল্পবিস্তর প্রভাব আছে। কিন্তু এঁরা কেউই কি আমাদের এই গোটা শতাব্দীকালকে প্রভাবিত করতে পারবেন বলে মনে হয়? এর উত্তর খুব সংক্ষিপ্ত হতে বাধ্য এবং তা হলো যে—না।

সবার শেষে বলবো ভারতবর্ষের কথা। চৈতন্যদেবের পরে কয়েক শ বছর বলতে গেলে ভারতবর্ষ ঘুমিয়ে ছিল। ওঁর পরে আজ পর্যন্ত আর কয়েকজন মাত্র জন্মেছেন ভারতবর্ষে যাঁদের চিন্তায় বিশ্বমানবকে প্রভাবিত করবার মতো জিনিস ছিল। তাঁরা হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী। পরমহংসদেবের কথা এ যুগের পক্ষে একটু বেশী সহজ সরল হয়ে গেছে বলে শিক্ষাভিমানী মানুষেরা কদাচিৎ প্রকাশ্যে তাঁর নামোচ্চারণ করে থাকেন। শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হয় যে উপনিষদের ঋষিগণ বা পশ্চিমের প্লেটোর পরে এমন সুগভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন আর কোনো মানুষের জন্ম হয় নি এ পৃথিবীতে। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সংক্ষেপে বলতে গেলে এই কথাই বলতে হয় যে ভারতে সভ্যতার আলোকের উদয় থেকে তাঁর সময় পর্যন্ত এদেশে ধ্যানধারণায়, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে যা কিছু শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা লাভ করেছে তার সারভাগ একা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু তবু বলতে হয় যে আজকের পৃথিবীতে মানুষের জীবন নেহাৎ বনের পশুর মতো দৈনন্দিন খাদ্য আহরণে বিব্রত, প্রাত্যহিক বাস্তব সমস্যায় আনত—এ অবস্থাকে দমন করবার জন্যে যে সংগঠনের প্রয়োজন শ্রীঅরবিন্দ বা রবীন্দ্রনাথ তা করে যান নি, কাজেই তাঁদের যে প্রভাব তা ব্যক্তিমানুষের মনে মনে—কখনই তা বাইরে প্রকাশিত হচ্ছে না। তবে একথা ঠিক যে মানুষের সামাজিক সমস্যার একটা মোটামুটি সমাধান হবার পরে যখন প্রকৃতই সে আত্মার ক্ষুধা উপলব্ধি করবার মতো মানসিকতা অর্জন করবে, তখন শ্রীঅরবিন্দ এবং রবীন্দ্রনাথের কথা আবার নতুন করে মনে পড়বে। সবার শেষে বলবো গান্ধীজির কথা। গান্ধীজি সত্যি মহাত্মা ছিলেন। নিজস্ব চিন্তা বলতে তাঁর বিশেষ কিছু না থাকলেও অপরের চিন্তাকে নিজের রঙে রঙিয়ে তা প্রয়োগ করবার তাঁর একটা নিজস্ব পদ্ধতি ছিল এবং সে পদ্ধতি তাঁর জীবদ্দশায় জনমানসে যথেষ্ট স্থানও করে নিয়েছিল। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর একান্ত বিশ্বাসভাজন শিষ্যগণের কাছে তাঁর শিক্ষা চরম অনাদর লাভ করে আজ বিস্মৃত প্রায়।

তাহলে?

তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে? এখন পর্যন্ত এ শতাব্দীর মালিকানা দেবার মতো আমরা কাউকেই পাচ্ছি না। হয়তো ভবিষ্যতে পাওয়া গেলেও যেতে পারে। কিন্তু সেটা যতদিন না পাওয়া যাচ্ছে, ততদিন আসুন আমরা বলি যে এ শতাব্দী আমার এবং আপনার, অর্থাৎ আমাদের সকলের—সাধারণ মানুষের—যারা পারলে অপরের মঙ্গল কিছু করে, না পারলে করে না; অন্ততঃ নিজেকে প্রতিষ্ঠার উদগ্র বাসনায় অমঙ্গল কিছু ঘটায় না।

’৭১ এর সৌখীন নাট্যশালা

প্রত্যেক দেশের নাট্যশালা তথা নাটকের অগ্রগতির ব্যাপারে সৌখীন নাট্যশালা তথা নাটুকে দলের অবদানই সর্বাধিক, এ তথ্য সর্বজনবিদিত। আজ যা অগ্রবর্তী বলে বিবেচিত হয় পরের যুগে তাই হয়ে পরে সম্পূর্ণ গতানুগতিক, তখন আবার নতুনরা আসে পুরানোর জায়গা নিতে। পৃথিবীর সব দেশের নাটকের ইতিহাসে তরংগের এই উত্থান পতনের কথাই লেখা হয়ে থাকে। বাংলা দেশও তার ব্যতিক্রম নয়, তবে বাংলার আর একটি বৈশিষ্ট্য পূর্বযুগ থেকে অবিচ্ছিন্ন ধারায় বহমান—এটি তার পশ্চিমী নাট্যানুসরণের ঝোঁক। পেশাদারী রংগমঞ্চের মত সৌখীন রংগমঞ্চেও তার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।

এমন ঝোঁকের একটা প্রধান কারণ, পশ্চিমের ফ্রেমে আঁটা রংগমঞ্চই তো এদেশে পরানুকরণ। স্বভাবতই এদেশের নাটককে তার আওতায় আনা কষ্টকর। প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের পরিবেশ কথায় কথায় রাজাদের পরিক্রমণ মাতলির রথচালনা এসব বোঝানো অত ছোট পরিবেশে প্রায় অসম্ভব। তাছাড়া যে যুগের মঞ্চ এদেশে রূপায়িত হল, তাতে ছোটখাট মানুষ আর তাদের সুখ দুঃখের কথাই কিছুটা বড় হতে শুরু করেছিল এবং তার পক্ষে ছোট পরিবেশই সবচেয়ে ভাল হত।

এদেশে কিন্তু পৌরাণিক আর ঐতিহাসিক পালাগানকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। তাই মাইকেলের প্রখ্যাত প্রহসন দুটির চেয়ে তাঁর ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটকই বেশি আদরণীয় মনে হয়েছিল (হয়ত তার একটা কারণ, চাবুকটা নিজের পিঠে পড়েছে এমন মনে করার লোকেরা অভাব ছিল না)। একমাত্র দীনবন্ধুই গতানুগতিকের মোহকে এড়িয়ে পুরোপুরি সামাজিক নাটক লিখলেন।

এত কথা অলোচনা অনেকের কাছে ’৭১-এর নাটক সম্বন্ধে আলোচনা প্রসংগে ধান ভানতে শিবের গীতের মত মনে হতে পারে কিন্তু এই গোড়ার কথা জানা থাকলে বুঝতে অসুবিধা হয় না কেন বহুরূপীর মত অগ্রবর্তী দল আজ রাজা বা রাজা ওয়েদিপাউসের মত নাটক মঞ্চস্থ করছেন।

তেমনি কলকাতায় দর্শকদের আর একটি প্রবণতার কথাও বলা দরকার। এখানে নাটকের সংগে ফাউ হিসেবে প্রহসন বা পঞ্চরঙের প্রচলন প্রায় গোড়া থেকেই দেখা যায়। পূর্ববর্তী হাফ আখড়াই প্রভৃতিরই অপেক্ষাকৃত সংস্কৃত রূপ যে ছিল এগুলি তা বোধ হয় না বললেও চলে। একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অভিনয় চালানোর প্রয়োজনে এগুলির উদ্ভব কিন্তু নতুন অভিনেতা-অভিনেত্রীর প্রস্তুতির কাজে এগুলির বিশেষ মূল্য ছিল। সর্বোপরি স্বল্পায়াসে জনচিত্তজয়ের সুযোগ আর কোন নাটকের মাধ্যমেই এত সহজে পাওয়া যেত না।

আজকের কয়েকটি প্রতিষ্ঠিত অর্ধসৌখীন নাট্যগোষ্ঠির এই ধরণের প্রাচীন প্রহসনের প্রতি অত্যধিক আনুরক্তি মুখ্যত তাদের জনরঞ্জক গুণের জন্য একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। কিন্তু পূর্ববর্তীদের ক্ষেত্রে যেখানে নাটকের জনশিক্ষামূলক কর্তব্যের আংশিক পরিতৃপ্তি এধরণের নাটকের সাহায্যে সম্ভব এ বোধই পূর্ণ মাত্রায় জাগ্রত ছিল। তাঁরা কালহরণ, নাট্য প্রশিক্ষণ তথা মনোরঞ্জন করার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত নাটক মঞ্চায়নের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতেন। একই আসরে প্রফুল্ল, বলিদান বা মৃণালিনীর সঙ্গে বেল্লিক বাজার, য্যায়সা কি ত্যায়সা বা ব্যাপিকা বিদায় অভিনীত হওয়ায় শেষোক্তরা গুরুভোজে চাটনীর কাজই করত।

এখনকার দিনে সারারাত্রিব্যাপী অভিনয় কদাচ কখনো সম্ভব হলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তা নিতান্তই ব্যতিক্রম সুতরাং চাটনীই আজকের দিনের একমাত্র ভোজ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজকের মানুষের পেট মরে গেছে এতথ্য অস্বীকার্য হলেও অভিজাত সর্বাধুনিক এ প্রকরণের ভোজে কারো কি পেট ভরে।

অভিনয় শিক্ষার দিক থেকে যেটা নিতান্তই প্রাথমিক স্তরের বস্তু সেটা যদি শেষ পর্যন্ত কেবল শিয়াল পণ্ডিতের কুমীর ছাত্রের মত বার বার দেখা যায় তো তাতে দর্শক বা প্রদর্শক কেউই লাভবান হয় না। নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে তাই বাবু, ব্যাপিকা বিদায় বা য্যায়সা কা ত্যায়সার ঐতিহাসিক মূল্য ছাড়া সামান্যই অবশেষ থাকে এ কথা জোর করে বলা চলে।

এর ঠিক বিপরীত মেরুতে দেখা যায় কিছু তথাকথিত প্রগতিশীল নাটক। এসব নাটকে বক্তব্যের ঘনঘটা প্রাবৃটের নীরদমালার মতই দর্শককে বিমূঢ় করে দেয় কিন্তু এর বিসমিল্লায় গলদ অর্থাৎ সুভোজ্য হবার সব কিছু থাকলেও লবণাভাব। প্রকৃত প্রস্তাবে এগুলিকে সংবাদ নাটক বলাই সমীচিন এবং স্বাভাবিক কারণেই তাতে নাটক বস্তুটাই অনুপস্থিত থাকে।

আর এক ধরণের নাটকের প্রাচুর্য বিস্ময়কর হলেও ঐতিহাসিক কারণে তা অস্বাভাবিক বলা চলে না। বাংলা নাট্যশালা জন্মলগ্নেই পশ্চিমী নাট্যশালার সংগে গাঁটছড়া বেঁধেছিল, আজো সে বাঁধন সম্পূর্ণ অটুট আছে। তারই ফলশ্রুতি, ইউরোপে বহু বিচিত্র নাট্যসম্ভারের বঙ্গীকরণ চলেছে বাংলা নাট্যশালায়।

এ আত্মীকরণ প্রচেষ্টার কিছু কিছু অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে এদেশী আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খেয়ে যেতে পারে। সেখানের মূল নাটকের পশ্চাৎপটটি অত্যন্ত সহজেই এদেশীয় পশ্চাৎপটে রূপান্তর করা যায় বলে ধরে নিতে হবে। কোন কোন নাটক আবার মেমসাহেবকে সাড়ী পরাবার মত উৎকট মনে হয়। প্রসংগতঃ আয়োনেস্কো ও বেকেটের নাট্যাবলীর কথা উল্লেখ করা যায়।

দুই মহাযুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপের বিজ্ঞজনের মনের মুকুরে যে হতাশার প্রতিভাস দেখা দিয়েছে, যে বঞ্চনা ও লক্ষ্যহীনতা তাদের অঙ্গের ভূষণ হয়ে পড়েছে তারই রূপায়ণ আয়োনেস্কো তথা বেকেটের নাটকের প্রধান তত্ত্ব। এদেশে আজো আমরা মূল্যবোধহীনতার ঠিক ঐ স্তরে পৌছাইনি, আজো আমাদের সামনে ভবিষ্যতের রক্তিমাভা অপস্থত হয়নি। তবে হতাশার ধূসরতা ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে হয়ত এক পুরুষ পরে আধুনিক ইউরোপীয় সমাজের অবস্থায় পৌছতে পারব কিন্তু যতদিন তা না হয়েচ্ছে ততদিন এ ধরণের নাটক বাংলা ভাষায় উপস্থাপনা সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে পড়ছে।

বাংলায় এ ধরণের যে সব নাটক রচিত ও মঞ্চায়িত হচ্ছে তা দেখে এ কথা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করা চলে না যে, এই সব প্রচেষ্টা নিতান্তই নিজেদের বৈদগ্ধ্য তথা অগ্রবর্তীতার প্রমাণস্বরূপই জন সমক্ষে উপস্থিত করা হচ্ছে। এ কাজে বৃত্তিভোগী সমালোচকরাও কিছুটা ইন্ধন যোগাচ্ছেন। সম্রাট যে বিনা পোশাকেই রাস্তায় নেবে পড়েছেন একথা বলতে গেলে অজ্ঞান বলে পরিগণিত হবার ভয়ে তাঁরা একবাক্যে সম্রাটের পোশাকের ফুলকারী আর নকসার প্রসংসায় পঞ্চমুখ। ফলে, যে অপ্রয়োজনীয় বস্তুর অংকুরেই বিনষ্টি সম্ভবতা ক্রমান্বয়ে বিষবৃক্ষের আকার ধারণ করছে।

আধুনিক বাংলা নাটকেই 'ইতোনষ্ট স্ততোভ্রষ্টঃ' অবস্থার সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়ছে অভিনেতৃবর্গের ওপর। আজকের দিনে অভিনীত চরিত্রের পূর্ণ মহিমা প্রকাশের প্রচেষ্টা বড় একটা দেখা যায় না কারণ নানাবিধ অনুষংগ সাহায্যে দর্শককে মোহিত করার ব্যবস্থা এমনই পাকা করা আছে যে, কোনরকমে সংলাপ উপস্থিত করে দিতে পারাটা যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। চলচ্চিত্রাভিনয়ের ধারানুসরণ সম্ভবতঃ এর অন্যতম কারণ। ক্বচিৎ কদাচিৎ এর ব্যতিক্রম যে দেখা যায় না তা নয়। নান্দীকারের নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র নাটকের অভিনয়ে সুঅভিনয়ের কিছু দৃষ্টান্ত দেখা গেছে।

ঐ নাটকের অভিনয় থেকেই পশ্চিমী নাটকের অনুসরণ যে সর্বদা পরিত্যজ্য নয় তার সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখা গেছে। পিরান্দেলোর নাটকের পশ্চাৎপটকে অতি সহজেই যে বাংলা দেশ তথা বাঙালী সমাজের পটভূমিকায় রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়েছে তাই এ নাটকের মঞ্চায়ন সাধারণ দর্শক তথা রসিকজনকে আনন্দ দিতে পেরেছে। অথচ পশ্চাৎপটকে ঠিকমত আনতে পারার চেষ্টা অসফল হওয়ার দরুণ ঐ একই গোষ্ঠির পরবর্তী নাটক বিশ্ববিশ্রুত নাট্যকার শেখভের ততোধিক প্রখ্যাত নাটক চেরী আর্চার্ডের বংগীকরণ 'মঞ্জরী, আমের মঞ্জরী' অসফল হয়েছে। প্রসংগতঃ এ কথা বলা বোধহয় অন্যায় হবে না যে রুশ নাট্যশালার অন্যতম প্রধান স্তম্ভ শেখভ কদাচ বিদেশে সাফল্য লাভ করতে পেরেছেন। তাঁর লেখায় সমকালীন রুশ চরিত্র এমন নিখুতভাবে ধরা পড়েছে যে, রুশ ছাড়া অন্য দেশীয়ের পক্ষে তাঁর রচনার পূর্ণ রসাস্বাদন অসম্ভব ঘটনা। সম্ভবতঃ তাই বারবার শেখভের ভাষান্তর ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। ব্যতিক্রম বোধহয় ব্রডওয়েতে যশুয়া লোগানের চেরী আর্চার্ড মঞ্চায়ন এবং সেখানেও পশ্চাৎপটের সম্পূর্ণ আত্মীকরণই ঘটনাটি সম্ভব করেছে।

সামগ্রিক পর্যালোচনায় ঐ তত্বই সুস্পষ্ট হয় যে, বাংলা দেশের সৌখীন নাটুকে দলগুলির উৎসাহ-উদ্দীপনার অভাব নেই, অসংখ্য নাটকও লেখা হচ্ছে মঞ্চস্থও হচ্ছে কিন্তু তাদের অধিকাংশই নিতান্ত তাৎক্ষণিক। সাময়িক ঘটনার প্রভাবও নিতান্ত সাময়িক হয়ে থাকে, দিনান্তে নিশান্তে তাদের পথপ্রান্তে ফেলে যেতেই হয়। রসের ভিয়ানে পাক করে কালের কষ্টিপাথরে নিকষিত হেম রূপে ধরা পড়ছে না কোন নাটকই। অনন্তকালের সমুদ্রে বুদ্বুদ যা ফুটে উঠেছে মুহূর্তের শেষে তা আবার কালের অতলে মিলিয়ে যাচ্ছে।

অথচ সবচেয়ে বিস্ময়কর এই যে, আমাদের চারপাশে অবক্ষয়ের যে ছবি ফুটে উঠেছে তার মধ্যে কালাতীতের প্রকাশ কষ্টকল্পনা বা অসম্ভব কিছু নয়। অথচ এমন পরীক্ষাগারের মধ্যে থেকেও সফল পরীক্ষা-নিরীক্ষা কেন সম্ভব হচ্ছে না তা দেবা ন জানন্তি।

হয়ত আমাদের যে দ্বিধা বিভক্ত মানস বুদ্ধিজীবীর মাটির সঙ্গে যোগাযোগ নষ্ট করে তাকে নিরালম্ব বায়ুভূত করে দিয়েছে তাই সৃষ্টির এ বন্ধ্যাত্বের মূল কারণ। কিন্তু জাতির দর্পণ নাটক যদি যথোপযুক্ত প্রতিভাস ফুটিয়ে তুলতে না পারে তো ভবিষ্যতে ঘনায়মান অন্ধকারে বিলুপ্ত হবার সমূহ সম্ভাবনা। অথচ আজকের দিনে নাট্যবিষয়ক আলোচনা মাত্রেই সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র এঁকে চলেছে। আশার সে রঙীন ফানুষ যে বাস্তবের ঘাতসহ তারই দেয়ালের লেখন ক্রমেই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

সংখ্যাধিক্যই যাদের কাছে উচ্চগুণের সমতুল তাদের কাছে এ আলোচনা অরণ্যে রোদন সার এ কথা জানি। তবু বারবার ক্যাসাণ্ড্রার মত দেওয়ালে মাথা ঠুকে যাচ্ছি যদি প্রকৃত রসিক জন এ বিষয়ে অবহিত হয়। বাংলা নাটককে বাঁচাবার একটা সুযোগ আমাদের হাতের কাছে এসে পড়েছে, সে সুযোগকে গ্রহণ করে কোন নব ভগীরথ যদি নাট্য ভাগীরথীকে রস সমুদ্রের দিকে নিয়ে যেতে পারেন তাহলেই প্রচেষ্টা সার্থক বিবেচনা করব।

ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে কিভাবে একাজ করা সম্ভব, এ বিষয়ে আলোচনা এ প্রসংগে অবান্তর। রবীন্দ্র সরণী নাট্যশালা ব্যবহারোপযোগী করার পর কি করা যেতে পারে তা বারান্তরে উপস্থিত করতে চেষ্টা করব। তার আগে রসিকজনের বিচারে বাংলা নাটকের বর্তমান অবস্থা কিভাবে তার উন্নতি সম্ভব, সে সম্বন্ধে মতামত জানতে পারলে, নিজস্ব চিন্তার খুঁত কি বা কোথায় তা জান যেত। আর তাহলে পরবর্তী চিন্তা অধিকতর সংহত করার সুযোগ পাওয়া যেত। কিন্তু রসিক জন আপন মাধবী বিতানের মধ্যে চাঁদ, চকোর আর চামেলীর মোহ কাটিয়ে এ বিষয়ে মনোযোগ দেবেন কি ?

রবি মিত্র

শিশিত স্বরাজ

মণীন্দ্র রায়ের সংকলিত কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। এর ফলে এই প্রতিষ্ঠাবান কবির কবিকর্মের সামগ্র্য পাঠকের চোখে ধরা দেবে। অনুরূপ প্রকল্পে তাঁর অন্যান্য সতীর্থদের কবিতা সংকলন প্রকাশও আমাদের অত্যন্ত প্রত্যাশিত। কিন্তু আলোচ্য কবির ক্ষেত্রে সংকলিত কবিতার প্রকাশন বিশেষ জরুরি ছিলো ব'লে মনে হয়। তাঁর কবিতা প্রসঙ্গে যে সমস্ত অনৃত ধারণা প্রচলিত ছিলো, এই কাব্যসংগ্রহ সেগুলির নিরসন ঘটাতে সাহায্য করবে।

মণীন্দ্র রায়ের কবিপ্রকৃতির অন্য নিরপেক্ষ বিশেষত্ব অথবা গুণাগুণ নিরূপণের আগে তাঁর বিষয়ে প্রচলিত একটি প্রবল ভ্রান্তির উল্লেখ এখানে করতে চাই। তাঁর কবিপ্রতিভা কোনো-কোনো পূর্বসূরীর দ্বারা আক্রান্ত, এরকম রটনা শোনা গেছে; বিশেষত বিষ্ণু দে'র রচিত শিল্পশস্য তাঁর কবিতার সাধনায় সঞ্চিত, এবম্বিধ কিংবদন্তী। এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য অবশ্যই এই নয় যে, বিষ্ণু দে'র প্রভাব (অথবা যে-কোনো শক্তিশালী কবির প্রভাব) পরবর্তী কবির পক্ষে ক্ষতিকর। শুধু এটুকুই এখানে উপপাদ্য, বিষ্ণু দে'র রচনার সঙ্গে তাঁর কবিতার আপাতসামীপ্য অথবা বহিঃস্থ সাদৃশ্য ঐ ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্তের প্রেরণা জুগিয়েছে। একটি উদ্ধৃতিই এখানে পর্যাপ্ত হবে—

আমার কবিতা রেবা   পড়েছ কী তুমি
স্বপ্ন-শোভন মদির নয়নে চেয়ে?
বুঝেছ কী বেদনায়   মোর মনোভূমি
বন্ধ্যাধূসর ভাষায় উঠিছে বেয়ে? (অভিনয় শেষে তাহাকে, পৃ ৬)

উদ্ধৃত সংলাপ উত্তীর্ণতম কবিতার দৃষ্টান্ত, একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু এ যে প্রভাবসিঞ্চিত কবিত্ব নয়, এটা বলতে দ্বিধা নেই। এক লাইন তানপ্রধান এবং পরের পংক্তি মাত্রাবৃত্তে ন্যস্ত, এর সার্থক নজির বিষ্ণু দে'র কবিতায় পেয়েছি। তবে সেখানে যা লোকনৃত্যস্পন্দ এখানে তার পরিবর্তে স্বগত অন্তর্দ্বন্দ্ব। দৃশ্যত নিশ্চয় একই ছন্দোরীতি অনুসৃত হয়েছে, অথবা, বয়োগ্রজ কবির হাতে ব্যবহৃত হয়ে অনুজ কবিকে বিভাবিত করেছে। কিন্তু প্রস্বর (intonation) কি আমূল-আলাদা নয়?

প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য, সুধীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত অথবা গৃহীত শব্দভাণ্ডার থেকে বিষ্ণু দে কিছু শব্দ গ্রহণ করেছিলেন, সেটা দ্বিতীয়োক্ত কবির অক্ষমতা নয়। এই দুই কবির কাব্যভাষা এবং ছন্দের চলন অরুণকুমার সরকারের কবিতায় সম্পূর্ণ ভিন্ন মেজাজ পরিগ্রহ করেছে। মণীন্দ্র রায় একজন সচেতন সুদক্ষ রূপকার হিসেবে অনুভব করেছেন, কবিতার উত্তরাধিকার বা ফলশ্রুতি থেকে কৃত্রিমভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়ার মধ্যে মৌলিকতার বীজাঙ্কুর নেই। তিনি যখন কবিতা রচনা শুরু

করেছেন—অর্থাৎ সেই কবিতাকে প্রকাশ্যতাও দিয়েছেন—সেই মুহূর্তের সামাজিক পরিমণ্ডলটিকে তিনি অবজ্ঞা করেন নি। বরং তার মধ্যেই একটি বলয়িত স্বকীয়তা তিনি মুদ্রিত ক'রে দিতে পেরেছেন।

কবিতার পরিপার্শ্বকে আহত না ক'রে তারি ভিতরে নতুন কবিতার আবহ রচনা তিনি করতে চেয়েছিলেন। এই কারণে তাঁর প্রথম পর্বের কবিতা আত্মপ্রসঙ্গে বড়ো বেশি কুণ্ঠিত। তাই নবচতুর্দশপদী'র অন্তর্গত—

প্রেম-মোর ব্যক্তিস্বত্ব করেছে নীলাম
তোমার বলিষ্ঠ হাতে এ দেহ দিলাম ॥

অথবা—এখন সংসারে দেখি সুরম্য রাত্রিও।
দরিদ্রের ছিন্ন কাঁথা, সেও তো আত্মীয়।
প্রেম যবে 'না' বলেছে দুলায়ে নোলক ॥

প্রভৃতি উচ্চারণে পাশাপাশি প্রেমের মহাযানী ও আত্মলীন মূর্তি ফুটে উঠলেও কবির ঝোঁক শেষ পর্যন্ত প্রেমের বিনিময়ে সুভগ সার্বজনিক শিল্পবিরচন যা ব্যক্তিজীবনকে সীমারেখামুক্ত করে। প্রেমের লিরিক মুহূর্তকে এঁকে তুলেও পরক্ষণে তাই অবসাদ বা কোনো অন্যতর কর্মযোগ তাঁর সেদিনের কবিতার আরাধ্য হয়েছে। সেদিন স্বদেশবেদনা, বন্দনা, অথবা সমাজ চৈতন্য তাঁর ঈপ্সিত আত্মগোপনতার সহায়ক হয়েছে। অথচ কবির অবচেতনা নিঃসন্দেহে নিজস্ব অভিমান নিয়ে নিষ্ক্রান্ত হতে চেয়েছিলো—নাহলে তাঁর কাছ থেকে এরকম অভিব্যক্তি শোনা যেত না—

নিদারুণ আত্মকরুণার | পরিহাস শুধু | চারিদিকে রুদ্ধশ্বাস ধূ ধূ | বালি, তৃণশষ্পহীন
ক্ষুরধার | মধ্যাহ্নের নিঃশব্দ আগুন | জ্বালে যেন চিতা। | নীরস দিনের প্রান্তে
তবু লিখি বিরস কবিতা, | তবু গান গাই। | জীবনের সাড়া তাতে নাই ; | রাশি
রাশি শ্মশানের ছাই, | —গায়ে মাখি বাতাসে উড়াই। (কবিতা, পৃ ২৫)

উৎকলিতাংশ যে-ভাবে পংক্তিখণ্ডনের দ্বারা প্রদর্শিত হলো, কবি নিজে তা করেন নি। তিনি পয়ারধার্য এই রচনাটিকে পয়ারে না গেঁথে গদ্যে ঢেলে সাজিয়েছেন। অনুমান করি, এই কবিতায় কবির আত্মজীবন সম্পর্কে যে-প্রতিবেদন রয়ে গিয়েছিল তাকেই যেন গদ্যের ছদ্মবেশে পুনর্বার তিনি সংবৃত করে তুলেছেন। কিন্তু গদ্যছন্দ তাঁর মানসিকতার আধার নয় ব'লেই গদ্যের ছদ্মবেশও তাঁর কবিতার পক্ষে বেমানান। এবং তিনি নিজেও কবিতার চিরায়ত প্রকরণের কাছে তাঁর স্বভাবনিহিত ঐ দোটানাকে বাঙ্ময় নিভৃতি দেওয়ার জন্যে একটি অব্যবহিত আঙ্গিকপাত্র খুঁজেছিলেন।

তাঁর সেই অভীষ্ট কল্পরূপ সনেট (এবং সনেটসম্মিত কবিতা)। সনেটই সম্ভবত মানব অভিজ্ঞতার কর্পূরমঞ্জরী যা শিল্পীকে ভালোবেসেও অ-সনাক্ত রাখে। শেক্সপীয়রের সনেটতর্জমায় সুদীক্ষিত এই কবি জানেন চতুর্দশপদীতে দরবারি ও প্রায়-পারিবারিক জীবন ওতপ্রোতভাবে মিশে যায়। মণীন্দ্র রায় সনেট প্রণয়নে সহজাত সিদ্ধি অর্জন করেছেন। এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়, শব্দাঢ্য সংহতি তাঁর উদ্দিষ্ট নয়। "সনেট আইডিয়া দিয়ে লিখো না, শব্দ দিয়ে লিখো,"—দেগা-র প্রতি নিক্ষিপ্ত মালার্মের এই সস্নেহ ভৎর্সনার নিহিত অভিপ্রায় ইদানীং অপব্যাখ্যাত হয়েছে। আইডিয়া-বিবিক্ত সনেট নির্মাণের কথা মালার্মে বলেন নি। অবিবেকী

স্বতঃস্ফূর্তি যেখানে কেন্দ্রহীন ধ্বন্যূর্মি নিয়ে উচ্ছ্বসিত হয় সেই তরলিত রোমান্টিকতা মালার্মের কাছে পরিহার্য বলে বিবেচিত হয়েছিল। আমাদের আলোচ্য কবির রোমান্টিকতা সামঞ্জস্যে বিধৃত। তাই এঁর সনেট দ্রুতি ও দীপ্তির সমন্বয়ের প্রতি একাগ্র এবং সেই সমন্বয় আইডিয়ানির্ভর বা ভাবনাভিত্তিক। সনেটের সময়-সম্মানিত রূপকল্পটি গ্রহণ করলেও প্রথানুগতরূপে বিভাজিত আরোহ-অবরোহের দ্বৈতত্ব—তাঁর আগেও আরো কোনো-কোনো কবিতে এটি দেখা যায়—তিনি কখনো-কখনো নিপুণ চলস্রোতে লঙ্ঘন ক'রে গিয়েছেন। এই ধরণের শতশ্চল উদ্দীপনার রসোন্নীত উদাহরণ 'খোয়াই' (পৃ ৬৭-৬৮) যেখানে সপ্তম পংক্তিতে অষ্টকের স্থাপনা, অথবা 'আমরা ক'জনে' (পৃ ৮৪-৮৫) যেখানে নবম পংক্তিতে একটি নব তরঙ্গকে বিভক্ত করে গতিযুক্ত ক'রে তোলা হয়েছে। তাঁর অনেকগুলি সনেটে স্মৃতিসঞ্চারী এমন কিছু নিরুক্তি ছড়িয়ে আছে যা যে-কোনো কবির পক্ষেই শ্লাঘার সামগ্রী। তাছাড়া সনেটের শুরুতেই বাক্যাংশের নাটকীয় সমাবেশে বাক্‌প্রপন্নতা সৃষ্টি করার ঈর্ষণীয় ক্ষমতা যে তাঁর প্রচুর, তার দৃষ্টান্ত 'সবই তো নিয়েছ!' (ভাষার শহীদ, পৃ ৮২) | 'বর্ষা কি কবির স্বপ্ন! (বর্ষার স্বপ্ন, পৃ ৮৩) | 'পাপের বে'তন মৃত্যু' (পুণ্যের বেতন, পৃ ১৪২) প্রভৃতি আবৃত্তিযোগ্য উচ্চারণ।

অথচ, আইডিয়া বিসর্জনে তিনি পরাঙ্মুখ। এমন হওয়া স্বাভাবিক যে আইডিয়ার মাধ্যাকর্ষণ তাঁকে বস্তুতা ও কল্পনার সেই বিষুবসৌষম্যে ধরে রেখেছে যা কবিকে উৎকেন্দ্রিক হতে দেয় না। কিন্তু আইডিয়ার সক্রিয়তা আত্মজীবনের আচ্ছাদন হিসেবে যে তাঁর কাছে বাঞ্ছিত বলে গণ্য হয়েছে, সে তাঁর সনেটের স্থাপত্যগুণে প্রমাণিত। অতঃপর সনেটে জীবনায়নের অভিজ্ঞতা থেকে প্রতি প্রতীক বা চিত্রকল্প স্বরচিত কবিতায় কীভাবে বাহিত হয়ে গেছে সেটি পর পর দুটি উদাহরণ থেকে গোচর :

তবু জানিব না সব, তবু রহে সন্দেহ আমার,	সেই যন্ত্রণাই শুদ্ধ, বুকে যার ডাকিনী-চিৎকার
যতক্ষণ ডাকিনী সে মঙ্গলে করে না বহিষ্কার ॥	কারণ স্বার্থহীন, দোলায় না সন্দেহের টানে।
(শেক্সপীয়রীয় সনেট ১৪৪, পৃ ১·৫)	(স্বতোৎসারে, নিজে, পৃ ১৩৫)

যেহেতু আধুনিক কবির কৃত ভাষান্তর তাঁর স্বকীয় ভাণ্ডারের অন্তর্ভুক্ত, সেক্সপীয়রীয় সনেটের অন্তিম দ্বিপদীর বক্তব্য বক্ষ্যমাণ কবির কবিতার প্রারম্ভিক দ্বিপদীর দ্যোতনায় কীভাবে সঞ্চারিত হয়েছে তা অবধানযোগ্য। অমঙ্গল-মঙ্গলের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ অথবা যন্ত্রণা-শুভ্রতার অন্যোন্য সম্পর্ক প্রতিপাদনে ডাকিনী-প্রতীকটি কার্যকরী হয়েছে। সনেট সৃজনে কিংবা ভাষান্তরে মণীন্দ্র রায় এভাবেই একটি বক্তব্য ও মর্মার্থকে গভীরভাবে আয়ত্ত করেছেন এবং ক্রমশ তাকে বিচিত্র গড়নের কবিতায় উন্মোচিত করতে পেরেছেন।

তাঁর মাত্রাবৃত্তে স্তবকিত কবিতাগুলিতেও ঐ বক্তব্যকে নির্দিষ্ট প্রস্থানবিন্দু থেকে ক্রমান্বয় উন্মুক্ত করার প্রচেষ্টা স্বার্থক :

দেখ তপস্বিনী মেলেছে চোখ	তুমি বৃন্ত যেন, পাপড়ি আমি
হেমকান্তি ঐ মেঘসমাজে!	দীপ্ত শিখা তুমি, আমি আঁধার।
আজ সূর্যোদয় মধুর হোক,	দুটি পক্ষ একই আকাশগামী,
জাগে স্বপ্ন যেন দিনের কাজে।	দুটি পংক্তি মিলে একই পয়ার! (ভোরের স্বপ্ন, পৃ ৬৫)

আকাশপ্রয়াণেও এই প্রতিবেশবোধের সংযম কবিতাকে বিম্বিত না করে যে সৌন্দর্য অর্পণ করেছে তা মণীন্দ্র রায়ের নিজস্ব। এই অভিযোজন তাঁর কবিতাকে কড়ি ও কোমলে মেশা স্বচিহ্নিত বৈশিষ্ট্য দিয়েছে।

কিন্তু যেখানে বিষয় বৈচিত্র্যের প্রয়োজনে তিনি ভাবনাকে প্রধানত বস্তুধর্মিতায় প্রত্যর্পিত করেছেন্ সেক্ষেত্রে তিনি যে ব্যর্থ হয়েছেন তার উদাহরণ 'মুখের মেলা' পর্যায়ের-কোনো কবিতা। বিশেষ ক'রে 'পাইলট অজিত নাগ' কবিতাটি লঘুগুরুর অসম মিশ্রণে এবং অতিকথনের শৈথিল্যে নষ্ট হয়েছে। প্রাকরণিকতায় সুসজ্জিত এই কবি যে এক-এক সময়ে সত্বর উপলব্ধি বর্ণনার উৎসাহে কিরকম দুর্বল অন্ত্যমিল ব্যবহার করতে পারেন তার কয়েকটি উদাহরণ 'যাত্রায়-জ্যোৎস্নায়' (লেখন, পৃ ৪১)। 'ইটখোলার-সাপতোলার' (সাপুড়ে, পৃ ৬২)। 'আঙিনায়-কান্নায়' (বাবলার গান, পৃ ৭৬)। শেষোক্ত কবিতার মতো লিরিকে তিনি কী ক'রে এরকম শ্লথ মিল প্রয়োগ করলেন তা অনুমানের অতীত। অথচ বাৎসল্যের গীতিময়তায় অভিরাম 'বাপ্পার জন্যে' (পৃ ১১০) কবিতায় এই অন্যমনস্কতাদোষ নেই। 'অর্ধনারীশ্বর' (পৃ ১৪৪) কবিতাটি মাটী হয়ে গেছে 'মূল রাগিনীর পাইনি যে সন্ধান' এই বাক্যে 'যে' শব্দের প্রতি অতিরিক্ত আতিথেয়তায়। এই অসতর্কতা পরবর্তী কবির কাছে বিপজ্জনক হতে পারে, এখানে সেই ইঙ্গিত রাখলাম।

সাম্প্রতিক কবিতায় মণীন্দ্র রায় অনতি ব্যক্ত স্বপ্নস্বরূপকে মেলে ধরেছেন। 'অতিদূর আলোরেখা'-পর্যায়ের কবিতাগুলিতে এই মৌনমুখর মানসবৃত্তির নিরুদ্ধ বেদনা অনবদ্য নতুনত্ব পেয়েছে। বিশেষত উল্লিখিত গ্রন্থের নাম-কবিতায় এই কান্নার ঐশ্বর্য অপর্যাপ্ত,—

চারিদিকে ঋজু শাল, হাওয়া নেই, শূন্যতার বুকে
গম্ভীর মাদল বাজে ঘন অন্ধকারে।
মনে হল একা আমি, উৎসবের দিন
অতিদূর আলোরেখা, কোনো ঘরে আর স্মৃতি নেই,
তুমিও ভুলেছ একেবারে! (অতিদূর আলোরেখা, পৃ ১২৭)

কিন্তু বেদনাকে নৈরাজ্যে পৌঁছতে না দিয়ে তিনি শিল্পিত স্বরাজের সন্ধান করেছেন। তাই এই বিষণ্ন বিজন পরক্ষণে পুরুষসূক্তের বীজমন্ত্রে তাঁর কবিব্যক্তিত্বের অভিজাত তন্ত্রীতে মন্দ্রিত হয়েছে—

স্বপ্ন করো, মগ্ন করো, কর প্রাণ আভার বসতি;
কেন্দ্রে টানো, কামনায়, কামাগ্নির ধাতুর ঘর্ষণে।
অশ্রু ঘাম রিরংসার দাহে তুমি এস স্নিগ্ধ জ্যোতি,
এবার ভ্রূমধ্যে এস মমতার তৃতীয় নয়নে॥ (এবার ভ্রূমধ্যে এস, পৃ ১৪৫-৪৬)

যে-কবি পঞ্চম দশকের অবক্ষয় অতিক্রম ক'রে বাংলা কবিতার ক্রমবিবর্তনে অনবসিত একটি ভূমিকা নিয়েছেন, এখানে তাঁরি কণ্ঠস্বর আলোড়িত হয়েছে।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

'শিল্পিত স্বরাজ' সংকলিত কবিতা। মণীন্দ্র রায়। এম. সি. সরকার এ্যাণ্ড সন্স্ প্রাইভেট লিমিটেড। ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য চার টাকা।

বিদেশীয় ভারত-বিদ্যা পথিক—শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত। কনটেমপোরারী পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা—৯। দাম বারোটাকা।

প্রাচীন ভারতকে নতুন করে জানবার পর থেকেই আমাদের জাতীয় ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। আমাদের অতীত যে কত গৌরবময় ছিল তা উপলব্ধি করার ফলে নিজেদের ভবিষ্যৎ মহত্তর করে গড়ে তোলবার প্রেরণা পেলাম। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে আমরা নানাভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছি, সত্য। কিন্তু একমাত্র তাকেই অবলম্বন করে আত্মপ্রতিষ্ঠার সংকল্প নিয়ে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। নবাবিষ্কৃত প্রাচীন ঐতিহ্যের বিবরণ এনে দিল সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাস; তার সঙ্গে যুক্ত হল পাশ্চাত্যের আত্মনিয়ন্ত্রণের নতুন আদর্শ। এই দুইয়ের মিলনই ভারতে নবজাগরণের পথ উন্মুক্ত করেছে।

প্রকৃতপক্ষে নবজাগরণের এই দুটি প্রেরণাধারাই এসেছে পশ্চিম থেকে। নিজেদের প্রাচীন গৌরবের ইতিহাস আমরা জেনেছি পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের গবেষণালব্ধ ফল থেকে এবং বিদেশী ভাষার মাধ্যমে। বিদেশী পণ্ডিতরা যা দেখেছেন, যতটুকু দেখেছেন, আমরা তা এবং ততটুকুই দেখেছি। তাঁদের দৃষ্টি প্রথম পর্যায়ে প্রধানতঃ দর্শন ও ললিতকলার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। ভারত যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার ক্ষেত্রেও পিছিয়ে ছিল না সে কথাটা তাঁরা তুলে ধরেন নি। তথাপি এই আংশিক দেখাও যে স্ফুলিঙ্গের কাজ করেছে তা অস্বীকার করা চলে না।

ভাষা বিদেশী বলেই প্রাচীন ভারতের গৌরব বৃহত্তর জনসাধারণের হৃদয় স্পর্শ করতে পারেনি। এর জন্য বিদেশী পণ্ডিতরা দায়ী নন। তাঁরা মুখ্যতঃ নিজেদের ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেছেন স্বদেশবাসীদের জন্য। কিন্তু ভারতীয় গবেষকরাও আজ পর্যন্ত প্রধানতঃ ইংরেজী ভাষায় লিখেছেন। মাতৃভাষায় উপযুক্ত বইয়ের অভাবে ভারতের অতীত ঐতিহ্য সম্বন্ধে জনসাধারণ যথেষ্টরূপে সচেতন নয়; একটা ধোঁয়াটে ধারণায় তাদের মন আচ্ছন্ন। অথচ অতীতের জন্য গৌরববোধ জাতীয় ঐক্যসাধনে বিশেষরূপে সহায়ক হতে পারত। বর্তমান নানা স্বার্থের দ্বন্দ্বে আমাদের কেবলই বিচ্ছিন্ন করবার প্রয়াসী। কিন্তু অতীতের জন্যে গৌরববোধের একটি কেন্দ্রবিন্দুতে সমগ্র জাতির মন মিলিত হওয়া সহজ ও স্বাভাবিক। এর সুযোগ আমরা গ্রহণ করতে পারিনি।

একেবারে পারিনি একথা ঠিক নয়। ইংরেজী শিক্ষিত মুষ্টিমেয় ভারতীয় পেরেছিলেন। যাঁরা ভারতবিদ্ পাশ্চাত্য মনীষাদের গ্রন্থ পাঠ করতে সক্ষম হলেন তাঁরাই উপলব্ধি করলেন আমাদের জাতীয় জীবনের উৎস ও পটভূমি এক—কয়েক শতাব্দী যাবৎ আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য যতই কেন না পরিস্ফুট হয়ে উঠুক। এবং এই উপলব্ধি আমাদের জাতীয় আন্দোলনকে এগিয়ে দিয়েছে।

যারা আমাদের এতবড় উপকার করেছেন তাঁরা স্বার্থবুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে ভারতের প্রাচীন

সভ্যতা ও সাংস্কৃতির চর্চা করেননি। জার্মান, ডাচ, রাশিয়ান পণ্ডিতরা তো নয়ই, ইংরেজ ও ফরাসী মনীষীরাও নয়; রাজ্য শাসনের জন্য সংস্কৃত, হিন্দু দর্শন, ধর্ম, শিল্প ইত্যাদির চর্চা অপরিহার্য ছিল না। ইংরেজ প্রশাসকরা গেজেটিয়ংর এবং অন্যান্য গ্রন্থ সংকলনে যে নিষ্ঠা ও আগ্রহের পরিচয় দিয়েছেন স্বাধীনতার পরে ভারতীয় প্রশাসকরা তা এখনো অতিক্রম করতে পারেন নি।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশুদ্ধ জ্ঞানের জন্যই ভারতবিদ্যার চর্চা হয়েছে। কোথাও কোথাও হয়ত ভুল ব্যাখ্যা আছে। কিন্তু সেটা তথ্যের অপ্রাচুর্যের জন্য যতটা হয়েছে, ততটা উদ্দেশ্যমূলক নয়। বিদেশী ভারতবিদ্যাবিদ্ পণ্ডিতদের ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ অনেকেই কঠোর সমালোচনা করেছেন। কিন্তু তাঁদের দানের জন্য উপযুক্ত শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উপযুক্ত নজির আছে বলে জানি না।

শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত তাঁর বিদেশীয় ভারত-বিদ্যা পথিক গ্রন্থে সমগ্র জাতির পক্ষ থেকে এই কাজটি করেছেন। লেখক পঁচিশজন খ্যাতনামা ভারতবিদ্যাবিদের জ্ঞানচর্চার কথা বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করেছেন। এ ছাড়া ১৩৭ জন পণ্ডিতেব সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দিয়েছেন। এই গ্রন্থের সর্বত্র লেখকের শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রমের চিহ্ন বর্তমান। এ ধরনের বইয়ের ক্রেতার সংখ্যা একান্ত সীমাবদ্ধ; উপযুক্ত পারিশ্রমিক লাভের আশাও নেই। বিদেশী মনীষীদের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধার আকর্ষণেই গৌরাঙ্গগোপালবাবু এই কঠিন কাজটি স্বেচ্ছায় সুসম্পন্ন করে আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়েছেন। সমগ্র বইটি তথ্যভিত্তিক, সুতরাং দু-এক ক্ষেত্রে তথ্যের বিচ্যুতি ঘটা সম্ভব। বিস্তৃত বিবরণের জন্য কোন কোন মনীষীদের নির্বাচন করা উচিত ছিল সে সম্বন্ধে মতান্তর দেখা দিতে পারে। কিন্তু যে প্রয়োজনীয় কাজটি সম্পন্ন হয়েছে তার তুলনায় এ সব প্রশ্ন বড় নয়। লেখকের মধ্যে যে কোথাও যত্নের ত্রুটি নেই সেটাই সবচেয়ে বড় কথা।

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকাটি বইয়ের মূল্য বৃদ্ধি করেছে। রেফারেন্সের উদ্দেশ্যে এই বই ব্যবহৃত হবে আশা করি। কারণ গৌরাঙ্গগোপালবাবু শুধু পণ্ডিতব্যক্তিদের কর্মসাধনার পরিচয় দেন নি; তাদের রচিত গ্রন্থের তালিকা দিয়াছেন। গ্রন্থাগারিকের পক্ষে এই তালিকা সর্বদাই কাজে লাগবে।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

Passage to America : The Recedtion of Rabindranath Tagore in the United States 1912-1914 by Sujit Mukherjee. Publisher : J. N. Basu & Co. 80/5 Grey Street, Cacutta-5. Price 2. '00

প্রাচীন কালের এবং মধ্যযুগের ভারতীয় মনীষিগণের জীবন ও কর্মের বিস্তারিত পরিচয় আমরা পাই না। জীবনবৃত্তান্ত রচনার বিমুখতাই এর একমাত্র কারণ নয়, ঐতিহাসিক এবং কাল্পনিক

উপাদানের ভেদ করার অক্ষমতা, বা অনিচ্ছা আরো বড় কারণ। তাই বড় বড় ধর্মগুরু, কবি দার্শনিক প্রায় সকলেরই জীবনচরিত আমাদের বহু কৌতুহল এবং জিজ্ঞাসাকে বেদনাদায়ক ভাবেই অতৃপ্ত রেখে যায়। প্রকৃত ঘটনার সঙ্গে অনুরাগীর রচিত উপন্যাস এসে মিশেছে, ভক্ত সৃষ্ট অলৌকিক কাহিনী এসে মূল বৃত্তান্তকে আবৃত করেছে। কখনও বা জীবনচরিতকারদের আকস্মিক নীরবতা জীবনের কোন একটি অধ্যায়কে রহস্যময় করে তুলেছে। যারা মানুষের মনে বাঁচেন, ধর্মগুরু, কবি বা গায়ক, তাঁদের বাইরের জীবনের অনেক কিছুই হয়ত ভক্ত বা রসিকের কাছে অবান্তর। তাঁরা একটি ভাবমূর্তি রচনা করেন। কিন্তু তাতে একটি ভয়ের দিক থাকে ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ভিন্ন ভাবনার রঙে সেই মানুষটির মর্ত্য পরিচয় বিলুপ্ত না হোক, বিকৃত হতে পারে। আধুনিক মানুষ অবশ্য মধ্য যুগের মানুষের চেয়ে বেশি সংশয়ী, মধ্যযুগের মানুষের মত সরলবিশ্বাসে বা ভক্তিতে সে সব মেনে নিতে চায় না। কিন্তু মহৎকে সাধারণের থেকে আলাদা করে রাখার জন্যে মানুষের উপন্যাস তৈরীর প্রবণতা সহজাত বলা চলে। তাই মহৎকে নিয়ে কিংবদন্তী গড়ে ওঠে, তারপরে তাদের সত্য মিথ্যা প্রমাণ করাই কঠিন হয়ে পড়ে। আমাদের দেশের রামমোহন বা বিদ্যাসাগর সম্পর্কে এই রকম লোকরঞ্জনী জনশ্রুতি সৃষ্টি হয়েছে; যৌবনে রামমোহনের তিব্বত যাত্রা কিংবা বর্ষার রাত্রে বিদ্যাসাগরের দামোদর সাঁতরে পার হওয়ার কাহিনী সম্বন্ধে লোকের মনে সন্দেহ নেই। তার কারণ আমরা যত্ন করে এঁদের জীবনের তথ্যগুলি সংগ্রহ করে রাখিনি। আবার শুধু যত্ন নয়, দৃষ্টিভঙ্গিরও একটা বড় দিক আছে। ভক্ত শিষ্যেরা সাধু-সন্তদের জীবনী লিখেছেন, তাঁরা সত্য গোপন করেছেন বলাটা অন্যায়, তাঁদের সত্যের ধারণা আমাদের থেকে পৃথক। চৈতন্যদেবের জীবনী তার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই লেখা হয়েছে, উপাদেয় জীবনী গ্রন্থই আমরা পেয়েছি, তাঁর সম্বন্ধে আমাদের যা জ্ঞান তা ঐ গ্রন্থগুলি থেকেই, তবুও আধুনিক মানুষের জিজ্ঞাসা এবং কৌতুহল তার থেকে নিবৃত্ত হয় না। প্রাচীন ও মধ্যযুগের মনীষীদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা অতৃপ্ত থাকে কারণ উপাদান বড় কম। আধুনিক মনীষী সম্বন্ধে সে ভয় নেই, কিন্তু অন্য ভয় আছে তা হল উপাদান প্রাচুর্যের। সংবাদপত্র, সরকারী কাগজ, ব্যক্তিগত চিঠি, ব্যক্তিগত সম্বন্ধে অন্যের মন্তব্য —ইত্যাদি বিপুল উপাদান স্তূপের সম্মুখীন হতে হয়। বিশেষত আধুনিক ইতিহাস গবেষণার যে নবতম পদ্ধতি—প্রাইভেট পেপারস বা ব্যক্তিগত কাগজপত্রের সন্ধান তাও মানুষের বহু চিন্তা ও কর্মকে বুঝতে সাহায্য করে। চৈতন্যদেবের সময় যদি মুদ্রাযন্ত্র থাকত, তাহলে কী বিপুল তথ্য সম্ভার আমরা পেতাম। চৈতন্যদেবের বিরুদ্ধে লেখার সংখ্যাও হয়ত কম হত না। আধুনিক মনীষীর জীবনী রচনার এইটি বড় সুবিধা, এইটি বড় বাধা। এই বিপুল উপাদান থেকে ব্যক্তির মূর্তিটি গড়ে তোলা সহজ নয়। বিভিন্ন মত, বিরোধীমত, অজানিত তথ্য, ব্যক্তিগত চরিত্রের জ্ঞাত দিকটির সঙ্গে আপাতবিরোধী কার্যকলাপের বিবরণ ঐতিহাসিক সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। উনবিংশ—বিংশশতাব্দীর ভারতীয় মনীষীদের জীবনচরিত রচনার সমস্যা এইখানে। বাংলাদেশে, রামমোহন, কেশবচন্দ্র সেন, বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ--বিশেষ করে এই মনীষীচতুষ্টয়ের সম্পর্কে তথ্য প্রচুর। বাংলা ভাষায় শুধু নয়, বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায়, সংবাদপত্রে এঁদের সম্পর্কে নানা কথা রচিত আছে। আর বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তথ্য আরো ব্যাপক: ইউরোপ, আমেরিকার বিভিন্ন

সাময়িক পত্র এবং সংবাদপত্রে অসংখ্য রচনা বেরিয়েছে। এই সেদিন বেনীপ্রসাদ শর্মার বিবেকানন্দ জীবনীতে আমরা ক্ষেত্রীর রাজসভার দিনলিপি থেকে বহু তথ্য জানতে পারলাম, বিবেকানন্দের জীবনের একটি অধ্যায়ের ওপরে নতুন আলো পড়ল, তাতে বিবেকানন্দ এবং ক্ষেত্রীর রাজার চরিত্রটি আরো দীপ্ত হয়ে উঠেছে। অজস্র উৎস আমাদের সামনে। সেখান থেকে তথ্য আহরণ করতে-পারলে আমাদের মনীষীজীবনচর্চা যেমন সার্থক হবে, তেমনই ভারতীয় সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনার মালমসলাও সংগ্রহ করা হবে। এ কাজ বলাই বাহুল্য একজনের নয়, বহুজনের। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বাংলায় প্রকৃত তথ্যবহুল সুলিখিত, সুচিন্তিত বই অঙ্গুলিমেয়। রবীন্দ্রচর্চা ক্ষোভের সঙ্গেই স্বীকার করি, আমাদের কাছে অনেকটা সহজ সাধনার পথ। অথচ রবীন্দ্র মনীষা এবং প্রতিভাকে চিনে নিতে গেলে দুর্গম পথে যাবার লোকও দরকার। সেই দুর্গম পথ হল, গ্রন্থপঞ্জী রচনা, সাময়িক পত্র থেকে তথ্য সংকলন, পৃথিবীর নানা দেশে রবীন্দ্রনাথের প্রতি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, পাঠান্তরের আলোচনা, গ্রন্থের পাঠ প্রস্তুত করা, ইত্যাদি ইত্যাদি। রসবোধের-সঙ্গে পরিশ্রম এবং চিন্তাশীলতাকে যোগ করে রবীন্দ্রচর্চার ভিত্তি তৈরী করা। সেই দুর্গম পথে একজন যাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে দেখে আনন্দ হল।

চৈতন্য, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ অথবা সুভাষচন্দ্র—যিনি হোন না কেন, এঁদের জীবনী শুধু ব্যক্তিজীবনী নয়, একটি জাতির একটি বিশেষ কালের একটি বিশিষ্ট সাধনার ইতিহাসও বটে। রবীন্দ্রনাথের ইউরোপের স্বীকৃতি সেই দিক থেকে আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের স্বীকৃতি। ইউরোপে ইতিপূর্বে ভারতীয় সাহিত্যের পরিচয় পৌছেছিল। পশ্চিমী ভারততত্ত্ববিদেরা সংস্কৃত সাহিত্যের কথা ইউরোপকে জানিয়েছিল। আধুনিক ভাষা সাহিত্য তখনও তার কৌতূহলের বিষয় হয়ে ওঠেনি। এমনকি প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কেও ইউরোপের জিজ্ঞাসা ছিল, হয় ভাষাতাত্ত্বিক, নয় ঐতিহাসিক। সাহিত্যিক নয়। গ্যেটে শকুন্তলা পড়ে দুই ছত্র কবিতা লিখেছিলেন, কিন্তু তা শকুন্তলার সমালোচনা নয়, এক ইউরোপীয় কবির ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া। আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য উনবিংশ শতাব্দীতে স্বদেশেই কিছুটা অবহেলিত ছিল, আর ইউরোপীয়রা মূলত ভাষাতাত্ত্বিক কৌতূহল দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের স্বীকৃতি তাই আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের স্বীকৃতি। ইউরোপ কীভাবে আমাদের একজন কবিকে গ্রহণ করেছে, বিচার করেছে—সেই ইতিহাস অতি মূল্যবান। এই ইতিহাসের একটি অধ্যায় রচনা করেছেন শ্রীযুক্ত সুজিত মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে পশ্চিমের চিন্তার পুরো বিবরণ এখানে পাওয়া যাবে না, পশ্চিমের একটা বড় ভূখণ্ডের রবীন্দ্রচিন্তা এবং রবীন্দ্রভাব-প্রতিক্রিয়ার ইতিহাস রচনা করে সুজিতবাবু সেই বৃহত্তর কাজের পথ প্রস্তুত করে দিয়েছেন। ইতিপূর্বে Alex Aronson তাঁর Rabindranath through Western Eyes (১৯৪৩) গ্রন্থে সেই কাজের ভূমিকা করেছেন। তার বিষয় ছিল বৃহৎ, উপাদান সংগ্রহে একদর্শিতা ছিল। সুজিতবাবুর বই থেকেই জানতে পেরেছি Harold Morim Hurwitz ইলিনিয়স বিশ্ববিদ্যালয়ে থিসিস প্রস্তুত করেছেন Robindranath and England (১৯৫৯)। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হলে, আশা করি আমাদের জ্ঞান আরও বাড়বে।

এই গ্রন্থে আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথের পরিচিতির কাহিনী স্তরে স্তরে বর্ণনা করা হয়েছে। সেই পরিচিতির ইতিহাস বড় কৌতুহলকর। মানুষের কাছে আমেরিকার তিনটি ব্যক্তি প্রথম রবীন্দ্রনাথকে পরিচিত করেছেন। একজন এজরা পাউণ্ড। তিনি লণ্ডনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হন। তাঁর উদ্যোগে আমেরিকার Poetry কাগজে গীতাঞ্জলির ছটি কবিতা প্রকাশিত হয়। এই সঙ্গে ছিল এজরা পাউণ্ডের একটি প্রবন্ধ। তিনি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথের কবিতার ইংরেজী অনুবাদ ইংরেজী কবিতা এবং বিশ্বসাহিত্যের কবিতার ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট ঘটনা। পাউণ্ড পরে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আরো দুটি মূল্যবান প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর আলোচনার একটি দিক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথই একমাত্র বড় কবি যিনি নিজে তাঁর কবিতার ভাষান্তর করেছেন। কবিতা ইতিহাসে এমন ঘটনা আর ঘটেছে বলে জানি না। পাউণ্ড এই জিনিসটার ওপর জোর দিয়েছেন যে রবীন্দ্রনাথের কবিতার রহস্য তাঁর ভাষার মধ্যে। তাই তিনি বাংলা ছন্দ, ধ্বনি, বাংলা ভাষাপ্রকৃতি সম্বন্ধে চিন্তা করেছিলেন। "an ideal language for poets" বলে উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন, ইয়েট্‌স্‌। ইয়েট্‌স্‌-রবীন্দ্রনাথ মৈত্রী কবিতার ইতিহাসে আর একটি স্মরণীয় ঘটনা। ইয়েট্‌স্‌-এর গীতাঞ্জলির ভূমিকা আমেরিকার পাঠককে সাহায্য করেছিল রবীন্দ্রনাথকে চিনতে। আর তৃতীয় ব্যক্তি হলেন, মার্কিন প্রবাসী বাঙালী সাংবাদিক বসন্তকুমার রায়। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে তিনি মার্কিনী বহু পত্রিকায় লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথের পরিচয়ও তিনি তুলে ধরতে সাহায্য করেছিলেন তাঁর জীবনী লিখে, তার লেখা অনুবাদ করে।

প্রথমবার যখন (১৯১২-১৩) রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা যান, তখন তিনি অপরিচিত। তাঁর নাম দুরুচ্চার্য ভারতীয় শব্দমাত্র। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদ যখন পৌঁছল তখনও আমেরিকা তাঁর সম্বন্ধে অজ্ঞ। নিউইয়র্ক টাইমস্‌-এ তাঁর নাম ছাপা হয়েছে "ববীন্দ্রনাথ"। "হিন্দু কবির" নোবেল পুরস্কার পাওয়ায় কেউ কেউ বিস্মিত হয়েছে, "কৃষ্ণাঙ্গ" ব্যক্তির পুরস্কার প্রাপ্তিতে অনেকে বিরক্তি বোধ করেছেন। তখনও পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ, কৃষ্ণাঙ্গ, হিন্দুকবি মাত্র। অপরিচিত। ক্রমে তিনিই অতি পরিচিত হয়ে উঠলেন। ধীরে ধীরে তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থের সমালোচনা, তাঁর মতামত সম্পর্কে মতামত, ব্যক্তিত্ব এবং প্রতিভা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা দেখা দিতে লাগল। বিদেশে রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যে অবিমিশ্র প্রশংসা জোটেনি মধ্যে মধ্যে খাদহীন নিন্দাও প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। গীতাঞ্জলি নিয়ে নানা বিরোধী মত, রবীন্দ্রনাথের কবিতা এবং ভারতীয় ধর্মসাধনা সম্পর্কে Paul Elmer More এর নিন্দাত্মক সমালোচনা, সেই লেখার উত্তরে এবং রবীন্দ্রনাথের স্বপক্ষে লালা লাজপৎ রায়ের প্রবন্ধ, গদর পার্টি এবং রবীন্দ্রনাথকে হত্যা করার চেষ্টা সম্পর্কে সংবাদপত্রের নানা বিচিত্র মন্তব্য, দ্বিতীয়বার আমেরিকায় বিপুল সম্বর্দ্ধনা, তৃতীয়বার আমেরিকার উদাসীনতা, চতুর্থবার আকস্মিক ভ্রমণ সংক্ষিপ্ত করণ এবং শেষবার আবার অভ্যর্থনা— এই বিরাট কাহিনীকে স্পষ্ট করে তুলেছেন সুজিত মুখোপাধ্যায়।

ব্যক্তিগতভাবে বহু মানুষের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উঁচু ধারণাই ছিল, আমেরিকার কোন কোন কবি মনীষীর চিন্তার সঙ্গে তাঁর পরিচয় গভীরই ছিল; কিন্তু আমেরিকার সভ্যতার প্রতি তাঁর দৃঢ় শ্রদ্ধা যে ছিল না তা বোঝা যায়। এর সব কারণটা আমেরিকার ঐতিহ্যের অর্বাচীনতা নয়, একটা

ব্যক্তিগত বেদনাও এর পেছনে আছে। এই সময়ে লেখা বিভিন্ন চিঠিপত্রে তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার ধনমত্ততার কথা বলেছেন এবং শান্তিনিকেতনের নির্জনতায় ফিরে যেতে চেয়েছেন তার পেছনে আমেরিকার সঙ্গে তাঁর তৎকালীন সম্পর্ক অনেকটাই দায়ী ছিল। রবীন্দ্রনাথ হয়ত আমেরিকাকে, তথা পশ্চিমকে সঠিক বুঝতে পারেন নি, আবার এটাও ঠিক রবীন্দ্রনাথকে ইউরোপও স্পষ্ট করে বুঝতে পারেনি। এর জন্য সম্ভবত দু-পক্ষেরই কম বেশি দায়িত্ব ছিল। ডি, এইচ, লরেন্স রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী করেছিলেন যে তাঁর আদর্শ গ্রহণ করার অর্থই হল পশ্চিমী সভ্যতার ধ্বংস। সমগ্র ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রতিযোগীরূপে তিনি একজন বাঙালী গীতিকবিকে ভেবেছিলেন—এটা অগৌরবের বিষয় নয়; কিন্তু এটা ঠিক কথা বলেন নি। শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে ইউরোপীয় কবি সমালোচকেরা রবীন্দ্রনাথের চিন্তাকে গ্রহণ করতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে গীতাঞ্জলির মধ্যে অনেক সমকালীন ইউরোপীয় কবিতার শূন্যতার মধ্যে এক নূতন বাণী আবিষ্কার করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় তাঁরা নিজেদের কথা শুনেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতা, রবীন্দ্রনাথেরই কবিতা। সেই কবিতায় ইউরোপীয় কবি তাঁর পথের ইঙ্গিত নাও পেতে পারেন। এই সত্যটা বুঝতে কারো কারো কষ্ট হয়েছিল। তার ফলে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে উদাসীনতা। এজরা পাউণ্ড যখন একটি চিঠিতে লিখেছিলেন যে পশ্চিমী সভ্যতার যন্ত্রণায় যে মানুষ নিষ্পেষিত তার কাছে রবীন্দ্রনাথের কোন বাণী নেই। একথার অবশ্য কোন ব্যাখ্যা করেন নি। আসলে রবীন্দ্রনাথ ইয়েটস্ অথবা পাউণ্ড উভয়ের কবিসত্তার বিকাশের কাছে প্রয়োজন ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত, স্বাভাবিকভাবে সংযতভাবেই তাঁদের পথ আলাদা হয়ে গেল। একদা তাঁদের দু-জনের কবিতার সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের কাব্য ভাবনার যোগসূত্র রচিত হয়েছিল। যেমনটী হয়েছিল স্প্যানীশ কবি হিমানেথের সঙ্গে। কোনটীকেই প্রভাব বলব না। হিমানেথের কাব্যে হয়ত রবীন্দ্রনাথ প্রেরণা দিতে পারেন। ইয়েটস্-এর ক্ষেত্রে তা সাহিত্যিক মৈত্রী। শেষ পর্যন্ত ইয়েটস্ যে লিখেছিলেন, আমি এখনও আপনার কবিতার ভক্ত এবং নিষ্ঠাবান পাঠক, তা অসত্য নয়। ১৯৩৬এ অক্সফোর্ড বুক অফ মডার্ণভার্স-এ রবীন্দ্রনাথের ছটি কবিতার অন্তর্ভুক্তি তার উজ্জ্বল প্রমাণ।

সাধারণ পাঠকের কাছে, এবং পাউণ্ড-ইয়েটস্-এর কাছেও রবীন্দ্রনাথের অনুরাগ এবং বিরাগ দু-ই তাঁর ইংরেজি অনুবাদগুলিকে আশ্রয় করে। রবীন্দ্ররচনার অনুবাদগুলির আলোচনা করেছেন সুজিতবাবু। সেই সঙ্গে সমকালীন আমেরিকান পত্রপত্রিকার সমালোচনা তুলে দিয়েছেন। এই গ্রন্থের প্রথমভাগ রবীন্দ্রনাথের পাঁচবার আমেরিকা ভ্রমণের কাহিনী, আর দ্বিতীয়ভাগ তাঁর রচনার প্রতিক্রিয়ার কাহিনী। এই বোধহয় প্রথম গ্রন্থ যেখানে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি লেখার একটী ধারাবদ্ধ আলোচনা হল বাংলার সঙ্গে তুলনা করে। এই আলোচনাই রবীন্দ্রনাথের পশ্চিমে জনপ্রিয়তার উত্থান পতনের কারণ নির্দেশ করবে। যে বিপুল তথ্যসম্ভার লেখক নাড়াচাড়া করেছেন তা বিস্ময়কর। হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত 'রোথেনস্টাইন পেপার্স', শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে হেনরী মুনরো আধুনিক কবিতা পাঠাগারে রক্ষিত রবীন্দ্র সম্পর্কিত কাগজ পত্র এবং দেশ-বিদেশের অসংখ্য কাগজপত্র। গ্রন্থপঞ্জী অংশটি এই গ্রন্থের মূল্য বাড়িয়েছে। এতে আছে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন

পুস্তকের আমেরিকার পত্রপত্রিকার বিভিন্ন পাঠাগারে প্রাপ্তব্য রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কিত কাগজপত্র, রবীন্দ্রনাথের ইংরেজিতে অনুদিত গ্রন্থের সম্পূর্ণ তালিকা, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত ইংরেজি গ্রন্থ এবং প্রবন্ধের নির্বাচিত তালিকা এবং রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থপঞ্জীর বিবরণ।

গ্রন্থটীর মৌলিকতা এবং উপভোগ্যতা সম্পর্কে সাধুবাদ করার পরে একটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই। দোষ সন্ধান করা সমালোচনার প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে অবশেষে এই কথা বলছি তা নয়। আসলে এটী গ্রন্থকারের কাছে প্রস্তাব মাত্র। গ্রন্থটি পাঠ করে একটি জিনিস সম্বন্ধে আমার কৌতুহল বারে বারেই জাগ্রত হয়েছে—তাহল লেখক যখন আমেরিকার বিভিন্ন মতামত, ঘটনার উল্লেখ করেছেন তখন রবীন্দ্রনাথের মানসিকতার কথা অনেক জায়গায় বলেছেন, যদি আরো একটু বিস্তৃতভাবে বলতেন, কাহিনীর আলোটুকু নায়কের মুখের ওপর আরো স্পষ্ট করে ফেলতেন আমাদের কৌতুহল মিটত। যেমন গদর পার্টির ঘটনা, চতুর্থবারে রবীন্দ্রনাথের বিপদ ইত্যাদি। লেখক তার চেষ্টা করেন নি, তা বলিনা। যদি তাঁর সমকালীন লেখার সঙ্গে তাঁর এই সময়ের মানসিতকতার যোগসূত্রটি লেখক আরো স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিতেন তাহলে রবীন্দ্রকাব্যের নেপথ্যভূমি সম্বন্ধে আরো কিছু জানা সম্ভব হত।

এই গ্রন্থ থেকে আর একটি বিষয় উদ্ভূত হচ্ছে। তা হল সমকালীন ইউরোপীয় কবিতায় রবীন্দ্রনাথের impact. ইয়েটস-পাউণ্ড, হিমানেথ, আরও কয়েকজন সুরকার, যাঁদের কথা এই বইতে উল্লেখিত হয়েছে, তাঁদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যভাবনার ভাব বিনিময় রবীন্দ্ররসিকদের আলোচনার বিষয়। এই গ্রন্থে সেই আলোচনার স্থান নেই। কিন্তু লেখক একটি মূল্যবান বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে গেলেন।

তথ্যসংকলনের পরিশ্রম, তথ্যনির্বাচনের নৈপুণ্য সমালোচনার নিরপেক্ষদৃষ্টি এবং রচনারীতির মনোরম্যতা—প্রধানত এই চারটি কারণে এই বইখানি রবীন্দ্র অনুরাগীদের সংগ্রহ করে রাখার মত। সেই সঙ্গে বলা দরকার যে, শুধু-যে রবীন্দ্র চর্চায় এই বইখানি বহুদিন অপরিহার্য হয়ে থাকবে তাই নয়, ভারতীয় মনীষীদের সম্বন্ধে অনুরূপ গ্রন্থ যাঁরাই রচনা করবেন তাঁদের কাছে অন্যতম সহায়রূপে বিবেচিত হবে। এইরকম একটি গ্রন্থ প্রকাশ করে নবীন প্রকাশক শ্রীদীপঙ্কর বসু পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন সন্দেহ নেই।

শিশিরকুমার দাশ

নিয়মাবলী

প্র ব ন্ধে র মা সি ক প ত্রি কা

'সমকালীন' প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয় (ইংরেজী মাসের ১লা তারিখে)। বৈশাখ থেকে বর্ষারম্ভ। প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা, সডাক বার্ষিক ছয় টাকা। পত্রের উত্তরের জন্য উপযুক্ত ডাক টিকিট বা রিপ্লাই-কার্ড পাঠাবেন।

'সমকালীনে' প্রকাশার্থ প্রেরিত রচনাদি নকল রেখে পাঠাবেন। রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার। ঠিকানা লেখা ও ডাকটিকিট দেওয়া লেফাফা থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়। দর্শন, শিল্প, সাহিত্য ও সমাজ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধই বাঞ্ছনীয়। **গল্প ও কবিতা পাঠাবেন না**—'সমকালীন' প্রবন্ধের পত্রিকা।

'সমকালীনে'র গ্রন্থপরিচয় প্রসঙ্গে, রসিক সমালোচকদের দ্বারা **শিল্প, দর্শন, সমাজ-বিজ্ঞান** ও **সাহিত্য সংক্রান্ত গ্রন্থ** ও **কাব্য গ্রন্থের** বিস্তারিত নিরপেক্ষ আলোচনা করা হয়। দুখানি করে পুস্তক প্রেরিতব্য।

সমকালীন ॥ ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

এই ঠিকানায় যাবতীয় চিঠিপত্র প্রেরিতব্য ॥ ফোন : ২৩-৫১৫৫

Regd. No. C-315 Phone: 23-5155 October'65 (0.50) Central Regd. No. R.N.2602/57 SAMAKALIN

সমকালীন

ত্রয়োদশ বর্ষ ॥ কার্তিক ১৩৭২

ডঃ হরিহর মিশ্র		ডঃ প্রফুল্লকুমার সরকার	
কান্তা ও কাব্য	৫˙০০	**গুরুদেবের শান্তিনিকেতন**	৩˙০০
ডঃ অসিতকুমার হালদার		মোহিতলাল মজুদার	
রূপদর্শিকা	১০˙০০	**শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র**	১০˙০০
শঙ্করীপ্রসাদ বসু		ডঃ রণেন্দ্রনাথ দেব	
চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি	১২˙৫০	**কবি স্বরূপের সংজ্ঞা**	৪˙০০
ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার		ডঃ রবীন্দ্রনাথ মাইতি	
রবীন্দ্রসাহিত্যে পদাবলীর স্থান	৬˙০০	**চৈতন্য পরিকর**	১৬˙০০
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়		ডঃ শান্তিকুমার দাশগুপ্ত	
শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী	৫˙০০	**রবীন্দ্রনাথের রূপক নাট্য**	১০˙০০
শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন		সোমেন্দ্রনাথ বসু	
বিদ্যাসাগর জীবনচরিত ও ভ্রমনিরাশ	৬˙৫	**সূর্যসনাথ রবীন্দ্রনাথ**	৪˙০০
দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়		**রবীন্দ্র অভিধান ১ম, ২য়, ৩য়**	
বিষ্ণুপুর ঘরাণা	৫˙০০	প্রতি খণ্ড	৬˙০০
ডঃ ক্ষুদিরাম দাস		ডঃ শিশিরকুমার দাশ	
রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিচয়	১০˙০০	**মধুসূদনের কবিমানস**	২˙০০
		ধীরানন্দ ঠাকুর	
রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা	১২˙০০	**রাবীন্দ্রিকী**	৪˙৫০

বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড ॥ ১, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬

ঝক ঝকে দাঁত
আর সুন্দর হাসি
সাধনা
দশন
আয়ুর্বেদীয় মতে তৈরী আদর্শ দাঁতের মাজন
SADHANA
DASAN
SADHANA AUSADHALAYA
সাধনা দশন নিয়মিত ব্যবহার করিলে কোন দন্তরোগের ভয় থাকে না। দন্তরাজী সুস্থ, সবল ও সুন্দর হয়।

আনন্দে
উৎসবে...
প্রাত্যহিক প্রয়োজনে..
ও মনোরঞ্জনে...
পরিনামরমনীয়
কেশতৈল
কেশরঞ্জন
কবিরাজ এন. এন. সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড।

নিয়মাবলী

সমকালীন

প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

'সমকালীন' প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয় (ইংরেজী মাসের ১লা তারিখে)। বৈশাখ থেকে বর্ষারম্ভ। প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা, সডাক বার্ষিক ছয় টাকা। পত্রের উত্তরের জন্য উপযুক্ত ডাক টিকিট বা রিপ্লাই-কার্ড পাঠাবেন।

'সমকালীনে' প্রকাশার্থ প্রেরিত রচনাদি নকল রেখে পাঠাবেন। রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার। ঠিকানা লেখা ও ডাকটিকিট দেওয়া লেফাফা থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়। দর্শন, শিল্প, সাহিত্য ও সমাজ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধই বাঞ্ছনীয়। **গল্প ও কবিতা পাঠাবেন না**—'সমকালীন' প্রবন্ধের পত্রিকা।

'সমকালীনে'র গ্রন্থপরিচয় প্রসঙ্গে, রসিক সমালোচকদের দ্বারা **শিল্প, দর্শন, সমাজ-বিজ্ঞান** ও **সাহিত্য সংক্রান্ত গ্রন্থ** ও **কাব্য গ্রন্থের** বিস্তারিত নিরপেক্ষ আলোচনা করা হয়। দুখানি করে পুস্তক প্রেরিতব্য।

সমকালীন ॥ ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

এই ঠিকানায় যাবতীয় চিঠিপত্র প্রেরিতব্য ॥ ফোন : ২৩-৫১৫৫

ত্রয়োদশ বর্ষ ৭ম সংখ্যা

কার্তিক তেরশ' বাহাত্তর

সমকালীন ঃ প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

সম্পাদক ঃ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

কার্তিক
তের'শ বাহাত্তর

সমকালীন

ত্রয়োদশ বর্ষ
৭ম সংখ্যা

আধুনিক শিক্ষা ও অধ্যাত্মবোধ

বাসন্তী চক্রবর্তী

শিক্ষা মানেই আজকের দিনে আমরা ডিগ্রিলাভ বুঝি। ছোটবেলা থেকে পাঠশালা, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করে আমরা কর্মজীবনে নামি—সংসার ক্ষেত্রে পদার্পণ করি। উদ্দেশ্য সমাজের বুকে নিজেকে দৃঢ়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করবো—করবো নিজেকে ধনে-মানে ঐশ্বর্যে সম্পদে দশজনের মধ্যে একজন বলে প্রতিপন্ন—তা সে ছলে বলে কলে কৌশলে যেভাবেই হোক না কেন। নেম-ফেম-গাড়ি-বাড়ি-এসব না হলে এ জীবনের যে অনেকখানিই বাদ রয়ে গেল। শুধু তাই না—ধনে-মানে-বিদ্যায়-বুদ্ধিতে-সমাজের যদি একটি বিশেষ স্তরে কেউ উন্নীত হয়েছেন তাহলে আর নীচের দিকে তাকাবার অবকাশ তাঁর মেলে না—যদি বা তাকান তাহলে সে দৃষ্টি এমন কৃপার, এমন ব্যঙ্গ মিশ্রিত যে একটা সৌখীন উন্নাসিকতা যে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে একথা বুঝতে আর বাকি থাকে না।

এই যে তথাকথিত শিক্ষা বা ডিগ্রিলাভ তা আমাদের আর যাই দিক না কেন মানবিকতার স্বাভাবিক বোধটুকু যে কেড়ে নিয়ে স্বার্থবুদ্ধি এবং নীচতার চরম পঙ্কিলতার মধ্যে যে নামিয়ে আনে সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকে না। নিজের অহঙ্কারে, অহংবোধে আমি শুধু এ জগতে একমাত্র আমাকেই দেখতে পাই এবং মনে করি এ বিশ্বের যা-কিছু সুখ সম্ভোগ সবকিছুই যেন আমারই জন্য। শুধু তাই না, অতিরিক্ত লোভ এবং কামনার বশবর্তী হয়ে একথা ভাবতে এতটুকুও দ্বিধা হয় না যে বিধাতার এই সমস্ত ভোগের উপকরণের উপর একমাত্র আমারই দাবী আছে। তাই মানুষকে তখন আর মানুষ বলে মনে হয় না। ন্যায়-অন্যায়-ধর্মাধর্ম-সত্যাসত্য বোধ থাকে না। যাকে-তাকে অপমান করা, দম্ভ প্রকাশ করা,—এ হোল যেন সহজাত

ধর্ম। অর্থাৎ মানুষ হবার নামে অমানুষ হয়েই উঠি বেশি। (অবশ্য এরও ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে।)

কিন্তু কেন এই পরিণতি? এর প্রকৃত কারণ কি? শিক্ষার মধ্যে কি কোন ত্রুটি আছে? আমাদের স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় কি কেবল মানুষ গড়ার কারখানা? সকলকে এক ছাঁচে ফেলে এক মাপে নিরেট করে ঢালাই করার ব্যবস্থার কাজেই কি সমস্ত দেশের শিক্ষা বিভাগ নিযুক্ত? সেখানে কি ন্যায়-নীতি বোধ—সত্যাসত্য বোধ—ত্যাগ-তিতিক্ষার কথা—আদর্শের—দেশপ্রেমের কথা শেখানো হয় না? স্কুল-কলেজ জীবনে আমরা কি বিদ্যাসাগরের ন্যায়-নীতিবোধের কথা, আত্মত্যাগের কথা—চিত্তরঞ্জনের সর্বস্ব ত্যাগের কথা, বিবেকানন্দের আত্মসংযম ও বলিষ্ঠ ত্যাগধর্মের কথা, নেতাজীর জ্বলন্ত দেশপ্রেমের কথা, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেম এবং আদর্শ শিক্ষা গ্রহণের কথা পড়ি না? কোন মহৎ ত্যাগ, কোন মহান আদর্শ, কোন নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ আমাদের জীবনের ওপর, চরিত্রের ওপর কোন ছাপ কি আজ আর ফেলে না? কোন প্রেরণা কি জোগায় না? তাঁদের আদর্শময় সাধনপূত চরিত্র থেকে আমাদের কি কিছুই গ্রহণ করতে বলা হয় না? কোন আদর্শ, কোন মহত্ত্ব, কোন পবিত্রতাই কি আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারে না? তবে? তাহলে? হাজার হাজার ছেলেমেয়ের মধ্যে দিয়ে আজ আর একটিও বিদ্যাসাগর-বিবেকানন্দ-দেশবন্ধু-নেতাজী বেরিয়ে আসে না কেন? আজ কি একটিও দেশবরেণ্য মহামান্য চরিত্র আর দেখা দিতে পারে না? না, পারে না, পারছে না। কারণ আমাদের শিক্ষা বিভাগের নির্দেশিত পাঠ্যসূচীর কোন দোষ নয়—শিক্ষাদাতার কোন দোষ আছে কি না সে-কথা পরে বিচার্য। আসলে আমাদের শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রেই রয়েছে মস্ত বড় ত্রুটি। আমরা আদর্শ, ন্যায়-নীতি, সত্যবোধ, আত্মত্যাগ, চরিত্র-সংযম, ধর্মবোধের কথা কেবল কাব্যে বা সাহিত্যে পাঠ্য-বিষয় হিসেবে পড়ি এবং নম্বর পাওয়া ও পরীক্ষা-পাশের সঙ্গে সঙ্গেই তার বাস্তব প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। ধর্মপুস্তকের এক পৃষ্ঠাও পড়ি না বা ধর্ম কথা শুনি না, কারণ ধর্মাচরণ আজ আর আধুনিকতার লক্ষণ নয়। কেউ যদি ধর্মকে স্বীয় জীবনে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করেন—তাহলে তিনি সকলেরই হাস্যাস্পদ হয়ে উঠবেন, পিছিয়ে যাবেন বিশ শতক থেকে দুশো কি আড়াইশো বছর পিছনে অর্থাৎ এ যুগের মাটিতে পা রেখে, বাতাস থেকে নিঃশ্বাস নিয়েও তিনি ভিন্ন যুগের লোক—একঘরে! এত বড় ঝুঁকি আর কে নিতে চায় বলুন? তাই কেউ বা গর্ব করেই বলেন, 'পুজো-আচ্চা, ধর্মকর্ম ওসব সংস্কার কেবল জীবন যারা ভোগ করতে পারে না তাদের জন্য; আর কেউ বা নিজের জীবনে কিঞ্চিৎ পালন করলেও সভ্য-শিক্ষিত সমাজের কাছে প্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করেন, রাখেন তাকে অতি গোপনে আপন অন্তরে লুকিয়ে। যেন কিছু চুরি করেছেন—করেছেন কিছু মারাত্মক ধরনের অন্যায়। বর্তমান সমাজের অধিকাংশ ঘরেই এই একই ভাব একই ধারণা এবং একে কেন্দ্র করে একটা আত্মসর্বস্ব ভোগবিড়ম্বিত বিষাক্ত আবহাওয়া! আমাদের শিক্ষায় দীক্ষায় চলনে-বলনে পোষাকে-আসাকে সর্বত্রই কেবল পরানুকরণের দাসত্ব করে করে মরছি আর জাতীয় জীবনের যে পবিত্র স্বচ্ছ সুন্দর ত্যাগ-তিতিক্ষায় সমাকীর্ণ সুস্থ গার্হস্থ্য জীবনের সুনিবিড় মাধুর্য লক্ষ্মীর কল্যাণী-দানে যা আত্মত্যাগে মহীয়ান তার স্বর্গীয় রূপলাবণ্যে যা মর্ত্য-জীবনের

অপরিসীম প্রীতি-মাধুর্যে শুচিস্নিগ্ধ চিরশ্যামল সেই ছায়া-সুশীতল ত্যাগ ঝলমল মর্ত্যজীবনের প্রীতি সুন্দর মাধুরীটুকু আজ আমরা হারিয়ে ফেলেছি। এ যে জাতীয় জীবনের কত বড় ক্ষতি উপলব্ধি করার মত সুস্থ স্বাভাবিক চেতনাও আজ আর আমাদের নেই। তাই দেখি আমাদের সমাজ জীবনে, পারিবারিক জীবনে কোন সুষ্ঠু স্পষ্ট ধর্মবোধ জীবন গঠনের সঙ্গে সঙ্গে গড়ে ওঠে না। ছোটবেলা থেকে ছেলেমেয়েদের চরিত্র গঠনে কোন স্বাভাবিক আত্মসংযম, ন্যায়-নীতি বোধের সঙ্গে আধ্যাত্মিক জীবন বোধের কোন স্পন্দন, কোন অনুরণনে আমাদের চারিত্রিক শান্তিকে বলকে নিষ্ঠাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। ধর্ম কথাটা যে কেবল বিশেষ আচার অনুষ্ঠান পূজা-পদ্ধতি সংস্কার বা নিয়ম-কানুন নয় তার যে এই সংকীর্ণ অর্থ থেকে সে অনেক বড় সে যে আমাদের সবকিছুকেই ধারণ করে অর্থাৎ 'জীবন-সত্য'—যার উপর ভিত্তি করেই আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত চরিত্র গড়ে ওঠে—যার সত্যবোধে, ন্যায়বোধে আমি আমার হয়েও আরও দশজনের আত্মকেন্দ্রিক হয়েও বিশ্ববিমুখ নয় এ বোধ আমাদের জাগ্রত হয় না। সে শিক্ষা আমাদের জীবনে নেই। ছোটবেলা থেকে পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে, ছাত্র-জীবনে আমরা যে আদর্শের কথা, ন্যায়-নীতির কথা, বা সত্যধর্মের কথা শুনি বা পড়ি বা জানি তা কেবল আদর্শলোকেরই কথা, শুধু বইতে লেখা, গুরুমশায়য়ের কাছে শোনা কোন ভাব বা নীতি-কথা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাকে যেন শুধু পরীক্ষা পাশের জন্য যতটুকু দরকার তার বেশি গ্রহণ করা যায় না। নিজের জীবন দিয়ে একে গ্রহণ করার জন্য একথা শেখা হয়নি, শোনা হয়নি। আসলে এই ধর্মবোধ-সত্যবোধকে জীবনে রূপায়িত করতে গেলে নিজের যে অনেকখানি ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, অনেক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়, অনেক ভোগ-বিলাস, আরাম-আমোদ ত্যাগ করতে হয় এতে আর কজন রাজি হতে পারেন বলুন?

তাই দেখি আজ শত শত ছেলে 'রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠিত' স্কুল-কলেজে পড়তে চায় (অবশ্য ধনীর সন্তানদেরই সাধারণতঃ সে সৌভাগ্য হয় কারণ এখানকার যা খরচা তা সাধারণ মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত লোকদের পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়, তাই তারা এ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত।) কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কজন পিতামাতা চান যে তাঁর ছেলে রামকৃষ্ণের মত, স্বামিজীর মত সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হোক—দেশের জন্য, দশের জন্য আত্মসুখ বিসর্জন দিয়েই ছেড়া কাঁথাই সম্বল করুক। মোটেই তাঁরা তা চান না। তাঁরা ছেলেকে এই উদ্দেশ্যে পাঠান যে ছেলেকে অমন জায়গায় রেখে পড়ানোই একটা সামাজিক ফ্যাসন—মান-মর্যাদা অহঙ্কারের সূচক। দ্বিতীয়তঃ ছেলে বাঁধা-ধরার মধ্যে থেকে বড় ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হয়ে আসবে—অতি সহজে নেম-ফেম-গাড়ি-বাড়ির অধিকারী হবে। এ কথা তো মনে হয় না সমস্ত ভোগসুখ বিসর্জন দিয়ে কোন ছেলে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে আসছে দেখলে কোন মা-বাবা সত্যিই সুখী হবেন। যদি কেউ হন তো তা হাতে গোনা যায়। অধিকাংশই কপাল চাপড়ে বলেন—'এই জন্যেই কি এত টাকা খরচ করে লেখাপড়া শিখতে পাঠিয়ে ছিলাম'? তাঁরা যে সামাজিক প্রতিষ্ঠাকে অনেক বড় দেখেন। বাইরের সুখ-ঐশ্বর্য-আরাম-বিলাস-স্বাচ্ছন্দ-মান-মর্যাদা যে জীবনের পরম এবং চরম কামনার ধন। কাজেই বাইরের চিত্তজগতে এ যত বড় সত্য এবং এ সত্যের যে মূল্য তার কাছে আন্তর সত্য অতি

নগণ্য। তাই আমাদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে অধ্যাত্ম জীবনবোধ একেবারেই জাগ্রত হয় না। আমাদের বৃত্তিমূলক শিক্ষাকেন্দ্রে এবং পারিবারিক ও সামাজিক এবং রাজনৈতিক আবহাওয়ার এই বাস্তবতাভোগী ভাবধারায় আজ আর অধ্যাত্ম জীবনবোধের কোন দাম নেই। অবশ্য আচার অনুষ্ঠান পালন বা সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হওয়াকেই জীবনের পরম চরিতার্থতা বলছিনে এবং এ চরিতার্থতায় সকলেই যদি নিজেকে ধন্য মনে করে তাহলে মানুষের এই সভ্যতার আর অগ্রগতি হয় না। 'আরও চাই'—এই বাসনাতেই তো সমস্ত বিশ্বজগৎ ছুটে চলেছে—নিজের বৈচিত্র্যময় সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে নিজেকে করছে উপভোগ। তাই তো তার এত লীলা, এত প্রকাশ, এত মাহাত্ম্য। কবির ভাষাতেই তাই বলি—'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়'। কিন্তু চরম ভোগের মধ্যেও থাকবে চরম বৈরাগ্য—সেই সাধনাই করা চাই আমাদের জীবনে। লোভ, মোহ, কামনা-বাসনা আমাদের যেন ছোট না করে—মনুষ্যত্ববোধের উপর জয়ী না হয়। আমার কাছে, আমার চিন্তায়, আমার ভাবনায় থাকবে জীবনের পরম মূল্যবোধ এবং সেই সঙ্গে সেই পরম একের প্রতি দ্বিধাদ্বন্দ্বহীন আস্থা, নিষ্ঠা বা বিশ্বাস। তাহলেই বাইরের কোন লোভ কোন মোহ কোন অন্যায় আমার সত্য বোধের উপর রাজত্ব করতে কখনোই সক্ষম হবে না। এই যে আধ্যাত্মিকতার চেতনা এবং তার ফলে আত্মবিশ্বাসের সূচনা এটাই তো মানবিকতার সত্যসুন্দর ধর্মবোধ। এ সত্যকে জীবনে মূল্য দিতে গেলেই দেখা যায় অনেক ত্যাগের প্রয়োজন, অনেক আত্মসংযমের প্রয়োজন। জীবনকে তখন ভোগ করলেও কিছু এসে যায় না, চিত্তসংযমের সত্য-সুন্দর মহিমায় সে সমুজ্জ্বল।

কিন্তু দুঃখ এই—সত্যি সত্যিই আমাদের জীবন গঠনে আমরা এর কোন স্ফুরণ দেখি না। সাহিত্যের কাব্যের বাইরে কোন আদর্শকেই আমরা বাস্তব জীবনে রূপায়িত করতে পারি না, মূল্য দিতে চাই না। কোন পরম এক বা সত্যের প্রতি আমাদের নিষ্ঠা বা বিশ্বাস দূরে থাক বিদ্রূপ করি, উপহাস্যাস্পদ করে তুলি। যেন তিনি কোন অন্যায় করেছেন—করেছেন কিছু অসামাজিক আচরণ।

এই রকম মনোভাব ছড়িয়ে আছে আমাদের সমাজের চারদিকে। বাড়িতে পরিজন-প্রিয়জনের মাঝে, সমাজে বন্ধু-বান্ধব-সহকর্মীর মাঝে, শিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষক-ছাত্রের মাঝে। কাজেই সমাজের এই আবহাওয়াতেই আমাদের চরিত্রগঠনে স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত অধ্যাত্মবোধে বাধার সৃষ্টি করছে। সামাজিক জীবনে দেখি মিথ্যা কথা, অতিরঞ্জন, বৃথা দম্ভ ও আত্মশ্লাঘা প্রকাশ চরিত্রেরই সহজাত ধর্ম হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক মহলে দেখি দেশহিতের নামে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা, ব্যক্তিগত হিতে খাটানো এবং পরমুহূর্তে ভোল পালটে মুখে বড় বড় বুলি আওড়ানো, আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেখি আদর্শের কথা—ক্লাশে প্লাটফর্মে উঠে বলে নেমে এসে তার উলটো আচরণ করা—(অবশ্য এরও ব্যতিক্রম আছে)। ছোটবেলা থেকে এ-সমস্ত দেখে দেখে আদর্শ এবং বাস্তবের যে মিশ্রণ সে সম্বন্ধে আমাদের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে মনে মনে দ্বন্দ্ব বাধে। সত্য অসত্য, ন্যায়-নীতিবোধ, ধর্মাধর্মবোধ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট কোন ধারণা জন্মায় না এবং কোন অন্যায়, কোন অধর্ম, কোন পাপাচরণই মনে দাগ কাটে না। আসলে 'শিক্ষা এবং

বাস্তবক্ষেত্রে তার প্রয়োগ' এর মধ্যেই রয়ে যায় আকাশ-পাতাল ফারাক। নীতিগত দিক থেকে, বিবেকের দিক থেকে যাকে সত্য বলে জানি বাস্তবে তার সুষ্ঠু রূপায়নে ব্রতী হয়ে উঠতে পারি না। আমাদের জীবন এবং চরিত্র গঠনের প্রাথমিক অবস্থাতেই যথোচিত আদর্শবান চরিত্র বা আদর্শ কার্যকলাপ অধিকাংশেরই সম্মুখে না থাকায় অঙ্কুরেই সে বীজ নষ্ট হয়ে যায়। ফলে ডিগ্রিলাভ করে কর্মজীবনে নামার সঙ্গে সঙ্গে আমরা অতিরিক্ত পরিমাণে স্বার্থপর এবং আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠি। তাই নিজের যে ক্ষমতা যে অর্থকে আগে লোকে দশজনের মধ্যে বণ্টন করে স্বীয় সুখ সৌভাগ্যে আনন্দকে ভাগ করে উপভোগ করতো, আজকের দিনে কোটিপতিও সেই ঐশ্বর্যের সৌভাগ্যকে ব্যক্তিগত ভোগে ব্যয়িত করে আনন্দ পান। গাড়ির পরে গাড়ি হয়, বাড়ির পরে বাড়ি। সিনেমা থিয়েটার-পার্টি-খেলাধূলো নিত্য নূতন সাজগোজ ও বিলাস কলা দেশভ্রমণ কত কি? অর্থ ব্যয়ের ব্যক্তিগত সীমানাও তো বিজ্ঞানের কল্যাণে আজ অনেক প্রসারিত। তাই 'যত পাই তত চাই', নীতির পিছনে ছুটোছুটি করে অন্যের মুখের গ্রাসও কেড়ে নিতে দ্বিধা হয় না এবং সব চেয়ে বড় কথা এর মধ্যে কোন অন্যায় আছে, পাপ আছে, এ যে মানবিক ধর্মের দিক থেকে পরিপন্থী একথা একবারও মনে উদয় হয় না। আমি যে এই দেশেরই একজন—দেশের জন্য, প্রিয়পরিজনের জন্য, সমস্ত মানুষের কল্যাণের জন্য আমরাও যে কিছু ত্যাগ স্বীকার করা ধর্ম এ ধর্মকে স্বীকার করি না। এ সম্পর্কে কবিগুরুর 'সমাজ' বিষয়ক প্রবন্ধের 'বিশেষ একটি অংশে'র কথা মনে পড়ে—"দেশের ধর্মস্থানকে, বন্ধুস্থানকে, জন্মস্থানকে কৃশ করিয়া কেবল ভোগস্থানকে স্ফীত করিয়া তুলিলে, বাহির হইতে মনে হয় যেন দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে চলিল। সেই জন্যে এই ছদ্মবেশী সর্বনাশই আমাদের পক্ষে অতিশয় ভয়াবহ। মঙ্গল করিবার শাস্তিই ধন, বিলাস ধন নহে"।

আবার 'ধন' বিষয়ক প্রবন্ধের একস্থানে বলেছেন—"প্রাচীন সংহিতাকারগণ আমাদের গার্হস্থ্যকে অনন্তের মধ্যে সেই শেষ পরিণামের অভিমুখ করিতে চাহিয়াছিলেন। সমস্ত জীবনকে জীবনের পরিণামের অনুকুল করিতে চাহিয়াছিলেন। সেই জন্যে আমাদের শিক্ষা কেবল বিষয়শিক্ষা, কেবল গ্রন্থশিক্ষা ছিল না; তাহা ছিল ব্রহ্মচর্য। নিয়ম সংযমের অভ্যাস দ্বারা এমন একটি বল লাভ হইত যাহাতে ভোগ এবং ত্যাগ উভয়ই আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক হইত। সমস্ত জীবনই নাকি ধর্মাচরণ, কারণ, তাহার লক্ষ্য ব্রহ্মের মধ্যে মুক্তি; সেইজন্য সেই জীবন বহন করিবার শিক্ষাও ধর্মব্রত ছিল। এই ব্রত শ্রদ্ধার সহিত, ভক্তির সহিত, নিষ্ঠার সহিত, অতি সাবধানে যাপন করিতে হইত। মানুষের পক্ষে যাহা একমাত্র পরম সত্য সেই সত্যকে সম্মুখে রাখিয়া বালক তাহার জীবনের পথে প্রবেশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইত"।

কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে আজকের দিনে এই সংযমের শিক্ষা আমাদের জীবনে আর নেই। সমস্ত গার্হস্থ্য জীবনকে অনন্তের অভিমুখী করে সেই 'পরম একে'র পায়ে সবকিছু সমর্পণ করে যে ভোগ সে ভোগ সংযমের বাঁধনে বাঁধা, ত্যাগের দীক্ষায় দীক্ষিত, সত্যসাধনার সুকঠোর তপস্যায় ভাস্বর। এর মধ্যে তাই আছে দেশের, দশের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল আত্মার চিরন্তন কল্যাণ। সমস্ত জীবনকে এইভাবে ধর্মপথে নিয়োজিত রেখে যে ভোগ সেই চিত্ত সংযমের শিক্ষা জীবনের মূলীভূত কোন ধর্মবোধের উপর আন্তর সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এ সত্যবোধ জাগ্রত হয় উচ্চতর

আধ্যাত্মিক জীবন সাধনার নিষ্ঠাবোধে। এই স্বতঃস্ফূর্ত সত্যনিষ্ঠ জীবনবোধ গড়ে ওঠে মা-বাবা প্রিয়-পরিজন পরিবেশে যেমন তেমনি সামাজিক এবং রাজনৈতিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কল্যাণী প্রচেষ্টায়। অবশ্য ব্যক্তিগত জীবনের সহজাত সত্যবোধ, ধর্মবোধের স্থানও নগণ্য নয়। কিন্তু আজকের দিনের পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক বা প্রতিষ্ঠানের কাঠামোই অন্যরকম। 'মানুষের মাঝে যা একমাত্র পরম সত্য সেই সত্যকে সম্মুখে রেখে বালক তার জীবনের পথে প্রবেশ করার' শিক্ষা পায় না। আর পেলেও গ্রহণ করার মনোভাবও অধিকাংশেরই নেই। তাই আজকের দিনে আমরা যে শিক্ষা লাভ করি তা আমাদের আর যাই দিক না কেন শিক্ষাগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে চারিত্রিক সংযম ও সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যাত্মবোধের এই স্বাভাবিক সুমহান প্রবণতাটুকু সমন্বিত হয়ে একটি সুস্থ-বলিষ্ঠ-ত্যাগ-বীর্যে-ধর্মে সার্থক চরিত্রের জন্ম দেয় না। আমাদের সমগ্র শিক্ষা তাই 'কচের প্রতি দেবযানী'র অভিশাপে'র মত জীবনব্যাপী ভারবাহী ডিগ্রীর বোঝা হয়েই দাঁড়ায়—'সে বিদ্যা সম্পূর্ণ বশ হয়ে' সত্যসুন্দর মহিমায় সমুদ্ভাসিত হয়ে আমাদের জীবনে 'অমৃত ফল' দান করে না। তাই সমাজের বুকে এই শিক্ষার ঢেউ যেভাবে আছড়ে পড়ছে তাতে এর যে শেষ পরিণতি কোথায় তা আজ বলা শক্ত। কি জানি এ দুয়ের সমন্বয় কোনদিন আমাদের বাস্তব জীবনে নেমে এসে পৃথিবীকে স্বর্গ করে তুলবে কি না!

যাত্রায় পৌরাণিক নাটক ও অভিনয়

দেবেন্দ্রনাথ মিত্র

আন্দাজ আট বৎসর বয়সে সর্বপ্রথম যাত্রা দেখতে যাই। তখন আমার অন্তরে অন্তরে কী মধুর বৃত্তি ছিল জানি না, আমার মনে হল আমি একটা স্বপ্নময় রাজ্যে এসে পড়েছি। ইন্দ্র, ব্রহ্ম, বরুণাদি দেবগণ যে সত্যসত্যই স্বর্গরাজ্যে বিচরণ করছেন, তাঁদের জ্যোতিতে দেবলোক উদ্ভাসিত, প্রজারঞ্জন, অতিথিসৎকার, সত্যানুরাগ প্রভৃতি তাঁদের মূলমন্ত্র একথা আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতাম। আমি রাক্ষস দেখে ভয় পেতাম, হাতী দেখে আমাদের দেশের রাজার হাতীর সঙ্গে তুলনা করতাম, যুদ্ধের সময় সত্যসত্যই যেন রণস্থলে বসে আছি এরকম মনে হত। অত্যাচারীদের দণ্ড না হওয়া পর্যন্ত মন নিরন্তর ব্যাকুল হয়ে থাকত। বাদ্যসঙ্গীত আরম্ভ হলে লোকে কেমন করে সেখান থেকে উঠে যেতে পারে একথা আমি অনেক চেষ্টা করেও কল্পনায় আনতে পারিনি।

সেই থেকে প্রায় দশবৎসর পরে পুনরায় যাত্রা দেখতে গেলাম। দেখলাম আমার সে কল্পনারাজ্য ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। যাত্রার আর সে মোহিনীশক্তি নাই, সঙ্গীত আর তেমন চিত্তাকর্ষণ করে না। প্রথম ঘণ্টা, দ্বিতীয় ঘণ্টা, তৃতীয় ঘণ্টা—যা বাজলে আমি অজ্ঞাতসারে একটা কল্পনাময় রাজ্যে এসে পড়তাম—সেটা ঘণ্টাবাদকের প্রক্রিয়ামাত্র; স্ত্রীগণ প্রকৃত স্ত্রীলোক নয়, পুরুষরা স্ত্রীলোক সেজেছে; যুদ্ধ একটা ব্যঙ্গযুদ্ধ মাত্র; যুদ্ধে লোক নিহত হলে সাজঘরে গিয়ে পুনরায় জ্যান্ত হয়ে ওঠে, ভূত একটা মুখোসপরিধারী মানব, সন্ন্যাসী হয়ত একটা বদ্ধ মাতাল। আমি যে পুনরায় বালক হতে চাইলাম তা নয় তবে আমার সে সোনার কল্পনারাজ্য কোথায় গেল? কেন আমি পার্থিব হলাম?

সেই সময় নাগাৎ আমি কয়েকটি যাত্রার পৌরাণিক নাটক ও অভিনয় যেমন দেখেছিলাম আর সে সম্বন্ধে আমার যে ধারণা জন্মেছিল প্রথমতঃ সেই কথাই বলব। তখনও থিয়েটার দেখিনি এবং তখনও সবাক সিনেমার সৃষ্টি হয় নি।

সমস্ত বাংলা পৌরাণিক নাটকে দেখা যায় সেগুলি কোন না কোন নীতি অবলম্বনে লিখিত। কেহ কেহ বলেন ললিতকলার সঙ্গে নীতির কোন সংস্রব নাই। কিন্তু আমরা বোধহয় সেকথা বলবার যুগ অতিক্রম করেছি। আমরা বলব নীতিই সৌন্দর্য। তবে নীতিটি দান করবার প্রকার ভেদ আছে। প্রধান গল্পের স্রোতে বাধা না দিয়ে প্রকারান্তরে নীতিদানই সর্বোত্তম কলানৈপুণ্য। কিন্তু প্রায় সমস্ত পৌরাণিক নাটকগুলিতে এত অধিক পরিমাণে এবং কখনও কখনও এমন অপ্রাসঙ্গিকভাব প্রদত্ত হয় যে তা সৌন্দর্যোপভোগ বিষয়ে অন্তরায় হয়ে ওঠে। নাট্যকার ও ঔপন্যাসিকের মধ্যে প্রভেদ এই যে শেষোক্ত ব্যক্তি একটি চরিত্র বিশ্লেষণ করে পাঠকের সম্মুখে সাধারণভাবে বর্ণনা করতে পারেন, কিন্তু প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে অবগুণ্ঠনের আড়ালে থেকে পাত্র-ক্রিয়াকলাপ ও কথোপকথনের দ্বারা চরিত্রগুলিকে পরিস্ফুট করতে হয়। যে মুহূর্তে শ্রোতা বুঝতে পারে যে গ্রন্থকার তাকে সাধারণভাবে উপদেশ দিচ্ছেন সেই মুহূর্তেই নাটকের মনোহারিত্ব কমে

যায়। বাংলা পৌরাণিক নাটকগুলিতে এরূপ ধরণের দোষ যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। যিনি দাতা তিনি দান সম্বন্ধে এবং যিনি ধার্মিক তিনি ধার্মিকত্ব সম্বন্ধে এত বেশি বক্তৃতা করেন যে শ্রোতার মনে নীতিটির ধারণা বদ্ধমূল হওয়া দূরে থাকুক, ক্রমশঃ শিথিল হয়ে আসে। গ্রন্থকার মনে করেন পৌনঃপুন্যের দ্বারা নীতিটি হৃদয়ঙ্গম করিয়ে দেবেন কিন্তু পৌনঃপুন্যের দ্বারা যে লাভটুকু হয় উদ্দেশ্য সিদ্ধি ও কলানৈপুন্যের মনোহারিত্ব বিষয়ে ক্ষতি তার চেয়ে বেশি।

আমাদের পৌরাণিক নাট্যকারগণ কেন যে এরকম করতেন তার কারণ বোধহয় এইভাবে নির্দেশ করা যায়। প্রথমতঃ, ভারতবাসীরা ধর্মপ্রাণ। দ্বিতীয়তঃ, এই নাটকগুলি যখন প্রথম রচিত হয় তখন জনসাধারণ অধিকাংশ অশিক্ষিত ছিল, তাদের এমন শক্তি ছিল না যে তারা পাত্রপাত্রীদের কেবলমাত্র কার্যকলাপ দেখে নীতিটি ধরতে পারে। বিশেষতঃ যাত্রা উন্মুক্ত স্থানে হত সেজন্য তারা একাগ্রচিত্তে সমস্ত বিষয় শুনতে পেত না, অনেকে আবার পালার আদ্যোপান্ত শুনত না। এই কারণে নাট্যকারগণকে বাধ্য হয়ে পাত্রপাত্রীদের মুখে ধর্মনীতিবিষয়ক কথাগুলির পুনঃপুনঃ অবতারণা করাতে হত। শুধু বাংলা নাটকে কেন, এরকম ঘটনা আমরা ভবভূতির উত্তরচরিত নাটকেও দেখতে পাই। রামচন্দ্র প্রজাদের প্রতি অনুগ্রহসূচক একটি কাব্য করলেন অমনিই কবি সীতার মুখ দিয়ে বলিয়ে দিলেন "আর্য্যপুত্র, এইজন্যই লোকে তোমাকে প্রজাবৎসল বলে।"

পৌরাণিক নাটকের আরও একটি বিষয় পর্য্যালোচনা করলে আমাদের অনুমান যথার্থ বলে প্রতিপন্ন হয়। বক্তৃতাগুলির মধ্যে মধ্যে বিশেষতঃ কোনও মর্মস্পর্শী ঘটনার সময়ে যে গানগুলি দেওয়া হয় সেগুলিরও উদ্দেশ্য এই: এজন্য সাংসারিক লোক স্ত্রীপুত্র পরিত্যাগ করে রণস্থলে যাচ্ছেন, একজন রাজা রাজভোগ ত্যাগ করে সন্ন্যাসী বেশ ধারণ করছেন এ সমস্ত বিষয়ের গুরুত্ব সাধারণ লোকে—বিশেষত মন যখন একাগ্র নয়—সহসা উপলব্ধি করতে পারে না। শ্রোতাকে এইগুলি বিশেষভাবে বুঝিয়ে দেওয়া এবং তাদের মনে অনুভূতি ঘনীভূত করা এই গানগুলির উদ্দেশ্য। এরকম অনুভূতি দৃঢ়ীকরণের শক্তি আমরা ইংরাজ কবি সুইনবর্ণের নাটকগুলিতে প্রভূত পরিমাণে দেখতে পাই, কিন্তু এ বিষয়ে গ্রীক কবি সোফোক্লিসের কোরাসগুলি অদ্বিতীয়।

পাত্রপাত্রীদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ, শ্রোতাগণের মনকে বিশ্রাম দেওয়া প্রভৃতি কোরাসগুলির অন্যতম উদ্দেশ্য হলেও সে সম্বন্ধে এখানে কিছু না বলে বাংলা যাত্রায় সেগুলি কিরকমে সাধিত হত দেখা যাক। অনুমান করা গেল রাম বনে যাচ্ছেন সীতাও তাঁর সঙ্গে যাবার জন্যে নির্বন্ধ্যাতিশয্য দেখাচ্ছেন। ঠিক এই সময়ে যুড়ী গান ধরল। যুড়ীদের পোশাক সাধারণতঃ জীর্ণ ও দীর্ণ। মুক্তস্থানে সঙ্গীতের শব্দ সহজেই বাতাসের সঙ্গে মিলিয়ে যায় বলে এবং তাদের বালকদের সাথে গাইতে হয় বলে তাদের বাধ্য হয়ে চড়া সুরে গান ধরতে হয়। কিন্তু তাদের কণ্ঠস্বর বালকদের মতো চড়ায় ওঠে না সেজন্য তারা সময়ে সময়ে শুধু মুখভঙ্গী ও হস্তসঞ্চলনাদি করে। গানের তান ও সরগম ভালো অভ্যাস নেই তথাপি কানে হাত দিয়ে চিবুক বাঁকিয়ে মাঝে মাঝে বিকট শব্দ করে। এবং মালসায় থুথু ফেলতে থাকে। দর্শকের মন স্বতঃই এই সকল অঙ্গভঙ্গীর দিকে আকৃষ্ট হয়। এই সমস্ত দেখে দর্শক ইচ্ছে করে 'উকীল মোক্তাররা' বসে পড়ুক। কিন্তু

সময় যাপনের অনুরোধে তাদেরকে গীতগুলি বিলম্বিত করতে হয়; তখন দর্শকের দৃষ্টি স্বভাবতঃই পাত্রপাত্রীদের ওপর পড়ে। কিন্তু এদিকে আর এক ব্যাপার। রাজপুত্রের পক্ষে বনগমন বড়ই দুঃখের বিষয়, কিন্তু ইতিমধ্যে রাম ও সীতা বসে পড়েছে, তাদের কী একটা হাসির কথা উঠেছে তারা হাসছে। তারপর রাম তামাক খেয়ে কলকেটি সীতাকে বাড়িয়ে দিল, সীতা তামাক খেতে লাগল। এদিকে সাজঘর থেকে একটা লোক রামের বনবাসযোগ্য পোশাক নিয়ে এল, দর্শকরা তাও দেখল। সমস্ত ব্যাপারে নাটকাভিনয়ের চমৎকারিত্ব একেবারে নষ্ট হয়ে যায়।

রচনা ও ভাববিষয়ে এই গানগুলির বিশেষত্ব এই যে এগুলির অধিকাংশ সংসারের অসারতা ভগবদ্ভক্তিমূলক এবং পাত্রপাত্রীর শেষ কথা অবলম্বনে এগুলির রচনারম্ভ। একজন পাত্রী বললেন "হে হরি এখন কি করি?" যুড়ীও ঠিক সেই সময় গান ধরলেন "হে হরি এখন কি করি, পড়েছি বিপদ পাথারে" ইত্যাদি। এই রকম দু-চারটি গীত হবার পর যুড়ী উঠলে শ্রোতা বুঝতে পারে যে সেই ভাব অবলম্বনে একটি গান হবে এবং তার প্রথম ছত্রটি কি হবে তাও অনুমান করে নেয়, ইহা বড়ই হাস্যোদ্দীপক। কিন্তু যুড়ীদের বাহাদুরী এই যে তারা সুরযন্ত্র বাজাবার পূর্বেই মুহূর্তমধ্যে যে সুরে গানটি ধরতে হবে ঠিক সেই সুরে ধরে ফেলে। এটা কম রেওয়াজের পরিচয় নয়।

পৌরাণিক নাটকে করুণ রসের আধিপত্য বড়ই বেশি এবং না হইবেই বা কেন? এটা যে আমাদের মজ্জাগত জিনিস। নায়ক বা নায়িকার ঈশ্বরানুরাগ দেখাবার জন্য তাদের অসংখ্য বিপদের মধ্যে ফেলা হয় এবং প্রত্যেক পরীক্ষাতেই ভগবদ্ভক্তি অবলম্বনে জয়ী করানো হয়। হরি যে ছলনাময় তা দেখবার জন্য হয়ত একটি রাক্ষসকে নায়কের কাছে সন্তানের রক্তপান ভিক্ষা করতে হয় এবং রাক্ষস যখন সন্তানটিকে বধ করবার জন্য উদ্যত হয় সেই সন্ধিস্থলে হরি এসে দেখা দেন। হরি যে দর্পহারী তা দেখাবার জন্য অপর একটি চরিত্রের দর্প ও পতন দেখাতে হয়। ভগবান যে ধর্মপ্রাণ ভক্তের তা দেখাবার জন্য কতকগুলি অধর্মচারীর পতন দেখাতে হয়? প্রায় সমস্ত পৌরাণিক নাটকে এইরকম কঠোর পরীক্ষার কাজগুলি এত সাধারণ হয়ে দাঁড়ায় যে সেই সমস্ত পরীক্ষাস্থলে নায়ক নায়িকা কী করবে তা বলে দেওয়া যায় এবং হরিও যে একটি জীবন মরণের সন্ধিস্থলে নিশ্চয়ই ভক্তের সম্মুখে সশরীরে আবির্ভূত হবেন ইহাও দর্শক জানতে পেরে হরি কখন আসবেন তারই জন্য যেন প্রতীক্ষা করতে থাকে। যদি ঘটনাগুলিতে কিছু বৈচিত্র্য মিশ্রিত করা হয় তাহলে বোধ হয় নাটকগুলির উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

সে যাই হোক করুণ দৃশ্যগুলি রঙ্গমঞ্চে এত অধিকবার দেখানো হয় এবং এত বিলম্বিত করা হয় যে সেগুলির চিত্তাকর্ষণশক্তি একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। দর্শকের আর ধৈর্য্য থাকে না। অনুভূতির উত্থানের এটা সীমা আছে সেটা অতিক্রান্ত হলে অনুভূতি শ্লথ হয়ে বিপরীত ভাব ধারণ করে। হয়ত সত্য রক্ষার জন্য একজন রাজা তাঁর পুত্রের শিরচ্ছেদ করবেন, তখন একটি সুদীর্ঘ করুণ বক্তৃতা আরম্ভ হল "হা পুত্র, তোকে কত করে লালনপালন করেছি, তুই কি আর বাবা বলে ডাকবি না?" ইত্যাদি। যদি এই ঘটনাটি একটিমাত্র দৃশ্যে দেখানো হত তাহলে কোনও দোষ ছিল না কিন্তু যাত্রাতে এটি কতকগুলি ধারাবাহিক দৃশ্যে দেখানো হয়। পিতা পাঁচ-সাত বার পুত্রের হাত ধরে রঙ্গালয়ে নিয়ে এসে করুণ বক্তৃতা করতে থাকেন। তারপর হয়ত মা এলেন। মা কাঁদছেন

অথচ এদিকে ঘন ঘন মূর্চ্ছিত হয়ে আসরের ঠিক কোন্‌খানে পড়বেন তা দেখচেন। এ রকম ব্যাপার বহুক্ষণ চলবার পর নাটকের বাস্তবভাব একেবারে তিরোহিত হয়ে যায়। মর্মান্তিক ঘটনাগুলি একটি মাত্র দৃশ্যে শেষ হয়ে যাওয়া বাঞ্ছনীয়।

যাত্রায় করুণ রসাত্মক বক্তৃতাগুলির আরও একটা দোষ এই যে সেগুলির অধিকাংশ সুদীর্ঘ ও ভাব্‌প্রবণ। ভাবপ্রবণতা (sentimentality) স্থায়ী ভাব (emotion) নয়, উহা স্থায়ীভাবের ব্যাধি মাত্র। বিশেষতঃ, মন যখন নিতান্ত দুঃখ-সংক্ষুব্ধ থাকে তখন নীরব ভাষায় অথবা অল্প ভাষায় মনের ভাব যে রকম প্রকাশ পায় একটি রোদনপূর্ণ সুদীর্ঘ বক্তৃতাতে কিছুতেই সম্ভবপর নয়। শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকের চরিত্রগুলি অনেক স্থলে ভাবাধিক্যের সময় অল্প কথা বলে এবং অল্প কথা বলাই স্বাভাবিক। সুদীর্ঘ করুণ রসাত্মক বক্তৃতা নাটকে সমীচীন বলে মনে হয় না।

পৌরাণিক নাটকে বিপরীত যুগ্ম-চরিত্র প্রদর্শন করা হয়, যথা—বিলাসীও উদাসীন, নির্দয় ধনী ও সদয় দরিদ্র, ভক্ত ও ভণ্ড, পাপী ও ধার্মিক। এর দ্বারা চরিত্রগুলি মনের মধ্যে দৃঢ়ীভূত হয় আর শেষ ফল দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন। কতকগুলি নাটকে মন্দ চরিত্রগুলির পতন দেখানো হয় তা কতকগুলি সীমার মধ্যে—উচ্চতর। বিপরীত চরিত্রগুলি রিলিফের কাজ করে বটে কিন্তু চরিত্রগুলি যুগ্মে যুগ্মে এলে নাটকখানি নীরস হয়ে দাঁড়ায়।

বাংলা যাত্রার নাটকে করুণ রসের অবতারণা এত অধিকবার বলেই বোধ হয় হাস্যোদ্দীপক চরিত্রগুলি বিশেষ মনোযোগ সহকারে অঙ্কিত না হলেও এত উপভোগ্য হয়। বাংলা যাত্রায় প্রধানতঃ বিদূষকের দ্বারা হাস্যরসের সৃষ্টি করা হয়। সিডনী স্মিথ বলেন অসামঞ্জস্যই হাস্যের কারণ। বিদূষকের পক্ষে অসামঞ্জস্য এই যে যখন রাজসভায় যুদ্ধবিগ্রহের মত গুরুতর কথাবার্তা চলছে তখন সে মিষ্টান্ন ভোজনের কথা ভাবছে। হাস্য দুরকমের হতে পারে—উদ্দেশ্যপূর্ণ ও উদ্দেশ্য শূন্য। প্রথম অবস্থায় বিদূষকদের হাস্য গোপাল ভাঁড়ের মত নিরুদ্দেশ্য ছিল এবং তার টান সাধারণতঃ আদিরসের দিকে এবং লাড্ডু ভোজনের দিকে থাকত। বিদূষকগুলিকে পুনঃপুনঃ নাটকে আনায় জিনিসটা ক্রমে একঘেয়ে হয়ে আসতে লাগল। নাটককারগণ সেই একই বিষয়ে নূতন কথা আর কিছুই বলতে পারলেন না। একই বিষয়ে নূতন কথা বলার অক্ষমতা প্রযুক্তই হোক অথবা হাস্যচরিত্রের অনিবার্য গতি প্রযুক্তই হোক হাস্যচরিত্রে সামাজিক সমালোচনা আরম্ভ হল। কিন্তু এখানের কতকগুলি পৌরাণিক নাটককার ভ্রমে পতিত হয়েছেন। তাঁরা সাধারণত গোঁড়া, সংস্কারাচ্ছন্ন, কাজেই ধর্মীয় আচারের মামুলী রীতিনীতি যে ব্যক্তি সামান্য পরিমাণে লঙ্ঘন করেছে সেই ব্যক্তিই বিদ্রূপের স্থল হয়ে দাঁড়াল। তাঁদের দেশ কাল পাত্র বিবেচনা নাই এবং সহানুভূতিও কম। হাস্যচরিত্র অঙ্কনে তাঁরা পারদর্শিতা দেখাতে পারেন নি।

অঙ্কনের বিষয় ছেড়ে দিয়ে অভিনয়ের বিষয় ধরলেও দেখা যায় বিদূষকগুলি দক্ষতা দেখাতে পারে নি। তারা যে লোককে হাসাচ্ছে এই রকম একটা ভাব অভিনয়কালে তাদের প্রত্যেক আকারইংগিতে প্রকাশ পায়। চার্লি চ্যাপ্‌লিনের মত হাস্য-চরিত্রের মধ্যে হাস্যের ভাব এরকম অন্তর্নিহিত অবস্থায় থাকা আবশ্যক যে হাসির ভাবগুলি যেন চরিত্রটির অনিচ্ছাক্রমে বেরিয়ে পড়ে। এ বিষয়ে আমাদের হাস্যচরিত্রের অভিনেতাগুলি অধিকাংশই অকৃতকার্য্য।

সেকালের যাত্রার একটা ছবি আঁকতে গেলে বোধ হয় এই রকম দাঁড়ায়—অর্থাভাবের জন্য সাজপোশাক ও যন্ত্রপাতির অবস্থা শোচনীয়; পুরুষরা স্ত্রীলোক সাজে; বিদ্যাসাগর মশায়ের প্রথম ভাগ বর্ণপরিচয়ের বিদ্যে নিয়ে মাথায় ঝাকড়া চুল রাখতে পারলেই অভিনেতা হতে পারত তার মধ্যে আবার গ্রামের যে লোকটি সব মাসে সবচেয়ে বেশি চাঁদা (বোধ হয় দশ টাকা) দিত তাকে রাজার পার্টটা দিতে হত; অভিনেতাদের উচ্চারণ অশুদ্ধ ও অভিনয়ভঙ্গী অস্বাভাবিক, তারা একটা কৃত্রিম সুরে বক্তৃতা করত এবং দু-জন প্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধার মধ্যে বক্তৃতার আস্ফালন অতিনাটকীয় ও হাস্যোদ্দীপক হয়ে উঠত ইত্যাদি। অবশ্য মথুর সাহা, প্রসন্ন নিয়োগী, শ্রীচরণ ভাণ্ডারী প্রভৃতির দু-তিনটি দল ছিল তাদের অবস্থা শোচনীয় ছিল না। ভালোর দিক বলতে গেলে দেখা যেত কোনও কোনও দলে এমন এক একটা প্রতিভাবান গায়ক বা বেহালাদার থাকত যারা একলাই আসরটাকে মাতিয়ে রাখতে পারত আর সেরকম লোককে ভাঙ্গিয়ে নেবার জন্য অন্য দলের চেষ্টা হত।

তবুও যাত্রা সগৌরবে চলছিল, কিন্তু গত বিশ পঁচিশ বৎসর যাত্রার খুবই দুর্দিন গিয়েছে। থিয়েটারের কারণে তাদের কিছুই ক্ষতি হয়নি, কারণ পাবলিক থিয়েটার কেবল কলকাতায় কয়েকটি ছিল এবং মফস্বল সহরে কদাচিৎ দু-একটা হয়ত ছিল। শখের থিয়েটারের জন্যেও তাদের ক্ষতি হয়নি। কিন্তু যেদিন থেকে সবাক সিনেমা চালু হল সেইদিন থেকে যাত্রার অবস্থা কাহিল হল। শুধু কলকাতায় নয়, মফঃস্বল সহরেও সবাক সিনেমা প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল, লোকজনের সিনেমা ছেড়ে যাত্রা দেখবার আর আগ্রহ রইল না। অনেক যাত্রার দল উঠে যেতে লাগল। কিন্তু যাত্রার ওপর চরম আঘাত এল সেই ১৩৬: সালে যখন জমিদারী প্রথা রহিত হয়ে গেল। জমিদাররাই তো যাত্রার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তাঁরা পুজা পার্বণ বিবাহ উৎসবে যাত্রার বায়না করতেন এবং যাত্রার দল বছরের মধ্যে প্রায় ৮।৯ মাস কাজ পেয়ে যেত। জমিদারদের গৌরব অন্তর্হিত হল। তাঁরা আর যাত্রার বায়না করলেন না। তখন মনে হল যাত্রা জিনিসটি বুঝি বা ক্রমশঃ লুপ্ত হয়ে যাবে।

কিন্তু গত দু-বৎসর থেকে যাত্রার যেন একটা নবযুগের মত দেখা যাচ্ছে। কয়েকটি দল সাবেক যাত্রার দোষত্রুটি বর্জন করে যাত্রাকে উন্নত ধরণে নূতন আঙ্গিকে গড়ে তুলবার চেষ্টা করছেন। এ দলগুলির আর্থিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল, এঁরা নারী-চরিত্রের জন্য নারী অভিনেত্রী নিচ্ছেন, যুড়ী বাদ দিয়েছেন, নটনটীরা অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত তাদের উচ্চারণ শুদ্ধ ও অভিনয়কলা উত্তম, যন্ত্রপাতিও উন্নত ধরণের এবং তাঁরা যুগোপোযোগী পালাও রচনা করেছেন। যাত্রা থিয়েটারের অগ্রদূত। যাত্রা একটা জাতির প্রাচীন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বহন করে আনে। এই দলগুলি যে সেই সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করছেন সেজন্য তাঁরা প্রশংসার্হ।

বাল্যকালে যে জিনিসটা মানুষকে আকর্ষণ করে তার আকর্ষণটা পরিণত বয়স পর্যন্তও থেকে যায়, তাই কতক থিয়েটার সিনেমা দেখবার পরেও আরো ইচ্ছা হয়—যাত্রা দেখি।

মঙ্গলকাব্য

সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মধ্যযুগের সাহিত্যের দিকে তাকালেই চোখে পড়ে মঙ্গলকাব্যের মিছিল। খ্যাত অখ্যাত কতো কাব্য কতো ভীড়। ইতিহাসের স্মরণভ্রষ্ট আরো কতো নাম একালে এসে পৌছতে পারেনি।

এই যে নামের ঠাসবুনানি, এর জন্যে অনেকখানি দায়ী 'মঙ্গল'-কবিদের অনুচারী বৃত্তি। একই দেবদেবীর একই গল্পের যৎসামান্য রূপান্তরিত চেহারাই নতুন সৃষ্টির দাবী নিয়ে এসেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যক্তিমুদ্রাহারা সে সৃষ্টিতে প্রতিভাদীপ্তিহীন অনুজ্জ্বলতাই প্রকট। এই তন্দ্রাকর্ষক অনুচিকীর্ষাকে আজকের দিনের পাঠক-সমাজ কিঞ্চিৎ অবজ্ঞা-মিশ্রিত অধৈর্যের সঙ্গে দেখেন। কিন্তু সেকালের পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে একে অতোখানি অর্থহীন বলে মনে হবার কথা নয়। মঙ্গলকাব্যের কবিরা অনুসরণের নামে প্রায়-পুনরুক্তিকে বিশেষ দোষের মনে করেন নি, পাঠক বা শ্রোতারাও না। কারণ প্রথমত সেকালের সাহিত্যজগতে স্রষ্টার চেয়ে সৃষ্টির দিকেই নজর ছিল বেশি, স্রষ্টা-মনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অভিমান ছিল কম। দ্বিতীয়ত মঙ্গলকাব্যের কাহিনীগুলি আসলে কবিবিশেষের কল্পনাজগত অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না, এগুলি লোক-প্রচলিত কাহিনী। সর্বসাধারণের সম্পদ গল্পের এই উপকরণকে কবিরা অসঙ্কোচেই কাজে লাগিয়েছেন। তৃতীয়ত সেই মুদ্রাযন্ত্রহীন যুগে কাব্যের প্রচার ছিল পুঁথিনির্ভর; অর্থাৎ পুঁথির প্রয়োজন ছিল বহুগুণিত হবার। এবং মানুষ যেহেতু যন্ত্র নয়, তাই কোনো গ্রন্থকে নিছক নকল করে যাওয়া তার সজীব মনের পক্ষে কষ্টসাধ্য। দেখা যায় পুঁথির প্রতিলিপিকারেরা নিজের রুচি ও ভালো লাগা অনুযায়ী স্বাধীন লেখনী চালনায় লুব্ধ হয়েছেন বিশুদ্ধ নকলনবিশীর পথ ছেড়ে। পুঁথির বহু পাঠান্তরের জন্ম এইভাবে। কবিরাও এক একটি জনপ্রিয় পালাগানের প্রচারে সহায়তা করেছেন লিপিকরেরই মতো, তবে তাঁদের ভূমিকা কিছু স্বতন্ত্র। গল্পের কাঠামোটুকু নিয়ে তাঁরা খুশিমতো তাতে রং চড়িয়েছেন। তবে বহু ক্ষেত্রেই লিপিকর আর রোমন্থজীবী 'কবি'র তফাৎটা এতো সূক্ষ্ম যে বোঝার যো নেই।

মঙ্গলকাব্যের রাজ্যে যে-সব দেবদেবীরা এসে হাজির হয়েছেন, প্রাচীনতার ভান করলেও তাঁরা সকলেই সদ্যোজাত। জন্ম সকলেরই মধ্যযুগীয় ভাবপরিমণ্ডলে, তৎকালীন নরনারীর মানস-লোকে। শ্রুতি অথবা প্রাচীন শাস্ত্র থেকে এঁদের উদ্ভব নয়, কোনো গভীর দার্শনিক তত্ত্ব এঁদের পশ্চাৎপট রচনা করেনি। গ্রাম্যজীবনের সহজ লোক-কল্পনার জগৎ থেকে এঁরা উদ্ভূত। সামাজিক রাষ্ট্রিক ঘটনা-পরম্পরার জটিল আবর্তে সে কল্পনা উদ্রিক্ত হয়েছে। এরই সাহায্যে সেকালের মানুষ দেবদেবীর মূর্তি গড়েছে আপন পরিমাপে। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা'নাটকের ঠাকুর্দার সেই বিখ্যাত উক্তিটি মনে পড়ে—'ও আয়নাতে যেমন আপনার মুখটি দেখে, রাজার চেহারা তেমনি ধ্যান করে'। মধ্যযুগের জীবন-বিড়ম্বিত মানুষ আশপাশের অবস্থার দিকে তাকিয়ে দুর্বল বুদ্ধিতে বিরাট বিশ্ব-ব্যাপারেও সর্বত্র এক নিয়মহীন অদ্ভুত যথেচ্ছাচার কল্পনা করেছে। বিশ্বাস করেছে, এর কেন্দ্রে যে শক্তি, সে তার ব্যক্তিগত মর্জি নিয়ে চলে এবং সংসারের সব শুভাশুভ সেই মর্জিনির্ভর,

নিয়মশৃঙ্খলাহীন আকস্মিক ঘটনামাত্র। ফলে দেব-দেবীরা দেখা দিয়েছেন এক এক খামখেয়ালিতার অবতাররূপে। এই রূপ কল্পনায় সুখ আছে, কেননা ধৈর্যহীন, ধর্মাচরণ হীন ফল-কামনার এ অনুকূল। 'অকস্মাতের আশা' সেবকের যুক্তিবিচারহীন উচ্ছৃঙ্খল কাল্পনিকতাকে নিরঙ্কুশ হতে সাহায্য করে। এরই ফলে এ কাব্যে হিংস্র, ভক্তিলোলুপ দেবচরিত্রগুলি প্রায়ই মহিমাহীন অগৌরবের শেষ ধাপে নেমে এসে কাব্যেরও মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছে। দেব-চরিত্রের এই দীনতা দেখেই রবীন্দ্রনাথের কলমের মুখে বেরিয়ে পড়েছিল সেই মারাত্মক মন্তব্য—'আমাদের প্রচলিত কাব্যে যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহাতে মনে হয় যেন দেবতারা আমাদের পূজা গ্রহণের জন্য মৃতদেহে শকুনি গৃধিনীর ন্যায় কাড়াকাড়ি ছেঁড়াছিড়ি করিতেছেন।' (সমাজ, পৃঃ ২৫৭, ১২ শ খণ্ড) আসলে গ্রাম্য দেবীরা অনুদার, অগভীর কল্পনা থেকে জাত। এঁদের অনেকেরই নাম অশ্রুতপূর্ব। শুধু কেউ কেউ পুরোনো নামে বৈদিক অথবা অন্য প্রাচীন ঐতিহ্যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন; কিন্তু স্পষ্টই ধরা পড়ে সে মিথ্যা পরিচয়, কেননা নামের মিল রূপের সামঞ্জস্যে সমর্থিত নয়। লৌকিক কাব্যের চণ্ডী মার্কণ্ডেয় চণ্ডী নন, প্রাচীন সংস্কৃত পুরাণের শ্লোক বিশেষ কালকেতুর প্রসঙ্গ উল্লেখ সত্ত্বেও না।

বাঙলা সাহিত্যের এই দেব-দেবীরা এক বিচিত্র জগতের অধিবাসী, যে জগতে মানুষ, পশু, দেবতা, উপদেবতার শুধু সহজ সহাবস্থানই নয়, এমন এক একাকার অবস্থা যে মঙ্গলকাব্যের আধা-অন্ধকার অরণ্যরাজ্যের অর্ধস্ফুট মূর্তিগুলির মধ্যে কে মানুষ, কে পশু, কে দেবতা অথবা দেবী মুহূর্তে তা ঠাহর করা কঠিন।

মনসামঙ্গল

মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে পুরানো মনসামঙ্গল। সর্পসঙ্কুল বাঙলাদেশে মনসা সর্পকুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। বাইরের মূর্তি সর্পাকৃতি নয় বটে, কিন্তু কবিদের হাতে দেবী যেন সাপেরই মতো ক্রুর, কুটীল চেহারা নিয়েছেন। মঙ্গলকাব্যের আর কোনো দেবতাকে ঠিক এভাবে আঁকা হয়নি।

মনসামঙ্গল কাব্য-কাহিনীর দুটি ধারা। একটি বেহুলাকে অবলম্বন করে করুণ-রসের ধারা, অন্যটি চাঁদ সদাগরকে কেন্দ্র করে বীর-রসের। বাঙলাদেশ কস্মিনকালেও বীর-রসের রসিক নয়, করুণ-রস তার প্রিয় রস। তাই রামায়ণে দেখি আদি কবির রচনা কৃত্তিবাসের হাতে কারুণ্যের প্লাবনে ডুবে গেছে। পৌরুষ-দৃপ্ত রামচন্দ্র চরিত্রের আদর্শে আমরা ততোখানি অনুপ্রাণিত নই। আমাদের আনন্দ দিয়েছে তাঁর বিড়ম্বিত জীবনের করুণ চিত্রগুলি—বনবাস, সীতাহরণ, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, সীতা বিসর্জন ইত্যাদি। মনসামঙ্গলকাব্যে স্বভাবতই অমিতবীর্য চন্দ্রধর সামনেই জাজ্জ্বল্যমান থাকলেও পাঠক-দৃষ্টির পক্ষপাত দুঃখিনী বেহুলার দিকেই। সেকালের মানুষ কিঞ্চিৎ উদাসীন দৃষ্টিতে এই মহানায়কের চরিত্রকে এক ঝলক দেখে নিয়েছে মাত্র। মনোযোগের সময় পায় নি, ইচ্ছারও অভাব ছিল। কেননা মধ্যযুগীয় পরিবেশ এই দেবদ্রোহকে কি বিশেষ সংস্কারাচ্ছন্ন চোখে দেখতে অভ্যস্থ করেছে, তাতে চাঁদসদাগরের পক্ষে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণের কোনো অবকাশই ঘটে নি। তাই কাব্যে ব্যক্তিত্বের এমন উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটলেও তাকে দেখার সৌভাগ্য

পাঠকের হয়নি নিছক দৃষ্টিশক্তির অভাবে। এমন কি কবিরাও অনেকে সেই পাঠক-গোষ্ঠীরই প্রতিনিধি। শুধু কচিৎ দু-একজন এ চরিত্রটিকে সমুচিত মূল্য দেবার চেষ্টা করেছেন। আজ মধ্যযুগের মেঘ কেটে যাওয়ায় সংস্কারমুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে চাঁদসদাগরকে আমরা দেখতে পেয়েছি। মনসা মঙ্গলকাব্যের এই কাল-অভিশাপ-গ্রস্ত মানুষটি বহু শতাব্দ পার হয়ে আধুনিক জীবনের তটে এসে গ্রাসমুক্ত হল।

মাঝে মাঝে অবশ্য এমন সংশয়ও জাগে যে আসলে চাঁদ-চরিত্রটিকে একালে আমরা অযথা গুরুত্ব দিয়ে ফেলি যা তার ন্যায্য প্রাপ্যের বাইরে। তাকে দেখি তার নিজস্ব যথার্থ রূপে নয়, সাম্প্রতের ভাবনা আরোপ করে আমাদের জীবনভূমি থেকে। সন্দেহ জাগে, যাকে আমরা তার ব্যক্তিত্বদ্যোতক দ্রোহবুদ্ধি-ভ্রমে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হই, আসলে তা উপাস্য শিবের প্রতি অন্ধ আনুগত্যের মূঢ়তা। কিন্তু এ সংশয় কাব্যখানি পুনশ্চ পাঠেই অবসিত হয়। স্পষ্ট ধরা পড়ে এই অনমনীয় অমিততেজা ব্যক্তিটির মধ্যে এমন কিছু আছে, যাকে তার্কিকের অতিবিচারেও উড়িয়ে দেওয়া অসম্ভব। চন্দ্রধরের শিব ভক্তির ঐকান্তিকতাকে স্বীকার করলেই তার চরিত্র-শক্তির মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ণ হয় না। জীবনের যা কিছু কাম্য—সুখ, সম্পদ, শান্তি, স্বস্তি সমস্তের বিনিময়েও যিনি আপন আদর্শে অবিচল, নিশ্চিত ক্ষতি আসন্ন জেনেও যিনি ভয়ে, লোভে, দুর্বলতায় বি-নির্বাচিত পথ ছাড়তে নারাজ, তাঁকেই তো বলতে হয় পুরুষ। ক্ষতি স্বীকার দূরের কথা, যৎসামান্য লাভের আশাতেই সুবিধাবাদী কাপুরুষের দল ঘন ঘন মত বদলায়, পথ বদলায়। চাঁপাই নগরের চন্দ্রধর সে দলের দলী নয়। হেন্তালের যষ্টি হাতে এই প্রবল পুরুষটির চরিত্র-মাহাত্ম্য যে নিছক আরোপিত নয়, মঙ্গল কবিদের বর্ণনার ভাষাতেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। 'মহাতেজা' 'মহাজ্ঞানী' এগুলি তাঁদেরি ব্যবহৃত বিশেষণ। এই সঙ্গে চরিত্র ফুটিয়ে তোলার ভঙ্গিও লক্ষ্য করবার মতো।—

মহাজ্ঞানী জপে মনে জয়নেত আচ্ছাদনে
নিমিষে নাথরা জীয়াইল
দম্ভময় অহঙ্কারে গালি পাড়ে মনসারে
দেখি পদ্মা ত্রাসযুক্ত হৈল।

অথবা

'মনসার ঘটে মারে হেন্তালের বাড়ি
ভাঙ্গিয়া পদ্মার ঘট যায় গড়াগড়ি।'

হৃতসর্বস্ব চন্দ্রধরের দুঃখে বন্ধু চন্দ্রকেতু লোকজন হাতিঘোড়া গাড়ি পালকি দিতে চাইলে সাহায্য গ্রহণ বিমুখ চাঁদ সদাগরের মুখে শুনি—

আমি চাঁদো রাজা হই বিদিত সংসারে
পরের বিভূতি লইয়া না যাব দেশেরে।'

মিতার দেওয়া বসনভূষণ ছেড়ে সে 'উন্মত্ত পাগলের বেশে' দেশে ফিরল। তার এই নিঃস্বতা আরাধ্য দেবতা দিগম্বর শিবের অকিঞ্চনতার মতোই মহিমাদীপ্ত। এই স্বেচ্ছাকৃত দারিদ্র্য বিশ্বের সমস্ত সম্পদ আর সম্ভোগকে লজ্জা দেয়।

প্রাচীন পাঠক মনসামঙ্গল বলতে বেহুলার মর্মান্তিক কাহিনীকেই বুঝেছে। বাসররাত্রেই সে হতভাগিনী স্বামী হারিয়ে অথৈ জলে ভাসল, তার অশ্রুসজল কথা এ রচনায় স্থানে স্থানে গীতিকাব্যে উচ্ছ্বসিত। মঙ্গলকাব্যের রূপ সাধারণত বস্তুভার বহুল, গদ্যাত্মক। কিন্তু মনসামঙ্গলকাব্য করুণ-রসের আতিশয্যবশত প্রায়ই গীতিরসে উদ্বেল হয়ে উঠেছে। গীতিরসপ্রিয় বাঙালীমন এই কারণেও এ কাব্যের সংঘাতমুখর চাঁদসদাগর জীবনের নাটকীয় দিকটায় উপযুক্ত দৃষ্টি দিতে পারেনি। বেহুলা-এবং চন্দ্রধর-কেন্দ্রিক দুটি ধারা শুধু ভাবের দিক থেকে স্বতন্ত্র নয়, রূপেও পৃথক। একটি করুণ-রসের গীতিময় প্রবাহ। অন্যটি বীররসের নাটকীয় প্রকাশ। সমকাল এবং উত্তরকালের বাঙলা কাব্যে চাঁদসদাগর-উপাখ্যানের শিল্পরূপের এই ধারাটিকে অর্থাৎ ওজরসাশ্রিত দ্বন্দ্বময় নাটকীয় ধারাটিকে আর কোনো কবি গ্রহণ করলেন না। সাহিত্যের এমন একটি সম্ভাবনাময় রূপসৃষ্টির পথ অস্পৃষ্টই রয়ে গেল। কিন্তু দীর্ঘ দিন পর পশ্চিমী সভ্যতাও সাহিত্যের সংসর্গে সঞ্জীবিত উনিশ শতকী নবজাগরণ-যুগে এই দীর্ঘ-উপেক্ষিত ধারার পুনঃপ্রকাশ ঘটেছে রঙ্গলালের পদ্মিনী-উপাখ্যানে, মধুসূদনের মেঘনাদ বধ কাব্যে, হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহারে।

সাধারণত মঙ্গলকাব্যগুলিতে কাব্যের সঙ্গে প্রচুর অকাব্যের মিশোল ঘটেছে। সেই ভূরিপরিমাণ জঞ্জাল থেকে বহুক্ষেত্রেই কাব্যকে উদ্ধার করা কঠিন। কিন্তু এ কাজ ততো কঠিন নয় মনসা-কাব্যে। শুধু যে এর লিরিক-অংশের সৌন্দর্যই আমাদের মুগ্ধ করে তা নয়, গল্পে স্থানে স্থানে আশ্চর্য সব কল্পনা-জাগানো ছবি ফুটেছে আধুনিক মনকেও যা স্পর্শ করে। লক্ষ্মীন্দরকে হত্যা করার জন্যে পাতালে মন্ত্রণা সভায় সর্পকুলের গোপন ষড়যন্ত্র, বিশ্বকর্মার লৌহবাসর নির্মাণ, অন্ধকার রন্ধ্রপথে মৃত্যুদূত কাল-নাগের ধীর সর্পিল গতিতে অলক্ষ্য প্রবেশ, সর্পাহত লক্ষ্মীন্দরের দুরবস্থায় বেহুলার বিমূঢ়, বিভ্রান্ত অসহায়তা, গাঙ্গুড়ের জলে ভেলার ভাসান, চলমান দুই তীরের অপস্রিয়মান বিচিত্র দৃশ্য এ সমস্তই এক আশ্চর্য চিত্রশালার সৃষ্টি করেছে। ছবিতে গানেতে মিলে মনসামঙ্গল শ্রোতৃ-মনের চোখ আর কানকে একেবারে ভরিয়ে তোলে।

আমরা দূরকালের লোক, পল্লীর সেই শ্রোতৃ-সমাকীর্ণ আনন্দবিষাদময় ভাসানগানের আসর থেকে নির্বাসিত। আমরা শ্রোতা নই পাঠক। প্রাচীন কবির পালাগানের পুঁথি কলরব-মুখর পল্লী প্রাঙ্গন থেকে আজ নীরব লাইব্রেরী ঘরে ছাপা বইয়ের ভদ্র সারিতে ঠাঁই নিয়েছে। তবু পরিবেশ-বিবিক্ত কাব্যের আস্বাদন নিরুচ্চার পাঠে সমাধা করলেও এর করুণ গীতরস আর অজস্র চলমান ছবি আমাদের আধুনিক মনকে স্পর্শ করে, নাড়া দেয়, একথা মানতেই হবে।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্য

পৌরাণিক চণ্ডী নয়, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের চণ্ডীর জন্ম মধ্যযুগের বাঙলার পল্লীতে। ইনি লৌকিক দেবী, এর জন্ম-ইতিহাস লেখা আছে কবির কাব্যেই। বাঙলা দেশের তৎকালীন রাষ্ট্রীয় বিপর্যয় ধর্ম ও সমাজ জীবনে যে বিভীষিকা জাগিয়েছিল, তার মধ্যে দিশেহারা বাঙালী হিন্দু কোথাও কোথাও একটু আশ্রয়ের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। বাস্তব সংসারে সে আশ্রয় না থাকায়

চণ্ডী এলেন কল্পলোকের অভয়ারূপে। মুকুন্দরামের কালকেতু-উপাখ্যানে ব্যাধের ভয়ে বনপশুদের দেবীর কাছে অভয় প্রার্থনার সুন্দর ছবিটিকে আমরা রূপক বলেই জানি।

চণ্ডীমঙ্গলের চণ্ডী মনসামঙ্গলের মনসার মতো ভক্তের কাছে অভয়া। কিন্তু ভক্তিহীনের কাছে ভীষণা। বলা বাহুল্য, দেবচরিত্র-চিত্রণে এ কৌশলও মঙ্গলকাব্যের কবিমাত্রেরই বিশেষ অধিগত। অন্যথায় দেবীর পূজা প্রচার অসম্ভব হয়ে ওঠে। অর্বাচীন দেবীকে শক্তি-মাহাত্ম্যে আকর্ষণীয় করে তুলতে হয়। কিন্তু প্রধান হলেও এটাই একমাত্র কৌশল নয়। প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িয়ে তাঁর বনেদী আভিজাত্য প্রমাণেরও দরকার পড়ে। তাই চণ্ডীমঙ্গলের কবিও লৌকিক দেবীকে প্রাচীন পৌরাণিক চণ্ডীর সঙ্গে যুক্ত করতে ব্যস্ত।

চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী মনসামঙ্গলের চেয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ, জটিল এবং বিস্তৃত। কালকেতু এবং ধনপতি সদাগরের উপাখ্যান কাব্য কাহিনীর এই দুটি ভাগ পরস্পর পরিপূরক নানা দিক থেকে। দেবী-মাহাত্ম্য কাহিনী দুটিতে দুভাবে চিত্রিত। একটিতে তাঁর অসাধারণ ক্ষমতায় ছোটকে বড় করার কাহিনী, অন্যটিতে রোষদীপ্ত ভয়ঙ্কর মূর্তির, প্রলয়াত্মিকা শক্তির রূপায়ণ। কালকেতু উপাখ্যানে সমাজের নিম্নস্তরের জীবন-চিত্র, আর ধনপতি সদাগর গল্পে বিত্তশালী প্রতিষ্ঠিত জীবনের ছবি।

চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের চণ্ডীমাহাত্ম্যের নির্মোকটি সরিয়ে নিলে এ কাব্য বিশুদ্ধ বাস্তব জীবনের কাব্য। কবি-দৃষ্টি সংসারের হাসি-কান্না, সুখ দুঃখ এবং অজস্র প্রাত্যহিক খুঁটিনাটির দিকে নিবদ্ধ, বিশেষ করে এর শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরামের রচনায়।

এদেশে জাতীয় ইতিহাস নেই বহুদিনের, বহুজনের এ অভিযোগ আজ অতি পরিচিত। কিন্তু পশ্চিমী পণ্ডিতের প্রতিধ্বনি এই যে মন্তব্য, এর অর্থহীনতা বাঙলাদেশের বিভিন্ন যুগের বিচিত্র কাব্য পড়লে ধরা পড়ে। কাব্যে যে জীবনেতিহাস লিপিবদ্ধ, এক হিসেবে তা পূর্ণতর, কেননা সে শুধু রাজনৈতিক চরিত্র ও ঘটনার বিবরণী মাত্র নয়। দেশের সামাজিক জীবন, ধর্মীয় পরিমণ্ডল, অর্থনৈতিক অবস্থা, এক কথায় জনজীবনের বিচিত্র দিকের ইতিবৃত্ত এ কাব্যে রূপ পেয়েছে। সংকীর্ণ নয়, আংশিক নয়, ইতিহাসের সমগ্র চেহারাটী কাব্যের আকারে এইভাবে দেশের ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে। বিদেশীয় দৃষ্টিতে অথবা বিদেশী ইতিহাস-পাঠে অভ্যস্ত এ দেশীয়ের চোখে ধরা না পড়লেও এগুলি ইতিহাস, জাতীয় জীবনের মূল্যবান দলিল। কবি কঙ্কণ চণ্ডী এই অর্থে বাঙলা দেশের ইতিহাস। এমনটি অন্যত্র দুর্লভ। নিচের মহল থেকে উপরের তলা অবধি সর্বসাধারণের প্রতিদিনকার জীবনের এমন নিখুঁত নিপুণ ছবি আর কেউ আঁকেন নি। এদিক থেকে আরো নানা দিক দিয়ে 'মুকুন্দরাম' এই নামটির মাহাত্ম্য আর সব চণ্ডীমঙ্গলকার মাণিক দত্ত, মুক্তারাম, ভবানীপ্রসাদ, কমললোচন, মাধবাচার্য সকলের মনকে এতোখানি আচ্ছন্ন করেছে যে রামায়ণে কৃত্তিবাস কিংবা মহাভারতে কাশীদাসের মতো চণ্ডীমঙ্গল বলতে আমরা মুকুন্দরামকেই বুঝি। এই কারণে আমাদের আলোচনা কবি কঙ্কণের কাব্যকে আশ্রয় করেই।

আগেই বলেছি চণ্ডীমঙ্গল মনসামঙ্গলের চেয়ে জটিল। কিন্তু শুধু জটিলই নয়, এর শিল্পরূপ একেবারে স্বতন্ত্র ধরণের। এতে না আছে বেহুলা-কাহিনীর গীতোচ্ছ্বাস, না আছে চাঁদ-উপাখ্যানের

নাটকীয় দ্বন্দ্বের তীব্রতা। এর শিথিল-গ্রথিত ভারালো রূপের গতি-মন্থরতা একেবারে অন্য জিনিস। এই রূপের কথায় পরে আসছি। তার আগে মুকুন্দরামের আর একটি বড় কৃতিত্বের কথা সেরে নি। আমরা যাকে বলি চরিত্র-রচনা, যে-জিনিসটি সে যুগের কাব্যে একটু দুর্লভই ছিল, মুকুন্দরামের রচনায় তার বিস্ময়কর নমুনা পাই। সেকালের পদাবলীতে শ্রোতাদের প্রধান উপভোগ্যে ছিল গীতিরস। মঙ্গলকাব্যে তারই সঙ্গে ছিল কাহিনীর আকর্ষণ। চরিত্রগুলো সেই কাহিনীর স্রোতে ভাসমান। গল্প থেকে স্বতন্ত্র হয়ে স্বয়ং সম্পূর্ণ মহিমায় দাঁড়াতে পারে এহেন চরিত্র কোটিকে গুটিক। কিন্তু মুকুন্দরাম এক ব্যতিক্রম। তাঁর ফুল্লরা, খুল্লনা, লহনা মুরারি শীল, ভাঁড়ু দত্ত এমন চরিত্র যারা শুধু গল্পের স্রোতে ভেসে না গিয়ে স্বতন্ত্র হয়ে দাঁড়াতে পেরেছে পাঠক-দৃষ্টির বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে। নিছক গল্প-পিপাসুকেও এরা উদাসীন থাকতে দেয় না। মঙ্গলকাব্যে এ জিনিসটি প্রায় নতুন। অবশ্য মুকুন্দরামের কাব্যেও একেবারেই চরিত্র ধর্ম নেই এমন চরিত্র আছে, সে চরিত্র দেবী চণ্ডীর, যাঁর আদেশেই কাব্য লেখা। মুকুন্দরামের এহেন অঘটন প্রথমটা বিস্ময় জাগালেও বেশ বোঝা যায় এর মূলে যে অভাব সে শক্তির নয়, ইচ্ছার। চণ্ডী যেন এ কাহিনীতে অনেকটা অবান্তরতায় পর্যবসিত। কবির আলোকসম্পাত মানুষের জীবনে। মাঝে মাঝে মূর্তি হয়ে এলেও চণ্ডী কাহিনীতে মানব জীবনের অলক্ষ্য অনির্দেশ্য নিয়ন্ত্রী-রূপে সমস্ত ঘটনাপুঞ্জের পটভূমিকায় অপসারিত। লেখকের আনন্দ মানুষ-সৃষ্টিতে।

কিন্তু 'লেখক চরিত্র-চিত্রণে পটু', মুকুন্দরাম সম্বন্ধে এই ধরণের মন্তব্য করতে অনিচ্ছা জাগে। কবি কঙ্কনের কাব্যে চরিত্রগুলি যেন চিত্রিত নয়, জীবন থেকে সশরীরে হাজির করা। কাব্য-কাহিনীর নির্দিষ্ট, সীমাবদ্ধ পরিসরের প্রয়োজনে মাপা-চালে কুণ্ঠিত পদচারণ এদের নয়, এরা বৃহৎ জীবনের খোলা হাওয়ায় বিচরণশীল, স্বাধীন, স্বচ্ছন্দ। আমরা যেন কাহিনীর জানালা দিয়ে এদের দেখতে পাই। কাব্য-কাঠামোর কৃত্রিম নিয়ন্ত্রণ এদের পঙ্গু করেনি। 'চিত্রিত' চরিত্রে একরকম কাগজের গন্ধ থাকে, এদের চরিত্রে আছে (রূপকথায় রাক্ষসের ভাষায় যাকে বলা যায়) 'মানুষের গন্ধ'।

চরিত্রের মতো একই অসাধারণ দক্ষতায় ফুটে উঠেছে দৃশ্যের পর দৃশ্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম খুঁটিনাটি নিয়ে। মনে হয় মুকুন্দরাম কল্পনা দিয়ে কিছুই দেখেন না, দেখেন চর্মচক্ষের জোরালো অনুবীক্ষণ-যন্ত্রে। গভীর অরণ্য, দরিদ্রের কুঁড়েঘর, রাজার প্রাসাদ সবই যেন লেখকের নখদর্পণে সমানভাবে। এমন কি শত্রুপুরীর অন্ধকার কারাকক্ষ ('এক-মুণ্ডা বন্দিঘর') সেও লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সুনিশ্চিত সঞ্চয়ের অন্তর্ভুক্ত।

> 'দিবসে দুপুরে তাহে ঘোর অন্ধকার।
> কিচিকিচি করে ছুঁচা মুষিকী মুত্তিকা।
> বহু কীট পোকা আছে উড্ডুষ মক্ষিকা॥'

এ যদি কল্পনা হয়, তবে এমন সর্বদেশী, সর্বস্পর্শী কল্পনার তারিফ করে বলতে হয় যে মুকুন্দরামের কল্পনায় রং নেই, আছে আলো। তীব্র টর্চের আলোর মতোই উদ্ভাসন তার কাজ।

অবশ্য কাব্যে যে তথ্যভার আছে তা সর্বত্রই যে কবিত্ব-রসে জারিত হয়ে উঠেছে এমন নয়। বরং বহু জায়গায় কাব্যের সঙ্গে অকাব্য সমপরিমাণে কিংবা হয়তো বেশি মাত্রাতেই আছে। এই হিসেবে মুকুন্দরামের রচনাকে বিরস এবং গদ্যাত্মক বলে ধিকৃত করা খুব সহজ বটে, কিন্তু এ কাব্যকে এভাবে দেখাই মস্ত ভুল। বিশুদ্ধ কাব্যের মাপকাঠিতে মেপে রসহীনতার দোষ দিলে শুধু যে রচনার প্রতি অবিচার হবে তা নয়, নিজের অরসিকতা ও দৃষ্টিভ্রমের পরিচয় দেওয়া হবে। সেকালে গদ্যজাতীয় কিছু সোজাসুজি লেখার চল ছিল না। সাহিত্য ছিল শ্রুতি-নির্ভর, গেয়। তাই গদ্যলেখককেও আত্মপ্রকাশ করতে হত কবির ছদ্মবেশে। তাঁর সৃষ্টিকে ত্রিপদী পয়ারের নামাবলী আর উপমা অলঙ্কারের ফোঁটাচন্দন পরে হাজির হতে হত শ্রোতৃ-সভায়। গদ্য লেখকের পক্ষে এ এক বিড়ম্বনা। আসলে মুকুন্দরাম গদ্যশিল্পী। তাঁর কলমটা গদ্যের কলম। এই সহজ সত্যটিকে মেনে নিলে আমাদের প্রত্যাশাও অসঙ্গত হবে না এবং কবিও অন্যায় অভিযোগ থেকে মুক্তি পাবেন।

অবশ্য এ কথা হাজারবার মানব যে সেকালের মঙ্গলকাব্যে এমন রচনা অজস্র আছে যার গদ্যাত্মকতা কাব্য রচনায় বিফলতাজনিত। অনড় কল্পনা, কায়ক্লিষ্ট মিল, গলদঘর্ম ভাষা সব জড়িয়ে এক জড়ত্বময় স্থবির রচনা ; ব্যর্থ কাব্য, তাই গদ্য। এবং সেই কারণেই সেই গদ্য আর্টের জগতের বাইরে। কিন্তু মুকুন্দরামের সৃষ্টি সে দলের নয়। এর জাত আলাদা। এ গদ্যাত্মক নয়, গদ্য—বিশুদ্ধ বলিষ্ঠ।

'দুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান।
আমানি খাবার গর্ত দেখ বিদ্যমান ॥

ধ্বনিহীন এই পংক্তিগুলি গদ্য জগতের অধিবাসী। অথবা কালকেতুর সেই বর্ণনা :

'শয়ন কুৎসিত বীরের ভোজন বিটকাল।
ছোট গ্রাস তুলে যেন তেঁয়াটিয়া তাল ॥'

স্বল্পবৃত্ত ক্ষীণতনু কাব্যে এ লাইনগুলি বিসদৃশ, কিন্তু উদার গদ্যরাজ্যে এদের স্বচ্ছন্দ বিহার, শব্দ ও চিত্রের রূঢ়তাটুকু যে-গদ্য সহজেই সয়।

একজন প্রবীণ প্রখ্যাত পণ্ডিত মঙ্গলকাব্যে উপন্যাসের পূর্বাভাস লক্ষ্য করে মুকুন্দরামকে ঔপন্যাসিকদের আদিপুরুষ বলেছেন। জনৈক আধুনিক কবি-সমালোচক এ নিয়ে পরিহাস কুটিল মন্তব্য করলেও কথাটি বাস্তব পরিহাসযোগ্য নয়। বলাই বাহুল্য এখানে অঙ্গ অথবা আঙ্গিকের স্থূল সাদৃশ্য খুঁজে বেড়ানোর ছেলেমানুষী অবশ্য-পরিহার্য। উপন্যাসের বেশ কয়েকটি মৌলিক স্বভাব-লক্ষণ সমগ্র মঙ্গলকাব্যে না হলেও মুকুন্দরামের রচনায় চোখে পড়ে। সাহিত্যের শাখাগুলিতে যদি প্রাণীজগতের জীবদের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তবে মনে গানের সঙ্গে পাখীর তুলনা সহজেই আসে। উভয়েই উড্ডুক্ষু। নাটককে দ্রুতগামী দৃঢ়কান্তি কোনো ভূচরের সঙ্গে মেলানো যায়। সে আকাশে ওড়ে না, কিন্তু মাটীতে তার চলাটা চলা নয়, ছোটা। লম্ফন, লঙ্ঘন যার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কিন্তু উপন্যাস সে যেন শ্লথগতি মেদভারগ্রস্ত বিপুল সরীসৃপ। সর্বাঙ্গে মাটি কামড়ে সে হাঁটে। মঙ্গলকাব্যেও ঐ সরীসৃপ জাতীয় উপন্যাসের সঙ্গে তার দেহের আর চালের মিল আছে।

কাব্যনাটকে যে খুঁটিনাটি উপেক্ষণীয়, অতএব ত্যাজ্য, উপন্যাস তাকেও ছাড়ে না, বরং সেখানেই তার সাগ্রহ মনোযোগ। মঙ্গলকাব্যেও এই প্রবণতা। গীতিকাব্য অজটিল, স্বল্পবৃত্ত। নাটকে জটিলতা থাকলেও তার সমস্ত জট কঠিন কেন্দ্রাকর্ষণে দৃঢ়সংস্থ, পরিচ্ছন্ন বিন্যাসে মসৃণ। 'বহু' সেখানে স্পষ্টভাবেই 'একের' নিয়ন্ত্রণাধীন। কিন্তু উপন্যাসে এবং মঙ্গলকাব্যেও শিথিলগ্রথিত উপকরণ-বহুলতায় একটা অনির্দিষ্ট ব্যাপ্তি আছে, যার ঐক্যভূমি দুর্লক্ষ্য।

মহাকাব্যেরও এ এক পরিচিত লক্ষণ। এবং অর্বাচীন শাখাদুটির সঙ্গে মহাকাব্যের প্রবল বৈসাদৃশ্য ও বিরাট দূরত্ব সত্ত্বেও এইখানে পরস্পর পরস্পরকে স্পর্শ করেছে। এই দিকে তাকিয়ে মনে হয় প্রাচীন মহাকাব্যের বিপুল শরীর কালে কালে অপভ্রংশতা-প্রাপ্ত হয়ে মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যে ও আধুনিক উপন্যাসে ক্রমপর্যবসিত। মহাকাব্য, মঙ্গলকাব্য ও উপন্যাস দূরাবস্থিত এই ত্রয়ী কোনো অস্পষ্ট জন্মরহস্যসূত্রে গ্রথিত, এ চিন্তা কল্পনাকে উত্তেজিত করে।

মুকুন্দরাম তাঁর চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে বিপুল বস্তুভারকে এক সঙ্গে গেঁথে নিয়ে অজস্র উপকরণের জুড়ি মিলিয়ে রচনাকে এক বৃহৎ ঐক্য দেবার দুর্লভ ক্ষমতা দেখিয়েছেন। তাঁর শিল্পরূপ বিশুদ্ধ কাব্যের মতো সরল, কোমল, পেলব কিংবা লঘুকায় নয়, তা জটিল, উপকরণবহুল, ভারগ্রস্ত। আগেই বলেছি যে শিল্প বস্তুর গদ্যশিল্প, ভাগ্যদোষে যুগপ্রভাবে ছদ্মবেশী। মুকুন্দরাম প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলাসাহিত্যে এইজাতীয় শিল্পকর্মের সেরা শিল্পী।

বিশ্ব সাহিত্যের মণিহারে পার্ল বাক্

বিভা সরকার

প্রভাতপদ্মে শিশিরবিন্দুর মতই পার্ল বাকের জীবন প্রাণরসে উচ্ছল—স্বনামধন্যা এই মহিয়সী মহিলা বিশ্বসাহিত্যের মণিহারে একটি উজ্জ্বল রত্ন। গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্না এই মমতাময়ী নারী মানব-জীবনের অন্ধকারতম অধোগতিও দেখেছেন, আবার দেখেছেন মানুষকে সেই পরম লগ্নে প্রতিষ্ঠিত যখন সে দেবত্বের অধিকারী, যখন তার মন প্রাণ জীবন সুন্দরের সাধনায় ধ্যানমৌন, তন্ময়।

মানুষকে তিনি তার দোষ-ত্রুটি ভাল-মন্দ সবকিছু নিয়েই দেখেছেন একান্ত মানব-দরদী সংস্কার মুক্ত মন নিয়ে। জীবনকে তিনি পরিপূর্ণ উপলব্ধি করেছেন। ধর্মপ্রাণ প্রেসবিটেরিয়ান যাজক পিতামাতার এই কন্যাটি জ্ঞানের তৃতীয় নয়নে সর্ব অভিজ্ঞতার মাঝখানে সত্যদ্রষ্টার মতই বিশ্বের জনসাধারণের সুখ দুঃখের কথা শুনিয়েছেন একান্ত দরদ ভরা মন নিয়ে। চিত্তের ঔদার্যে জাতি সম্প্রদায়ের উর্ধে বিশ্বনাগরিক তিনি। দেশ কাল বর্ণ ভেদের সংকীর্ণতা তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি।

অতি নগণ্য তুচ্ছাতিতুচ্ছ যে তার মাঝেও আছে কিছু না কিছু দেবত্বের বিকাশ, তিনি তারই অনুসন্ধানী। অতলান্ত জলধির গভীরে মুক্তানুসন্ধানী ডুবুরীর মতই তিনি মানব মনের গভীর গহনে ডুব দিয়ে দেখতে চেষ্টা করেছেন—তাঁর লেখনী তাই সার্থক।

তাঁর জননী ২৩ বছর বয়সে নববধূরূপে তাঁর ধর্মপ্রচারক তরুণ পিতার সহধর্মিণী হয়ে চায়না গিয়েছিলেন। এই চায়নার মাটিতেই তাঁর জননী জীবন মধ্যাহ্নে কিন্তু পিতা দীর্ঘজীবন সেবাব্রতে অতিবাহিত করে পরমধামে চলে যান।

পরপর তিনটি সন্তানকে চীনের 'ট্রপিক্যাল' অসুখে অকালে হারিয়ে তাঁর জননী একান্ত কাতর ও ভগ্নস্বাস্থ্য হয়ে পড়ায় ও ডাক্তাররা তাঁকে দেশে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করায় তিনি দু-বছরের জন্য পশ্চিম ভার্জিনিয়ায় চলে যান। পার্ল, এস বাকের জন্ম সেইখানেই ২৬শে জুন ১৮৯২ সালে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। তিনমাস বয়স থেকেই তিনি চীনের মাটিতে ইয়াংশি নদীর তীরবর্তী চুং কিয়াউ সহরে লালিত, তাই তার নাড়ীর টান সেখানের জলবায়ুতেই। ইয়াংশি নদীর প্রভাব তাঁর মনে অপরিসীম। তাঁর বাল্য স্মৃতি চীনা দাসদাসী ও প্রতিবেশীদের আদর ভালবাসায় পরিপূর্ণ। বাল্যশিক্ষা তাঁর আপন জননী ও একজন কনফুৎসিয়শের অনুগামী চীনা পণ্ডিত মিং কং-এর কাছে। আপন জন্মভূমি আমেরিকা সম্বন্ধে বাল্যে তাঁর সমস্ত জ্ঞানই তিনি মা'র কাছেই পেতেন আর তাঁর মাও দীর্ঘদিন চায়নায় প্রবাসী হয়ে মাসিক পত্র-পত্রিকার ওপরই দেশের খবরাখবরের জন্য নির্ভর করতে বাধ্য হতেন। মায়ের কাছে তিনি সকাল বেলায় আমেরিকার ইতিহাস ও সাহিত্য তা ছাড়া এনসিয়েণ্ট গ্রীস ও রোম সম্বন্ধে পড়াশুনা করতেন। বিকেলে মিং কংয়ের কাছে চীনার লেখা-পড়া শিখতেন। তাঁর জীবনে তাই ইউরোপ ও এশিয়ার সভ্যতা

সংস্কৃতির দুটি যুগল ধারা সমপ্রবাহিনী। রোমক দেবতা জেনসের মতই তাঁরও চিন্তাধারা দ্বিমুখী।

মিং কং তাঁকে যে সব উপদেশ শেখাতেন তার মধ্যে ছিল—কেউ যদি সুখী হতে চায় সে যেন তার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধাচরণ না করে, যে অন্য সকলকে ছোট করে নিজে বড় হতে চায় তার ধ্বংস একদিন না একদিন অবশ্যম্ভাবী—কিন্তু আজকের চীন এ আদর্শ, সহাবস্থানের এ নীতি একেবারেই ভুলেছে। জ্ঞানী কনফুৎশিয়স যে সব নিয়ম নীতি রচনা করে রেখে গেছেন মানুষে-মানুষে পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদানের জন্য অন্য চীনা ছেলেমেয়ের মত সেসব তাঁকেও পড়তে হত। আজকের চীন কনফুৎশিয়সের চীন থেকে অনেক দূরে—বাক বলছেন তাঁদের সেই পাহাড় উপত্যকাময় মনোরম বাল্যজগতে অর্থাৎ চায়নায় পুলিস বলে কিছু ছিল না। প্রতিটি পরিবার নিষ্ঠার সঙ্গে নিয়মানুবর্তিতা পালন করতেন। যদি কোনও অপরাধ ঘটে যেত পরিবারের প্রধানেরা বা কর্তারাই তার বিচার করতেন…এমনকি অপরাধ অনুযায়ী তাঁরা মৃত্যুর রায়ও দিতেন। পারিবারিক সম্মান রক্ষার জন্য ছোটদের কেমন করে আচরণ করতে হয় শেখানো হত। যদিও সাত আট বছর পর্যন্ত চীনারা আমাদের চাণক্য পণ্ডিতের উপদেশের মত পালয়েৎ রীতির প্রাধান্যই দিতেন। আট বছর বয়স থেকেই আরম্ভ হত আসল শিক্ষা। তখনকার চীনের রীতি-নীতি প্রায় আমাদের ভারতীয় রীতি-নীতিরই মতই ছিল। বাক বলেছেন—'বাল্যে আমাদের শেখানো হত—গুরুজনেরা আসন গ্রহণ করার আগে বসবে না, তাঁদের আহার গ্রহণ করার আগে খাবে না। তাঁরা চায়ের পাত্র হাতে তুলে নেওয়ার আগে চা পান করবে না। যথেষ্ট বসবার স্থান না থাকলে ছোটোরা দাঁড়িয়ে থাকবে আর বড়রা যতই পরিহাস করে কথা বলুন না কেন ছোটরা সব সময়ই যোগ্য সম্মানপূর্বক উত্তর দেবে।' তিনি বলেছেন, 'এ সব মানতে কি আমরা কষ্ট বোধ করতুম, একেবারেই না, কারণ আমরা মনে মনে জানতুম, একদিন আমরাও বড় হব।' বাক বলছেন—'আমার শৈশবের দিনগুলি যে অত্যন্ত নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে অতিবাহিত হয়েছিল তার জন্য আমি ধন্য।' একদিনের ঘটনার কথা বলতে তিনি বলেছেন, আমি আমাদের বড় গেটটা পেরিয়ে বিদ্যুৎগতিতে ছুটে পালিয়ে আসছিলুম, আমার মা জিজ্ঞাসা করেছিলেন ব্যাপার কি? আমি বলেছিলুম সৈনিক আসছে। মা বলেছিলেন তাতে কি? আমি তাঁকে বোঝাতে পারিনি কি এবং তিনি তাঁর আমেরিকান জগতে বাস করে আমার কথা বুঝতেও পারতেন না কিন্তু আমার ভিন্ন জগতে অর্থাৎ চীনা জগতে শেখানো হয়েছিল সৈনিক সভ্য মানুষের জীবন ও সমাজের রীতি-নীতি থেকে বিচ্ছিন্ন আর একজন বালিকার পক্ষে তার দৃষ্টির বাইরে থাকাই সমীচীন ও নিরাপদ। চায়না ভিখারী আতুরেপূর্ণ দেশ। কিন্তু সৈনিকেরা সেদিনের চীনা দৃষ্টিতে তাদের চেয়েও ভয়াবহ।' পার্ল বাকের এই উক্তিটি পড়ে আমার মনে পড়েছে ভারতবর্ষে বাল্যে আমরাও মা ঠাকুরমার মুখে গোরা সৈনিক সম্বন্ধে যেন এমনি ধারাই উক্তি শুনেছিলুম। বাল্যে শ্রীমতী বাকের খাবার টেবিলেও এক সমস্যা দেখা দিয়েছিল। তাঁর মা শেখাতেন আমেরিকান ভঙ্গিতে ছুরি কাঁটার ব্যবহার। বাবা চাইতেন ইংরাজদের মত ছুরী কাঁটার ব্যবহার আর তিনি নিজে একান্ত পছন্দ করতেন চপষ্টিক নিয়ে চীনা পদ্ধতিতে আহার করতে। আহার সামগ্রী তিনি তাঁদের জন্য যা দেওয়া হত তার চেয়ে তাঁদের ঘরের চীনা দাস দাসীদের খাদ্যই পছন্দ করতেন আর তাদের অংশীদারও হতেন মায়ের অগোচরে। বাড়ীর

চীনা দাসদাসীরা তাঁকে বরাবরই প্রশ্রয় দিত। বাকের জীবনে তাই এশিয়া ইউরোপের দুটি ধারা সম প্রবাহিনী। একটি জগৎ তাঁর মা-বাবার পরিচ্ছন্ন নীতিনিষ্ঠ যাজক সম্প্রদায়ের আমেরিকান জগৎ অন্যটি বৃহৎ ভালবাসায় ভরা নাতিপরিচ্ছন্ন কুসংস্কারময় চীনা জগৎ।'

বাক আরও বলেছেন 'আমি যখন চায়নায় তখন আমি চীনা ভাষায় কথা বলেছি তাঁদেরই মত আচার আচরণ করেছি, তাঁদেরই মত করে আহার করেছি, তাঁদের সুখ দুঃখ ভাবনা কামনার সম অংশীদার হয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ চীনা বলেই মনে করেছি। কিন্তু তারপর আমি যখন আমেরিকায় চলে গেছি তখন এই বিভক্ত দুটি জগতের মাঝের কবাট আমি বন্ধ করে দিয়েছি।' Ts'-a'-yun, অর্থাৎ সুন্দরী মেঘ নামে তাঁর মায়ের এক পালিতা কন্যা ছিলেন—এঁর চীনা জননী মৃত্যুশয্যায় বাকের জননীর হাতে এঁকে দিয়ে যান। বাকের পিতামাতাও মেয়েটিকে সন্তান-স্নেহে মানুষ করে তোলেন। এঁর ছেলেমেয়েরাই ছিল বাকের বাল্য সাথী—এই সব বাল্য সাথী ও অন্যান্য প্রতিবেশী খেলার সাথীদের কথা তিনি তাঁর ছোট্ট বই 'The Chinse children next door' এ আমেরিকান ছেলেমেয়েদের জন্য লেখেন। লোকমুখে যখন বাক শুনেছিলেন এই ছোট্ট বইখানি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু একসময় গান্ধীজীর রোগশয্যায় তাঁকে পড়ে শুনিয়েছিলেন আর এই কাহিনীগুলি শুনে তিনি হেসে আকুল হয়েছিলেন, মন তাঁর আনন্দে ভরে উঠেছিল। নিজের বাল্যের কথা বলতে তিনি বলেছেন—'সে সময় আমরাই বোধ হয় একমাত্র মিশনারী পরিবার যাঁরা চীনা অতিথিদের আমাদের সঙ্গে একই টেবলে খাওয়ার নিমন্ত্রণ জানাতুম। এর কারণ তাঁর পিতামাতা অত্যন্ত সুরুচি-সম্পন্ন উন্নতমনা ছিলেন বলেই জাতিভেদ বর্ণভেদের উর্ধ্বে উঠতে পেরেছিলেন। তাঁরা তাঁদের মতই সুশিক্ষিত চীনাদের তাঁদের সান্নিধ্যে আনতে চাইতেন। একজন অশিক্ষিত চীনাকে তাঁরা ততটাই অপছন্দ করতেন যতটা করতেন সেইরকম একজন ইউরোপীয়ানকে। এইভাবে আমরা মানুষকে জাতিসম্প্রদায়ের উর্ধ্বে তাদের চরিত্রের গুণাবলী ও বুদ্ধিমত্তা দিয়েই বিচার করতে শিখেছিলুম।'

তাঁর বাল্য স্মৃতিতে অন্যান্য চীনা মেয়েদের মতই মাঞ্চু রাজত্বের শেষ সম্রাজ্ঞী ডাওয়েগার মহারাণী আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিতা। তাঁর আট নয় বছর বয়সেই তিনি বুঝতে শিখেছিলেন মাঞ্চু আর চীনারা এক নয়। এই মাঞ্চুদের চীনারা পরম যত্নে রেখেছিল। তারা জানত এমনি করে সকল স্বাবলম্বন হারিয়ে সর্ব বিষয়ে ঠুঁটো জগন্নাথের মতই তারা চীনাদের ওপর নির্ভরশীল ও আত্মসুখে নিমগ্ন থেকে একেবারে অপদার্থ হয়ে পড়বে—তখন চীনারা তাদের গলিত শবের মতই দূরে নিক্ষেপ করবে। অস্ত্রউন্মাদনা চীনাদের যেন রক্তধারায় প্রবাহিত। নবীন ও প্রবীণদের সংঘর্ষ এই সময় হঠাৎ আরম্ভ হয়ে গেল—সম্রাজ্ঞীকে যখন প্রতিবিধান করতে হল, তিনি বিনা দ্বিধায় তৎক্ষণাৎ তাই করলেন। তাঁর পুত্র তরুণ মহারাজা বন্দী হয়ে একটি দ্বীপে প্রেরিত হলেন। বিরুদ্ধ পক্ষের ছয়জন সেনানী প্রধানকে হত্যা করা হল অন্য দুইজন পালিয়ে গেলেন। পাশ্চাত্যে শিক্ষাপ্রাপ্ত সেনাপতি Yuan-shri-kan, সম্রাজ্ঞীর পক্ষ অবলম্বন করলেন। এরপর বয়োজীর্ণ সম্রাজ্ঞী মারা যাওয়ার আগেই নবীন সম্রাট আততায়ীর হাতে নিহত হলেন সম্রাজ্ঞীরই দলের সঙ্কেতে।

ইংরাজেরা প্রথমে এতে খুশিই হয়েছিলেন—কারণ নবীনপন্থীদের তাঁরা ভাল চক্ষে দেখতেননা।

ইউরোপিয়ানরা বিশেষ করে ইংরাজদের তাঁরা চীনাভূমির গ্রাসকারী শত্রু বলে মনে করতেন। বিনা বিচারে সাদা মানুষদের হত্যা আরম্ভ হয়ে গেল এবং তাঁরাও সভয়ে শুনলেন বহু মিশনারীকে হত্যা করা হয়েছে। এই বক্সার (Boxar) যুদ্ধের বিভীষিকাই বাকের জীবনে প্রথম আতঙ্ক। চিংকিয়াং ছেড়ে জাহাজে করে তারা সাংহাই চলে যেতে বাধ্য হলেন। তাঁদের প্রায় সবই ফেলে যেতে হল তাঁর মা যখন চায়নায় বসবাস করতে আসেন, পশ্চিম ভার্জিনিয়া থেকে সঙ্গে করে কিছু রূপার বাসনপত্র এনেছিলেন। সে সব তিনি উঠানের একধারে পুঁতে রাখলেন গোপনে যদি ফিরে এসে নিতে পারেন এই ইচ্ছায়। এই ঘর ছেড়ে রেফ্যুজী হওয়ায় তাঁর বালিকামনে গভীর রেখাপাত করেছিলো—তিনি বলেছেন 'সেই প্রথম বুঝেছিলুম একজন আমেরিকান কিছুতেই চীনা হতে পারেন না চীনকে তিনি যতই ভালবাসুননা কেন আর চীনাদের পক্ষে আমেরিকাও সেই তার দেশ যেখানে তার পিতৃ পিতামহ বাস করে গেছেন।' বক্সার যুদ্ধে চীনারা নিদারুণভাবে হেরে যায় ১৯০০ সালে সাদা সৈন্যরা সম্রাজ্ঞীকে দারুণ শাস্তি দেয়। তাঁর প্রাসাদ ভেঙ্গেচুরে তচনচ করে। কুবেরের মত রত্নভাণ্ডার লুণ্ঠিত হয়।

তারা মনে করেছিলো যে শিক্ষা চীনাদের হল এরপর আর কখনও তারা শ্বেত জাতির বিরুদ্ধাচরণ করবে না কিন্তু সেটা যে কত বড় মিথ্যা পরে তা প্রমাণিত হয়েছিলো। অন্যায় দিয়ে অন্যায়কে জয় করা যায় না, সেটা ভবিষ্যতে আর একটা যুদ্ধের বীজই বপন করে। বাক বলেছেন 'চীনারা জাতি হিসাবে অত্যন্ত অভিমানী আত্মসচেতনজাত। তাদের চেয়েও শ্রেষ্ঠতর জাতি কেউ হতে পারে বলে তারা মানতে চায় না।'

বক্সার যুদ্ধের সেই দারুণ ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ দিনে—তিনি প্রথম পশ্চিম ভার্জিনিয়ার তাঁর জন্মস্থান ও পিতামহের গৃহে যান। আমেরিকাতেও তখন গণ্ডগোল। প্রেসিডেণ্ট ম্যাকিং নাকি আততায়ীর হাতে মারা গেছেন—সমস্ত আমেরিকাবাসীর মনে বেদনার অন্ধকার ছায়া—তাঁর ঠাকুর্দার মুখে এই হত্যা সংবাদ শুনে তিনি কেঁদে উঠেছিলেন। তাঁর ঠাকুর্দা ঠিক বুঝতে না পেরে তাঁর মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কি হল? কিন্তু তাঁর মা ঠিক বুঝতে পেরেছিলেন কিসের বেদনায় সেই কচি মেয়েটি কাতর হয়ে কেঁদে উঠেছিল।

এরপর তাঁরা আমেরিকার বহু প্রদেশ ও সহর ঘুরে আবার চায়নায় ফিরে আসেন। আমেরিকার নৈসর্গিক শোভা নদনদী পাহার জলপ্রপাত তাঁর শিশুমনে যাদুর মায়া বুলিয়ে দিয়েছিল, তিনি আপন মাতৃভূমিকে ভালবেসে ফেলেছিলেন।

চায়নায় ফিরে আবার পূর্বজীবন আরম্ভ করে প্রথম যেদিন তিনি মিংকং-এর কাছে পড়তে বসেন তাঁর কেমন যেন সন্ত দেখে আসা আপন ঠাকুর্দার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। বারবার তাঁর মনে হয়েছিল এই দুটি মানুষের দেখা হয়ে গেলে তাঁরা পরস্পরের শ্রদ্ধা ও সমাদর না করে পারবেন না। তাঁদের চিন্তাধারা মানবতা বোধ তাঁদের মাঝের যে চায়না আমেরিকার ব্যবধান তা আপনি ভেঙ্গে দেবে। তিনি দুঃখ করে বলছেন—মানুষ যদি মানুষকে ভাববাসতে পারত তা হলে কী পার্ল হারবারের বেদনাময় ঘটনা ঘটত না আমেরিকান যুদ্ধ বন্দীদের কম্যুনিষ্ট চায়না থেকে আহত পীড়িত অবস্থায় ফিরে যেতে হ'ত। মানুষের ভুল বোঝাবুঝিই সকল অনর্থের মূলে।

দশ বছর বয়সেই উপন্যাস লেখিকা হবেন ঠিক করে ফেলেছিলেন, যদিও তাঁর শিক্ষক তাঁর দারুণ সংশয় সৃষ্টি করেছিলেন—মিং কং এর মতে উপন্যাস রচনা অতি নিকৃষ্ট রচনা। একে সাহিত্যের পর্যায়ে স্থান দেওয়া যায় না। উপন্যাস মূর্খ কুঁড়েদের আনন্দ বর্ধন করে—তাঁর এই মতবাদের সঙ্গে তাঁর যাজক পিতামাতার মতবাদও মিলে যেতো। তাঁর মায়ের সঙ্গে এই নভেল নাটক পড়া নিয়ে তাঁর বড মজার লুকোচুরি খেলা চলতো। বাড়ির যত নভেল তিনি প্রাণপণ নিত্য নতুন জায়গায় লুকিয়ে রাখতেন আর বাকও সেই সব বই খুঁজে বার করে পড়ে তবে থামতেন। মুখে কিন্তু কেউই কাউকে কিছু বলতেন না—এর জন্য কিন্তু তাঁর মায়ের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ ছিল না, যাকে তিনি অত্যন্ত ভাল বাসতেন। বাক দুঃখ করে বলেছেন বড় হয়ে মা যে কেন এমন সহজ জায়গায় বই লুকোতেন এ কথা জিজ্ঞাসার সুযোগ পাবার আগেই তিনি আমাদের ছেড়ে অকালে চলে গেলেন। মিং কং ও মা বাবার উপন্যাসের বিরুদ্ধমতের প্রভাব তাঁর মনে এত গভীর রেখা পাত করেছিলো যে তিনি 'গুড আর্থ'এর মত বই লিখেও, সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম প্রকাশ উপন্যাস ছিল বলে মনে মনে সঙ্কোচ বোধ করেন। বাকের মনে চালর্স ডিকেন্সের প্রভাব অত্যন্ত গভীর, এঁর বইগুলি তিনি বার বার পড়েছেন—অলিভার টুইষ্ট তাঁর পড়া প্রথম উপন্যাস।

১৯১০ সালে ১৭ বছর বয়সে তিনি দক্ষিণ আমেরিকার ভার্জিনিয়া সহরের র‍্যানডলস মহিলা কলেজে ভর্তি হন। চায়না থেকে আমেরিকায় আসার আগে তাঁরা তাঁর মায়ের বিশেষ ইচ্ছায় সমস্ত ইউরোপ ও রাশিয়া ঘুরে আসেন। তাঁর মা সুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী ও ইংল্যাণ্ডকে পছন্দ করতেন, বিশেষ করে তিনি একবার হল্যাণ্ডে যেতে ইচ্ছুক হয়েছিলেন যেখান থেকে তাঁর পূর্বপুরুষেরা আমেরিকা যান। তাঁর মা যাত্রার আগে সঙ্গীত-শিল্প ও ইতিহাসের বাছা-বাছা বইয়ে একটি ট্রাঙ্ক পূর্ণ করে নেন আর সমস্ত পথ তাঁরা এসব বই পড়ায় ও আলোচনায় অতিবাহিত করেন; ফলে ইউরোপের মাটীতে পা দেওয়ার আগেই তাঁর সে সব দেশ ও দেশবাসীদের বিষয় যথেষ্ট জ্ঞানলাভ হয়ে যায়। কোনও কারণে তাঁর মা জর্মানীর ওপর বীতরাগ ছিলেন কিন্তু তাঁর বাবা সে অভাবও পূর্ণ করেন। তিনি ছিলেন জর্মান-ভাষায় সুপণ্ডিত, তাছাড়া তার পূর্বপুরুষেরা দক্ষিণ জার্মনীর কোনওখান থেকে আমেরিকায় গিয়েছিলেন। বিপ্লব পূর্বরাশিয়ার যে ছবি তিনি দেখেছেন জনতার যে দুঃখপীড়িত দরিদ্ররূপ দেখেছিলেন সারা বিশ্বে বুঝি কোথাও তার তুলনা হয় না। রাশিয়ার জনসাধারণকে দেখে তিনি হতবাক হয়েছিলেন, পরে মস্কোয় তিনি রাশিয়ান ধনী ও যাজক সম্প্রদায়ের ঐশ্বর্যও দেখেছিলেন। মানুষের প্রতি মানুষের অসাম্য ব্যবহার তাঁর বাকি যাত্রা পথটুকু চিন্তাভারাক্রান্ত করে। অতি ভদ্র মার্জিতরুচি ইউরোপীয়ান জনসাধারণকে দেখে তাঁর বারবার মনে হয়েছিল—এঁদের প্রতিনিধিরা এশিয়ার মাটিতে এঁদের যে ধ্বংসের পথ দ্রুত সুগম করে চলেছে সে সম্বন্ধে কোনও ধারণা বা জ্ঞানই এঁদের নেই। সাধারণ ইউরোপীয়ানরা এই অত্যাচার ও অন্যায় সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ।

পার্লবাকের জীবন কথা বলতে গেলে সারা বিশ্বের কথা এসে যায় এখানে তা সম্ভব নয়। কলেজজীবনে বাক তাঁর জন্মভূমি আমেরিকাকে ভালবেসে ফেলেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য হয়েছিলেন বিশ্ব ও বিশ্ববাসীর সম্বন্ধে তাঁর সহপাঠিদের একান্ত কৌতুহলের অভাব ও অজ্ঞতা দেখে।

পাঠ্যাবস্থায় তিনি তাঁর ক্লাশ-এর প্রেসিডেন্ট হবার সম্মান অর্জন করেন ; এ ছাড়া ছোট গল্প ও কবিতার প্রতিযোগীতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন—সেই তাঁর সাহিত্যিক জীবনে প্রথম প্রকাশ। পাঠ্যজীবন শেষ করে বছরখানেক শিক্ষকতার পর মায়ের অসুস্থতার জন্য তিনি চায়না ফিরে এসেছিলেন যদিও তখন তাঁর মনের ইচ্ছা আমেরিকায় থেকে আপন দেশকে জানার ও সেবার জন্যই ইচ্ছুক হয়েছিল। পিতামাতার মত যাজকতা তাঁর একেবারেই প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। উপদেশ দিয়ে কাউকে আপন ধর্ম পরিবর্তত করতে বলার মনোবৃত্তি তাঁর একেবারেই নেই।

চায়নার মাটিতে পা দিয়ে মাকে দেখে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন। তাঁর মা তখন চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রতিবিধানহীন চায়নার এক দুরারোগ্য 'ট্রপিক্যাল' অসুখে ভুগছিলেন। বাক বলছেন 'বাল্যে আমি আমার সমস্ত ভালবাসা মার জন্যই উজার করে দিয়েছিলুম। পিতামাতা দুজনকেই আমি ভালবাসতুম, কিন্তু মায়ের প্রতি ভালবাসা যেন আমার অস্থি মজ্জার মতই গভীর ছিল।' মায়ের প্রতি গভীর ভালবাসার শ্রদ্ধাঞ্জলি 'দি এক্সাইল্' নামে বইখানি। এইটিই তাঁর প্রথম লেখা বই যদিও প্রকাশিত পুস্তকের সপ্তম স্থান এটি অধিকার করে। এ ছাড়া 'ফাইটিং এ্যাঙ্গেল' ও 'দি এক্সাইল্' তাঁর পিতামাতার জীবন-চরিত।

এই সময় ১৩ই মে ১৯১৭ সালে তিনি Dr. John Lossing Buck নামে একজন Agricultural Missionaryকে বিয়ে করেন—এর কিছুদিন পরেই তাঁর মা মারা যান। তাঁরা তিনটি ভাই বোন—দাদাই তাঁদের মধ্যে সবার বড় ছিলেন। এ বিবাহে তাঁর পিতামাতার মত ছিল না। তাঁরা তাঁর স্বামীকে বুদ্ধিমত্তার দিক দিয়ে তাঁদের পরিবারের সমগোত্রীয় মনে করতেন না। স্বামীর সঙ্গে তিনি পশ্চিম চায়নায় চলে যান। ১৭ বছর বাক এঁর সঙ্গে ঘর করেন। এঁর জগত ছিল একেবারেই চীনা চাষীদের মাঝখানে—এই বিবাহের ফলস্বরূপ আমরা 'গুড্ আর্থ'-এর মত বই পেয়েছি। ১৯৩১ সালে প্রকাশিত হয়ে 'গুড্ আর্থ' ২১ মাস বেষ্ট সেলার হয়েছিল এবং পুলিট্জার প্রাইজ পায়। ৩১টি ভাষায় এর অনুবাদ হয়েছে এবং সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে। 'গুড্ আর্থ' 'সন্স্' ও 'এ হাউস ডিভাইডেড্' এই তিন খণ্ডে এ উপন্যাসটি সম্পূর্ণ।

বাক এর জীবনের অত্যন্ত বেদনাময় ঘটনা তাঁর একমাত্র কন্যার অসুস্থতা। 'The child who never grew' বইখানিতে এ সম্বন্ধে বড় দরদভরা ভাষায় বাক গভীর বেদনায় ভাগ্যের এই বিড়ম্বনার কথা প্রকাশ করেছেন। ১৯২৫ সালে তিনি তাঁর কন্যাকে নিয়ে আমেরিকার চলে যান। এই বোধশক্তিহীন মেয়েটিকে নিয়ে তাঁর উদ্বেগ উৎকণ্ঠার অন্ত ছিল না। একে নিয়ে তিনি ডাক্তারদের দোরে দোরে বৃথা আশায় দিনের পর দিন ব্যর্থ হয়ে ফিরেছেন। এই সময় তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'A China Woman speak's', এশিয়া ম্যাগাজিনে ১৯২৬ সালে প্রকাশিত হয়। এই লেখাটির জন্য প্রাপ্ত ১০০ ডলার তখন তাঁর সাংসারিক প্রয়োজনে বিশেষ সহায়তা করে। এরপর এরই দ্বিতীয় খণ্ডটি আরম্ভ করেও শেষ করতে দেরী হয়ে যায়। ছোট অক্ষম মেয়েটিকে দেখাশুনা, ঘরের কাজ ও কলেজের পড়া নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে থাকতে হত। অর্থ রোজগারের পন্থা হিসাবে তিনি University Essay Compitionএ যোগ দিয়ে প্রথম পুরস্কারস্বরূপ ২০০ ডলার পান। আর A China Woman speak'sএর দ্বিতীয় খণ্ডটির রচনা সমাপ্ত

করে Asia Magazineএ দেন ও সেটিও গৃহীত হয়। সেই গ্রীষ্মেই তিনি আবার চায়নায় ফিরে যান তাঁর অনাথ পালিত শিশুদের প্রথমটিকে নিয়ে। তাঁর আপন অসুস্থ কন্যাটি ছাড়াও এবারে এই তিন মাসের রুগ্ন শিশুটির ভারও তাঁকে নিতে হয়। ১৯২৬-১৯২৭ চায়না গৃহযুদ্ধে বিক্ষুব্ধ। সান-ইয়াৎ-সেন নির্বাচিত ন্যাশনালিষ্ট নেতা চিয়াং-কাই-শেকের বিরুদ্ধে কম্যুনিষ্টদের সংঘর্ষ আরম্ভ হয়ে গেছে'। এই কম্যুনিষ্টদের সম্বন্ধে সঠিক কেউ কিছু জানত না। তাঁর ছোট বোন স্বামী সন্তান হুনানে বাস করছিলেন। কম্যুনিষ্টদের উৎপাতে তিনিও নানকিংএ তাঁর কছে চলে এলেন কিন্তু সেখানেও সেই দুর্যোগ এসে উপস্থিত হল। ১৯২৭এর ২৯শে মার্চ সকালের একটি দৃশ্য তিনি আজও মানসনেত্রে দেখতে পান—একটি ইঁটের বাড়ীর সামনে দুটি মহিলা একজন একটি শিশুর অন্যজন ২টি শিশুর হাত ধরে দুজন প্রবীণ ও একজন অত্যন্ত সম্রান্ত বৃদ্ধ দিশাহারা হয়ে মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে তাকিয়ে বাড়ির সামনের লনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। 'কোথায় আমরা লুকাবো?' এই প্রশ্নই তাঁরা কানাকানি করছিলেন। মহিলা দুটি ছিলেন তিনি আর তাঁর বোন, পুরুষ দুজনা তাঁদের স্বামীরা আর বৃদ্ধটি তাঁর বাবা। দূর থেকে গণ্ডগোল ও চিৎকারের শব্দ ভেসে আসছিল—পরস্পরের দিকে অসহায় ভাবে তাকিয়ে সন্তানদের তাঁরা আরও দৃঢ়মুষ্টিতে চেপে ধরেছিলেন। তাঁর পিতার ঠোঁট নড়ছিল। এমন সময় বাগানের কোণার ছোট গেট খুলে বস্তিবাসিনী মিসেস্ লী বরাভয় দান করে দেবদূতের মতই তাঁদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন আর সেই মহাদুর্যোগের দুইটি দিন আপন নগণ্য কুঁড়ের মধ্যে আশ্রয় দিয়ে রক্ষা করেছিল। একসময় বাক এই মহিলাটিকে তার দুর্দিনে আশ্রয় দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। শ্রীমতী বাক সেই অতি দরিদ্র অতি অশিক্ষিতা নগণ্য মিসেস্ লী-র মধ্যে অপরাজিত মানুষকে দেখেছিলেন যার মধ্যে মানুষের দিব্যরূপ দেদীপ্যমান। তৃতীয়দিন যখন তাঁদের আততায়ীরা দরজা খুলে বেরিয়ে আসতে বলেছিল, তিনি গোপনে তাঁর শেষ সম্বল সোনার হাতঘড়িটি মিসেস্ লী-র বালিশের তলায় লুকিয়ে রেখে দিয়ে শিশুকন্যা দুটির হাত ধরে সবার আগে দৃঢ়পদক্ষেপে বেরিয়ে এসেছিলেন। দুই ধারে তাঁরা তাঁদের দাসদাসী ও পরিচিত চীনা বন্ধু-বান্ধবদের বিষণ্নভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন তাদের মধ্যে মিসেস লীও ছিল যার দুই গণ্ড চোখের জলে ভেসে যাচ্ছিল।

আগন্তুকরা তাঁদের ইউনিভার্সিটি বিল্ডিং-এ যেতে বললে পথে যেতে অন্ধকারে তাঁর ছোট মেয়েটি একজন সৈনিকের সঙ্গে ধাক্কা খাওয়ায় সঙ্গীন উঁচিয়ে রেগে সে মেয়েটির দিকে তেড়ে আসে। তিনি সেই সৈনিকটির কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হয়েছিলেন এই অবোধ বালিকাটির জন্য ঠিক যেমন করে আর একটি বিপ্লবের সময়ে তাঁর বাল্যে তাঁর মা ক্ষমা চেয়েছিলেন তাঁরই জন্যে। সেই নিদারুণ রাত্রিটা তাঁরা সেইখানে অন্য বহু ইউরোপীয়ানদের সঙ্গে কাটিয়ে ব্রিটিশ যুদ্ধ-জাহাজে করে সাংহাই-এর পথে যেতে পেরেছিলেন। চীন থেকে পালিয়ে তিনি জাপানে নাগাসাকিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তিনি বলছেন "আজও আমার মনে সেই দিনটি উজ্জ্বল হয়ে জেগে আছে যেদিন পার্লহারবার এর বোম্বিং-এর পর আমার নিউইয়র্ক এর পড়ার ঘরে চুপ করে বসেছিলুম আর 'Yasno kuniyoshi' জাপানের প্রখ্যাত শিল্পী আমার ঘরে এলেন। তিনি আসতেই আমি উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে সাদর সম্ভাষণ ও সম্বর্ধনা জানিয়ে বসতে বললুম। নীরবে তিনি

আমার সামনের আসনে বসলেন, তাঁর দুই গণ্ড বেয়ে বেদনার অশ্রু ঝরে পড়তে লাগলো, তিনি সে অশ্রু মুছলেন না নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। বহুক্ষণ পর মৃদু স্বরে বললেন, আমাদের দুটি দেশ। এর বেশী আর কিছু তাঁর রুদ্ধ গলা থেকে বেরুল না। আমি বললুম, জানি। আরও বললুম, যাই হোক না কেন আমাদের জনসাধারণ কখনও পরস্পরের শত্রু নয়।'

এই সময় বাক আবার চায়নায় ফিরে যান চিয়াং-কাই-শেক তখন চায়নার নায়কদের স্থান অধিকার করেছেন। প্রতিদিন তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ করে তাঁর তেজস্বিনী আমেরিকায় লালিতা তরুণী ভার্য্যার বিষয়ে নানা কাহিনী শুনতে পেতেন। আচার আচরণে প্রায় বিদেশিনী জন্মসূত্রে চীনা হলেও এই মহিলাটি না জানতেন ভালকরে চীনা না চায়নার ইতিহাস। চিয়াং নিজে ছিলেন সেকালপন্থী তাই কেমন করে তিনি এই স্পষ্টভাষিণী আধুনিকা স্ত্রী নিয়ে ঘর করতেন এ নিয়ে লোকের কৌতুহলের শেষ ছিল না। এই সময় একদিন তিনি গুজব শুনে জনতার সঙ্গে গিয়ে দেখলেন দৈত্যাকার এক যন্ত্রের দ্বারা জনতার হাহাকারের মধ্যে চীনাদের পিতৃপিতামহের পুরাতন মাটির ঘর বাড়ি ভেঙ্গে তচনচ করা হচ্ছে। নতুন শাসকগোষ্ঠি দেশকে পরিচ্ছন্ন ও আধুনিক করে সাজাতে ব্যস্ত কিন্তু মানুষের মনের হাহাকার ভিটের মমতা যারা বুঝলো না, টাকা দিয়ে যারা মানুষের স্মৃতি আর বহুকালের বংশ পরম্পরার ঐতিহ্যের ঋণ শুধতে চায় তাদের বলার কিই বা ছিল এঁরা নিজেরাই নিজেদের সমাধি খনন করছে দেখে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে তিনি আপন ঘরে ফিরে এসেছিলেন।

১৯৩১ সাল বাকের জীবনে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ—এই সময়ে যুগপৎ সুখ দুঃখের ঢেউ এসে বেজেছে তাঁর মনে। এই সময়ে চীনের পীতনদীর দারুণ জলপ্লাবনের পর জাপানের মাঞ্চুরিয়া অধিকার করে নেওয়ায় আর শান্তির কোন আশাই রইল না। বাক তখন প্রবীণ চীনাপণ্ডিত মিং লুং-এর সহায়তায় Shui-Hu Chean 'All men are brothers' বা 'আমরা সবাই ভাই' অনুবাদ করছিলেন। মিং লুং উদ্বেগের সঙ্গে বারবার বাককে প্রশ্ন করতেন—জাপানের মাঞ্চু অধিকারের গুরুত্ব কি ইংরাজ আমেরিকানরা বুঝতে পারছেন না? এ যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ বপন করা হচ্ছে। বাকের কাছে সে বছরের সবার বড় দুঃখদায়ক ঘটনা তাঁর পিতার মৃত্যু। এরপর চায়নার মাটিতে শান্তি পাওয়া অসম্ভব জেনে এবং আপন কন্যাটিকে কোনও সুযোগ্য আবাসিক স্কুলে ভর্তি করার উদ্দেশ্যে তিনি একরকম চায়না ত্যাগ করে স্থায়ী বসবাসের জন্যই আমেরিকায় চলে যান। এই বছরই তাঁর Good Earth বইটি প্রকাশিত হয়। 'All men are brothers' ১৯৩৩ সালে ও The mother ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত হয়।

১৯৩২ সাল, আমেরিকার পক্ষে দারুণ আর্থিক দুর্যোগের সময়। এই সময় নিউইয়র্ক-এ নিগ্রো শিল্পীদের আঁকা একটি শিল্পমেলা দেখে তিনি যে মন্তব্য করেন তা থেকে আমরা মানুষ বাককে দেখতে পাই—দেখতে পাই তাঁর একান্ত দরদভরা বিশ্বপ্রেমিক নীতিনিষ্ঠ মনটিকে। তাঁর চিত্ত ঔদার্য বিশ্বে বিরল। হৃদয়ের ঐশ্বর্যে তিনি আমাদের প্রণম্য। একান্ত কৌতুকবসে এই চিত্র-প্রদর্শনী দেখতে গিয়ে তিনি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। কল্পনাতীত বেদনার সে সব ছবি দেখে তিনি বলছেন 'আমি দেখলুম দুঃখভরা বিষণ্ণ ম্লান পাণ্ডুর শিশুরা—আবর্জনাময় অন্ধকার সব

গলি আর দারিদ্রপীড়িত লাঞ্ছিত জনতার ছবি। আজও পরম সহিষ্ণু সব ম্লান মূঢ় মুখে দেখলুম মানবতার চরম অপমান। দর্শক জনতার মধ্যে সাদা কালো দুই ছিলেন। তাঁদের মধ্যে আমি শিক্ষিত বুদ্ধিদীপ্ত আত্মসচেতন নিগ্রো নরনারীকে দেখে তাদের কাছে এই সব ছবির তাৎপর্য জানতে চেয়েছিলেম—জবাবে তাঁরা বলেছিলেন 'যা আমি দেখছি এই তাদের জীবনের প্রতিচ্ছবি। বর্ণ বিদ্বেষে তাদের আলাদা করে রাখা হয়েছে। সভ্য মানুষের নাগরিক জীবনের সমস্ত সুযোগ সুবিধা থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়েছে আর বিনা বিচারে কথায়-কথায় বেত্রাঘাত তাদের জীবনের নিত্য পুরস্কার। এই অপ্রত্যাশিত আঘাত থেকে আমি কোনও দিনই আর মুক্ত হতে পারিনি—আমার মর্মান্তিক বেদনার কারণ এই নয় যে এর কোনটাও আমার নিজেকে ভুগতে হয়েছে, আমার মর্মজ্বালা এইজন্য যে এই সব অত্যাচারী অনাচারীরা আমার জাতভাই। সেইদিন সেই সব ছবির সামনে দাঁড়িয়ে মনের দুঃখে আমি আকুল হয়ে কেঁদেছিলুম আর উপস্থিত শ্রোতাদের আমি কি বলেছিলুম আর কি না বলেছিলুম আজ আর আমার সে কথা মনে নেই। আমার বক্তব্য শেষ করেই আমি আমার ঘরে পালিয়ে এসেছিলুম—দারুণ অন্তর্দাহে আমি কয়দিন ঘরের বার হইনি, কারও সঙ্গে কথাও বলিনি কারও মুখও দেখতে ইচ্ছে করেনি—তারপর আত্মস্থ হয়ে আমি বুঝেছিলুম যে অত্যাচার ও অনধিকারের দায়ে শ্বেতজাতি Colonial Asia-তে কলঙ্কজর্জরিত আমার আপন আত্মপরিজন অর্থাৎ আমেরিকানরা নিগ্রোদের প্রতি সম অপরাধে অপরাধী।' মহীয়সী বাক ছাড়া এমন করে আত্মবিশ্লেষণ কয়জনে পারে ?

১৯৩৮ সালে তিনি সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পান। এই পুরস্কার গ্রহণ করতে তিনি সুইডেন-এ যান, আমন্ত্রণ নিমন্ত্রণ সম্মান সমাদরে ভরে গিয়েছিলো তাঁর দিনগুলি। Sweden রাজের নিমন্ত্রিত সম্মানিত অতিথি হয়ে রাজদরবারে প্রবেশ করার বিষয়ে তিনি বলছেন, রাজকীয় জাঁকজমকে সজ্জিত দরবার ঘরে ঢুকে তিনি দেখলেন অকাদেমীর সম্মানিত অতিথিরা অর্ধচন্দ্রাকারে সাজানো আসনে বসে আছেন—প্রথম সারিতে মণিমাণিক্যের ঝলক খেলিয়ে বসে আছেন রাজপরিবার। গেলারি থেকে ভেরী বাজছিল। প্রথম সারির বাঁ-দিকের শেষ আসনে গিয়ে তিনি বসলেন। সুইডিশ ভাষায় প্রথম বক্তৃতাটি আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। তিনি বলছেন 'আমি কিছুই বুঝছিলুম না আর সেই সুযোগে আমি আমার পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হতে পেরেছিলুম। আধঘণ্টা পরে আমি বয়োবৃদ্ধ সম্ভ্রান্ত রাজার সামনে পুরস্কার নিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম। রাজার মুখের দিকে চেয়ে আমি চমকে উঠেছিলুম। আমি তখন রাজার মুখে আমারই বৃদ্ধ পিতার মুখচ্ছবি দেখলুম যিনি বহু পূর্বে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। দুজন মানুষ যে এমন অবিশ্বাস্যভাবে একে অন্যের প্রতিচ্ছবি হতে পারেন এ না দেখলে বোঝা যায় না। তেমনি দীর্ঘ একহারা গঠন তেমনি পাতলা মুখ, কঠিন চিবুক, নীল শান্ত দৃষ্টি তেমনি ঠোঁটের দু পাশ দিয়ে শ্বেত-গুম্ফ। ঠোঁটের গঠনটিও তেমনি এমনকি সেই হাতটি যেটি পুরস্কার ধরে রেখেছে সেটিও একেবারেই যেন আমার পিতার হাত দুখানি। আমি এমনই বিহ্বল হয়ে পড়েছিলুম যে রাজাকে ধন্যবাদ জানাতেও ভুলেছিলুম। ঘরে এসে আমি আমার বাবার ছবি দেখিয়ে স্বামীকে বলেছিলুম তিনিও দুজনার মিল দেখে আশ্চর্য হয়েছিলেন। এ ঘটনা যদিও দৈবাতই ঘটেছিল তবু আমার জীবনের সেই পরম লগ্নে এমন করে

বাবার অস্তিত্ব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বহুকাল আগে আমার বাবার আর রাজার দুজনার পূর্বপুরুষ জার্মনীর একই জায়গা থেকেই এসেছিলেন হয়ত এর মধ্যে তার কোনও সম্বন্ধ থাকতে পারে।

বাকের জীবনকথা বলতে গেলে অনেক কথাই এসে যায়। প্রায় ৩৫ খানি বড়দের ও খান বারো ছোটদের বই তিনি লিখেছেন। ১৯৪১ সালে তিনি The East & The West Association এর পত্তন করেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে মৈত্রী বন্ধনে বাঁধতে কিন্তু বছর দশেক পর ১৯৫১ সালে কিছুটা নিরাশ হয়ে তিনি এই মিলন সভা বন্ধ করে দেন। এবং এই একই কারণে তিনি Asia Magazineও বন্ধ করে দেন আজকের ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ যুগে মানুষে মানুষে সদ্ভাবে বসবাস অসম্ভব মনে করে। ১৯৫১ সালে U. S. Academy of arts & letters এর আজীবন সভ্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৫ সালে I. L. Buch কে পরিত্যাগ করে সেই বছরেই তাঁর Publisher John Co.-এর Mr. R. I. Walshকে বিবাহ করেন। এই নতুন গৃহকে অনাথ আশ্রম বললে অত্যুক্তি হবে না। পরপর ৫টি বাপ পরিত্যক্ত Asiatic-American অর্থাৎ যাদের পিতামাতার একজন এশিয়াবাসী ও অন্যজন আমেরিকান এমন শিশুকে গ্রহণ করে তারা লালিত করেন। অনাথ শিশুদের জন্য মন তাঁর চিরদিনই কেঁদেছে। আমেরিকার বৃহৎ-অনাথ আশ্রম তারই চেষ্টায়। দীর্ঘাঙ্গী সুশ্রী ধূসরকেশ ব্যক্তিত্বসম্পন্না মহিলা তিনি। মন তার বিশ্বভ্রাতৃত্বে ভরপুর। বহু দেশ প্রায় সারা বিশ্ব তিনি বারবার ভ্রমণ করেছেন। এই কিছুদিন আগেও বিশ্ব ভ্রমণে বেরিয়ে তিনি ভারতবর্ষেও এসেছিলেন। এই কলকাতা শহরেও কয়দিন থেকে গেছেন। জীবন তাঁর নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতায় ভরপুর। মহাকবি Words Worth-এর Skylark-এর মত তিনি যেখানেই যান না কেন ঘরের টান কখনও বিস্মৃত হননি। বারবার তিনি বলেছেন 'পৃথিবীর যে প্রান্তেই যাযাবরী করি না কেন প্রতিটি যাত্রার আনন্দময় সমাপ্তি ঘটেছে ঘরে ফেরায়। বিশ্বের যে প্রান্তেই থাকি না কেন আমি বিশ্ব নাগরিকা।'

শিল্পের প্রেরণা

শিল্পী যাঁরা, তাঁরা সব সময়ে শিল্প গড়েন না। মানে, গড়তে পারেন না। কারণ ফুল ফোটার আড়ালে যেমন থাকে রোদে-রসে জড়ানো ঋতু, শিল্পের পেছনে তেমনি আছে আমেজ-আবেশে ভেজা মন। এই মনের আবহাওয়াটি খাপ-খাওয়ানো হলে তবেই শিল্প গড়ার ইচ্ছে জাগে শিল্পীমনে। তাই দেখি, সব শিল্পীই শিল্প গড়েন মনের একই রকম মরশুমে নয়—কেউ বিষাদে-বিরাগে-বিক্ষোভে, কেউ প্রমোদে, কেউ বা প্রেমে-অপ্রেমে। এমনিধারা প্রেম-অপ্রেম শিল্পীর নিজের জীবনেরই ঘটনা, নয়তো অন্যের জীবনের ঘটনার সঙ্গে শিল্পীর নিজের অনুভূতির যোজনা। এরই দৃশ্যপটে দাঁড়িয়ে শিল্পীমন রচনার তাগিদ অনুভব করে। শুরু হয় কারুশালায় কারিগরি। তাহোলে প্রেরণার কথা মেনে নিতে হোলো। রাত পোহালেই পাখি যেমন ভাবে, এবারে স্বর জাগানো যাক কণ্ঠের স্বরবাহারে, অনুকূল আলো পেলে শিল্পীমনেও অমনি এক ভাবনা জাগে আপন অচিনপুরের পাপড়িগুলোকে চেনালোকের রোদ্দুরে মেলে ধরবার। প্রেরণা হচ্ছে ঐ ভাবনারই ভিতপাথর। ঠিক তারে ঠিকমতো ঘা লাগলেই চমৎকার। আশেপাশের নানান রঙ হাজার স্বর হরেক ছবি রূপকারের যন্ত্রীমনের দেউড়ি পেরিয়ে এই যে শিল্পীমনে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দেয়, প্রেরণা এর নাম।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, প্রেরণা আসে কোথা থেকে। অনেকেরই বিশ্বাস, ওটা পুরোপুরি স্বর্গের জিনিস, ঈশ্বরের দেওয়া মায়াবাঁশি। এ ধরণের বিশ্বাসে আমাদের কোনো আস্থা নেই। কারণ, হক কথাটি হোলো, আমরা না-জানাকে বলি স্বর্গ, বুঝতে না-পারাকে বলি ঈশ্বর। তাছাড়া ওদের ভেতরে নজরছুট্ ধর্মের ফুলচন্দনের গন্ধটুকুও আছে জড়িয়ে। কাজেই শিল্পীরা তাঁদের রচনার মুখপাতে যতোই যাদুকরী কলাদেবীর কিংবা মধুকরী কল্পনাময়ীর করুণা ভিক্ষে করুন না কেন, আমি বলবো—শিল্পরচনার সব প্রেরণাই আসে শিল্পীমনের ভেতরমহল থেকে, ওটা স্বর্গের ফসল নয়, শিল্পীর নিজের মনোবাসিত আবেগ। আর, ঈশ্বরের দান বলে হেঁয়ালি না করে বরং স্পষ্ট করে বলা যাক, শিল্পী নিজেই ওকে গড়ে তোলেন নিজেরই অজান্তে, নয়তো নিজেরই আধা-জানায়। অবশ্য ওকে গড়ে তোলবার অভ্যেসটি শিল্পী পেয়েছেন তাঁর জন্মের দৌলতে, আর বিশেষ বিশেষ খেয়ালে চলা মানস-অনুভূতির অনুশীলনে।

কেউ কেউ বলেন, প্রেরণা যখন জাগে শিল্পীমনে, শিল্পী তখন ধুলোমাটির জগৎ ছেড়ে কল্পলোকে উধাও হয়ে যান। আমার ধারণা, শিল্পীর তো আর এক নিমেষে উধাও হয়ে যাবার মতো পক্ষীরাজ ঘোড়া নেই ; তাছাড়া শিল্পী যদি সত্যিই নিজেকে হারিয়ে ফেলেন তবে শিল্প গড়ার সময় বাছাই-করা রঙ-স্বর যাচাই-করা ভাষা-ভঙ্গি জোগাড় করেন কেমন করে! ওগুলো তো যন্ত্রীমনের কারিগরি। আর, যন্ত্রীমন যে খুব করে জড়িয়ে রয়েছে ধুলোমাটির জগতের সঙ্গে—এ কথা

আমরা হাজারবার জানি। কাজেই উধাও হওয়া বলতে যা বোঝায়, শিল্পী মোটেই তা হোতে পারেন না। বরং শিল্পরচনার প্রেরণা জাগলে শিল্পী আপন মনের কল্পলোকে গভীর হোতে থাকেন, সে সঙ্গে ধুলোমাটির জগৎকেও আঁকড়ে রাখেন নিজের কাছে। এ যেন ঠিক ঘাটে-বাঁধা শেকল ধরে সাগরচানের মতো। ঢেউ এসে ভাসিয়ে নিয়ে গেলেই শিল্পী দিশেহারা, শিল্প আলুথালু।

এ হোলো শিল্পীর দিককার জবানবন্দি। এবারে দেখা যাক শিল্পের দিক থেকে। রসিক যাঁরা, শিল্পে তাঁরা চান জীবনের কথা। জীবনের কথা মানে ভাবের কথা, অভাবের কথাও। ধুলোমাটির জগৎকে ছেড়ে গেলে তো অমনি সব কথাকাহিনী কোথাও মিলবে না। কাজেই শিল্পী কোনো দূর ঠিকানার কল্পলোকে উধাও হতে পারেন না শিল্পের খাতিরে। শিল্পে তাই পারিজাত আছে, অপরাজিতা আছে, সুয়োরাণী আছে. দুয়োরাণী আছে, মেঘদূত আছে, ভগ্নদূতও বাদ যায় নি। কেউ হয় তো বলবেন, তা না হয় হোলো, কিন্তু আবোল-তাবোলও যখন শিল্প হয়ে ওঠে তখন রোজদিনকার দুনিয়া তো সেখানে ঠাঁই পায় না। আমার ধারণা, পায় বৈ কি। তবে সোজা পথে নয়, ঘুর পথে। সম্ভবকে না জানলে কি অসম্ভবের শিল্পরূপ দেওয়া যায়? গরুই যদি না চিনি, টাঁসগরু আঁকবো কেমন করে! তাহলে মানতেই হচ্ছে, শিল্প রচনার প্রেরণা জাগলে শিল্পী উদাসী হলেও হতে পারেন, কিন্তু বিরাগী হবার জো নেই।

প্রেরণা না পেলে শিল্পী রচনা করতে পারেন না, খাঁটি কথা। তবে জানতে ইচ্ছে করে, সে প্রেরণা কখন আসে। এর লাগসই জবাব দেওয়া ভারী মুশকিল। কারণ বাইরের আকাশে আকাশে যেমন ঋতুরঙ্গ আছে. শিল্পীর মনের আকাশেও ঠিক তেমনি। শরৎ-হেমন্ত-শীত-বসন্ত নাম রেখে আমরা তো বাইরের ঋতুগুলোকে সাজিয়েছি দেয়ালপঞ্জিতে তারিখ মিলিয়ে, তবু ওরা তারিখের বাঁধা পথ ধরে আসে না, আসে খুশিমতো। বর্ষা আসে আষাঢ়ের প্রথম দিনে, না প্রশম দিনে—সে তর্ক মেটেনি আজো। কাজেই মনেরও ঋতুবদল হয় খুশির ওপরে, খামখেয়ালিপনাটাই সেখানে একটা মস্ত বড়ো খেয়াল,—যেন পাহাড়পুরীর রোদ-মেঘ-বৃষ্টির ভালোবাসা। তাছাড়া মনের ঋতু বাইরের ঋতুর মতো চারিদিকের দরজা-জানলা খুলতে খুলতে আসে না, নিরিবিলি তার আনাগোনা। ফলে, প্রেরণা যে কখন এসেছিলো শিল্পীমনে, তা একমাত্র শিল্পী নিজেই বলতে পারেন। আমরা শুধু এইটুক জানি, প্রেরণা যখন আসে, শিল্পীমন তখন অশান্ত আনন্দে ভরপুর! টলোমলো মন নিয়ে শিল্প গড়া যায় না, গড়লেও তা শিল্প হয় না। বাইরের হাজার টালমাটাল থেকে যন্ত্রীমন যে-দোলা পৌঁছে দিয়েছে শিল্পীমনে সে-দোলায় শিল্পীমন দুলছে, কিন্তু তাল হারায় নি। যেই তাল হারালো, অমনি যন্ত্রীমন শিল্পীমন একাকার হয়ে বিমনা হোলো। শিল্পীর কারিগরির পাট বন্ধ।

মোট কথা, প্রেরণাকে যদি স্বর্গের ব্যাপার কিংবা ঈশ্বরের কৃপা বলে মেনে না নিই, তবে আমাদের নজর ফেরাবো শিল্পীর স্বভাবের দিকে, আরো বলবো, প্রেরণা জাগে শিল্পীর স্বভাব-ওস্তাগরি থেকে, তার মানে প্রতিভা থেকে। অবশ্য প্রতিভা থাকলেই পয়লা নম্বরের শিল্পী হওয়া যায় না, কারণ প্রেরণা হচ্ছে শিল্পের হাল—শিল্পের ময়ূরপঙ্খী নয়। ঐ ময়ূরপঙ্খী গড়তে গেলে শিল্পকলায় নবিশী করে হাত পাকাতে হবে শিল্পীকে, সে সঙ্গে তাঁর সহজ নজরকে করতে হবে হৃদয়গভীর দিগন্ত ছোঁয়া। কাজেই প্রেরণা আর কলাকল্পা, কাউকে বাদ দিলে

চলবে না। শুধু প্রথমটা যাঁর আছে তাঁকে বলি স্বভাব-শিল্পী, শুধু দ্বিতীয়টা যাঁর আছে তাঁকে বলি পণ্ডিত-শিল্পী। শিল্পী-ব্রহ্মা বলি তাঁকেই, দুটোই আছে যাঁর।

শিল্পী যখন তৈরী করেন না, সৃষ্টি করেন,—আর-পাঁচজনের মতো জ্ঞানের জোরে নয়, ভাবের ঘোরে, তখনই বুঝতে হবে তাঁর মনে প্রেরণা জেগেছে। তৈরী করার চেয়ে সৃষ্টি করার ক্ষমতা ঢের বেশি উঁচুদরের। কারণ তৈরী করার পেছনে বাইরের তাগিদটাই বড়ো, অন্যদিকে ভেতরের আনন্দটাই সৃষ্টির আসল কথা। তৈরীতে যদি যন্ত্র লাগে তো সৃষ্টিতে মন্ত্র। একটায় নিজের কিছুই নেই, আর-একটায় নিজের মনই সব। কাজেই প্রেরণা-ছাড়া রচনা অনেকটা কাগজের ফুলের মতো—রূপ থাকে, রঙ থাকে, থাকে না শুধু প্রজাপতিকে ডাক পাঠবার মধু-পরাগ। তাই আমার ধারণা, প্রেরণা আর উৎসাহ এক জিনিস নয়। মনের সদরমহালে নাড়া লাগলে উৎসাহ আসে, রঙমহালে সাড়া জাগলে আসে প্রেরণা। এর বড়ো প্রমাণ, শিল্প গড়বার উৎসাহ আমাদের অনেকেরই আছে, তবু অনেকেই আমরা শিল্পী হতে পারি না।

প্রায়ই দেখা যায়, শিল্পী এমন নানান কালের নানান পরিবেশের ছবি আঁকেন, গল্প বলেন, যাঁর সঙ্গে তাঁর সরাসরি কোনো যোগ নেই, এমন কি কোনো কোনোটা হয়তো সব যোগের বাইরে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যে দিনের মুখ কোনোদিন দেখেন নি, যে-ঘাটে তাঁর পায়ের চিহ্ন পড়ে না, সে-দিনের সে-ঘাটের সবকিছুকে আমাদের চোখের সামনে জীবন্ত করে তোলবার প্রেরণা শিল্পী কেমন করে পেলেন। আমার মনে হয়, দুটি জিনিসের ওপর ভর দিয়ে শিল্পীমনে অমনিধারা প্রেরণা জাগে। একটি হচ্ছে জ্ঞানের অভিজ্ঞতা, আর-একটি সকল-পাওয়া সকল-ছোঁওয়া অনুভূতির অভিজ্ঞতা। জ্ঞানের অভিজ্ঞতাকে পাওয়া যায় বই পড়ে, ছবি দেখে, কিংবা কারো কাছ থেকে শুনে। আর শিল্পীর অনুভূতি এমনই লজ্জাবতী যেখানে না-দেখাও দেখা হয়ে দোলা লাগায়, না শোনাও দরদে কল্পনায় মিশে শোনা হয়ে ওঠে। অনুভূতির অভিজ্ঞতা আসে সেখান থেকেই।

অবশ্য শিল্পী অনেকসময় এমন কোনো দৃশ্যের ছবি আঁকেন কিংবা এমন কোনো চরিত্রের রূপ মেলে ধরেন, যা হয়তো সেই ছবি-আঁকার সময়, রূপ-লেখার সময় তাঁর চোখের সামনে নেই, কিন্তু একদিন ছিলো। এ ধরণের অবস্থায় শিল্প গড়ার প্রেরণা জাগে শিল্পীর সেই কোনো একদিনের দেখা দৃশ্যকে-চরিত্রকে মনের গোপন কুঠুরীর জমা-খাতা থেকে তুলে আনবার আমেজে। তার মানে, থিতিয়ে-আসা স্মৃতির মায়ামদির চরণবিলাসে।

সব শিল্পীরই আকাশমাটির মাঝের ঘরে দিনযাপনের কোনো-না-কোনো প্রিয় মুহূর্ত, কিছু-না-কিছু ভালো লাগার আবেশপট আছে যা তাঁদের মনের কারুশালায় শিল্প গড়ার প্রেরণা এনে দেয়। তাই বাঁধা পথে চলে চলে ঝিমিয়ে পড়া শিল্পীমনকে চাঙা করে তোলবার জন্যে তাঁরা কেউ আশ্রয় খোঁজেন প্রকৃতির নীড়ে, কেউ বা মানুষের ভিড়ে। অবশ্য প্রেরণার বশে গড়ে তোলা সব শিল্পই যে পয়লা নম্বরের হবে, কিংবা আদৌ শিল্প হবে, এমন কথা হলপ করে বলা যায় না। তবু প্রেরণা চলে গেলে শিল্পীর রচনা যে শুভংকরের আর্যা হয়ে পড়ে। আজকের শিল্পব্যবসার দিনে বেশির ভাগই ফরমায়সী শিল্প, ভিয়েন-চড়ানো শিল্প। কাজেই প্রেরণাহীন। তাই অ-শিল্প।

দেবব্রত

জাতীয় নাট্যশালা প্রসংগে

সরকারী হিসাবে ১৯৬৬ সালের মাঝামাঝি না হোক শেষাশেষি 'রবীন্দ্র স্মরণী' নামধেয় নাট্যশালাকে ব্যবহারযোগ্য রূপে পাওয়া যাবে। এই ঘটনা (মন্দলোকে অবশ্য বলছে দুর্ঘটনা) ঘটার আগেই বাংলা নাটকের অভিভাবকত্ব সরকারী প্রসাদে কার কপালে তিলক হবে তা নিয়ে যবনিকার আড়ালে তোড়জোড় চলছে। যিনি বা যারা এ অধিকার লাভ করবেন তাঁদের অগ্রিম অভিনন্দন তথা সমবেদনা জানিয়ে রাখি। অভিনন্দন সরতাজের জন্য আর সমবেদনা কণ্টক শয্যার জন্য। তবে সাধারণ মানুষ হিসাবে রবীন্দ্র স্মরণীর সংগে আত্মিক সংযোগ যে রাখতে পারব না এ তথ্য দিবালোকের মত পরিস্ফুট হয়ে গেছে। ব্যক্তিবিশেষের বিজয়বৈজয়ন্তী আলোকমালার সাহায্যে সুপরিস্ফুট হবে একথাও বলা চলে। তবে তা বাংলা নাট্যশালার বা বাংলা নাটকের সামগ্রিক কোন উন্নতি করতে পারবে এমন আশা অতি বড় সমর্থকেও বোধ করতে পারেন বলে মনে হয় না।

অথচ আজকের দিনে এ উন্নতির প্রয়োজন অপরিসীম। একদা যে বাংলা নাটক তার গজ-দন্তমিনার থেকে নেবে এসে সাধারণের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাংখা, আনন্দ-বেদনার অংশভাগী হয়েছিল আজ আবার তার মধ্যে প্রাক্তনে প্রত্যাবর্ত্তনের প্রচেষ্টা স্ফুটতর হয়ে উঠেছে। তবে এবার কিছু যান্ত্রিক উন্নতির এ পরিবর্ত্তনের মধ্যে যুগোচিত রূপ নিচ্ছে। সমাপ্তপ্রায় 'রবীন্দ্র সরণী' এই তথাকথিত আধুনিকতাকে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করবে বলেই মনে হয়। ফলে নাটক আরো নয়ন মনোহর হবে একথা জোর করে বলা যায় কিন্তু তার মধ্যে নাটকীয়তা থাকলেও নাটক কতটা থাকবে সে সম্বন্ধে সন্দেহকে প্রায় দৃঢ় প্রত্যয়ের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায়।

তাহলে রবীন্দ্র স্মরণী ও তার সংশ্লিষ্ট দলকে হিসাব থেকে বাদ দিয়ে আমাদের নাটকের কথা ভাবতে হবে। নাটকের মাধ্যমে আজ জীবনের বহু বিচিত্র সমস্যাবলীর বিচার বিশ্লেষণ একান্ত প্রয়োজনীয়। একথা রসিকজনে স্বীকার করবেন নিশ্চয় কিন্তু কি ভাবে তা করা যাবে! ব্যক্তিগত চিন্তার ফসল হিসাব একটা অভিমত নাট্যরসিক মহলে পর্যালোচনার জন্য নিবেদন করছি, আশা (নিতান্ত দুরাশা) এ বিষয়ে অন্যমতও জানানো হবে এবং তার দরুণ কিছুটা করা সম্ভব। অর্থাৎ অচলায়তন অন্ততঃ একটা নাড়াও খাবে।

এতদিন পর্যন্ত জাতীয় নাট্যশালার পরিকল্পনা ছিল ওপর থেকে গড়বার অর্থাৎ শিশিরকুমারের মত কোন অমিত শক্তিশালী নট-পরিচালককে কেন্দ্র করে বা সরকারীভাবে। এর প্রথমটি আজ অর্থহীন প্রস্তাব আর দ্বিতীয়টির সম্ভাবনা সম্বন্ধেও গোড়ায় আলোচনা করেছি। কাজেই তৃতীয় একটি বিকল্পের কথা বোধহয় সমীচীন হবে।

এ প্রস্তাব হল, তলা থেকে গড়ে তোলা। অর্থাৎ বিভিন্ন নাট্য সংস্থার বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টাকে

সংহত করার জন্য একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা। এ ধরণের সংহতি গড়ার চেষ্টা যে একেবারে বিরল এমন কথা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে কিন্তু যেটুকু করা হচ্ছে তাও একান্তভাবে আঞ্চলিক, আংশিক ও অসম্পূর্ণ। এই সবগুলিকে একত্র করে একটি বৃহত্তর তথা ব্যাপকতর ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান গড়া দরকার।

এ প্রতিষ্ঠান কি কাজ করবে তা বলার আগে প্রাসংগিকভাবে অন্য একটি দেশের দৃষ্টান্ত আপনাদের সামনে হাজির করছি। হয়ত দৃষ্টান্তটি আমার বক্তব্য বোঝাবার পক্ষে সহায়ক হবে।

পশ্চিম ইউরোপের ছোট্ট দেশ হল্যাণ্ড তার গোধন, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে নিম্নতর জমি উদ্ধার আর টিউলিপ ফুলের বাহারের জন্যই বিখ্যাত। সেখানকার চিত্রকরের নাম থাকলেও নাট্যকারের নেই। এ অবস্থায় এমন মনে করা অন্যায় হবে না যে সেখানে নাট্যাভিনয়ের ঝোঁক বোধহয় কম, নেই বললেই চলে। প্রকৃত প্রস্তাবে সেখানেও নাটক অভিনয়ে আমাদের মতই আগ্রহ দেখা যায়। আর এখানকার মতই অধিকাংশ সংস্থা অপেশাদার।

এই সব সংস্থার কাজকর্ম যাতে সুষ্ঠুভাবে হতে পারে তার জন্য দু'টি সংযোগকারী প্রতিষ্ঠান আছে। এর মধ্যে একটি ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বীদের প্রতিষ্ঠান অন্যটি ধর্মনিরপেক্ষ সার্বজনীন। এরা বিভিন্ন নাট্য সংস্থাকে সহায়তা করে থাকেন। সরকারের কাছে নাটকের ব্যাপারে দরবার করেন; নাটক ও নাট্যশালার বিভিন্ন বিভাগের উন্নতির জন্য সচেষ্ট থাকেন। মোটকথা নাটকের সর্বাংগীণ উন্নতির জন্য করণীয় সব কাজই করে থাকেন। একাজে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান দু'টি পারস্পরিক সহযোগিতাও করেন।

অনুরূপ প্রচেষ্টা এদেশে করা নিশ্চয় সম্ভব। আর তা করার কাজ এখনই বোধ হয় করা দরকার। জানি এদেশে বার রাজপুতের তেরো হাঁড়ি আজো জীবন্ত সত্য: একটি নাট্যসংস্থা ভেঙে তিনটি হওয়া এখানে এতই স্বাভাবিক যে, নাট্যামোদীরা এক দেড় বছরে এমন ঘটনা না ঘটলেই বিস্মিত হন। তবু নাটক তথা নাট্যশালাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বিভিন্ন সংস্থা নিজেদের স্বাধিকার কিছুটা সংযত করে কেন্দ্রীয় সংস্থা প্রতিষ্ঠায় অনিচ্ছুক একথা বিশ্বাস করতে মন চায় না।

গোড়াতেই বলে রাখা ভাল এ সংস্থা প্রথমেই নিয়ামক হিসাবে কাজ করবে না। প্রাথমিক অবস্থায় এর কাজ হবে সহায়ক তথা পরিপূরক সংস্থার। কোন সংস্থার কোথাও কোন অসুবিধা ঘটলে তাঁরা তা কেন্দ্রীয় সংস্থাকে জানাবেন এবং সেখান থেকে এ অসুবিধা দূরীকরণের উপায় বাতলানো হবে!

নাট্যবিষয়ক একটি গ্রন্থাগারও কেন্দ্রীয় সংস্থা গড়ে তুলবেন। এখানে শুধু যে বাংলাভাষায় প্রকাশিত সমস্ত নাটক থাকবে তাই নয়, সংস্কৃত থেকে সুরু করে সমস্ত আঞ্চলিক ভাষার নাটক এমনকি যথাসম্ভব বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় প্রকাশিত নাটক তথা সর্বভাষায় প্রকাশিত অভিনয় ও নাট্যানুসংগ বিষয়ক গ্রন্থাবলী রাখা হবে।

আলোক নিয়ন্ত্রণ, শব্দানুসংগ প্রভৃতির যন্ত্রাদিও ক্রমে ক্রমে এই সংস্থা সংগ্রহ করবেন এবং প্রয়োজনানুযায়ী উপযুক্ত দক্ষিণায় তা সহযোগী সংস্থাদের ব্যবহার করতে দেবেন। এইভাবে সংস্থার যে আয় হবে তা সংস্থার উন্নয়নে ব্যয়িত হবে।

নাট্যবিষয়ক আলোচনার জন্য প্রকৃত রসিকজনের সহায়তা নেওয়া হবে। এতে অন্তত নাটক সম্বন্ধে সর্বজনের একটা স্বচ্ছ ধারণা গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

সংস্থার কাজকর্ম চালাবার জন্য সহযোগী সংস্থাগুলি নিয়মিত দক্ষিণা দেবেন। সরকারী অনুদান পাওয়া গেলে ভাল অন্যথায় নাট্যমোদীদের কাছ থেকে দান গ্রহণ করে কাজ চালাতে হবে। সুযোগ ও সুবিধামত কেন্দ্রীয় সংস্থা বিভিন্ন অঞ্চলে পরীক্ষামূলক নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করবে।

এ বিষয়ে বিস্তৃতর আলোচনা, বিশেষ করে নট, নাট্যকার, পরিচালক প্রভৃতির সংগে এই জাতীয় নাট্যশালার সম্পর্কে, তার গঠনতন্ত্রের কাঠামো প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা ক্রমান্বয়ে পরে করার ইচ্ছা রইল।

রবি মিত্র

A Desciriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts vol 1, part 1 By Biraj Mohan Tarka-Vedantatirtha and Jagadishchandra Takatirtha ; Calcutta Sanskrit College Research Series no 34 ; Sanskrit college, Calcutta—1965 ; Rs 7'50.

জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী—বাঙ্গলা বিভাগ (১৯৬১—১৯৬২) ॥ সম্পাদক—বি. এস, কেশবন, সহ-সম্পাদক—সুনীলবিহারী ঘোষ, অশোককুমার বিশ্বাস। প্রকাশক : স্টেটব্যুরো অব্ এডুকেশন, শিক্ষাবিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। মূল্য—৯'৭৫

জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী : বাঙ্গালা বিভাগ (জানুয়ারী মার্চ, ১৯৬৪) ॥ সম্পাদক—সুনীলবিহারী ঘোষ ও অশোককুমার বিশ্বাস। প্রকাশক—ষ্টেট ব্যুরো অব্ এডুকেশন, শিক্ষা বিভাগ : পশ্চিমবঙ্গ সরকার। মূল্য—২'০০ টাকা।

বাঙ্গলা শিশুসাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী ॥ বাণী বসু সঙ্কলিত। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। কলিকাতা ১৪। মূল্য—৭'০০।

মুদ্রাযন্ত্র প্রবর্তনের পূর্বে সকল দেশের স্থায় আমাদের দেশেও হস্তলিখিত পুঁথি বিদ্যাচর্চার অবলম্বন ছিল। এই সমস্ত পুঁথি সচরাচর পণ্ডিত ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত সংগ্রহে অথবা মঠ মন্দিরাদিতে রক্ষিত থাকিত। বিদ্যোৎসাহী ধনী ব্যক্তিগণও প্রয়োজন বোধে পেশাদার লিপিকার দ্বারা পুঁথির নকল করাইয়া লইতেন এবং ব্যবহার করিতেন। ভারতবর্ষে এমন কোন গ্রাম সম্ভবত: ছিল না যে গ্রামের উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিদের গৃহে দুই-চারিখানিও পুঁথি না পাওয়া যাইত। অযোগ্য উত্তরাধিকারীদের অবহেলায়, কীটের অত্যাচারে, বন্যায় অথবা রাষ্ট্র বিপ্লবে এইরূপ বহু পুঁথি অবশ্যই নষ্ট হইয়া যাইত।

ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক ভারতের শাসনভার গৃহীত হইলে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ভারতবর্ষের প্রাচীন বিদ্যাবৈভব বিশেষত: সংস্কৃতের প্রতি আকৃষ্ট হন। ইউরোপীয় পণ্ডিত, বণিক ও পর্যটকদের দ্বারা বহু প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথি সংগৃহীত হয় এবং এইগুলি ইউরোপের প্রাচ্য বিদ্যাচর্চা কেন্দ্রগুলিতে সযত্নে রক্ষিত হইতে থাকে।

১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে সার উইলিয়ম জোন্সের চেষ্টায় কলিকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হইলে সঙ্ঘবদ্ধভাবে এদেশে ভারত-বিদ্যাচর্চা তথা সংস্কৃত বিদ্যাচর্চার সূত্রপাত হয়। এশিয়াটিক সোসাইটির প্রাথমিক পর্যায়ের কর্মীদের মধ্যে সকলেই প্রায় সংস্কৃত উত্তমরূপে অধ্যয়ন করেন। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে সংস্কৃত শিক্ষা ব্যপদেশে সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহ এবং নির্বাচিত গ্রন্থগুলির মুদ্রণে ইহারা উৎসাহী হন। প্রধানত: এশিয়াটিক সোসাইটি সংশ্লিষ্ট দেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিতদের চেষ্টায় ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড লরেন্সের গভর্ণর জেনারেল থাকাকালে গভর্ণমেণ্ট

পুঁথিসংগ্রহের জন্য অর্থ বরাদ্দ করেন। তদবধি এই অর্থে এশিয়াটিক সোসাইটির জন্য ও অন্যান্য অনুরূপ প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য পুঁথি ক্রীত হইতে থাকে। পরে এই বরাদ্দ অর্থদানের দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকার গ্রহণ করেন।

সরকারী অর্থসাহায্য অথবা ব্যক্তিগত চেষ্টায় প্রাচীন পুঁথি বিশেষত সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহ ব্যাপারে এই সব দেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিতের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—রাস্ক, হজসন, কোলব্রুক, হোরেস হেমান উইলসন, ব্যুল্যর, পীটারসন, চোমা দ্য ক্যরশ, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর, শরৎচন্দ্র দাস, ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। বৈদেশিক পণ্ডিতদের দ্বারা সংগৃহীত পুঁথিগুলির অধিকাংশই ইংল্যাণ্ডের ব্রিটিশ মিউজিয়ম, ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী, বডলেয়ন লাইব্রেরী ও সংস্কৃত শিক্ষা দান ব্যবস্থাযুক্ত ইউরোপের প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রেরিত হয়।

যে কোন বিদ্যাচর্চার জন্যই পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য, আবার পাঠাগারে কি পুস্তক পাওয়া যাইবে তাহা বুঝিবার জন্য গ্রন্থতালিকারও প্রয়োজন। এই গ্রন্থতালিকা শুধু পাঠাগারের সহিত সংশ্লিষ্ট পাঠকেরই প্রয়োজনে লাগে না, অন্যস্থানে অবস্থিত আগ্রহী পাঠকও এই গ্রন্থতালিকা দেখিয়া পুস্তকটির অস্তিত্ব জানিতে পারেন। এই কারণেই গ্রন্থতালিকা মুদ্রিত হইলে বহু পাঠকেরই প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। সংস্কৃত ভাষার অধিকাংশ অমূল্য পুস্তক উনবিংশ শতাব্দীতে অমুদ্রিত থাকায় দুষ্প্রাপ্য ছিল, কোন একটি বিশেষ পুঁথি কোথায় পাওয়া যাইতে পারে এই সংবাদটি বিদ্যার্থীদের পক্ষে কতদূর প্রয়োজনীয় ছিল তাহা বিস্তারিতভাবে ব্যাখান করা বাহুল্যমাত্র বিদ্যাচর্চার পক্ষে অত্যাবশ্যক সংস্কৃত পুঁথির বিস্তারিত বিবরণ (Descriptive catalogue) সঙ্কলন কার্যে প্রথম পদক্ষেপ করেন সম্ভবতঃ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র। ১৮৭০ হইতে ১০০৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিনি নয়খণ্ডে বিভিন্ন স্থানে রক্ষিত সংস্কৃত পুঁথির বিবরণ সংকলন করিয়া প্রকাশ করেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত শুধু সংস্কৃত ব্যাকরণ পুঁথিগুলির বিবরণ সঙ্কলন করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি বিকানীরের মহারাজার লাইব্রেরীতে রক্ষিত সংস্কৃত পুঁথি সমূহেরও তালিকা প্রস্তুত করেন। রাজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত অপরাপর সংস্কৃত পুথিগুলির বিবরণী সমেত সুবৃহৎ তালিকা ১৯১৭ হইতে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ছয়খণ্ডে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহারই তত্ত্বাবধানে সঙ্কলিত অপর চারিটিখণ্ড ১৯৩৪ হইতে ১৯৪৮ পর্যন্ত এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। এই বিবরণীতে সঙ্কলিত পুথিগুলির ৮১০০টি খণ্ড স্বয়ং হরপ্রসাদই সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত পুঁথির ক্যাটালগ প্রস্তুতের প্রসঙ্গে বৈদেশিক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের মধ্যে বন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক ডাঃ থিওডোর আউফ্রেখ্‌ট এই নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই দিক্‌পাল মনীষী তিনটি সুবৃহৎ খণ্ডে সংস্কৃত পুঁথি ইহাদের গ্রন্থকারদের বিবরণসহ সঙ্কলন করিয়া প্রকাশ করেন। ইহাতে উল্লিখিত পুস্তকগুলি কোন একটি বিশেষ পাঠাগারের সংগ্রহের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নাই। আউফ্রেকটের সমসাময়িককালে একটি বিশেষ পুস্তক যে যে স্থানে প্রাপ্য ছিল তাহারও উল্লেখ এই গ্রন্থে স্থান পায়, (catalogus catalagorum Leipzig, in three parts ১৮৯১—১৯০৩)। ইহার কিছুকাল পূর্বে জার্মান সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ভেবর

কেবলমাত্র বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত সংস্কৃত ও প্রাকৃত পুঁথি সমূহের তালিকা প্রস্তুত করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন (১৮৮৫, ১৮৮৬)। প্রসিদ্ধ জার্মান সংস্কৃতজ্ঞ ব্যুল্যর ভারতে বাসকালে বহু সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহ করেন—এই পুঁথির একটি তালিকা বোম্বাই হইতে প্রকাশিত হয় (১৮৭৩)। অধ্যাপক ভেবর সম্পাদিত ইণ্ডিশে ষ্টুডিয়েন পত্রিকায়ও ব্যুল্যর ধারাবাহিকভাবে তাঁহার দ্বারা ভারতে সংগৃহীত পুঁথিগুলির বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতদের দ্বারা সঙ্কলিত পুস্তক তালিকাগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত পুস্তক বিবরণীগুলিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। **উইনট্যারনিটস্ কৃত**—ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউটে রক্ষিত সংস্কৃত ও প্রাকৃত পুঁথির বিবরণী (১৯০৪); বডলেয়ন লাইব্রেরীর সংস্কৃত পুঁথির বিবরণী (কীথে সহযোগিতায়, ১৯০৬); লণ্ডন রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত দক্ষিণভারতে সংগৃহীত পুঁথির বিবরণী (১৯০২)। **টমি কৃত**—ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরী সংস্কৃত পুঁথির বিবরণী (টমাসের সহযোগিতায়, ১৯০৩)। **সিসিল বেণ্ডল কৃত**—কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের (বৌদ্ধ) সংস্কৃত পুঁথির তালিকা (১৮৮৩), ব্রিটিশ মিউজিয়মস্থ সংস্কৃত পুঁথির তালিকা (১৯০২) প্রভৃতি।

এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠার ষোল বৎসর পর ১৮০০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। ইউরোপ হইতে আগত নব্য সিবিলিয়ান কর্মচারীদের প্রাচ্য বিদ্যা শিক্ষা দানই ইহার লক্ষ্য ছিল। দেশীয় শিক্ষার্থীদের প্রাচ্য বিদ্যা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত সরকারী আনুকুল্যে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে Public Instruction Committee এর সেক্রেটারী প্রাচ্যবিদ্যা-প্রেমিক হোরেস্ হেমান উইল্‌সন সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। তিনি সম্পাদকরূপে এই কলেজটির পরিচালনভারও গ্রহণ করেন। সংস্কৃত কলেজ প্রথমে বহুবাজারে একটি ভাড়া বাড়িতে স্থাপিত হয়, দুই বৎসর পর গোলদীঘির উত্তরপার্শ্বে কলেজের নিজস্বভবন নির্মিত হইলে এখানে উঠিয়া আসে।

সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার পর ২৫ বৎসর কাল এখানে অধ্যক্ষের পদ ছিল না, সম্পাদকই ইহার পরিচালক ছিলেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। অতঃপর ইরি কাউয়েল, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন প্রভৃতি উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত অধ্যক্ষ পদে সমাসীন ছিলেন।

সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠাকাল হইতে ইহা একটি গতানুগতিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না, সমগ্র দেশে সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্য প্রচারে ইহার দান অপরিমেয়, নামে না হইলেও কার্যতঃ ইহা ছিল একটি বিশ্ববিদ্যালয়। ভারতের বিশ্রুত-কীর্তি পণ্ডিতেরাই অধ্যাপক ও অধ্যক্ষরূপে ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকার গৌরব লাভ করেন।

স্বাভাবিক কারণেই প্রতিষ্ঠাকাল হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত মুদ্রিত পুস্তকের সহিত বহু প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথি সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারে সঞ্চিত হইয়া আসিয়াছে। গত শতাব্দীর শেষদিকে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের অধ্যক্ষতাকালে সংস্কৃত পুঁথির একটি বিবরণী (catalogue) মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হয়। বর্তমানে এই ক্যাটালগ দুষ্প্রাপ্য, ৭০ বৎসরের ব্যবধানে সংগৃহীত পুঁথি ভাণ্ডারও সমৃদ্ধতর হইয়াছে।

সুখের বিষয় সংস্কৃত কলেজের কর্তৃপক্ষ ঐ কলেজে রক্ষিত সংস্কৃত পুঁথির তালিকা নূতনভাবে

সঙ্কলন ও প্রকাশের কাজে ব্রতী হইয়াছেন। ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে এই বিস্তৃত বিবরণী বা ক্যাটালগের প্রথম খণ্ডের প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইয়াছে, এই প্রথম ভাগে শুধু ন্যায়শাস্ত্র বিষয়ক পুঁথিগুলির উল্লেখ ছিল। প্রথম ভাগ প্রকাশের অত্যল্পকাল পরেই এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইল, ইহাতেও ন্যায়শাস্ত্র বিষয়ক চারিশতাধিক পুঁথির বিবরণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পুঁথির উপকরণ (কাগজ, তালপত্র ইত্যাদি), আকার, পুঁথির ও লেখকের নাম, পৃষ্ঠা সংখ্যা, অবস্থা (মুদ্রিত অথবা অমুদ্রিত) ইত্যাদি বিবরণ ইহাতে দেওয়া হইয়াছে। পাঠান্তর নির্ণয়ের জন্য মুদ্রিত সংস্করণ থাকা সত্ত্বেও হস্তলিখিত পুঁথির একটি বিশেষ মর্যাদা আছে, এইজন্যই এই বিবরণী গবেষক ও ছাত্রদের নিকট অমূল্য। সংস্কৃত কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গৌরীনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত বিবৃতি হইতে জানা যায় যে এই 'ক্যাটালগ' সঙ্কলনের কাজ অবিশ্রান্ত গতিতে চলিতেছে এবং একবৎসরের মধ্যেই পরবর্তী ভাগ প্রকাশিত হইবে। সংস্কৃত কলেজে বর্তমানে কত সংখ্যক পুঁথি আছে এবং আনুমানিক কতকগুলি খণ্ডে এবং কতকালের মধ্যে এই 'ক্যাটালগ' প্রকাশক সম্পন্ন হইবে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস শাস্ত্রী মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে পাওয়া গেলে ভাল হইত। যাহা হউক, আশা করা যায় এই অতি প্রয়োজনীয় তথ্যবহুল ক্যাটালগের প্রকাশ ব্যপারে সংস্কৃত কলেজ কর্তৃপক্ষের বর্তমান তৎপরতা অব্যাহত থাকিবে। যে দুই ভাগ 'ক্যাটালগ' প্রকাশিত হইল তাহা ন্যায়শাস্ত্র বিষয়ক, যে ন্যায়শাস্ত্র বাঙ্গালী মনীষার একটি বিশিষ্ট রূপায়ণ। এই 'ক্যাটালগ' প্রকাশের দ্বারা সম্পাদকদ্বয় ও সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর গৌরীনাথ শাস্ত্রী মহাশয় নিঃসন্দেহে আমাদের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদভাজন।

গত কয়েক বৎসর যাবৎ ভারত সরকার জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী সঙ্কলন ও প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী সংবিধান স্বীকৃত ১৪টি ভাষায় জাতীয় গ্রন্থাগারে প্রাপ্ত পুস্তক সমূহের একটি ত্রৈমাসিক তালিকা এবং বৎসরান্তে একটি ক্রমচয়িত বা Cumulated বার্ষিক সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যাগুলি পুস্তক যে-কোন ভাষারই হউক না কেন ইংরাজী (রোমান)অক্ষরে মুদ্রিত হয় ও সকল ভাষার পুস্তকে উল্লেখ থাকায় উহার মূল্যও অধিক হয়, এইজন্য সাধারণের পক্ষে উহা ক্রয় করা দুরুহ হয়। এই অসুবিধা দূরীকরণার্থে এই গ্রন্থপঞ্জীগুলি ভাষা অনুসারে বিন্যস্ত করার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং প্রতিটি রাজ্য সরকার নিজরাজ্যে প্রচলিত ভাষায় গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশের দায়িত্ব লইয়াছেন। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী ১৯৫৮ হইতে জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর বার্ষিক বাঙ্গলা অংশটুকু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত হইতেছে। কলিকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে "ডেলিভারি অফ্ বুকস্" য়্যাক্ট অনুযায়ী যে সব বাঙ্গলা পুস্তক সংগৃহীত হয় তাহার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত সেণ্ট্রাল রেফারেন্স লাইব্রেরীর ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী বিভাগের দুইজন সহ-সম্পাদকের উপর এই গ্রন্থপঞ্জী সঙ্কলনের ভার ন্যস্ত রক্ষা হইয়াছে।

এই গ্রন্থপঞ্জী দুইভাগে বিভক্ত—বিষয়ানুযায়ী বর্গীকৃত এবং বর্ণানুক্রমিক নির্ঘণ্ট। নির্ঘণ্টে দেওয়া বিবরণ প্রয়োজনের পক্ষে পর্যাপ্ত না হইলে ঐ তথ্যের শেষাংশে যে দশমিক বর্গীকরণ সংখ্যা আছে তাহার সাহায্যে বর্গীকৃত বিভাগে নির্দিষ্ট স্থানটি দেখিলে সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়।

ইতিপূর্বে প্রকাশিত জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীগুলির ন্যায় বর্তমান গ্রন্থপঞ্জী দুটিও যত্নসহকারে প্রভূত পরিশ্রমের সহিত সঙ্কলিত হইয়াছে। বাঙ্গলা সাহিত্যের সহিত যে-কোন রূপে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিই এই

গ্রন্থপঞ্জী ব্যবহার করিয়া উপকৃত হইবেন, ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর : জানুয়ারী—মার্চ ('৬৪) এ সঙ্কলনটি ত্রৈমাসিক সঙ্কলনেই জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর বাঙ্গলা বিভাগটি সীমায়িত ছিল। মাত্র তিন মাসের মধ্যে বাঙ্গলা ভাষায় কতগুলি পুস্তক কি কি বিষয়ে প্রকাশিত হইল এই সঙ্কলন হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। বাঙ্গলা সাহিত্যের লেখক, পাঠক ও প্রকাশকের মানসিক গতির দিগদর্শনী হিসাবে এই সঙ্কলনের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। এই সঙ্কলনের সম্পাদকদ্বয় যোগ্যতার সহিত তাঁহাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করিয়াছেন।

১৮১৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার স্কুল বুক সোসাইটি স্থাপিত হয়, বাঙ্গালাদেশের বিদ্যালয়গুলির জন্য উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক সরবরাহই ছিল এই সোসাইটির উদ্দেশ্য। রাধাকান্ত দেব, তারিণীচরণ মিত্র এবং রামকমল সেন কর্তৃক যুক্তভাবে রচিত "নীতিকথা" এই সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত প্রথম পুস্তক। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত এই পুস্তিকাটি সুখপাঠ্য গল্পের সমষ্টি। বিদ্যালয়পাঠ্য হইলেও এইটিকে বাঙ্গালাভাষায় রচিত প্রথম শিশুপাঠ্য গ্রন্থ বলা যাইতে পারে। এই সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত 'সচিত্র অশ্বাবলী', 'উষ্ট্রের মনোরঞ্জন ইতিহাস' 'ঠাকুরদাদার হস্তীবিষয়ক ইতিহাস' প্রভৃতি পুস্তকও শিশুমনোরঞ্জনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই রচিত হইয়াছিল। ইহার পরবর্তীকালে শিশুসাহিত্য-লেখক হিসাবে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বর্ণকুমারী দেবী, মধুসূদন মুখোপাধ্যায়, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, জগদানন্দ রায়, সুকুমার রায়, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৮১৮ হইতে ১৯৬২ এই দেড় শত বৎসরের বাঙ্গালা শিশুসাহিত্যের ধারাবাহিক পরিণতি যাহাতে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শ্রীবাণী বসু অশেষ পরিশ্রম ও ধৈর্য সহকারে "বাঙ্গালা শিশুসাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী" পুস্তকটি সঙ্কলন করিয়াছেন। এই পুস্তকে মোট ৫,০৬০টি গ্রন্থ এবং ১৩৩টি সাময়িকপত্র অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থপঞ্জীটি বর্ণানুক্রমে বিন্যস্ত হইয়াছে এবং একটি পুস্তক সংক্রান্ত সকল সংবাদ অর্থাৎ গ্রন্থকার, পুস্তকের নাম, বিষয় ইত্যাদি সকল সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। পুস্তকের প্রারম্ভে সঙ্কলনকর্ত্রী বাণী বসু দীর্ঘ ৩৮ পৃষ্ঠায় বাঙ্গালা শিশুসাহিত্যের যে রূপ-রেখা অঙ্কন করিয়াছেন তাহাও বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ হইয়াছে। লেখিকার অক্লান্ত অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার পরিচয় এই সুবৃহৎ পুস্তকটির প্রত্যেকটি পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। গ্রন্থপঞ্জীটি শুধুমাত্র একটি নিরস ক্যাটালগে পর্যবসিত হয় নাই। দেড়শত বৎসরের বাঙ্গালা শিশুসাহিত্যের মনোরম আলেখ্যরূপে ইহা একটি সংগ্রহ ও সংরক্ষণযোগ্য সম্পদের রূপ পাইয়াছে। এই পুস্তক সংলগ্ন বরেণ্য শিশু-সাহিত্যিকদের প্রতিকৃতি, পশ্বাবলি, ঠাকুরদাদার হস্তিবিষয়ক ইতিহাস, হস্তির মনোরঞ্জন ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থের প্রচ্ছদচিত্রের প্রতিনিধি এবং 'সখা' 'শিশু' 'বালক বন্ধু' 'মুকুল' 'বালক' প্রভৃতি অবলুপ্ত সাময়িক পত্রগুলির প্রচ্ছদের প্রতিলিপি এই সুমুদ্রিত, সুদর্শন গ্রন্থটিকে আরও সমৃদ্ধ ও আকর্ষণীয় করিয়াছে। এই গ্রন্থের সঙ্কলক শ্রীবাণী বসু ও প্রকাশক বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ্ শিশু-সাহিত্যের অনুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই ধন্যবাদ ও মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই।

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

সমকালীন

ত্রয়োদশ বর্ষ ॥ অগ্রহায়ণ ১৩৭২

এই মুহূর্তের কর্তব্য

খাদ্যে আমাদের স্বয়ংসম্পূর্ণ হ'তেই হবে

—মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

পাকিস্তানের ভারত আক্রমণ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করা ভারতবর্ষের প্রতিরক্ষা এবং আত্মসম্মানের জন্য একান্ত আবশ্যক। এই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য আমাদের সর্ব্বস্ব পণ করে প্রস্তুত হ'তে হবে।

এই জন্য প্রয়োজন—

(ক) সকল প্রকার অপচয় বন্ধ করা।

(খ) সকল প্রকার খাদ্য শস্যের উৎপাদন বাড়ানো।

ভারতের নাগরিক হিসাবে এ সম্পর্কে আপনার সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে—

(ক) আপনার যেখানে যেটুকু জমি আছে তাতে কোন না কোন খাদ্য ফসল তুলুন।

(খ) খাদ্যের সকল প্রকার অপচয় বন্ধ করে প্রতিটি খাদ্য কণার সদ্ব্যবহার করুন।

ভারতের সম্ভ্রম এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার করে জওয়ানদের পিছনে দাঁড়ান।

ডব্লিউ, বি (আই এণ্ড পি আর) অ্যাড. ডি ৭৫৭৬/৬৫

আপনার যদি থাকে র‍্যালে সাইকেল— গর্বে মাটিতে পা পড়বে না

হ্যাঁ, সাইকেল হ'ল র‍্যালে ! যেমনি চলন, তেমনি গড়ন। চড়ে গেলে লোকে তাকিয়ে দেখে। হবে না ? তুনিয়ার সবচেয়ে নামী সাইকেল। র‍্যালের কদরই আলাদা। যার র‍্যালে থাকে, তার খাতির বেশী হয়। র‍্যালে যদি আপনার বাহন হয়, গর্বে আপনারও মাটিতে পা পড়বে না।

ঝক ঝকে দাঁত
আর সুন্দর হাসি
সাধনা
দশন
আয়ুর্বেদীয় মতে তৈরী আদর্শ দাঁতের মাজন
SADHANA
DASAN
SADHANA AUSADHALAYA

ত্রয়োদশ বর্ষ ৮ম সংখ্যা

অগ্রহায়ণ তেরশ' বাহাত্তর

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

বাঙলার মৃৎশিল্প

কমলকুমার মজুমদার

কুম্ভকারগণই স্বভাবত মৃত্তিকা লইয়া শিল্প রচনা করিয়া থাকে, সেই হেতু এই কথা কোনক্রমে বলিবার উপায় নাই যে কুম্ভকারগণই মৃৎশিল্পের জনক। ইহারা সাধারণত হাঁড়ী কলস ইত্যাদি গৃহস্থের নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু করিয়া থাকে; অবশ্য ইহাদের মধ্যে এক সম্প্রদায় আছে যাহারা মূর্তি ও পুতুল গড়ে। এই সম্প্রদায়ের সঙ্গে সাধারণ কুম্ভকারদের বৈবাহিক সূত্র বড় একটা নাই। অবশ্য এই পার্থক্য কালক্রমেই ঘটিয়াছে বলিয়া অনুমান করা যায়, একদা আধুনিক দুই শ্রেণীই একই ছিল।

বিশ্বকর্মা চ শূদ্রায়াং বীর্যাধানং চকার সঃ
তত বভূবঃ পুত্রাশ্চ নবৈতে শিল্প কারিণঃ
মালাকার কর্মকার শঙ্খকার কুবিন্দিকাঃ
কুম্ভকারঃ কাংস্যকারঃ ষড়েতে শিল্পিনাং বরাঃ

ব্রহ্মখণ্ড ১০ম অধ্যায়।

বিশ্বকর্মা শূদ্রাস্ত্রীতে বীর্যবান করিলে নয় প্রকার শিল্পকারী উৎপন্ন হয়। মালাকার কর্মকার শঙ্খকার কুম্ভকার ও কুবিন্দক ও কংস্যকার এই ছয় শ্রেণী শিল্পীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

এতদ্ব্যতীত ভার্গবরাম উক্ত জাতিমালা মতে

"পট্টিকাৎ গোপকন্যায়াং কুলালো জায়তে ততঃ।"

অর্থাৎ পট্টিক হইতে গোপকন্যার গর্ভে কুম্ভকার জাতির উৎপত্তি এবং পরশুরাম পদ্ধতিতেও কুম্ভকার জাতির উৎপত্তি এইরূপই লিখিত হইয়াছে। রুদ্র যমাল উক্ত জাতিমালা মতে—

"পট্টকারাচ্চ তৈলক্যাং কুম্ভকারো বভুব হ।" পট্টকার হইতে তেলির গর্ভে কুম্ভকার জাতির উৎপত্তি। এবং "বৈশ্যায়াং বিপ্রতশ্চোরাৎ কুম্ভকার স উচ্যতে" ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছে; তাহাতে, বৈশ্যের গর্ভে ব্রাহ্মণ হইতে কুম্ভকার জাতির উৎপত্তি বলিয়া মতভেদ দৃষ্ট হয়। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়া গর্ভে কুম্ভকার উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া এক পৃথক মতও বর্তমান।

ইহাদের উৎপত্তি সম্পর্কে অন্যান্য জাতির ন্যায় একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। ইহারা বলে যে মহাদেবের বিবাহের সময় কুম্ভের প্রয়োজন হয়; কিন্তু তখন কুম্ভ প্রস্তুত করিতে জানিত না। সেই অভাবে পড়িয়া মহাদেব তাঁহার গলদেশের রুদ্রাক্ষমালা হইতে দুইটি রুদ্রাক্ষ লইয়া একটি হইতে পুরুষ এবং অপরটি হইতে নারী সৃষ্টি করেন। তাহারা তাঁহার বিবাহের ঘট প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল। ঐ স্ত্রী পুরুষ হইতে কুম্ভকার জাতি হইয়াছে। এই জন্য সম্ভবত বঙ্গদেশীয় কুম্ভকারগণ তাহাদের চক্র বা চাকের উপর মহাদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকে এবং তাহাদের উপাধি রুদ্রপাল বলিয়া উল্লেখ হয়।

উপরোক্ত শ্লোকেই এবং কিম্বদন্তীতে প্রমাণ হয় ইহারা নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুই করিত, শিল্প বলিতে দেবজনবিদ্যা তথা সুকুমার শিল্প ইত্যাদি বুঝায় না; সুতরাং পাহাড়পুর ময়নামতী অথবা মহাস্থানগড়ের যে সকল শিল্পকলা অদ্য আমরা দেখিতে পাই, তাহা যে ইহাদের পূর্বপুরুষগণ করিয়াছে এমত মন্তব্য করা যায় না। বর্গভীমা মন্দিরে অথবা বক্রেশ্বর ইত্যাদি ইষ্টকের উপর এবং বিষ্ণুপুরের রাসমঞ্চের বড় টালির উপরের কাজ এবং গৌড় পাণ্ডুয়ায় একলাখির দেয়ালের যে যে অপূর্ব বাস রলিফ তাহা কোন কুম্ভকার গোষ্ঠীর দ্বারা সম্ভব নয়।

ঐ সকল কাজ সুঙ্গতুয়াশশ,গোঙর ভাস্কর (masons and stone cutters are called here Sungturash, Gonger + Bhaskar—Buchanan Hamilton) বিশেষত সূত্রধর ও বঢ়হাই কৃত। গোঙর সম্পর্কে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে গ স্থানে ক যদি করা যায়—যাহা স্বভাবত ভারতে মুসলমান যুগে ঘটিত (যথা গনেশ-র স্থানে কংস ইহা লিখন পদ্ধতি হইতেই সম্ভব হইয়াছে) সূত্রধরগণ বঙ্গের এবং বঙ্গের নিকটস্থ দেশ সমূহে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। পাটালিপুত্রের রাজপ্রাসাদ, শুনা যায় কাষ্ঠেরই ছিল। দারু নির্মিত বাসগৃহের অনেক চরিত্র গুহা নির্মাণে বর্তমান। ইহা ব্যতীত মহাপ্রভুর সময়কালীন এক ঘটনার উল্লেখ এই স্থানে করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। "নবীনানন্দ নামক একজন ভাস্কর তোমার নিকটে আসিবে এবং তোমার অনুমতি পাইলেই সে পরম উৎসাহের সহিত আমার স্বরূপ মূর্তি প্রস্তুত করিয়া দিবে সে আমাকে অনেকবার ভালরূপে দেখিয়াছে সুতরাং আমার স্বরূপ-মূর্তি সেই প্রস্তুত করিতে পারিবে। আমার পিতৃভবনের গঙ্গার পাড়ের উপর একটি প্রকাণ্ড নিমগাছ আছে…" "নবীনানন্দ সেই নিমগাছটি কাটিয়া আনিবে, এবং তদ্দ্বারা এক পক্ষ কালের মধ্যে আমার স্বরূপ-মূর্তি নির্মিত করিয়া চিত্রিত ও সজ্জিত করিয়া দিবে॥" (৪১ পৃষ্ঠা—শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ। প্রকাশক—শ্রীকামিনীকুমার গোস্বামী নবদ্বীপ ১৩৩২)। এই স্থানে ভাস্কররা কাষ্ঠ মূর্তি সকল করিত বা করে, যাযাতে বীরভূম জেলার মুরাই থানার জাজী-গ্রামের নিকটে বহু ভাস্কর আছে (যাহারা কাষ্ঠের কাজ করে) সূত্রধর এবং বঢ়হাইরাই যাহা কিছু সূক্ষ্ম ও সুন্দর কাজ করিয়া থাকে। বিষ্ণুপুর মহকুমায়,

এবং নিজ বিষ্ণুপুরে কাটানডারে বহু সুন্দর কাষ্ঠ নির্মিত থাম বর্তমান, হুগলী জয়পুর মণ্ডেশ্বর কটোয়া আউসগ্রাম থানা, কেতুগ্রাম, বীরভুম-নান্নুর লাভপুর সাঁইথিয়া. মল্লারপুর পার্শ্বে মুর্শীদাবাদ কান্দি মহকুমার ভরতপুর বারওয়ান থানা খড়গ্রাম এবং উপরে রামপুরহাট জাজীগ্রাম পূর্বে মুর্শীদাবাদ স্থতি থানা এবং গঙ্গার পূর্বকূলে মালদহ জিলার বহু স্থানে বিশেষত নিজ ইংরাজ-বাজার মালদহর গঙ্গা মাঠের কাজ সকল উল্লেখযোগ্য। সূত্রধরগণ প্রায় প্রত্যেক থানায় প্রতিমা নির্মাণকারী। প্রতিমা নির্মাণের ব্যাপারে কুম্ভকার বা পাল, কয়েক জিলা ব্যতীত অন্য কোথাও প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। দেবী মূর্তি মুখমণ্ডল অনেক স্থানে দেখা যাইবে নিম্বকাষ্ঠ নির্মিত, দেহ ও বাহু ইত্যাদি—খড়ের তৈরী এবং প্রতিমা বিসর্জনের পর ইদানীং যেমন শুধু মাত্র মুকুট সংগ্রহ করা হয়, তেমনি কাষ্ঠের মুখমণ্ডল সংগ্রহ করা হইত। সূত্রধর সম্পর্কে "Bengal Peasant Life বা গোবিন্দ সামন্ত"তে আছে কাঞ্চননগরের সূত্রধর যে মূর্তি করিত তাহা কলিকাতা হইতে অনেক শ্রেয়। কলিকাতার অনেক ধনীদের গৃহ অদ্যাপি অন্য জিলার সূত্রধর আসিয়া দেবী প্রতিমা নির্মাণ করিয়া থাকে। এই সূত্রধরগণ শুধুমাত্র কাঠ খোদাই করে এমন নহে। ইহারা অঙ্কণ বিদ্যায়ও পারদর্শী। পুঁথির পাটা, ও তাস অঙ্কণে ইহাদের দক্ষতার প্রমাণ বর্তমান। তুলির ব্যাপারে চিত্রকর ও মালাকরদের নামই প্রসিদ্ধ। মালাকররা বহু সুন্দর কিছু আঁকিতে পারিত এবং এখনও পারে, কেশীয়াড়ি থানা হইতে মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত বহু মালাকার অদ্যাবধি চিত্রাঙ্কণের কাজ করিয়া থাকে যয়ানের (মুর্শীদাবাদ বারওয়ান থানা) মালাকররা কুলা সরা বা অভ্র অঙ্কণ করিয়া থাকে। কেশিয়াড়ীর মালাকররা মেঢ় প্রস্তুত করে। কিন্তু তত্রাচ সূত্রধররা তুলি চালানে সিদ্ধ। এই সূত্রধররা গৃহ কর্মেও অদ্ভুত দক্ষ। পঙ্কের কাজ এবং প্রাচীরে নকাসীর কাজে অনেকে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ।

সূত্রধর ব্যতীত মৃৎশিল্পে অনেক পটিদারও বর্তমান। মেদিনীপুরের তমলুক অঞ্চলে ও ঘাটালে সাধারণ পুতুল-কারকদের পটিদারই বলা হয়। পটিদার কথাটি পট বাক্য হইতে গঠিত। পট যাহারা করে তাহারা পটিদার এবং এই পটিদার কথাটি তাহাদের পক্ষে প্রযোজ্য যাহারা যে কোন আকৃতি তৈয়ারী করে। সে ব্যক্তি পটিদারও হইতে পারে এবং কুমার বা অন্য জাতিও হইতে পারে। শাস্ত্রীয় পট্টিক হইতে পটিদার এবং জাতিতত্ত্বে কোথাও পট্টিক ও তৈলিক হইতে কোথাও পট্টিক গোপকন্যা হইতে কুম্ভকার জাতির উদ্ভব। সুতরাং কুম্ভকারগণের মৃৎশিল্প কর্ম পট্টিকদের নিকট হইতে প্রাপ্ত।

ইদানীং একপক্ষকে, পূর্বে উল্লিখিত, বলা হয় পাল অন্য পক্ষকে বলা হয় হাড়ীহোলাকারী কুমোর। ইহাদের মধ্যে বেনারস্‌, আজমগড়, আগত যাহারা কলিকাতা তাহারা দাসপাড়া ও হুগলী অঞ্চলে বাস করে এবং নদীয়াতেও দেশীয় পালের সহিত মিলিয়া গিয়াছে, তাহা ব্যতীত বিহার আগত বহু কুমারও মিলিয়াছে। বহিরাগত বহু কুম্ভকার চাকে ও ছাঁচে অনেক কাজ করিয়া থাকে, মালদহ জেলায় মূর্তি পর্যন্ত গড়ে।

দেশীয় কুম্ভকারগণ কিয়ৎ পরিমাণে বংশগত এবং কিয়ৎপরিমাণে অন্য জাতি যথা সূত্রধর, চিত্রকর, মালাকর ইত্যাদির নিকট হইতে মৃৎশিল্পজ্ঞান অর্জন করিয়াছে। ক্রমে ইহা তাহাদেরই

জাতি ব্যবসা বলিয়া চালাইয়াছে। এই সূত্রে, চিত্রকর গোষ্ঠির কথা উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন। এই চিত্রকরশ্রেণী বাঙলার শিল্পকলায় বিশেষ আসন অনেক দিন পর্যন্ত অধিকার করিয়াছিল। বঙ্গে দেখা যাইবে দেবীপীঠস্থান জিলায় জিলায় ছড়াইয়া আছে। সেই সকল পীঠস্থানের নিকটস্থ স্থানে মূর্তি পূজা নিষিদ্ধ ছিল। কিছুকাল পূর্বে (৩০।৪০ বৎসর পূর্বে) কালীঘাটের নিকটবর্তী স্থানে মূর্তি পূজা বিশেষ হইত না। পট পূজা হইত। বাঙলার বহুস্থানে পট পূজাই হয়। যথা কেশিয়াড়ীতে সর্বমঙ্গলা আছেন বলিয়া এখানার নিকটবর্তী গ্রাম সমূহে মেঢ় পূজা হয়। (অবশ্য কেশিয়াড়ীতে মালাকররাই মেঢ় রচনা করে) এই সকল পট সাধারণত চিত্রকরদেরই কাজ। ইহারা সাড়া বাঙলাদেশে ছড়াইয়া আছে। বিনপুর ষাঁড়পুরা, মেদিনীপুরে বহুস্থানে, বাঁকুড়ায়, বেলিয়াতোড় বর্ধমানে, বীরভূমে নানাস্থানে। মুর্শিদাবাদ কান্দি মহাকুমায়, হুগলীতে, হাওড়া জিলায় ২৪ পরগণায় এবং নিজ কলিকাতা শহরে কালীঘাটে ও পটলডাঙায় (ছিল)। ইহাদের মধ্যে বেদে পটুয়ার তত্ত্ব সম্পর্কে বিশেষ জানা যায় না, এক এক মত বর্তমান কিন্তু তাহাতে কোন সঠিক ধারণা করা যায় না। ইহাদের মধ্যে হিন্দু নাম ও মুসলমান নাম প্রচলিত, বিশেষ পাঁচথুপি বীরভূম ইত্যাদি স্থানে বিশেষভাবে ইহাদের এই নাম বিড়ম্বনা প্রচলিত। কিছুকাল পূর্বে যাহারা পটলড্যাঙায় ছিল তাহাদের মুসলমান বলিত তাহার অবশ্য কারণ আছে কারণ তখনকার দিনে হয়ত কালীচরণ পটুয়াকে জৌনপুর আগত মহম্মদ হোসেনের সাগরেদি করিতে হইত। কিন্তু বীরভূম নিবাসী চিত্রকর তথা বেদে পটুয়ারা কি কারণে আধা হিন্দু এবং আধা মুসলমান তাহা সঠিকভাবে জানা যায় না। ইহারা বৎসরের অনেক সময় গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গিয়া রাধাকৃষ্ণ বা ভাসান (বেহুলার গান গাহিয়া অন্ন বস্ত্রের সংস্থান করিয়া থাকে এবং যেখানে মালাকর সম্প্রদায় নাই সেখানে ইহারাই দুর্গা প্রতিমার চালচিত্র আঁকিয়া থাকে। পূর্ববাঙলায় (পাকিস্থানে) বহু স্থানে অদ্যাবধি গাজীর গান গীত হয়, এই গাজীপট তাহারাই অঙ্কিত করে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নিজেরাই পট প্রদান করিরা গাজীর গান করে। এইরূপ দু-একটি পট আশুতোষ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। যাদু পটুয়া বা যমপট বলিতে গেলে আলেখ্য চিত্রকরই বুঝায়, ইহারা গৃহস্থের মৃত্যুর পর, গৃহস্থের বাড়ী যাইয়া তাহার আলেখ্য দেখাইয়া বা মৃত্যুর পর তাহার অবস্থা অঙ্কিত করিয়া কিঞ্চিৎ গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করে। (আজিও এই রীতি নিম্নশ্রেণী লোকদের মধ্যে—অধুনা যাহাদের চাষীশ্রেণীর হিন্দু বলা হয় এবং সাঁওতাল, মুণ্ড ও কোল ইত্যাদিদের মধ্যে প্রচলিত আছে। এই চিত্রকরদের অঙ্কণ পদ্ধতি অথবা চিত্রকর শ্রেণীই কোন ক্ষেত্রে মৃৎশিল্পীদের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। শিল্পী ও মৃৎশিল্পীদের পদবী ও জাতি বিভিন্ন। যথা সূত্রধর, কুম্ভকার, রজক কেশিয়াড়ী কালিন্দী ডোম (সানবাজার গোপীবল্লভপুর) পাথার, লোহার (শিমলাপাল) মাঝি (চন্দ্রকোনা)।

তাহাদের চিত্রের রীতি বা arrangement এবং আঙ্গিক কিয়ৎ পরিমাণে পালেদের মধ্যে বর্তমান। আমাদের মনে হয় সর্বপেক্ষা পারস্য বা আরব্য লিখন রীতিই পালেদের টানের মধ্যে বাস্তবতা লাভ করিয়াছে। নিঃসঙ্কোচ জোরাল টান বাঙলার আদি চিত্রধর্মে বহুল পরিমাণে পাওয়া যায় যথা পাহাড়পুরও ময়নামতীর ইটে আমরা দেখিতে পাই কিন্তু তবুও একথা স্বীকার করা

প্রয়োজন যে যেমন কলিগ্রাফী আমাদের বহুভাবে উন্নীত করিয়াছে। যথা আমাদের লিখন রীতিকে অনেকটা জোরাল নূতনত্ব দান করিয়াছে—দনুজমর্দ্দন দেবের মুদ্রা পাথর ও অনেক পরে দলিল সমুহ দেখিলে আমরা বুঝিতে পারিব। অবশ্য এই সকল ব্যাপার আমরা পরে আলোচনা করিব।

আমাদের ন্যায় সম্মত এই কথা নিশ্চিত যে, পটুয়া বা চিত্রগুপ্ত মালাকর সূত্রধর ভাস্কর ইত্যাদি সকলের স্বকীয়তা মিলিয়া এই হাঁড়ী হোলাকারী কুম্ভকার শ্রেণী প্রস্তুত হইয়াছে।

বাঙলাদেশের মানচিত্র খৃষ্টের পরে প্রায় প্রত্যেক শতক বহুবার বহুভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে। শশাঙ্ক যাহা জয় করিয়াছিল মৎস্যন্যায়ে তাহা অন্যরূপ ধারন করে এবং পালবংশ পুনর্বার তাহা বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল পরে সেন বংশ খিলজীরা তথা তুর্ক পাঠান মুঘোল ইংরাজ রাজত্ব কালে বহু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ইদানীং পূর্বে গঙ্গা বা ভাগীরথী ও পদ্মা মহানন্দা, পশ্চিমে দামোদর, দ্বারকেশ্বর রূপনারায়ণ-কসাই দলভ সুবর্ণরেখা, উত্তরে ব্রাহ্মণী, ময়ূরাক্ষী অজয় বরাকর ইত্যাদি নদ ও নদী বর্তমান। জমিরূপ এক এক ক্ষেত্রে এক প্রকারে দাঁড়াইয়াছে। সাধারণত, লালমাটি, ও পলিমাটিতে ভাগ করা যায়। গোনডোয়ানা ধারার শেষভাগ লাল। তাহার পর মৃত্তিকা কিঞ্চিৎ কৃষ্ণবর্ণের, এমনকি রাজমহল পর্বতমালার দক্ষিণভাগ সমূহের মৃত্তিকা কাল। মালদহের মহানন্দার উত্তরে নবাবগঞ্জের মৃত্তিকা লাল। বাঁকুড়া জিলার মাটিতে বহুতর মৃত্তিকার সন্ধান বর্তমান। ঝাড়গ্রাম মহকুমার মাটীতে অনেক প্রকার ভেদ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও তাহা কুমাররা কাজে লাগাইতে জানে না। দামোদরের বন্যার জন্য বর্ধমান জিলার ও হুগলী জিলার দামোদর অঞ্চলের মানাজমির মৃত্তিকাসমূহ লাল। এমনকি কলিকাতার নিকটবর্তী কামারকুণ্ডুর জমি রক্তিম, কসাই নদী মেদিনীপুর অঞ্চলে অনেক ক্ষেত্রে লাল। তেমন সুবর্ণরেখার জমি লাল। বর্দ্ধমান জিলার মধ্যবর্তী স্থান সমূহ মন্তেশ্বর কেতুগ্রাম ইত্যাদির জমি ২৪ পরগণার মত নহে।

যেখানে ড্যাঙা জমি বালিয়াড়ীতে পরিণত হইয়াছে অথবা প্রায়ই বন্যাবিধ্বস্ত সেখানে দেখা যায় যে কুম্ভকারেরা নাই, যদিবা বসবাস করে তাহা নিতান্ত অল্পসংখ্যক। কসাই সুবর্ণরেখা অঞ্চলে কিছু কিছু মৃৎশিল্প আছে কিন্তু দামোদরের উত্তরভাগে তেমন কুম্ভকার দেখা যায় না। ১৮ শতকের শেষভাগ হইতে ১৯ শতকের অনেক কাল পর্যন্ত ফুলবাঁধের কথা বর্দ্ধমান রেকর্ডে দেখা যায়। বর্দ্ধমানের এই সকল অঞ্চল বহুকাল যাবৎ বন্যা পীড়িত। ফলে কুম্ভকারগণ এখানে শান্তিতে বসবাস করিতে পারে না। বাঁকুড়া জিলার দ্বারকেশ্বর নদীর ধারে রাজগা শিলাবতী নদীর তীরবর্তী ফুলবেড়ে সোনামুখী কালিনদীর নিকটে পাঁচমুড়া এবং রূপনারায়ণ তীরবর্তী বহু গ্রাম সমূহের ঘাটাল ইত্যাদি থানায় বহু কুমারের বাস। যথা চৌরীগাছা কাটালিয়া, কালনা, শান্তিপুর, নবদ্বীপ, ঘূর্ণি তীরবর্তী কৃষ্ণনগর। উত্তরে মহানন্দার তীরে এবং ২৪ পরগণায় অনেক কুমাররা বাস করে।

কোথাও কোথাও মৃত্তিকার গুণের জন্য অনেক কুমারের বাস আছে। যথা—বিষ্ণুপুর, চন্দ্রকোনা ইত্যাদিতে আবার কোথাও বাজারের জন্য কুমার মৃত্তিকার অভাব সত্ত্বেও জলের ও জ্বালানীয় অভাব সত্বে সেখানে বাস করে। যথা—কলিকাতা হাওড়া এবং নিকস্থ অঞ্চলসমূহ।

অনেক স্থানের মৃৎশিল্পীরা জাতি ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া অন্য ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছে। ১৯ শতাব্দীর শিক্ষা বিস্তার, স্বজাতি বিদ্বেষ, জাতি ব্যবসা হেয় প্রতিপন্ন হওয়াতে অনেকে দারিদ্র শ্রেয় মনে করিয়া আপন জাতি ব্যবসা পরিত্যাগ করেন। কতিপয় লোক মনে করেন ইহা অর্থনৈতিক কারণ।

জাতি ব্যবসা প্রসঙ্গে স্থির করিয়া বলা যায়, যে বর্দ্ধমান অঞ্চলে ১৯২১ সালের (?) কেনাল পত্তনের পর স্থানীয় লোকেদের ধান ছাড়া অন্য কিছুতেই মন নাই। এমন কি অন্য শাক-সব্জীর কোন চাষ পর্যন্ত নাই। লোকে বহুতর ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া লাঙ্গল শ্রেয় মনে করে। এই সূত্রে বলা যায় মেদিনীপুর কাঁথি তমলুকে বহুদিন ধরিয়া কেনাল বর্তমান তত্রাচ সেখানকার লোকেরা বহু শিল্পকলায় পারদর্শী। মাদুর ধামা মৃৎশিল্প ইত্যাদিতে বিশেষ প্রসিদ্ধ। বর্দ্ধমান জিলার তুলনায় এখানে বহু স্থানে বৃহৎ মেলা বসিয়া থাকে। তবু বাজার প্রায় দুই জিলার সমান। কলিকাতা ও নিকটস্থ জিলা সমূহে মাল পাঠাইবার দিক হইতে মেদিনীপুরের কিছু সুবিধা বর্তমান অর্থাৎ নদী বা কেনাল পথে মাল যাওয়া-আসা করিতে পারে। জন সংখ্যা প্রায় এক সত্ত্বেও মেদিনীপুরের লোক কলিকাতায় কর্মে ব্যাপৃত আছে, কিন্তু বর্দ্ধমানে সকল সময় জনমজুর কমতি, তাই পৌষ মাসে অন্যত্র হইতে ধান কাটিতে মজুর আসে। তবু এখানকার লোক আত্মসম্মান বজায় রাখিতে অত্যন্ত তৎপর।

তীর্থস্থান হিসাবে কালীঘাট নবদ্বীপের মত পুরাতন নয়, এখানে মেদিনীপুর হইতে মাল আসে কিন্তু বর্দ্ধমান জিলার অন্যান্য স্থান হইতে নবদ্বীপে মাল যায় না। মেদিনীপুর হইতে অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়া হুগলী নদী হইতে কাঁকুড়গাছি কিম্বা সুতাহাট থানা, অথবা ঘাটাল হইতে রূপনারায়ণ ধরিয়া গঙ্গা বহিয়া কলিকাতায় বহু জিনিস আসে।

অবশ্য, বর্দ্ধমান জিলায় মৃৎশিল্প ব্যতীত অন্য শিল্পকর্মে প্রসিদ্ধি আছে। এই জিলায় কাংস্য শিল্প ও লৌহ শিল্পের প্রচার চর্চা ও ব্যবসা অত্যধিক বেশী। শুধু মাত্র বোনপাস কামার পাড়ায় হাজার হাজার কংস্য শিল্পীর বাস। কাঞ্চননগর একদা লৌহ শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। মৃৎশিল্পীর সংখ্যা খুব বেশী নাই, ইহার কারণ সাধারণের মধ্যে শাস্ত্রীয় পূজা ও দেশজ পূজার প্রচার বিশেষ নাই। ধনীর নজরে কোন কালেই এই শিল্প পড়ে নাই। মৃৎশিল্প যেখানে রাজাবাদশার সুনজরে পড়িয়াছে সেখানেই দেখা যাইবে এই শিল্প উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। যথা—৮৪ বিঘা দানের কথা আমরা সকলেই জানি। ১৯ শতকে য়ুরোপীয় পারিসের প্রদর্শনীতে সেখানকার নদীয়া জেলার কাজ অত্যন্ত প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল।

সারা বৎসরের পেশা হিসাবে মৃৎশিল্পকে অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করা প্রায় জিলায় দেখা যায় না। ইহাদের প্রায় অংশই জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় হইতে লাঙল দেওয়ার কাজে ব্যাপৃত থাকে, তাছাড়া বর্ষায় জ্বালানী সংগ্রহ করাও একটি কারণ; পৌষে ধান কাটার কাজেও ব্যস্ত থাকিতে হয়। সকলেই যে অন্যের জমিতে মনিষ খাটে তাহা নয়, নিজেদের জমি যাহা তাহারা পুরুষানুক্রমে ভোগদখল করিতেছে তাহার পাট করিতে হয়। এই সকল জমি ধনীদের নিকট অথবা জমিদারের নিকট হইতে তাহারা দান হিসাবে পাইয়াছে। এই জমির কিয়দংশ পারিশ্রমিকের

পরিবর্তেও দেওয়া হয়, যাহাতে তাহারা বৎসর সালিয়ানা ১৩ পারবনে সকল কিছু সামগ্রী বা মূর্তি সরবরাহ করিবে। গ্রামে গ্রামে দেখা যায় এই হেতু মৃৎশিল্প ইহাদের পুরাপুরি পেশা নহে। কুমারের ক্ষেত্রে বলা যাইতে পারে সুবিধা পাইলে তাহারা চাক চালায়, পোয়ান জাগায় আর স্ত্রীলোকেরাই অবসর সময়ে অর্থাৎ গৃহস্থালির কাজকর্ম সারিয়া পুতুল ইত্যাদি গড়ে। তাহাও কোন মেলা খেলা লাগিবার পূর্বে তাহারা এই কাজ করিয়া থাকে।

সে স্থানে ধনী অথবা বড় গৃহস্থ তেমন নাই বা হাট বাজার নাই, তীর্থস্থান নাই সেহ স্থানে যদি দেখা যায় এই শিল্পীর সম্বৎসরের পেশা হইয়াছে, তাহা হইলে বুঝিয়া লইতে হইবে যে সেইস্থানে গ্রাম্য পূজার যথেষ্ট চলন আছে। শাস্ত্রীয় পূজা অর্থবান না হইলে করা অসম্ভব। তাহা ব্যতীত নিত্য পূজার মূর্তির গায়ে অনবরত গঙ্গাজল পড়িলে মূর্তি বিকৃত হইতে পারে এবং তাহা অমঙ্গলজনক ফলে সাধারণ গৃহস্থ নিত্যপূজার ঠাকুর মাটির প্রতিমা স্থাপন করেন না। সুতরাং মৃৎশিল্পীরা নিত্য পূজার মূর্তিসকল প্রস্তুত করে না উহা সাধারণত পিতলেরই হইয়া থাকে। ১৯ শতকের শেষভাগে বিদেশ আগত বহু চীনামাটি নির্মিত দেবদেবীর মূর্তি আসিত তাহা কোন কোন গৃহে পূজা হইত, কেহ আলমারীতেও রাখিতেন। গ্রাম্য দেবতা বা পীরের পূজার জন্য হাতী ঘোড়া লাগে, যেখানে যেখানে সেই পূজাবিধির চলন আছে সেখানে লোকে তাহা তৈয়ারী করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে। যথা বিষ্ণুপুর মহকুমার তালডেংরা থানার পাঁচমুড়া, বাঁকুড়ার রাজনগর, বরদা, গোপী বল্লভপুর, ২৪ পরগণায় বারুইপুর থানায় আটঘর ঝাড়গ্রাম বামুনমুড়া ইত্যাদি

সাধারণ মৃৎশিল্পীদের অবস্থা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ইহাদের বাসস্থান খারাপ, খাদ্য কদর্য, পরিধেয় লজ্জাকর। সাধারণের সহিত আমরা কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পী ইদানীং যাহারা নিজেদের ভাস্কর বলে তাহাদের সহিত তুলনা করি তাহা হইলে ভুল করা হইবে। কৃষ্ণনগরের অবস্থা অবিশ্বাস্য, তাহারা ঘোর রাজসিক, অনেকেরই বিরাট প্রাসাদ আছে, নিত্যসেবার বিগ্রহ আছে, কাঙাল দরিদ্রকে দান আছে, গোলমাল শুনিলে ভয় পায়, চৌকিদারকে আদর করে। ইহাদের মতই অবস্থা নদীয়া জিলার নবদ্বীপের মৃৎশিল্পীর—হয়ত প্রাসাদতুল্য গৃহ নাই তবুও তাহারা রাতবেরাতে বিপদে পড়িলে সামলাইয়া লইবার চেষ্টা করিতে পারে। কিন্তু অন্যদের অবস্থা যাহারা শিল্পকর্মে রত আছে, তাহাদের বক্ষ প্রায় পায়রার মত, সূত্রধর, চিত্রকর, ভাস্কর ইত্যাদি। কুৎসিত লিভারের ছাপ মুখমণ্ডলকে ক্লিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে, জাজীগ্রাম হইতে আরম্ভ করিয়া গোপীবল্লভপুর; সুতাহাট-বনগ্রাম হইতে, চোড়দা, চালিয়ানা হইতে আন্দুল। অবস্থার তারতম্য নাই। যদি আমরা হিসাব করি, তাহা হইলে দেখিব যে ইহারা দিনে মাত্র একবারই খাবার পায়। শীতে খড়ের উপর ঘুমায়, সন্ধ্যার পর কচিৎ বাড়িতে আলো জ্বলে। কাঁচামাল খরিদ করিবার অর্থ নাই। কোথাও কোথাও মেলা বসে তখন তাহারা দুই একটি জিনিস তৈয়ারী করিয়া বিক্রয় করে, মাটির পুতুল যদিবা বহু দূর অঞ্চলে যায় কিন্তু কাষ্ঠ নির্মিত পুতুল—একমাত্র পাটুলি ও চন্দননগরের পুতুল কলিকাতায় আসে—বহু দূরে যায় না। মাটির পুতুল—যাহা কাটালিয়া গ্রামে তৈয়ারী হয় তাহা সালার-কান্দি রাস্তা অথবা, লাভপুরের রাস্তা ধরিয়া নগর এবং বোলপুর পর্যন্ত যায়। (কলিকাতায়

সাধারণ লোকেরা ইহাকে বোলপুরের পুতুল বলিয়া জানে) সুতাহাটার পুতুল তমলুক পাশকুঁড়ায় যায়। পাশকুঁড়ার পুতুল সোনামুখার পুতুল বর্দ্ধমানে বিক্রয় হয়। এইভাবে একস্থান হইতে আর একস্থানে লইয়া যাওয়ার কাজ প্রায়ই কোড়িয়ারা করিয়া থাকে, মৃৎশিল্পের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই।

এই সকল শিল্পীরা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া কোথাও কোথাও বিক্রয় করে। প্রায়ই সামগ্রীর পরিবর্তে চাল বা ধান পায়, মহকুমা অথবা জিলা সহরে যেখানে চাকুরিয়ার সংখ্যা অধিক সেখানে দুই একটি কাপড় বা জামা (শতছিন্ন) চাহিয়া লয়। এই কথা সকল শিল্পীদের পক্ষেই প্রযোজ্য, যথা—সূত্রধর চিত্রকর, ভাস্কর ঢোকরা কামার মৃৎশিল্পী। ইহাদের মধ্যে যাহারা ঠাকুর গড়ে তাহাদের অন্তত বছর শালিয়ানায় কয়েক পক্ষকাল ভাল চলে অর্থাৎ মাড়ভাত পায়। তাহার কারণ দানের জমি সকল ইহারা চাষ করে। এবং ৺দুর্গা পূজার সময় বাবুর বাড়িতে একা তিন বেলা খাদ্য পায়, কাপড় পাইয়া থাকে।

শিল্পীদের অনেকে প্রায়ই উদর রোগ ম্যালেরিয়া ও যক্ষায় ইহলীলা সম্বরণ করে। চিকিৎসা যদিবা টোটকা হয় কিন্তু খাদ্য একেবারে নাই। ফলে বহু রোজ বিনা কাজে বহিয়া যায়।

এই সকল শিল্পীদের মধ্যে একমাত্র কুম্ভকার সম্প্রদায় অপেক্ষাকৃত ভাল। কারণ তাহারা গৃহস্থের নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ তৈয়ারী করে এবং হাটে বাজারে লইয়া যায়। কেহ কেহ টালির কারখানা করিয়াছে, যথা—কাটালিয়ায়। ইহাতে তাহারা বেশ কিছু অর্জন করে এবং ছেলেদের স্কুলে পাঠাইতে সমর্থ হয়।

লেখা পড়ার চর্চা উহাদের মধ্যে আদৌ নাই। তাহার একমাত্র কারণ সময় ও সুযোগ। ইহারা কোন কালে কোন সুযোগ লাভ করে নাই। শাস্ত্রীয় মূর্তির সকল কিছু বিচার সংস্কৃত ভাষায় লিখিত আছে এবং তাহা নূতন করিয়া জানিবার প্রয়োজন নাই বংশ পরম্পরায় রূপ কল্পনা চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু যখন মূর্তি হয়, যথা ৺কালী বা চণ্ডী মূর্তি তখন, পণ্ডিতমশায়রা রূপ বর্ণনা করিয়া দিয়া থাকেন।

মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রী

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

১৮৬০ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে মাদ্রাজ রাজ্যের তিনিভেলী জেলার তারুবৈ নামক গ্রামে এক নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ পরিবারে তারুবৈ অগ্রহরম্ গণপতির জন্ম হয়। গণপতির পিতা রামসুব্বিয়র খৃষ্টিয় ষোড়শ শতাব্দীর অশেষ শাস্ত্রবেত্তা ও বহু গ্রন্থপ্রণেতা অপ্পয় দীক্ষিতের বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

উপনয়ন সংস্কারের পর ৮ হইতে ১২শ বর্ষ বয়সের মধ্যেই গণপতি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া সমগ্র যজুর্বেদ পাঠ সম্পন্ন করেন। কৈশোর অতিক্রান্ত হইলে গণপতি আরও উত্তমরূপে সংস্কৃত শিক্ষালাভ করিবার নিমিত্ত তদানীন্তন ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের রাজধানী ত্রিবেন্দ্রম্ নগরে (বর্তমানে কেরল রাজ্যের রাজধানী) আগমন করেন এবং সুব্বা দীক্ষিতার ও ধর্মাধিকারী কর্মনাই সুব্রাহ্মণ্য নামক দুইজন বিখ্যাত পণ্ডিতের নিকট বিবিধ শাস্ত্র পাঠ করেন। অত্যল্পকালের মধ্যেই গণপতি অলঙ্কার, ব্যাকরণ ও দর্শনশাস্ত্রে সবিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়া শাস্ত্রী উপাধি লাভ করেন ও পণ্ডিতসমাজে প্রসিদ্ধি পান। ১৭ বৎসর বয়সে গণপতি "মাধবী বসন্তম্" নামে একটি সংস্কৃত নাটক রচনা করিয়া ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা বিশাখম্ তিরুমলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ত্রিবাঙ্কুর মহারাজ বিশেষ বিদ্যোৎসাহী ও গুণগ্রাহী ব্যক্তি ছিলেন।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ত্রিবাঙ্কুর মহারাজ গণপতিকে ত্রিবেন্দ্রমস্থ রাজকীয় প্রাসাদ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করেন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে মহারাজার আনুকুল্যে ত্রিবেন্দ্রমে একটি সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়, গণপতি এই নবপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যায়তনের প্রধান সংস্কৃত শিক্ষক নিযুক্ত হন। এই সময়ে গণপতি কয়েকটি সংস্কৃত কবিতা ও পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। দশবৎসর কাল সংস্কৃত কলেজে প্রধানশিক্ষকরূপে কার্য করার পর ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে গণপতি এই কলেজের অধ্যক্ষের পদ লাভ করেন।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা ত্রিবেন্দ্রমে একটি সরকারী পুঁথিসংগ্রহ (Oriental Manuscript Library) স্থাপন করেন। নানাস্থান হইতে সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহ করিয়া এইগুলি এই পুঁথিমালায় রক্ষা করা এবং নির্বাচিত দুষ্প্রাপ্য পুঁথিগুলি মুদ্রিত করাই ছিল এই পুঁথিমালা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য। ইতিপূর্বে কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির "বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা সিরিজ', বারাণসীর ভিজিয়ানাগ্রাম সিরিজ, নির্ণয়সাগর গ্রন্থমালা (বোম্বাই), আনন্দাশ্রম গ্রন্থমালা (পুণা) প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রন্থমালায় বহু দুর্লভ সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সংস্কৃত সাহিত্যের ব্যাপক প্রচার ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির প্রয়োজনের তুলনায় এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের পুস্তক প্রকাশক্ষমতা সীমাবদ্ধ দেখিয়া ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে উহা প্রকাশের জন্য ত্রিবেন্দ্রম সংস্কৃত সিরিজ নামীয় গ্রন্থমালারও প্রবর্তন করেন। ত্রিবেন্দ্রমের সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠিত হইলে মহারাজা গণপতিকেই উহার অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন এবং ত্রিবেন্দ্রম্ সংস্কৃত গ্রন্থমালা (Trivandrum Sanskrit Series) তাঁহার দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৯০৮ হইতে ১৯২৫

খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি এই পুঁথিশালার অধ্যক্ষ (Curator) রূপে গণপতি স্বয়ং ১৪০০ শত খানি দুর্লভ সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহ করেন। ত্রিবেন্দ্রম্ সংস্কৃত সিরিজে প্রকাশিত প্রথম ৮৭ খানি পুস্তকের ৬৮ খানি গণপতি একক চেষ্টায় টিকা, টিপ্পনি ও বিস্তৃত ভূমিকা সহ সম্পাদনা করিয়া প্রকাশ করেন। এই পুস্তকগুলি বেদ, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, তর্ক, মীমাংসা, ধর্মশাস্ত্র, জ্যোতিষ, স্থাপত্য, তন্ত্র, কল্প, রাজনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে সংস্কৃত ভাষায় রচিত। সম্পাদকরূপে গণপতি এই পুস্তকগুলির সহিত যে সব ভূমিকা টিকা প্রভৃতি রচনা করেন সেগুলি একত্র করিলে বৃহৎ আকারের ৮০০ পৃষ্ঠার একটি পুস্তকের রূপ লইতে পারিত। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির বার্ষিক সভায় সভাপতির ভাষণে প্রাচ্যবিদ্যা পারঙ্গম মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় গণপতি শাস্ত্রী সম্পাদিত সংস্কৃত গ্রন্থমালার শুদ্ধপাঠ, সুষ্ঠু সম্পাদন ও জ্ঞানগর্ভ ভূমিকাগুলির বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। গণপতির একক চেষ্টার সংস্কৃতের ৪৩ জন লেখকের রচনা সর্বপ্রথম আবিস্কৃত হয়। এই লেখকদের নাম ও পরিচয় তাঁহারই চেষ্টায় প্রচারিত হয়। সংস্কৃত সাহিত্যের যথাযথ ইতিহাস রচনায় গণপতি শাস্ত্রী পরিবেশিত তথ্য ও তাঁহার মতামতগুলি বর্তমানে অমূল্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

সংস্কৃত লৌকিক সাহিত্যের কালিদাস পূর্ববর্তী কবি ভাস ও তাঁহার রচনাবলী বর্তমানে সুপরিচিত। ভাসের রচনাবলী আবিষ্কার ও তাহার প্রচার গণপতির জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন ব্যক্তিরা ভাসের নামের সহিত অপরিচিত ছিলেন না। সুপ্রাচীন সংস্কৃত আলঙ্কারিক ভামহ তাঁহার কাব্যালঙ্কার গ্রন্থে ভাসের রচনার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিয়াছেন—ইহা সংস্কৃতজ্ঞদের নিকট সুবিদিত। এতদ্ব্যতীত (খৃঃ ৪র্থ শতাব্দী) মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে, বাণভট্টের (খৃঃ ৭ম শতাব্দী) হর্ষচরিত কাব্যে, বাক্‌পতির (খৃঃ ৮ম শতাব্দী) গৌড়বহ কাব্যে এবং রাজশেখরের (৯ম শতাব্দী) রচনাতেও একজন সুকবি হিসাবে ভাসের প্রশংসা ও উল্লেখ আছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে খৃষ্টিয় দশম শতাব্দী পর্যন্ত ভাসের রচনা আমাদের দেশে সুপ্রচারিত ছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয় পরবর্তী সহস্র বৎসরের মধ্যে ভাসের রচনার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। এই শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত তিনি তাঁহার নামের মধ্যেই জীবিত ছিলেন মাত্র, তাঁহার কোন রচনার কোন সন্ধানও এই কালের মধ্যে পাওয়া যায় নাই।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে ত্রিবেন্দ্রমের সরকারী পুঁথি সংগ্রহালয়ের অধ্যক্ষরূপে পুঁথি সংগ্রহের কার্যে ব্যাপৃত থাকার সময় ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলে পদ্মনাভপুরম্ নামক স্থানের নিকট অবস্থিত মানালিক্কর মঠ হইতে তালপত্রে লিখিত ১০ খানি নাটক উদ্ধার করেন। এই নাটকগুলি একত্রে বাঁধা ছিল। সংস্কৃত ও শৌরসেনী প্রাকৃতে রচিত এই নাটকগুলি মালয়ালী অক্ষরে লিখিত ছিল। গণপতি শাস্ত্রী অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারেন যে এইগুলি স্থানীয় লোকেরা প্রাচীনকালে যাত্রার পালা হিসাবে ব্যবহার করিত। দশখানি পুঁথি উদ্ধারের পর গণপতি এইস্থান হইতে আরও তিনখানি পুঁথি পান। এই তিনখানি পুঁথির দুইটির প্রতিলিপি ত্রিবাঙ্কুর রাজপ্রাসাদস্থ পুঁথি সংগ্রহের মধ্যেও পাওয়া যায়। এই পুঁথিগুলির কোনটিরই প্রস্তাবনা অথবা পুষ্পিকায়

(Colophone) ভাসের নামের উল্লেখ ছিল না। অলঙ্কার শাস্ত্র লৌকিক সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা সাহিত্যে প্রগাঢ় দক্ষতাহেতু গণপতি এইগুলিকে ভাসের লুপ্ত রচনারূপে চিহ্নিত করেন। এই নাটকগুলিতে সন্নিবিষ্ট শৌরসেনী প্রাকৃতের ভাষাতাত্ত্বিক বিচারেই তিনি এই সিদ্ধান্ত করেন যে এইগুলি কালিদাস পূর্ববর্তী যুগে লিখিত হইয়াছে। ১৯১২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে গণপতি ত্রিবেন্দ্রম্ সংস্কৃত গ্রন্থমালায় উপরিউক্ত তেরখানি নাটক ভাসের নামে চিহ্নিত করিয়া প্রকাশ করেন।১ ইহার সহিত তিনি সংস্কৃত সাহিত্য মন্থনপূর্বক বহু যুক্তি ও তথ্যের অবতারণা করিয়া ভাস সম্বন্ধীয় তাহার সিদ্ধান্তগুলি প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন। নাটকগুলির সহিত গণপতির নিজস্ব টিকা, টিপ্পনীও সংযোজিত হয়। গণপতি শাস্ত্রী এইরূপ মত প্রকাশ করেন যে কালিদাস শুধু বাল্মিকী ও ব্যাসের নিকট ঋণী নহেন, তিনি ভাসের দ্বারাও প্রচুর প্রভাবিত হইয়াছেন। শূদ্রক রচিত মৃচ্ছকটিক নাটকটির উপাদানও ভাসের চারুদত্ত নাটক হইতে গৃহীত হইয়াছে—গণপতি এই মত প্রকাশ করেন।

ভাসের রচনাবলীর আবিষ্কার সংবাদে ভারতে ও ভারতের বাহিরে সংস্কৃতজ্ঞ সুধিবর্গের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। ভাসের রচনাবলী গণপতি কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ এই রচনাগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া দেখিবার সুযোগ পান। ভাসের রচনাবলী প্রকাশের পর অতি সুদীর্ঘকাল ধরিয়া সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে ভাস সম্বন্ধীয় গবেষণা চলিতে থাকে। ভাস প্রসঙ্গে গবেষণাকারী ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মধ্যে য়াবোবি, য়ুয়োলি, উইন্‌ট্যরনিৎজ, ষ্টেনকোনো, ল্যাকোটে, বার্নেট, ফ্রেড্‌রীথ্‌ টমাস্ ও আর্থার বেরিডেল কীথের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিত পিসারোটি, সুখ্‌ঠণ্‌কর, রামাবতার পাঁড়ে, পরশুরাম বামন কানে রঙ্গাচারী ও অনন্তপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রীর নামও ভাস-বিতর্ক প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। দীর্ঘকাল আলোচনান্তে বর্তমান এই মতটিই সর্বজনগ্রাহ্য হইয়াছে যে গণপতি আবিষ্কৃত ও সম্পাদিত ভাসের রচনাবলী প্রকৃতই ভাস রচিত এবং ভাস কালিদাসের পূর্ববর্তী কবি। ভাস আলোচনায় প্রসিদ্ধ ইংরাজ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত আর্থার বেরিডেল কীথ্‌ গণপতির মতামতগুলি সর্বাধিকভাবে সমর্থন করেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মধ্যে বার্নেট (L. D. Brrnett) এবং দেশীয় পণ্ডিতদের মধ্যে পিসারোটি ও রামাবতার পাঁড়ে ভাসকে কালিদাসের পরবর্তী বলিয়া মত প্রকাশ করেন। তাঁহারা বলেন যে ভাস সম্ভবতঃ ৭ম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন। গণপতি ভাসকে খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর কবি বলিয়া অনুমান করেন, গণপতির এই মতটি অবশ্য কেহই গ্রহণ করেন নাই; কীথ্‌ ও উইন্‌ট্যর্ নিৎজ উভয়েই ভাসকে খৃষ্টিয় তৃতীয় শতাব্দী অথবা চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম ভাগের কবি বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। সাধারণভাবে ভাসের কাল হিসাবে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মতানুযায়ী কালই গৃহীত হইয়াছে। ভাস বিতর্কের প্রতিটি ক্ষেত্রে গণপতি প্রতিপক্ষের মতকে বিধ্বস্ত করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করেন একথা বলাই বাহুল্য।

ত্রিবেন্দ্রম্ সংস্কৃত গ্রন্থমালায় গণপতি সম্পাদিত অসংখ্য পুস্তকাবলীর মধ্যে তাঁহার আবিষ্কৃত ও সম্পাদিত আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প (৭৬নং, ১৯২০—১৯২৫) ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য (৩ খণ্ড, ১৯২১—১৯২৫) ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের সহিত গণপতির নিজস্ব একটি

উপাদেয় টিকা (শ্রীমুলম) সন্নিবিষ্ট ছিল। আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প পুস্তকে খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী হইতে খৃষ্টিয় অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত যে সকল নৃপতি ভারতে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের বিবরণ অবশ্য দুর্বোধ্যরূপে লিপিবদ্ধ আছে। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার উপযোগী অমূল্য উপাদান এই পুস্তকে নিহিত আছে। গণপতি আবিষ্কৃত ও সম্পাদিত এই দুষ্প্রাপ্য পুস্তকটি অবলম্বন করিয়া পরবর্তীকালে যশস্বী ঐতিহাসিক কাশীপ্রসাদ জয়সোয়াল একটি অতি উল্লেখযোগ্য ইতিহাস পুস্তক রচনা করিয়া তাঁহার খ্যাতিবৃদ্ধি করেন (An Imperial History of India in a Sanskrit Text C 700 B. C. to C. 770 AD, Lahore, 1934).

ত্রিবেন্দ্রম সংস্কৃত গ্রন্থমালার সম্পাদক রূপে গণপতি শুধু সাহিত্য, দর্শন, ব্যাকরণ, অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্রেই মনোযোগ নিবদ্ধ রাখেন নাই। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের ন্যায় রাজনীতি সংক্রান্ত পুস্তক সম্পাদন ও প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রযুক্তি বিদ্যা সংক্রান্ত কয়েকটি পুস্তক প্রকাশ করিয়া প্রকাশিত সংস্কৃত সাহিত্যের সীমা সুপ্রসারিত করিয়া দেন। এই প্রসঙ্গে গণপতি সম্পাদিত সমরাঙ্গন সূত্রধার (গায়কোয়াড় প্রাচ্যবিদ্যা সিরিজ, ১৯২৪) পুস্তকটির নাম উল্লেখযোগ্য। ভোজরাজের নামে প্রণীত এই পুস্তকটি হইতে শিল্প চর্চায় এবং গৃহ ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি ও সামরিক দ্রব্যসম্ভার প্রস্তুত সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতীয়রা কতদূর ব্যবহারিক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক ভোজ রাজের নামে বইটি প্রচলিত হইলেও মনে হয় ইহা ভোজের নামে সঙ্কলিত হইয়াছে মাত্র। ইহাতে লিপিবদ্ধ তথ্যগুলি দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রাচীন ভারতবাসীগণ গার্হস্থ্য ও সামরিক প্রয়োজনে ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। গণপতি সম্পাদিত বস্তুবিদ্যা ও শিল্পসংক্রান্ত আরও কয়েকটী পুস্তকের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য— বাস্তুবিদ্যা (১৯১৩), ময়মতম্ (১৯১৯), শিল্পরত্ন (শ্রীকুমার রচিত (১৯২২) প্রভৃতি।

ত্রিবেন্দ্রম্ সংস্কৃত পুঁথিসংগ্রহশালার অধ্যক্ষ ও ত্রিবেন্দ্রম্ সংস্কৃত গ্রন্থমালার সম্পাদকরূপে গণপতির পাণ্ডিত্য ও অধ্যবসায় সমগ্র পৃথিবীর সংস্কৃত প্রিয় ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে প্রয়াগে নিখিল ভারত সংস্কৃত সম্মেলনে গণপতিকে সঙ্ঘের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। এই বৎসরই ভারত গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত করেন।

প্রধানতঃ প্রাচীন পন্থায় সংস্কৃত পাঠ গ্রহণ করিলেও গণপতি নিজের চেষ্টায় ইংরাজী ভাষাও উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ত্রিবেন্দ্রম্ সংস্কৃত গ্রন্থমালার বহু পুস্তকে তাঁহার লিখিত ইংরাজী ভূমিকাসংযোজিত আছে। শুধু বিদেশী ভাষাতেই তিনি দক্ষতা লাভ করেন নাই, পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের ন্যায়বৈজ্ঞানিক আলোচনা পদ্ধতিও (critical) তিনি উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে জার্মাণীর প্রসিদ্ধ সংস্কৃত শিক্ষাকেন্দ্র Tubingen বিশ্ববিদ্যালয় ভাসের নাটকাবলী আবিষ্কার ও প্রকাশের জন্য গণপতিকে Ph. D উপাধি দান করেন। লণ্ডনস্থ গ্রেটব্রিটেন ও আয়ারল্যাণ্ডের এশিয়াটিক সোসাইটি ১৯২০ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে সোসাইটীর সম্মানিত সদস্য শ্রেণীভুক্ত করেন (Honorary Member)। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার ওরিয়েণ্টেল সোসাইটি, গ্রেটব্রিটেনের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি ও ফ্রান্সের সোসাইতে এশিয়াটিকের সদস্যবৃন্দ পারী শহরে একটি মিলিত অধিবেশনে গণপতি শাস্ত্রীর ভূয়সী প্রশংসা জানাইয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

এই প্রস্তাবে বলা হয় যে ইউরোপ আমেরিকায় এই সব প্রাচ্যবিদ্যা সেবকেরা এই আশা পোষণ করেন যে ডাঃ গণপতি শাস্ত্রী দীর্ঘজীবী হইবেন এবং তাঁহার অতি উপাদেয় গবেষণা ধারা যাহা ভারতবিদ্যার বিভিন্ন ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করিয়াছে তাহা অব্যাহত থাকিবে ["They trust that he (Dr Sastri) may be enabled to continue a work of research so fruitful in large contributions to several departments of Indian Literature]"। আর্থার এন্টনি ম্যাকডোনেল, ফ্রেড্‌রিক্ এডেন পার্জিটার, লিয়োনেল্ ডেভিট, বার্নেট, জর্জ গ্রীয়ারসন্, ফ্রেডারিখ্ উইলিয়ম্ টমাস, আর্থার বেরিডেল কীথ, এডোয়ার্ড জেমস র‍্যাপসন্, এমিল চার্লস সেনার, সিলভ্যাঁ লেভি, লুই ফিনো জুল ব্লখ্, মরিস্ ব্লুমফিল্ড, নর্মান ব্রাউন, চার্লস রকওয়েল লানম্যান প্রভৃতি ইংরাজ, ফরাসী ও মার্কিন প্রাচ্য-বিদ্যা বিশারদেরা এই প্রশস্তি পত্রে স্বাক্ষর দান করেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের নিকট হইতে ভারতীয় পণ্ডিতদের এইরূপ সম্বর্দ্ধনা লাভের দৃষ্টান্ত বড় বেশী পাওয়া যায় না।

দীর্ঘ সতের বৎসর কাল ত্রিবাঙ্কুর সরকারী পুঁথি সংগ্রহালয়ের অধ্যক্ষতা করার পর ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে গণপতি চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ইহার অল্প কিছুকাল পরে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ৩রা এপ্রিল স্বীয় পল্লীভবনে তিনি পরলোক গমন করেন। গণপতির অবসর গ্রহণের পর তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য ও সহকর্মিগণ ত্রিবাঙ্কুর সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহালয় ও ত্রিবেন্দ্রম্ সংস্কৃত সিরিজ প্রকাশনার কাজ অব্যাহত রাখেন।

১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের ৩০শে মার্চ ত্রিবেন্দ্রম্ প্রাচ্য বিদ্যা বা সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহালয় ভবনে (Govt. Oriental Manuscript Library) কর্তৃপক্ষের চেষ্টায় মহামহোপাধ্যায় গণপতির একটি চিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ডাঃ সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণণ আনুষ্ঠানিকভাবে চিত্রের আবরণ উন্মোচন করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি গণপতি আবিষ্কৃত ও সম্পাদিত গ্রন্থাবলীর উল্লেখ করেন এবং বলেন যে গণপতির জীবনব্যাপী সাধনা অতীত ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাস তথা সংস্কৃত সাহিত্যের যথাযথ ইতিহাস উদ্ঘাটনে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। শঙ্করাচার্য যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন সেই দেশে তাঁহার জন্ম সার্থক হইয়াছে।

ভারতীয় স্বাধীনতা লাভের কিছুকাল পর দেশীয় রাজ্যরূপে ত্রিবাঙ্কুরের বিলুপ্তি ঘটে এবং ইহা ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন নামে একটি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ইহার কিছুকাল পর রাজ্যসমূহের পুনর্বিন্যাসের ফলে ত্রিবাঙ্কুরের মালয়ালম ভাষী অঞ্চল কেরল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের রাজধানী ত্রিবেন্দ্রম্ এই কেরল রাজ্যের রাজধানী হয়। কেরল রাজ্য গঠিত হইবার পর বর্তমানে ত্রিবেন্দ্রম্ সংস্কৃত সিরিজ—কেরল বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃত সিরিজ ও ত্রিবেন্দ্রম্ সংস্কৃত সিরিজ এই যুক্ত নামে প্রকাশিত হইতেছে। গণপতি শাস্ত্রীর অধ্যক্ষতা কাল হইতে ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে পর্যন্ত এই সিরিজে ২১৩ খানি দুর্লভ সংস্কৃত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থমালায় মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রী সম্পাদিত এই পুস্তকগুলির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশিকা (১৯০৯), দুর্ঘট বৃত্তি (১৯০৯), পরমার্থসার (১৯১১), কামন্দকীয় নীতিসার (১৯১২), বৈখানস ধর্ম প্রশ্ন (১৯১৩), জানকী পরিণয় (১৯১৩), বররুচি সংগ্রহ (১৯১৩), পরিভাষা-বৃ

(১৯১৫), তন্ত্রশুদ্ধপ্রকরণ (১৯১৫), আপস্তম্ব ধর্মসূত্র (১৯১৫), নাম লিঙ্গানুশাসন (১৯১৪-১৭), শব্দনির্ণয় (১৯১৭), সর্বমতসংগ্রহ (১৯১৮), তন্ত্রসমুচ্চয় (১৯১৯), যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি (১৯২২), তত্ত্বপ্রকাশ (১৯২০), বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্র (১৯২০), মধুসূদন সরস্বতীকৃত ঈশ্বর প্রতিপত্তি প্রকাশ (১৯২১), আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র (১৯২৩), সঙ্গীত সময় সার (১৯২৫), বিষ্ণুসংহিতা (১৯২৫)।

(১) স্বপ্ন বাসবদত্তা, প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ, পঞ্চরাত্র, অবিমারক, বালচরিত, মধ্যমব্যায়োগ, দূতকাব্য, দূত ঘটোৎকচ, কর্ণভার, ঊরুভঙ্গ (১৯১২), অভিষেক (১৯১৩), চারুদত্ত (১৯১৪), প্রতিমা নাটক (১৯১৫)।

সম্পাদক ও সাহিত্যসাধক কালীপ্রসন্ন সিংহ

কমল চৌধুরী

১৮৫৭ খৃঃ কালীপ্রসন্ন সিংহের বাড়ীতে বিদ্যোৎসাহিনী থিয়েটারে 'বেণীসংহার' নাটক অভিনীত হয়। বিখ্যাত দেশী ও বিদেশী ব্যক্তিরা এই অভিনয়-রজনীতে উপস্থিত ছিলেন। বহুজনের প্রশংসা লাভ করলেও কালীপ্রসন্ন এই অভিনয় ও নাটক দেখে সন্তুষ্ট হোতে পারেন নি। অনেকের মতে নাটকটি কালীপ্রসন্নের অনুবাদ তা সত্য নয়। 'বিক্রমোর্ব্বশী'র বিজ্ঞাপনে কালীপ্রসন্ন লিখেছিলেন: 'প্রথমতঃ বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গভূমিতে ভট্টনারায়ণ প্রণীত বেণী সংহার নাটকের শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য কৃত বাঙ্গলা অনুবাদের অভিনয় হয়।'

১৭৭৯ শকাব্দের বিবিধার্থ সংগ্রহে প্রকাশিত হয়েছিল: 'কয়েক মাস হইল শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের সাতিশয় প্রযত্নে প্রস্তাবিত অনুবাদগ্রন্থের অভিনয় হইয়াছিল; তদ্দর্শনে সহৃদয় মহাশয়েরা যেপ্রকার পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে নিশ্চিন্তবোধ হইয়াছিল যে পণ্ডিতবরের অনুবাদ ও নটদিগের নাট্যক্রিয়া কোনমতে দূষণীয় হয় নাই; সকলেই আপন আপন প্রযত্ন পূর্ণরূপে সফল করত দর্শক ও পাঠক উভয়েরই প্রশংসভাজন হইয়াছেন।'

'বেণীসংহার' নাটক অভিনয়ে অতৃপ্ত কালীপ্রসন্ন ১৮৫৭ খৃঃ সেপ্টেম্বর মাসে 'বিক্রমোর্ব্বশী' নাটক অনুবাদ করেন। তত্ত্ববোধিনী প্রেসে মুদ্রিত 'বিক্রমোর্ব্বশী' নাটক'-এর তৎসঙ্গে পত্রে তিনি লেখেন:

To
His Highness
The Maharaja of Burdwan
This work is most respectfully dedicated
as an humble but sincere token
of the
Translator's Esteem for the noble love
And most gracious patronage
with which
His Highness has distinguished
The cause of of the Vernacular Literature
of the Country.

CALCUTTA
20 Sept. 1857

এই সময়ে কালীপ্রসন্নের বয়স মাত্র ষোল বৎসর। বয়সের তুলনায় এই কাজে তিনি যথেষ্টই সমাদর পেয়েছিলেন। প্রকাশ্যভাবে অনেকে বলেছিলেন যে, নাটকটি কালীপ্রসন্নের রচনা নয়। কিন্তু রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' প্রকাশিত হয়েছিল: 'বেণীসংহার নাটকের অভিনয়ে যে প্রশংসা পাইয়াছিলেন তাহাতে উত্তেজিত হইয়া শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ স্বয়ং নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন্, এবং সেই উদ্যমের ফলস্বরূপ আমরা বিক্রমোর্ব্বশী নাটকের গৌড়ীয়ানুবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রশংসিত বাবুর বয়ঃক্রম ১৭ বৎসরের অধিক হইবে না। ঐকালে বালকেরা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া থাকে; গ্রন্থ-রচনায় কেহই পারগ বা উদ্যত হয় না; কিন্তু উল্লিখিত বাবু ঐ কাল মধ্যে নানা গ্রন্থ সাময়িক পত্র ও বক্তৃতা রচনা করিয়া স্বদেশীয়দিগের নিকট প্রশংসা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভরসা করি, সৎ-পথালম্বনপূর্ব্বক সত্য ও সদগুণের আশ্রয়ে তাহার রচনা ক্ষমতা দিন দিন বর্দ্ধমানা হইবে। তথা তাহার বিদ্যানুরাগিতা বঙ্গদেশীয় ধনাঢ্য সন্তানদিগের সদ্গুণোত্তেজক হইবে। পূর্ব্বে প্রস্তাবিত গ্রন্থের কিয়দংশ পূর্ণ চন্দোদয় পত্রে প্রকটিত হইয়াছিল; এইক্ষণে বিদ্যোৎসাহিনী সভার রঙ্গভূমিতে অভিনীত হইবার নিমিত্ত সমুদয়ে একত্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থাভাবে পূর্ব্ব প্রকটনের কোন উদ্দেশ নাই; বোধ হয় বাবুর নাট্যরচনা সর্ব্বসাধারণ কি প্রকারে গ্রাহ্য করেন এই নিরূপণার্থে তিনি স্বয়ংই তাহা মুদ্রিত করাইয়া থাকিবেন। রচনাচাতুর্য্য দৃষ্টে প্রতীত হইতেছে যে ইদানীন্তনের বিষয়ী গ্রন্থকারদিগের ন্যায় প্রশংসিত সিংহমহাশয় ভট্টাচার্যদিগের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই, যেহেতু ইহাতে নস্যের গন্ধমাত্র বোধ হয় না। বিক্রমোর্ব্বশী নাটক মহাকবি কালীদাস প্রণীত। ইহাতে চন্দ্রবংশীয় পুরুরবাঃ রাজার সহিত উর্ব্বশী নাম্নী অপ্সরার প্রেমানুবন্ধ বিবৃত আছে।'

১৮৫৭ খৃঃ নভেম্বর মাসে কালীপ্রসন্নের 'বিক্রমোর্ব্বশী নাটক' বিদ্যোৎসাহিনী থিয়েটারে অভিনীত হয়। অভিনয়ে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি অংশ গ্রহণ করেছিলেন। পুরুরবার অভিনয় করেছিলেন কালীপ্রসন্ন। পরবর্তীকালের বিখ্যাত ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও অভিনয় করেছিলেন। অভিনয়রজনীতে কলকাতার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। দর্শকসংখ্যা খুব বেশী হওয়াতে অনেকে ফিরে যান। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'হিন্দুপেট্রিয়ট' এই অভিনয় সম্পর্কে লিখেছিল:

"The part of the King Pururoba represented by Baboo Kali Prosonno Sing was admirably done. His mien was right royal, and his voice truly imperial. From the first scene of the play when he with his pleasant companion, a civilised baffon, commenced to interchange words of fellowship, to the last scene when he was translated with his fair Oorbosi to heaven, he kept the attention of the audience continuously alive and made a most gladsome impression on their minds. Every word he gave utterance to was suited to the action which followed it. In the languge of the poet he did truly hold the mirror up to nature." এই নাটকের অভিনয়ই প্রকৃতপক্ষে বাঙলা রঙ্গালয়ের নতুন যুগ সৃষ্টি করে। কালী

প্রসন্নের এই প্রচেষ্টাকে বহুজন প্রশংসা করেছিলেন। কিশোরীচাঁদ মিত্র Calcutta Review-এ লিখেছিলেন :

"There was a large gathering of native and European gentlemen, who were unanimous in praising the performance. Among the latter, Mr., after words Sir, Cecil Beadon, the Secretary to the Government of India, expressed to us his cenfeigned pleasure at the admirable way in which the principal characters sustained their parts."

ভবভূতির মালতীমাধব অবলম্বনে কালীপ্রসন্ন 'মালতীমাধব' নাটক রচনা করেন ১৮৫৯ খৃঃ। উৎসর্গপত্রে লেখেন :

This Translation
is
Most Respectfully
dedicated
to all
Lovers of the Hindoo Theatre,
by the
translator.

ভূমিকায় কালীপ্রসন্ন লেখেন, 'মদ্রচিত মৎপ্রণীত ও মদনুবাদিত অন্য অন্য নাটক হইতে মালতীমাধবের ভাষারও প্রভেদ হইয়াছে, কারণ অভিনার্হ নাটক সকল ইদানিন্তন যে ভাষায় লিখিত হইতেছে আমিও সেইরূপ অবলম্বন করিয়া ইপ্সিত বিষয় শুদ্ধিকরণ মানসে সচেষ্ট ছিলাম।'

কালীপ্রসন্নের 'সাবিত্রী সত্যবান' নাটকের কাহিনী মহাভারত থেকে গৃহীত। নাটকে কয়েকটি সুন্দর ধর্মসঙ্গীত আছে।

বাংলা নাট্যসাহিত্য উন্মেষে কালীপ্রসন্নের দান অসামান্য। বিশেষ কোন মৌলিক নাটক তখনও পর্যন্ত রচিত হয় নি। ইংরেজী নাটকের অনুসরণে কয়েকখানি মাত্র নাটক রচিত হয়েছে। সংস্কৃত নাটকের অনুবাদও প্রকাশিত হচ্ছে। ১৮৫৯ খৃঃ বাংলা নাটকের অবস্থা রেঃ জেমস লঙ-এর রিপোর্ট থেকে জানা যায় :

"A taste for Dramatic Exhibitions has lately revived among the educated Hindus, who find that translations of the Ancient Hindu Dramas are better suited to Oriental taste than translations from the English plays...foremost among the patrons of the Drama are Raja Pratap Chander Singh and a young Zeminder Kali Prasanna Singh, who has translated from the Sanskrit and distributed at his own expense, the **Malati Madhava, Vikrama Urvssi** and **Sabitri Satyaban.**"

কালীপ্রসন্নের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকৃত মহাভারতের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ ও প্রচার। তখন কালীপ্রসন্নের বয়স আঠার বৎসর মাত্র বরানগরের 'সারস্বতাশ্রম' ও পুরাণ সংগ্রহ কার্যালয়ে এই সুবৃহৎ অনুবাদ কার্য সমাধা করেছিলেন। সেকালে হরচন্দ্র ঘোষ ছিলেন একজন বিখ্যাত সম্পাদক। হরচন্দ্র কালীপ্রসন্নের এই কার্যে উৎসাহ দিয়েছিলেন। কালীপ্রসন্নের একার পক্ষে এই সুবৃহৎ কাজ অসম্ভব বিবেচনা করে হরচন্দ্র তাঁকে পণ্ডিত সমাজের সাহায্য নিতে বলেন। কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাহায্য প্রার্থনা করলে, তিনি একটি পণ্ডিতমণ্ডলী নির্বাচন করে দেন। তিনি স্বয়ং ছিলেন এর তত্ত্বাবধায়ক। কালীপ্রসন্নের বিবরণ থেকে জানা যায়: '১৭৮০ শকে সৎকীর্তি ও জন্মভূমির হিতানুষ্ঠান লক্ষ্য করিয়া সাতজন কৃতবিদ্য সদস্যের সহিত আমি মূল সংস্কৃত মহাভারত বাঙলা ভাষায় অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হই। তদবধি এই আটবর্ষকাল প্রতিনিয়ত পরিশ্রম ও অসাধারণ অধ্যবসায় স্বীকার করিয়া বিশ্বপিতা জগদীশ্বরের অপার কৃপায় চির সঙ্কল্পিত কঠোর ব্রতের উদ্‌যাপনস্বরূপ মহাভারতীয় অষ্টাদশ পর্বের মূলানুবাদ সম্পূর্ণ করিলাম। অনুবাদ-গ্রন্থ কতদূর সাধারণের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে, তাহা গুণাকর পাঠকবৃন্দ ও সহৃদয় সমাজ বিবেচনা করিবেন; তবে সাহস করিয়া এইমাত্র বলিতে পারি যে, অনুবাদ সময়ে মূল মহাভারতের কোন স্থলই পরিত্যাগ করি নাই ও উহাতে আপাতরঞ্জন অমূলক কোন অংশই সন্নিবেশিত হয় নাই; অথচ বাঙালা ভাষায় প্রসাদগুণ ও লালিত্য পরিরক্ষনার্থ সাধ্যানুসারে যত্ন লইয়াছি এবং ভাষান্তরিত পুস্তকে সচরাচর যে সকল দোষ লক্ষিত হইয়া থাকে, সেগুলির নিবারণার্থ বিলক্ষণ সচেষ্ট ছিলাম।' কালীপ্রসন্ন গ্রন্থ উৎসর্গ করেছিলেন মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে, উৎসর্গপত্রে লিখেছিলেন:

পরম ভক্তিভাজন
শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভিক্টোরিয়া
অতুল শ্রদ্ধাস্পদেষু—

মহারাজ্ঞি!

পৃথিবীমধ্যে যখন যে দেশের সৌভাগ্য দিবাকর মুদিত হইতে আরম্ভ হয়, সে সময় তত্রত্য রাজলক্ষ্মী অবশ্যই কোন না কোন সর্ব গুণাধার মহাত্মাকে সমাদর পূর্বক আলিঙ্গন করিয়া থাকেন। নৈসর্গিক নিয়ম এই যে, রাজ্যের উন্নতির সময় বিশুদ্ধ গুণশালী প্রজাবৎসল নরপতিগণই রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। জগদীশ্বর প্রসাদে চিরদুঃখিনী ভারতভূমির ভাগ্যে এক্ষণে সেই শুভদিন উপস্থিত।...এক্ষণে দিনে দিনে তাঁহার মলিন মুখশ্রী পুনর্বার তপনোপম উজ্জ্বলকান্তি ধারণ করিতেছে এবং ভারতবর্ষবাসিগণ আপনার অকৃত্রিম স্নেহ ও অনুগ্রহচ্ছায়া লাভ করিয়া আপনাদিগকে আশাতিরিক্ত কৃতার্থম্মন্য ও চরিতার্থ জ্ঞান করিতেছেন।

দেবি! আমি এই শুভক্ষণ সন্দর্শনে স্বদেশের হিতসাধন করিতে উৎসাহিত হইয়া আগ্রহাতিশয় সহকারে মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত সংস্কৃত মহাভারত বাঙলা ভাষায় অবিকল অনুবাদে প্রবৃত্ত হই। এক্ষণে আট বৎসর প্রতিনিয়ত পরিশ্রমের পর বিশ্বপাতা জগদীশ্বরের অপার কৃপায় অদ্য আমার সেই চির সংকল্পিত কঠোর ব্রত উদ্‌যাপিত হইল। এই আট বৎসরের বহু পরিশ্রম ও যত্ন সঞ্জাত সাহিত্যকুসুম অন্য কোন নিভৃত নির্বাতস্থলে বিন্যস্ত করা কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে।

বিশেষতঃ মহাভারত যেরূপ অনুপম গ্রন্থ, উহাতে ভারতেশ্বরী মহারাজ্ঞীর নাম অঙ্কিত না হইলে শোভা পায় না। যেমন দেবতারা বহু পরিশ্রমে পয়োনিধি মন্থন করিয়া তদুত্থিত পারিজাত কুসুম সুররাজ পুরন্দরকে অর্পণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমি এই বহু যত্নলব্ধ বিকশিত ভারতপঙ্কজ আপনাকে উপহার প্রদান করিলাম।

ভারতেশ্বরি! অবশেষে জগদীশ্বর সমীপে আমার এই প্রার্থনা যে, ভারতবর্ষের রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজ্য শাসন সময়ে যেরূপ কালিদাসাদি ভুবনবিখ্যাত মহাকবিগণ জন্মগ্রহণপূর্বক সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতি-সাধন করিয়া গিয়াছেন এবং মহারাণী এলিজাবেথের ইংল্যাণ্ড শাসন সময়ে যেরূপ সেকস্‌পিয়ার প্রভৃতি কতিপয় সুপ্রসিদ্ধ কবি জন্মগ্রহণ করিয়া কবিত্বশক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনপূর্বক তাঁহার শাসনকাল চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন, তদ্রূপ আপনার শাসনকালেও হিন্দুস্থান শত শত সংস্কৃত সাহিত্যদীপের উজ্জ্বলতা সাধন করিয়া লোকের মোহান্ধকার নিরাকৃত ও এই বিশ্বরূপ বাসগৃহ আলোকিত করুন। ইতি—

মহারাজ্ঞি!

সারস্বতাশ্রম — আপনার চিরানুগত প্রজা ও বিনয়াবনত দাস

শকাব্দ। ১৭৮৮। — শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ

এই সুবৃহৎ গ্রন্থ বিনামূল্যে বিতরণ করা হইয়াছিল। যে সমস্ত পণ্ডিত কালীপ্রসন্নের মহাভারত অনুবাদ কার্যের অন্যতম সহায়ক ছিলেন, গ্রন্থশেষে তিনি তাঁদের নাম সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছেন। মহাভারতের কোন কোন অংশ কালীপ্রসন্নের অনূদিত। কৃষ্ণদাস পাল লিখেছিলেন:

"W‹ hsve been assured by friends who were in his confidence, that some of the finest spcimens of Bengali in the translation of the Mahavaratha were from his pen."

যে সকল পণ্ডিতব্যক্তি কালীপ্রসন্নকে সাহায্য করেছিলেন, তাদের সম্পর্কে শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি বলেন: 'মহাভারত যেরূপ দুরূহ গ্রন্থ, মাদৃশ অল্পবুদ্ধিজন-কর্তৃক ইহা সম্যকরূপে অনুবাদিত হওয়া নিতান্ত দুষ্কর। এই নিমিত্ত ইহার অনুবাদ সময়ে অনেক কৃতবিদ্য মহোদয়গণের ভূয়িষ্ঠ সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে, এমন কি তাঁহাদের পরামর্শ ও সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া আমি এই গুরুতর ব্যাপারের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তন্নিমিত্ত ঐসকল মহানুভবদিগের নিকট চিরজীবন কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম।'

ভূমিকাতে বিনয়ের সঙ্গে লেখেন: 'আমি যে দুঃসাধ্য ও চিরজীবনসেব্য কঠিন ব্রতে কৃতসংকল্প হইয়াছি, তাহা যে নির্বিঘ্নে শেষ করিতে পারিব, আমার এ প্রকার ভরসা নাই। মহাভারত অনুবাদ করিয়া যে লোকের নিকট যশস্বী হইব, এমত প্রত্যাশা করিয়াও এবিষয়ে হস্তার্পণ করি নাই। যদি জগদীশ্বর প্রসাদে পৃথিবী মধ্যে কুত্রাপি বাঙলা ভাষা প্রচলিত থাকে, তার কোন কালে এই অনুবাদিত পুস্তক কোন ব্যক্তির হস্তে পতিত হওয়ায় সে ইহার মর্মানুধাবন করত হিন্দুকুলের কীর্তিস্তম্ভস্বরূপ ভারতের মহিমা অবগত হইতে সক্ষম হয়, তাহা হইলেই আমার সমস্ত পরিশ্রম সফল হইবে।' ১৮৬৬ খৃঃ সম্পূর্ণ মহাভারত অনুবাদ সমাপ্ত হয়।

১৭৮০ শকাব্দ আদিপর্ব রচনা সমাপ্ত হয়। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল গ্রন্থবিতরণ সম্পর্কে। বিজ্ঞাপনটি ছিল নিম্নরূপ :

বিজ্ঞাপন

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্তৃক গদ্যে অনুবাদিত

বাঙালা মহাভারত

মহাভারতের আদিপর্ব তত্ত্ববোধিনী সভার যন্ত্রে মুদ্রিত হইতেছে। অতি ত্বরায় মুদ্রিত হইয়া সাধারণে বিনামূল্যে বিতরিত হইবে। পুস্তক প্রস্তুত হইলেই পত্রলেখকমহাশয়দিগের নিকট প্রেরিত হইবে। ভিন্ন প্রদেশীয় মহাত্মারা পুস্তক প্রেরণ জন্য ডাকষ্ট্যাম্প প্রেরণ করিবেন না। কারণ, পূর্ব প্রতিজ্ঞানুসারে ভিন্ন প্রদেশে পুস্তক প্রেরণের মাসুল গ্রহণ করা যাইবে না। প্রত্যেক জেলায় পুস্তক বণ্টন জন্য এক একজন এজেণ্ট নিযুক্ত করা হইবে। তাহা হইলে সর্ব প্রদেশীয় মহাত্মারা বিনা ব্যয়ে অনুপূর্বক সমুদায় খণ্ড সংগ্রহ করনে সক্ষম হইবেন।

শ্রীরাধানাথ বিদ্যারত্ন

বিদ্যোৎসাহিনী সভার সম্পাদক

প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হলে রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত বিবিধার্থ সংগ্রহে সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল : "পূর্বে আমরা দুই-তিনবার শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যানুরাগিত্ব বিশেষ প্রশংসা করিয়াছি। তদবধি উক্ত বাবু এক মহদ্ব্যাপারে নিযুক্ত হইয়া তাহার প্রথম ফলস্বরূপ "পুরাণ-সংগ্রহ" নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ড জনসমাজে সমর্পিত করিয়াছেন। ঐ খণ্ডে "মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মহাভারতের আদিপর্বান্তর্গত অনুক্রমণিকা, পর্বসংগ্রহ, পৌষ্য, মৌলোম ও গাণ্ডীক পর্বাবধি আদি বংশাবতরণিকা সহিত সম্ভব পর্বীয় ভারতসূত্র শকুন্তলোপাখ্যান" বঙ্গ ভাষায় অনুবাদিত হইয়া বিষয়ি জনগণের ভারতার্থ বুঝিবার শ্রেষ্ঠ উপায় হইয়াছে। ইহার পূর্বে কাশীরাম দাসকৃত অনুবাদ ভারতামৃত পানের একমাত্র উপায় ছিল এবং তাহা সুকোমল পয়ারে বিরচিত হওয়াতে এতদ্দেশীয় অপর সাধারণ সকলেরই সমাদরণীয় ছিল। ফলতঃ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে তুলসীদাসকৃত রামায়ণ যেরূপ সুপ্রসিদ্ধ, বঙ্গদেশে কাশীরাম দাসের ভারতও তদনুরূপ, পরন্তু উভয় গ্রন্থকর্তারা স্ব-স্ব আদর্শ বাল্মীকি ও ব্যাসের উক্তি পরিহরণ করিয়া নানাবিধ স্ব-স্ব কপোলকল্পিত আখ্যায়িকাদ্বারা আপন আপন গ্রন্থ কুলষিত করিয়াছেন। বাল্মীকি রামায়ণ ও ব্যাসের ভারতের প্রকৃত অর্থ জানিতে তাঁহাদিগের বাসনা। তাঁহাদিগের পক্ষে উক্ত গ্রন্থ কদাপি সমাদরণীয় হইতে পারে না। তন্মধ্যে যাহার ভিতরে তাৎপর্য জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের নিমিত্ত কালীপ্রসন্ন-বাবুর গ্রন্থ উপযুক্ত হইয়াছে। যেহেতু তিনি অতীব সাবধানে সংস্কৃত মূলের অবিকল অর্থ বাঙ্গালী অনুবাদেতে রক্ষা করিয়াছেন এবং ঐ অনুবাদও এতাদৃশ সুকোমল ও সুমধুর হইয়াছে যে, তাহার পাঠ মাত্রেই পরিতৃপ্ত হইতে হয়। ইহা অবশ্য স্বীকর্তব্য যে, ব্যাসোক্ত সংস্কৃত পদ্যের লালিত্য কদাপি বাঙ্গালী গদ্যে প্রত্যাশা করা যায় না; পরন্তু যাহারা সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ অথচ ভারতের প্রকৃতার্থ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা উপস্থিত গ্রন্থ হইতে সদুপায় অনায়াসে প্রাপ্ত হইতে পারেন। কালীপ্রসন্নবাবুর বয়ঃক্রম নিতান্ত তরুণ, এই অবস্থায় দেশীয় অপর ধনাঢ্যের ন্যায় ইন্দ্রিয়

সেবার বিরত না হইয়া তিনি যে মহৎ ও দুরূহ ব্যাপারে অভিনিবিষ্ট হইয়াছেন, ইহাতে তিনি অবশ্য প্রশংসনীয়, অধিকন্তু তাহাতে যেরূপ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তিনি সমস্ত বিদ্যানুরাগিদের ধন্যবাদার্হ হইবেন। এস্থলে ইহাও উল্লেখ্য যে, তিনি প্রস্তাবিত মহদ্ব্যপারের যোগ্য হইলেও এবং তারুণ্যের ঔদ্ধত্য সত্ত্বেও বিহিত বিবেচনা ও গাম্ভীর্য প্রদর্শনপূর্বক তাঁহাকে যে সকল পণ্ডিতমহাশয়েরা সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট বিহিত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন…"

হিন্দু পেট্রিয়টে কৃষ্ণদাস পাল মহাভারতের সুদীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশ করে বলেছিলেন : "When the histroy of rise and progress of Bengalee literature will come to be written Baboo Kaliprossunno Sing will undoubtedly occupy a high place in the gallery of the literary character of the present period. In the magnitude of the work which he has achieved he is only equalled by Rajah Radhakant Bhadoor, whose Sanskrit encyclopaedia is a monument of his scholarship and literary labors. But one is in the yellow sear of life, while the other is in the full bloom of youth. But both have established an equally undying claim to the gratitude of the country on the completion of the gigantic work of the Rajah an expression of national feeling was conveyed to him, and is it not meet that a similar honour should greet Baboo Kaliprossunno Sing for the successful accomplishment of the noblest design of his literary ambition."

১৮৬২ খৃঃ কালীপ্রসন্নের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থখানি আজও জনপ্রিয়। সেকালে গ্রন্থখানি সমাদৃত হয়েছিল বিপুলভাবে। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের গ্রন্থে আছে :

"তাঁহার হাস্যরসাত্মক ও বিদ্রূপাত্মক সামাজিক নক্সা 'হুতুম প্যাঁচা' গ্রন্থে তিনি তদানীন্তন সমাজের ভালমন্দ সকল ভাবই বিশদরূপে যথাযথভাবে অতি নিপুণতার সহিত চিত্রিত করিয়াছেন। ঐ শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে উহাই সর্বোৎকৃষ্ট, উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুস্তক এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। হয়তো এমন দিন আসিলেও আসিতে পারে, যখন লোক হুতুম প্যাঁচা পড়িবে না। কিন্তু এমন দিন কখনই আসিবে না, যখন হুতুম প্যাঁচা পড়িয়া লোকে আনন্দ ও উপকার লাভ না করিবে" (সুবলচন্দ্র মিত্র অনূদিত)। অক্ষয়চন্দ্র সরকার লেখেন : "বিশুদ্ধ সহজ বাঙ্গালায় সুন্দর গদ্য হয়। প্যারীচাঁদ হইতে ইহা শিখিয়াছিলাম। সঙ্গে কালীপ্রসন্ন সিংহের নাম করিতে হইবে। বঙ্কিমবাবু মিত্রজার গ্রন্থ দেখাইয়া 'রত্নোদ্ধার' করিতেছিলেন। তখন তাঁহার কালীপ্রসন্নের কথা বলিবার প্রয়োজন হয় নাই, আমাদিগকে এখন বলিতে হইবে। আমরা যখন নিতান্ত বালক, তখন 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা প্রকাশিত হইল। তাহার ভাষার ভঙ্গীতে। রচনার রঙ্গেতে একেবারে মোহিত হইয়াছিলাম। তখন হইতে বুঝিয়াছি, আমাদের মাতৃভাষায় বাজী খেলান যায়। তুবড়ি ফুটান যায়। ফুল কাটান যায়। ফুয়ারা ছোটান যায়। আমাদের মাতৃভাষা সর্বাঙ্গে রঙ্গময়ী।"

"কালীপ্রসন্নের মহাভারত ও হুতোম প্যাঁচা দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার অনেক উপকার হইয়াছে। মহাভারতে যে অভাব মিটিয়াছে, তাহা অন্তত মুখেও বলিয়া শেষ হয় না। হুতোমের কৃপায় বাঙ্গালায় নূতন শব্দ সৃষ্টি। বাঙ্গালা নাটকের বা উপন্যাসে কথোপকথনের ভাষার পরিবর্তন, নৈসর্গিক বিষয়ের বর্ণনার প্রণালী সংস্কার হইয়াছে, আর হইয়াছে কতকগুলি মজলিসী ইয়ারকির সৃষ্টি। হুতোমই বাঙ্গালার প্রথম এবং প্রধান ব্যঙ্গকাব্য।"

কালীপ্রসন্নের চরিত্রের প্রধান গুণ ছিল স্বদেশপ্রেম। নীলদর্পণ সংক্রান্ত মামলায় লঙ সাহেব অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হলে কালীপ্রসন্ন সে টাকা জমা দিয়ে লঙ সাহেবকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি নিজ ব্যয়ে নীলদর্পণের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ ও বিনামূল্যে প্রচার করেন।

নীলদর্পণ মোকদ্দমাকালে জাস্টিস ওয়েলস ব্যাঙালীকে মিথ্যাবাদী বলায় ১৮৬১ খৃঃ ২৯শে আগষ্ট রাধাকান্ত দেবের সঙ্গে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য এক সভা আহূত হয়। এই রাজনৈতিক সভায় কালীপ্রসন্ন বক্তৃতা করেছিলেন। সভায় উপস্থিত অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেনঃ রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, মহারাজা সত্যানন্দ ঘোষাল, মহারাজা রমানাথ ঠাকুর, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নবাব আসবর আলী এবং আরো কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। ওয়েলস্ পরে বাঙলা দেশে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। তাঁকে বিদায় অভিনন্দন দানে কালীপ্রসন্ন ছিলেন প্রধান উদ্যোগী। কালীপ্রসন্ন অত্যাচারী ইংরেজের নিন্দা করেছেন এবং মহৎ কাজ করবার জন্য তাঁদের প্রশংসাও করেছেন। 'হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর তাঁর পরিবারবর্গকে রক্ষা করিয়াছিলেন কালীপ্রসন্ন।

'হিন্দু পেট্রিয়ট' সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৮৬১ খৃঃ ১৪ই জুন মারা যান। দারুণ দুরাবস্থায় পড়ে পেট্রিয়ট বন্ধ হওয়ার সম্মুখীন হয়। কালীপ্রসন্ন হাজার টাকায় পেট্রিয়টের স্বত্ব কিনে নেন। তিনি হরিশ্চন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন।

হস্তান্তরের পর পেট্রিয়টের সম্পাদনার ভার অর্পিত হয় শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ওপর। গিরিশচন্দ্র ঘোষই প্রকৃতপক্ষে সম্পাদকের কাজ করতেন। কারণ পেট্রিয়ট ছিল তাঁরই হাতে গড়া এবং হরিশচন্দ্রের অকৃত্রিম সুহৃদ। নানা কারণে শম্ভুচন্দ্র ও গিরিশচন্দ্র হিন্দু পেট্রিয়টের সংশ্রব ত্যাগ করলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরামর্শে কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও দ্বারকানাথ মিত্র কয়েকটি সংখ্যা সম্পাদন করেন। কাগজের গৌরব বৃদ্ধি না পাওয়ায় নবীন কৃষ্ণ বসু, কৈলাশচন্দ্র বসু এবং কৃষ্ণদাস পাল—তিনজন পত্রিকা সম্পাদনা করতে থাকেন। শেষে কৃষ্ণদাস একাই সম্পাদক হন। কালীপ্রসন্ন অবশেষে একটি ট্রাষ্টীর ওপর পত্রিকার পরিচালন ভার অর্পণ করেন। দলিলটি এখানে উদ্ধৃত হলঃ

ট্রষ্ট ডিড্।

হিন্দু পেট্রিয়ট্।

শ্রীযুক্ত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও শ্রীযুক্ত বাবু রমানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়গণ বরাবরেষু।—

লিখিতং শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ সাকিম কলিকাতা জোড়াসাঁকো ট্রাষ্টিনামা পত্রমিদং কার্য্যানঞ্চাগে আমি নানাবিধ বৈষয়িক কার্য মধ্যে সদাসর্বদা আবৃত থাকায় হিন্দু পেট্রিয়ট নামক ইংরাজি সংবাদপত্র সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টি করিয়া নির্বাহ করায় অশক্ত বিধায় উক্ত সংবাদপত্র ও তৎসম্বন্ধে টাইপ অর্থাৎ অক্ষর মায় লওয়া জমা ও লহনা আদায়ের বিল প্রভৃতি আপনাদের হস্তে অর্পণ করিয়া আপনাদিগকে ট্রাষ্টি নিযুক্ত করিলাম। আপনারা এই সম্বাদপত্র ও অক্ষর ও পাওনা টাকা প্রভৃতির ট্রাষ্টিসূত্রে মালিক হইয়া নীচের লিখিত নিয়ম প্রতিপালনপূর্বক ঐ কাগজের সমুদয় কর্ম সুচারুরূপে নির্বাহ করিবেন। যেহেতু আপনাদিগের হস্তে ঐ ছাপার কাগজ থাকিলে দেশের নানাবিধ উপকার হইবার সম্ভাবনা। এমতে স্বীকার করিতেছি যে উক্ত কাগজের অক্ষর ও লওয়া জন্য দ্রব্য ও উপস্বত্বের প্রতি আমার স্বত্ব রহিল না। কস্মিনকালে আমি কি আমার উত্তরাধিকারী কোন দাবী-দাওয়া করিব না ও করিবেন না। যদি করি কিম্বা করেন, সে বাতিল বা না মঞ্জুর।

নিয়ম

১। অত্র পেট্রিয়ট কাগজের গত এডিটার ৺হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নামে স্থায়ী থাকা জন্য এই হিন্দু পেট্রিয়ট নাম কখন পরিবর্তন হইবে না। যে পর্যন্ত এই কাগজ আপনাদের হস্তে থাকিবে, তাবৎকাল ঐ কাগজের নাম হিন্দু পেট্রিয়ট নামে প্রচলিত থাকিবেক এবং আপনারা ঐ কাগজ অন্য কোন সম্বাদ কাগজের সহিত যোগ কিম্বা মিশ্রিত করিতে পারিবেন না।

২। কস্মিনকালে এই হিন্দু পেট্রিয়টের কর্ম নির্বাহকালে আপনাদের কর্তৃত্বকালে কোন রকমে ক্ষতি হইতে পারিবে না। আর ঐ কাগজ ও তাহার গুড্‌উইল ব্যতীত তৎসম্বন্ধীয় অক্ষরে মায় লওয়া জন্য বিক্রয় করিতে আপনাদের ক্ষমতা থাকিবে। কিন্তু ঐ মূল্যের টাকা আপনারা নিজে ভোগ না করিয়া প্রেসের দেনা শোধ বা তার অবশিষ্ট টাকা হরিশ মেমোরিয়াল ফাণ্ডে অর্পণ করিবেন।

৩। অন্য কোন কাগজ পেট্রিয়টের সহিত মিশ্রিত করিলে কিন্তু আপনারা স্বয়ং কোন মুদ্রাযন্ত্রালয় ক্রয় করিয়া পেট্রিয়টের কাগজের সহিত মিশ্রিত করিলে সেই কাগজের আপনাদিগের ক্রয় করা যন্ত্র কি অন্য পদার্থ আপনাদিগের স্বেচ্ছানুসারে বিক্রয় করিলে তদুপস্বত্ব আপনাদিগের ইচ্ছামত ব্যয় করিবেন।

৪। হিন্দু পেট্রিয়ট কাগজের কর্মচালাইবার আয় ব্যয় হিসাবাদি অপনাদিগের নিকটে আমার লইবার ক্ষমতা রইল না।

৫। হিন্দু পেট্রিয়ট কাগজ ও তাহার গুড্‌উইল বিক্রয় করিবার ক্ষমতা রহিল না। ঐ কাগজ মায় গুড্‌উইল দেশের উপকারার্থে কেহ প্রার্থনা করেন তাহা উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া দান করিতে পারিবেন।

৬। আপনাদিগের কাহারও লোকান্তর হইলে কিম্বা কেহ আপনারা ইচ্ছাপূর্বক ট্রাষ্টির ভার পরিত্যাগ করিলে যাঁহারা উপস্থিত থাকিবেন, তাঁহারা ইচ্ছামত পরিত্যাগ কিম্বা মৃত ট্রাষ্টির পরিবর্তে তত্তুল্য ক্ষমতাবান্ অন্য ট্রাষ্টি নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

৭। ট্রাষ্টির সংখ্যা তিনজনের কম ও পাঁচজনের অধিক হইবেক না ও ট্রাষ্টনিয়োগের নিমিত্ত

আমার মতের প্রয়োজন হইবেক না ও আমি আপনাদিগের পরিবর্তে কখন অন্য ট্রাষ্টি নিযুক্ত ও আপনাদিগকে রহিত করিতে পারিব না।

৮। আপনারা ঐক্য হইয়া সর্বদা ট্রাষ্টি কর্ম নির্বাহ করিবেন। আপনাদিগের মধ্যে মতের অনৈক্য হইলে যেরূপ ট্রাষ্টির অভিপ্রায় হইবে সেই মত কার্য নির্বাহ হইবেক।

৯। যদি কোন ট্রাষ্টি ইন্‌সল্‌ভেণ্ট লয়েন কিম্বা কোন রকমের অকর্মণ্য হয়েন, অথবা কোন অপকর্ম করেন। তবে তাঁহাকে বহিষ্কৃত করিয়া তাঁহার স্থানে আপনারা অন্য ট্রাষ্টি নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

১০। এই ট্রাষ্টি নির্বাহ করিবার নিমিত্ত আমি একজন ট্রাষ্টি আপনাদিগের সহিত থাকিলাম, এবং আপনাদিগের তুল্য ক্ষমতাসম্পন্ন হইয়া ট্রাষ্টির স্বরূপ উপরের লিখিত নিয়ম সকল প্রতিপালন করিব। যদি উপরে লিখিত নিয়ম সকল অন্যথা করি তবে নয় দফার সর্ত আপনারা আমার প্রতি খাটাইতে পারিবেন।

১১। উপরোক্ত নিয়ম সকল প্রতিপালনপূর্বক হিন্দু পেট্রিয়টের কার্য নির্বাহ হইবেক ও দুই দফার লিখিত অনুসারে বিক্রয় করা আবশ্যক হইলে বিক্রয় হইবেক। এতদর্থে পেট্রিয়ট কাগজও অক্ষর মায় লওয়া জন্য মালিকত্ব পরিত্যাগ করিয়া ট্রাষ্টিনামা লিখিয়া দিলাম। ইতি—সন ১২৬৯ সাল, ৪ঠা শ্রাবণ।

কলিকাতা, শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ

১৯শে জুলাই ১৮৬২ সাল

সাক্ষী

শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণদাস পাল

রবীন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতিতে আছে:—"রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' বলিয়া একটি ছবিওয়ালা মাসিকপত্র বাহির করিতেন। তাহারি বাঁধানো এক ভাগ সেজদাদার আলমারির মধ্যে ছিল। সেটি আমি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। বারবার করিয়া সেই বইখানা পড়িবার খুসি আজও আমার মনে পড়ে। তাই বড় চৌকা বইটাকে বুকে লইয়া আমাদের শোবার ঘরের তক্তাপোষের উপর চীৎ হইয়া পড়িয়া নইলে তিমি মৎস্যের বিবরণ, কাজির বিচারের কৌতুকজনক গল্প, কৃষ্ণকুমারীর উপন্যাস পড়িতে পড়িতে কত ছুটির দিনের মধ্যাহ্ন কাটিয়াছে।"—ছয় বৎসর সম্পাদনার পর ১৮৬০ খৃঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র অবসর গ্রহণ করেন। কালীপ্রসন্ন এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের অবসর গ্রহণের পর কালীপ্রসন্ন হন সম্পাদক। এর মধ্যে কিছুকাল পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ ছিল। ১৮৬১ খৃঃ ৬ই জুলাই-এর 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ডে' প্রকাশিত হয়েছিল: "The Bibidartho Sangraha, a Bengalee illustrated monthly periodical which was stopped for sometime since, has been revived under the auspices of Babu Kally Prosonno Sing of Jorasanko. This paper is one of the best of its kind and was at first edited by Babu Rajendralall Mitra, the well-known Director

of the Ward's Institution and a native gentleman of large and various ability. We trust it will maintain the reputation under the management of Babu Kally Prosonno Sing." কালীপ্রসন্ন ১৭৮২ শকাব্দ বৈশাখ থেকে 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' সম্পাদনা করেন। সম্পাদনা ভার গ্রহণ করে কালীপ্রসন্ন লেখেন : "বিবিধার্থ এতাবৎকাল যাঁহার অবিচলিত অধ্যবসায় ও প্রযত্নে পূর্ব্বোল্লিখিত বহুতর জ্ঞানগর্ভ রচনাবলীর আন্দোলনে পাঠকবর্গের স্নেহভাজন হইয়াছে— যিনি বাঙ্গালি ভাষাকে বিবিধ তত্ত্বালঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া স্বদেশের গৌরববর্দ্ধন করিয়াছেন—এক্ষণে তিনি এতৎপত্রের সম্পাদকীয় পদ পরিত্যাগ করায় বিবিধার্থ বিলক্ষণ ক্ষতি স্বীকার করিয়াছে। জন্মদাতা হইতে স্বতন্ত্রিয় ও সহসা অপরিচিত হস্তে ন্যস্ত হওয়াতে অনেকে ইহার স্থায়িত্ব বিষয়ে সন্দেহ করিতে পারেন। বিশেষতঃ, শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের পরিবর্ত্তে তৎপদে অপর ব্যক্তির সুশৃঙ্খল কার্য্য নির্বাহ করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। বিবিধার্থ যে প্রকার পত্র, মিত্র মহাশয়ই তাহার উপযুক্ত পাত্র ছিলেন ; অনুবাদক সমাজ, বিবিধার্থ সহৃদয় সমাজের স্নেহভাজন ও পাঠকমণ্ডলীর নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনীয় নহে জানিয়াই অগত্যা আমারে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন : কিন্তু বিবিধার্থ সম্পাদনপদ স্বীকার করিয়া আমি অসম সাহসিকতার কার্য্য করিয়াছি।..."

১২৬৯ সালের ১ অগ্রহায়ণ কালীপ্রসন্ন 'পরিদর্শক' পত্রিকা সম্পাদনা আরম্ভ করেন। এই পত্রিকা সম্পাদনা করতেন জগমোহন তর্কালঙ্কার ও মদনগোপাল গোস্বামী।

আইন-ই-আকবরীর প্রথম ইংরাজী অনুবাদ

নারায়ণ দত্ত

আঠারশ' বার সালে লর্ড ময়রা যখন ব্রিটিশ ভারতের দণ্ডমুণ্ডের অধিকারী হয়ে এলেন, প্রাক্তন গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস তাঁকে এক অমূল্য উপদেশ দেন। বলেন, ভারতীয় শাসনযন্ত্র, হেস্টিংসের ভাষায়—ম্যাগনিফিসিয়েণ্ট মেশিনের সকল প্রয়োজনীয় খবরই তিনি এক কেতাব থেকে পাবেন। কেতাবটি, আশ্চর্যের বিষয়, কোন বিলাতী গ্রন্থ নয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া হাউসের কোন দিকপালের রচনাও নয়। ষষ্ঠদশ শতাব্দীর এক ভারতীয় রাজপুরুষ—আল্লামা আবুল ফজলের লেখা ফার্সি বইটির নাম আইন-ই-আকবরী।

ওয়ারেন হেস্টিংসের এই সুপারিশ লর্ড ময়রা কিভাবে নিয়েছিলেন, সে খবর আমাদের জানা নেই। তবে এই অমূল্য ফার্সি গ্রন্থটির ওপর হেস্টিংসের সুগভীর আস্থার পিছনে যে কারণটি সক্রিয় ছিল, সেটা অজানা নয়। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ওয়ারেন হেস্টিংস ভারতবর্ষকে এক ভারতীয় শাসনব্যবস্থা দিতে চেয়েছিলেন। ইংলণ্ড থেকে আমদানি করা কোন শাসন কাঠামো যে এদেশের গায়ে মানাবে না, তাঁর দূরদৃষ্টির পক্ষে এটা বুঝতে কষ্ট হয় নি। আর সেই কারণেই মুঘল সাম্রাজ্যের শাসনপদ্ধতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হবার জন্যে তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

তবে ওয়ারেন হেস্টিংস শুধু যে সরকারী কারণেই আইন-ই-আকবরীর ইংরাজী অনুবাদের জন্যে তৎপর হয়ে পড়েছিলেন, সেটা পুরোপুরি ঠিক নাও হতে পারে। যে লোক ভাগবত গীতার অনুবাদ করায়, মহাভারতের রুরু ও প্রমদ্বরা কাহিনী পড়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে স্ত্রীকে চিঠি লেখে, শুধু যে প্রশাসনিক প্রয়োজনেই তাঁকে এই মহৎ উদ্যমে উদ্বুদ্ধ করেছিল, সেটা বোধ করি ঠিক নাও হতে পারে। সে যাই হোক, সতের শ' তিরাশি সালের জুলাই মাসে ওয়ারেন হেস্টিংসের পৃষ্ঠপোষকতায় আইন-ই-আকবরীর ইংরাজী অনুবাদ করেন ফ্রান্সিস গ্লাডউইন। এই ফ্রান্সিস সায়েব ছিলেন এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের ফাউণ্ডার মেম্বার। তিন খণ্ডের এই অনুবাদগ্রন্থের প্রথম খণ্ড ছেপে বেরোয় ঐ বছর পয়লা সেপ্টেম্বর। বইটি হেস্টিংসকেই উৎসর্গ করা হয়।

সেকালে বই ছাপা বড় সহজ কথা ছিল না। প্রবন্ধ গ্রন্থ ছাপায় আজকাল যেসব অসুবিধা রয়েছে, সেকালে সেগুলি ছিল আরও বেশী তীব্র। ক্রেতার অভাব আর অভাব অর্থের। এই সমস্যার সমাধান হিসেবে তখন কোম্পানীর তহবিল থেকে মূল্যবান বই প্রকাশের জন্য অর্থসাহায্য করার রেওয়াজ ছিল; অন্ততঃ সেই প্রথার কথা উল্লেখ করেই গ্ল্যাডউইন সায়েব গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের কাছে অর্থসাহায্যের জন্যে আবেদন করেছিলেন। কিন্তু এহ বাহ্য। তার আগেরও কথা আছে। প্রায় এক বছর আগে এই অনুবাদকার্যের পাণ্ডুলিপির কয়েকটি পাতা গ্ল্যাডউইন সায়েব খাস গবর্ণর জেনারেলের দপ্তরে হাজির করেন। সায়েব দুরু দুরু বক্ষেই এসেছিলেন কয়েকদিন পরে হেস্টিংসের মতামত জানতে। কিন্তু অকুণ্ঠ সাধুবাদ তাঁকে অভ্যর্থনা করল। হেস্টিংস খুব খুশী। স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসে উদ্বেল হয়ে বড়লাট বললেন, 'এক্সলেণ্ট'। কথায়

কথায় বইটি প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় বিপুল ব্যয়ভারের কথা এসে গেল।

সে আলোচনার ফলাফল কি হয়েছিল বলা না গেলেও দেখা যায় কয়েক দিন পরেই গ্ল্যাডউইন সায়েব এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্য সাহায্য চেয়ে আবেদন করেন কোম্পানীর কাছে। বলা বাহুল্য এর জন্যে হেস্টিংসের অন্ততঃ মৌন সম্মতি তিনি আগে থেকেই পেয়ে গিয়েছিলেন।

সতের শ' তিরাশি সালের দোসরা জুন ফোর্ট ইউলিয়ম থেকে ওয়ারেন হেস্টিংস প্রাচ্য সাহিত্যের উজ্জলতম নিদর্শন এই ফার্সি গ্রন্থটির প্রকাশনার জন্য বোর্ড অব ট্রেডকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবার জন্যে অনুরোধ করেন। এই ঐতিহাসিক মিনিটের বয়ান থেকে দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে ওঠে হেস্টিংসের প্রাচ্যসাহিত্য প্রীতি ও সুগভীর শ্রদ্ধা। হেস্টিংস বলেছিলেন, 'Though every branch of Indian literature will prove a valuable acquisition to the stock of European knowledge, this work will be found peculiarly so, as it comprehends, the original constitution of Mughal Empire, described under the immediate inspection of its founders...' অর্থাৎ যদিও ভারতীয় সাহিত্যের যে কোন শাখাই য়ুরোপীয় জ্ঞানভাণ্ডারের অমূল্য আহরণ হিসেবে পরিগণিত হবার যোগ্য তবু এই গ্রন্থটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে এতে মুঘল সাম্রাজ্যের মূল শাসন সংবিধান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতার নিজস্ব তত্বাবধানে লিখিত হইয়াছে।

হেস্টিংসের এই চিঠি থেকে আরও একটি খবর জানা যায়। হেস্টিংসের পরোক্ষ সম্মতি পেয়ে গ্ল্যাডউইন বইটা ছাপার কাজ শুরু করে দেন। কেননা, হেস্টিংস গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য বোর্ডকে সাহায্য করবার জন্যে সুপারিশ করার সময় বলেন যে এই অনুবাদ কার্যের গুণাগুণ বিচারের সহায়তার জন্যে বইটির ছাপা কয়েকটা পাতাও আবেদনপত্রের সঙ্গে দেওয়া হ'ল।

গভর্ণর জেনারেলের এই সুপারিশ বোর্ড গ্রহণ করেন। এবং সেইমত লীভোহল স্ট্রীটের কাছে চিঠি লেখা হয়, কোম্পানী একশ পঞ্চাশখানা বই কিনতে রাজী। কিন্তু তারপরই বাধল গোলমাল। কোম্পানী যে টাকা দেবে বলেছে, কিন্তু বোর্ড অব ট্রেড বললেন, কোম্পানীর খাজাঞ্চিখানায় অত টাকা কোথায়? ধিক্কারে শেষবেশ গ্ল্যাডউইনই বললেন, 'ভিক্ষে চাই না, খুব হয়েছে।'

বললেন তো, কিন্তু বই ছাপার খরচ? কি সমস্যা! মহা ফাঁপরে পড়লেন আইন-ই-আকবরীর প্রথম ইংরাজ অনুবাদক। আর গ্লাডউইনের এই বিপদে এগিয়ে এলেন আর কেউ নয়, ওয়ারেন হেস্টিংস স্বয়ং। এই অর্থসঙ্কটে হেস্টিংস তাঁর নিজের ট্যাঁক থেকে টাকা দিয়ে সাহায্য করেন। তবে একটা কথা। বোর্ড অব ট্রেড নগদ টাকা না দিতে পারলেও প্রকারান্তরে তাঁকে কিছু সাহায্য করেন। বোর্ডের পক্ষে তাঁদের সেক্রেটারি আর কোওয়ে গ্লাডউইনকে একটা চিঠি লিখে জানান এই সময় যে 'বইটির গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে' তাঁরা কোম্পানীর বোর্ড অব ডিরেক্টরদের কাছে কোম্পানীর কর্মচারীদের ব্যবহারের জন্যে পঞ্চাশখানা বই কেনবার জন্যে অনুমোদন করেছেন'। এ'ছাড়াও বোর্ডের সভ্যরা তাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্যে বইখানির এগার খানা কপি কেনবার প্রতিশ্রুতি দেন।

আরও একটা কাজ করেছিলেন বোর্ড অব ট্রেড। তাঁরা বিভিন্ন রেসিডেণ্ট ও সরকারী বাণিজ্য

সংস্থার কাছে ঐ দিনই একটি সার্কুলার জারী করেন। তাতে বইটি কেনবার জন্যেই শুধু অনুরোধ করেননি, কোম্পানীর ভারতীয় কর্মচারীরাও যাতে কেনে তার জন্যে তদ্বিরও করতে বলেছিলেন। কিন্তু এইটাই কোম্পানীর অর্থ সাহায্যের জন্যে হেস্টিংসের শেষ তদ্বির নয়। হেস্টিংসের আনুকূল্যে আইন-ই-আকবরীর প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব বেরিয়ে যাবার পর তৃতীয় খণ্ড ছাপার সময় এই সরকারী অনুদানের জন্যে ওয়ারেন হেস্টিংস আর একবার শেষ চেষ্টা করেছিলেন। সতেরশ' পঁচাশি সালের একত্রিশে ডিসেম্বর হেস্টিংস গ্লাডউইনকে সাহায্য করার জন্যে কোম্পানীর কাছে আর একটি পত্র লেখেন। মনে হয় ফল কিছু হয়নি। গ্লাডউইন কিন্তু হেস্টিংসের এই ব্যর্থ প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর বই-এর ভূমিকায় হেস্টিংসের এই মিনিটের সংশ্লিষ্ট অংশটুকু ছেপে দেন। কিন্তু কেমন হয়েছিল আইন-ই-আকবরীর এই প্রথম ইংরাজী অনুবাদ? বলাবাহুল্য কাজটা খুব সোজা ছিল না। আইন-ই আকবরীর ফার্সি আকবরনামার ফার্সি থেকে আলাদা। আকবরনামার প্রথম খণ্ড এবং দ্বিতীয় খণ্ডের বেশীর ভাগ চলন ফার্সিতে লেখা। মনে হয় কাহিনী বহুল বলেই আবুলফজল এই সহজ ফার্সির আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু আইন-ই-আকবরীর চালটা একটু ভিন্ন। অন্যে পরে কা কথা, সমসাময়িক এক ঐতিহাসিক—ইকবালনামা জাহাঙ্গিরীর রচয়িতা মহম্মদ শেরিফ মতামদ খাঁ আইন-ই-আকবরীর ফার্সি সম্বন্ধে বলেছিলেন যে এই গ্রন্থটি লেখবার সময় আবুলফজল প্রাচীনতম ফার্সি লেখকদের বয়ান অনুসরণ করেছেন; ফলে রচনা শুনতে কর্কশ হয়নি শুধু, পরিশ্রম ছাড়া বইখানি সাধারণ পাঠকদের পক্ষে পড়া বা পড়ে বোঝা শক্ত।

অনুবাদের কাজে গ্লাডউইন সায়েবকে এই ভাষাগত অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। কিন্তু তা হোক, সায়েব বেশ উৎরে গিয়েছিলেন। উৎরে গিয়েছিলেন এই কারণে যে সায়েব কখনও পাণ্ডিত্য ফলাতে যাননি। বক্তব্য বুঝে একজন সায়েব যেমন লিখত গ্লাডউইন তেমনি লিখেছিলেন। কিছু কিছু বাদও দিয়েছিলেন। প্রত্যেকটি আইনের আগে থাকত সম্রাট আকবরের দীর্ঘ অস্বস্তিকর প্রশস্তি। অনুবাদক বিনা দ্বিধায় সেগুলি বাদ দিয়েছেন। বাদ দিয়েছেন আবুলফজলের ভাই ফৈজীর লেখা ছয়শ' বয়েৎ-এর আকবরের সভাসদবর্গের মাহাত্ম্য খ্যাপন।

ফ্রান্সিস গ্লাডউইনের অনুবাদের পরে সংস্করণ হয়েছিল। একটা পাঠাগার সংস্করণও ছাপা হয়েছিল। সে সময় প্রথম সংস্করণের উৎসর্গ পৃষ্ঠাটি পুনর্মুদ্রিত করা হয়েছিল। এই সংস্করণটি সম্পাদনা করেন জগদীশ মুখোপাধ্যায়। দাম হয়েছিল ছয় টাকা।

সে কথা যাক গ্লাডউইনের পর আইন-ই-আকবরীর আরও ইংরাজী অনুবাদ হয়েছে। আঠারশ' তিয়াত্তর সালে ব্লাকম্যান সায়েব এর প্রথম খণ্ডের অনুবাদ করেন। ফিলট সায়েব উনিশ' উনচল্লিশে আবার তার সংস্করণ করে ছাপেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের অনুবাদ করেন এইচ-এস-জারেট। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার স্বাধীনতা লাভের পর এই দুইটি খণ্ডেরই সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করেন। বাঙলা আইন ই-আকবরীর অনুবাদ করেন পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়। এইটি একমাত্র বঙ্গানুবাদ এবং সেটিও গ্লাডউইনের ইংরাজী অনুবাদ থেকে ভাষান্তরণ। গভীর পরিতাপের সঙ্গে স্বীকার না করে উপায় নেই যে মূল ফার্সি থেকে আইন-ই-আকবরীর কোন বাঙলা অনুবাদ নেই। আজও না।

শিল্পে মনোলেখ

কল্পনা করা মানে অনুভূতি দিয়ে মনে মনে ছবি তৈরী করা। এই দুনিয়ার ছোট-বড়ো ফিকে-গাঢ় অনুভূতির বিষয়গুলো তাই শিল্পীর কল্পনায় মিলেমিশে মনের ঘরে কতো রকমের ছবি লিখে দেয়—কথার ছবি, রঙের ছবি, সুরের ছবি, এমনি সব। শিল্পী ওদের ঘষে মেজে আরাশ করে সাজিয়ে রাখেন পটে। সবাই একে বলেন ইমেজ, আমি নাম দিলুম মনোলেখ। তাহোলে দেখা যাচ্ছে, মনোলেখ হোলো শিল্পীর অনুভূতির ফসল। রসিক যদি সে-ফসল তুলতে চান নিজের গোলায় তবে তাঁরও দরকার অনুভূতির, শিল্পীর সমান অনুভূতির। অবশ্য ভাবনার দিক থেকে যে-মন শিল্পীমনের পড়শি, মনোলেখ তাকে নিয়ে যায় শিল্পভাবের শ্রীক্ষেত্রে, তারপর নিপুণ হাতে পাকা রসের রসকলিটি এঁকে দেয় তার কপাল জুড়ে।

মনোলেখ দুরকমের—সাদামাটা আর জমকালো। যদি বলি, ভোর বেলাকার আলোরা দুলছে শিরীষডালে, তবে মনোলেখ সাদামাটা। আর যদি বলি আলোর তারে ছড় টেনে শিরীষগাছটা সারা সকাল রাত্রির-ভৈরোঁ বাজালে, তবে চোখ বুজে একে জমকালো মনোলেখ বলে রায় দেওয়া যায়। কারণ প্রথমটায় আছে শুধু প্রাণ প্রতিষ্ঠার কল্পনা, আর শেষেরটায় প্রাণপ্রতিষ্ঠার কল্পনার ভেতর দিয়ে কল্পনার প্রাণপ্রতিষ্ঠা। তার মানে, একটায় অনুভূতি দাঁড়িয়ে রয়েছে বাইরের নজর-বাঁধা মাফিকের কোঠায়, আর-একটায় মাফিকের কোঠা পেরিয়ে অনুভূতি পৌঁচেছে গভীর বোধের জগতে। ফলে, একই আলো-ঝলমলে শিরীষগাছকে নিয়ে দুটি ভিন্ন আদলে গড়ে-তোলা মনোলেখ রসিকমনে দুরকমের আমেজ নিয়ে এলো।

কথার ছবির বেলায় যেমন, রঙের ছবির, সুরের ছবির বেলাতেও তেমনি। রঙগুলো সুরগুলো তো কথারই মতো শিল্পীমনের অনুভূতিকে মেলে ধরে। মরণপুরীর ছবি আঁকতে গিয়ে শিল্পী আলো-ছোপ-রেখার টানাপোড়েনে লাল-নীল-গেরুয়া-বাদামী-সাদা রঙের এমন একটি বুনুনি গড়ে তোলেন যাকে ভয়-বিষাদ-বিরাগ-আবছায়া রহস্য আর পবিত্র মহিমায় ঘেরা মরণপুরীর মনোলেখ বলে মানতে ইচ্ছে করে, যদিও মরণপুরী আমরা দেখি নি, কেউ কোনোদিন দেখে না। গানের আসরেও এমনি করে মনোলেখ গড়া হয় রাগরাগিনীর মালমশলায়। ওদেরই ভেতর দিয়ে শিল্পী কতকগুলো ছবি উপহার দেন রসিককে। তাই তিনি কল্পনামাফিক সৃষ্টি করেন বাগেশ্রী আর মালকোষ অঙ্গের কৌশিকী-কানাড়া, জয়জয়ন্তী আর বাহার মিলিয়ে জয়বাহার।

এখন, এই মনোলেখ শিল্পের একটা উঁচুদরে কারুকাজ ঠিকই, তবে শুধুই কারুকাজ নয়, সে সঙ্গে শিল্পীর ধ্যানধারণার সারটুকুও। ফলে, শিল্পীর ঐ ধারণাগুলোকে, তাঁর মন-দিয়ে-দেখা মানেগুলোকে রসিকের হাতে তুলে দিতে হয় একমাত্র মনোলেখের ঝাঁপিতে ভরে অনেকটা

বাদশাকে রেকাবিতে করে সোনাচাঁদির নজরানা দেবার মতো। তারপর রসিক যেই কথায়-রঙে-সুরে শিল্পীর দেওয়া মনোলেখ পেলেন অমনি তাঁর অভিজ্ঞতার পথ বেয়ে অনুভূতির দোরে পড়ল মৃদু চাপড়, আবেগ উঠলো জেগে। মোদ্দা, এক সাদৃশ্য থেকে মনোলেখের জন্ম, মনোলেখ থেকে আর এক সাদৃশ্যের। অবশ্য এই সাদৃশ্যকে হয় চোখের নজর আবিষ্কার করে, নয় তো মনের নজর। প্রশ্ন উঠতে পারে, শিল্পী যদি লেখেন—গিরিতলে জল কলকল করে ছুটে চলে, তাহোলে তো কোনো সাদৃশ্য নেই, মনোলেখ নেই, তবু রসিকমনে কেন অনুভূতি জ্বলে ওঠে। আমি বলবো, সাদৃশ্য এখানে কথায় না মিললেও সুরে মিলবে, জলের আওয়াজ বাজিয়ে দিতে এমন একটি ধ্বনিকে এখানে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সাজানো হয়েছে যার ভেতরে ধরা পড়েছে পাহাড়িয়া নদীর ছবি। মনোলেখ এখানে তাই সুর-বাহার। ভাটিয়ালিতে যে অকারণ জল আর বাউলের সুরে যে অকারণ মাঠ ছড়িয়ে পড়ে আমাদের মনের চোখের সুমুখে তা এই সুরেরই গড়া মনোলেখ।

ধরা যাক, শিল্পী একটি ছবি এঁকেছেন—একজন রুগ্ন লোক আধশোয়া হয়ে রয়েছে বিছানায়, পা থেকে বুক অবধি চাদরে ঢাকা, চুল এলোমেলো, চোখের চাউনি করুণ, হাতে তার ওষুধ খাবার গ্লাস, কিছুটা তরল ওষুধ রয়েছে সেই গ্লাসে; লোকটি অসহায়ভাবে তাকিয়ে আছে বিছানা থেকে দূরে জানালার কাছে রাখা একটি টেবিলের দিকে, সেই টেবিলে রয়েছে ছোটো একটি ঘড়ি, ক্রুশে বেঁধা যীশুর মূর্তি আর একগুচ্ছ আঙুর, পড়ন্ত বেলার রোদ এসে পড়েছে টেবিলে, সে সঙ্গে এসেছে একটা হলদে রঙের পাখি, যে ঠোঁট গুঁজে দিয়েছে আঙুরগুলোতে। কেউ হয়তো বলবেন, এখানে কথার ছবি নেই, সুরের ছবি নেই, রঙ আর ছবি থাকলেও শিল্পী কোনো রঙের ছবি সৃষ্টি করেন নি, একটা সহজ জিনিসকে সহজভাবে এঁকে দিয়েছেন, তবু তা রসিকমনে সাড়া জাগালো কেমন করে। আমার ধারণা, সহজকে সহজকরে এঁকে দেওয়াটাও তো মনোলেখ গড়বার আর একটা পথ। রসিকের ঘরে-দোরের অভিজ্ঞতার অনুভূতি ঐ ছবিতে তাঁরই অনুভূতির অভিজ্ঞতার সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছে। আয়নায় মুখ দেখার আনন্দ কুড়িয়েছে রসিকমন ঐ ছবির ভেতরে। তাছাড়া যদি বলি, শিল্পী কিছুই সৃষ্টি করেন নি তবে দারুণ ভুল করবো। ওষুধের গ্লাস-ধরে-থাকা রুগ্ন লোকটির পাশাপাশি আঙুল-ঠোকরানো পাখিটির বুনুনিই তো তাঁর বড়ো সৃষ্টি, অনুভূতির কারিগরি। এটাই তো সেরা মনোলেখ। একে বাদ দিলেও ঐ ঘড়ি ঐ যীশুমূর্তি ঐ পড়ন্ত রোদ্দুর—শিল্পীর অনুভূতিময় ছবির ইসারার দিক থেকে এরাই কি কেউ কম!

আসল জিনিসকে হালকা মোচড়ে বাঁক ফিরিয়ে শিল্পী সুন্দর মনোলেখ গড়তে পারেন। যেমন, দেয়ালগুলো মাছের চোখের মতো চেয়ে আছে—না বলে যদি বলি—মাছের চোখ ছড়িয়ে আছে সারা দেয়াল জুড়ে, তবে মনোলেখ ঢের বেশি সুন্দর হয়ে ওঠে। অবশ্য এমনি করে বাঁক ফেরাতে গিয়ে আসল জিনিসটি যেন ঝাপসা না হয়ে যায়, শিল্পীকে নজর রাখতে হবে সেদিকে। সুন্দর মনোলেখ বললে কেউ যেন মনে না করেন, শিল্পে সব মনোলেখই বুঝি মিঠে-মোলায়েম হবে। মোটেই তা নয়। ভীষণের ছবি থাকতে পারে, হতশ্রী জীবনের ছবি থাকতে পারে, দুঃখের ছবি, ঘৃণার ছবি, সর্বনাশের ছবিও। এখানে সুন্দর মানে চমৎকার। বস্তুর চোখে সুন্দর না হলেও শিল্পের চোখে সুন্দর। অনেকের ধারণা, মনোলেখ যখন সুন্দর একটি সৃষ্টি, তখন যতো বেশী

মনোলেখ হাজির করা যাবে, শিল্প ততো বেশি সুন্দর হয়ে উঠবে। হ্যাঁ, তা হতে পারে, যদি সে সব মনোলেখ শিল্পের তাগিদে গড়া হয়। নইলে শুধু মনোলেখ গড়ে শিল্পকে বাহারে করবার একরোখা উৎসাহে অগুণতি মনোলেখ গড়লে সেগুলো শিল্পের দিক থেকে সুন্দর হবে না, ফলে শিল্পও রইবে অসুন্দর হয়ে। কারণ ছবি মানেই তো আর শিল্প নয়। ছায়াছবির পুরোটা একটা শিল্প, কিন্তু তার কাটা কাটা ছবিগুলোকে দেয়ালে গাঁথা কাঁচের বাক্সে টাঙিয়ে দিলে তাদের তখন শিল্প বলি কেমন করে!

অনেক সময় শিল্পীর অনুভূতি ফুটে ওঠে একটি বিশেষ মনোলেখে, কখনো বা একের বেশি মনোলেখ মিলে যে আবেশ গড়ে তোলে তার ভেতর দিয়ে। ধরা যাক, শিল্পী বললেন—অন্ধকার সিঁড়িটা পেরোতে গিয়ে হঠাৎ বৃষ্টির কথা মনে এলো। এখানে, সিঁড়ি আর বৃষ্টিকে নিয়ে দুটো স্পষ্ট মনোলেখ গড়ে উঠেছে। কিন্তু শিল্পীর অনুভূতি সিঁড়িতেও নেই, বৃষ্টিতেও নেই। তাছাড়া অন্ধকার সিঁড়ির সঙ্গে বৃষ্টির মিল কোথায়? আছে। চোখে যেখানে অমিলটাকে বড়ো করে দেখে, অনুভূতি সেখানেও মিল খুঁজে পায়। সিঁড়ির ঐ ঠাণ্ডা অন্ধকার হচ্ছে বাদলা-দিনের মেঘলা আঁধারেরই আরেক রূপ, অন্ধকার সিঁড়িতে একলা চলতে গিয়ে যে-বিষণ্ণতা জাগে মনে, বৃষ্টিঝরার ধ্বনিতরঙ্গে মন-কেন-করার সাথেই তার যোগ। কাজেই শিল্পীমনের সবটুকু অনুভূতি রয়েছে ঐ দুটো অভিজ্ঞতার মিলনবিন্দুতে দুয়ের বোঝাপড়ায়।

এখন কথা হোলো, এই ভাবের মনোলেখের সঙ্গে প্রতীকের তফাৎটা কোথায়। আসলে গোড়া দুটোরই এক। তার মানে, শিল্পী তাঁর মনের যে-অনুভূতিকে পৌঁছে দিতে চান রসিকমনে, সে-অনুভূতিকে ঠিকমতো পৌঁছে দেবার কাজে ভাবের মনোলেখ আর প্রতীক দুজনেই পাকা হরকরা। প্রতীকে যেমন দুটো জিনিসের ভেতরে সাধারণ মিল খুঁজে পায় শিল্পীমন, ভাবের মনোলেখেও তেমনি। তবে প্রতীকে সেই মিল অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ; আর ভাবের মনোলেখ মিলটুকু খুঁজে বের করতে হয় ঘোরালো পথে ঘুরে ঘুরে ঘুরে। সোজা কথায়, মিল যেখানে সহজ নয়, মিলকে সেখানে সহজ করাই ভাবের মনোলেখের নিশানা। এছাড়া প্রতীকে প্রতিমাটি থাকে সামনে, মূল বিষয়টি থাকে আড়ালে; ভাবের মনোলেখে দুটোই পাশাপাশি।

প্রশ্ন উঠবে, রূপকেও তো মূল বিষয় আর প্রতিমা থাকে পাশাপাশি: এক নজরে যাদের ভেতর বনিবনা নেই বলে মনে হয়, ভাবের মনোলেখের মতো রূপকও তো তাদের বাঁধে মিলের গাঁটছড়ায়, তবু রূপক কেন আলাদা আসন পেলো। আমার ধারণা, রূপকে মূল বিষয় আর প্রতিমা পাশাপাশি থাকে বললে কম বলা হয়, থাকে জড়িয়ে মিশিয়ে। রূপক হচ্ছে ভাবের মনোলেখেরই আরো কিছুটা গাঢ় রূপ। যতটা গাঢ় করলে অন্ধকার সিঁড়িতে বৃষ্টির কথা মনে হওয়ার ব্যাপারটা একেবারে মনের সিঁড়িতে অন্ধকার বৃষ্টির ব্যাকুলতা হয়ে উঠতে পারে, ঠিক ততোটা। রূপক যখন দুটো ভিন্ন জিনিসকে জোড়া দেয় তখন সেই জোড়ের জায়গায় থাকে এই মনোলেখের কারিগরি। কারণ রূপকও ছবি, তবে দীঘল ছবির উজ্জ্বল সারসংক্ষেপ।

দেবব্রত চক্রবর্তী

জাতীয় নাট্যশালা ও নাটক

আগের বার আমরা জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার বিকল্প পন্থা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এবং মোটামুটি সকল নাট্যসংস্থার মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠা কেন্দ্রীয় এক সংস্থার সাহায্যে যে একাজ করা সম্ভব তা বোধহয় রসিকজনকে বোঝাতে পেরেছিলাম। এবার সে-হেন নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হলে বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে তা কি প্রভাব বিস্তার করবে তা নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করছি। স্বাভাবিক কারণেই এ আলোচনা অসম্পূর্ণ, তবে এর ওপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতের পরিপূর্ণ রূপরেখা রচনা করা অনেকটা সহজসাধ্য হবে এই আশাই পোষণ করা যায়।

প্রথমতঃ জাতীয় নাট্যশালাকে বাংলা নাটকের সজীব কোষ হতে হবে অর্থাৎ একেবারে গোড়ার যুগ থেকে বর্তমান পর্যন্ত বাংলা ভাষায় যত নাটক লেখা হয়েছে তাদের অভিনয়যোগ্য সবগুলিকেই যে কোন মুহূর্তে অভিনয়োপযোগী করে রাখতে হবে। কিছুটা সংস্কার অবশ্য করতে হবে কিন্তু তা প্রধানতঃ ভাষাগত। এই ধরণের নাটকের বস্তুগত আধুনিকরণ নাটকটির ঐতিহাসিক মূল্যকে হ্রাস করবে একথা সুনিশ্চিতভাবে বলা চলে।

আমাদের প্রস্তাবিত রূপানুসারী জাতীয় নাট্যশালায় এ ধরনের ব্যবস্থা করা খুব কঠিন হবে না। কারণ যেহেতু বহু নাট্যসংস্থার সমবায়ে এ নাট্যশালা গড়ে উঠবে কাজেই বিভিন্ন সহযোগী নাট্যসংস্থার ওপর একটি বা দু'টি নাটক প্রস্তুত করবার দায়িত্ব অর্পণ করলে অতি অল্পায়াসে তথা অল্প সময়ে নাটকগুলি তৈরী করা যাবে। অবশ্য কালাযুগ ও যথাযথ মঞ্চায়নের কাজে নাট্যশালা সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা নির্ধারিত পরিচালককে সহায়তা করবেন।

এতে অভিনয় শিক্ষার্থীরা বহু বিচিত্র চরিত্রসত্তার রূপায়নের সুযোগ পেয়ে সহজেই নিজেদের শিক্ষার পূর্ণতা আনতে পারবে। পরিচালকরাও সমকালীন সৃষ্টির বাইরে চরিত্ররূপায়ণের তথা মঞ্চায়নের মাধ্যমে নিজের ক্ষমতা কষ্টিপাথরে যাচাই হয়ে যাবে। ফলে হয়ত কিছু চটকদার পরিচালক থাবে কিন্তু রক্তে যার নাটক সে ঠিকই সাফল্য অর্জনে সক্ষম হবে এবং তার সৃষ্টি দর্শকদের মার চোখে শুধু ছাড়াও মনে নাড়া দেবার মতন নাটক উপস্থান করে আপন ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারবেন। দর্শকরা বাংলা নাটকের বিবর্তন যেমন অনুধাবন করতে পারবেন তেমনি একদা জনমনোরঞ্জক নাটক যুগের পরিবর্তন সত্ত্বেও দর্শকদের মনের খোরাক যোগাতে পারবে কি না সে খবরও জানা যাবে। এ তথ্য আধুনিক নাট্যকারদের দর্শকের মনের গতি-প্রকৃতি বুঝতে সাহায্য করবে।

জাতীয় নাট্যশালা এ ছাড়াও প্রাচীন সংস্কৃত নাট্যাবলীর সু-অনুবাদ উপস্থাপন করবে। সংস্কৃত কন্যা বাংলাকে করায়ত্ব করতে গেলে যেমন তার মাতৃ পরিচয় সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকা দরকার ঠিক তেমনি বাংলা নাটককে এগোতে হলে তার পূর্বাপর সম্বন্ধ সম্বন্ধে পতাকাবাহকদের

ওয়াকিবহাল থাকা একান্ত প্রয়োজন। অবশ্য ঐ একই বিচারে পশ্চিমী নাট্যশালা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তবে এক্ষেত্রে পারম্পর্য রক্ষাটাও দরকার। ইবসেন থেকে সোফোক্লিস কি মলেয়ার থেকে আয়োনাস্কো—কোনটাই এই পারম্পর্যের নিদর্শন বলা চলে না অথচ এদেশের নাট্যসংস্থায় এমন ঘটনা প্রতিদিনই ঘটছে। ফলে যেমন দর্শক তেমনি নাট্যশালা সম্পৃক্ত অন্যান্য সকলেই পথ নির্দেশে ভুল করে বিভ্রান্ত হচ্ছে!

জাতীয় নাট্যশালাকে তাই পূর্ব পশ্চিম দু'দিকের ঐতিহ্যকে প্রকরণগত ভাবে উপস্থাপনে যত্নশীল হতে হবে। পূর্বে শুধু ভারতীয় নাটক নয়, চীনা ও জাপানী পরম্পরাগত রীতির নাটক নিয়েও চিন্তা করতে হবে। একদা জাপানী কাবুকি নাটকের কিছু অনুসরণ এদেশে করা হয়েছিল কিন্তু অন্য সব কিছুর মত এটাও খাপছাড়া ভাবে করায় তা সাধারণের কাছে বিশেষ মূল্য পায়নি। এতক্ষণ প্রাচীন নাটকের কথাই বলা হচ্ছিল, এর-মধ্যে অনুবাদ বা ভাবানুসরণও আছে। কিন্তু জাতীয় নাট্যশালাও মৌলিক নাটককে অস্বীকার করে বাঁচাতে পারে না কাজেই মৌলিক নাটক লিখতে নাট্যকারদের উৎসাহ দেওয়া হবে। পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক নাটক নিয়মিত মঞ্চায়ন করে যুগরুচিকে পরিবর্তনের চেষ্টা যেমন করা হবে তেমনি নাট্যামোদী রসিক দর্শককে নিজের মতামত প্রকাশের সুযোগ দিয়ে নাট্যকারের যথার্থ মূল্যায়ণের সুযোগ করে দিবে।

জাতীয় নাট্যশালার সংগে সংযুক্ত থাকার ফলে নাট্যকাররাও লাভবান হবেন। নাট্যকারদের তাই এখানে বিশেষ সম্মানের আসন থাকবে। মহৎ নাট্যকার কখনই তৈরী করা যায় না কিন্তু সু-নাট্যকার সৃষ্টি অবশ্যই সম্ভব। আমরা যদি অধিকাংশ নাট্যকারকে সু-নাট্যকারে রূপান্তরিত করতে পারি, তাহলে সেই পরিবেশে হয়ত মহত নাট্যকারের জন্ম হতে পারে। মার্লো না থাকলে যেমন সেক্সপীয়ার সম্ভবতঃ জমি চাষ করেই দিন কাটাতেন মানব জমিন পতিতই থাকত তেমনিত আমাদের দেশেও হচ্ছে। প্রতিদিন যুগান্তকারী নাটকের হুজুগে নাট্যলক্ষ্মীকে তো ধুলোয় নাবাতে হয়েছে এবার কি সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটবে নাকি?

যে কোন কাজ করতে গেলে কিছুটা অভিজ্ঞতা থাকা দরকার; সাহিত্যের বাজারই তার একমাত্র ব্যতিক্রম। যে কোন লোক যথাইচ্ছা নাটক লিখতে পারেন এবং পকেটে কিছু রেস্ত থাকলেই তা মঞ্চস্থ করে দর্শককে জীবন্ত নরক দর্শন করান যেতে পারে। গণতন্ত্রী দেশে তাদের নিরস্ত করা কঠিন, হয়ত উচিতও নয়, তাদের বোঝাবার উপায় যখন নেই তখন পথ নির্দেশিকা থাকতে বাধা দেওয়া উচিত নয়।

নাট্যকারকে যেমন মানব চরিত্র খোলাখুলি ভাবে জানতে হবে তেমনি নাটকীয় গুণাবলীও তাঁর মধ্যে যথোপযুক্ত পরিমাণে থাকা উচিত। অর্থাৎ যে নাটক যেমন হওয়া উচিত সেটাকে তেমনি ভাবে গড়তে চেষ্টা করা দরকার। এ কাজে নাট্যকারকে সহায়তা করার জন্য জাতীয় নাট্যশালা কর্তৃপক্ষের এক বিচারক সংস্থা গঠন প্রয়োজন। এঁরা প্রত্যেকটি নাটক পড়ে প্রয়োজন দেখে প্রত্যেকটির মঞ্চায়ন প্রত্যক্ষ করে কোনটির কি দোষ ত্রুটি আছে তা সর্বজনবোধ্য ভাষায় প্রকাশ করতে হবে। এসব অবিমিশ্র প্রশংসা বা অবিমিশ্র নিন্দা করার প্রয়োজনীয়তা কি? কোন কোন নাট্যকারের হয়ত এধরনের প্রচেষ্টায় ক্ষুব্ধ হওয়ার সম্ভাবনা সেদিকে নজর দিয়েও এ প্রচেষ্টা চালানো অত্যন্ত প্রয়োজন। তাহলে নাট্যকার সমস্যার একটা সুরাহা হতে পারবে।

রবি মিত্র

সৌন্দর্যের পূজারী কবি কবি কীটস্ একদা চ্যাপম্যান কর্তৃক হোমারের 'ইলিয়াড' কাব্যের প্রাঞ্জল অনুবাদ পাঠ করে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। কীটস্ গ্রীক জানতেন না, কিন্তু উক্ত কাব্য অনুবাদ পাঠে প্রাচীন গ্রীক ভাবধারার সৌন্দর্যমণ্ডিত চিত্তবৃত্তিকে আবিষ্কার করে তিনি অভিভূত হয়েছিলেন। এবং বলা বাহুল্য, সেটি সম্ভব হয়েছিল চ্যাপম্যানের মূলানুগ অনুবাদের জন্য। এবং সেজন্য কবি কীটসের চিত্তে যে বিস্ময় ও শ্রদ্ধানত অনুরাগের সৃষ্টি হয় তা তিনি ব্যক্ত করেন 'অন ফার্স্ট লুকিং ইনটু চ্যাপম্যান'স হোমার' কবিতায়ঃ

...'Oft of one wide expanse had I been told
That deep-browed Homer ruled as his demense ;
Yet did I never breathe its pure serene
Till I heard Chapman speak out loud and bold :
Then felt I like some watcher of the skies
When a new planet swims into his ken ;
Or like stout Cortez when with eagle eyes
He star'd at the Pacific—and all his men
Looked at each other with a wild surmise—
Silent, upon a peak in Darien'

এবং, সংস্কৃত থেকে গৌড়জন উপযোগী ললিত ভাষায় মহাভারত অনুবাদ করেছিলেন কবি কাশীরাম দাস। সেই অনুবাদ কাব্যের সুধা পান করে আমাদের মাইকেল মধুসূদন দত্ত-ও বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন এবং একটি চতুর্দশপদীর মাধ্যমে আপন শ্রদ্ধা ব্যক্ত করেছিলেন বাঙালী কাব্যপিপাসুর পক্ষ থেকে। গৌড়জন আজিও সেই অনুবাদের সুধা পান করে চলেছেন।

বিশ্বসাহিত্যে কাব্যের যে অনুপম রচনামালা রয়েছে তার প্রতি বিশ্বের প্রত্যেক কাব্যপাঠকের অসীম শ্রদ্ধা। প্রতিটি উৎসাহী কাব্যপাঠক সে রসসুধা পানে উৎসুক, কিন্তু বিদেশী ভাষা সেই ইচ্ছা পরিপূরণের প্রধান অন্তরায়। পাঠককে সেজন্য মূলের উৎসরস সন্ধানে অনুবাদের উপরই অনেকখানি নির্ভর ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না। সম্প্রতি ইংরেজি ভিন্ন য়ুরোপীয় অন্যান্য ভাষাগোষ্ঠির উল্লেখযোগ্য কবি ও তাঁদের উল্লেখ্য কবিতার ব্যাখ্যাসহ প্রত্যক্ষ গদ্যানুবাদের একটি সঙ্কলন প্রকাশিত হয়েছে। যা থেকে অন্যান্য ভাষাভাষী পাঠক নিশ্চয়ই বিশ্বকাব্যভাণ্ডারে কিঞ্চিৎ সুধা আহরণের সুযোগ পাবেন।

স্ট্যান্‌লে বারনশ সম্পাদিত 'দি পোয়েম ইটসেল্‌ফ' সঙ্কলনটি নানা কারণেই আধুনিক কাব্যপাঠককে উৎসাহিত করবে। বিদেশী ভাষায় খ্যাতিমান কবিদের, আজকের কাব্য আন্দোলনে দেশে বিদেশে যারা নন্দিত, তৎসহ পঠিত, কাব্যাদর্শের বিশ্লেষণসহ তাঁদের কবিতা বর্তমান সঙ্কলন

গ্রন্থটিতে সন্নিবেশিত হয়েছে। বিদেশী সাহিত্যের তথা য়ুরোপীয় কাব্যের বিগত এক শতাব্দীর গতিপ্রকৃতি বর্তমান সঙ্কলন পাঠে পাঠক আবিষ্কার করতে পারবেন।

সঙ্কলন গ্রন্থটির সম্পাদক স্ট্যান্‌লে বারনশ' স্বয়ং একজন কবি। তিনি একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে গ্রন্থটিব সম্পাদনায় ব্রতী হয়েছিলেন। সচরাচর দ্রষ্টব্য সঙ্কলন গ্রন্থের চিরাচরিত পথে তিনি অগ্রসর হননি। ইংরেজি ভিন্ন অন্যান্য য়ুরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর উল্লেখ্য কবিদের বহুখ্যাত একাধিক কবিতার প্রতিটি ছত্রের সাহিত্যরসপুষ্ট আক্ষরিক ব্যঞ্জনা, মুল বক্তব্যের বিশ্লেষণ, ভাষ্য পরন্তু কবিকর্ম ও কবি সম্পর্কে সারগর্ভ আলোচনা এবং মূলের উচ্চারণবিধির এক পরিশ্রমী চরিত্র গ্রন্থটিতে বিরাজমান। সম্পাদকমণ্ডলী মূল কবিতার কাব্যিক অনুবাদ প্রকাশ করে হয়তো তাঁদের কর্তব্য থেকে বিরত থাকতে পারতেন। কিন্তু ভূমিকায় ইংগিত করা হয়েছে যে আসলে এ সঙ্কলনের উদ্দেশ্য তা নয়—মোট কথা মূল কাব্যের বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিশ্বকাব্যের সাধারণ পাঠকের মধ্যে সঞ্চারিত করাই গ্রন্থটির অন্যতম লক্ষ্য।

মূল ফরাসী, স্প্যানিশ, জর্মন, ইতালী, পর্তুগীজ ভাষায় প্রতিনিধি স্থানীয় দেড়শত কবিতা বর্তমান সঙ্কলনের ভিন্ন ভাষাভাষী পাঠকদের রসনিবৃত্ত করবে। প্রতিটি কবিতাই মূল ভাষায় গ্রন্থে মুদ্রিত এবং পাশাপাশি পংক্তি-অনুক্রমিক সেগুলির গদ্যান্তর ও বিশ্লেষণ রসিক পাঠককে বিশ্ব-কাব্যের কাননে প্রবেশের পথে আলোকবর্তিকার কাজ করবে।

সর্বসমেত পঁয়তাল্লিশ জন বিশিষ্ট কবি এই গ্রন্থে স্থান লাভ করেছেন। এই তালিকায় ফরাসী কাব্যের চার্লস বোদ্‌লেয়র, র‍্যাঁবো, ভ্যালেরী, স্তিফেন মালার্মে, ভের্লেন, পল ক্লদেল, অ্যাপোলিনেয়র, লুই আঁরগ, স্ত জ পার্স, পল এলুয়ার এবং আধুনিকতম রেনে চার প্রভৃতি; জর্মন কাব্যের ফেদেরিক হ্যেলডারলিন, স্তিফান জর্জ, রিল্‌কে, বারটল্ট ব্রেফ্‌ট; স্পানিশ ও পর্তুগীজ কাব্য সাহিত্যের উনোমুনো, রোসালিয়া কাস্ত্রো, জোয়ান র‍্যমন হিমেনেৎ, ফার্নানদে পেশওয়া, জর্জ ত্ব লিমা, ফেদেরিকো গারথিয়া লরকা, রাফায়েল আলবার্তি এবং সাম্প্রতিকতম বহু আলোচিত পাবলো নেরুদা প্রভৃতি; এবং সর্বশেষে ইতালীয় কাব্যের গিয়াকোমো লিয়োপারদি, জি, জি, বেল্লি, আন্নুনজিও, গোজানো, আমবার্তো সাবা, মন্টেল, সালভাদোর কোয়াসিমোদো প্রমুখের কবিতা সঙ্কলিত হয়েছে। বিগত দেড় শতকের য়ুরোপীয় বিভিন্ন কাব্য আন্দোলন সম্পর্কে প্রারম্ভে সম্পাদক মহাশয়ের একটি প্রবন্ধ সংযোজিত হয়েছে। আধুনিক য়ুরোপীয় কাব্যাদর্শ মানসিকতা, ইত্যাদি অনুধাবনের পক্ষেও উক্ত প্রবন্ধটি প্রচুর পরিমাণে সহায়ক। বলাবাহুল্য, সঙ্কলনখানি তার পরিকল্পনা বিন্যাসে অন্যান্য ভাষাভাষী কাব্যরসিকের কাছে সহনীয় করে তুলতে সক্ষম হবে।

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

* **THE POEM ITSELF**: Edited by Standley Burnsho. Assistant Editors: Dudly Fits, Henry Peyere, Johu Frederick Nims, Pelican Books.

ভারতীয় সঙ্গীত প্রসঙ্গ ॥ প্রথম খণ্ড (মুসলিম যুগ)। ডাঃ বিমল রায়। প্রকাশক : জিজ্ঞাসা। ৩৩ কলেজ রো। কলি-৯। দাম : ছয় টাকা।

প্রাচীন ভারতের সঙ্গীত ইতিহাস নিয়ে গবেষণার অন্ত নেই। একথা জানা গেছে যে মহেনজোদারোর সভ্যতায় ছিদ্রযুক্ত বাঁশীর ব্যবহার ছিল। নৃত্যরতা মৃন্ময় মূর্তিও তখনকার সাঙ্গীতিক সাক্ষ্য বহন করছে। বৈদিক যুগের সঙ্গীত নিয়েও আলোচনা কম হয়নি। তবু আলোচনায় ধারাবাহিকতার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। সে যুগের সঙ্গীত সম্পর্কে হয়ত কিছুটা জেনেছি কিন্তু তার ইতিহাস এখনও লেখা হয়নি।

খ্রীষ্টির প্রথম বা দ্বিতীয় শতকের ভারত নাট্যশাস্ত্র সংকলন ও পরবর্তী সম্পাদকমণ্ডলীর সংরক্ষণ প্রচেষ্টা প্রাচীন ভারতের ইতিহাস জানতে আমাদের সাহায্য করেছে। তবু সম্পূর্ণ ইতিহাসের মালমশলা পাওয়া শক্ত। কিছুটা রাজনৈতিক কারণে কিছুটা বা ধারাবাহিক চিন্তাশীলতার অভাববশতঃ বোধকরি প্রাচীন ইতিহাস সংরক্ষণ সম্ভব হয়নি। তাই আধুনিক ঐতিহাসিকরা প্রাচীন কিম্বদন্তী ও ঐতিহাসিক সত্যের ভেদাভেদ নির্দ্ধারণ করতে অপারগ হয়ে কেউ বা হাল ছেড়ে দিয়েছেন আবার কেউ বা অনুমান শক্তি প্রয়োগ করে এগিয়ে চলেছেন।

রামায়ণ মহাভারতে লবকুশের বীণাবাদ্য সহকারে গান বা বিরাট রাজার বাড়ীর নৃত্যশালা ও গান্ধর্ব জাতির পরিচয় প্রসঙ্গ ব্যাপারের উদাহরণগুলির ঐতিহাসিক মূল্য নিরূপণের যুক্তি প্রয়োগে অনুমানকে সত্যের পর্যায়ভুক্ত করতে হয়। কিন্তু মৃচ্ছকটিক নাটকে রেভিলার বাড়ীর গীতবাদ্যাদি ব্যাপার বা মালবিকাগ্নি মিত্র নাটকে মালবিকার চতুষ্পদ বস্তু সহযোগে মধ্যলয়ে গানের উল্লেখগুলি ঐতিহাসিক সত্য হিসাবেই গ্রহণযোগ্য। তবু এই ধরনের বিক্ষিপ্ত উল্লেখগুলি নিয়ে ইতিহাস লিখতে বসা যায় না।

আলোচ্য গ্রন্থে ডাঃ বিমল রায় এই যুক্তিগুলির বশবর্তী হয়েই "ভারতীয় সঙ্গীত প্রসঙ্গ" লিখতে বসে মুসলিম যুগ থেকে শুরু করেছেন। খ্রীষ্টিয় একাদশ শতাব্দীতে মুসলমানরা ভারতে আসে। এই সময় থেকেই ভারতীয় সঙ্গীত ঐতিহ্যে পরিবর্তন আরম্ভ হয়। মুসলমান ঐতিহাসিকদের মতে যখন আলাউদ্দীন খিলজী ঢাকা আক্রমণ করেন এবং তাঁর স্থলতান মালিক কাফুর ১৩১০ খৃষ্টাব্দে যখন দক্ষিণ ভারত জয় করেন তখন ভারতবর্ষে সঙ্গীতে স্বর্ণযুগ চলছে। কথিত আছে যে সেই সময় সম্রাটের বাহিনী বিভিন্ন সঙ্গীতজ্ঞদের ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে নিয়ে এসে উত্তর ভারতে বসতি স্থাপন করায়। এই সময়েই পারস্য থেকে কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ আমীর খুসরোকে ভারতে আনা হয়। এবং সেই সময়ই স্থাপিত হয় উত্তর ভারতের সঙ্গীত বুনিয়াদ।

ভারতীয় সঙ্গীত প্রসঙ্গ বস্তুতঃ ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস লেখার মালমশলা সংগ্রহ পর্যায়ে

পড়ে। সন তারিখের ধারাবাহিক আলোচনার দিকে নজর নিবদ্ধ না রেখে ডাঃ রায় প্রধানত ঘরানার বৃক্ষপঞ্জী নিয়ে আলোচনা করেছেন। এছাড়া করেছেন ধ্রূপদ খেয়াল ইত্যাদি বিভিন্ন গীত পদ্ধতির বৃত্তান্ত আলোচনা। বিভিন্ন ব্যক্তি বিশেষকে কেন্দ্র করে গুরুমুখী বিদ্যার ক্রমপ্রকাশের বৃত্তান্ত ডাঃ রায়ের বিষয়বস্তু। ডাঃ রায়ের বৈজ্ঞানিক মন কোনও কাব্য বা কিম্বদন্তী মূলক উপাখ্যানকে কেন্দ্র করে অগ্রসর হয়নি। তিনি ঐতিহাসিক সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রামাণ্য ইতিহাসের পাতাই অবলম্বন করেছেন। শিব সদাশিব ব্রহ্মা ইত্যাদি দেবতার নামে সঙ্গীতকে স্বয়ংসিদ্ধ না করে সাধারণ ভারতীয় নাগরিক হিসাবেই তাদের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।

মুসলমান ঐতিহাসিকেরাই মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস লিখে গেছেন। পরবর্তী যুগে বিভিন্ন ঐতিহাসিকেরা সেগুলির সত্যতাও যাচাই করেছেন। ফলে কোথাও বা মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। মুসলিম যুগ থেকে সঙ্গীত প্রসঙ্গ আরম্ভ হয়েছে সুতরাং ইতিহাস থেকে সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করবার কোনও অসুবিধা এক্ষেত্রে হয়নি। তাঁর প্রথম আলোচনা শার্ঙ্গদেবের সঙ্গীত রত্নাকর গ্রন্থের পূর্বাভাষে তিনি বলেছেন যে মুসলমান রাজত্বের প্রারম্ভে যখন হিন্দুসঙ্গীত স্তব্ধ, গীতগোবিন্দের গান নীরব, হিন্দুর যা কিছু নষ্ট হচ্ছে আগুনে পুড়ছে তখন "এই ধ্বংসস্তূপ থেকে সঙ্গীত শাস্ত্রকে বাঁচাতে এগিয়ে এলেন শার্ঙ্গদেব তাঁর সংগৃহীত বিভিন্ন পুস্তক থেকে সার অংশ সংকলন করে। নিজ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ঐ সংকলনে মিশিয়ে "সঙ্গীত রত্নাকর" নামক সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়ন করে।"

ভারতীয় সঙ্গীত প্রসঙ্গ প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় সঙ্গীতগুণীদের জীবনীও বটে। সঙ্গীতগুণীদের জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন ঘরানার ইতিহাস আলোচনা একান্ত প্রয়োজন। বস্তুতঃ ভারতীয় সঙ্গীতের বিশেষ করে উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস বিভিন্ন ঘরানার ইতিহাসেরই নামান্তর। ঘরানা বিশেষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে অনেক কাহিনী বা কিম্বদন্তী ইতিহাসের স্থান দখল করে বসে আছে। এই সমস্ত কাহিনীর অধিকাংশই কল্পনার সঙ্গে সত্য মেশানো এবং স্ববিরোধী। সুতরাং ঘরানার ইতিহাস জানলেই সত্য প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভব।

এছাড়া আছে গল্প উপন্যাসের কাহিনীকারদের মোহ। এঁদের হাতে পড়ে জীবনে অনেক নূতন তথ্য সন্নিবেশিত হয়ে পড়েছে। তানসেন সম্পর্কে কিম্বদন্তীর অভাব নেই। মীরাবাঈ তো অনেক সময় কল্পিত চরিত্র বলেই মনে হয়। ঐতিহাসিক টডের মতে মীরাবাঈ রাণা কুম্ভের পত্নী। জন্ম ১৪২০ খৃষ্টাব্দে ও মৃত্যু ১৫৪৬ খৃষ্টাব্দে। শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর লিখেছেন, সম্রাট আকবরের দরবারে মীরাবাঈ গান করেছেন। অনেকে আবার মীরাবাঈকে শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক হিসাবে দেখেন।

গ্রন্থকার এই সকল সন্দেহের নিরসন করেছেন। "ভারতীয় সঙ্গীত প্রসঙ্গ" একাধারে ইতিহাস ও জীবনী। সঙ্গীত ইতিহাসের জট ছাড়ানোর প্রচেষ্টা সত্যই সার্থক হয়েছে।

প্রায় নির্ভুল ছাপা, উৎকৃষ্ট মলাট ও বাঁধাই বইখানির বহিরাকর্ষণ। ভিতরের বস্তু সঙ্গীত অনুশীলক মাত্রেই উপভোগ করবেন। স্বচ্ছলসুন্দর ভাষায় ডাঃ রায়ের এই বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস বিশ্লেষণ পদ্ধতিকে স্বাগত জানাই। গ্রন্থশেষে একটি গ্রন্থপঞ্জী সংশ্লিষ্ট থাকলে ভাল হত বলে মনে হয়।

নরেন্দ্রকুমার মিত্র

কাছের মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র ॥ সোমেন্দ্রনাথ বসু। প্রকাশক : বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা। দাম : ছয় টাকা।

বঙ্কিম সাহিত্য সম্পর্কে সাধারণ পাঠকের আগ্রহ স্তিমিত এখন। বিশ্ববিদ্যালয়ের চাপে তাঁর দু-একটি গ্রন্থের পঠন-পাঠন বাধ্যতামূলক না হলে বোধ করি পর্ণোগ্রাফির হাটে বসে কেউ তাঁকে চকিতেও স্মরণ করত না। বঙ্কিম রচনাবলী আজ ধ্রুপদী সাহিত্যের মণিকোঠার স্থান পেয়েছে। ধ্রুপদী-সাহিত্যের পরিহাস এই, তার গলায় ফুলের মালা, পদপ্রান্তে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদিত হলেও, নিভৃত মনের অবসর সঙ্গীরূপে তার কোন আমন্ত্রণ নেই। সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র আরও দুর্ভাগা। রবীন্দ্র জন্মোৎসব এবং শরৎসাহিত্য সম্মেলনের নামে নানাস্থানে যুগোচিত হুজুগ দেখা দিলেও মাইকেল, দীনবন্ধু ও বঙ্কিমচন্দ্র আজও বিস্মৃত (কী আশ্চর্য, দীনবন্ধুর নাটকে আদিরস ও ভাষায় শ্ল্যাং থাকা সত্ত্বেও)। দুর্গেশনন্দিনীর শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে কোন প্রকাশন প্রতিষ্ঠান তাঁর গ্রন্থের সুলভ সংস্করণ প্রকাশ করেছেন বলে জানা নেই। হুজুগে সংবাদপত্রগুলি কোন ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে শ্রদ্ধানিবেদন করেন নি, (কারণ বিজ্ঞাপন প্রাপ্তির সম্ভাবনা নেই)।

এতে অবশ্য আক্ষেপের কারণ নেই। বঙ্কিম নিজেও তার জাতি-চরিত্র জানতেন—বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃত জাতি। এই নিদারুণ রুচি-বৈগুণ্যের দিনে সোমেনবাবু 'কাছের মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র' প্রকাশ করে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর ভূমিকার সঙ্গে অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে একমত হতে পারি নি, কারণ একই দৃষ্টিকোণ থেকে সবাই সব প্রবন্ধ বিচার করে না। ভিন্নরুচির্হি লোকা।

ইতিপূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে চটুল-চপল কাহিনী (যার বারো আনার ভিত্তি জনশ্রুতি) অবলম্বনে বঙ্কিমের হাসির গল্প, বিচারক বঙ্কিমের ক্ষুরধারবুদ্ধির গল্প ইত্যাদি চমকলাগানো বই বাজারে চালু হয়েছে। কিন্তু সমগ্র বিষয়টিকে যথোচিত গুরুত্বের সঙ্গে অনুধাবনের চেষ্টা সম্ভবত শ্রীবসুই প্রথম করলেন। যথোচিত গুরুত্ব কথাটির তাৎপর্য আছে। আমাদের জাতীয় চরিত্রের প্রধান অভিশাপ এই, মৃত্যুর পর মহৎদের আমরা এমন মহত্তর করে তুলি যে তাঁরা দেবত্বে উন্নীত হন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-চৈতন্যকে মানুষরূপে কল্পনা করতে অনেকের মনে পাপবোধ জাগে। ভক্তের হৃদয়ে তাঁরা খোদ ঈশ্বর। আর যেখানে সেই মহৎ মানুষটি ধর্মপ্রচারক নন, তাঁকে মহামানব শ্রেণীতে উন্নীত করে তাঁর মানবিক সত্তাটিকে অস্বীকার করি। সাহিত্যসেবীর প্রধান পরিচয়, তিনি জীবন-শিল্পী। তাঁকে সার্থক হতে হয় সহৃদয়-হৃদয় সংবাদীরূপে। মহৎ সাহিত্যের যিনি স্রষ্টা তাঁকে মহামানবরূপে চিত্রিত করলে তাঁর প্রতি নির্মম অবিচার করা হয়।

উনিশশো পাঁচ সালের অব্যবহিত পরবর্তী যে সময়টাকে আমরা অগ্নিযুগ বলে চিহ্নিত করেছি সে সময় 'বন্দেমাতরম' মন্ত্রের উদ্গাতা বঙ্কিমচন্দ্রকেও কেউ কেউ রাজনৈতিক কারণে ঋষি আখ্যায় ভূষিত করেছিলেন। সেই আরোপিত দেবমহিমার অত্যুজ্জ্বল জ্যোতির্মণ্ডল ভেদ করে মানুষ বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুভব করার কোন চেষ্টা এতাবৎকাল হয় নি। সমসাময়িক দৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখার এই সুযোগ উপস্থিত করে শ্রীবসু একটি আকাঙ্খা পূরণ করলেন। ঋষি মহিমায় অন্ধ ভক্তিমান

পাঠক যখন নবীনচন্দ্রের বর্ণনা—'সন্ধ্যা হইল। ভৃত্য আসিয়া দুটি মোমবাতির সেজ রাখিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সুরাদেবী অধিষ্ঠিত হইলেন। এবং অক্ষয়বাবু ছাড়া তাহারা তিনজনে তাঁহার সেবা আরম্ভ করিলাম। যখন পাঠ করবে তখন হয় তো স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণায় মূর্চ্ছা যাবে। সুরেশ সমাজপতির বঙ্কিম-প্রসঙ্গ সম্পর্কে সম্পাদক বলেছেন—তাঁর রচনার মধ্যে বঙ্কিমের বিশেষ অন্তরঙ্গ মুহূর্ত ধরা পরে নি। ফলে এমন অনেক জিনিসকে সমাজপতি সুদীর্ঘস্থান দিয়েছেন যার কোন প্রয়োজনই বঙ্কিমজীবনে নেই।

স্বীকার করি, বঙ্কিমজীবনে এর কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু পাঠকমনে, বিশেষত আজকের প্রাণহীন হট্ট-সাহিত্য পাঠকের মনে এর এক গভীর আবেদন আছে। সাহিত্যের প্রতি সাহিত্যিকের একাগ্র নিষ্ঠার এত বড় দলিল বাংলা-সাহিত্যে খুব বেশি আছে কি? আজকের শারদ সাহিত্যের অবস্থা একবার স্মরণ করুন। খ্যাতিমান লেখকের দরজায় উপন্যাস আদায়ের ফিকিরে সম্পাদকরা ঘুরছেন। কেউ লেখক-পত্নীকে উপহার দিচ্ছেন শাড়ী কেউ লেখক-কন্যাকে রিষ্ট-ওয়াচ। আর লেখক দরজায় খিল দিয়ে আহার-নিদ্রা বিসর্জন দিয়ে কলম চালাচ্ছেন। কে কত উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন, তা নিয়ে প্রতিযোগিতা নেই। সাহিত্যের উৎকর্ষ নিয়ে গ্রন্থকার বা সম্পাদক কারও মাথা ব্যথা নেই। সংখ্যায় গরিয়ান হওয়াই তাঁদের লক্ষ্য। লেখকের একমাত্র লক্ষ্য—টাকা। গ্রন্থ কলেবর যত স্ফীত, টাকার অঙ্ক তত। বক্তব্যের শূন্যতাকে ঢাকবার জন্য পাতার পর পাতা লিখে ওজন বৃদ্ধি কর্বার কৌশল আজ তাঁদের অনায়াস লব্ধ। আজ সেজন্য ছোট গল্পের নায়িকার মুখে অর্থহীন প্রলাপ একশো পাতা জুড়ে তাকে উপন্যাসে পরিণত করতে হচ্ছে। এই আদর্শহীন নির্বিবেকী সাহিত্যিকদের সঙ্গে আদর্শনিষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্রের তুলনার জন্য বা তুলনাজনিত সান্ত্বনার জন্যও সমাজপতির লেখাটি অবশ্য পাঠ্য।

"বঙ্কিমবাবু হাসিয়া বলিলেন—আমার লেখা? আমি লিখিলেই কি কাগজ চলিবে? তা চলুক না চলুক, আমি যে তোমার কাগজে কিছু দিতে পারিতেছি না তাহার অন্য কারণ আছে। অন্ততঃ চারিটি প্রবন্ধ না লিখিলে হয় না। তা পারিয়া উঠিতেছি না।"

আমি সাগ্রহে বলিয়া উঠিলাম—'একটাই দিন না?' বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'শুধু তোমাকে একটা দিলে তো চলিবে না। স্বর্ণকুমারী আসেন, আমার নাতিদের কত খেলনা দিয়া গিয়েছেন। আমি সব বুঝি তাঁহার 'ভারতী' আছে। রবি আছে, রবি আসেন; তাঁহার 'সাধনা' আছে তুমি আছ, তোমার 'সাহিত্য' আছে। তারপর আর এক আছেন,—আমার বেহাই দামোদর বাবু।'

আমি বলিলাম—'তাঁহার 'প্রবাহ' তো নাই। তিনি কি আবার...'

'না, তিনি নব্যভারতের জন্য ধরিয়াছেন। সেদিন তাঁহাকে বলিয়াছি—আমার দ্বারা হইয়া উঠিবে না। এখন তিনটি লিখিতে পারিলেও হয়। তা যে কবে পারিয়া উঠিব, তা তো বলিতে পারিনা।' এমনসময় মুরলী আসিয়া খবর দিল—হারাণবাবু আসিয়াছেন। বঙ্কিমবাবু তাঁহাকে লইয়া আসিতে বলিলেন। বঙ্কিমবাবু বলিলেন—'হারানচন্দ্র কেন আসিয়াছেন জান? 'বঙ্গবাসী'র যোগেনবাবু হারানবাবুকে আর একদিন পাঠাইয়াছিলেন। 'জন্মভূমির' জন্য আমার উপন্যাস চান,' পাঁচ শত টাকা দিতে চাহিয়াছে'। এমনসময় হারানবাবুর প্রবেশ। বঙ্কিমবাবু বলিলেন।—

'বসুন হারানবাবু।—আমি পারিয়া উঠিব না' হারানবাবু একটু জিদ করিতে লাগিলেন, টাকার পরিমাণ বাড়িতে পারে, তাহার আভাস দিলেন। কিন্তু বঙ্কিমবাবু বলিলেন—না। হারানবাবু বলিলেন—'যোগেনবাবুকে কি বলিবেন?' বঙ্কিমবাবু বলিলেন—'বলিবেন আমি পারিব না।'

তারপর গড়গড়ায় নলটি লাগাইয়া দু-একটান তামাক টানিয়া বলিলেন, ভক্তি-প্রীতির জন্য যাহা করিতে পারিতেছি না, টাকার জন্য তাহা পারিয়া উঠিব কি?' হারানবাবু বলিলেন—'আমি আর একদিন আসিব।' বঙ্কিমবাবু বলিলেন—'কিন্তু আমাদ্বারা হইয়া উঠিবে না।'

সাহিত্যিকের প্রতি এই নিষ্ঠা একালের কোন সাহিত্যিকের অর্থাৎ সাহিত্য-বণিকের কাছে আশা করা বাতুলতা। তবু আদর্শের প্রয়োজন আছে। সেজন্যই, সর্বকালের বঙ্গসাহিত্যসেবীর কাছে সুরেশ সমাজপতির রচনাটি আলোকবর্তিকা।

ভূমিকায় শ্রীবসু একস্থানে বলেছেন,—রবীন্দ্রনাথের যে স্মৃতিচিত্রগুলি বাংলা সাহিত্যের অক্ষয় সম্পদে পরিণত হয়েছ তার প্রায় সবকটি মেয়েদের লেখা।

এ প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ অবান্তর মনে হয়। বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের যুগ এক নয়। রবীন্দ্রনাথের আমলে স্ত্রীপুরুষের সাম্যবোধ অনেকটা সামাজিক স্বীকৃতি পেয়েছে এবং রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের বাইরে ব্যক্তিগতজীবনে স্ত্রী-স্বাধীনতার ক্ষেত্রকে ব্যাপকতর করেছেন। স্ত্রী-স্বাধীনতার ক্ষেত্র, যা রবীন্দ্রনাথের কালে ব্যপকতালাভ করেছে, তার মূলেও বঙ্কিমসাহিত্যের নারী-চরিত্রগুলির অবদান কম নয়। যতদূর মনে পড়ে, স্বর্ণকুমারী দেবী বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে নিজ স্মৃতি-কথা 'প্রদীপে' লিখেছেন। আশাকরি ভবিষ্যৎ সংস্করণে সম্পাদকমশাই লেখাটি সংকলিত করে নিজ আক্ষেপ দূর করবেন।

'কাছের মানুষ বঙ্কিমচন্দ্রে' দীনবন্ধু বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরঙ্গ চিত্রটি খুবই সুখপাঠ্য। একালের সাহিত্যককূলের সর্বনাশা ঈর্ষাকাতরতার দিনে এই দুই সুহৃদের বন্ধুত্বের কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। দীনবন্ধু গ্রন্থাবলীর প্রথম দিকের কয়েকটি সংস্করণের ভূমিকায় দীনবন্ধুর পুত্র যে ভূমিকা লিখেছিলেন তাতে বঙ্গিমচন্দ্র-দীনবন্ধু অন্তরঙ্গতার কথা আলোচিত হয়েছে। ভবিষ্যৎ সংস্করণে তার থেকে প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করলে পাঠক একটি সামগ্রিক চিত্রদর্শনের আনন্দ অনুভব করবেন।

বিভিন্ন লেখকের রচনায় যেমন বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা প্রত্যক্ষদর্শীরা আলোচনা করেছেন তেমনি বহু আপাত মধুর চটুল কথাও শুনিয়েছেন কেউ কেউ। রচনাগুলি থেকে জানা গেল, বিদ্যাসাগর রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিম, তিনজনেই হোমিওপ্যাথিক প্র্যাকটিস করতেন। রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে লম্বা চুল রেখে কোন নতুনত্বের পরিচয় দেন নি, বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন এবিষয়ে পথপ্রদর্শক।

চণ্ডী লাহিড়ী

আনন্দে
উৎসবে...
প্রাত্যহিক প্রয়োজনে..
সবার মনোরঞ্জনে...
পরিনামরমনীয়
কেশতৈল
কেশরঞ্জন

সমকালীন

ত্রয়োদশ বর্ষ ॥ পৌষ ১৩৭২

আমরা আমাদের জোয়ানদের জন্য একান্তভাবে গর্বিত। তারা আমাদের স্বাধীনতা, সম্মান, সম্পদ ও জীবন রক্ষা করেছে। তারা শক্তিশালী শত্রুকে প্রতিহত ও বিতাড়িত করেছে। এই কাজে অনেকে জীবন বিসর্জন দিয়েছে, আর আহত হয়েছে আরো বেশী। আমাদের জোয়ানরা নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের কর্তব্য পালন করে চলেছে। আসুন, সর্বশক্তি দিয়ে কাজ করে আমরা তাদের শক্তিবৃদ্ধি করি।

এক মহান দেশের
এক মহান জনসমাজ

ঝক্ ঝকে দাঁত
আর সুন্দর হাসি
SADHANA DASAN
SADHANA AUSADHALAYA
আয়ুর্বেদীয় মতে তৈরী আদর্শ দাঁতের মাজন
সাধনা দশন

ত্রয়োদশ বর্ষ ৯ম সংখ্যা

পৌষ তেরশ' বাহাত্তর

সমকালীন ঃ প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

সম্পাদক ঃ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

বাঙলার মৃৎশিল্প

কমলকুমার মজুমদার

লোকশিল্পের পদ্ধতি

সময় অনুপাতে আমাদের প্রত্যেক জিলা ধরিয়া অনুসন্ধান করা সম্ভব হয় নাই। সীমাবদ্ধ সময় মধ্যে যতদুর সাধ্য এই লোকশিল্পের রূপ বা পদ্ধতি বাহির করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বাঙলায় বিভিন্ন প্রকারের কাজ হইয়া থাকে, আমরা ঠিক সেইভাবে স্থানসকল বাছিয়া লইয়া কার্য শুরু করিয়াছিলাম। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল ইহাদের জাতিতত্ব, জীবনধারা, আয় অবস্থা, বাজার ইত্যাদি বিবেচনা করা, দ্বিতীয়ত তাহাদের কর্মপদ্ধতি এবং অন্য কর্মের প্রভাব বিচার করা। ফলে, মৃত্তিকা বিচার, গঙ্গা অঞ্চল, লালমাটি অঞ্চল, চড়ং বিচার, বনক মাটি, কালো মাঝের বনক, লাল হেমাটাইট, গাছরা কষ (vegetable), গোলাপী মাটি, পোয়ান ও জ্বালানী বিচার, কলার বাসনা, ষ্টিমকুকু, কাঠ—জ্বালানী পদ্ধতিতে রঙ ধরানো। রঙ বিচার, অভ্র প্রলেপন, আঙ্গিক বিচার, কৃষ্ণনগর, চৌরীগাছা, পাঁচমুড়া। বিরাট মুর্তিবিচার, নবদ্বীপের পটপূর্ণিমার মেলা, জাজীগ্রামের ৺কালীপূজা। প্রতিমার রূপবিচার, যথা—মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, মস্তেশ্বর বর্ধমান। চিত্রবিচার, তাহার রঙ ও রস বিষয়। ক্রমে রেখা বিচার। কাষ্ঠ পুত্তুলের রূপবিচার, মুখোস বিচার, পেপার মাসিয়ে, বিভিন্ন ধরনের ঘট বিচার এবং ঢোকরা কামারদের কার্যধারা ও তাহার আঙ্গিক বিচার।

মাটি সম্পর্কে আমরা পূর্বে কিছু উল্লেখ করিয়াছি। পলিমাটির কুমার বা মৃৎশিল্পীদের মাটি খুঁজিয়া ফিরিতে হয় না। দোআঁশ বা কিছু বেলে মাটি পাইলেই তাহাদের কাজ চলে, এঁটেল মাটি যাহাতে aluminaর ভাগ বেশী সেই মাটিতে গড়নের কাজ অনেক হইয়া থাকে। এই মাটি

পলিমাটির, লোকে এক গরুর গাড়ীর দাম ৪৲, ৫৲ টাকা দিয়া থাকে, কৃষ্ণনগর অঞ্চলে চূর্ণী নদী হইতে লইয়া আসে, কলিকাতায় কুমাররা নৌকা বা শালতী বোঝাই মাটি খরিদ করে, এই মাটি দক্ষিণ বঙ্গ কখনও কাকুড়গাছি, মেদিনীপুর হইতে আসে। এক নৌকা মাটি ২০৲ টাকা ২৫৲ টাকা দামে বিক্রয় হয়। কাটালিয়ার মাটি আঠা হইলেও ইহার রঙ দক্ষিণের মত কালো নহে। কান্দীর কিছু দূরে যদিও গঙ্গা তবু এইস্থানে মধ্য দিয়া ময়ুরাক্ষী গিয়াছে, নিকটে বোলতলির কুমাররা যে মাটি ব্যবহার করে তাহা কথঞ্চিৎ বেলে। চাকে এই সকল মাটি কিছুটা পাট করিয়া লইলে ভাল খেলে, কোথাও ৵০, ।০ আনা বালু মিশ্রিত করিতে হয়, তাহাতে পোড় খাওয়ান ভাল রূপ হয়। কারণ কিছু অংশ বালু তাত বহু সহিতে পারে এবং উচ্চ তাপে গলিয়া যায়; শুধুমাত্র এঁটেল কম তাপ সহ, উচ্চ তাপে গড়ন বিকৃত হইবার আশঙ্কা থাকে। এবং প্রতিমা বা পুতুলের এই মাটিকে লইয়া বিশেষ পাট করিতে হয়, তুষ, কেহ চূণ ইত্যাদি ইহার সহিত মিশ্রিত করে।

লাল মাটি লইয়া যাহারা কাজ করে তাহাদের সকল সময় মাটির খোঁজ রাখিতে হয়। এক এক ঘর কুমোর বা মৃৎশিল্পী দুই মাইল তিন মাইল অন্তরে যাইতে হয়। পাঁচমুড়ার লোকেদের শিলাই নদীর নিকটে, বিষ্ণুপুরের লোকেদের বিড়য়ায়, বেলেতোড় শালি নদীর নিকটবর্তী স্থানসমূহে এবং সোনামুখীর লোকেদের মুসলো (৪ মাইল পূর্বে) যাইতে হয়। রামপুরহাটে ভাল মাটি মিলে না বলিয়া (?) তাহারা পুতুল করে না (মদন সূত্রধরের কথা মত)। এই মাটির জন্য গুসকরার লোকেদের সোনা লহনা যাইতে হয়। দুবরাজপুরের পণ্ডিতপুরের কুমোরদের রাজনগরের কুমোরদের বহুদূরে যাইতে হয়।

এই মাটিকে লইয়া কুটিতে হয়, থিতাইতে হয়, চালিতে হয়; ভাগ মিশাইতে হয়, বালু তো বটেই, ইহা ব্যতীত অন্য প্রকারের মাটি। তাহার পর তাহা দ্বারা গড়ন ও পুতুল করা চলে। এই মাটি বাঁকুড়ার প্রায় স্থানের কুমোররা ১লা বৈশাখ হইতে ১৩ই জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত সংগ্রহ করে না কারণ তখন জমি এতই কঠিন হইয়া যায় যে মাটি খনন করা একপ্রকার দুঃসাধ্য। সাধারণত জ্যৈষ্ঠ মাসে এই অঞ্চলে বৃষ্টি হয়, তখনই ইহারা পুনর্বার কর্ম আরম্ভ করে।

এই মাটির পর চড়ং-এর কথা আসে। সাধারণত প্রায় প্রত্যেক কুমোরের কাছে ইহার নাম, বনক অর্থাৎ যাহা হইতে বর্ণ সম্ভব হয়। সাধারণভাবে বনক মাটি চন্দ্রকোণা হইতে কলিকাতায় আসে। এই মাটি ।০ এবং ৵০ সেরে বিক্রয় হইয়া থাকে। চন্দ্রকোণা রোড ষ্টেশন হইতে চন্দ্রকোণায় যে রাস্তা গিয়াছে তাহারই মাঝামাঝি প্রায় ৮ মাইলের পর বহেড়াশোল, রাস্তার বামদিকে দেখা যাইবে বনক মাটির খাদ, মালসার ছাঁচে তুলিয়া রৌদ্রে শুকান হইতেছে। এই মাটি ঘাটাল হইয়া কলিকাতায় আসে। কিন্তু এক এক জিলায় এক এক স্থান হইতে ইহা সংগৃহীত হয়। যথা সোনামুখীতে বাঁশখুলে (ধানশিমলা), পাঁচমুড়া, বিষ্ণুপুরে বিড়ায়টানা পুল, দুবরাজপুরে গৌরবাজার, বেলিয়াতোড়ে শালিনদী ইত্যাদি।

গোলাপী মাটি। গোলাপী মাটি একমাত্র তিন জায়গার কাজে আমার নজরে পড়িয়াছে, যথা বিষ্ণুপুরের গোপালগঞ্জের কুমোরদের কাজে, সোনামুখী এবং পাঁচমুড়ার হাঁড়ী কলসীতে, ইহাদের মধ্যে সোনামুখীর গোলাপী সর্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু ইহা পুড়াইবার পর অদ্ভুত চিটা থাকিয়া যায়।

বিষ্ণুপুরের পুতুলে এই রঙও দেখা যায়। ইহার রঙ অত্যন্ত মনমুগ্ধকর। চিটার কারণ সম্ভবত ঠিক তাপে পুড়ান হয় না।

গেরিমাটি। লৌহগত মাটি পুড়িলে কৃষ্ণ কমলা রঙ হইয়া থাকে, ইহাকে উত্তমরূপে বাটিয়া কুটিয়া ছাকিয়া লইতে হয়। ইহা শুধুমাত্র প্রলেপ সস্তা দরের খুরি গেলাস ও পুতুলে দেওয়া হয়।

মাঝের বনক। অশুদ্ধ কেওলিন। ইহার ব্যবহার বাঁকুড়া এবং বীরভূম দুবরাজপুরে হইয়া থাকে। দুবরাজপুরের লোকেরা ইহাকে কোড়লার খনি বলিয়া থাকে, উহা কোড়লা হইতে সংগ্রহ করে। সোনামুখী (বাঁকুড়া) বনশিমলা এবং পাঁচমুড়ার লোকেরা সংগ্রহ করে। ইহা প্রায়ই ঘটে বা বিবাহের হাড়ীতে ব্যবহার করা হয়। পুড়িবার সময় ইহার রঙ পাঁশুটে বর্ণের হইয়া থাকে।

পুরাতন কৃষ্ণবর্ণ পটারী (Black pottery)। কালো মাটি। এক প্রকারের পচা মাটি দক্ষিণে যেখানে পলিমাটির দেশ, সেখানে জলা যায়গায় দুই চারি হাত খনন করিলে, অত্যন্ত কৃষ্ণ বর্ণের হালকা চিটাবিহীন মাটি পাওয়া যায়। সেই মাটিকে পাট করিয়া হাড়ী, হোলায় প্রলেপ দেওয়া হয়। ফলে পুড়িবার পর যে কৃষ্ণবর্ণ রূপ পরিগ্রহ করে তাহার সহিত পোয়ান-ধোয়ার কৃষ্ণবর্ণের তফাৎ বিশেষ পরিলক্ষিত হয়।

গাছড়া। অনেক ক্ষেত্রে গাছড়ার কষ এই সকল বনক বা slipএর সহিত মিশ্রিত হয়। যথা—বেলগুটি খয়ের, কোথাও হরিতকী, কোথাও আম্র বা বাব্লের কষ। ইহা কোথাও লোহার কড়ায়, কোথাও মাটির হাড়ীতে ফুটাইয়া লইয়া কষ বাহির করিয়া বনকের সহিত মিশ্রিত করিতে হয়।

সোনা। একমাত্র দুবরাজপুরে পণ্ডিতপুর খয়রাডিহির কুমোররা এই মাটি রাজনগর হইতে সংগ্রহ করে; পুড়িবার পর ইহা অবিকল সোনার মত রঙ হয়। সোনামুখীর লোকে এই মাটির কথা জানে কখনও কখনও বাশখুলের মাটির সহিত ইহার কণা মিলিয়া থাকে এবং পুড়িবার পর স্বর্ণাভ হইয়া যায়, কিন্তু সোনার মত খাদানের সন্ধান না পাইবার হেতু তাহারা ব্যবহার করিতে পারে না।

সোহাগা। ইহারা সোহাগার Glane জানে কখনও কখনও সোহাগা ব্যবহার করে।

শঙ্খ মুদ্রা। পূর্বে প্রায় পুতুলে শঙ্খমুদ্রা ব্যবহার করা হইত। এখনও কয়েক স্থানে হয়। শঙ্খ মুদ্রা শিশার মতই বিষ দোষ দুষ্ট।

প্রায় প্রত্যেক শিলা যথা কৃষ্ণ বর্ণ বা গোলাপী বর্ণ ইত্যাদির পাটে কুমোরদের বড় কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। খড়ছেঁচা বৃষ্টির জল লইয়া তাহাতে ঐ মৃত্তিকা মিশ্রিত করিয়া, থিতাইয়া তাহার পর প্রলেপ দিতে দেখা যায়। কেহ কেহ ইহার সহিত আটা যথা শিরীষ ইত্যাদি মিশ্রিত করিয়া থাকে।

পোয়ান। সর্বসমেত, সারা বাঙলায় ৩।৪ প্রকারের পোয়ান দেখা যায়। সাধারণত দুই প্রকারের পোয়ান হইয়া থাকে, কুচলে মালের পোয়ান ও বড় পোয়ান। বড় পোয়ান,

গোল, লম্বা, ঝিঁকদার ও বিনা ঝিঁকদার। বিনা ঝিঁকদার পোয়ান কিঞ্চিৎ সাঁওত ভূমি এবং আদিবাসী অঞ্চলে দেখা যায়। ঝিঁকদার লম্বা ও গোল স্থান হিসাবে প্রায় কুমোরের গ্রামে দেখিতে পাওয়া যায়। কুচলে পোয়ান ছোট গোল হইয়া থাকে।

কুচলে পোয়ান মাটি হইতে দুই হাত পরিমাণ উচ্চ হয়, অনেকটা ধোবার ভাটির মত দেখিতে। আগুন দিবার জায়গা আছে, বেশ বড়, কারণ লতাপাতা ইত্যাদি প্রায়ই ঠেলিতে হয়। উপরে মাকড়সার জালের মত ঝিঁক দেওয়া, এক একটি ফুটা ২˝ মত গোল। পোয়ানের কোন ধার নাই। কুচলে অর্থাৎ ছোট মাল উপরে দুই হাত পর্যন্ত সাজান হয়। তাহার পর মাটি বা খড় ইত্যাদি দিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ঘণ্টা পাঁচ-ছয় পর মাল তৈয়ারী হইয়া যায়। ইহার সুবিধা হইল এই যে ইহাতে কম জ্বালানী লাগে।

বিনা ঝিঁকদার। ইহা ক্রমশ ৩।৪˝ ফুট চালু হইয়া যায়। সর্বসমেত মাপ ১০´।৮´; চারি-পাশে উচ্চ প্রাচীর প্রায় জমি হইতে ৩´ ফুট উচ্চ হইয়া থাকে। এক দিকে মাটির খাদ করিয়া বাতাস খেলিবার জায়গা থাকে। মৃন্ময় পাত্র ইত্যাদি সারি সারি সাজাইয়া এবং পাশে পাশে কাঠের গোঁজ দিতে হয় এবং এক সারির উপরে যখন আর এক সার সাজাইতে হয় তখন আবার জ্বালানী সাজাইতে হইবে। ইত্যাকারে প্রায় প্রাচীরের উপরি ভাগ হইতে ৫।৬´ ফুট পর্যন্ত পাত্র সাজাইতে পারা যায় এবং পরে খড় ইত্যাদি দিয়া ঢাকিয়া মাটি দিয়া প্রলেপ দিতে দেখাও যায়। ১০।১২ ঘণ্টায় সকল কিছু তৈয়ারী হইয়া যায়। ইহাতে রঙের অত্যন্ত তারতম্য হয়, হস্কা লাগিয়া সকল রঙই চটিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। এইরূপ পোয়ান আমি ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে ও গোপীবল্লভপুর থানায় দেখিয়াছি। এই জাতীয় পোয়ানে জ্বালানীর অপচয় অত্যন্ত অধিক।

ঝিঁকদার। এইরূপ পোয়ান প্রায় সর্বত্রেই আছে। যেখানে পয়সা দিয়া জ্বালানী খরিদ করিতে হয় অথবা জ্বালানী সংগ্রহ কষ্টসাধ্য এবং যাহারা ভাল মাল তৈয়ারী করিতে চাহে সেখানেই এরূপ পোয়ান দেখা যায়। ইহা কুচলে পোয়ানের একটি বৃহৎ আকার মাত্র এবং ঝিঁকে উপর প্রাচীর তোলা থাকে। লম্বাগুলি ৬।৭´ ফুট এবং গোলগুলি ১০।১২´ ফুট ডাইয়োমিটার হয়। এই ধরনের পোয়ানে ধীরে ধীরে আঁচ বর্দ্ধিত করা যায় তাহাতে যথোপযুক্তভাবে পাত্র সামগ্রী তৈয়ারী হয়।

জ্বালানী। সাধারণত জঙ্গল মহলে কাঠের অভাব নাই, তবে ইদানীং জঙ্গল হইতে বিনা ছাড়ে কাঠ সংগ্রহ করা আইন বিরুদ্ধ হওয়াতে কুমারদের একটু অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছে। চব্বিশ পরগণায় কলার বাসন, লতাপাতা ইত্যাদিতে জ্বালানীর কাজ চলে, কোথাও কোথাও কয়লার চলও আছে। যেখানে জ্বালানী কিছু মহার্ঘ সেখানে প্রায় চারি শত ডিগ্রীতে পোড়ান দিয়া ক্ষান্ত হয়।

উচিত মত পোড়ান পাত্র লোকে বাজাই লয়। যদি এক সুরু লাগে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে ঠিক পুড়িয়াছে। এক এক স্থানে হাড়ী এত সুন্দর বাজে যে তাহার সহযোগে অনেক ভিখারী গান গাহিয়া থাকে। মাটি নয় শত ডিগ্রী পুড়িলে ঝামা হইয়া যায়। অথচ চীনা মাটি বার শত ডিগ্রী হইতে চৌদ্দ শত ডিগ্রীতে শক্ত হয়। এই সূত্রে দেখা যায় যে বাঁকুড়ার 'মাঝের বনক' কিছুদিন পর ঝরিয়া পড়ে।

পোয়ান পদ্ধতি। আমরা সাধারণত, লাল আর কাল পাত্র ইত্যাদি দেখিতে পাই। ইহা কোনরূপ স্লিপ প্রলেপ নহে। ঘুটের ধোয়ায় এইরূপ রঙ হইয়া থাকে। বড় মালের মধ্যে ছোট মাল ও ঘুটে ঠসিয়া মুখ বন্ধ করিয়া দিলে অথবা সর্ব উচ্চ স্থানে রক্ষিত পাত্রের চারি পাশে ঘুঠে দিয়া বন্ধ করিয়া দিলে উক্ত প্রকারের কাল রঙ হয়। আর এক প্রকারের কাল রঙ দেখা যায়, বিষ্ণুপুর সোনামুখী, পাঁচমুড়া, বীরভূমের পণ্ডিতপুর অঞ্চলে হইয়া থাকে। উহা ঘুটের পরিবর্তে Steam Coke ঠাসিয়া দেওয়া হয় বা পোড়ার শেষ Steam Coke ভরিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। ইহার ফলে পুতুলে অদ্ভুত রূপালী জৌলষ হয়। পণ্ডিতপুরের এই পদ্ধতির ফলে দেখিয়াছি কলিকা হরিদ্রাভ শ্বেত রঙ ধারণ করিয়াছে, এই রঙ পূর্বোক্ত রঙ হইতে বেশী স্থায়ী।

ইহারা লবণ জৌলষও করিয়া থাকে। ইহা বহু পুরাতন পদ্ধতি। পোড়া প্রায় শেষ হইয়া আসিলে তখন লবণের ছিটা দিতে হয় তাহাতে সামগ্রীর গায়ে অদ্ভূত জৌলষ লাগে। ইহা এখনও বহু যায়গায় হইয়া থাকে।

পোড়াইবার পর আসে রঙের কথা। বহু যায়গায় শুকনা মাটির (Sun baked) উপর রঙ দেওয়া হয় এবং বহু স্থানে পোড়াইবার পর রঙ দেওয়া হইয়া থাকে। যেগুলি পোড়ানর পরে দেওয়া হয় সেগুলিতে সাধারণত কোন বনক ব্যবহার করা হয় না। রঙ ধরাইবার জন্য বহু প্রকারের আঠা প্রয়োজন, এই আঠার মধ্যে বেল, তেঁতুল, কুচর আঠাই প্রধান। বারলা আঠা, সাবু ও এরারুট এবং খৈর মাঢ়। এই মাঢ় বা আঠা রঙ মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করা হয়। সাবেক রঙ পিউরী, গেরিমাটি, নীল, পিঁপড়ী হরিতাল ইত্যাদি ছিল এবং গর্জন তৈল বার্নিশের মত ব্যবহার করা হইত। ইদানীং বহুরূপ earth colour বিদেশ হইতে আসে তাহাই শিল্পীরা ব্যবহার করে এবং copal বার্নিশ ব্যবহার বহুল প্রচলন হইয়াছে। আঠা বাদে ডিম এবং দুধের ব্যবহার (চব্বিশ পরগণা) হয়। অভ্র লাগানোর ক্ষেত্রে একটি অদ্ভুত আঠার প্রয়োগ করা হয়, কারণ অভ্র গুঁড়া সাধারণ আঠায় পুতুলের গায় ধরে না। ইহার ফলে কুচুর আঠা ব্যবহার করিয়াই অভ্র পুতুলের গায় লাগানো হইয়া থাকে। এইরূপ পুতুল আমরা বহু স্থানে দেখিতে পাই যথা কাঠালিয়া, আসানসোল, জামুরিয়া। এখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন প্রথম কোটিং সাদা খড়ি দিয়া অথবা White ink ও Zinc oxide দিয়াও হইয়া থাকে। অনেক ক্ষেত্রে পুতুলে চালের গুঁড়ার ভূষা দিয়াও অথবা হাঁড়ীর তলার ভূষা দিয়া, বেলের আঠার সহিত মিশ্রিত করিয়া ধুনার সহিত ফুটাইয়া ব্যবহার করা হয়।

অধ্যাপক বেণীমাধব বড়ুয়া

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার অন্তর্ভুক্ত মহামুনি পাহাড়তলী গ্রামে এক বৌদ্ধ পরিবারে বেণীমাধবের জন্ম হয়। বেণীমাধবের পিতার নাম ছিল রাজচন্দ্র তালুকদার। বেণীমাধব তালুকদার পদবী ব্যবহার না করিয়া জাতিসূচক 'বড়ুয়া' উপাধি গ্রহণ করেন। গ্রামের বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া ১৯০২ খৃষ্টাব্দে বেণীমাধব চট্টগ্রাম কলিজিয়েট স্কুলে প্রবিষ্ট হন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি চট্টগ্রাম কলেজ হইতে এফ. এ. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে বেণীমাধব বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ হইতে পালিতে অনার্স সহ বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পালি ভাষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া তিনি এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। অল্পকাল চট্টগ্রামের মহামুনি এংলো পালি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কার্য করার পর বেণীমাধব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আণ্ডার গ্রাজুয়েট শ্রেণীর অস্থায়ী পালি শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকারের একটি বৃত্তি (State Scholarship) লাভ করিয়া বেণীমাধব উচ্চ শিক্ষা লাভার্থে ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া তিনি প্রাচীন ও আধুনিক ইউরোপীয় দর্শন অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধশাস্ত্র বিশারদ অধ্যাপক রীজ ডেভিডস মিসেস রীজ ডেভিডস, ডক্টর ফ্রেড্‌রীথ্‌ উইলিয়ম টমাস ও এল. ডি. বার্নেটের নিকট পালি ভাষাসহ বৌদ্ধশাস্ত্র ও ভারতীয় দর্শন অধ্যয়ন করেন। ইঁহাদের নিকট অধ্যয়ন ও গবেষণা করিয়া ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে বেণীমাধব লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. লিট্‌ উপাধি লাভ করেন। ইতিপূর্বে কোন ভারতীয় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডক্টরেট্‌' লাভ করেন নাই। প্রাক বৌদ্ধ ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে যে গ্রন্থখানি রচনা করিয়া তিনি ডি. লিট্‌ উপাধি করেন তাহা ১৯২১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হয় (১)।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর সার আশুতোষের চেষ্টায় বেণীমাধব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগে পালি ভাষার 'লেক্‌চারার' নিযুক্ত হন। এই সঙ্গে তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি এবং সংস্কৃত বিভাগেও কোন কোন বিষয়ে অধ্যাপনা করিতে হইত। পালি ভাষা ও সাহিত্য এবং বৌদ্ধশাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেও বেণীমাধব যে নিবন্ধ রচনা করিয়া লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট্‌ লাভ করেন তাহার বিষয় ছিল বেদ-সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রগুলির দার্শনিক ভিত্তির পর্যালোচনা। বুদ্ধদেবের উপদিষ্ট ধর্মতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে ভারতে প্রাক্‌-বৌদ্ধ চিন্তা-ধারার অনুসরণ তিনি আবশ্যক মনে করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করিয়া তিনি বৌদ্ধ দর্শন সম্বন্ধে কয়েকটি ভাষণ দেন ও বৌদ্ধ দর্শনের ভূমিকা নামে উহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন (২)। এই গ্রন্থে বেণীমাধব দেখান যে বৌদ্ধরা বেদ উপনিষদের ভিত্তিরই উপর নূতন

দর্শনের সৃষ্টি করিয়াছেন। বৌদ্ধ মতবাদ ভারতীয় চিন্তার ক্রম বিবর্তনের ফল।

ভগবান বুদ্ধের সমসাময়িক কালে আজীবিক নামে একটি ধর্ম সম্প্রদায় ছিল, প্রচলিত বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম গ্রন্থে এই সম্প্রদায় বিশেষভাবে নিন্দিত হইয়াছে। প্রাক্-বৌদ্ধ ও বৌদ্ধ দর্শনের আলোচনা করিয়া বেণীমাধব এই সম্প্রদায় সম্বন্ধেও একটি তথ্য বহুল গ্রন্থ রচনা করেন। বৌদ্ধ অথবা জৈন গ্রন্থের পক্ষপাত দুষ্ট ও সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিপূর্ণ মতামতে প্রভাবিত না হইয়া বেণীমাধব এই সম্প্রদায়ের ধর্মমত বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেন এবং এই নিরপেক্ষ মত প্রকাশ করেন যে গৌতম বুদ্ধ অথবা জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের অভ্যুদয়ের পূর্ব হইতেই আজীবিক সম্প্রদায় প্রবর্তত মস্‌করি গোশাল অহিংসা মন্ত্রের প্রচারক ছিলেন এবং এই সম্প্রদায়ের নৈতিক মতবাদ ভগবান বুদ্ধ ও মহাবীরের উপর কল্যাণকর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। নিন্দিত আজীবিক সম্প্রদায়ের কলঙ্ক-স্খলনে নিষ্ঠাবান বৌদ্ধধর্মী বেণীমাধব যে সততা, সত্যানুসন্ধিৎসা ও প্রকৃত ঐতিহাসিকোচিত নিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন তাহার তুলনা বিরল (৩)।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধশাস্ত্র ও পালিভাষা বিশারদ বেণীমাধব আমন্ত্রিত হইয়া সিংহল গমন করেন। এখানে তিনি সিলোন বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবোধি সোসাইটি, বৌদ্ধ সাহিত্য সভা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত অনেকগুলি তথ্য সমৃদ্ধ ভাষণ দান করেন। ইংরাজীতে প্রদত্ত এই ভাষণমালা Ceylon Lectures নামে প্রকাশিত হয় (৪)। বৌদ্ধধর্মের মূলসূত্রগুলি এই ভাষণগুলিতে বেণীমাধব অভিনব পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, গতানুগতিক চিন্তাধারা এই ব্যাখ্যায় প্রতিফলিত হয় নাই। বুদ্ধ উদ্দিষ্ট 'নির্বাণ' সম্বন্ধে এই গ্রন্থে প্রদত্ত বেণীমাধবের অভিমতটিও সম্পূর্ণ মৌলিক। তত্ত্বজিজ্ঞাসু রূপে বেণীমাধব বৌদ্ধ দর্শনসহ ভারতীয় দর্শনের সাধনা করিতেন ও সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক এবং সংস্কার মুক্ত মন লইয়া তাঁহার মতামতগুলি লিপিবদ্ধ করিতেন, এই জন্য বৌদ্ধ দর্শন, লোকায়ত দর্শন ও প্রাচীন হিন্দু দর্শন সম্বন্ধে তাঁহার চিন্তাধারা সুধিগণের বিশেষ মনোযোগ ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল।

পালি সাহিত্যের ছাত্ররূপে তরুণ বয়সেই প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে বেণীমাধবের কৌতূহল জাগরিত হয়। লণ্ডনে তিনি যাঁহাদের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন তাঁহাদের মধ্যে রিজ্‌ ডেভিডস্‌ দম্পতি, লিয়োনেল ডেভিড্‌ বার্নেট ও ফেড্‌রিখ উইলিয়ম টমাস্‌ প্রভৃতি আচার্যগণ শুধু বৌদ্ধ দর্শন ও সাহিত্যেই পারদর্শী ছিলেন না, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস চর্চাতেও ইঁহাদের সবিশেষ কৃতিত্ব ছিল। ইঁহাদের সংস্পর্শে আসিয়া বেণীমাধবের ইতিহাস চেতনাও বিশেষভাবে জাগ্রত হয়। বৌদ্ধ সাহিত্যে বিশেষত পালি-প্রাকৃতে প্রভূত অধিকার তাঁহার ইতিহাস সাধনার পথও সুগম করিয়া দেয়। ইতিহাস সাধনার পথে অগ্রসর হইয়া তিনি অশোকের রাজত্বকাল হইতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের কাল পর্যন্ত শিলালিপিগুলির সঠিক পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যায় মনোনিবেশ করেন। ডঃ বড়ুয়ার পূর্বে যাঁহারা শিলালিপি চর্চা করিতেন সংস্কৃত বা প্রাকৃত ব্যাকরণের সাহায্যই তাঁহারা বিশেষভাবে গ্রহণ করিতেন। ইঁহাদের ন্যায় শিলালিপির মর্ম গ্রহণে ব্যাকরণের সাহায্যই বেণীমাধব পর্যাপ্ত মনে করেন নাই। বৌদ্ধ সাহিত্যের আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য ও বৌদ্ধ যুগের পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি নূতন ভাবে বহু শিলালিপির সঠিক পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার

এই ব্যাখ্যা বিশেষজ্ঞগণকর্তৃক নির্ভুল রূপে স্বীকৃতি লাভ করে। শিলালিপির পাঠ ও ব্যাখ্যা সম্বন্ধে বেণীমাধব কলিকাতার Indian Historical Quarterly পত্রিকায় ও অন্যান্য পত্রিকাতে বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই বিষয়ে তাঁহার অনেকগুলি পুস্তকও প্রকাশিত হয়। অশোকের শিলালিপি, উদয়গিরি-খণ্ডগিরির ব্রাহ্মী শিলালিপি এবং ভরাহুতের শিলালিপি সম্বন্ধে তাঁহার লিখিত গ্রন্থগুলি তাঁহার বিস্ময়কর মনীষা ও ইতিহাস চেতনার পরিচায়ক (৫—৭)। প্রাচীন ভারতের প্রকৃত ইতিহাস রচনায় বেণীমাধবের এই গ্রন্থগুলি অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

শুধু শিলালিপির পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যা করিয়াই বেণীমাধব তৃপ্তিলাভ করেন নাই। ভরাহুত স্তূপ ও বুদ্ধগয়া সম্বন্ধে তিনি দুইখানি সুবৃহৎ পুস্তক রচনা করেন। এই দুইটি পুস্তকে বহু অজ্ঞাত ঐতিহাসিক তথ্য সন্নিবিষ্ট হয়। ভরাহুত সম্বন্ধীয় গ্রন্থে তিনি ভরাহুতের চিত্রগুলির সহিত পালি জাতকের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া দেন। ইহা দ্বারা এই চিত্রগুলির রসাস্বাদন ও বৌদ্ধ চিত্রকলার ইতিহাস ও বিকাশ অনুধাবনে বিশেষ সাহায্য পাওয়া যায় (৮—৯)। বেণীমাধব রচিত বুদ্ধ গয়া সম্বন্ধীয় গ্রন্থটি বর্মী ও জাপানী ভাষাতেও অনূদিত হইয়াছিল।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের মৃত্যু হইলে বেণীমাধব তাঁহার স্থলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি ভাষার প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে এই পদের বেতন ও মর্যাদা বৃদ্ধি হইলে বেণীমাধব ইহার ফলভোগী হন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত বেণীমাধব একান্ত নিষ্ঠা সহকারে বিশ্ববিদ্যালয়ের পালিভাষা বিভাগটিকে লালন পালন করিয়া ভগবান বুদ্ধের জন্মভূমিতে পালিভাষা চর্চার খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখেন। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে আমন্ত্রণক্রমে সিংহল দেশে অবস্থিতিকালে পালিভাষায় ও বৌদ্ধশাস্ত্রে বেণীমাধবের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তত্রস্থ বৌদ্ধ আচার্যেরা তাঁহাকে "ত্রিপিটকাচার্য" উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে বেণীমাধব "প্রাকৃত ধম্মপদ" (১০) সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। প্রাকৃত ধম্মপদের সঠিক পাঠের সহিত ইহার অনুবাদ ও টিকাও সন্নিবিষ্ট হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি অধ্যাপক শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মিত্র এই সম্পাদন কার্যে বেণীমাধবকে সাহায্য করেন।

বেণীমাধব যে 'প্রাকৃত ধম্মপদ' টিকা সহ সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন উহা বিগত শতাব্দীর শেষ দিকে মধ্য এশিয়ায় আবিষ্কৃত হয়। বুদ্ধের উপদেশাবলী এতকাল যাবৎ পালি ভাষায় লিখিত ধম্মপদের মধ্যেই বিধৃত ও প্রচলিত আছে। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে কয়েকজন ফরাসী পর্যটক মধ্য এশিয়ার খোটান অঞ্চলে প্রাকৃত ভাষায় লিখিত ধম্মপদের একটি খণ্ডিত অংশ আবিষ্কার করিয়া ফ্রান্সে পাঠিয়ে দেন। প্রসিদ্ধ ফরাসী ভারতবিদ্যাবিশারদ সেনার (Senart) গবেষণা দ্বারা প্রমাণ করেন যে পুঁথিটি 'খরোষ্টি' লিপিতে লিখিত, খৃষ্টিয় ৩য় বা ৪র্থ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে ও মধ্য এশিয়ার একাংশে ইহাই ছিল প্রচলিত লিপি। পুস্তকের পাঠোদ্ধার করিয়া সেনার পুস্তকটিকে পালি ধম্মপদের প্রাকৃত সংস্করণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। খণ্ডিত পুস্তকের অপর অংশটুকু মধ্য এশিয়ার রুশ পর্যটকদের সহায়তায় রুশীয়ভারতবিদ্যা বিশারদ সেরজি ওল্ডেনবুর্গের নিকট পৌছায়, তিনিও ইহার পাঠোদ্ধার করেন। ফরাসী পণ্ডিত সেনার অনুরূপ একটি পুঁথির খণ্ডিতাংশ লইয়া গবেষণায় রত আছেন জানিয়া তিনি তাঁহার দ্বারা প্রাপ্ত অংশটুকুও গবেষণার সুবিধার্থে সেনারকে

প্রেরণ করেন। সেনার পুঁথির দুইখণ্ড মিলাইয়া বুঝিতে পারেন যে উহা মূল একটি পাণ্ডুলিপিরই দুইটি অংশ। সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি পাইয়া সেনার উহা সম্পাদন করিয়া পারির এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করেন। ইহার পর জার্মান পণ্ডিত লুডর্স, ফ্রাঙ্কে এবং বুল্লার ফরাসী পণ্ডিত জুল ব্লথ ও নরওয়ের ডাঃ ষ্টেন কোনো এই পুস্তকের লিপি ও ভাষা সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া বহু মূল্যবান তথ্য প্রচার করেন। জুল ব্লথ ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা দ্বারা প্রমাণ করেন যে এই পুস্তকে সম্রাট কনিষ্কের সমসাময়িক প্রচলিত 'প্রাকৃত' ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। বর্ণমালা বিশারদ বুল্লার মন্তব্য করেন যে লিপির গতি দৃষ্টে মনে হয় যে পুঁথিটি ভারতে বসিয়াই খৃষ্টিয় প্রথম শতাব্দীতে লিখিত হইয়া পরে খোটানে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের দ্বারা নীত হইয়াছিল। ষ্টেন কোনো বুল্লারের এই মত গ্রহণ করেন নাই। তিনি এই সিদ্ধান্ত করেন যে খোটানে বসিয়াই এই পুঁথি খোটানে প্রচলিত প্রাকৃত ভাষাতেই লিখিত হয়।

মাতৃভাষা বাঙ্গালাতেও বেণীমাধবের বিষয়ে অনুরাগ ছিল। বহু বাঙ্গলা সাময়িক পত্রে তাঁহার রচিত প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইত। একসময়ে তিনি "বিশ্ববাণী" ও বৌদ্ধধর্মসম্বন্ধীয় "জগজ্জ্যোতি" মাসিক পত্র সম্পাদনার কাজে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বাঙ্গলা ভাষাতে তিনি কয়েকটি উৎকৃষ্ট পুস্তকও রচনা করেন, ইহাদের মধ্যে একটি পালি মজ্‌ঝিমনিকায়ের অনুবাদ (১১—১৩)। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত বেণীমাধব রচিত 'বাঙ্গলা সাহিত্যে শতবর্ষের বৌদ্ধ অবদান' প্রবন্ধটির নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৫২ বর্ষ)।

যৌবনকালেই বেণীমাধব সুপণ্ডিত রূপে বিখ্যাত হন। নিখিল ভারত প্রাচ্যবিদ্যাসম্মেলনের তিরুপতি অধিবেশনে তিনি 'প্রাকৃত ভাষা' শাখার সভাপতির পদে বৃত হন। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে আন্নামালাই নগরে অনুষ্ঠিত All India History Congress এর প্রাচীন ভারতীয় শাখার সভাপতি-রূপে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে তিনি একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন (Trends in Ancient Indian History)।

কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে বেণীমাধবকে সোসাইটির সম্মানিত 'ফেলো' নির্বাচিত করেন। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে ১৫ ফেব্রুয়ারী সোসাইটির বাৎসরিক সভায় বৌদ্ধযুগের ইতিহাস সম্বন্ধে অতি উল্লেখযোগ্য সাধনার জন্য সোসাইটি বেণীমাধবকে "বিমলাচরণ" লাহা স্বর্ণ পদক দ্বারা সম্মানিত করেন।

১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মার্চ কলিকাতা নগরে মাত্র ৫৮ বৎসর বয়সে বেণীমাধবের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি দেশে ও বিদেশে বৌদ্ধশাস্ত্র সাহিত্যের ক্ষেত্রে দিক্‌পাল রূপে চিহ্নিত ছিলেন। বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী বেণীমাধবের চরিত্রে ভগবান বুদ্ধের স্বভাবগত মৈত্রী ও করুণা বিশেষভাবে পরিদৃষ্ট হইত। সরল হৃদয়, নিরভিমানতা ও অমায়িকতার জন্য তিনি পরিচিত ব্যক্তি মাত্রেরই প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেন। বিদ্যাচর্চার প্রয়োজনে ছাত্র ও গবেষকদের নিকট তাঁহার দ্বার সর্বদাই অবারিত থাকিত। ছাত্রদিগকে তিনি আপন পরিবারভুক্ত বলিয়া মনে করিতেন এবং সকল প্রকার আপদ বিপদে তিনি তাহাদিগকে রক্ষা কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

এই শতাব্দীর ত্রিংশ দশকে কলিকাতার Indian Research Institute নামে একটি বিদ্বৎ-

সংস্থা গঠিত হয়। বেণীমাধব এই সংস্থার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। এই সংস্থা হইতে Indian Culture (Vol 1—15), নামে একটি উচ্চাঙ্গের গবেষণামূলক সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইত, বেণীমাধব ইহার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। বেণীমাধবের মৃত্যুর পর এই পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা (July 1948—49, Vol XV) বেণীমাধবের স্মৃত্যর্থে প্রকাশিত হয়। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বেণীমাধবের-সুহৃদ ডাঃ বিমলাচরণ লাহা ভারতবিদ্যা সংক্রান্ত বহু তথ্য বহু নিবন্ধ সহ উহা সম্পাদিত করিয়া প্রকাশ করেন। "Indian culture" পত্রিকা অতঃপর আর প্রকাশিত হয় নাই। "জগজ্জ্যোতি" নামক বৌদ্ধধর্মসংক্রান্ত বাঙ্গলা মাসিক পত্রের একটি সংখ্যাও বেণীমাধব স্মরণ সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হয় (৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা বৈশাখ ১৩৫৯)। মৃত্যুকালে বেণীমাধব স্ত্রী, তিনপুত্র ও আট কন্যা রাখিয়া যান। বেণীমাধবের লিখিত শেষ রচনা প্রগতির দর্শন (Philosophy of Progress) তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রগণ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে (১৪)।

সম্পূর্ণ গ্রন্থ ব্যতীত বেণীমাধবের যে পঞ্চাশটিরও অধিক গবেষণামূলক রচনা বিভিন্ন স্থানে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মধ্যে মহাযান বৌদ্ধধর্ম, ভারতীয় লিপি ও তান্ত্রিক চিহ্নাবলী, মহাস্থান গড়ের (বগুড়া) ব্রাহ্মী লিপি, হাতীগুম্ফা লিপি প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য (১৫—১৮)।

(১) A history of Pre-Buddhistic India Philosophy, Calcutta—1921.

(২) A prologomena to the history of Buddhist Philosophy, Calcutta, 1918.

(৩) The Ajivakas—, Calcutta—1920. (৪) Ceylon lectures, Calcutta, 1945.

(৫) Old Brahmi Inscriptions in the Udaigiri and Kandagiri Caves—1926.

(৬) Barhut Inscriptions (A critical edn. with trans. & notes) Calcutta, 1936.

(৭) Inscriptions of Asoka—Part I (a critical edn. of the texts 1943 ;

(৮) Inscription of Asoka—(with trans and notes)—1945 ; (গ) Asoka and his edicts (3 Vols)—1946. (৮) Gaya and Buddhagaya (2 Vols) Calcutta 1931.

(৯) Barhut (Illustrated monograph in 3 Vols) Calcutta—1934-37.

(১০) Prakrit Dhammapada (A critical edn. with trans and notes)—1921.

(১১) বৌদ্ধ কোষ—(বৌদ্ধ গ্রন্থ কোষ) ১ম খণ্ড, কলিকাতা—১৯৩৬

(১২) মধ্যম নিকায় (সুত্তপিটক), কলিকাতা, ১৯৪০

(১৩) বৌদ্ধপরিণয় পদ্ধতি—কলিকাতা, ১৯২১

(১৪) Philosophy of Pogress, Calcutta, 1948

(১৫) Mahayana in Making (Sri Asutosh Silver Jubilee Vol, Calcutta.)

(১৬) Indian Script and Tautric Code (B. C. Law. Comm. Vol Calcutta).

(১৭) Old Brahmi Inscriptions of Mahathan garh—Bogra Dist. (Indian Historical Quarterly, Vol—X)

(১৮) Hatigupha Inscriptions of kharbela (I. H. Q, Vol XV).

পঞ্চভূত ও রবীন্দ্রনাথ

অলোক রায়

ম'তেন ছিলেন সেরা রোমান্টিক। নিজেকে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন তিনি, অভিজ্ঞতা আর অনুভবের প্রকাশ। নব প্রয়াস সন্দেহ নেই, এবং তারই ফলে সৃষ্টি হলো 'এসে' বা রোমান্টিক প্রবন্ধ সাহিত্য। ধ্রুপদী যুগের চিন্তা নায়কেরাও এরই সন্ধান করেছিলেন, কিন্তু সমাজমনের দাসখৎ অস্বীকার করা সহজ ছিল না সেদিন। প্লেটোর তত্ত্বকথা খুব সাদামাঠা ভাষায় রচিত হয় নি, সন্দেহ হয় আসলে এই দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞও ছিলেন কবি, কিন্তু প্রকাশ করতে পারেন নি সেই অন্তরঙ্গ পরিচয়কে।(১) প্লেটোর 'ডায়লগ'গুলি সংলাপের মধ্য দিয়ে রচিত বলেই তার মধ্যে বুদ্ধির ঝলক, আত্মপ্রতিকৃতি দর্শনের প্রয়াস ও সরস রচনারীতি অনিবার্য হয়েছে। রোমান্টিক যুগের লেখকেরা প্লেটোনিক ভাবাদর্শকে গ্রহণ করেছিলেন প্রত্যক্ষভাবে; কিন্তু হয়ত নিজেদের অজ্ঞাতেই তারা প্লেটোর রচনারীতির দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিল, বিশেষতঃ রোমান্টিক যুগের 'এসে' বা 'প্রবন্ধে'র বিশিষ্ট প্রকরণের ক্ষেত্রে। তবে আধুনিক যুগের ব্যক্তির স্বরাট্‌ প্রাধান্য শুধু ভাবনার ক্ষেত্রে নয়; রচনারীতিকেও বিশিষ্টতা দিয়েছে। ব্যক্তির প্রকাশ তথা আত্মার প্রকাশ রোমান্টিক কাব্যান্দোলনের প্রধান পরিচয়। ল্যাম, হ্যাজলিট্‌, লে হাণ্ট ইংরেজি সাহিত্যে নব্যরীতির প্রবন্ধ লিখলেন। বাংলা-সাহিত্যে 'কমলাকান্তের দপ্তর' তার প্রাথমিক রূপ, 'পঞ্চভূতে' তার পরিণত নিদর্শন।

কখনো কখনো 'নিজের সঙ্গেই কথা কইতে হয়।...ডায়রী নয়; অথচ যা মনে আসছে, সব তাই নয়; নিজের ব্যক্তিগত বিষয় নয়; অথচ খানিকটা তো বটেই। যা মনে আসছে সেগুলি অনুপস্থিত, বুদ্ধিমান সুশিক্ষিত, আগ্রহশীল বন্ধুর সঙ্গে নীরব কথাবার্তা। মার্টিন বুচার বলেন সব-কিছুই Thou and I এর কথোপকথন, সংলাপ। Thou (এ) ক্ষেত্রে ডিমন নয়; জীবন দেবতা নয়; জীনিয়স নয়—ভূত নয়; প্রেত নয়; ভগবান্‌ নয়; এমন একটি পুরুষ সে......যার আগ্রহ আমার আগ্রহের সমগোত্র; হয় তো পুরুষটি, আমার বিশেষ বন্ধুদের একটা আলকেমিক মিশ্রণ। তাদের সঙ্গে মনে মনে কথাবার্তা কইছি; লিখছি; কারণ সেই মিশ্রিত Thou এর উপাদান সামনে নেই।(২) 'পঞ্চভূতে'র রচনা—সংলাপধর্মী; প্রেরণা—ডায়রী লেখা-মন; উদ্দেশ্য—আত্মপ্রকাশ; অবশ্যই নিজেকে খুঁজে পাওয়া সহজ নয় খুবই শক্ত। ডায়রীতে প্রকাশ পায় কোন্‌ 'আমি'? সম্ভবতঃ একটি নির্মিত কৃত্রিম, 'আমি'। কিন্তু সেদিন থেকে সাহিত্য মাত্রেই কৃত্রিম, লৌকিক ভাবকে নানা প্রক্রিয়া-পদ্ধতির মধ্য দিয়ে সাহিত্যের জগতে উত্তীর্ণ করতে হয়। তবে কেউ যদি বলেন 'আমি নিজেকে টুকরো টুকরো করিয়া ভাঙ্গিতে চাহি না। ভিতরে একটা লোক প্রতিদিন সংসারের ওপর নানা চিন্তা নানা কাজ গাঁথিয়া এক অনাবিষ্কৃত নিয়মে একটি জীবন গড়িয়া চলিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ডায়ারি লিখিয়া তাহাকে ভাঙিয়া আর একটি লোক গড়িয়া আর একটি দ্বিতীয় জীবন খাড়া করা হয়।'—তবে সে কথাও সত্য। কিন্তু এই দ্বিতীয় জীবন বা দ্বিতীয় 'আমি'কে প্রকাশ করার ইচ্ছা থেকেই ডায়রি সাহিত্যের জন্ম। প্লেটোর ডায়ালগের সঙ্গে রোমান্টিক যুগের ডায়রির

এইখানেই আসল পার্থক্য। ল্যাণ্ডর কিংবা এমিয়েল অথবা আধুনিককালের মার্সেল কিংবা আঁদ্রে জীদের জার্নালগুলি আত্মবিশ্লেষণের চেষ্টায় পরিপূর্ণ। হয় তো এর সঙ্গে একমাত্র লিওনার্দাভিঞ্চির নোটবুক তুলনীয়।

'পঞ্চভূত' গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি 'সাধনা' পত্রিকায় ১২৯৯ এর মাঘ থেকে ১৩০২ এর ভাদ্র পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়। পত্রিকায় প্রথমে 'পঞ্চভূতের-ডায়রি' এবং পরে 'পঞ্চভৌতিক ডায়রি' শিরোনামায় প্রবন্ধগুলি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত হয়েছিল। গ্রন্থকারে প্রকাশের সময় (১৩০৪ | ১৮৯৭) নাম হলো 'পঞ্চভূত'। রচনাগুলির প্রাথমিক প্রেরণা ডায়রি লেখার ইচ্ছা; গ্রন্থের 'পরিচয়' প্রবন্ধে এগুলকে 'ডায়রি' বলেই অভিহিত করা হয়েছে। তবে ইংরেজী প্রতিশব্দ হিসেবে ডায়রির পরিবর্তে জার্নাল শব্দটিই এখানে বেশী প্রযোজ্য। ডায়রি একান্তভাবেই আত্মবিশ্লেষণী; জার্নাল চতুষ্পার্শ্বস্থ ব্যক্তিবর্গ বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে আত্মপরিচয় উদ্ঘাটনকারী। অন্যদিকে আত্মজীবনীর মত ডায়রি বা জার্নাল ঘটনাসূত্রে বা ভাবসূত্রে সর্বদা সংযুক্ত নয়; সাহিত্যরূপ হিসাবে ডায়রি বা জার্নাল অনেক পরিমাণে শিথিল সংবন্ধ। 'What they loose in artistic shape and coherence, they gain in frankness and immediacy.' (৩)

রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'পঞ্চভূতে'র উৎস হিসেবে 'পারিবারিক স্মৃতি (১৮৮৮—১৮৮৯) নামে একটি খাতার উল্লেখ করেছেন। 'একই বিষয়ে বহুজনের বহু মত হইতে পারে—পক্ষে ও বিপক্ষে; বিপরীত মত আপত্তি নেই, অদ্ভুত ঘটনাও লিপিবদ্ধ হয়। রবীন্দ্রনাথ এই লেখকদের মধ্যে প্রধান……। নানা কথা নানাভাবে মনে জাগে, এই খাতায় লিখিয়া যান আপন মনে; কেহ বা তার মধ্যে খুঁত ধরে, টিপ্পনী করে—তাহাতে বাদ-প্রতিবাদ হয়, লেখার ঔজ্জ্বল্য বাড়ে। রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আছেন জ্যেষ্ঠদের মধ্যে; তাছাড়া আছেন আশুতোষ চৌধুরী, তাঁর ভ্রাতা যোগেশচন্দ্র, কবি অক্ষয় চৌধুরী; সিভিলিয়ান লোকেন পালিত, ছোটদের মধ্যে আছেন সুরেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ।—এই পাণ্ডুলিপিখানি ভাল করিয়া পড়িলে বেশ বুঝা যায় যে উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথ 'পঞ্চভূত' নামে যে গ্রন্থ রচনা করেন তাহা মুখ্যতঃ এই পাণ্ডুলিপির উপাদান ও আইডিয়া হইতে গৃহীত। (৪)

এখানে বলা প্রয়োজন রূপগত এমন কি ভাবগত সাদৃশ্য সত্ত্বেও 'পারিবারিক স্মৃতি' ও 'পঞ্চভূত' ঠিক একই শ্রেণীর রচনা নয়। 'পঞ্চভূতে'র পাঁচ 'আমি' আসলে একই ব্যক্তির 'দ্বিতীয় জীবন'-এর পাঁচটি দিক। একই ব্যক্তির আত্মপরিচয়কে টুকরো টুকরো করে ভেঙে সহস্র ভাগ করব। এবং 'পঞ্চভূত' তাই আমাদের পারিপার্শ্বিক পাঁচটি ব্যক্তিই বটে, আবার অন্তরজাগতিক পাঁচটি স্বত্বাও বটে। টমসনের ভাষায় 'They represent five different points of view five different types of personality'. 'পঞ্চভূতের' ডায়রিতে পাঁচটি মত একত্রিত হয়েছে, যাদের মধ্যে চরম বৈপরীত্য অথবা সামান্য বৈসাদৃশ্য দুইই আছে। সুতরাং 'পঞ্চভূতে'র রচনা-রীতিতে জার্নাল-ধর্মিতা এবং এবং ডায়রি-ধর্মিতা উভয়ই আবিষ্কার করা যায়।

'বিচিত্র প্রবন্ধে'র সূচনায় রবীন্দ্রনাথ যে-কথা বলেছেন, 'পঞ্চভূত' গ্রন্থখানি সম্বন্ধেও তা সত্য; 'অর্থাৎ ইহার যদি কোন মূল্য থাকে তাহা বিষয়বস্তু গৌরবে নয়; রচনা রস সম্ভোগে—।' কিন্তু

'পঞ্চভূতে'র রচনাগুলির কোন বিষয়বস্তু গৌরব নেই, এমন কথা অনেকেই মানতে পারবেন না। সমাজ ও ব্যক্তি ; নিসর্গ ও ব্যক্তি, সৌন্দর্য ও ব্যক্তি এবং আত্মপ্রকাশ ও ব্যক্তি—এই চতুর্বিধ ধারায় রচনাগুলিকে শ্রেণীভুক্ত করা যাক। 'পঞ্চভূতে'র মধ্যে রবীন্দ্রনাথ অনেক গভীর কথা ; উপলব্ধি ও জিজ্ঞাসাকে প্রকাশ করেছেন। এই পর্বের গদ্য-পদ্যে যে চিন্তা নানাভাবে দেখা দিয়েছে, 'পঞ্চভূতে'র রচনাগুলিতেও তা অনুপস্থিত নয়।

তবে প্রকাশ বৈশিষ্ট্যে 'পঞ্চভূত' অনন্য। প্রথম চৌধুরী যাকে বলতেন 'বাজে-কথার ফুলের চাষ,' 'পঞ্চভূতে'র রচনাগুলি অনেকটা সেই শ্রেণীর। 'কথা যতই ছোট হোক ; খাঁটি হওয়া চাই—তার ওপর চকচকে হলে তো কথাই নেই। যে ভাব হাজার হাতে ফিরেছে ; যার চেহারা বলে জিনিষটা লুপ্ত প্রায় হয়েছে, অতি পরিচিত বলে যা আর কারও নজরে পড়ে না ; সে ভাব এ খেয়াল-খাতায় স্থান পাবে না। নিতান্ত পুরোনো চিন্তা পুরোনো ভাবের প্রকাশের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে—আর্টিকেল লেখা—।' (৫) 'পঞ্চভূতে'র রচনাগুলি এদিক থেকে খেয়ালী লেখা সন্দেহ নেই।

ডায়রি বা জার্নালও খেয়ালী লেখা। মনের আলো এই লেখাকে উজ্জ্বল করে তোলে। জিজ্ঞাসা এবং উপলব্ধি দুইই প্রকাশ পায় অন্তর্জগতের উদ্ঘাটনে। লেখক বিশেষে পার্থক্য আছে সন্দেহ নেই। 'ছিন্নপত্রে' এমিয়েলের জার্নালের কথা রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন। এমিয়েলের রচনার স্নিগ্ধতা, প্রজ্ঞা দৃষ্টি এবং অধ্যাত্মবোধ রবীন্দ্রনাথের রচনাতেও স্বভাবধর্মেই প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে কৌতুকবোধ, কৌতূহল এবং সংশয় উদ্‌বেজিত করেছে যে মনকে, তারও প্রতিবিম্ব ধরা পড়েছে পঞ্চভূতের ডায়রির স্বচ্ছ দর্পণে। 'ছিন্নপত্র' এবং 'পথে ও পথে প্রান্তরে'র সম্মিলন 'পঞ্চভূতে'। অবশ্যই রবীন্দ্রনাথকে খুঁজে বার করা খুব সহজ নয় পঞ্চভূতের কথোপকথন সভায় ; যেমন আঁদ্রে জীদকে ডায়রিতে আবিষ্কার করতে অনেক অধ্যবসায়ের প্রয়োজন।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই জাতীয় রচনার বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বলেছেন 'ব্যাপারটা আসলে এই, নানা চিন্তা, নানা মনোভাব, নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ; নানা ভয়-ভাবনার টানাপোড়োনে ব্যক্তিত্বের নক্সা ; সেই ব্যক্তিত্বের নক্সা নিতান্তই বিশেষ ; অন্য কারণে নয় ; মাত্র পারমুটেশন—কম্বিনেশনের জন্য। একটি নক্সা অন্য নক্সার জুড়ি কখনই হতে পারে না। এই নক্সাই হল ষ্টাইল : style is the man।' (৬) 'পঞ্চভূত' গ্রন্থে তাই যুক্তি অপেক্ষা উপমার আধিক্য ; তথ্য অপেক্ষা অনুভবের স্বীকৃতি ; সিদ্ধান্ত অপেক্ষা জিজ্ঞাসার প্রকাশ সর্বক্ষেত্রেই বিধিবদ্ধতার বিরুদ্ধতা করেছে। 'মন এমন একপ্রকার দাহ্য পদার্থ যে, ঠিক যেখানে প্রশ্ন স্ফুলিঙ্গ পড়িল সেখানে কিছু না হইয়া হয়তো দশহাত দূরে আর এক জায়গায় দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।...আমাদের কথোপকথন সভা সেই উৎকট সভা, সেখানে যদি একটা অসংলগ্ন কথা অনাহুত আসিয়া উপস্থিত হয় তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে 'আসুন মশায় বসুন' বলিয়া আহ্বান করিয়া হাস্যমুখে তাহার পরিচয় না লইলে উৎসবের উদারতা দূর হয়।' ফলে পঞ্চভূতের কথোপকথন সভায় সামান্য বস্তুকে অবলম্বন করেই বিচিত্রতর ক্ষেত্রে বক্তাদের সজীব এবং সচল মন চলাফেরা করে। উৎসবের নহবত, কিংবা বাড়ির ক্রিয়াকর্মে, সামান্য একটু অসতর্ক হাসি কিংবা কোন কাব্যপাঠের প্রতিক্রিয়া, পুণ্যাহের সানাই কিংবা ডায়রির রচনা-

পর্যালোচনাকে অবলম্বন করে অনেক গভীর তত্ত্ব এবং অগভীর বিতর্ক গড়ে উঠেছে। কথোপকথন সভার সভ্যরা জানেন—'আমরা পঞ্চভৌতিক সভার পাঁচভূতে মিলিয়া এপর্যন্ত একটা কানাকড়ি দামের সিদ্ধান্তই সংগ্রহ করতে পারিয়াছি কিনা সন্দেহ; কিন্তু তবু যতবার আমাদের সভা বসিয়াছে আমরা শূন্যহস্তে ফিরিয়া আসিলেও আমাদের সমস্ত মনের মধ্যে যে সবেগে রক্তসঞ্চালন হইয়াছে, এবং সেজন্য আনন্দ এবং আরোগ্য লাভ করিয়াছি তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।' প্রসঙ্গত 'নরনারী' কিংবা 'কৌতুকহাস্য' রচনার কথা মনে পড়বে; সেখানে বিভিন্ন মত উপস্থাপিত হয়েছে মাত্র, কিন্তু তাদের মধ্যে কোন ধারাবাহিকতা বা নিশ্চয়তা কোথাও নেই। জার্নাল শ্রেণীর রচনার পক্ষে এই-ই স্বাভাবিক।

পঞ্চভূতের কথোপকথন সভা সর্বাংশে জীবন্ত হতে পারে নি, তারও কারণ রচনার এই জার্নাল ধর্মিতা। ডায়রিতে অনেক পরিমাণে ব্যক্তিগত চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে ব্যক্তিগত ঐহিক পরিচয়ও নিহিত থাকে, 'পঞ্চভূতে' শুধু মত আছে, মানুষ নেই। 'পঞ্চভূত'কে যদি কাল্পনিক কথোপকথন বলি, যেমন ল্যাণ্ডরের রচনা; তাহলেও কথোপকথন সভার চরিত্রগুলি কেবলমাত্র তত্ত্বমুখ্য রূপে উপস্থিত হওয়ায়, তারা মানব-পরিচয় হারিয়ে ভাবমূর্তি লাভ করেছে। এ সম্বন্ধেও লেখক সচেতন ছিলেন,—'তোমার ডায়রির এই লোকগুলো কি মানুষ না যথার্থই ভূত। ইহারা দেখিতেছি কেবল বড়ো বড়ো ভালো ভালো কথাই বলে, কিন্তু ইহাদের আকার আয়তন কোথায় গেল।' বলাবাহুল্য জার্নালে ব্যক্তির এই 'আকার আয়তন' অপেক্ষা চিন্তার সারাংশটুকুই প্রকাশিত হয়। ডায়রির সঙ্গে জার্নালের, পত্রসাহিত্যের সঙ্গে প্রবন্ধ সাহিত্যের এইখানেই প্রধান পার্থক্য।

'পঞ্চভূত'-এর রচনাগুলিকে প্রথমে ডায়রি নামে অভিহিত করা হলেও, পরে সম্ভবত অপ্রয়োজনীয় বিবেচনায় 'ডায়রি' শব্দটি বাদ দেওয়া হয়েছিল। আর একটি তথ্য এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়; 'পঞ্চভূতে'র রচনাগুলি একদা বিচিত্র প্রবন্ধ' নামের সঙ্কলনের অন্তর্ভুক্ত ছিল, এবং 'পঞ্চভূত' গ্রন্থের অন্ততঃ দুটি রচনা 'পল্লীগ্রামে' ও 'মন' কথোপকথন সভার শ্রুতিলিখন নয়; স্বগতোক্তিমূলক রচনা। আসলে 'পঞ্চভূত' সহজেই রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্র-প্রবন্ধে'র অন্তর্গত হতে পারে; অন্যদিকে 'আষাঢ়' কিংবা 'মাভৈ' প্রবন্ধ অনায়াসেই 'পঞ্চভূতে' গৃহীত হতে পারে।

তাহলে 'পঞ্চভূত গ্রন্থে' 'ডায়রি' লক্ষণ নিতান্তই বহিরঙ্গ; অন্তরঙ্গ পরিচয়ে 'পঞ্চভূত' ব্যক্তিগত প্রবন্ধের নিদর্শন। মঁতেন বা রোমান্টিক নব্য প্রবন্ধ ধারার অনুসরণেই রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত প্রবন্ধের নানারূপ-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করলেন; 'বিচিত্র প্রবন্ধে' এবং 'পঞ্চভূত' উভয়েরই রস-রূপ একক বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। এর মধ্যে 'ডায়রি'র মত ব্যক্তিহৃদয়ের উদ্‌ঘাটন আছে, কিন্তু আত্মসর্বস্বতার পরিবর্তে আছে রস সাহিত্যের সর্বজনীনতা। 'ডায়রি' বিশেষ দিনের বিশেষ ক্ষণের বিশেষ জনের মনের ইতিহাস; 'পঞ্চভূত' নির্বিশেষের পরিচায়ক। 'পঞ্চভূত' তাই ডায়েরির রূপবন্ধ সত্ত্বেও 'ডায়রির' লক্ষণাক্রান্ত নয়।

আসলে রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই ডায়রি লেখা অসম্ভব ছিল। রবীন্দ্রনাথের একান্ত ব্যক্তিগত পত্রও বিশেষ উপলক্ষকে অবলম্বন করে সুরু হয়ে নির্বিশেষ ভাবোপলব্ধিতে শেষ হয়। বিশেষের ভঙ্গী

নির্বিশেষের রস—এরই সমাহারে রবীন্দ্রসাহিত্য গড়ে উঠেছে। 'পঞ্চভূত' রবীন্দ্রব্যক্তিত্বের প্রক্ষেপে বিশেষ ও নির্বিশেষের এই সমন্বয় রূপ লাভ করেছে।

১। 'কিংবদন্তী অনুসারে প্লেটো প্রথম যৌবনে কবি ছিলেন। গুরু সক্রেটিসের সঙ্গে সাক্ষাতের পর সে সব কবিতা নাকি তিনি পুড়িয়ে ফেলেন। গ্রীক কাব্যসঙ্কলনে তাঁর লেখা বলে প্রচলিত কিছু কিছু টুকরো কবিতাও পাওয়া যায়। এ কিংবদন্তী সত্য কি-না, এসব কবিতা যথার্থই প্লেটোর রচনা কিনা ; তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। এ বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত যাই হোক না কেন, তাঁর নানা দার্শনিক রচনা হতে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় যে, এই ঘোর কাব্যবিরোধী দার্শনিক প্রভৃতির দিক থেকে অনেকখানিই কবিদের সমধর্মী ছিলেন।'
—শিবনারায়ণ রায় : সাহিত্যচিন্তা (১৯৬০)। পৃঃ—১৭—১৮।

২। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : মনে এলো (১৯৬৩), পৃঃ—৩১।

৩। A. S. Noad : Autobiography (Dictionary of World Literary terms. London 1955) পৃঃ—৩২

৪। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্রজীবনী (প্রথম খণ্ড) (১৩৬৭) পৃঃ—২৪২।

৫। প্রথম চৌধুরী : খেয়ালখাতা (বীরবলের হালখাতা, ১৩৬৭) পৃঃ—১৪।

৬। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : মনে এলো। পৃ—১৬২-১৬।

প্রেমের নিদানতত্ত্ব

দেবেন্দ্রনাথ মিত্র

সূর্য যে শক্তির প্রভাবে পৃথিবীকে স্বীয় পথ হইতে বিক্ষিপ্ত হইতে দেয় না, পৃথিবী যে শক্তির প্রভাবে চন্দ্রকে কেন্দ্রচ্যুত হইতে দেয় না, অণু যে শক্তির প্রভাবে পরমাণুকে টানিয়া রাখে তাহার নাম আকর্ষণশক্তি। বস্তুতঃ যদি এই আকর্ষণশক্তি সংসারে না থাকিত তাহা হইলে পৃথিবী একটি বিশৃঙ্খল বস্তু (chaos) হইত এবং তাহার ফলে জগতের যাবতীয় জিনিস বিলুপ্ত হইয়া যাইত। সংসারে প্রতি মুহূর্তে তরিৎ-তরঙ্গের যে বিশেষ সংঘর্ষ ঘটিতেছে তাহা আকর্ষণ শক্তির প্রভাবে। গ্রহ যদি উপগ্রহকে টানে, শরীর যদি শরীরকে টানে তাহা হইলে মনও মনকে না টানিবে কেন? মনের প্রতি মনের এই টানের নাম প্রেম এবং প্রেম আকর্ষণের রূপান্তর মাত্র।

মনের প্রতি মনের যে টান তাহাকে যদি আমরা প্রেম বলি তাহা হইলেও দেখা যায় তাহারও প্রকারভেদ আছে। যে আকর্ষণে মানব অজ্ঞাতসারে মহাপুরুষগণের নিকট আকৃষ্ট হয় তাহার নাম ভক্তি। দম্পতির হৃদয়নির্যাসভূত যে আকর্ষণ আনন্দগ্রন্থিরূপে সন্তানকে বাঁধিয়া রাখে তাহার নাম স্নেহ। অনেক সময়ে এই 'প্রেম' শব্দটিতে এইরূপ বিভিন্ন অর্থ আরোপ করা হয়, কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে আমরা প্রেমকে শুধু দম্পতীর প্রেম ছাড়া অন্য কিছুই বলিব না। অধ্যাত্ম ও পার্থিব ভেদে দাম্পত্য প্রেমেরও দুইটি মূর্তি আছে, কিন্তু আমরা এখানে কেবল তাহার পার্থিব দিকটি আলোচনা করিব মাত্র।

মানবমাত্রেই একটা সৌন্দর্য-লালসা লইয়া জন্মগ্রহণ করে। ভগবান অনন্তসুন্দর বলিয়াই বোধ হয় মানবের এরূপ অদম্য এবং অপরিসীম সৌন্দর্যলালসা। মানব তাঁহার জীবনের যাহা কিছু ইচ্ছাকৃত পরিবর্তন ঘটাইতেছে অথবা প্রিয়জনকে যাহা কিছু উপদেশ দিতেছে তাহা মঙ্গলের উদ্দেশ্যে এবং মঙ্গল সৌন্দর্যের নামান্তর মাত্র। মহামতি গেটে এমনকি সৌন্দর্যকে মঙ্গলের অপেক্ষা উচ্চতর স্থান দিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন The Beautiful is higher than the good; the Beautiful includes in it the good অর্থাৎ সৌন্দর্য মঙ্গল অপেক্ষা উচ্চতর, সৌন্দর্যের মধ্যে মঙ্গল নিহিত আছে। বস্তুতঃ পৃথিবীর আত্মা যদি সৌন্দর্যময় না হইত তাহা হইলে তাহা কিছুতেই ফুল প্রজাপতি অথবা ইন্দ্রধনুর ন্যায় জিনিস উৎপাদন করিতে সমর্থ হইত না।

'সুন্দর' শব্দটির ব্যাখ্যা ও প্রকারভেদ আছে। আমাদের দেশে প্রধানতঃ ইহা রূপ অর্থাৎ শরীরের বর্ণ বুঝায়। কিন্তু বর্ণ আকর্ষণে চিরন্তন সামগ্রী বলিয়া বোধ হয় না। ইহা ভালোবাসার মন্দিরের তোরণস্বরূপ। যদি কেহ ইহা দ্বারা প্রেমের মন্দিরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া শুধু দ্বারদেশে হোঁচট খাইয়া পড়িয়া যায় তাহা হইলে পরিণামে ইহার আকর্ষণশক্তি একেবারেই থাকে না। ইহা নিজে একটি চিরন্তন মোহের কারণ নহে কিন্তু ভালোবাসার অঙ্গীভূত কারণ। ফলে দেখা যায় অধিকাংশ লোক এইরূপ বর্ণের সৌন্দর্যের জন্য পাগল। আমাদের দেশে উপন্যাস নাটক প্রভৃতির নায়ক-নায়িকাকে এইজন্য দুধে আলতায় মিশ্রিত রঙে চিত্রিত করা হয়। বৈষ্ণব কবিগণ শ্রীরাধিকার

শরীরের বর্ণ বর্ণনা করিতে কখনও ক্লান্তি বোধ করেন নাই। আমাদের দেশের বিদ্যালয়ের কতক কতক ছাত্র সামান্য সামান্য কথায় ইংরাজী বলিতে না পারিলেও Exquisite beauty, Matchless beauty, Paragon of beauty প্রভৃতি কথাগুলি বানানসুদ্ধ মুখস্ত করিয়া রাখে এবং ঐ কথাগুলি ভাবিবার সময় তাহাদের মনে বোধ করি বর্ণের সৌন্দর্যটি বলবৎ হইয়া উঠে।

সৌন্দর্য অথবা আকর্ষণের দ্বিতীয় বিষয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৌষ্ঠব। পুরুষের আকৃতি 'ব্যূঢ়রস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশু র্মহাভুজঃ' এবং স্ত্রীলোকের আকৃতি 'তন্বী শ্যামা শিখরি দশনা পক্কবিম্বাধরৌষ্ঠী মধ্যে ক্ষামা চকিতহারিণী প্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ' ইত্যাদিপ্রকার কালিদাস বর্ণনা করিয়াছেন। এইরূপে কবিগণ চক্ষু নাসিকা. হস্তপদ প্রভৃতি লইয়া পদ্মপলাশ, বংশী, সর্প প্রভৃতির সহিত তুলনা করিয়াছেন। সর্বাঙ্গসুন্দর মানব দুর্লভ বলিয়াই হউক অথবা শরীরের কোনও বিশেষ অঙ্গ অন্যান্য অঙ্গ নির্বিশেষে প্রণয়ীর চিত্তাকর্ষক বলিয়াই হউক, দেখা যায় একটি বিশেষ অঙ্গের অথবা একাধিক অঙ্গের সৌষ্ঠব সমবায়ও আকর্ষণের সামগ্রী।

আকর্ষণের যতপ্রকার বস্তু আছে তাহার মধ্যে চক্ষুর আকৃতি ও ভাব প্রধানতম। আমরা জানি মুখই কথা বলে কিন্তু চক্ষুও কথা বলে। লজ্জা প্রথমত চক্ষুতে উৎপন্ন হয় এবং লজ্জা হইতে প্রেমের সঞ্চার হয়। এইজন্য শেকস্‌পীয়র বলিয়াছেন—

Tell me where is fancy bred

... ...

It is engendered in the eyes

By gazing fed

প্রেমাতুর বধূর ভাবাকুল লোচনের ভাষা ও অভিব্যক্তি মানবমাত্রেই উপলব্ধি করিয়াছেন। এইরূপ ভাবময় চক্ষুর সম্মুখে অন্যান্য সৌন্দর্য ব্যর্থ হইয়া যায়। এই জন্য রবীন্দ্রনাথ একটি কালো মেয়েকে দেখিয়া বলিয়াছেন—

কালো? তা' সে যতই কালো হোক্
দেখেছি তা'র কালো হরিণ-চোখ।

রূপ ও গঠন ব্যতীত সৌন্দর্যের আরও একটি বিষয় আছে তাহা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্চালন। বিজ্ঞ ইংরাজ প্রাবন্ধিক বেকন সৌন্দর্য সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া একটি রচনায় বলিয়াছেন 'In beauty that of favour is more than that of colour, and that of decent and gracious motion more than that of favour"। স্ত্রীলোকের ধীর মন্থর গতি একটি সৌন্দর্যের লক্ষণ, এই জন্য কালিদাস লিখিয়াছেন 'শ্রোণীভারাদলসগমনা' এবং বিদ্যাপতি 'গতি গজরাজক ভানে।' যদিও একজন উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিক প্রেমিকার প্রত্যেক অঙ্গসঞ্চালনের মধ্যে একটা মধুরত্ব দেখিতে পান, তথাপি ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে চলনচালনেও একটা মধুরত্ব থাকে।

ভগবান সৌন্দর্যময় বলিয়া লোকে সৌন্দর্য দ্বারা আকৃষ্ট হয়, কিন্তু ভগবান গুণময় তাই গুণও আকর্ষণের একটি এবং একটি প্রধানতম বিষয়। রবার্ট-ব্রাউনিং ব্যারেট ব্রাউনিং-এর চেহারা না দেখিয়া তাঁহার রচিত কবিতামাত্র পাঠ করিয়া তাহাকে ভালবাসিয়াছিলেন এরূপ ঘটনাও অসাধারণ

নহে। গুণও যদি সৌন্দর্যের কারণ না হইত তাহা হইলে বাহ্যসৌন্দর্যরহিত গুণসম্পন্ন নরনারীগণ চিরকাল অবিবাহিত থাকিয়া যাইত। এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে কোনও বিপদ হইতে উদ্ধার করিলে শেষোক্ত ব্যক্তি স্বভাবতঃই প্রথমটির উপর আকৃষ্ট হয় এবং তাহারা বিপরীত জাতি অর্থাৎ স্ত্রী ও পুরুষ হইলে অবস্থাবিশেষে বিবাহবন্ধন কৃতজ্ঞতার চূড়ান্ত প্রতিদান হইয়া দাঁড়ায়। রূপ ও গুণ ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি ভাল তাহা নির্ধারণ করা আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয় অথবা আমরা তাহার উত্তর দিতে পারি না। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে গুণ যদি বাঞ্ছনীয় হয়, রূপের মোহিনীশক্তি অধিক।

অনেক স্ত্রীলোক এবং কোনও কোনও জাতির প্রায় সমস্ত স্ত্রীলোকই পুরুষের শারীরিক শক্তিতে মুগ্ধ হয় এবং না হওয়াও বিস্ময়ের বিষয়। শক্তি পুরুষের গৌরবের বস্তু এবং শক্তিহীন হইয়া সংসারে বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়স্কর। সার্কাসে একজন বীর পুরুষের কার্যকলাপ দেখিয়া শত শত দর্শক পুরুষও যদি মুগ্ধ হইতে পারে তবে ভাবপ্রবণ স্ত্রীজাতি যে তাহাকে ভালবাসিতে চাহিবে তাহা আর বিচিত্র কী? ওথেলো এবং ডেসডিমনার রূপমাত্র তুলনা করিয়া আমরা অবাক হইয়া যাই কিরূপে তাহাদের মধ্যে ভালোবাসার সঞ্চার হইল কিন্তু পরক্ষণেই আমরা ওথেলোর অসীম শক্তির পরিচয় পাইয়া আমরা আরও অবাক হইয়া যাই কিরূপে ভালোবাসার সঞ্চার না হয়। এমনকি ওথেলোর বিচারের সময় বিচারকও বলিয়া উঠিলেন— 'such a tale would win my daughter too.' বলহীন ব্যক্তি সংসারে কিরূপে জয়লাভ করিবে?

অসামান্য শক্তিসম্পন্ন সরলতার আধার ওথেলো বুঝিতে পারিয়াছিল অকপটভাবে বর্ণিত তাহার বিপদসঙ্কুল জীবনের মর্মস্পর্শী কাহিনী শুনিয়া ডেসডিমনা আকৃষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু পরিশেষে ওথেলো ইহাও বুঝিতে পারিয়াছিল যে তাহার মধ্যে বিদগ্ধজনোচিত রহস্যপূর্ণ মধুরালাপের একেবারে অভাব, কারণ সে নিজেই একস্থানে বলিতেছে—

"Happy, for I am black
And have not those soft parts of conversation
That Chamberers have........."

একজন ইংরাজ গ্রন্থকার ইংরাজ উপন্যাসের ইতিহাস লিখিতে গিয়া গ্রন্থের প্রারম্ভেই লিখিতেছেন "All the world loves a story as it does a lover।" আমরা এই বাক্যটির উপমাটির পরিবর্তন করিয়া একটি কার্যকারণ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে ইচ্ছা করি। আমরা বলিতে চাই পৃথিবী গল্প ভালবাসে বলিয়াই প্রেমিককে ভালবাসে। বস্তুত প্রিয়জনের পরস্পর আলাপ একপ্রকার গল্প, যদিও নবদম্পতীর আলাপের অধিকাংশ স্থলে কোনও অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অতএব শুধু গল্প কেন, যে কোনও ভাব গভীরভাবে মনকে আন্দোলিত করে তাহা পরিশেষে প্রণয়ের সহযোগী হইয়া উঠে। তাই ইংরাজ কবি কোল্‌রিজ বলিতেছেন—

All thoughts, all passions, all delights
Whatever stirs this mortal frame

Are all but ministers of Love
And feed his sacred flame.

কোল্‌রিজ এইরূপে একটি করুণ গল্প বলিয়া তাঁহার প্রণয়িণীকে লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার সহিত আরও একটি জিনিস মিশ্রিত ছিল তাহা সঙ্গীত। সঙ্গীত যে পৃথিবীর মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ জিনিস তাহাতে আর সন্দেহ কী? সঙ্গীত দ্বারা যদি ভগবানকে লাভ করা যায় তবে প্রেমিককে লাভ করা যাইবে না কেন? সেক্সপীয়র তাঁহার একখানি নাটকের প্রারম্ভেই লিখিয়াছেন "If music be the food of love, play on!" সঙ্গীতের মোহিনীশক্তি এরূপ যে প্রেমিকের আকৃতি না দেখিয়া তাহার শুধু গান শুনিয়াই প্রাণ দিতে পারা যায়। গান না শুনিলে বোধ হয় অন্য কারণে তাহার উপর ভালবাসা জন্মিত কি না সন্দেহ। শ্যামের বংশীধ্বনি শুনিয়া রাধা কিরূপ ব্যাকুল হইতেন এবং তাঁহার বংশীবাদককে দেখিবার বাসনা কিরূপ বলবতী হইত এই ভাব গ্রহণে যতগুলি বাংলা ও হিন্দী গান রচিত হইয়াছে শুধু সেইগুলির যদি সমষ্টি করা যায় তাহা হইলে বোধ হয় মহাভারতের মত একখানা প্রকাণ্ড পুস্তক হইয়া পড়ে। সাধারণের বিদিত বিষয় বলিয়া বহুল দৃষ্টান্ত না দিয়া আমরা দুই-একটি গানাংশ উদ্ধৃত করিতে পারি। 'এখনও তারে চোখে দেখিনি, শুধু বাঁশী শুনেছি, মনপ্রাণ যা ছিল তা দিয়ে ফেলেছি;' 'যমুনা পুলিনে কালা বাঁশী বাজালে, কেমনে গৃহেতে র'ব জঞ্জাল বাধালে; 'যাই গো এই বাজায় বাঁশী প্রাণ কেমন করে;' আকাশে পতিয়া কান, শুনেছি তোমারি গান, তোমারে সঁপেছি প্রাণ' ইত্যাদি।

সঙ্গীত বলিতে গেলে যে কেবল নৃত্য গীত ও বাদ্য বুঝায় তাহা নহে। ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি বিবেক প্রভৃতিতেও ইহা প্রকাশ পায়। সঙ্গীতের বিষয় ধ্যান করিতে করিতে আচার, ব্যবহার, চিন্তা, কর্ম সমস্তই সঙ্গীতময় হইয়া উঠে। সঙ্গীতের গভীরত্ব সৃষ্টিতত্ত্বের গভীরত্ব অপেক্ষা কোনও অংশে ন্যূন নয়। এইজন্য কারলাইল লিখিয়াছেন—

"Musical : how much lies in that! A musical thought is spoken by a mind that has penetrated into the in most heart of coherence the thing; the inward harmony of which is its soul. The meaning of song goes deep. Who is there that, in logical words, can express the effect music has on us? A kind of unfathomable speech which leads us to the edge of the Infinite and lets us for moments gaze into that."

সম্মোহনের এইরূপ প্রকারভেদ দেখিয়া ইউরোপের কোনও কোনও জাতি এগুলি কৃত্রিম উপায়ে সাধনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। বাল্যকাল হইতে লোকদিগকে দর্পণের সম্মুখে কথা বলিতে অভ্যাস করানো হয় কারণ তাহাতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ইঙ্গিতগুলি মধুর হইতেছে কিনা জানা যায়। স্ত্রীলোকগণকে চড়া সুরে কথা বলিতে ও গান গাহিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। এরূপ কৃত্রিমতার মূল্য আমাদের দেশে যত কমই হউক, পাশ্চাত্য দেশে অত্যন্ত অধিক। সেখানকার লোকগণের মধ্যে প্রেমবিষয়ে এইরূপ কৃত্রিমতার প্রতিযোগিতা চলে এবং যিনি ইহাতে জয়ী হন তিনি প্রেমলাভ করিতে সমর্থ হন। এই কৃত্রিমতাগুলি ক্রমশঃ অভ্যাস করিতে করিতে কতকটা স্বাভাবিক হইয়াও

পড়ে এবং যতক্ষণ উহা বজায় থাকে ততক্ষণ মধুর লাগে বটে কিন্তু ধরা পড়িলেই তাহা হেয় হইয়া দাঁড়ায়। ইহার সহিত ক্রমশঃ চাটুকারিতা এবং বৃথাড়ম্বরপ্রিয়তা আসিয়া যোগদান করে। পাশ্চাত্য দেশে কৃত্রিমতা ও বৃথা আড়ম্বর সম্মোহনের প্রধান লক্ষণ কারণ তাহা না হইলে কবি বায়রণ কখনও Women like moths are caught by glare এইরূপ একটি কথা লিখিতে সাহস করিতেন না। কিন্তু আমাদের দেশের লোকগণ স্বাভাবিক সৌন্দর্যের উপাসক। তাঁহারা যুবতীর ইচ্ছাকৃত বঙ্কিম কটাক্ষ অপেক্ষা স্বভাবসুন্দর ঋজু দৃষ্টির অধিক আদর করেন। তা'ই আমরা ভট্টিকাব্য পড়িতে পড়িতে 'আহার্য শোভা রহিতৈরমায়ৈঃ' এইরূপ একটি কথা পাই অথবা মেঘদূত পড়িতে পড়িতে 'ত্বয্যায়ত্তং কৃষিফলামিতি ভ্রূবিলাসানভিজ্ঞৈঃ প্রীতিস্নিগ্ধৈর্জনপদবধূঃ লোচনৈঃ পীয়মানঃ' এরূপ একটি বাক্যাংশ পাই।

আমাদের দেশে কৃত্রিমতার দ্বারা একেবারেই যে কোনও ফল হয় না একথা বলা যাইবে কি করিয়া? এরূপ ঘটনা দেখা গিয়াছে যে একজন পুরুষ তাঁহার রূপসী স্ত্রীর স্বাভাবিক অব্যক্ত প্রেম ত্যাগ করিয়া কুৎসিত বারাঙ্গনার কৃত্রিম ব্যক্ত প্রেমে আকৃষ্ট হন। তাঁহার স্বভাবসুন্দরী স্ত্রীর অপরাধ হয়ত এই যে সে ইচ্ছাকৃত 'বচনক চাতুরী লহুলহু হাস' প্রভৃতির দ্বারা স্বামীর বক্ষে শেল হানিতে পারে নাই।

আমরা এপর্যন্ত প্রেমের নানাবিধ গৌণ কারণ নির্দেশ করিয়া যাইতেছি এবং কেহ বাধা না দিলে বয়স, অর্থ, বংশমর্যাদা প্রভৃতি দ্বাদশটি নিদান নির্দেশ করিয়া যাইব। কিন্তু ব্যাপারটা যত সহজ বোধ হইতেছে ততটা সহজ নয়। বিভিন্ন মানবের রুচি বিভিন্ন রকমের এবং একজন যাহাকে কুৎসিত বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে অপর একজনের পক্ষে সে পরম সুন্দর। আরও দেখা যায় একজন আরএকজনকে যে কারণে কুৎসিত বলিতেছে অপর একজন তাহাকে সেই কারণেই সুন্দর বলিতেছে। এক শিল্পী একটি চিত্র আঁকিয়া তাহার দোষগুণ বিচারের জন্য সর্বসমক্ষে ধরিলেন। দেখা গেল একজন ব্যক্তি চিত্রটির যে যে স্থান সুন্দর বলিয়া নির্দেশ করিলেন অপর এক ব্যক্তি ঠিক সেই সেই স্থানগুলি অসুন্দর বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। সৌন্দর্য সম্বন্ধে ইহা এক বিষম প্রহেলিকা।

অতএব দেখা যাইতেছে যে প্রেমের কোনও মুখ্য কারণ নির্দেশ করা যায় না এবং যাঁহারা প্রত্যেক জিনিসের কারণ না জানিলে সন্তুষ্ট হন না তাঁহাদের জন্য বলিতে হয় প্রেমই প্রেমের কারণ। সৌন্দর্যটা প্রেমিকের উপহার মাত্র। আমি একজনকে ভালবাসি কিন্তু কেন ভালবাসি জানি না। সে কি—রূপ? তাহার অপেক্ষা অধিক রূপসী আছে তাহাকে ভালবাসি না কেন? তবে কি গঠন? তাহাও নহে কারণ অষ্টাবক্র মুনিও হয়ত তাহার অপেক্ষা দেখিতে সুশ্রী। তবে কি যৌবন? তাহাও নহে, দৃষ্টান্ত মহম্মদ, শেক্‌সপীয়র, জন্‌সন্। তবে বোধ হয় প্রেম। কিন্তু উহা কী? কোথা হইতে আসিল? প্রেমিক কবি ভবভূতিও ইহার কারণ নির্দেশ করিতে পারেন নাই।

নাট্যচিন্তার পালা বদল

বাংলার নাট্যশালায় নবজীবনের জোয়ার এসেছে বলে যাঁরা সর্বদাই সন্তোষ প্রকাশ করেন, তারাও প্রতিদিনই মহান নাটক চাক্ষুষ করার জন্য সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। সাধারণ দর্শককে 'ন্যাজিক' দিয়ে (শব্দটা এক নাট্যরসিক বন্ধুর সৃষ্টি: তার মতে বর্তমানের নাটক অধিকাংশই নাটক ও ম্যাজিকের দো-আঁসলা অপসৃষ্টি।) ভোলানো যায়। কিন্তু নাট্যরসিকদের ক্ষেত্রে যে কেবল ঊষর বন্ধ্যাত্ব জোটে, সেটা বোধহয় তাঁদের চোখের দোষ;

পেশাদারী নাট্যশালার কাছে হতাশ হয়ে রসিকজনে তাই অর্ধপেশাদারী তথা সৌখীনদের দরবারে এগুলো দেবার প্রচেষ্টাতেই ব্যাপৃত ছিলেন এতকাল কিন্তু মনে হচ্ছে সে আসরের থেকেও তাঁদের নির্বাসন দেবার ব্যবস্থাটা পাকা হয়ে উঠছে। কেন উঠছে সেটা নিয়েই কিছুটা আলোচনা করতে চেষ্টা করছি।

প্রথমে নাটক বস্তুটার কি গুণ সাধারণতঃ রসিকজনকে আকৃষ্ট করে তা বোধ হয় আর একবার বলে নেওয়া ভাল। সাধারণভাবে নাটকীয়তা বা নাট্যরস বলেই ব্যাপারটা চুকিয়ে দেওয়া হয়—অনেকটা পারফিডিয়াস অ্যালবিয়নের 'ইটস নট ক্রিকেট' বলার মত। সন্ধান জানলে সাধু ব্যাপারটা বোঝে, নয়ত সম্রাটের পরণে কিছু না থাকলেও তার ফুলকারির প্রশংসা করতেই হয়, না হলে সর্বজনসমক্ষে বোকা বনে যেতে হবে। আর বোকা বনতে অনীহাই আমাদের অনেক বস্তাপচা মালও হজম করিয়ে দেয়।

ওকথা যাক। (আমাদের মত নয় নাটকের মূলতত্ত্বের মোদ্দা কথাটা নাট্যাচার্য শিশিরকুমার তথা তাঁর আড্ডায় আলোচিত হয়ে যেভাবে বলা হয়েছিল সেই ভাবেই জানাই।) নাটকের প্রধান কথা তার চারিত্রিক দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব দুই ভিন্ন পথগামী চরিত্রের মধ্যে হতে পারে কিংবা বিরূপ ভাগ্যের সঙ্গে হতে পারে কিংবা সম্পূর্ণ ব্যক্তিমানসের প্রবণতার সঙ্গে তার বিবেক বা বিচার বুদ্ধির হতে পারে।

আজকের দিনের নাটকে প্রথমোক্ত রীতির প্রকাশ কদাচিতই ঘটে কারণ তা নাকি অতি সরলীকরণের দোষদুষ্ট। মানুষ যে পুরোপুরী ভাল নয় পুরোপুরী খারাপও নয় অর্থাৎ দেবতাও নয় দানবও নয় দোষগুণে মিলিয়ে মানুষ এ তথ্যের সঙ্গে মেলে না বলে দুই বিভিন্ন চরিত্রের দুই মেরুগামী প্রবৃত্তির সংঘর্ষ তাই এড়িয়ে যাওয়াই রীতি হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

ফলে বিরূপ ভাগ্য বা প্রকৃতির অথবা ভিন্নমুখী সমাজ বা মানুষের সঙ্গে দ্বন্দ্ব ও তাকে বাঁধাপথে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টার ওপর কিছুটা জোর দেওয়া হচ্ছে। গণনাট্য বা নবনাট্যের ঝোঁকটা অনেকটাই এদিকের এই ঝোঁকের দরুণই বহুরূপীর মত নাট্য সম্প্রদায় রাজা ওয়েদিপাউস বা

রাজার মত নাটক মঞ্চস্থ করার কথা ভাবেন, এটা বুঝতে কষ্ট হয় না।

এঁদের মধ্যে আর একদল আছেন যাঁরা অতটা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কোন কিছু বলার পক্ষপাতি নন। এঁদের মতে বক্তব্যটা স্পষ্ট এবং জোরালো হতে হবে এবং সেই জন্য নাটক যদি না থাকে তাতেও আপত্তি নেই। সংবাদকে খাঁটি সাহিত্য বিবেচনা করার মত এধারণা অযৌক্তিক জেনেও আপত্তি করে কোন লাভ নেই। এ কথা বলাও অবান্তর যে, প্রতিটি নাটকেরই কিছু বলার থাকে, তবে সে বক্তব্য দেখার চোখ যুগে যুগে ভিন্নতর হতে পারে, হয়ও।

মধুসূদনের প্রহসন দু'টির কথাই ধরুন না। রচনাকালে এ দুটি লক্ষ্য ছিল সমকালীন সমাজ ও তার অংগীভূত কোন কোন মানুষ। চিত্রগুলি এমনই জীবন্ত তথা বাস্তব হয়েছিল যে, মুখোসের আড়ালের আসল মানুষদের অনেকেই চিনে ফেলেছিল। ফলে এই সব মানুষরা নিজেদের সম্মান হানিতে ক্ষিপ্ত হয়ে নেপথ্য চাপে প্রহসন দু'টির অভিনয় বন্ধ করে।

আজকে সে ইতিহাস অবশ্য মূল্যহীন হয়ে গেছে কিন্তু তবু নাটকের মূল্য হানি ঘটে নি বরং ব্যষ্টির দ্যোতক গোষ্ঠির প্রতিভাত হওয়ায় তা চিরন্তন হয়ে দাঁড়িয়েছে। লিটল থিয়েটার তো বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ'তে শ্রেণী সংগ্রামের মালমশলাও পেয়েছে।

এহেন দৃষ্টান্ত সামনে থাকা সত্ত্বেও বক্তব্যমূলক নাটকের মধ্যে তাৎখানিকতাই একমাত্র উপজীব্য করার রেওয়াজ আজো ছাড়তে পারছেন না নাট্যকাররা। অবশ্য সমকালকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে যে নাট্য রচনা করা হয় তাও চিরন্তন হবে না একথা অনস্বীকার্য কিন্তু সমকালের মধ্যে চিরকালের বীজ যদি না থাকেত ভবিষ্যতের কাছে সে কি মূল্য পাবে? বাংলা নাট্যশালার রাজপথের দু'ধারে এমন বিস্মৃত প্রায় নাট্যকারের চিহ্ন খুঁজলে অনেক পাওয়া যাবে।

তবে ভবিষ্যত কিছু দিক বা না দিক বর্তমান অন্ততঃ কিছু পাচ্ছে এঁদের কাছ থেকে কিন্তু আর কিছু নাটক বর্তমানে দেখা যাচ্ছে (এদের হারও ক্রমবর্ধমান) যাদের সেক্সপীয়র ভাষায় বলতে হয়, ফুল অব সাউণ্ড এণ্ড ফিউরি সিগনিফাইং নাথিং। কোন কিছু 'সিগনিফাই' করার ইচ্ছাও যে এসবের আছে তা মনে হয় না। এগুলির বিদেশজ নাম 'ড্রামা অব দি আবসার্ড,' বাংলায় বলা হচ্ছে অ নাটক।

নাট্যকারদের বলার কিছু নেই বা থাকলেও তা বহুস্তর আবরণমণ্ডিত। অথচ মজার ব্যাপার এই যে, মানবমনের গোপনতম চিন্তাটিকেও এঁরা সম্পূর্ণ নিরাবরণ করে দেখতে চান, চেষ্টাও করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে, এঁদের রচনা একটা বিশেষ ভাবেরই দ্যোতক। তাই নাট্যকারের মনোভাব জানা না থাকলে নাটককে বোঝাও কষ্টকর হয়ে পড়ে।

এধরণের নাটক এদেশের মাটির উপযোগী একথা বলা হয়ে থাকে কিন্তু নাট্যকাররা এ মত বিরুদ্ধবাদীদের ক্ষোভের প্রকাশ বলে উড়িয়ে দিতে চান। চাইলেও ব্যাপারটা অত সহজ নয়। আজ পর্যন্ত কোন নাট্যকারও ঐ ভাবে ভাবিত নাট্যরসিক তাঁর বক্তব্য সর্বজনবোধ্য স্পষ্ট ভাষায় উপস্থাপিত করেন নি। স্বেচ্ছায় হোক বা রীতি প্রভাবিত হয়েই হোক যেমন তাঁদের নাট্যসংলাপে তেমনি তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপনে একটা ধূসর কুয়াসা সর্বদাই দেখা যায়? তাই আমাদের মত 'নন-ইউ'রা অর্থ বুঝতে না পেরে বিভ্রান্ত হই, ক্ষুব্ধ হই শেষ পর্যন্ত এ ধরণের নাটক এড়িয়ে চলতে চাই।

এমন ঘটনা ঘটার প্রধান কারণ আমাদের দেশে এই ধরনের প্রচেষ্টাকে গ্রহণ করবার মত দর্শক সৃষ্টি করা হয় নি ফলে এ অবিমিশ্র পশ্চিমী অনুকরণ অসফল হবে এ তত্ত্ব সুরুর আগেই জানা বলা চলে। তবু এ প্রচেষ্টা চলছে কারণ পরানুকরণ ছেড়ে সম্পূর্ণ নিজস্ব কিছু করাটা এঁদের বোধ হয় অসম্ভব মনে হয়।

পশ্চিমী দেশে এ ধরনের নাটকের সাফল্য একদিনে গড়ে ওঠে নি। আয়োনেস্কোর মত শক্তিমান নাট্যকারকেও নতুন আংগিকে দর্শককে অভ্যস্ত করতে দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা করতে হয়েছে। অথচ ওদেশের শিল্পে-সাহিত্যে-সংগীতে এ ধরনের নাটককে স্বীকার করবার পরিপ্রেক্ষিত তিল তিল করে গড়ে তোলা হয়েছিল। চিত্রকর্মে ধ্রুপদী রীতি ত্যাগ করে মনোচ্ছায়াবাদ প্রমুখ নতুন রীতির কাজ আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গেই এ ধরনের পরিপ্রেক্ষিত রচনা সুরু হয়েছিল। তারপর নানা রীতির টানা-পোড়েন একটি পূর্ণাংগ পশ্চাৎ-পট তৈরী করেছিল। পারিপার্শ্বিক গড়ে উঠেছিল কাব্য-উপন্যাস-ছোট গল্পের একই রীতি প্রসারের ফলে। তবু দর্শক প্রথম নাটককেই স্বীকার করে নি, বারবার একই ধরণের নাটকের আঘাত তার মনের বাধার প্রাচীর ভেঙে দিয়েছে।

এদেশের অবস্থা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে যদি বা চিত্রকর্মে নতুন রীতির প্রভাব পড়েছে, সাহিত্যে কিন্তু সবেমাত্র এ বস্তুর অনুপ্রবেশ ঘটেছে, সংগীতে ক্বচিৎ কদাচিৎ বিশেষ করে সিনেমায় ব্যবহৃত সংগীতে শোনা গেলেও সাধারণভাবে নবরীতির কোন সমাদর নেই—কোন সংগীতস্রষ্টা এ ধরণের সংগীতকে সচেতনভাবে নিজ রচনায় স্থান দেন নি। অর্থাৎ শ্রোতার চোখ বা কান কোনটাই একে গ্রহণ করবার অবস্থায় পৌঁছায় নি। তাছাড়া ইউরোপে আজ যে হতাশা তথা যে ভাঙন দেখা দিয়েছে আমাদের ক্ষেত্রে তা পুরোপুরি প্রযোজ্য নয়, আমাদের আজো আশা আছে, প্রত্যাশা আছে। তাই ওরা যা বলতে চায়, আমাদের কথা তা হতে পারে না, হওয়া উচিত নয়।

ইউরোপ আজ নাট্যসৃষ্টির প্রচেষ্টায় পুবের দিকে মুখ ফিরিয়েছে, পশ্চিমী নাটকে আজ ধ্রুপদী চীনা তথা জাপানী নাটকের প্রভাব বাড়ছে এ তথ্য ওদেশের নাট্যবোদ্ধারাই বলছেন। এ অবস্থায় আমরা কেন পশ্চিমের অনুকরণ করব? কাজেই আমাদের নাট্যচিন্তার পালাবদলের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। বিদেশী থিয়েটার ইন দি রাউণ্ড নয়, থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা নয় খাঁটি যাত্রার মাধ্যমে থিয়েটারকে এগিয়ে নিয়ে যাবার কাজ করতে হবে।

নাট্যগংগা আজ চিরন্তনের সমুদ্রে মেলবার জন্য চঞ্চল কিন্তু কে তাকে পথ দেখাবে? কোথায় সেই নাট্যভগীরথ মহাকালের জটাজুট থেকে যে মুক্ত করে আনবে ভাগীরথীকে? তার তপস্যা কি আজো সম্পূর্ণ হয় নি? প্রলয়ের মুখেও তারই প্রত্যাশায় বসে আছে নাট্যপিপাসুরা। এ শবরী প্রতীক্ষা কবে শেষ হবে কে জানে!

রবি মিত্র

বিদেশী সাহিত্য

মাঝে মাঝে এমন কিছু গ্রন্থ হাতে আসে যা সর্ব বয়সের পাঠকের মনকে নাড়া দিয়ে যায়। সময়ের হাতের বয়স তখন আবার পিছু হটতে শুরু করে। বড়রা-ও ফিরে যেতে পারেন, ভেসে যেতে পারেন এক নির্ভার নির্মল হাল্কা মেঘের ভেলায় দিকদিগন্তে।

এমনই একটি গ্রন্থ হ্যারল্ড কারল্যাণ্ডারের 'দি টাইগার'স হুইস্কার'। গ্রন্থটি মূলত শিশু সাহিত্য—এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য উপকথা ও প্রচলিত কাহিনীর সঙ্কলন। মোট একত্রিশটি কাহিনীর বা উপকথার মাধ্যমে হ্যারল্ড কারল্যাণ্ডার আলোচ্য যে গল্প বলার আবহাওয়া রচনা করেছেন তা নিঃসন্দেহে দুর্লভ। 'দি টাইগার হুইস্কারের' কাহিনীমালার প্রধান আকর্ষণ গল্প, এবং গল্প বলার কৃতিত্ব। এক একটি কাহিনীর মধ্যে গল্পকে ছাপিয়ে যে চতুর ব্যঙ্গ এবং রহস্য ও অভিযানের আস্বাদ রয়েছে তা যে কোন বয়সের পাঠককে গভীরভাবে কাছে টানে।

গ্রন্থকার হ্যারল্ড কারল্যাণ্ডার দূর প্রাচ্যের নানা স্থানের লোকগাথাকেও বর্তমান গ্রন্থে সঙ্কলিত করে সে দেশগুলির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন। আরব, বর্মা, কোরিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশের কাহিনীগুলি মনোরম। একটি সিংহ ও পণ্ডিতম্মন্যদের যে ভারতীয় কাহিনীটি একটি সংকলিত হয়েছে তার আকর্ষণ কিংবা চীন দেশীয় 'চাওআ' কাহিনীর এক বোকার আশ্চর্য কীর্তিকলাপ পাঠে যে কোন পাঠক কৌতুক বোধ করতে বাধ্য। কিংবা ছোট্ট, কাশ্মীরী উপকথায় যে লোকটি নিরন্তর ঈশ্বরের ত্রুটি ধরতে ব্যস্ত সে একদা নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে ঈশ্বরের সুবিচারকে স্বীকার করতে যখন বাধ্য হলো সেটিও কম রসসিক্ত নয়। বলা যেতে পারে গ্রন্থটির সব ক'টি কাহিনীই সজীব, মনকে নাড়া দেয়, এবং সুলিখিত। রূপকথার আশ্চর্য কাহিনী পাঠের স্বাদ 'দি টাইগার'স হুইস্কার' পাঠে অবশ্য প্রাপ্তব্য।

গ্রন্থটির আরো বড় আকর্ষণ এর চিত্রকর্ম অর্থাৎ ইলাসট্রেশন। গল্পের ছবিও যে আশ্চর্য হাতের যাদুতে গল্পে পরিণত হতে পারে তার অন্যতম প্রমাণও 'টাইগার'স হুইসস্কার'। * গল্পের কথনরীতির নৈপুণ্যের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পী এনরিকো আরনো'র চিত্রকর্ম পাঠককে এক নির্ভার খুশির জগতে নিতে সাহায্য করে।

উপরোক্ত আলোচনা সূত্রে আরো একটি গ্রন্থের উল্লেখ করতে হয় বর্তমান গ্রন্থটিও সর্ব বয়সের পাঠককে নিঃসন্দেহে কাছে টেনে নেবে। গ্রন্থটির নাম হলো : 'দি হ্যাট-শেকিং ড্যান্স'। আলোচ্য গ্রন্থটি যদিচ কিশোর পাঠ্য লোককথামালার এক সংকলন, তথাপি রমণীয় উপস্থাপনা তদুপরি কাহিনীর আশ্চর্য স্বাদ যে কোন পাঠকের মনোনিবেশ দাবী করে।

আফ্রিকার স্বর্ণ উপকূলের অশান্তি সম্প্রদায়ের মধ্যে নানাভাবে প্রচলিত মোট একুশটি লোককথা বর্তমানে 'দি হ্যাট-শেকিং ডান্স' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। বলাবাহুল্য, প্রায় প্রতিটি

কাহিনীই সুখপাঠ্য—পড়তে পড়তে পাঠক নির্ভার আনন্দলাভ করবেন। চাঁদ কেন আকাশে—সে সম্বন্ধে যে অভিনব তথ্য 'আনানসি'স রেসক্রু ক্রস দি রিভার' অংশে পরিবেশিত। শেষপর্যন্ত কচ্ছপের কেন সুকঠিন গাত্রাবরণ, বিশেষত সুকঠিন পৃষ্ঠদেশ এবং চিতাবাঘের পিঠে কি কারণেই বা চাকা চাকা দাগ তার রহস্য উন্মোচিত 'অসবু'স ড্রাম' শীর্ষক কাহিনী কিংবা একদা পাহাড়ী মাকড়সা একটি ভীষণ গরম বীন মাথায় টুপির তলায় লুকিয়ে রাখতে গিয়ে কি বিপদে পড়েছিল এবং ফলত শেষপর্যন্ত তার কেশপতনে যে টাকের সূচনা,—যে কারণে আজকের সমস্ত মাকড়সা মস্তকহীন—তার এক চমকপ্রদ কাহিনী 'দি হ্যাট-শেকিং ডান্স' সর্বদেশের সর্বশ্রেণীর পাঠকের মনে কৌতূহলের সৃষ্টি করবে। গ্রন্থের * অন্যান্য কাহিনীও পূর্বেই বলেছি, কাহিনীর অভিনবত্বে, কৌতুকও অন্যতর জীবনদর্শনের অপরূপ ব্যাখ্যায়, রমণীয় উপস্থাপনার সারল্যগুণে পাঠককে সমাহিত করে।

* **THE TIGER'S WHISKER** by Harold Courlander. Harcourt, Brace and Company, New York 17, N. Y. 3. 25.

* **THE HAT-SHAKING DANCE** by Harold Courlander and Albert Kofi Prempeh. Harcourt, Brace and Co. NewYrok. N. Y.

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

কবি চিত্তরঞ্জন দাশ

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। প্রখ্যাত আইনব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ ও দাতা হিসেবেই স্মরণীয়। কবি চিত্তরঞ্জন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের অন্তরালে আজ প্রায় বিস্মৃত। উত্তরজীবনের কর্মক্ষেত্রের বিপুল সম্মান তাঁকে কবিতা রচনার অবকাশ মুহূর্ত দেয় নি।

চিত্তরঞ্জনের জীবনের কবিতারচনার কাল ১৮৯৬—১৯১৫ প্রায় কুড়ি বছর। বাল্যের দিন থেকে যৌবনে কবিরূপে আত্মপ্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর কবি-মানসের গঠন সম্পর্কে জীবনীকারগণ রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবের উল্লেখ করেছেন। সাহিত্যের প্রতি তাঁর আকর্ষণ আবাল্য। রঙ্গলালের 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়' এবং হেমচন্দ্রের 'ভারত সঙ্গীত' তাঁর উৎসাহ উদ্দীপিত বালককণ্ঠে উচ্চারিত হত। বাল্য ও যৌবনের সন্ধিস্থলে প্রিয় ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা। বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত, আনন্দমঠ, লোকরহস্য, অনুশীলন প্রভৃতি রচনা একান্ত আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করতেন। বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ চিত্তরঞ্জন ১৮৯০ খৃঃ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় প্রতিযোগিতার জন্য বিলাতযাত্রা করেন। তখনও তাঁর সাহিত্যানুরাগ সুস্পষ্ট। সহযাত্রী শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্তের ভাষায়—'আমরা উভয়েই কীট্‌স্‌ ও শেলীর কবিতা পড়িতাম ও চর্চা করিতাম। তখন রবীন্দ্রনাথের কবিতাও উভয়ে শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিতাম।...আমি যতদিন ছিলাম, রাজনৈতিক বিষয়ে তাহার কোন ঝোঁক লক্ষ্য করি নাই তাহার সাহিত্যবিষয়ক অনুরাগই উল্লেখযোগ্য। নাট্যকলায় তাঁহার বিশেষ অনুরাগ লক্ষিত হইত একদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার দ্বারা তাঁর মনে অতি সঙ্গোপনে দেশমাতৃকার চিন্ময়ী মূর্তি প্রতিষ্ঠা; অপরদিকে শেলী, কীট্‌স্‌, রবীন্দ্রনাথ পাঠে সৌন্দর্য জগতে সঞ্চরণ—দুই-ই চলছিল।

বাংলা সাহিত্যে চিত্তরঞ্জনের কবি অপেক্ষাও 'নারায়ণ' পত্রিকার সম্পাদকরূপেই অধিক পরিচিতি। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকার ন্যায় চিত্তরঞ্জনের 'নারায়ণ, পত্রিকাও রবীন্দ্রবিরোধী বলে সুচিহ্নিত ছিল। সে পত্রিকার লেখক ছিলেন সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, অমরেন্দ্রনাথ রায়, গিরিজাশংকর রায়চৌধুরী প্রভৃতি। এবং তাঁদের আক্রমণের কেন্দ্রস্থল ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'নারায়ণ' পত্রিকার রবীন্দ্র-সমালোচনায় চিত্তরঞ্জনও অংশী ছিলেন। যেমন 'নারায়ণ' পত্রিকায় প্রকাশিত বাংলা গীতিকবিতা শীর্ষক আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' কাব্যগ্রন্থের 'জন্মকথা' কবিতাটির সমালোচনা আছে। কিন্তু তিনি সর্বাংশে রবীন্দ্রবিরোধী ছিলেন না। 'তাঁর অলৌকিক প্রতিভা আমি কখনও অস্বীকার করি না, তবে তাঁর সব লেখাই যে ভাল লাগে তা বলতে পারি না' —কবিকন্যা অপর্ণা দেবীর 'মানুষ চিত্তরঞ্জন' গ্রন্থের ঐ উক্তির সঙ্গে তাঁর রবীন্দ্র কাব্যপাঠ মিলিয়ে নিলেই ঐ ভ্রান্ত ধারণার নিরসন ঘটবে।

বিপরীতপক্ষে, অনেকের মতে প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মালঞ্চ' (১৮৯৬ খৃঃ) রবীন্দ্রপ্রভাব বর্জিত নয়। ডাঃ সুকুমার সেন বলেন—'চিত্তরঞ্জন দাশ অনেকদিন আগে কবিতাকর্মে মনোযোগী হইয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে পড়িয়া'। (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড) চিত্তরঞ্জন রবীন্দ্রনাথের 'খামখেয়ালী ক্লাবে'র সভ্য ছিলেন। অতুলপ্রসাদ সেন, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রভৃতির সঙ্গে তিনিও খামখেয়ালী পোষাকে ঐ বৈঠকে যোগদান করতেন। সুতরাং তাঁকে রবীন্দ্রদ্বেষী বলা বোধহয় সঙ্গত হবে না।

চিত্তরঞ্জনের সমগ্র কাব্যগ্রন্থের সঙ্কলন 'কবিচিত্ত'। সম্পাদিকা কবিকন্যা অপর্ণা দেবী। প্রতিটি কাব্যের মূল ভাবটি তিনি কাব্যগ্রন্থে সুন্দররূপে প্রকাশ করেছেন। কবিকে বোঝার সূত্র হিসেবে ঐ খণ্ড মন্তব্যগুলি যথেষ্ট মূল্যবান।

তাঁর ভাষায় 'মালঞ্চ'র কবিতাগুলি কবির যৌবনকালের হৃদ-মাঞ্চের ফুল। যৌবনের উদ্দাম অস্থিরতা, দীপ্ত আবেগ কবিতাগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের প্রতি অভিমান, দুঃখীর সহানুভূতিও 'মালঞ্চে'র কয়েকটি কবিতায় প্রকাশিত। 'জীবনের জলন্ত যাতনা' নির্বাপিত করতে ব্যাকুল কবিচিত্ত শুধু অন্বেষণ করেই ফিরছে—কখনও মানবপ্রেমে, কখনও কল্পনাজগতে, কখনও বা ঈশ্বরের করুণায়। 'ধরণীর ম্লান বক্ষে' 'মলিন গম্ভীর দিন'কে ভোলাবার জন্য তিনি চেয়েছেন 'স্বর্ণ-সুরা', 'আরক্ত চুম্বন'। কিন্তু পরিশেষে উপলব্ধি করেছেন—

'আমার এই প্রেম বুঝি তৃপ্তিহীন তৃষা
সমস্ত জীবন এক নিদ্রাহীন নিশা।'

সেই অনন্ত প্রেমতৃষার তৃপ্তির জন্য বলেছেন—'যা কিছু সুন্দর, এই প্রেম তাই পাক।' এবং 'সমস্ত ধরণী পাক্ প্রেম মরমের।'

আশাহীন, লক্ষ্যহীন, অতৃপ্ত জীবনের অন্ধ অন্ধকার মুহূর্তে কবি নিখিল নির্ভরকে ডাকছেন তাঁর বিপন্ন হৃদয়কে আশ্বাসিত করার জন্য। কিন্তু তিনি 'করুণাবিহীন', 'অনন্ত নিষ্ঠুর'। কবি দেখছেন—

এই যে বেদনাভরা কামগত ধরণী,
চিরদিন মৃত্যুময় মলিন মেদিনী,
আনিছে চরণে তব, প্রতি প্রভাতের
ভাষাহীন আশা, প্রতি নিশীথের
মর্মভেদী কাতরতা, ডাকিছে তোমায়
কত না ব্যকুল কণ্ঠে, আকুল পরাণে।
কেমনে শুনিবে ?—তুমি সুখের সম্রাট।
স্বর্গের রাজন! তোমার নন্দন মাঝে
সে ক্রন্দন পশিবে কেমনে ?'

তাই দুঃখভরে মুখ ফিরিয়েছেন এই বলে যে ঈশ্বরের করুণার প্রত্যাশী আর তিনি নন। তিনি নিজেই 'যত্ন করে তাঁর ঈশ্বর'কে সৃষ্টি করে নেবেন। কারণ প্রচলিত ধর্মানুমোদিত পথে তিনি ঈশ্বরের যথার্থ রূপটি প্রত্যক্ষ করতে পারেন নি।

'ধরণীর দুঃখদৈন্য আছে যাহা থাক :
ঊর্দ্ধমুখে পূজা কর দেবতা গড়িয়া'—এবং
'ঈশ্বর ! ঈশ্বর ! বলি অবোধ-ক্রন্দন,'

এই প্রাণহীন ঈশ্বর সাধনা তাকে বিলুব্ধ করেছিল। 'সোঽহং', ঈশ্বর', প্রভৃতি কবিতার জন্য তৎকালীন ব্রাহ্ম সমাজ তাঁকে নাস্তিক আখ্যা দিয়েছিল।

চিত্তরঞ্জনের কোমল, অনুভূতিশীল প্রাণ সাধারণ মানুষের দুঃখদৈন্য দর্শনে নিতান্তই ব্যথিত হত। সেই ব্যথিত কবিহৃদয়ের প্রকাশ 'অভিশাপ' কবিতাটিতে। লাঞ্ছিতা, অপমানিতা, নারীসত্তার কারুণ্যকে কবি রূপদান করেছেন 'বারবিলাসিনী' কবিতায়। ঐ কবিতাটি তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজের নিকট রুচি-দোষে দুষ্ট বলে প্রতিভাত হয়েছিল। কবিপ্রাণের সহজ, অনাড়ম্বর প্রকাশে কবিতাটি অনবদ্য।

এ বিশ্ব লালসা ছাই
সর্বাঙ্গে মাখিয়া তাই
চলিয়াছি কলঙ্ক বাহিনী—

একটি রূঢ় সামাজিক সত্যের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে।

জীবনের দুঃখদৈন্য, অতৃপ্তি যেমন সত্য, তেমনি সত্য 'সুন্দর সূর্যের আলো,' 'সুমন্দ বসন্ত বায়ু,' 'সুবর্ণ স্বপন' ও সুন্দর প্রেম। সব মিলিয়ে জীবনবাদী কবির বাণী—

'আমি রাজা, সকলি আমার !...
অনন্ত সৌন্দর্য আছে
বিলাইতে চাই,
অনন্ত জীবন আজি—
তারি গান গাই !'

'মালঞ্চে' যে ভাবগুলি বিক্ষিপ্ত ছিল, 'মালা'র ঈশ্বর সন্ধানের ভাবসূত্রে তা গ্রথিত হল। 'মালা'র প্রকাশকাল ১৯০২। 'মালঞ্চে' যে আকুল অস্থিরতা প্রকাশ পেয়েছিল তা এখানে যৌবন মধ্যাহ্নে স্থির।' কবির জিজ্ঞাসা—

'ওরে রে অশান্ত মন।
কারে তুই চাস ?...
আপন হৃদয়ে তবু
খুঁজেছিস কভু ?

আপন হৃদয়মাঝারে কবি অনুসন্ধান করতে বলছেন। একমাত্র আত্মজ্ঞানই পারে মুক্তি দিতে দিতে পারে শান্তি। সেই পরম পূর্ণের কাছে কবির প্রার্থনা

'ভরি দিও শূন্য প্রাণ তব পূর্ণতায়
মহান করিয়া দিও তব মহিমায়।'

যে ঈশ্বরের প্রতি অভিমানে একদা তিনি বলেছিলেন—

তুমি যাও, আমি থাকি আপনারে লয়ে—

সেই ঈশ্বরকেই তিনি উপলব্ধি করলেন—

হে অনন্ত! হে মহান! তুমি প্রাণসিন্ধু
পরাণ তরঙ্গে তব আমি প্রাণবিন্দু।'

'মালঞ্চে'র কবিতাগুলির উত্তাপ যেন মালার ঈশ্বরপ্রেমে শান্ত হয়ে গেছে। 'মালা'র কবি যেন দ্বিধাদ্বন্দ্বের শেষে তার বীণায় ধীরে ধীরে আত্মসমর্পণের সুরে-সাধা শুরু করেছেন। 'মালঞ্চ' অপেক্ষা 'মালা'র প্রেম অনেক সংযত। বাসনার রক্তিমতা এখানে আপন গাঢ়তা হারিয়ে স্তিমিত। এখানে কবি প্রেমে 'আপনার গান,' 'মরমের সুখ; 'শূন্য প্রাণ' সমর্পণ করে বলেছেন—

এ প্রাণ আছিল শূন্য অলঙ্কার হীন
তব প্রেম আজি তার বসন ভূষণ।'

'মালঞ্চে' ঈশ্বরানুসন্ধানের আর্তিই 'সাগর সঙ্গীতে' জীবনদেবতার প্রাপ্তিতে পরিণত হয়েছে। 'সাগর সঙ্গীতে'র প্রারম্ভে কবির সকরুণ মিনতি—

'সত্যই এসেছ যদি হে রহস্যময়ি
দাঁড়াও অন্তর মাঝে ছন্দে গেঁথে লই।
দাঁড়াও ক্ষণেক!'

আদিঅন্তহীন বিশাল বারিধি—নানা রং বদলের খেলায় তার বিচিত্র রূপকে কবি দেখলেন। কখনও সে অনন্ত সঙ্গীতবাহী, প্রভাতবেলায় কিরণ রঞ্জিত সর্ববেশধারী 'সিন্ধু রাজার মতন' মহিমাপ্রোজ্জ্বল, আবার কলনাদিনী সিন্ধুর গর্জন মৃত্যুবার্তাবাহী। সাগর দর্শনে মনে হয়েছে—

কাঁদিতেছে একি ক্ষুধা একি তৃষ্ণা অনিবার
একি ব্যথা গরজিছে শ্রান্তিহীন দুর্নিবার?'

অভিশপ্ত ব্যথিত সিন্ধুকেই কবি তাঁর সখারূপে গ্রহণ করলেন। ঐ অসীম অনন্তের স্পর্শে 'মনখানি মম, শত শত তন্ত্রীভরা গীতযন্ত্র সম।' পরিপ্লুত কবিকণ্ঠে উচ্চারিত হল—'আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী।—বাজাও আমারে

দিবস রজনী ভরি আলোক আঁধারে,
বাজাও নির্জন তীরে, বিজন আকাশে,
সকল তিমির ঘেরা আকুল বাতাসে,
মায়ালোকে, ছায়ালোকে, তরুণ উষায়—
বাজাও বাসনাহীন, উদাসী সন্ধ্যায়।

যে কবিসত্তা এতদিন আপন পরাণমাঝারে তৃষ্ণার্ত ছিল, তার নিবৃত্তি ঘটেছে ঐ 'মহাপ্রাণে'র সঙ্গে মিলনে। সেই মিলন-গীতি, পূর্ণ আনন্দের গান কবি 'গেয়ে বেড়াবেন।—'

আজ হতে আমি, হে অর্ণব। হে অশেষ
গাহিব তোমার গান ফিরি দেশ দেশ।'

সাগরসঙ্গীত পাঠে অভিভূত শ্রীঅরবিন্দ তার ইংরাজী অনুবাদ করেন। কবিকৃত অনুবাদ ও

শ্রীঅরবিন্দকৃত অনুবাদের ভাবগতি ও প্রকাশগতি সাধর্ম অপেক্ষা পার্থক্যই সহজদৃষ্ট। 'Songs of the sea'র ভূমিকায় অপর্ণা দেবী এই পার্থক্যের কারণস্বরূপ বলেছেন—'as interesting a contrast in its own way, as that between the two personalities involved.'

'সাগরসঙ্গীতে'র অসীমের অনুসন্ধানের পর চরম আত্মনিবেদনের পালা—'অন্তর্যামী (১৯১৪) কাব্যে। কবিকন্যা বলেছেন—'তিনি আর তাঁর অন্তরের দেবতা এখানে বিরাজিত। আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলনের তীব্র আকুলতাই এখানে অনুভূত হয়।' আত্মাভিমানের অবসানে কবির সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জন। 'এই দাঁড়াইনু আমি

যে পথে লইতে চাও লয়ে যাও অন্তর্যামী !

কবি-কামনা বাসনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভয়-ত্রাস সবকিছুকে চোখের জলে ধুয়ে দিয়ে বৈষ্ণব পদকর্তার আকুল আর্তিতে যেন বলেছেন—

'দেই তুলসী তিল দেহ সমপিলু
দয়া জনু ছোড়বি মোয়।'

আপন অন্তরবেদীর উপর অন্তর্যামীর প্রতিষ্ঠা করে কবির প্রার্থনামন্ত্র—

'এস আমার আঁধার বুকে এস আলো ক'রে !
এস আমার দুঃখের মাঝে সকল দুখ হরে।
এস আমার সকল প্রাণে ওগো প্রাণহরা
এস আমার সকল অঙ্গে সকল সোহাগ ভরা।
এস আমার মরণকালে এস হাসি হাসি
আন তোমার মরণ-হরা সব-ভুলানো বাঁশী।'

এই সর্বস্ব সমর্পণের ব্যাকুলতা এবং সমর্পণজনিত গভীর প্রশান্তি—বৈষ্ণবপ্রাণতার নিদর্শন 'সাগর সঙ্গীত'-এর যুগে তার প্রথম অস্ফুট প্রকাশ। চিত্তরঞ্জনের জীবনীকারগণও জানিয়েছেন মহাপ্রভুর অমিয়-জীবনকথা এবং মহাজন পদাবলী তিনি বিহ্বল চিত্তে আস্বাদন করতেন। বৈষ্ণবধর্মের আত্মসমর্পণ এবং বৈষ্ণবপদালীর লীলারস আস্বাদনের ফল 'কিশোর-কিশোরী' কাব্য (১৯১৫)।

'কিশোর-কিশোরী'র অবলম্বনীয় প্রেম 'মালঞ্চের ভাবরসে সিঞ্চিত হয়, এ মিলনে কামগন্ধহীন দেহাতীত যে প্রেমের অনাবিলধারা বৈষ্ণবসাহিত্যে প্রবাহিত ছিল, 'কিশোর-কিশোরী'তে তারই নূতন পরিবেশন।' এ প্রেমে 'ধরার পঙ্কিলতা স্পর্শ করিতে পারে নি।' কিশোর-কিশোরীর পারস্পরিক গাঢ় অনুরাগের মধ্যে সেই চিরপ্রেমময়ের ছায়া পড়েছে। সেই 'মহাপ্রাণের বাঁশরী' সর্ব আবরণ ছাড়া করে দেয়, সেই 'নূপুরের মধু রুনুরুনী' প্রাণকে করে নিয়তি-চঞ্চল, সেই মুরতি যার— 'পদতলে কলকলে কাল উর্মিমালা

শিরে কোন্ দেবতার নিত্য দীপজ্বালা।'

কবি সে মুরতি-স্রোতে নিত্য ভাসমান। এই অনুভূতিতে কবির প্রেম প্রসাধনকলা ত্যাগ করে সাধন পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।

কিশোর-কিশোরীর প্রেম এক জনমের নয়—অনাদিকালের বীণায় তার আহ্বান গীতি ধ্বনিত।

'যেন কোন মহাদেবতার
মহামিলনের তরে মিলেছি আমরা!—
যুগে যুগে জনমে জনমে বার বার!'

মহাদেবতারই চরণপাতে ধন্য কবিমন বলে উঠে—

'ওরে দেখ দেখ কি ধুম লেগেছে!
পরাণ-কমল মাঝে কি জানি জেগেছে।'

পাওয়া-না-পাওয়া, বিরহ-মিলন নিয়ে আনন্দবাদী কবির উক্তি—

হে পূর্ণ অপূর্ণ তুমি! ধন্য এ জীবন!

কিশোর-কিশোরীতেই কাব্যজীবনের সমাপ্তি। 'মালঞ্চে' অস্ফুট কবিহৃদয় বলেছিল—'আমার জীবনভরা বিশ্বের আহ্বান', 'মালা'য় আরও জোর দিয়ে বলেছেন—'জনম বিশ্বের তরে পরার্থে কামনা।' আত্মসুখ, আত্মমুক্তি নয়, দুঃখদৈন্য প্রপীড়িত পরাধীন জাতির পাশে আপনার সবটুকু শক্তি সাহস নিয়ে তিনে দাঁড়ালেন—দেশ পেল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে।

আলোচ্য কাব্যগুলিই তাঁর লেখকজীবনের একমাত্র রচনা নয়। দুটি ছোট ছোট গল্পও রচনা করেন। 'ডালিম' গল্পটি 'নারায়ণ' পত্রিকায় (১৩২১)-এর পৌষ মাসে প্রকাশিত হয়। পরবৎসর অগ্রহায়ণ মাসে প্রকাশিত হয় 'প্রাণ প্রতিষ্ঠা।' 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা' গল্পটির রচনাস্থল মায়াবতী।

রচনা ছাড়াও সমালোচন ক্ষমতাও যথেষ্ট ছিল। 'নির্মাল্য,' 'নব্যভারত', 'মানসী' প্রভৃতিতে তাঁর রচনা প্রকাশ হয়েছিল। 'বাংলার গীতিকবিতা,' 'কবিতার কথা'—তাঁর সমালোচন ক্ষমতার নিদর্শন।

রচনা, সমালোচন ব্যতিরেকে তাঁর কাব্যরসপিপাসু চিত্তের অন্যতম পরিচয় সাহিত্য-বিষয়ক আলোচনা। তাঁর জীবনীকারগণ জানিয়েছেন, শতকাজের মধ্যেও তিনি সাহিত্য আলোচনাদির দ্বারা বিশ্রামসুখ উপভোগ করতেন। কারাবাসের নির্জনতাকে মুখর করে তুলতেন সরস টীকা টিপ্পনী প্রয়োগে।

যে সকল কবিতা, গান, নাটক সহজ সরলভাবে বাঙালীর জীবনকে তার আশা আকাঙ্ক্ষাকে সত্যসুন্দর রূপ দিতে পারত, তাইতেই দেশবন্ধুর ছিল সমধিক অনুরাগ। তাঁর কবিকৃতির আলোচনায় সর্বদাই মনে রাখতে হবে যে তিনি প্রাণ দিয়ে চেয়েছিলেন—

'বাঙালির পণ, বাঙালির আশা, বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হইক হে ভগবান॥'

সেইজন্য তাঁর রচনার সর্বত্র যে গুণটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হল—সহজ অনাড়ম্বর প্রকাশভংগিমা। আপন অনুভবকে অনাড়ম্বরে পাঠকের হৃদয়-দুয়ারে পৌছে দেওয়াই যদি কবিত্ব হয়—তবে চিত্তরঞ্জনের কবিতা সার্থক গীতি কবিতা।

কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়

স্মৃতিভারে ॥ শ্রীযুক্ত জনার্দন চক্রবর্তী। জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যাণ্ড পাব্লিশার্স-প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা। মূল্য পাঁচ টাকা।

মানুষের হৃদয় দর্পণের মত। তাতে কত বিচিত্র ছায়া পড়ে। কিন্তু দর্পণে ছায়া ততক্ষণ, যতক্ষণ সামনে কায়া। তারপর আবার শূন্যতা। হৃদয়দর্পণে শূন্যতা নেই, সেই ছায়াগুলি বেঁচে থাকে। সঞ্চারিণী দীপশিখার মত স্মৃতি মধ্যে মধ্যে মনের অলিন্দে অলিন্দে ঘুরে বেড়ায়, একটি ঘটনা, একটি ছবি, একটি মুখকে উদ্ভাসিত করে তোলে। সমস্ত মানুষই স্মৃতিভারে আচ্ছন্ন। অন্যের স্মৃতিকথার মধ্যেও মানুষ কখনও কখনও নিজেকে খুঁজে পায়। অতীতের কথা আমরা শুনি, কারণ আমার অতীত অন্যের অতীতের সঙ্গে যুক্ত। সত্যিকার ভাবুক কথকের হাতে তাই নিজের স্মৃতিকথা একটি বিশেষকালের জীবনসাধনার কথা হয়ে ওঠে। ফরাসীভাষায় একটি কথা আছে, বিচ্ছেদ মানেই অংশত মৃত্যু। কথাটি বড় সত্য; প্রত্যেকের সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদে আমরাও একটু একটু মরি। তবু ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির বিচ্ছেদ নয়, কালের সঙ্গে কালের বিচ্ছেদও আমাদের আংশিক মৃত্যু। আমাদের জীবনকে পূর্ণরূপে দেখতে পাবার আকাঙ্ক্ষা আছে বলেই আমরা অতীত কাহিনী বা 'পূর্ব কথা' স্মরণ করি। সদ্য প্রকাশিত 'স্মৃতিভারে' গ্রন্থটি সেই অতীতের কাহিনী, শুধু ব্যক্তিগত স্মৃতিকথা নয়।

মানুষ মাত্রেরই জীবন মূল্যবান, অভিজ্ঞতা মূল্যবান। কিন্তু ইতিহাসে এক একটা সময় আসে যখন অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র বেড়ে যায়, আমাদের মত সাধারণ মানুষের বৈচিত্র্যহীন জীবনেও ঘটনার তরঙ্গ লাগে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আমাদের দেশে সেই বিচিত্র সময়। স্বদেশী আন্দোলন, বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের উত্থান, দেশ বিভাগ, ধর্মদ্বন্দ্ব, দেশের স্বাধীনতা লাভ, আমাদের সামাজিক জীবন ও সাংস্কৃতিক জীবনের মূল্যবোধের গায়ে পরিবর্তনের প্রবল আঘাত—এক মহাকাব্যের বিষয়বস্তু। এই যুগের সংবেদনশীল মানুষের স্মৃতিকথায় হৃদয়স্পর্শী উপাদান তাই বিচিত্র ও ব্যাপক হতে বাধ্য। 'স্মৃতিভারে' একজন আদর্শবাদী, জীবনরসিক একজন শিক্ষকের জীবনে এই যুগের মূল্যবোধের ক্রমপরিবর্তনের বেদনাকে যেমন তুলে ধরেছে, তেমনই তুলে ধরেছে পরিবর্তনের স্রোতের মধ্যে অপরিবর্তনীয় জীবনের অর্ঘ্যগুলি। গ্রন্থের দেশ এবং কাল দু-ই অনেক দূরে। দেশ আজ বিদেশ। তা আজ সত্যই স্বপ্ন দিয়ে তৈরী; স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। আর কাল আধুনিকতার তরঙ্গের ধাক্কায় আমাদের থেকে বুঝি অনেক দূরে সরে গেছে। পঞ্চাশ বছর আগের বাংলাদেশের একটি গ্রামের বর্ষণমুখর রাত্রে কাশেভ মৌলভীর হিন্দু 'কাকামশাই'-এর বাড়িতে দুধের জন্য আগমন, ক্ষুধার্ত শিশুর কান্নার কথা মনে ভেবে মধ্য রাত্রে দুটি বালকের দুধ পৌঁছে দিতে যাওয়া যে হৃদয়বন্ধনের কথা মনে করায়—সেই হৃদয়বন্ধন আজ ছিন্ন। লেখক এক বাংলাদেশের মধ্যে আমাদের উপস্থিত করেছেন,

যে দেশে আমরা আর কোন দিনই ফিরব না। যেখানে চণ্ডীমণ্ডপের মেটে দেওয়ালের ধারে পাঠশালা, তালপাতার ওপর বাঁশের কঞ্চির কলম দিয়ে লেখা, কুমোরের পুঁইশালে মেটে দোয়াত-লোভী বালখিল্যের দল, একটাকায় বত্রিশটি সন্দেশ, গুরুমশাইকে বরণের জন্য একটাকা মূল্যের মোটা থানের ধুতি, ভোরবেলার শ্রীদাম বৈরাগীর প্রভাতী কীর্তন, আর মুসলমান গুরুমশাই হিন্দুছাত্রের কাগজ ধরাচ্ছেন, 'কাগজের শিরোদেশে ধীরে ধীরে লিখলেন, এলাহি ভরসা, তাঁর নিজের প্রাণের কথা লখে একটু মাথা নোয়ালেন। তারপর সেই পংক্তি মুড়িয়ে দিয়ে মুক্তার পাঁতির মত পরিষ্কার নির্ভুল করে লিখলেন, শ্রীদুর্গা শরণম' আর বললেন 'প্রথম কথাটি অর্থাৎ এলাহী-ভরসা আমার, দ্বিতীয় কথাটি অর্থাৎ শ্রীদুর্গা শরণম তোমার। কিন্তু বাবাজী মনে রেখো, দুটি কথাই এক।' লেখকের প্রশ্ন আমাদেরই' 'সেই স্বাধীন ভারতে বসে ভাবছি' আজ আমার মুসলমানগুরু আর শ্রীরামকৃষ্ণদেব এক দেশেরই মানুষ। সেই ভারত কোথায়? সে মানুষই বা কোথায় গেল?'

লেখকের চেতনার দর্শনে কত ছবিই ধরা পড়েছে, কিন্তু যেখানেই মানুষের হৃদয়, মানুষেয় অনুভব দেখেছেন তা স্থায়ীরূপে মুদ্রিত হল। তা কখনও অন্ধ মুসলমান যুবকের মুখের কথায়, মামলাবাজ বড় মোল্লার চরিত্রে, অসময়ের অতিথি নজরুল ইসলামের মনখোলা উচ্চহাসিতে। মহাপ্রাণ শিক্ষকদের স্মৃতিচিত্রগুলি বাংলাদেশের দ্রুত পরিবর্তমান জীবনমূল্যবোধের পাশে আরো উজ্জ্বল। সংস্কৃতের শশীপণ্ডিত মশাই, ছোট গল্পকার যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, স্বনামধন্য সতীশচন্দ্র মিত্র, দীনেশচন্দ্র সেন, তারাপুরওয়ালা ত্যাগ, বাৎসল্য ও ভালবাসার আলেখ্য। কোন কাহিনী হাস্যোজ্জ্বল, কোনটি গভীর বেদনায় বিধুর, কোনটিতে কণ্ঠস্বর শান্ত, আবেগে গাঢ়। মানবমহিমার আর একটিছবি বিদেশী ইংরেজ চরিত্রগুলিতে। আর ভারতীয় মনীষিগণের সম্বন্ধে যে ক'টি স্মৃতিকথা আছে—সেখানেও তাঁদের দেশ, ভাষা কিংবা মানুষকে ভালবাসার কাহিনী আমরা নতুন করে জেনেছি।

তাই বাংলাদেশে আধুনিক কালে যেসমস্ত স্মৃতিকথা লেখা হয়েছে এইগ্রন্থ সেই শ্রেণীর বাইরে। কারণ এ-ব্যক্তির নিজের কথাই শুধু নয়, কবি বা ভাবুক যেমন করে এই যুগের বিচিত্র ঘটনার দোলায় আন্দোলিত হতেন, যেমন প্রতিক্রিয়া করতেন, এই বই সেইরকম আন্দোলন এবং ভাবসংবেদন কাহিনী। জীবনের অপরাহ্ন বেলায় বসে কথাশিল্পী সুলভ প্রতিভায় যে কাহিনীগুলি লিখেছেন তাতে অপরাহ্নের প্রশান্তির সঙ্গে মিশে আছে মধ্যাহ্নের প্রকার ঔজ্জ্বল্য এবং ভোরবেলার সহজ কোমলতা। একালের তরঙ্গমুখরতায় তিনি বিধ্বস্ত হয়েছেন, কিন্তু ঢেউর মাথায় যে আলো জ্বলে ওঠে তাকে দেখতে ভুলে যাননি। বাঁশঝাড়ে-চাপা একখানি মাত্র খড়ের ঘর দরিদ্র কাসেম মৌলবীর। ঝাঁপের দরজা, ভিতরে মিট্‌মিট করে জ্বলছে একটি কেরোসিনেরটেমি।' এই আলোটি সাধারণ মানুষের সাধারণ, কিন্তু অসাধারণ, হৃদয়ের দীপশিখা। সেই দীপশিখায় এই গ্রন্থ পবিত্র এবং উজ্জ্বল।

শিশিরকুমার দাশ

ফোকালারিস্ট্‌স্‌ অব বেঙ্গল। শঙ্কর সেনগুপ্ত। ইণ্ডিয়ান পাবলিকেশন্‌স্‌। ৩ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট। কলিকাতা-১। বারো টাকা।

ঐতিহ্য এবং লোকসংস্কৃতির চেয়ে সনাতন বিষয় যদিও আর নেই, তথাপি ঐ বিষয়ে সচেতন আগ্রহ মাত্র য়োরোপীয় রোমান্টিক যুগের সন্নিহিত। আর ফোক্‌-লোর নামে যে সুপরিচিত শব্দটির এখন বহুলপ্রচার, সেই শব্দ মাত্র ১৮৪৬ সালে উইলিয়ম জন টম্‌স্‌ নামে এক ইংরেজ ভদ্রলোকের উদ্ভাবনা।

আমাদের দেশে ঐতিহ্য ও লোকসংস্কৃতি বিষয়ে চর্চা ঐ প্রতীচ্য আগ্রহেরই প্রায় সমসাময়িক। আমাদের দেশে য়োরোপীয় প্রভাবের সূত্রপাতও প্রায় সমকালীন। কারণ হিসেবে এই কথাই সম্ভবত নির্দেশ করা চলে। অষ্টাদশ শতাব্দী না ফুরোতেই শহর কলকাতায় যে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় তার কৌতূহল অবশ্য ছিল ভারততত্ত্বে। কিন্তু ভারততত্ত্ব ভারত ইতিহাসেরই উল্টো পিঠ। তাছাড়া, আমাদের ঐতিহ্য ও লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে অবধান যে, স্বদেশ-ইতিহাস-সচেতনার পথ বেয়েই আত্মপ্রকাশ করেছে তার জন্য গবেষণার শরণ নেওয়ার দরকার হয় না, কারণ তা স্বতঃপ্রাদিত।

সুক্ষণে য়োরোপীয় প্রভাবের প্রথম পাদপীঠ বাঙলাদেশেই বিধিনির্দিষ্ট হয়েছিল। নবযুগের আদিম ইতিহাসচর্চাকারীরা প্রায় সকলেই বাঙলাদেশে বা বাঙালি পরিবারে কেন্দ্রীভূত; এই তথ্যেরই উজ্জ্বল পরিণাম হিসেবে স্বদেশ ও স্বজাতীয়তায় অনুরাগ যে বাঙলাদেশে সূচীত—এই গর্বিত বচন উচ্চারণ করা যায়। কিন্তু সে প্রসঙ্গ পৃথক, আর ঐ ইতিহাস বিষয়েরও উপোদ্‌ঘাতে অন্তত য়োরোপীয় স্বেদঃপাতের এ বিস্মরণীয় দৃষ্টান্তমালা সজ্জিত আছে।

ঐ বিদেশী-ভারতবিদ্যা-সন্ধিৎসুজনেরা এদেশের লোকবৃত্তচর্চারও প্রথম অধ্যায় লিখে যেতে পেরেছিলেন। উইলিয়ম জোন্স বা চার্লস উইলকিন্স, কোলব্রুক বা হ্যামিল্টন—আদিপর্বের এই স্মরণীয় নামগুলি, কিংবা তারপরে দি ওরিয়েন্টালিস্ট-খ্যাত টমাস বেকন থেকে শুরু করে হাণ্টার ডাল্টন রাইস রিজলি বার্ট টেম্পল-আদি নামগুলি পর্যন্ত অন্তর্বর্তী আরো অনেকগুলি অবিস্মরণীয় নাম-সহ এদেশের লোকবৃত্তের ইতিহাসে বিশেষভাবে জড়িত হয়ে আছে। শ্রীশঙ্কর সেনগুপ্ত তাঁর বইয়ের কোনোখানে এই সিদ্ধান্ত লিখেছেন: The study of Indology and Folklore began in right earnest since the foundation of Asiatic Society in 1784. তাঁর ফোকলোরিস্ট্‌স্‌ অব বেঙ্গল গ্রন্থ অবশ্য বাঙালি লোকবৃত্তসন্ধিৎসুদেরই প্রতিপাদন করার দায়িত্ব নিয়েছে, কিন্তু সেক্ষেত্রেও ঐ বিদেশী কৃত্যের জন্য এই বইয়েরই সূচনায় একটি শোভন অনতিবিস্তৃত অনুচ্ছেদ দাবি করতে ইচ্ছা হয়। শ্রীযুক্ত অশোক মিত্র-কৃত গ্রন্থ পরিচয় অংশে এ-বিষয়ে অতি সংক্ষিপ্ত একটি সমাচার স্থান পেয়েছে বটে, লেখক-কৃত ভূমিকায় লোকবৃত্তের নানা প্রসঙ্গের সঙ্গে আলোচ্য ব্যক্তিদের সম্পর্কে নানা তথ্য ও তার উৎস বিষয়ে বহু মূল্যবান বিষয়ও লিখিত হয়েছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও বাঙলাদেশে লোকবৃত্তচর্চার সূচনা ও প্রথম অধ্যায় নামে অতি প্রয়োজনীয় একটি উপক্রমণিকা থেকে এই গ্রন্থের লেখক আমাদের বঞ্চিত করেছেন বলে মনে হয়।

অবশ্য লেখকের লক্ষ্য সীমাবদ্ধ, প্রধানত অবাঙালি পাঠকদের কাছে বাঙলাদেশের লোকবৃত্ত-সন্ধিৎসুদের তিনি পরিচিত করার দায়িত্ব নিয়েছেন। কিন্তু এই জাতীয় গ্রন্থ বাঙালি পাঠকের জ্ঞাতার্থেও এর আগে কেউ প্রণয়ন করেছেন বলে মনে পড়ে না। বাঙলা ভাষায় যা কিছু লোকবৃত্ত-চর্চা চোখে পড়ে তা সবই বিষয়নিবিষ্ট। নামমাহাত্ম্যবশত একমাত্র রবীন্দ্রনাথই বোধ করি ব্যক্তিগতভাবে এইক্ষেত্রে আলোচিত হয়েছেন। সেদিক থেকে লেখকের এই হস্তক্ষেপ আমাদের কাছেও সমূহভাবে বরেণ্য। সেই কারণে লেখকের দায়িত্বও অবশ্য তাঁর অঙ্গীকারের চেয়ে বেশি ব্যাপকতা পেয়েছে। কিন্তু সেই দায়িত্ব ও অভাবের ছোট কথা বাদ দিয়ে, এই প্রথম বাঙালি লোকবৃত্তসন্ধিৎসুদের ব্যক্তিগত জীবন ও রচনাপঞ্জী সঙ্কলন করে দিয়ে শ্রীসেনগুপ্ত আমাদেরও সবার আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন।

এই গ্রন্থ তাঁর প্রস্তাবনার পর্ব মাত্র। কালানুক্রমিকভাবে এখানে প্রথম যুগের আটজন লোকবৃত্তসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি স্থান পেয়েছেন। প্রথম লালবিহারী দে, ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম লোকবৃত্তের গ্রন্থরচয়িতা। ১৮৭৪ ও ১৮৮১ সালে প্রকাশিত তাঁর Bengal Peasant Life এবং Folktales of Bengal যথাক্রমে উত্তরপাড়ার জমিদার বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ঘোষিত পুরস্কারের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং ক্যাপ্টেন রিচার্ড কারনাক টেম্পলের পরামর্শে লিখিত হয়। বিদেশীদের চেয়ে লালবিহারী রচিত এই লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্য দেশে-বিদেশে অধিক প্রচার লালবিহারী রচিত এই লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যই দেশ বিদেশে অধিক প্রচার লাভ করেছিল। তাঁর বই দুটি রবীন্দ্রনাথও পড়েছিলেন বলে মনে হয়, হয়তো তার দ্বারা সামান্য প্রভাবিতও হয়েছেন। জমিদারীসূত্রে গ্রামবাঙলার অন্তঃপুরে নিবাস রচনা করতে যাওয়ার অনেক আগেই ১৮৮৩ সালে অতিস্বল্পকুমার বয়সে 'বাউলের গান' নামে গীতসংগ্রহের সমালোচনা সূত্রে তিনি যে লিখেছিলেন, "ইহাকে দেখিলেই এমনি আত্মীয় বলিয়া বোধ হয় যে, কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া ইহাকে প্রাণের অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিতে দিই"—সেই স্বাজাত্যচেতনার পিছনে এমন হওয়া বিচিত্র নয় হয়তো কোনো প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণাও কাজ করেছিল।

ঐ প্রথম বয়সের রচনাতেই রবীন্দ্রনাথ স্ব-সংগৃহীত তিনটি লোকসংগীত স্থাপন করেছিলেন, এবং ঐখানেই সর্বপ্রথম তিনি আপামর বাঙালিকে এই দেশজ ঐতিহ্যের উপকরণ সংগ্রহের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। আরো এক যুগ পর যখন বাঙ্গালী সাহিত্য পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন এ বিষয়ে তাঁর প্রযত্ন ও সক্রিয়তা আরো লক্ষ্যগোচর হয়ে উঠলো। পরিষৎ পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই তাঁর 'ছেলে ভুলোনো ছড়া' প্রকাশিত হয়। তাছাড়া সমসাময়িক সাধনা-পত্রেও তাঁর বহু শ্রমের স্বাক্ষর রয়েছে। পরবর্তীকালে দীর্ঘ জীবন ধরে তিনি এই দেশজ ঐতিহ্যের উপকরণ আহরণ করেছেন এবং ব্যবহার করেছেন, তাঁর রচনায় ও তাঁর চরিত্রে অন্তঃশীলভাবে সেই চলোর্মি পাঞ্জার ছাপ রেখে গিয়েছে। কিন্তু তারও চেয়ে বড় কথা, তিনি একদল চিন্তাশীলকে এই দিকে নির্দেশিত করতে পেরেছিলেন, শ্রীসেনগুপ্ত সেই অনুপ্রাণিত শ্রমদাতাদের একটি তালিকা দিয়েছেন (পৃঃ-২৯)।

তৃতীয়, শরৎচন্দ্র মিত্র, যিনি গ্রন্থাকারে এখনো অসঙ্কলিত এবং মাত্র দুটি ছাড়া যাঁর সাড়ে চার শতেরও বেশি নিবন্ধ ইংরেজিতে রচিত বলে যিনি বাঙালি পাঠকের কাছে তেমনি পরিচিত নন।

কিন্তু শরৎচন্দ্র লোকবৃত্তের বিজ্ঞানসম্মত পর্যালোচনার সূত্রপাত করেছিলেন। আলোচ্য গ্রন্থকার লিখেছেন, "He made an invaluable contribution towards the assessmeut of folk-traditions their social and cultural implications and opened up a new vista for socio-cultural and anthropological study.

অতঃপর সেই নিরলস শ্রুতকীর্তি দীনেশচন্দ্র সেন, বাঙলাবিদ্যায় সামান্য পরিচিতদের কাছেও যাঁর কোন পরিচয় অজ্ঞাত থাকবার কথা নয়। দীনেশচন্দ্র বাঙলাদেশের পুরোনো ঐতিহ্য এবং বাঙলা ভাষায় পুরোনো সম্পদগুলিকে জগৎসমক্ষে উপস্থাপন করেছিলেন। ঐ উপকরণ সংগ্রহের জন্য তিনি ব্যক্তিগত উদ্যমের পাশে সম্মিলিত যৌথ উদ্যোগের প্রযোজনা করেছিলেন। সর্বসাধারণের সামনে লোকসংস্কৃতি ও লোক সাহিত্যের সম্মানিত পদবীও তিনিই রচনা করেছেন।

কেদারনাথ মজুমদার ও চন্দ্রকুমার দে, এই বইয়ের অন্ত্য আলোচনা দুটি যে দুজন পরিশ্রমী ও নিষ্ঠিত উপাদান সংগ্রহকের আলোচনা, তারাও কোনো না কোনো সূত্রে দীনেশচন্দ্রের সঙ্গ সম্পর্কিত ছিলেন। চন্দ্রকুমার মৈমনসিংহ গীতিকা নামে সুখ্যাত ও স্মরণীয় গীতিকা বিস্মৃতির গভ থেকে উদ্ধার করেন, কেদারনাথ তাঁর সম্পাদিত সৌরভ-এ তা প্রকাশ করেন, এবং সেই প্রকাশ দীনেশচন্দ্র সেনের চোখে পড়ে। দীনেশচন্দ্র পূর্ববঙ্গের অন্যান্য অঞ্চল থেকে ব্যাপকভাবে অনুরূপ লুপ্তরত্নোদ্ধারে মনোযোগী হয়ে ওঠেন। কেদারনাথের বিশেষ প্রতিভা ছিল ইতিহাস ও ঐতিহ্যের উপকরণ সংগ্রহ, আর ছিল যোগ্য কর্মী নির্বাচনে। আলোচ্য গ্রন্থকার জানিয়েছেন, 'he did a commendable work by enconraging people for collecting for literature and history of Bengal." আর চন্দ্রকুমার দে লিখেছিলেন, "সৌরভ সম্পাদক কেদারনাথ মজুমদার আমার ।"

চন্দ্রকুমার ছিলেন বিনীত শ্রমদাতা, কিন্তু অবিস্মরণীয়। বলেছি, দীনেশচন্দ্র সেনই তাঁর সংগ্রাহকে মহার্ঘ বলে সম্মানিত করে তোলেন। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার সংগৃহীত রূপকথাও দীনেশচন্দ্রেরই মূল্যবান পক্ষপাতে মহার্ঘ্য হয়ে ওঠে। তাঁরই অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ 'ঠাকুরমার ঝুলি'র ভূমিকা লিখে দেন। দক্ষিণারঞ্জন রূপকথার কথক হিসেবে অচিরে শিশুসাহিত্যের একচ্ছত্র সম্রাট হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু তাঁর কীর্তি আরো প্রসারিত, অন্তত আলোচ্য গ্রন্থকারের এই সিদ্ধান্ত, '(he) introduced folk style of writing' বড় হরফে লিখে রাখা যায়।

গুরুসদয় দত্ত ছিলেন ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের সদস্য, এবং ব্রতচারী আন্দোলনের পুরোধা। ব্রতচারীদের জন্য যে নৃত্য ও গীত তাঁকে প্রযোজনা করতে হয়েছিল তার আঙ্গিকে লোকশিল্পের বিশেষ উপস্থিতি আছে। এছাড়া তাঁর আগ্রহ ছিল বিলীয়মান পটুয়া জাতির প্রতি এবং অজস্র পটচিত্র বাঙালা লোকশিল্পের মর্যাদা বাড়িয়েছে। গ্রন্থকারের ভাষায়: He has reclaimed folk dance and music forms from a wasting state and disseminated the same among the educated people rousing their interest. His mission speaks for his Catholic interest in folk culture.

উপর্যুক্তদের অনেককেই গ্রন্থকার কঠোর বিচারে folktorist বলতে দ্বিধা করেছেন। প্রসঙ্গত

folklore-এর সীমা ও শাসন নিয়েও তিনি নানা যুক্তির অবতারণা করেছেন। ইংরেজি ভাষায় লেখার কারণে কোনো পরিভাষার বিড়ম্বনায় তাঁকে বিব্রত হতে হয় নি বটে, কিন্তু কোনো খানে পরিভাষার প্রশ্নটিকেও তাঁকে অধিকার দিতে হয়েছে। অবশ্য কতিপয় পারিভাষিক শব্দের নাম-মাত্র তিনি করেছেন, সম্ভবত তৃপ্ত হন নি, কিন্তু তা নিয়ে কোনো আলোচনাও করেন নি।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য লোকসাহিত্য-কথাটি উচ্চারণ করেছিলেন, এবং তখনো folklore-এর অভিধা থেকে তিনি খুব একটা দূরে সরে যান নি, যেহেতু folklore প্রধানত বাক্-রক্ষণা, মনুষ্যমুখনিঃসৃত শতাব্দীবাহী শব্দগত উত্তরাধিকার : oral tradition. শব্দটির প্রভাব-প্রতিপত্তিও অনেকদিন ধরে ছিল। আসলে folklore শব্দটিরই অর্থসঙ্কোচবশত টিউটনিক দেশগুলি volkskunde নামে ব্যাপকার্থবহ জর্মন শব্দটির প্রতি পক্ষপাত দেখিয়েছিল। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যে লোকযান শব্দটি ব্যবহার করেছেন, সমগ্র লোকজীবনের পংক্রম এবং ধর্মাদর্শের কথা ভেবে সীমাটিকে সেখানে আরো প্রসারিত লাগে বটে, কিন্তু সেখানেও সম্ভবত সমগ্র বিষয়টি বিধৃত হয় নি। আমরা খুব অতৃপ্তভাবে লোকবৃত্ত-শব্দটি বসিয়েছি, কিন্তু এর মধ্যে material ও non-material উভয়জাতীয় লোকসংস্কৃতিই আমাদের অভিপ্রেত। শ্রীসেনগুপ্তেরও অভিপ্রায়ও আমাদেরই মতো ব্যাপক। কিন্তু material culture এর উপকরণ-আহরণ যা প্রধানত নৃতত্ত্ব বা সমাজঘটিত নৃতত্ত্বের অন্বিষ্ট, তা যে আরো আধুনিক সময়ের উপার্জন সেই সত্য তাঁর কাছে আদৌ অসচ্ছ নয়। অথচ সেই সহযোগ বাদ দিয়ে কোনোক্রমেই পূর্ণতাকে স্বীকার করা তাঁর পক্ষে অস্বস্তিকর। তিনি যে শরৎচন্দ্র মিত্র সম্পর্কেই শেষপর্যন্ত অকুণ্ঠভাবে বলতে পেরেছেন, 'he along with a few, *laid the foundation for study of folklore in Bengal,*' তার কারণ কোনো সূত্রেই অস্পষ্ট নয়, তার কারণ পরবর্তী বাক্যেই সম্ভবত বিশদীকৃত : He made an invaluable contribution towords the assesment as of folktraditions, their social and cultural implications and opned up a new vista for social-cultural and anthropolorical study.

শ্রীশঙ্কর সেনগুপ্তও তাঁর এই প্রথম খণ্ডে আটজন লোকবৃত্ত-কর্মীর জীবন ও কৃত্য লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রতিটি রচনার জন্যই তিনি প্রভূত তথ্য সংগ্রহ করেছেন। প্রতিটি রচনার মধ্যেই তাঁর ঈর্ষণীয় শ্রম সঙ্কলিত আছে। তাঁর রচনায় আপতিক ডিসিপ্লিনও বেশ স্পষ্ট। অবশ্য তাঁর লেখায় শ্রম যে পরিমাণে প্রকট, শৈলী ততখানি উৎকৃষ্ট নয়। প্রতিপত্তিশীল অথরিটির প্রতি নিরবশেষ শ্রদ্ধাবশত তার রচনায় একধরনের দুর্বলতাও এসেছে। তাঁর রচনায় একধরণের দৃষ্টিকটু পণ্ডিতম্মন্যতাও আছে। উদাহরণত একটি ছোট দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা যায়। মানসী-পর্বে রবীন্দ্রনাথের জীবনবোধ যে অপূর্ণ ছিল সেকথা বলার জন্য গ্রন্থকারকে Archiv Orientalani Praha, No. 3. 1958 কে সাক্ষ্য মানতে হয়েছে। এরকম উদাহরণ খুব অল্প নয়।

এই গ্রন্থটির জন্য লেখকের স্বলিখিত একটি বাদে শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীঅশোক মিত্রের আরো দুটি ভূমিকা সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। শ্রীঅশোক মিত্রের রচনাটি সুলিখিত এবং এই বইয়ের পক্ষে একটি অপরিহার্য পূর্বাধ্যায়। আমরা আগে লিখেছি, তাঁর ঐ রচনায় ভারতীয় লোকবৃত্তচর্চার আদিম-বৃত্তটিও সংক্ষেপে লিখিত হয়েছে। শুধু তিনি একজায়গায় যে লিখেছেন সিস্টার নিবেদিতা

Cradle Tales of Hinduism রবীন্দ্রনাথকে লোকবৃত্ত-প্রসঙ্গ অনুপ্রাণিত করেছিল, সেখানে একটু কালাতিক্রম-দোষ আছে বলে মনে হয়। যদিও ১৯০৭-এ প্রকাশনার আগেই ঐ বইয়ের প্রস্তুতি হয়েছিল, তথাপি রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেভুলোনো ছড়া'র প্রকাশকাল (১৮৯৪ খ্রী:) তারও বেশ কিছুটা আগেই। আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়েছি এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অনুরাগ পরিষৎ-পত্রিকার এই নিবন্ধে'আরো পূর্ববর্তী, শ্রীসোমেন বসু এই বইয়ের জন্য যে রবীন্দ্ররচনাপঞ্জী প্রস্তুত করে দিয়েছেন, সেখানেও এই তথ্য সঙ্কলিত রয়েছে।

কিন্তু সেকথা যাক। এই বইয়ের ছোটখাটো একটু-আধটু দোষ-ত্রুটি কিংবা মুদ্রাকরপ্রমাদ অনায়াসেই বিস্মৃত হওয়া চলে। এই বইয়ের যে উজ্জ্বল দিকগুলি আছে তার পাশে ঐ ত্রুটিকে আমল না দিলে চলে। শ্রীশঙ্কর সেনগুপ্ত প্রভূত নিষ্ঠা ও শ্রমসহকারে যে কৃত্যের সূত্রপাত করেছেন সহস্র বাধা অস্বীকার করে তিনি তাকে পূর্ণ করে তুলবেন, তাঁর কাছে আমাদের এই প্রত্যাশা। তাঁর পরবর্তী খণ্ড আরো দোষ-মুক্ত গুণযুক্ত এবংসর্বতো সার্থক হয়ে উঠবে বলে আমরা আশা করি।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

গুরু নানক ॥ শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, বি. এল ॥ দি শিখ কালচারাল সেণ্টার, ১ লিণ্ডসে স্ট্রীট, কলকাতা-১৬। এক টাকা ॥

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্তী বিরচিত আলোচ্য গ্রন্থখানি মহাপুরুষ নানকের জীবন-কাহিনী। গ্রন্থটি আদ্যোপান্ত সুললিত পদ্যে ছন্দোবদ্ধ। শিখ সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু প্রাতঃস্মরণীয় নানকের স্মরণীয় জীবন-কাহিনীমালাকে গ্রন্থকার আলোচ্যগ্রন্থে বিবৃত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। মহাপুরুষ নানকের অমৃতময় উপদেশাবলী পাঠে লেখক অনির্বচনীয় আনন্দলাভ করেছেন এবং তারই প্রেরণায় তিনি নানকের জীবন ও বাণী সরল কবিতায় বঙ্গজনের মধ্যে বিতরণের উদ্দেশ্যে বর্তমান গ্রন্থ রচনায় উৎসাহিত হয়েছেন।

'গুরু নানক' আখ্যায়িকার প্রকাশভঙ্গী সরল এবং সাধারণ পাঠকের ভালো লাগবার মতো। মূলত পয়ারের চালেই তিনি তাঁর বক্তব্যকে প্রকাশ করছেন :

'নদী গেছে এঁকে বেঁকে, তটে কে দিয়েছে এঁকে
ঘনচ্ছায় ক্ষুদ্র পল্লীখানি।
ক্ষত্রি বংশ আলো করে, আজি এ জন্মেছে কেরে,
শিশু এক স্বরগের মণি।' ইত্যাদি

গুরু নানকের জীবন-কাহিনী বিবৃত করতে গিয়ে প্রারম্ভে লেখক নিবেদন করেছেন, 'ইহাতে

অনেক অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ আছে সত্য ; কিন্তু কোনটিই লেখকের কল্পনাপ্রসূত নহে। জড়বাদী ও ঐতিহাসিকের চক্ষে যাহা অতি মানুষিক ও অসম্ভব কে বলিতে পারে যে সেগুলি অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক জগতের চিরন্তন সত্য নহে ?' আধুনিক যুগেও অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক জগৎ সম্পর্কে আগ্রহী ধর্মোৎসাহী ব্যক্তির সংখ্যা একেবারে স্বল্প নয় ; তাঁরা নিঃসন্দেহে এই গ্রন্থ পাঠে তৃপ্তি পাবেন।

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

নিয়মাবলী

সমকালীন

প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

'সমকালীন' প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয় (ইংরেজী মাসের ১লা তারিখে)। বৈশাখ থেকে বর্ষারম্ভ। প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা, সডাক বার্ষিক ছয় টাকা। পত্রের উত্তরের জন্য উপযুক্ত ডাক টিকিট বা রিপ্লাই-কার্ড পাঠাবেন।

'সমকালীনে' প্রকাশার্থ প্রেরিত রচনাদি নকল রেখে পাঠাবেন। রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার। ঠিকানা লেখা ও ডাকটিকিট দেওয়া লেফাফা থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়। দর্শন, শিল্প, সাহিত্য ও সমাজ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধই বাঞ্ছনীয়। **গল্প ও কবিতা পাঠবেন না**—'সমকালীন' প্রবন্ধের পত্রিকা।

'সমকালীনে'র গ্রন্থপরিচয় প্রসঙ্গে, রসিক সমালোচকদের দ্বারা **শিল্প, দর্শন, সমাজ-বিজ্ঞান** ও **সাহিত্য সংক্রান্ত গ্রন্থ** ও **কাব্য গ্রন্থের** বিস্তারিত নিরপেক্ষ আলোচনা করা হয়। দুখানি করে পুস্তক প্রেরিতব্য।

সমকালীন ॥ ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩
এই ঠিকানায় যাবতীয় চিঠিপত্র প্রেরিতব্য ॥ ফোন : ২৩-৫১৫৫

Regd. No. C-315 Phone: 23-5155 January'66 (0.50) Central Regd. No. R.N.2602/57 SAMAKALIN

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল

সমকালীন

ত্রয়োদশ বর্ষ ॥ মাঘ ১৩৭২

পশ্চিমবংগ সরকারের প্রকাশন

দেশের গান

০·৫০

জাতি-গঠনে খাদ্য

ডাঃ হরগোপাল বিশ্বাস

০·৫০

জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী (বাংলা বিভাগ)

(ক) জানুয়ারী—মার্চ ; ১৯৬৪ (খ) এপ্রিল—জুন, ১৯৬৪

(গ) জুলাই—সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪

প্রতি খণ্ড : ২·০০

—প্রাপ্তিস্থান—

নগদ মূল্যে বিক্রয়-কেন্দ্র
প্রকাশন বিক্রয় কেন্দ্র,
নিউ সেক্রেটারিয়েট,
১, কিরণশংকর রায় রোড,
কলিকাতা—১

ডাকযোগে অর্ডার পাঠাবার ঠিকানা
পশ্চিমবংগ সরকারী মুদ্রণ,
প্রকাশন-শাখা,
৩৮, গোপালনগর রোড,
কলিকাতা—২৭

ডব্লিউ. বি. (আই এণ্ড পি.আর) এ. ডি-ভি ১১৫

সাধনা দশন নিয়মিত ব্যবহার করিলে কোন দন্তরোগের ভয় থাকে না। দন্তরাজী সুস্থ, সবল ও সুন্দর হয়।

দেশীয় গাছ্‌গাছড়া হইতে ইহা প্রস্তুত হয়।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর, কলিকাতা-৪৮

EYE APPEAL STIMULATES CUSTOMER PREFERENCE

An attractive package is a strong selling argument. Whatever the package design, the surface and the quality of paper makes the difference. Rohtas Chromo paper and boards have the smooth surface and superior gloss which gives that attractiveness to the package.

ত্রয়োদশ বর্ষ ১০ম সংখ্যা

মাঘ তেরশ' বাহাত্তর

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

বাঙলার মৃৎশিল্প

কমলকুমার মজুমদার

রূপ

ঘট : কলিকাপুর তমলুক অঞ্চলে লক্ষ্মীর ঘটগুলি হয় তাহা সত্যই অত্যন্ত অদ্ভুত, এইরূপ ঘট পুরাতন দিনে বহুস্থানে হইত, বিশেষত প্রতীচ্যদেশে ইহার অনুরূপ আকৃতি চিত্র আমরা দেখিয়াছি। ঘটটি একটি মদ্য (wine) কাপের মত এবং তাহার কাণার উপরে একটি সুস্পষ্ট মুখমণ্ডল, দেখিলেই অনুমান করা যায় ইহা নারী বা দেবীমূর্তি, আকর্ণবিস্তৃত চক্ষুদ্বয়, এই চক্ষুদ্বয় বাঁশের কলম দিয়া কাঁচা অবস্থায় গভীর করিয়া রেখা দেওয়া উৎকীর্ণ করা উপরে ত্রিকোণ মুকুট। ঠিক এই ধরনের লক্ষ্মীমূর্তি মেদিনীপুরের পিতলের কাজে দেখা যায়, তবে তাহার ঘট বা পাত্র কোথাও কাঁথি মহকুমার ঘড়ার মত, ঘাটাল রামজীবনপুরে সঠিক vase-এর মত। বর্তমান মূর্তিগুলি চাকে গড়ন করা তাই বসানের চানকা দেওয়া আছে। এই লক্ষ্মীমূর্তি কোতলপুর থানার জয়রামবাটির ৺শ্রীশ্রীমার মন্দির নিকট ৺সিংহবাহিনীর মূর্তিও এই রূপের কিন্তু ইহা লক্ষ্মীমূর্তি নহে। দেবী মূর্তিটি প্রায় তিন ফুট উচ্চ পার্শ্ব মূর্তি দুইটি এক হাতের মত। এই অনুরূপ মূর্তি ঢোকরা কামাররাও করিয়া থাকে। কেনদার মুখগুলি বড় হয়। লক্ষ্মীঘট কড়া বনক দেওয়া এবং বিশেষ ভালভাবে পোড়ান, কারণ ইহা সহজে ভাঙিয়া যায় না। ইহাতে ধান্য রক্ষিত করিয়া পাটে বসান হয়। অন্যান্য মঙ্গলঘট খুব সাধারণ ধরনের হইয়া থাকে, একমাত্র বাঁকুড়া মঙ্গলঘটের আকারটি সুন্দর তাহার কারণ সম্ভবত, স্বকীয় ভাব পূর্বে হয়ত ইহার উপরে বসান হইত না, বট বা অশ্র পল্লবই স্থাপনা করা হইত। এই ঘটের উপর অর্ধেক মাছের বনকের প্রলেপ দেওয়া এবং তাহার উপর কলম দিয়া আঁচড় দেওয়া, এই আঁচড়ের ফলে ইহাতে একটি অদ্ভুত চৌকা প্যাটার্ন হইয়াছে।

ঘটবারি : ইহা আর একটি বহু পুরাতন রূপ ইহা প্রায় ৭"×৩" dia, দেখিতে অবিকল মগ্ন 'কাপ'-এর মত এবং কাপের গায়ে বিস্ময় নিপট নাগ রূপ, কোথাও এক বা তিন, কোথাও পাঁচ, কোথাও সাত। ইহা প্রথমে চাক হইতেই গড়ন করা হয় এবং সাধারণত ধোঁয়া লাগাইয়া কালো করিয়া পোড়ান হইয়া থাকে। বাঁকুড়া জিলা এবং গড়বেতা অঞ্চলে ইহার খুবই প্রচার বর্তমান। ইহাই উক্ত স্থানসমূহের মনসার ঘট। অন্যান্য জিলায় ঠিক এইরূপ ঘটের প্রচলন নাই বলিলেই হয় এবং এই সূত্রে পূর্ববঙ্গীয় মনসার ঘটের কথা বলা যাইতে পারে, এই ঘটও চাকে তৈয়ারী হাতের কেয়ারীতে অদ্ভুতভাবে ডবল ফুলা হইয়া উঠে এবং ইহার গাত্রে অসম্ভব সুন্দর এক দেবীমূর্তি ইনি ৺মা মনসা। মা মনসার আয়ত নয়নের রেখা সত্যই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঘট বা vase জাতীয় জমির উপর অঙ্কন কৌশল অত্যন্ত চাতুর্যপূর্ণ, ইহা কখনই সম্মুখবর্তি functional বস্তুটি ভুলিতে দেয় না তথা পাত্রের সহিত এক হইয়া মিলিয়া থাকে। ঘট বা পাত্রই অত্যন্ত সুন্দর হইয়া আমাদের সকলের চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া ওঠে। পূর্ববঙ্গীয় রেখাসজ্জা এই ঘটে এক অপূর্ব রূপ ধারণ করিয়াছে।

সরা খোলা : সরার উপর চিত্র অঙ্কন ও প্রাচীন খোলার উপর চিত্রাঙ্কন আমরা চিত্রাঙ্কন সূত্রে আলোচনা করিব।

বিবাহের হাড়ী : বাঁকুড়ার বিবাহের মণ্ডা লইয়া যাইবার বা সাধারণ তত্ত্ব পাঠাইবার হাড়ী অপূর্ব, অবশ্য হাড়ীর আকারের জন্য নহে ; ইহার আকার সাধারণ ভাত রন্ধনের হাড়ীর মত নহে, হাড়ীর মুখ ছোট প্রায় ৭" dia. উচ্চতা ১৮" মধ্যের dia প্রায় ১২" কানার তলায় প্রায় ইঞ্চি চারেক চওড়ায় মাঝের বনকের সাদা slip দেওয়া এবং তাহার মধ্যে নানারূপ কলমের আঁচড়। কলমের আঁচড়ে অনেকগুলি প্যালেন বা খোপ বিভক্ত করিয়া তাহার মধ্যে মাঙ্গলিক চিহ্নসকল উৎকীর্ণ করা। প্রথমেই সুন্দর একটি মীন এবং বক্র দ্রুত স্রোতচিহ্ন তাহার পরে কুসুম দাম তাহার পর শ্রীমীনরূপ ও ও স্রোত ও তাহার পর বৃক্ষচিহ্ন। এবং ইহার পর পদ্ম। ইহার দাম ২০/ সেরা ১॥০, ১৫/ সেরা ১।০। এই সূত্রে বারওয়ান ভরতপুর থানার (কান্দী মহকুমা) কুলে সরা উল্লেখযোগ্য। ইহার মাপ প্রায় ১৪" উচ্চতা ৭"।৮" ইঞ্চি মুখ ১২" প্রায় মধ্য হইতে তলদেশ পর্যন্ত ক্রমে গোল হইয়া গিয়াছে। এই চিত্রিত হাড়ী সাধারণত অন্য কোথাও দেখা যায় না। কানা হইতে মধ্য পর্যন্ত প্রায় ৪"।৫" চওড়া স্থানে তিন চারিখানি সুন্দর বিবাহের দৃশ্য থাকে। সম্প্রদান, পাল্কী, বধূবরণ সত্যই এগুলি তুলি রঙ composition-এর অপূর্ব নিদর্শন। বলিষ্ঠ পাল্কী বাহকের রেখা অথবা পার্শ্ববর্তি পত্রচিত্রণ রমণীর মুখমণ্ডল সকল কিছু মিলিয়া সুন্দর স্মৃতিকে চিরস্থায়ী করিয়া রাখিয়াছে। ইহার দাম ২৲ টাকা। এই হাঁড়ী উক্ত মহকুমায় প্রচুর বিক্রয় হইয়া থাকে।

পুতুল : আমরা সাধারণ পুতুলকে মোটামুটি হাতে গড়া ও ছাচে গড়া হিসাবে ভাগ করিতে পারি। তাহার পর তাহাকে আরও বিশেষরূপে তিন ভাগে বিভক্ত করিতে পারি। প্রথম, আদিম আকৃতির বা আঙুলে গড়া পুতুল (আঙুলে পুতুল নহে) অর্থাৎ আঙুল এবং শুধু পোড়া মাটির পুতুল। দ্বিতীয় বর্তমানবৎ বা (naturalistic)। তৃতীয় চিত্র অঙ্কনবৎ।

আঙুলে পুতুল। ছোট ছোট হইয়া থাকে, প্রায় আঙুলের মতই মোটা এবং লম্বা এগুলি

সাধারণ পুতুল খেলার জন্য তৈয়ারী হয়। আঙুলের চাপে করা হয় ইহার রূপটি অত্যন্ত আদিম ইহা কৌশাম্বী অথবা যে কোন পুরাতত্বের স্থানেই মিলিতে পারে, ইহার সেগুলি কিঞ্চিৎ বড় অর্থাৎ মোটা সেগুলিতে কলমের আঁচড় থাকে এবং ফুটা ফুট দাগ দ্বারা অলঙ্কৃত করা থাকে। কখন শুধু মাত্র গেরিমাটি বা বনক মাটির প্রলেপ দেওয়াও হয় যেগুলি বিষ্ণুপুর ও বাঁকুড়ার সেগুলি বেশ যত্ন সহকারে তৈয়ারী করা, শান্তিপুর বা পূর্ব অঞ্চলের মত নহে। লক্ষ্য করিলে আমরা দেখিব উহাতে ভাব ব্যঞ্জনাও আছে, অবশ্য ভাব ব্যঞ্জনা চক্ষু থাকিলেই কোন না কোন ভাব মানিয়া লওয়া হয় যথা খড়্গের চক্ষু অতীব রক্তিম, নৌকার চক্ষু কুমীরের চক্ষুর মত ধূর্ত। তবু আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি এই ক্ষুদ্রাকৃতি পুতুলটির মধ্যে বিরাটত্বের আদি দৈবিক লক্ষণ আছে।

ইহার পর আসে পোড়া মাটির পুতুল "মাতৃ" মাতৃমূর্ত্তি নানান আকৃতির হইয়া থাকে। পাঁচমুড়া সোনামুখীর মাতৃমূর্ত্তি ইহাদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য। সোনামুখীর পুতুলগুলি লাল slip দেওয়া, পাঁচমুড়ায় প্রায় কৃষ্ণ বর্ণের হয়। সাধারণত ইহা ছাঁচজাত, ছাচের পর পুতুলগুলিতে, কিছু কিছু কারিকুরি চাঁচার কাজ করা হইয়া থাকে, এবং কলস আঁচড় দেওয়া হয়। সোনামুখীর নিরঞ্জনের ছাঁচ অপূর্ব, তাহার মুখগুলি গর্ব্বিত, চক্ষুদ্বয় ভাবময়। চুলে দম্ভিক রেখায় সতরঞ্চ করা বাহুদ্বয় সত্যই দুঃসাহসী ঃ বাহুর মধ্যে সন্তান। এই পুতুলগুলির পিছনে ঠেকো বা Rest আছে যাহাতে দাঁড়াইতে পারে। পাঁচমুড়ার পুতুলগুলি সুন্দর পাঁচ বা সাত ছেলের মা কোলে সন্তানদের সাজানোর ভঙ্গী অপূর্ব কাহারও ছাঁচে দেখা যায় টুপি মত (Bonnet) আছে। বিষ্ণুপুরে এবং সোনামুখী রাজগাঁর পুতুলের মাথায় Bonnet আছে এগুলি সত্যই সত্যই সৌখীন। বিশেষত বিষ্ণুপুরের পুতুলের রঙ অসম্ভব চতুর; ইহাতে সেই বিড়য়া টানা পুলের নিকটে যে মাটি পাওয়া যায় তাহার প্রলেপ দেওয়া। ফলে তাহাতে মনোরম গোলাপী রঙ ধরিয়াছে। এই সূত্রে সোনামুখীর পা ছড়ান পুতুলের কথা উল্লেখ করিতে হয়, পুতুলটির গায়ে কৃষ্ণ কমলালেবু রঙ ইহা গেরিমাটি বা Red hematite এর জন্যেই সম্ভব হইয়াছে উপরন্তু ইহাতে জৌলষ বর্ত্তমান। শুধু মাত্র একটি ভাবের উপর এই পুতুলটি থামিয়া নাই।

এই প্রসঙ্গে হুগলী জিলা হাওড়া ও ২৪ পরগণার, কলসী কাঁখে পুতুলের কথা উল্লেখ করিতে হয়। যাহাকে Folk art Connoi ssear বা মাতৃমূর্ত্তি বলিয়া ভুল করেন। কলস কাঁখে কুলবধূ বাঙলার একটি বড়ই প্রিয় ও পুরাতন বিষয়বস্তু, ইদানীং বহু চিত্রকরই এই বিষয়বস্তুকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। এই রূপটি মাটির সাদামাটা রূপের মধ্যে বেশ ভালভাবেই ধরা পড়িয়াছে, যাহাদের গ্রামাঞ্চলে যাতায়াত নাই তাহারা এই রূপটি ঠিক কখনকার তাহা বুঝিতে বা ধরিতে সক্ষম হইবে না। আমাদের যতদূর ধারণা, এই রূপ ঘাটের পথে বা ঘাট প্রত্যাগত পথে যখন পরপুরুষ দর্শনে জড়সড় হইয়া দাঁড়ায় এবং সন্ধ্যার আলোটি পিতল বা মাটির জল সিক্ত কলস প্রতিবিম্বিত হইয়া তির্য্যক গতিতে তাহার মুখমণ্ডলে লাগিয়া তাহাকে ধরাইয়া দিবার চেষ্টা করে ইহা সেই ক্ষণকালীন রূপ বটে। তাহার ভীরুতা ওতঃপ্রোত। ইহা সত্যই আমাদের কল্পনা বিলাস বা সমালোচনা মুখরতা নহে, ইহা বাস্তবিক।

ইহার পর অধুনা প্রসিদ্ধ চৌরীগাছার কাটালিয়া গ্রামের স্ত্রীলোকদিগের কাজ। এই সকল

কাজের নিদর্শন যেহেতু বোলপুরের মেলায় বিক্রয় হইয়া থাকে, সেইহেতু বহু সমালোচকের ধারণা উহা বীরভূমের কাজ এমনকি আশুতোষ মিউজিয়মে বীরভূম বলিয়া লেখা রহিয়াছে। কিন্তু কাটালিয়া বোলপুরের নিকট বা বীরভূমের অন্তর্গত নহে। এই গ্রাম মুর্শিদাবাদ জিলার বহরমপুর সদর থানা এলাকা গঙ্গার পশ্চিম তীরে, চৌরীগাছা ষ্টেশন হইতে প্রায় ১।।-২ মাইল উত্তরে অবস্থিত। গ্রামটির উত্তর প্রান্তেই কুমোরদের বসতি। গ্রামের সম্মুখে কয়েকটি টালির (pan tile) কারখানা বর্তমান। লোকে এখনও চাকে জিনিসপত্র প্রস্তুত করিয়া থাকে। এই সকল কুমোর বাড়ীর স্ত্রীলোকরাই অবসর সময়, এই সকল পুতুল গড়িয়া থাকে! সর্বসমেত ৫।৬টি বিষয়বস্তু বর্তমান। প্রথম উকুনবাছুনী, গমপিশানী, গোয়ালিনী, হাতী-সোয়ার ,ঘোড়-সোওয়ার। ইহাদের মধ্যে উকুন বাছুনীটি সর্বশ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে। আঙুলের দক্ষতা কি পরিমাণে উৎকর্ষ লাভ করিলে এরূপ কাজ বাহির হয় তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। যে স্ত্রীলোকটি সম্মুখভাগে বসিয়া আছে তাহার কোলে সন্তান, সে স্তন্যদান করিতেছে এবং উকুনবাছুনী অত্যন্ত সতর্কভাবে উকুন বাছিয়া চলিয়াছে। এই দৃশ্য গ্রামাঞ্চলের দরিদ্রগৃহের নিত্যকার ঘটনা। প্রায় দেখা যাইবে একজন রমণী অন্যের উকুন বাছিয়া দিতেছে। বিষয়বস্তুটি সত্যই কৌতুকপ্রদ। সেই কৌতুকটিকে এই ৫″×৬″×৩″র মধ্যে গভীরভাবে আনিয়া ফেলা যে কি বিস্ময়কর ব্যাপার তাহা দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। ইহার আঙ্গিক অত্যন্ত নূতন, মনে হয় কয়েকটি দুরন্ত রেখায় সমস্ত বাস্তবতা এবং দু'জন রমণীর মনোভাব অনায়াসে আনিয়া দিয়াছে! দেহ ও পাটাতনে খড়ি অভ্র দেওয়া এবং অলঙ্কার হিসাবে হাতে দুই একটি দ্রুত টান সমস্ত কাজের সহিত মিলিয়া গিয়াছে। তুলির ঘন মোটা টান (শুধু মাত্র সাদা গাত্রের উপর) মাটির এই ধরনের কাজের সহিত এরূপ মিলিতে দেখিয়া আমরা অবাক হইয়া যাই। কাজটি শুধু মাত্র মাটির তৈয়ারী এই কথাই বলা যায়, কিন্তু মাটির মধ্যে কখনও মনে হয় কাঠ বা কখন মনে হয় পাথরের চরিত্র নামিয়া আসিয়াছে এবং বস্তুর চরিত্র ও বিষয় মিলিয়া একটি অভিনব ভাবের সৃষ্টি করিয়াছে। ঠিক এই কাজের অনুরূপ গম পিশানীর আলেখ্য, ইহার সমস্ত সজ্জা অত্যন্ত দাম্ভিক শিল্পরুচির পরিচায়ক, এখানে স্বাভাবিক ব্যালেন্সের জন্য জাঁতার দণ্ডটি অনেক উচ্চে উঠিয়া গিয়াছে, সাধারণভাবে চিত্রগত করা হইলে এই স্বাধীনতা লওয়া কোনক্রমেই সম্ভব হইত না। ইহার গমের বাটির মাপ ও তৌলত্বের সাক্ষাৎ ভারসাম্য হিসাবে খাড়া রহিয়াছে এবং সর্বপরি গমপিশানীর ভাবও লক্ষ্যণীয়। গোল পাটাতনটির উপর বসিয়া সগর্বে গৃহকর্ম করিয়া চলিয়াছে। গোয়ালিনীটি বড় মধুর ইহা প্রায় ৬″ লম্বা, একটি তন্বী ছিপ ছিপে গোয়ালিনীর রূপ। ইহারা ইচ্ছা করিলে হয়তো সমস্ত কিছুকে ছাঁচে করিয়া বাজারে পাঠাইতে পারিত। কিন্তু না করিয়া আপনার অঙ্গুলির মধ্যে সকল রসটি রাখিয়া দিয়াছে। হাতী-সোয়ার ও ঘোড়া সম্পর্কে আমাদের ঐ একই মন্তব্য। কয়েক মাইলের মধ্যে খাগড়া এবং কিছু দক্ষিণে নবদ্বীপ ও কৃষ্ণনগর, প্রথমোক্ত স্থানে হাতীর দাঁতের অতি সূক্ষ্ম কাজ, শেষোক্ত দুইটিতে একেবারে নূতন ও স্বাভাবিক ধরনের কাজ হইয়া থাকে, এইসকল স্থানের এত নিকটবর্তী থাকিয়াও ইহাদের কাজ অদ্যাবধি কিভাবে এইরূপ রহিয়া গেল তাহা বিস্ময়কর। নূতনত্ব কাটালিয়ার রমণীদের কোনরূপ মতিভ্রান্ত করিতে পারে নাই। এই পুতুলগুলি,

বোলপুরের মেলা, নগরের মেলা কান্দীশহরে, এবং নিকটবর্তী মেলা সমূহে বিক্রয় হইয়া থাকে।

আঙুলে গড়া পুতুলের পর আসে কৃষ্ণনগরের ধরনের পুতুল। ইহার বয়স খুব বেশীদিন নহে। ইহা সম্ভবত হাতীর-দাঁতের কাজ ও পশ্চিম অঞ্চলের প্রভাবে এখানে প্রচলন হইয়া থাকিবে। ইহার কাজগুলি খুব নাটকীয় এবং বর্তমানবৎ সাধারণ জীবনযাত্রার যাবতীয় বহুরূপের কর্মরত লোক ইত্যাদি ইহার বিষয়বস্তু। ইহাতে প্রায়ই কাপড় পরান এবং মাথার চুল ইত্যাদি দেওয়া থাকে ইহাদের চেষ্টা কিভাবে সমস্ত বিষয়টিকে ফোটগ্রাফের মত করিয়া তুলিব। ইহাদের রঙের ব্যবহার অত্যন্ত ন্যাচারাল (হুবহু)। ইহারা অর্থাৎ কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীরা খুব বেশীস্থানে না হইলেও কয়েক স্থানে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। যথা—কলিবাতা ও তাহার আশপাশ অঞ্চল। সর্বোপরি আশ্চর্যের বিষয় হইল এই যে যাহারা এইরূপ পুতুল গড়ে অন্যপক্ষে শাস্ত্রীয় প্রতিমা ব্যাপারে পট লিখনে সর্বরূপে এই বর্তমানবৎ শিল্পের বিপরীত। অবশ্য ইদানীং কিছু কিছু লোক শুধু মাত্র এই পুতুলই করিয়া থাকে এবং অন্যপক্ষ প্রতিমূর্তি, প্রতিমা ও পুতুল গড়ে। যাহা হউক এই পট লিখনে বা প্রতিমা গড়িতে সাবেকরীতি অনুসরণ করিতে কখনই অবহেলা করে না। ইদানীং বারোয়ারী ঠাকুর বাড়িতে যদিও শাস্ত্রের প্রয়োজন হয় না, কিন্তু বড় বড় গৃহস্থের বাড়ী পুরুষানুক্রমে যে পূজা হয় তাহাতে কোনক্রমে রীতি বিরুদ্ধ হইবার উপায় নাই।

ইহার পর আমরা ধরিতে পারি যে পুতুলগুলিতে চিত্রগত নানান চরিত্র বর্তমান। এই ধরণের পুতুল গড়ার চেষ্টা বাঙলার সর্বত্রই দেখা যায়। সকলেই অর্থাৎ সকল মৃৎশিল্পীই এ ধরণের কাজ অত্যন্ত পছন্দ করিয়া থাকে এর পুর্বেই বলিয়া রাখি এই ধরনের পুতুল কখনও কাঁচা কখনও পোড়ামাটির হইয়া থাকে।

চিত্রগত চরিত্র বলিলাম এই কারণে যে, সাধারণ চিত্র যখন সমতল ক্ষেত্রের উপরে আরোপিত হয় তখন তাহার রূপ যেরূপ হইয়া থাকে এই সকল পুতুল অনেকাংশে সেই চরিত্র প্রধান। অবশ্য আর একটি বিষয় উত্থাপন করা প্রয়োজন যে আমরা আলোচ্য পুতুলের মধ্যে রঙের প্রাচুর্য হেতু চিত্ররীতি প্রভাব সাব্যস্ত করিতেছি না। প্রথম ইহার ভঙ্গিমা, দ্বিতীয়ত ইহার রেখা সৌষ্ঠব। এই দুইটি প্রধান কারণ মিলিয়া ইহাকে চিত্রগত করিয়াছে। মাটির কাজে বিশেষভাবেই ভাস্কর্যগত হইতে পারিত। যেমন পোড়া-মাটির পুতুলে সেই লক্ষণ বর্তমান, ইহা ব্যতীত ছাঁচ ব্যবহার যেহেতু সকল ক্ষেত্রে ব্যবহার হইয়াছে, সেই জন্য আমরা অনায়াসে ধারণা করিতে পারি এই ভাস্কর্য লক্ষণ চিত্রগত চরিত্র হইতে ভালভাবেই রূপায়িত হইতে পারিত। কারণ ভাস্কর্যের মোটা বা সূক্ষ্ম কর্ম সকল পরিষ্কাররূপ প্রতিফলিত হইত যাহা চিত্রের সূক্ষ্ম রেখা এখানে মোটা বিকৃত হইয়া যায়। যাহা হউক এই চিত্রগত পুতুলের দিকে, মেদিনীপুরের পটিদার রাজগিরের পাল, কাঞ্চননগরের পাল, বর্ধমানের পাল ও হুগলী মালদহ (বগুড়াগত মৃৎশিল্পী রাধাগোবিন্দ লাহা) ইত্যাদি প্রায় মৃৎশিল্পীদের স্বাভাবিক টান আছে।

ইহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কতিপয় পুতুলের বিষয় উত্থাপন করিব। যথা—রাজনগর বীরভূমের, কৃষ্ণ রাধা, কৃষ্ণ বলরাম, গণেশজননী ; কলসবাহিকা পরী। মেদিনীপুরের সুতাহাট থানার পরী, ব্রাকেট, (দাড়িওয়ালা ব্রাকেট) টিয়া। বর্ধমানের ব্রাকেট কৃষ্ণরাধা, গৌরাঙ্গ। মালদহ,

মুরগী, কৃষ্ণরাধা, জলকে ইত্যাদি শান্তিপুর কলিকাতা হুগলী মুর্শিদাবাদ ২৪ পরগণা হাওড়া ইত্যাদির বিষয় আমরা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিব।

বৈষ্ণব ভাবধারা ক্রমে যখন কবি জয়দেবের মধ্যে পরিণতি লাভ করিল এবং জনসাধারণ যখন 'কেনা বাঁশী বায় বড়াই গাহিতে' পারিল এবং বহু পরে নদীয়া তথা সারা পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গ যখন বিষ্ণু পরম পদঃ বলিয়া জানিল তখন লোকে চাহিল বহুদিনের যুগ্ম মীনের মিলনের বাটকে অঙ্গ করিয়া, পরম নৈসর্গিক মিলনের প্রতীকটি বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করুক (এই সুত্রে কে জানে infanticede-এর পাপ চির মোচনের জন্যে গোপাল মূর্তি আসিল কিনা) রাধাকৃষ্ণ যে সারা ভারতবর্ষের কি মহৎ আত্মিক বিষয়বস্তু তাহা আমরা সকলেই জানি এবং বিশেষ করিয়া মহাপ্রভুর আবির্ভাবের রাধাকৃষ্ণ, ভারতীয় ভদ্র জীবনের নিত্য সহচর।

আমরা এযাবৎ বহু ভাস্কর্য এবং খোদাই দেখিয়াছি, বস্তুর সীমা ভেদে এইরূপ রসিকভাব কোথাও কোথাও দেখিয়াছি। কঠিন বস্তুর সীমাজ্ঞানকে কারিগর রূপের বাস্তবতার মতই একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করে। ফলে দ্বিভঙ্গ করা তথবা ত্রিভঙ্গ করা বস্তুর দিক দিয়া সীমাবদ্ধ হয়। কিন্তু ঢালাই ইত্যাদিতে দেখা যায় এ সীমা লঙ্ঘিত হয়, সেখানে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারুকার্য করা সম্ভবপর হয়। মোমের কণা ও মৃত্তিকার কণায় বিস্তর প্রভেদ আছে, যাহা মৃত্তিকায় হয় না তাহা মোমে হইয়া থাকে। তাহা সত্ত্বেও গলিত ধাতুর গতি অনেক সময় অনেক ভঙ্গিমা আনিতে সক্ষম হয় না। যাহা অতি সহজেই তুলির টানে সম্ভব হইয়া থাকে। অজন্তা চিত্রগুহার প্রাচীর চিত্রে যে অসম্ভব টান যে বক্রতা পরিলক্ষিত হয় তাহা অন্য কোথাও সম্ভব হয় না। তালপত্র পাণ্ডুলিপি এক এক ক্ষেত্রে অসম্ভব ভঙ্গিমা দেখা যায়, যাহা পত্রের ফাইবারের জন্য এবং অন্যপক্ষে সুচাগ্র লৌহ কলমের জন্যই সম্ভব হয়। তালপত্রের অঙ্গগুলি অসংস্কৃত জ্যামিতিক ছকের মতই প্রতীয়মান হইয়া থাকে। এই এই তুলিকাসম্ভব-ভঙ্গিমা পাথরে রূপায়িত হইয়াছে। ইহার পরিচয় গান্ধার হইতে অদ্যাবধি পাইয়া থাকি। বিশেষত অঙ্গুলিতে, চক্ষুতে ওষ্ঠতে।

তুলির গতির বিভিন্নতা অনেক সময় মাটির মধ্যে চলিয়া আসে। প্রাচীন নিদর্শনে অবশ্য খাড়া হইয়া বড় একটা কোথাও নাই। (পিতলে আছে) সকল সময়ই ইহা বাস রিলিফ হইয়া আছে। যেমন আমরা বহু টেরাকোটাতে দেখিতে পাই। রাসমঞ্চের বড় টালি জাতীয় গুলি দেখিলে ইহা প্রমাণিত হয়, সেখানকার ভঙ্গিমার সহিত তুলিকৃত, তালপত্র বক্রতাসুলভ পুঁথির পাঠার ভঙ্গিমা হুবহু মিল আছে। ইহা ব্যতীত আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে তুলিকাসম্ভাব্য ভঙ্গিমা পাথরে রূপায়িত হইয়াছে। তেমনি পাঠার ভঙ্গিমার সহিত বহুস্থানের রাধাকৃষ্ণের মিল আছে, যথা—শবরকোণের ৺রামকৃষ্ণ মূর্তি, বাঁকুড়া কলেজের ৺কৃষ্ণ মূর্তি, কালনার ৺কৃষ্ণ মূর্তি, কান্দীর রাজবাড়ীর যুগল মূর্তি ৺রাধাবল্লভ।

যুগল মূর্তির ভঙ্গিমা যদিচ ত্রিরত্ন প্রতীকের যুগ্ম মীনের মত, তৎসত্ত্বে বক্রতা কিঞ্চিৎ কম, কৃষ্ণ রাধার ভাবে বঙ্কিম এই কথাটিই আছে; রাসপঞ্চাধ্যায়ের ভাবব্যঞ্জক কৃষ্ণ এখানে বর্তমান। যেখানে কৃষ্ণ একা যথা শবরকোন, ইত্যাদিতে সেখানে অসম্ভব দ্বিভঙ্গ। অসম্ভব দ্বিভঙ্গ রূপের উদাহরণ মাটিতে কোথাও মিলে এবং কোথাও যুগল মূর্তিতে যথোপযুক্ত ভঙ্গিমা মিলে। এই যুগল

নিছক চিত্রসুলভ। যথা রাজনগরের রাধাকৃষ্ণ, এবং সঙ্গে কৃষ্ণ বলরাম মূর্তি। বলরামের বক্ষে রেখা দেওয়া যেমন ভাস্কর্যে বা টেরাকোটায় হইত।

এই দুইটি মূর্তির বা পুতুলের composition অতি সুন্দর, রাধাকৃষ্ণের পশ্চাতে কদম্ব বৃক্ষটিও আছে। এই পুতুলের রাধাটি অত্যন্ত সুন্দর, ইহার ষ্টাইল বহুলাংশে লিখন ভঙ্গীর রীতিতে নিস্পন্ন হইয়াছে। রাধার ভাবের মধ্যে নৃত্যরত লহরী ভঙ্গিমা বর্তমান। দেখিলেই মনে হইবে ইহার রস পার্থিব আলোক্রমে আসে নাই। এখানে অন্য আলো উদ্ভাসিত। ইহা রঙ মাধুর্য। এখানে রেখাই, পুতুলটি যদিও অনেকটা আলতো রিলিফ প্রকৃতির তত্রাচ সমগ্র বাস্তবতা সাড়া আনিতে সক্ষম হইয়াছে। রাধার কাপড়ে নালান্দা এবং পরবর্তী যুগের কাজের মত ফুলকারি করা এবং সেই বস্ত্রভেদ করিয়া রাধার সুন্দর নিটোল দেহ দেখা যাইতেছে, দেহের গড়নে (modeling) অসম্ভব বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। বাম হস্ত উর্দ্ধমুখী দক্ষিণ নিম্নে স্থাপিত। পদদ্বয় কৃষ্ণের মতই, উপরিভাগের ভঙ্গিটি সর্বৈব মিথ্যা প্রমাণিত হইত যদি এইভাবে পদ রচনা না করা হইত। বস্ত্রের পাড় দেহের ভঙ্গিমা সকল কিছু উক্ত সত্য হইতেই বাস্তব হইয়া উঠিয়াছে। কৃষ্ণের কথা কিছু বলিবার নাই, ইহার খঞ্জন আঁখি, বংশী ধারণ সকল কিছুই সুন্দর। কৃষ্ণের রূপ ও ভঙ্গি বহু পুরাতন এবং তাহাই এই মূর্তির মধ্যে রক্ষিত হইয়াছে।

ইহাদের গনেশজননী আর একটি অপূর্ব সৃষ্টি। ইহা পুরাপুরি মূর্তির মতই। ইহার চক্ষে অদ্ভুত দেবী ভাব, সটান নাসিকা, সুন্দর নাসাপুট, বান্ধুল পুষ্পের মত ওষ্ঠদ্বয়। দেবীর ক্রোড়স্থ গণেশ কয়েকটী রেখায় সুপষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এখানে কোন অসংযম দেখা যায় না, কোথাও রঙের হঠকারিতা নাই। রাজনগরের কলসী কাঁকে বধুটিও অত্যন্ত সুন্দর ইহা শুধু মাত্র emarld green ও গোলাপীতে সম্পন্ন। অনেক সুত্রে মুর্শিদাবাদ বা পাটনা কাজের বোধ ইহার মধ্যে রহিয়া গিয়াছে! কলসীবাহিকা বধূর কথা আমরা পোড়া মাটিতে উল্লেখ করিয়াছিলাম এখন ইহার সহিত মিলাইয়া বিচার করিলে দেখিব যে একই বিষয়বস্তুর দুইটি নিদর্শনে কতখানি পার্থক্য রহিয়াছে। আলোচ্য নিদর্শন অন্যান্য বহু জিলায় হইয়া থাকে প্রত্যেক জিলায় রেখা রঙ ভিন্ন আর সব কিছুতে প্রায় মিল আছে। কলিকাতা অঞ্চলে হলুদ ও লাল, কোথাও সাদা লাল ইত্যাদি মেদিনীপুর কলিকাতা ও হুগলী হাওড়া ২৪ পরগণার পুতুল রাজনগরের মত নহে, মালদহ ও বর্দ্ধমান পুতুলে রেখা, রাজনগরের মত না হইলেও, স্বীকার করিতে হইবে যে বেশ জোরাল, ইহাদের পদদ্বয়ে চলনের ইঙ্গিত নাই এবং কাপড়ে মাটির ভাঁজও বর্তমান নহে, এবং দক্ষিণ হস্তে কাপড় সামলাইবার কোন লক্ষণ এত সুপষ্ট ভাবে নেই। কলসীর উপর দুইটি দৃপ্ত টান দিয়া তৌলত্বের ইঙ্গিত দিয়া জিনিসটি যথাসম্ভব সঠিকভাবে সম্পাদন করিবার মত মানসিক অবস্থা কোথাও নাই।

ব্রাকেট। একদা এই ব্রাকেট বাঙলায় অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। গৃহের যে কোন কক্ষকে সাজাইয়া সৌখীন করিবার জন্য, এই ব্রাকেট ব্যবহার করা হইত। এগুলি সাধারণত ৫"×৪"র এক একটি মুখ মাত্র। ইহার মুখখানি অত্যন্ত বিদেশী ধরনের। অবশ্য ডিম্বাকৃতির কথা বহুস্থানে উল্লেখ আছে তৎসত্বে কোথাও সঠিক ভারতীয় ইঙ্গিত নাই। করিন্থীয় অথবা পরে রোমান গৃহসজ্জার মুখের মত। শুধু মাত্র সম্মুখের তেড়িটি অত্যন্ত বাবড়ী চুলের সোজা সিঁথে করা। কোথাও

কোথাও এই মুখমণ্ডলে চন্দন তিলক পরান বা অলকাতিলকা কাটা। দাড়ীতে কালীঘাটের মত রেখা দেওয়া। এইরূপ ব্রাকেট শান্তিপুর, নবদ্বীপ, মেদিনীপুর, বৰ্দ্ধমান, মালদহ সর্বত্রই পাওয়া যায়। সর্বোপরি আকর্ষণীয় হইল ইহার চক্ষুদ্বয়। আকর্ণ বিস্তৃত লোচন, উপরে পল্লব রেখা এই চক্ষু আমরা বহু পট ও পাটা বিশেষত কালীঘাটের পটে দেখিয়াছি। ইহার রঙ সাধারণত শ্যাওলার মত সবুজ কোথাও কোথাও আসমানী রঙ হইয়া থাকে। ইহা ছাঁচে হইয়া থাকে।

পরী এবং দেওয়াল পরী। পরী পুতুল সর্বত্র প্রচলিত, ইহাকে সঠিক ভাবে বলা উচিত, সুন্দরী, কারণ ইহার সহিত স্বর্গ হইতে মর্তের সম্পর্ক বিশেষরূপে আছে। ইহার মধ্যে স্বর্গীয় অপ্সরীদের মতই লীলা চপল, লাস্যময়ী ভাবটি বিশেষরূপে বর্তমান, সুন্দর দেহবল্লরী, উন্নত বক্ষদ্বয়, সুন্দর গ্রীবা কোথাও কোথাও দেখা যায় ইহার চক্ষুদ্বয় স্পষ্ট ও আয়ত, সবকিছু মিলাইয়া অত্যন্ত আমোদপ্রিয় এবং বিলাসিনী। রাজনগরে শান্তিপুরে এই ভাবটি সুস্পষ্ট। অন্যান্য স্থানে ছাঁচের ছাঁচ হইয়া গা-গতর নাই। ইহার গোলাপী বা নরম লাল বসনে সমস্ত রসভাবকে আরও উন্নীত করিয়াছে।

দেওয়াল পরী। ইদানীং সর্বত্র যাহা আমরা পাই তাহার মধ্যে মেদিনীপুর ও বৰ্দ্ধমান শান্তিপুর এবং মালদহের ছাঁচই সুন্দর। ইহা গতশতকে বিদেশাগত দেওয়াল-ই দেবদুতের (Plaque) মতই দেখিতে। ইহার বস্ত্রবিন্যাস, ইহার চুলের পাট, এমনকি চক্ষুদ্বয় নীল। দেবদুতের নিষ্কলুষ মুখখানি পর্যন্ত সঠিকভাবে বর্তমান। এমনকি রঙ গালের উপর গোলাপী, চুল সোনালী, কাপড় হরিৎ-হলুদ এবং বিরাট পক্ষদ্বয় আবছায়া আসমানী রঙ,স্বর্ণের বদলে কমলালেবু রঙ এখানে ব্যবহার করা হইয়াছে।

জেলেনী। এই বিষয়টি উত্তর ভারতেও অত্যন্ত জনপ্রিয়। অন্যও বাঙলায় অনেক স্থানে চল আছে। মেছুনী একটি বিরাট মাছ মস্তকে স্থাপন করিয়া চলিয়াছে। জেলেনীর সহিত সকল ক্রেতার বড় রসের সম্পর্ক। কলিকাতায় অল্পবয়সী জেলেনী কদাচিৎ চোখে পড়ে, পড়িলেও ইহারা জিলা শহরের বাজারের ডাকাবুকো জেলেনী নয়। যাহারা ক্রেতার পৌরুষকে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া দেয়। বিষ্ণুপুর বাঁকুড়া, ভুবরাজপুর, (ইহার কিছু বয়স হইয়াছে) কান্দী, তমলুকে খুব মারাঠা জোয়ান জেলেনী দেখিয়াছি। এই সকল জেলেনী যাহারা আলোর পেদি জ্বালাইয়া আটে-ঘাটে বসিত; মাছ লইয়া ফেরি করিত, এই মূর্তি তাহাদের স্মরণ করিয়াই সৃষ্টি হইয়াছে। এই পুতুলের চোখের চাহনিতে পর্যন্ত আঁশ গন্ধ, (তাই লোকে বলে অমন আঁশ চোখে চেওনি) গা-গতর মাছের ডিমের মতই নরম। হাতে তাগা, কোমরে গোট, পরনে পাছা পেড়ে সাড়ী, কণ্ঠে শঙ্খরেখা বলিরেখা, স্তনের পাশে রেখা (?) ইহার মধ্যে গত শতকের চিত্র ছাপ বর্তমান। ইহার সহিত হাতে গড়া পুতুলের ভাবগতিক অনেক পৃথক। ইহার মধ্যে জেলেনী সব, দুই হাত উপরে তুলিয়া দেহ দেখাইবার ছল মাত্র, আর উহার মধ্যে মৎস্য একটি ভার বিশেষ এবং বাহিকা তাহার জন্য কুণ্ঠিত নহে, তাহার সমস্ত কিছুই অর্থাৎ দেহটি এই পরিশ্রম সমর্থ।

গোয়ালিনী। হাতে গড়া গোয়ালিনীর সহিত ছাঁচে গড়া গোয়ালিনীর একই পার্থক্য বর্তমান। এই গোয়ালিনীরও আজও কোথাও কোথাও পাছাপেড়ে সাড়ী; বিছা—জেলেনীর মতই

সকল কিছু আছে। অবশ্য ইহার মুখমণ্ডলে কিছু পার্থক্য দেখা যায়, তাহা না হইলে আমরা অনায়াসে ভাবিতাম ইহা এক ছাঁচ হইতে গড়ন হইয়াছে। বেশি জুয়াচুরী ইহার দ্বারা সম্ভব বলিয়া ইহাকে আরও রসিকা সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। এই ধরনের কলিকাতার বেনারসী পুতুলগুলি খুব সুন্দর হয়।

আহ্লাদী। এই পুতুলের ছাঁচ আর কোথাও ভাল নাই, আহ্লাদী এক এক স্থানে এক এক রকমের হয়, কোথাও পা ছড়াইয়া ব সিয়া, কোথাও দাঁড়াইয়া, কোথাও হাসিতেছে। এখন যা আছে তাহাতে কোথাও কোথাও সেই আহ্লাদী মেয়ের ভাবটি আছে। যেমন সোনামুখী, সুতাহাটা, রাজনগর। এই পুতুলটি, নদীয়া হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগণা কলিকাতা ইত্যাদি স্থানের প্রিয়।

বেনে বৌ। গায়ে কাঁচা সোনার রঙ, হাতে কোথাও কিছু নাই। বউটি দাঁড়াইয়া আছে। এই নামটি একদা খুব বাজার-প্রিয় হওয়ার জন্য অনেকে যে কোন রমণী মূর্তি দেখিলেই বেনে বৌ বলেন। কিন্তু ইহা খুব সমীচিন নহে। বেনে বৌ পুতুলের ছাঁচ অত্যন্ত খারাপ হইয়া যাওয়ার দরুণ ইহার চল নাই। ইদানীং সাদা গায়ের উপর লাল সাড়ী পরান হয়। ভাব বৈচিত্র্য কিছু নাই বলিলেই হয় এবং প্রায়ই কাঁচা মাটির উপর রঙ করা হইয়া থাকে। চিত্রগত পুতুল আমাদের এইখানে শেষ হইল।

চতুরঙ্গের ভাষা

নবেন্দু সেন

'চতুরঙ্গে'র"(১৯১৫) ভাষার ঐশ্বর্য চতুরঙ্গের শব্দে, Phrase-এ, বাক্যে, শব্দ সজ্জায়, বাক্য বিন্যাসে সমাসে, অলঙ্করণে। প্রতি ভাষারই ভাষা বৈশিষ্ট্য এমনিতর ভাষা নির্মাণের উপাদানের মধ্যে নিহিত। পৃথিবীর সব ভাষারই নিজস্ব একটি রূপ (Form) থাকে ; যেমন ইংরেজী ভাষার এই নিজস্ব রূপে গঠিত বাক্যের রূপ হল : S. V, O (Suject. Verb. Object); যেমন Shakespeare is poet ; বাংলা ভাষার নিজস্ব রূপ হল S. O. V. (কর্তা। কর্ম। ক্রিয়া।) যেমন, আমি কথা বলি। ভাষার এই নিজস্বরূপকে স্বাভাবিক ক্রম (Norm) বলা চলে।১

শক্তিমান ভাষা শিল্পী এই 'Norm' থেকে সরে এসে নিজের ইচ্ছানুযায়ী ভাষার নূতন ক্রম সৃষ্টি করেন, ভাষায় ব্যক্তিত্বের ছাপ রাখেন। কি ভাবে কতটা সরে আসবেন, সে স্বাধীনতা শিল্পীর 'পছন্দে'র উপর নির্ভর করে।২ 'পছন্দ' অনুযায়ী, লেখকবিশেষের রচনারও প্রকৃতি পাল্টায়। রচনার এই স্বতন্ত্র প্রকৃতির জন্যই গড়ে লেখকবিশেষের লেখার ষ্টাইল।

চতুরঙ্গের ভাষায় লেখকের পছন্দ অনুযায়ী ভাষার যে ক্রম অনুসৃত হয়েছে, তাতে বাংলা ভাষার স্বাভাবিক ক্রমের বিচ্যুতি ও স্বাভাবিকতা কতটা কিরূপ শিল্পশোভন রূপ সৃষ্টি করেছে, তাই বিবেচ্য।

শব্দ সম্ভারে তৎসম, তদ্ভব, দেশী, বিদেশী শব্দ যেমন ব্যবহার হয়েছে তেমনি 'phrase', শব্দ সজ্জা, সমাস, অলঙ্কারও ব্যবহার হয়েছে **'চতুরঙ্গ'** গ্রন্থে। দেশী শব্দের ব্যবহার : **এলো খোঁপা, ডাল পালা, ঝপাঝপ, জেল্লাগিরি, ঝাঁট, কাদা খোঁচা।**

বিদেশী শব্দের ব্যবহারে ফরাসী **'আশমান,' 'খরচ', 'দরজা', 'বন্দোবস্ত',** যেমন ব্যবহৃত হয়েছে, তেমনি ব্যবহৃত হয়েছে **'জব্দ', 'জাহাজ', 'তাগা তাবিজ'** আরবি শব্দ। **খুঁটা, মৎলব, মুল্লুক** প্রভৃতি হিন্দী শব্দও সহজেই ব্যবহার করেছেন লেখক। বিদেশী শব্দের বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে ইংরেজী শব্দের ব্যবহারও বহু ; **পজিটিভিস্‌ম্‌, জেল কোর্ট, মাইডিয়ার, ক্লাশ, গুড্‌বাই, লাইব্রেরী, নাইট স্কুল, উইল, ভিজিট,** ভাষায় কৌতুককর পরিবেশ সৃষ্টিতে ইংরেজী শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয় : যেমন,

(১) **একজামিন পাশের পেটেণ্ট** ঔষধ ;

(২) রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ **মার্কা** ;

(৩) যৌবনকালে যখন তাঁর স্ত্রী মারা যান তার পূর্বেই তিনি **ম্যালথস্‌** পড়িয়াছিলেন ; আর বিবাহ করেন নাই।

তদ্ভব শব্দ : কান্না, পরশমণি, চব্বিশ, ভাই, মাঝ, শ্যাৎলা, ভুরু, মানুষ, কিছুক্ষণ। চতুরঙ্গের ক্রিয়াপদগুলিও প্রায়ই তদ্ভব শব্দে গঠিত : যেমন **রাখিব, করিব, যাইবে, উঠিয়া বসিলাম, শুনিতেছি।**

তৎসম শব্দ : দল, চঞ্চল, নীলাভ, মাধুর্য, ছলছল, বাধন, সাধনা, বেদনা, মুক্ত, সমুদ্র, পূর্ণিমা, অরূপ, ফাল্গুণ, লাবণ্য, বসন্ত, গন্ধ, হিল্লোল, পারিজাত, বৃষ্টি, জল, কল্পনা, পল্লব, নির্জন, নিস্তব্ধ—প্রভৃতি।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে শব্দগুলিতে ল | ম | ন | ণ | শ | ষ | স | ত | বর্ণ খুব বেশী ব্যবহৃত হয়েছে। এই বর্ণগুলি স্বভাবতই সঙ্গীতময়। অনিবার্যভাবে শব্দগুলিও তাই সঙ্গীতের সুরে সমৃদ্ধ হয়েছে, ভাষার সঙ্গীত সৃষ্টি করেছে।

কতকগুলো pharaseর ব্যবহার ও শব্দের গঠন নবসৃষ্টির মর্যাদা ও ঐশ্বর্য সৃষ্টি করেছে। যেমন : **ওষ্ঠহীন, নাস্তিকতা চর্চা, আনন্দসম্ভোগ, চিরযমুনাতীর, দলচর, সত্যপুরুষ, দুর সমুদ্র।**

বিশেষণ ব্যবহার চতুরঙ্গের ভাষা সম্পদের অন্যতম আকর্ষণ। বিশেষণ সাধারণতঃ দু'প্রকার। (১) **Abstract** ; (২) **Concrete**৩ ; যে বিশেষণ কোন রূপের, ধরা ছোঁয়ার মধ্যে আসে এমনিতর ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণী বাচক শব্দকে বিশেষিত করে তাকে Concrete বা রূপময় বিশেষণ বলা চলে। যেমন, সাদা কাগজ, সবুজ ঘাস, ছোট্ট পুত্র। যে বিশেষণ ব্যক্তি, বস্তু, প্রাণীবাচক শব্দকে বিশেষিত করলেও অমূর্ত, অরূপ ধারণা সৃষ্টি করে তাকে Abstract বিশেষণ বলা চলে। যেমন অপূর্ব সুন্দর সঙ্গীত, আশ্চর্য মেয়ে ; অপূর্ব পরিচ্ছদ।

বিশেষণ ব্যবহারের একটি ভাষাতাত্বিক সাধারণ নিয়ম আছে যে, যে শব্দটির জন্য বিশেষণ বাচক শব্দটি বা phraseটি ব্যবহৃত হবে ঠিক সেই শব্দটির মধ্য অব্যবহিত পূর্বে বা অব্যবহিত পরে বিশেষণটি বসবে ; যেমন : শুকনো মুখ, আকাশ তপ্ত। বিশেষণ পরে বসলে 'effect' Rational ; বিশেষণ পূর্বে বসলে 'effect' emotional হয় ;৪ যেমন বেদনার্ত হৃদয় ; চুল তার বিদিশার নিশা।

কিন্তু ভাষাতত্বের বিশেষণ ব্যবহারের নিয়ম ভঙ্গে জাত লেখকগণ তাঁদের রচনার সৌষ্ঠব সৃষ্টি করতে পারেন। 'পছন্দ' নির্ভর এই ভাঙনের স্বাধীনতায় গঠিত হয় তাদের ভাষার সৌষ্ঠব, শ্রী। রবীন্দ্রনাথ এমনিতরো দুর্লভ শিল্পী। 'চতুরঙ্গ' গ্রন্থে ভাষাতত্বের নিয়মভঙ্গজনিত যে শিল্পশোভন রূপ গড়ে উঠেছে তা লক্ষ্য করা যেতে পারে।

(১) কালো ডানার ঝলক। (ডানার ঝটপটানি বা ঝাপটা (নি) স্বাভাবিক)।

(২) জলটি একেবারে, নীলে নীল (নীলজল-স্বাভাবিক)।

(৩) সমুদ্রের অলস কল্লোল। (নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের বিশালতা বোঝাচ্ছে)।

(৪) পৃথিবীর একখানি ক্লান্ত হাত। (সমাসোক্তি অলঙ্করণে বিশেষণ)।

(৫) নির্লজ্জ, নিষ্ঠুর, সর্বনেশে রসের রসাতল ('রস-'এর চরিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে)।

(৬) সীমানাহারা ফ্যাকাশে সাদার মাঝখানে দাঁড়াইয়া, দামিনীর বুক দমিয়া গেল (বুক কেঁপে ওঠে ; মন দমে যায় ; কিন্তু এখানে ধবধবে সাদা'র শব্দসঙ্গর৫ পরিবর্তে সাদা'র 'মাঝখানে' 'দামিনী'কে দাঁড় করিয়ে লেখক নূতন শব্দ সঙ্গ ব্যবহার করেছেন 'effect' মননে ভরপুর)।

Collocation এবং Collogition৬এর স্বাধীনতা গ্রহণ করে লেখক ভাষার নবৈশ্বর্য সৃষ্টি করেন। চতুরঙ্গে তার চিহ্ন ; (ডানার শব্দ) **ঝপাঝপ** ; (গা) **ঝিম্‌ঝিম্ ; (মন) টনটন ; (ঢেউ) ছলছল**

(প্রলয়) ঝমাঝম ; (চোখ) ঝক ঝক।

Phrase সৃষ্টিতে লেখকের নূতনত্ব।

(১) ভরা অশ্রুর বেদনা (Adjectival)।

(২) পাগলামি আরব্য-উপন্যাসের সেই জুতো (Adj)।

(৩) শূন্যতার পাহারাওয়ালা (Adj)।

(৪) বসন্তের পুষ্পবন (Noun phrase)।

(৫) নাস্তিকতা চর্চা (N. phrase)।

(৬) তৃষ্ণার দরখাস্ত (")।

(৭) মৌনের গর্ত (")।

(৮) রুদ্র তেজের ঝলক (")।

(৯) গুরু পুরোহিতের অনেক টাকার আশীর্বাদ (N. phrase)।

(১০) দাওয়াইখানার দেনার আগুন (N. phrase)।

চতুরঙ্গের ভাষার সমাস ব্যবহারের দুটি রূপ লক্ষিত হয়। (১) সমাসবদ্ধ পদ। (২) ব্যাসবাক্য। সমাসবদ্ধ পদ কম। ব্যাসবাক্য বেশী। যেমন :

সমাসবদ্ধ পদ :

চিরযমুনাতীর, গরহাজির, রসালোচনা, জীবনতরী, ভক্তিস্রোত ; সৃষ্টিছাড়া, অনাবৃষ্টি ; সুধাপাত্র।

ব্যাসবাক্য :

বসন্তের পুষ্পবন ; ঈর্ষার আগুন ; জীবনের কারবার, বুলির চৌঘুড়ি, রসের সমুদ্র, রসের বিহ্বলতা, সন্ধ্যাবেলাকার আয়োজন, জীবনের পর্দা, আত্মোৎসর্গের ফুল, রসের রসায়ণ, সমুদ্রের কল্লোল, কামনার পাক, মায়ার ফাঁদ, প্রকৃতির মায়া, রূপের মুখোস।

অলঙ্করণ (Figure of speech) : চতুরঙ্গের ভাষার সম্পদ উৎপ্রেক্ষা, রূপক, উপমা অনুপ্রাসের ব্যবহারে একটি শিল্পশোভন রূপ কেমন সৃষ্টি করেছে লক্ষ্য করা যেতে পারে।

(১) সেটা বোধ করি ঠিক ঘুম নয়—অসাড়তার একটা পাতলা চাদর আমার চেতনার উপরে ঢাকা পড়িল। (সমাসোক্তি)।

(২) যেন একটা মড়ার মাথার একান্ত ওষ্ঠহীন হাসি, যেন দয়াহীন তপ্ত আকাশের কাছে বিপুল একটা শুষ্ক জিহ্বা মস্ত একটা তৃষ্ণার দরখাস্ত মেলিয়া ধরিয়াছে। (উৎপ্রেক্ষা ও সমাসোক্তি)।

(৩) সেই গুহার অন্ধকারটা যেন একটা কালো জন্তুর মতো—তার ভিজা নিশ্বাস যেন আমার গায়ে লাগিতেছে (উৎপ্রেক্ষা ও সমাসোক্তি)।

(৪) বসন্তের পুষ্পবনের মতো—লাবণ্যের, গন্ধে হিল্লোল, সে কেবলই ভাস্বর হইয়া উঠিতেছে। (উপমা)।

(৫) ওই-যে মেয়েটা মরিল—রসের পথে রসের রাক্ষসীই তো তার বুকের রক্ত খাইয়া তাকে মারিল। (অনুপ্রাস)।

(৬) কাজেই আমার অন্য কাজের উপর একটা ইংরেজি কাজের সাব-অডিটারি লইতে হইল। (অনুপ্রাস)।

(৭) এতো দুঃসাধ্য সাধন নয়, এ যে অসাধ্য সাধন। (অপহ্নুতিঃ অনুপ্রাস)।

চতুরঙ্গের ভাষার এই সৌরভ অব্যয় ব্যবহারের মধ্যেও। নিষেধাত্মক অব্যয় 'না' ও 'নাই' ব্যবহারেও যে ভাষার ঐশ্বর্য সৃষ্টি সম্ভব, চতুরঙ্গের নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি কটি তার প্রমাণ।

(১) পায়ের তলায় কেবল পড়িয়া আছে একটা **'না'**। তার **না** আছে শব্দ **না** আছে গতি; তাহাতে **না** আছে রক্তের লাল **না** আছে গাছ পালার সবুজ, **না** আছে আকাশের নীল, **না** আছে মাটির গেরুয়া।

(২) প্রথমে ভাবিলাম, কোনো একটা বুনো জন্তু। কিন্তু তাদের গায়ে তো রোঁওয়া আছে, এর রোঁওয়া **নাই**। আমার সমস্ত শরীর যেন কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। মনে হইল, একটা সাপের মতো জন্তু, তাহাকে চিনি **না**। তার কী রকম মুণ্ড, কী রকম গা, কীরকম লেজ কিছুই জানা নাই, —তার গ্রাস করিবার প্রণালীটা কী ভাবিয়া পাইলাম **না**। সে এমন নরম বলিয়াই এমন বীভৎস, সেই ক্ষুধার পুচ্ছ।

(৩) 'সে কথা ভাবিবার ভার আমার উপর কেহ দেয় **নাই**। আমি ইহাই খুব করিয়া বুঝিয়াছি, আমার মা **নাই**, বাপ **নাই**, ভাই **নাই**, আমার বাড়ি **নাই**, কড়ি **নাই**, সেইজন্যই আমার ভার বড়ো বেশি; সে ভার আপনি সাধ করিয়াই লইয়াছেন; এ আপনি অন্যের ঘাড়ে নামাইতে পারিবেন **না**'।

ভাষার ঐশ্বর্যের নির্ভরতা যেমন শব্দ সম্পদে (vocabulary) তেমনি বাক্যের নির্মাণ পদ্ধতিতেও। বাক্য কত বড় হবে, বা কত ছোট হবে সে সম্পর্কে লিখিত কোন নিয়ম নেই। শব্দ নির্বাচন যেমন লেখকের 'পছন্দ'র উপর নির্ভর করে, বাক্যের দৈর্ঘ্য স্থির করাও তেমনি লেখকের 'পছন্দ'র উপর নির্ভর করে। তবে বাক্য ছোট্টই হোক আর দীর্ঘই হোক, একই ধরনের বাক্যের পৌনপণিক ব্যবহারে ভাষার গতি শিথিল হয়ে যায়। জাত শিল্পীর রচনায় এই শৈথিল্য থাকে না। ছোট, বড় মাঝামাঝি নানান দৈর্ঘের বিভিন্ন বাক্য এমনভাবে ভাষার গতিটি তাঁরা অক্ষুণ্ণ রাখেন, যাতে ভাষার ছন্দটি, সঙ্গীতটি ঠিক পাঠক চিত্তে 'আবেদন জাগায়। চতুরঙ্গের দু' একটি বাক্যের উদাহরণই বক্তব্যকে সমর্থিত করতে যথেষ্ট। যেমন :

(১) আমাকে বাঁচাও।

(২) দরকার যে আমারই।

(৩) শচীশ রাজী হইল।

(৪) একটা বিশেষ খবর ছিল।

(৫) এদিকে মেয়েটির সন্তান সম্ভবনা।

(৬) গান যে করে সে আনন্দের দিক হইতে রাগিণীর দিকে যায়, গান যে শোনে সে রাগিণীর দিক হইতে আনন্দের দিকে যায়।

(৭) যে দিন মাঘের পূর্ণিমা ফাল্গুনে পড়িল, জোয়ারের ভরা অশ্রুর বেদনায় সমস্ত সমুদ্রে

ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল, সেদিন দামিনী আমার পায়ের ধুলা লইয়া বলিল, সাধ মিটিল না, জন্মান্তরে আবার যেন তোমাকে পাই।

(৮) এখন দামিনী গানগুলিকে সাজায় না, গানগুলিই দামিনীকে সাজাইয়া তোলে।

(৯) মায়ার সংসারে মানুষ যেমন করিয়া দিন কাটায় তেমনি করিয়া দামিনীকে লইয়া যদি আমি পুরোমাত্রায় ঘরকন্না করিতে পারিতাম তবে তেল মাখিয়া স্নান করিয়া আহারান্তে পান চিবাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতাম, তবে দামিনীর মৃত্যুর পরে নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিতাম "সংসারোঽয়মতীব বিচিত্র' এবং সংসারের বৈচিত্র্য আবার পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য কোন একজন পিসি বা মাসির অনুরোধ শিরোধার্য করিয়া লইতাম।

ভাষাতত্ত্বের ৯-সংখ্যক বাক্যটির নাম **'Periodic Sentence**।, অসমাপিকা ক্রিয়ায় গ্রথিত শব্দগুলি পাঠকের জিজ্ঞাসা জাগিয়ে রেখে একটি অসমাপিকা ক্রিয়ার ঘাট থেকে সামনের (পরবর্তী) ক্রিয়ার ঘাটে কৌতূহলী পাঠক মনকে ঠেলে দেয় যেন ; তারপর সেখান থেকে (Neat point of infinite verb) আর একটি ক্রিয়ার কাছে, এমনিভাবে চলতে চলতে কৌতূহল, জিজ্ঞাসা নিবৃত্ত হয় একেবারে শেষ সমাপিকা ক্রিয়ার কাছে, যেখানে বাক্যটি সমাপ্ত সেইখানে। ৯ সংখ্যক বাক্যটিতে কৌতূহল আর জিজ্ঞাসার শুরু **"যেমন করিয়া"**য়, আর শেষ **"করিয়া লইতাম"**-এ। আবার **বাংলা বাক্য বিন্যাসের সাধারণ নিয়ম কর্তা | কর্ম | ক্রিয়া** (S. O. V.)'র ক্রমটি ৩ সংখ্যক বাক্যটিতে রক্ষিত হয়েছে। ১ সংখ্যক বাক্যটিতে কর্তা উহ্য। বাক্য বয়নের 'যেমন…তেমন'; 'যখন…তখন', প্রভৃতি জটিল (complex) রীতির রূপ '**যে…সে**', ও '**যেদিন… সেদিন**' যথাক্রমে ৬ সংখ্যক, ও ৭ সংখ্যক বাক্যটিতে রক্ষিত হয়েছে।

চতুরঙ্গের কয়েকটি বাক্য প্রবাদবাক্যের মত। চিরকালের। যেমন :

(১) যার কিছুমাত্র যোগ্যতা আছে সংসার হইতে তার কোনমতে ফসকাইবার জো নাই।

(২) ফাঁকিই সহজ, সত্য কঠিন।

(৩) বড় দুঃখে কিম্বা বড় আনন্দে মানুষের ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে না।

(৪) পাগলামি আরব্য-উপন্যাসের সেই জুতা যা পায়ে দিলে সংসারের হাজার হাজার বাজে কথাগুলো একেবারে ডিঙাইয়া যাওয়া যায়।

শব্দে, শব্দের সজ্জায়, বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছে, সমাসবদ্ধ শব্দে, অলঙ্করণে, এবং বাক্যবিন্যাসের বৈচিত্র্যে চতুরঙ্গের ভাষা সঙ্গীত সমৃদ্ধ। বলাকা, ফাল্গুনী, আর ছোট গল্পের মধ্যে চতুরঙ্গের সৃষ্টি, তাই কবির মানসিকতায় কবিতার ভাব প্রকাশোপযোগী শব্দ, কাব্যনাটকের গতি আর যতি'র চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী বাক্যবয়নপদ্ধতির রীতি, নীতি, এবং ছোট গল্পের মনন প্রকাশোপযোগী 'Relation effect'র বাক্য, বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছ একত্রে চতুরঙ্গের ভাষারপরিবেশ সৃষ্টি করেছে। চতুরঙ্গের ভাষার সঙ্গীত হৃদয় ও মনকে মন্থিত করে। শোনা যাক, বোঝা যাক চতুরঙ্গের সেই সঙ্গীত সমৃদ্ধ মনন মন্থিত ভাষার সুর ও কথা। "আমার ভাবের যে আশমানে মনটাকে বুঁদ করিয়া দিয়াছিলাম তার কাছে এগুলি অতি তুচ্ছ ; কিন্তু হঠাৎ মনে হইত অনাবৃষ্টির মধ্যে

যেন ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। আমাদের দেওয়ালের পাশের অদৃশ্যলোক হইতে ফুলের ছিন্ন পাপড়ির মতো জীবনের ছোটো ছোটো পরিচয় যখন আমাদিগকে স্পর্শ করিয়া যাইত তখন আমি মুহূর্তের মধ্যে বুঝিতাম রসের লোক তো ওইখানেই—যেখানে সেই বামির আঁচলে ঘরকন্নার চাবির গোছা বাজিয়া ওঠে, যেখানে রান্নাঘর হইতে রান্নার গন্ধ উঠিতে থাকে, যেখানে ঘর ঝাঁট দিবার শব্দ শুনিতে পাই—যেখানে তুচ্ছ কিন্তু সব সত্য, সব মধুরে-তীব্রে-স্থূলে-সূক্ষ্মে মাখামাখি, সেইখানে রসের স্বর্গ।"

গ্রন্থ গ্রহণ

১। শিশিরকুমার দাশ—**গল্পগুচ্ছের গদ্যরীতি** (**একতা** : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগীয় : রবীন্দ্রসংখ্যা পত্রিকা ; ১৯৬১) পৃ :

২। Ullmana, Stephen—**Style in the French Novel** (1957) London, pp. 6-9.

৩। Sayce, R. A.—**Style in French Prose** (1953) London p. p. 21-23.

৪। ibid p. 23.

৫। শিশিরকুমার দাশ—তদেব ; পৃঃ ৮১।

৬। তদেব—পৃঃ ৯৩।

(অধ্যাপক কার্থ (একজন বৃটিশ ভাষাতাত্ত্বিক) ষ্টাইলের আলোচনায় দুটি ধারণার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। collocation ও colligation। colligation অর্থাৎ 'পদের মিলন', যেমন **সে কথা কয়** (S. O. V. বা কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া) ; সে **'সে রসগোল্লা কয়'**, হয় না ; যদিও কর্তা | কর্ম | ক্রিয়া রূপেই গঠিত। অর্থাৎ 'কয়' ক্রিয়াটি যে শব্দটির সঙ্গ কামনা করে তা **কথা** **'রসগোল্লা'** নয়। কিন্তু শক্তিশালী লেখক colligition ঠিক রেখেও এই শব্দ সঙ্গ'র (collocation) নূতনত্ব আনতে পারেন যেমন 'শরীর **কুঞ্চিত** হইয়া উঠিল (**শিউরে ওঠা** স্বাভাবিক)—তদেব পৃঃ ৯৩)।

৭। Warner, Alan, A short Guide to English Style (1961, London) p. 156.

রবীন্দ্র-কাব্যসাধনায় বাস্তব জীবনবোধ ও সৌন্দর্যবোধ

বাসন্তী চক্রবর্তী

রূপশিল্পীর সৃষ্টি-পটে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে যেমন বাস্তব জীবন-সত্য,—তার সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না ব্যথা-বেদনা নিয়ে ; এঁকে তোলে জীবনের ছোট-খাটো তুচ্ছ-বৃহৎ চিত্রগুলিকে নানা রেখায়, নানা রঙে নানা ছন্দে নানা গানে—তেমনি ধরা পড়ে জীবনের অতীত যে সৌন্দর্যলোক, যে ভাবলোক, যে রসলোক ; তা আভাসে ইঙ্গিতে। শিল্পী ছবি আঁকেন, জীবন থেকেই গ্রহণ করেন তাঁর প্রয়োজনীয় বাস্তব জগৎ থেকে নেন নানা ছবি, নানা দৃশ্য ; প্রকৃতি জগৎ থেকে নেন নানা চিত্র, নানা ভাব—তার সঙ্গে যোগ করেন আপন মনের মাধুরী। রঙের কারিকুরিতে,—রেখার এক এক আঁচড়ে তা হয়ে ওঠে রূপাতীত কিছু,—তা আমাদের এমন আনন্দ দেয় যা অপার্থিব লোকের। তাই গুহাগাত্রে যে শিল্পচিত্র দেখি, যে ছবি প্রত্যক্ষ করি তা আমাদের চির পরিচিত হয়েও অপরিচিত কোন রহস্য-লোকের বার্তা বহন করে আনে। কি এই সৌন্দর্য কোথায় এর রসমাধুর্য, কোথায় এর লোকাতীত অনির্বচনীয়তা যা চিরন্তনকালের হয়েও নূতন কিছু দেয়? আসলে শিল্পীর সৌন্দর্যসৃষ্টি,—তাঁর শিল্পবোধ, রুচি, জীবনদর্শন একত্রে মিলে উদ্ঘাটিত করে কোন জীবনসত্যকে। যে সত্য-বোধ আমাদের চিরকালের জানা হয়েও অজানা, চেনা হয়েও অচেনা।

কবি ও কাব্যের ভাবে, ছন্দে, রূপে, রেখায়, ধরার চেষ্টা করেন এই জীবনসত্যকে। একদিকে বাস্তব জীবনসত্যের সঙ্গে এর যেমন নিবিড় যোগ—অর্থাৎ এ-লোক থেকে সে গ্রহণ করে পট, রঙ, তুলি—অর্থাৎ প্রতিদিনের হাসি-কান্না-দুঃখ-সুখ-দ্বিধা-দ্বন্দ্বের লীলাবৈচিত্র্যকে, অপরদিকে আপন কল্পলোকের রসমাধুরীতে মণ্ডিত করে ভাবে-ভাষায়, ছন্দে-রূপে তাদের করে তোলেন এক অনির্বচনীয় শিল্পসামগ্রী। চোখ মেললে আমরা যেটিকে ঠিক যেমন দেখি, হুবহু সেইরূপে যদি তাকে কবি বা শিল্পীর তুলিতে চিত্রিত দেখি, তাহলে আমরা তার থেকে রসের আনন্দ কিছু পাই না। তা আমাদের রচনাতীতের সন্ধান দিতে পারে না। অথচ কাব্য বা সাহিত্য যদি বাস্তব জগৎ থেকে সরে গিয়ে কেবল ভাবলোকের কারবার করে তাহলে তাও সর্বসাধারণের চিত্তে যুগে যুগে আনন্দ দান করতে সক্ষম হয় না। সাময়িক আনন্দ তার থেকে কেউ কেউ গ্রহণ করলেও জীবন দিয়ে তাকে আমরা উপলব্ধি করি না—তাই গ্রহণও করি না। এখানেই কবি-শিল্পীর মস্ত বড় ব্যর্থতা। কবির ভাষাতেই বলি—"জীবনে জীবন যোগ করা, না হলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা"। বাস্তবিক কবি যে দুঃখ করে বলেছেন—

> "তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা—
>
> আমার সুরের অপূর্ণতা"

একথা আংশিক সত্য হলেও সামগ্রিক সত্য নয়। কারণ বাস্তবতাবোধ যে তাঁর ছিল না—একথা পুরোপুরি স্বীকার করা যায় না। অবশ্য একথাও ঠিক যে এই বাস্তবতার সংজ্ঞা বা মূল্যবোধ সকল কালের সকল লোকের কাছে সমান নয়। যুগ ভেদে এবং রুচি ভেদে এর ধ্যানধারণারও হেরফের

হয়। তাই এ সম্বন্ধে কোন তর্ক না তুলে এটুকু বলা চলে যে বাস্তবতা বলতে যদি কদর্যতা বা নগ্নতা বোঝায় তাহলে কবির দীর্ঘ কাব্যজীবন-সাধনার ক্ষেত্রে তার সন্ধান আমরা পাই না। কিন্তু প্রতিদিনের তুচ্ছতাও তো কাব্যগৌরব লাভ করে মহনীয় হয়ে উঠতে পারে এবং এখানেই কাব্যের কাব্যত্ব এবং শিল্পীর শিল্পবোধের চরম এবং পরম সার্থকতা।

তাঁর ভাবলোকের রূপসাগরে ডুব দিলে আমরা পাই অরূপ-রতন। শুধু বাস্তব জীবনবোধ কেন—তার তুচ্ছতা, তার দৈন্য, তার বৈচিত্র্য, তার মাধুর্য নিয়ে সে কবি-মানসে এমন করে ধরা পড়েছে—সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রেখা-ছন্দ-ভাব-অনুভাব বিষয়বৈচিত্র্য, ছন্দসুষমা আমাদের অভিভূত করে তোলে। যে সমাজের বুকে, যে পরিবেশে, যে প্রাচুর্য এবং বিলাসে ও আভিজাত্যে তিনি ছোটবেলা থেকে মানুষ, যেখানে নিতান্ত দীনহীন সাধারণ নরনারীর জীবনদ্বন্দ্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্পন্দন না পৌঁছানোই সম্ভব। যদি বা পৌঁছোয় তাহলে তারা তার যথাযথ রূপ নিয়ে সেখানে ধরা দেবেনা—এটাই মানবজীবনের সাধারণ ঘটনা। কিন্তু আশ্চর্য এই—আমাদের বিশ্বকবির জীবনে এর অবিস্মরণীয় যোগ হয়েছে। মহাসমুদ্রের বুকে এসে ছোট ছোট শাখানদী সব মহাসঙ্গমে মিলে গেছে। সেখানে তাদের তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতা একাকার হয়ে সুনীল জলধির অনাবিলে নীলিমার শ্যামলতায় মিলিয়ে গেছে। ক্ষুদ্র কলতান এখন আপনাকে বিলিয়ে দিয়েছে উত্তাল তরঙ্গের বুকে বিরাটের চিরন্তন মহিমায়। তাই এর রূপসৌন্দর্য তথা ভাবসৌন্দর্য বাস্তবের তুচ্ছতাকে গ্লানিকে গ্রহণ করেও অনির্বচনীয় সৌন্দর্যলোকের মহামূল্য সম্ভার উপহার দেয়। কবির বাস্তব জীবনবোধ সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে এক অপরূপ রূপশিল্প নির্মাণ করে। তাই 'সাধারণ মেয়ে', 'ক্যামেলিয়া', 'বালক', 'মাসিক তিনটাকা মাইনের ছেঁড়া ছাতি মাথায় শিক্ষক', 'পুঁটুরাণী', 'নেড়িকুকুর', সকলেই আমাদের চোখে দেখা—হাতের ছোঁয়া—অতিশয় চেনা জানা হয়েও কবির কাব্যে আভাসিত হয়েছে এক সৌন্দর্যশিল্পের অনির্বচনীয় মহিমায়। তাকে ঠিক এর আগে যেমন করে জানতাম বা জানছি—সেখানেই তার শেষ মূল্য নয়? সে যে যুগে যুগে কান্নাহাসির ঢেউখেলানো এই জগতে দুঃখ-সুখের লগি ঠেলে ঠেলে গ্রাম্য খাল বেয়ে এই সমাজের বুকে এসেছে—আসবে। বাস্তব জীবনের এই চিরন্তন সত্যতার মধ্যেই আছে সুন্দরের শিল্পসৌন্দর্যের সুষমামণ্ডিত অলৌকিক মাধুরিমা। সেখানেই এ লৌকিক হয়েও অ-লৌকিক, অকাব্য হয়েও কাব্য—সাধারণ চিত্র হয়েও কাব্যশিল্পের মহিমায় সমুত্তীর্ণ।

কবির দীর্ঘকালব্যাপী কাব্যজীবন সাধনার মধ্যে এই বাস্তব জীবনবোধের সঙ্গে কল্পলোকের সৌন্দর্যবোধের দ্বন্দ্ব চলেছে এবং কখনও বা তাঁর কাব্যে সৌন্দর্য দৃষ্টি প্রাধান্য পেয়েছে; কবি বাস্তবলোক থেকে ভাবলোকে বিহার করেছেন—আবার কখনো বা আপন ভাবলোককে আদর্শ-লোককে নামিয়ে আনতে চেয়েছেন মর্তজীবনের ধূলিমলিন শ্যামল মাটির বুকে। এভাবে প্রত্যক্ষ বাস্তবসত্য ও অনির্দিষ্ট ভাবসত্যের লীলাখেলায় দোলাচলবৃত্তি অনবরত কাজ করে চলেছে তাঁর মানস পটে। এ সম্পর্কে একখানি চিঠিতে তাঁর নিজেরই উক্তি—"অসম্পূর্ণ Real এবং পরিপূর্ণ Ideal-এর মিলনই কবিতার সৌন্দর্য"। আবার—"আমি সত্যি সত্যি বুঝতে পারিনে আমার মনে সুখ-দুঃখ-বিরহ-মিলনপূর্ণ ভালোবাসা প্রবল, না সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা প্রবল।" বাস্তবিক

কবি-শিল্পীর ভাবছন্দময় মানসপটে এ দুয়ের লীলা এত গভীর, এত ব্যাপক এবং এত বেশী বৈচিত্র্যময় যে কবির পক্ষে এ সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট বোধসীমা আশা করা যায় না।

কোথাও বা এই সুখ-দুঃখ-বিরহ-মিলন-পূর্ণ ভালোবাসা প্রবল, আবার কোথাও সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্খাপ্রবল—একথা যতখানি সত্যি ; অপর পক্ষে এই সুখ-দুঃখ-বিরহ-মিলনপূর্ণ বাস্তব জীবনবোধের সঙ্গে সৌন্দর্যবোধের সমন্বয় ঘটে আমাদের এই দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতা-ক্ষুদ্রতা-দীনতা এমন মূল্য পেয়েছে যে অতি সাধারণ নগণ্য জীবনও কাব্যময় হয়ে উঠেছে। তার সমস্ত দীনতাকে তুচ্ছ করে অস্বীকার করে সে যেন অমৃতলোকের দিকে হাত বাড়াচ্ছে—ছোট্ট ঘাসটির মত মাটির বুককে আঁকড়ে ধরে থেকেও তার শিশির টলমল অরুণ কিরণের মাধুর্যে আঁকা রূপসৌন্দর্যে সে যেন শিল্পজগতে অদ্বিতীয়—অতুলনীয়।

প্রথম যুগের কাব্যসাধনা 'সন্ধ্যাসঙ্গীত', 'প্রভাত সঙ্গীত', 'ছবি ও গান', 'কড়ি ও কোমল', সুরু করে 'মানসী', 'সোনারতরী', 'চিত্রা', 'চৈতালী', 'খেয়া','বলাকা', 'পূরবী', 'মহুয়া'র মধ্যে দিয়ে কবি শেষ পর্যায়ে 'পুনশ্চ', 'শেষ সপ্তক', 'পত্রপুট', 'শ্যামলী'র যুগে এসে হাজির হয়েছেন। প্রথম পর্বে দেখি কবির রোমান্টিক মন বাস্তব জগতের কোন চিত্র ভাব বা জীবন সত্যকে আশ্রয় করলেও কল্পনাই সেখানে প্রবল বন্যার মত কাজ করে দু'কূলকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। 'ছবি ও গানে'র সূচনায় কবির স্বীকৃতি থেকেই এ সত্য স্পষ্টতর হয়। 'এটা বয়ঃসন্ধিকালের লেখা, শৈশব যৌবন যখন সবে মিলেছে।……এখন সেই বয়স যখন কামনা কেবল সুর খুঁজছে না, রূপ খুঁজতে বেরিয়েছে। কিন্তু আলো-আঁধারে রূপের আভাস পায়, স্পষ্ট করে কিছু পায় না। ছবি এঁকে তখন প্রত্যক্ষতার স্বাদ পাবার ইচ্ছা জেগেছে মনে, কিন্তু ছবি আঁকবার হাত তৈরি হয় নি তো'। বাস্তবিক 'ছবি ও গানে'র 'পোড়োবাড়ি' কবিতায়—

'চারিদিকে কেহ নাই একা ভাঙা বাড়ি
সন্ধ্যেবেলা ছাদে বসে ডাকিতেছে কাক'।

বা 'অভিমানিনী'র—

'ও আমার অভিমানী মেয়ে
ওরে কেউ কিছু বোলো না'।

এর মধ্যে বাস্তবের অতি সাধারণ জীবনচিত্রকে ধরবার চেষ্টা করেছেন ; কিন্তু বেশ বোঝা যাচ্ছে সে চেষ্টা তখনও রূপের সঙ্গে ভাবের, ভাষার সঙ্গে ছন্দের সমন্বয়ে এমন কাব্যসৌন্দর্য লাভ করেনি যা অভাবনীয় কোন শিল্পমাধুর্য দান করতে পারে। বাস্তবিকপক্ষে কবির তখন যে কাঁচা বয়স, যে অস্পষ্ট অভিজ্ঞতা এবং যেরূপ ভাসা ভাসা চোখ তাতে এর থেকে অধিক গাঢ়পুষ্ট কিছু আশা করা সম্ভবও নয়। পরবর্তী জীবনের কাব্যে তাঁর এই বাস্তববোধের সঙ্গে সৌন্দর্যবোধের যে সুসমন্বয় আমরা লক্ষ্য করি—তা বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা—বহু প্রয়োগ-প্রচেষ্টা-বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতালব্ধ শিল্পসাধনার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। তাই 'পুনশ্চ', 'শেষ সপ্তক', 'পত্রপুট', 'শ্যামলী'র মধ্যে বিষয়বস্তুর দিক থেকে বাস্তব জীবনবোধের যে সজীবচিত্র আমরা পাই—তা কেবল আমাদের প্রতিদিনের চেনা-জানা অতি পরিচিত তুচ্ছতার আলোকেই অতিবাস্তব হয়ে উঠেছে এ কথা যেমন সত্য—তার চেয়ে অধিকতর

সত্য এর এই বাস্তব উপস্থাপনায় সঙ্গে ভাব, ভাষা, আঙ্গিক, চিত্রকল্পের অতি সাধারণ আটপৌরে চলনের অভিপ্রকাশ। এর মধ্যেই এর অতিবাস্তবতার মূল সূত্রটি সংগুপ্ত। কিন্তু 'চিত্রা', 'চৈতালী', 'খেয়া' 'গীতাঞ্জলি', 'বলাকা', 'পুরবী', 'মহুয়া'র যুগে কবি দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতার ক্ষেত্র থেকে উপাদান সংগ্রহ করলেও তার উপস্থাপনা, ভাব-ভাষা, শিল্পকলা, উপমা-রূপকে, ছন্দে এবং সৌন্দর্য-কল্পনার অনির্বচনীয় ভাবলালিত্যে তা রোমান্টিক ভাবকল্পনার ক্ষেত্রে অভাবনীয় চমৎকারিত্ব লাভ করে অতি সার্থক কাব্যসুষমা লাভ করেছে। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে বাস্তব জীবনবোধের সঙ্গে সৌন্দর্যবোধের পরিপূর্ণ মিলন না ঘটলে কাব্য রসোত্তীর্ণ হয় না—কাজেই এযুগের কাব্য যখন রসের পরীক্ষায় সমস্ত কাব্যসাধনার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে তখন বাস্তবতার সঙ্গে তার সমন্বয়ও ঘটছে সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু আসল কথা কাব্যের বাস্তবতাবোধ বা সত্যবোধ আর জীবনসত্য এক নয়। সৌন্দর্যবোধের ভাবদৃষ্টিতে, রসের সাধনায় কাব্যসত্যের বিচার। এ বিচারে এ যুগের কাব্য তাঁর সাধনজাত সোনার ফসল।

তবে দৈনন্দিন জীবনের অনাড়ম্বর তুচ্ছতা—যে অতি সাধারণ পরিচিত বিষয়কে কাব্যে স্থান দিয়ে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে রসোত্তীর্ণ করে তোলা—সেদিক থেকে 'পুনশ্চ', 'শেষসপ্তক', 'পত্রপুট', 'শ্যামলী'র কবিতাগুলি বিষয়বস্তুর দিক থেকে সাধারণ লোকের অতিশয় নিকটের এবং অধিকতর চেনা-জানার জন্য বাস্তব জীবনের নিরাভরণ সহজতার দাবী করে। দীর্ঘজীবনব্যাপী কাব্যসাধনার ক্ষেত্রে কবির এ এক নূতনতর পরীক্ষা নূতন আঙ্গিকে কাব্যকে অভিনব বৈচিত্র্য দানের চেষ্টা। অথচ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিদিনের তুচ্ছতাকে তার স্বকীয় মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত রেখেও তাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে কাব্যে রসোত্তীর্ণ করা যায় কি না তারই একটা নূতনতর পরিকল্পনা।

তাই মধ্য পর্বের এই রোমান্টিক সৌন্দর্য কল্পনার ভাবসাধনার ক্ষেত্রে কবি কিন্তু বাস্তব জগতে চোখ মেলেও সে দৃষ্টিকে প্রসারিত করে দিয়েছেন দূর লোকে। ধূলি মলিন এই পৃথিবীর কোন তুচ্ছতা তখন তাঁর চোখে পড়লেও, তা চোখকে অতিক্রম করে আপন অন্তরে কোন স্পন্দন তোলে নি—কোন আসন সেখানে সে লাভ করেনি। মন-বিহঙ্গ যাত্রা করেছে নীড় ছেড়ে আকাশের দিকে। মাটির পৃথিবীর দিকে চোখ রেখেও সে আপনাকে ভাসিয়ে দিয়েছে কোন মহাশূন্যের বুকে। সে তখন একটি স্বপ্নে বিভোর—away, away. মাটির বুকে যেটুকু থাকে সেখানেও নামিয়ে নিয়ে আসতে চায় সুদূর আকাশের সুবিস্তীর্ণ নীলিমাকে—সীমার বাঁধনের মধ্যে অসীমের অনন্ত সৌন্দর্যমাধুরীকে। তাই এ যুগে বাস্তব জীবন-বোধের সঙ্গে সৌন্দর্যসৃষ্টির সুসমন্বয় অপেক্ষা সৌন্দর্যবোধের স্বাভাবিক অনুপ্রেরণাই কবি-মনে কাজ করেছে বেশী। কবি-শিল্পীর রোমান্টিক সৌন্দর্য কল্পনা তাই এখানে গগনস্পর্শী—আমাদের সাধারণ ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। এ কবিকে তাই আমাদের ভালো লাগে—ভালোবাসি—কিন্তু সম্যক বুঝে উঠতে পারিনে। যতখানি জানি, তার থেকে অনেকখানিই রয়ে যায় অজানা—অচেনা।

'চিত্রা' কাব্যের সূচনায় তখনকার কাব্যজীবন উপলব্ধি সম্বন্ধে আপন মনের যে অভিব্যক্তি; তার মধ্য দিয়ে এই বাস্তব জীবনের সুখ-দুঃখ বিরহ-মিলন কথা একদিকে যেমন প্রকাশ পাবার চেষ্টা করেছে আপন মহিমায়—অপরদিকে তাঁর অন্তর্যামী তাঁকে আপন কাজ ভুলিয়ে যে হাতে বাঁশি তুলে

দিয়েছেন—আপন মনের সুর সাধনার জন্য—এবং এ সুর যে একান্তভাবেই কাজ ভোলাবার তাতে সন্দেহ থাকে না তার সুদূরের প্রতি আকাঙ্ক্ষা দেখে—সীমার বাঁধন থেকে অসীমের প্রতি অভিসার দেখে। কবি এখানে বলছেন—"কিন্তু চিত্রায় আমার যে উপলব্ধি প্রকাশ পেয়েছে সেটি অন্য শ্রেণীর। আমার একটি যুগ্ম সত্তা আমি অনুভব করেছিলাম যেন যুগ্ম নক্ষত্র মতো, সে আমারই ব্যক্তিত্বের অন্তর্গত, তারই আকর্ষণ প্রবল। তারই সংকল্প পূর্ণ হচ্ছে আমার মধ্য দিয়ে, আমার সুখে দুঃখে, ভালোয় মন্দয়। তাই কবি বলেন—

জ্বেলেছ কি মোরে প্রদীপ তোমার রহস্যঘেরা অসীম আঁধার
করিবারে পুজা কোন দেবতার মহামন্দির তলে।

'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় কর্মজীবনের সেই বিচিত্রের ডাক পড়েছে। 'আবেদন' কবিতায় ঠিক তার উল্‌টো কথা। কবি বলেছেন, কর্মক্ষেত্রে যেখানে কার্যক্ষেত্রের জনতায় কর্মীরা কর্ম করছে, সেখানে আমার স্থান নয়। আমার স্থান সৌন্দর্যের সাধকরূপে একা তোমার কাছে। জীবনের দুই ভিন্ন মহলে কবির এই ভিন্ন ভিন্ন কথা। জগতে বিচিত্ররূপিণী আর অন্তরে একাকিনী কবির কাছে এ দুই-ই সত্য, আকাশ এবং ভূতলকে নিয়ে ধরণী যেমন সত্য। 'ব্রাহ্মণ', 'পুরাতন ভৃত্য', 'দুই বিঘা জমি'—এগুলির কাব্যকাকলি নীড়ের, বাসার ; 'স্বর্গ হইতে বিদায়'—এখানে সুর নেমেছে উর্ধ্বলোক থেকে মর্ত্যের পথে।

কবির আপন কাব্যজীবন সাধনার পথে এই যে বৈচিত্র্যের সাধনা এবং কখনও মন বাস্তবমুখী, কখনও বা সৌন্দর্যবিলাসী, ভাববিলাসী তা কবির এই সমস্ত স্বগতোক্তি থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এর পর 'চৈতালি'তে অবশ্য কবি নেমে আসতে চেয়েছেন বাস্তব জগতের ছোট-খাটো স্নেহ প্রেমের দুঃখ-সুখের কান্না হাসির দোলায়। কিন্তু এ কথা সত্যি, ছোটো-খাটো এই সমস্ত জীবন-বোধের মধ্যে তুচ্ছতা, বাস্তবতাকে ছাড়িয়ে জয়ী হয়ে উঠেছে তাকে কেন্দ্র করে কবি মনের কোন বিশেষ জীবনদর্শন বা তত্ত্বপ্রধান ভাবদৃষ্টি। তাই এখানেও বাস্তব জীবনবোধ সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে ভাবে, ভাষায়, ছন্দে রূপাঙ্গিকে সুসংহত হয়ে সত্যিকারের কাব্যশিল্পমণ্ডিত হয়ে উঠলেও বাস্তব জীবনের তুচ্ছ বিষয়বস্তু তার তুচ্ছতাকে হারিয়ে ফেলেছে কবির জীবনদর্শনের তত্ত্বপ্রধান ভাবদৃষ্টির মধ্যে। পরবর্তী যুগের আমের খোসা, কাঁটালের ভূঁতি, মাছের কানকো, গুবরে পোকা, ছাইপাঁশ আরো কতো কি'র মতো যথাযথ রূপটি নিয়ে কাব্যসৌন্দর্যে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। 'চৈতালির দু' একটি কবিতা আলোচনা করলেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ কাব্যের "দিদি" কবিতায়—

নদীতীরে মাটি কেটে সাজাইতে পাঁজা ঘাটে করে আনাগোনা ; কত ঘসামাজা
পশ্চিমি মজুর। তাহাদের ছোট মেয়ে ঘটি বাটি থালা লয়ে,.........।

এর মধ্যে বাস্তবের অতিসাধারণ তুচ্ছতা দৈনন্দিন জীবনের নিত্যকালের কর্মভার নিয়ে সহজ সরল ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। বেশ বোঝা যায় কবির বাস্তববোধ ভাবলোককে পরিত্যাগ করে ধূলিমলিন পৃথিবীর দীনতার মধ্যে নেমে এসেছে। কি ঐ কবিতারই শেষে—

যায় বালা ডান হাতে
ধরি শিশুকর ; জননীর প্রতিনিধি
কর্মভারে অবনত অতি ছোটো দিদি।

যেইমাত্র আমরা পড়ি তখনই বুঝি ; কবি মনে চিরন্তনকালের এই জীবনগতিটিকে রূপ দিবার আকাঙ্খাই প্রবল। বাস্তব জীবনের ছোটো খাটো ঘটনা বা একটি ছোট মেয়ের জীবনের তুচ্ছতাকে রেখাচিত্রে ধরবার বাসনাই এখানে প্রবল নয়।

'পুঁটু' কবিতায় 'পুঁটুরাণী' যে একটি বৃহদাকার মহিষ—তা কবির কৌতুকপ্রবণ চিত্তকে নাড়া দিয়েছে। কবি এ-হেন 'পুঁটুরাণী'কে কাব্যালঙ্কারে ভূষিতা করলেন। কিন্তু বলাই বাহুল্য এই 'পুটুরাণী' পরবর্তীকালের 'নেড়ীকুকুর 'শালিখে'র মতো তার স্বকীয় মর্যাদা পায় নি। আসলে বাস্তব জগতের দিকে কবি এখানে চোখ মেলেছেন—তার রূপ-রস সৌন্দর্য মাধুর্যকে দেখেছেন কিন্তু কবির বোধসৃষ্টি তার কল্পনালোক থেকে নেমে আসতে পারছে না। ছন্দ-ভাব ভাষার ক্ষেত্রেও সেই এক কথা। তা এমন স্বাভাবিক এমন আটপৌরে নয় যা দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতাকে হুবহু রূপ দিতে পারে—যেমন হয়েছে 'পুনশ্চ'য়, 'শেষসপ্তকে', 'পত্রপুটে,' 'শ্যামলী'তে। অবশ্য একথাও সত্যি এই যুগে আসতে কবিকে আরও দীর্ঘ জীবনের শিল্পসাধনার পরীক্ষা দিতে হয়েছে। কাব্য যে নিছক ছন্দে নয় ভাবে, কবি যে বলেছেন—"বিষয় বাছাই নিয়ে রিয়ালিজম্ নয়, রিয়ালিজম্ ফুটবে রচনার জাদুতে'—এই রচনার 'জাদু'কে ধরতে, কবিকে 'কল্পনা'—'নৈবেদ্য'—'গীতাঞ্জলি' 'বলাকা'—'পূরবী'—'মহুয়া'র যুগকে অতিক্রম করে আসতে হয়েছে। সে তো এক লাফে অনন্ত সমুদ্রের বুকে জীবন তরীর জালাটিকে খুব শক্ত মুঠিতে ধরে ধীরে ধীরে পাল তুলে দাঁড় বেয়ে আসতে হয়েছে। এই সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমার কত না ব্যথা—কত না সাধনা—কত না আশা-নিরাশা দ্বিধা দ্বন্দ্বের উত্থান পতন। সেই দীর্ঘ জীবনসাধনার ইতিহাস থেকে তাঁর নূতন অভিজ্ঞতা নূতন সিদ্ধি,—নূতন ভাব এবং রূপ চেতনার সন্ধান পাওয়া যায়। স্পষ্ট হয়ে ওঠে কবি শিল্পীর সচেতন এবং অবচেতন মনের অন্তর্বেদনার শুভ উদ্বোধন।

এ জীবনে কবি এই মর্ত্য পৃথিবীকে ভালোবেসেছেন। তাঁর মানবমুখী মন প্রতি মুহূর্তে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছে এর রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শ সংগীতকে।

জীবন দিয়ে অনুভব করতে চেয়েছে জীবনের মাধুর্যকে। তাই 'পূরবী'র 'শেষ রাগিণীর বীণে'র অনুরণনে শুনি—

যারা আমার সাঁঝ-সকালে গানের দীপে জ্বালিয়ে দিলে আলো,
আপন হিয়ার পরশ দিয়ে ; এই জীবনের সকল সাদা-কালো
যাদের আলো ছায়ার লীলা সেই যে আমার আপনমানুষগুলি

... ...

তাই যারা আজ রইল পাশে এই জীবনের অপরাহ্ন বেলায়
তাদের হাতে হাত দিয়ে তুই গান গেয়ে নে থাকতে দিনের আলো,
বলে নে ভাই, "এই যা দেখা, এই যা ছোঁওয়া এই ভালো এই ভালো"।

বাস্তবিক এ যুগে কবি মর্ত্যপৃথিবীকে সমস্ত প্রাণ-মন দিয়ে ভালোবেসেছেন। তার ছোট্ট শিশির কণাটুকু, ক্ষুদ্র ঘাসটুকু, তুচ্ছ মানবজন্মটুকুও তাঁর কাছে অপরূপের মহিমায় অনির্বচনীয় হয়ে উঠেছে। তারা যে কেউ বস্তুবিশ্বের ওজন দরে ক্ষুদ্র নয় তুচ্ছ নয়,—এই মহাবিশ্বজীবনের লীলারঙ্গরসে তারা যে এক একটি আনন্দ কণিকা এবং কবি জীবনের কানায় কানায় এরা যে স্নেহ প্রেম আনন্দ বেদনার মঙ্গলঘটটিকে পূর্ণ করে দিয়েছে তাদের অযাচিত দাক্ষিণ্যে ? কিন্তু কবির এই মর্ত প্রীতি বাস্তবজীবনবোধ এখানে ততখানি বাস্তবপৃথিবীর ধূলি-মাটিতে নেমে আসেনি যতখানি এসেছে এর সৌন্দর্যের প্রেমের রহস্যমধুর ভাবচেতনার মধ্যে। প্রতিদিনের জীবনে যে তুচ্ছতা তারা যে কাব্যলোকে তার যথাযথ রূপ নিয়ে সাবলীল ছন্দে ধরা তখনও দেয়নি তা এর পরের কাব্যগুলি আলোচনা করলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাস্তবিক এ যুগের এই মর্ত্যপ্রীতির মধ্যে সৌন্দর্যবোধ ভাবকল্পনা, ভাষামাধুর্য, শিল্পবিলাস সবই পরম এবং চরম সার্থকতার সৌন্দর্যশিখরে আরোহণ করেছে। কিন্তু কবি যাকে বলেছেন—"প্রাণের ধর্ম, সুমিতি, আর্টের ধর্মও তাই। এই সুমিতিতেই প্রাণের স্বাস্থ্য ও আনন্দ, এই সুমিতিতেই আর্টের শ্রী ও সম্পূর্ণতা"। এখনও পর্যন্ত এই কাব্যের বাস্তব জীবনবোধে ও কবির শৈল্পিক সৌন্দর্যবোধে তেমনতর হয়ে ফুটে ওঠেনি—যাতে কাব্য দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতাকে অকপটে বরণ করে নিতে পারে। এখন পর্যন্ত সে তার কৌলিন্য রক্ষাতেই ব্যস্ত,—নিমন্ত্রণ সভার ভোজের আসরে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলকে সমান মর্যাদা সে দিতে পারছে না। তাই বাস্তবের তুচ্ছতা এখনও পর্যন্ত তার যথাযথ রূপটি নিয়ে ধরা দেয়নি। ভাবসৌন্দর্য এবং কল্পনার ঐশ্বর্যই এখানে প্রাধান্য পেয়েছে।

এইভাবে মর্ত্য জীবনবোধ ও সৌন্দর্যবোধের সাধনা কবি তাঁর কাব্যজীবনের প্রথম যাত্রা থেকেই করে এসেছেন। কিন্তু আসলে বাস্তবজীবনবোধের মধ্যে দৈনন্দিন জীবনের যে তুচ্ছতা যে অনাড়ম্বর সহজ সরল স্বচ্ছতা—তা কেবল ভাবকল্পনার ক্ষেত্রেই নয় ; ভাষার ক্ষেত্রে এবং রচনা-রীতির ক্ষেত্রেও এই সহজ সাবলীলতার প্রয়োজন আছে—একথা কবি হয়তো এর আগে বুঝতে পেরেছেন কিন্তু ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রে—ছন্দ বা শব্দ চয়নে গদ্যের এই সহজ অনাড়ম্বর রূপটিকে 'পুনশ্চ' কাব্যের আগে ধরতে পারেন নি। কবি যে গদ্যকাব্যের আলোচনায় বলেছেন—"যা আমাকে বচনাতীতের আস্বাদ দেয় তা গদ্য বা পদ্যরূপেই আসুক তাকে কাব্য বলে গ্রহণ করতে পরাঙ্মুখ হব না"। অথবা কাব্য ছন্দের আলোচনায়—"ছন্দটাই যে ঐকান্তিক ভাবে কাব্য তা নয়। কাব্যের মূল কথাটা আছে রসে, ছন্দটা এই রসের পরিচয় দেয় আনুসঙ্গিক হয়ে। কাব্যের লক্ষ্য হৃদয় জয় করা—পদ্যের ঘোড়ায় চড়েই হোক আর গদ্যে পা চালিয়েই হোক।...গদ্যেই হোক পদ্যেই হোক, রচনামাত্রেই একটা স্বাভাবিক ছন্দ থাকে। পদ্যে সেটা সুপ্রত্যক্ষ, গদ্যে সেটা অন্তর্নিহিত"। কবির এই সমস্ত উক্তি থেকে বোঝা যায় দীর্ঘকাল কাব্যের রস, ধ্বনি, ব্যঞ্জনা, শব্দ, ভাব, ভাষা ছন্দ বৈচিত্রকল্প নিয়ে কাজ করে করে কাব্যের আসল আত্মাটা যে কোথায় তা ধরতে পেরেছিলেন এবং সেইজন্যেই বাইরের দিক থেকে এই ছন্দটিকে ত্যাগ করে গদ্যভঙ্গিমার সহজ সরল অনাড়ম্বর প্রকাশের মধ্যে এই কাব্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করলেন।

সুতরাং রিয়ালিজম্ যে কেবল বিষয় নির্বাচনের উপর নির্ভর না করে 'রচনার জাদু'র মধ্যে

ধরা পড়েছে' এ সত্য এ যুগের কাব্যে প্রত্যক্ষগোচর হয়ে উঠেছে। এ যুগে তাই কবির বাস্তব জীবনবোধ তার নিরাভরণ স্বচ্ছতা নিয়েই কাব্যে ফুটে উঠেছে। অথচ দু'একটি উপমা-রূপকে, সংযত-সংহত ক্ষিপ্র বাচন-ভঙ্গিতে একটি সহজ ছন্দময় সুষমা ফুটে উঠে মহান শিল্পীর অনবদ্য কাব্য-সৌন্দর্য-বোধের পরিচয় দিচ্ছে। কবির এই যুগের 'গদ্য-কাব্যগুচ্ছ', 'পুনশ্চ', 'শেষ সপ্তক', 'পত্রপুট', 'শ্যামলী', কবির এই পর্যায়ের কাব্যপ্রচেষ্টায় একটি উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করে বেড়াচ্ছে যে শিল্পক্ষমতা একটি অভিনব ইঙ্গিত বহন করে এনে এ যুগের কাব্যগুলিকে বিশেষ বৈশিষ্ট্য এবং বৈচিত্র্যমণ্ডিত করে তুলেছে। আঙ্গিক এবং বিষয়বস্তুর উপস্থাপনায় এই যে অভিনবত্ব তা পূর্ববর্তী যুগ থেকে এ কাব্যগুলিকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। কবি যে বলেছেন—'গদ্যকাব্য অতি নিরূপিত ছন্দের বন্ধন ভাঙাই যথেষ্ট নয়, পদ্যকাব্যে, ভাষায় ও প্রকাশরীতিতে যে একটি সলজ্জ অবগুণ্ঠন প্রথা আছে তাও দূর করে অসংকুচিত গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেক দূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব।' এই বিশ্বাসে ভর করে তিনি যে নূতন রচনার সৃষ্টি করলেন তা তাঁর বিরাট প্রতিভার এবং বিপুল সৃষ্টির বিশেষ বৈচিত্র্য এবং চমৎকারিত্বেরই নির্দেশ দেয়। অথচ গদ্যের এই অনাড়ম্বর বাচনভঙ্গির মধ্যে কাব্যের অনির্বচনীয় রস-সম্ভারও যে ক্ষুণ্ণ হয়নি একটুও তা এযুগের কাব্যের আন্দোলন হতেই স্পষ্ট হয়। 'পুনশ্চ'র 'পুকুরধারে'র—

তীরে তীরে কলমীশাক আর হেলঞ্চ।
ঢালু পাড়িতে সুপারি গাছক'টা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।
এ ধারের ডাঙায় করবী, সাদা রঙীন, একটি শিউলি।
দুটি অযত্নের রজনী গন্ধায় ফুল ধরেছে গরীবের মতো।

এই যে সাধারণ অতি পরিচিত একটি বাস্তবচিত্র এ সকলেরই চেনা-জানা কিন্তু এর প্রকাশের মধ্যে যে 'যাদু' আছে তাতে কবির সূক্ষ্ম বাস্তব দৃষ্টির সঙ্গে সমন্বয় ঘটেছে সৌন্দদৃষ্টির এবং এ দুয়ের সমন্বয় আরও শিল্পমণ্ডিত হয়েছে এর সহজ সরল প্রকাশ ভঙ্গিমায়। 'সুপারি গাছক'টি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে' বা 'অযত্নের রজনী গন্ধায় ফুল ধরেছে গরীবের মত' এই যে স্বচ্ছ বাচনভঙ্গির সঙ্গে অনাড়ম্বর উপমা, এ জিনিস এর আগের যুগে দেখা যায় নি। আবার 'ফাঁক' কবিতার এক জায়গায় আছে—

বনমালী ভাবে দরজা বন্ধ করাটা,
ভদ্রঘরের কায়দা।
দিই তাকে এক ধমক।

কত সাধারণ তুচ্ছ ঘটনা। এ ভাব যে কাব্যে ঠাঁই পেতে পারে এর আগে তা এমন করে জানা ছিল না। কাব্য হয় তো এখানে নেই কিন্তু এরই ক'লাইন পরে ঐ একই কবিতায়—

এদিকে বাগানে পথের ধারে
টগর গন্ধরাজের পুঁজি ফুরোয় না,
এরা ঘাটে জটলা করা বউদের মতো,
পরস্পর হাসাহাসি ঠেলাঠেলিতে
মাতিয়ে তুলেছে কুঞ্জ আমার।

কোকিল ডেকে ডেকে সারা।
ইচ্ছে করে তাকে বুঝিয়ে বলি,
অত একান্ত জেদ করো না
বনান্তরের উদাসীনকে মনে রাখবার জন্যে।

এই যে প্রকৃতিকে এমন সহজ উপমা রূপকে অলঙ্কারের বাঁধনে তাদের অতখানি মূল্য দিয়ে একটি সহজ আসন তাদের জন্য বিছিয়ে দিয়েছেন এখানেই তো তারা কাব্যমূল্য পেয়ে অনির্বচনীয় কিছু, অনবদ্য কিছু হয়ে উঠলো। কবি যে বলেছেন,—'প্রকৃতিতে করাটাই বড় নয়, হওয়াটাই বড়', তাঁর কাব্যের ক্ষেত্রেও একথা বলা চলে। এখানে শিল্পীর ভাব-ভাষা-ছন্দ সম্বন্ধে যে সচেতন শিল্পপ্রয়াস তাকে ব্যর্থ করে দিয়ে আপন রচনার 'জাদু'তে এ এমনভাবে আপনাকে প্রকাশ করেছে যেখানে এর কাব্যত্ব, এর শিল্পসম্মত সৌন্দর্য বিকাশ। প্রকৃতি এর আগের যুগের কাব্যে অনবদ্য শিল্পসুষমা লাভ করে অভিনব শিল্পলোক রচনা করেছে একথা সত্যি, কিন্তু তাকে সাধারণের চোখে দেখা আমাদের আঙিনার পাশের অতিবাস্তব চিত্ররূপে তার যথাযথ রূপটিকে কাব্যে তুলে ধরার মধ্যে যে স্বাভাবিক সৌন্দর্য বিকাশ হয়েছে তা বোধ হয় এ যুগের কাব্যের অনবদ্য দান।

'শেষ সপ্তকে'ও দেখি এই বাস্তব জীবনবোধ আরও তীব্র আরও গভীর। তার সঙ্গে আছে কাব্যের স্বাভাবিক সহজ সৌন্দর্যবোধসম্পন্ন গতিভঙ্গি। কবি যে গদ্যের এই সহজ চলমানতা সম্বন্ধে বলেছেন সেকথা মনে পড়ে—'কিন্তু এমন মেয়ে দেখা যায় যার সহজ চলনের মধ্যেই বীণা ছন্দের ছন্দ আছে।...সে মেয়ের চলনটাই কাব্য; তাতে নাচের তাল নাইবা লাগাল; গদ্যকাব্যের এই দশা। সে নাচে না, সে চলে। সে সহজে চলে বলেই তার গতি সর্বত্র'। বাস্তবিক এখানে কাব্যের সহজ চলনটাই যে তাকে অবারিত করে তার গতি দিয়েছে বাড়িয়ে অথচ শিল্পসুষমাও ক্ষুণ্ণ হয়নি তা বেশ বোঝা যায়। বিষয়বস্তু তাই সব সময় যে বাস্তবের তুচ্ছতার ক্ষেত্র থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে তা নয়, কবিমনের বিশেষ ভাবনা বা কোন খণ্ড বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা বা বিশেষ জীবনদর্শন অথবা কোন টুকরো স্মৃতি কবিমনের কাব্যময় লীলাবিলাসরূপে এ কাব্যে আভাসিত হয়েছে অথচ তাদের স্বচ্ছন্দ গতিভঙ্গির জন্য তারা অপরূপ এক কাব্যলাবণ্য লাভ করে অভিনব বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছে। 'শেষ সপ্তকে'র 'চার' সংখ্যক কবিতার—

কাক ডাকছে তেঁতুলের ডালে,
চিল মিলিয়ে গেল রৌদ্রপাণ্ডুর সুদূর নীলিমায়
বিলের জলে বাঁধ বেঁধে
ডিঙি নিয়ে মাছ ধরছে জেলে।
বিলের পরপারে পুরাতন গ্রামের আভাস,
ফিকে রঙের নীলাম্বরের প্রান্তে
বেগুনি রঙের আঁচলা।

অথবা 'এগার নম্বর কবিতায়—

সাতটা বাজল ঘড়িতে।
ছড়িয়ে-পড়া মেঘগুলি গেছে মিলিয়ে।
সূর্য উঠল প্রাচীরের উপরে,
ছোটো হয়ে গেল গাছের যত ছায়া।
খিড়কির দরজা দিয়ে
মেয়েটি ঢুকলো বাগানে।
পিঠে দুলছে ঝালোরওআলা বেণী
হাতে কঞ্চির ছড়ি।
চড়াতে এনেছে
একজোড়া রাজহাঁস,
আর তার ছোটো ছোটো ছানাগুলিকে।

এখানে টুকরো টুকরো বাস্তব জীবনচিত্রের সঙ্গে প্রকৃতির দু'একটি রূপ-রেখার আলিম্পন এমন সূক্ষ্ম তুলির আঁচড়ে স্বাভাবিক সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে যে কবির বাস্তববোধ এবং সৌন্দর্যবোধ সুসমন্বিত

হয়ে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে তা আর আলোচনার অপেক্ষা রাখে না। ছোট ছোট খণ্ড বিচ্ছিন্ন চিত্রগুলি এক একটি তুলির আঁচড়ে তার অনাড়ম্বর স্বচ্ছতা নিয়ে কাব্যময় হয়ে উঠেছে। কবির জীবনদৃষ্টির সঙ্গে শিল্পদৃষ্টির সমন্বয় এবং ভাব-ভাষা-রচনাশৈলীর মধ্যে অপূর্ব সংহতি এসে একে অনবদ্য শিল্পসামগ্রী করে তুলেছে। 'চিলের রৌদ্রপাণ্ডুর সুদূর নীলিমায় মিলিয়ে যাওয়া' এমন কিছু অভিনব ঘটনা নয়—কিন্তু এ কল্পনার মধ্যে যে কাব্যিক শিল্পদৃষ্টি আছে এবং তার যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ এটাই এখানকার অভিনবত্ব। তারপর 'বিলের পরপারের গ্রামকে 'ফিকে রঙের নীলাম্বরের প্রান্তে বেগুনি রঙের আঁচলা'র সঙ্গে তুলনাও অতি সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছ ঘটনাকে সৌন্দর্য দৃষ্টিতে দেখার কথাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। আবার 'এগারো' নম্বর কবিতার উদ্ধৃত রেখাচিত্রটির মধ্যে কোন একটি দিনের অলস মুহূর্তকে কাব্যে ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন। এর যে সৌন্দর্য তা নিতান্ত সাধারণকেই অসাধারণ করে দেখা এবং এ সৃষ্টি কবির সহজাত শিল্পচেতনার অনাবিল আত্মপ্রকাশ।

'শ্যামলী'তে এসে এই প্রয়াস এই সুসংগতি আরও সুস্পষ্ট আরও সুপ্রত্যক্ষ। তার ভাবব্যঞ্জনা এবং প্রকাশ-ভঙ্গিমার স্বতঃস্ফূর্ততা আরও স্বচ্ছ আরও সরল আরও ঋজুশুভ্র আর বলিষ্ঠ জীবনধর্মে। তার প্রাণচঞ্চল গতিবেগের লীলাচাপল্যে যেন পার্বত্য ঝর্ণা খরবেগে, কুলুকুলু তানে নেচে চলে যাচ্ছে চঞ্চলা নটিনীর মত। তার দেহ লাবণ্যে যে ছন্দ, যে লীলাবিলাস তা ঠিক্‌রে ঠিক্‌রে পড়ছে কলহাস্যে কুলুকুলু তানের। এখানকার ভাব-ভাষা-ছন্দ-রূপাঙ্গিকের স্বচ্ছ সাবলীলতার সঙ্গে রচনা-শৈলীর স্বাভাবিক প্রাণ স্পন্দনকে এই পার্বত্য ঝরণার সঙ্গে তুলনা করা চলে। 'হারানো মনে'—

দাঁড়িয়ে আছ আড়ালে,
ঘরে আসবে কিনা ভাবছ সেই কথা।
একবার একটু শুনেছি চুড়ির শব্দ।
তোমার ফিকে পাটকিলে রঙের আঁচলের একটুখানি
দেখা যায় উড়ছে বাতাসে
দরজার বাইরে,
তোমাকে দেখতে পাচ্ছিনে,
দেখছি পশ্চিম আকাশের রোদ্দুর
চুরি করেছে তোমার ছায়া,
ফেলে রেখেছে আমার ঘরের মেঝের পরে।

অথবা—'অমৃত' কবিতার—

সেদিন ঢেউ ছিল না জলে।
আশ্বিনের রোদ্দুর কাঁপছে
সমুদ্রের শিহর-লাগা নীলিমায়
বাসার ধারে পুরোনো ঝাউ গাছে
ধেয়ে আসছে খাপছাড়া হাওয়া,
ঝর্‌ঝর্‌ করে উড়ছে তার পাতা।
বেগনি রঙের পাখী ; বুকের কাছে সাদা ;
টেলিগ্রাফের তারে বসে লেজ দুলিয়ে
ডাকছে মিষ্টিমৃদু চাপা স্বরে।

এ সমস্ত রচনার প্রত্যেক পঙ্‌ক্তিতে ছড়িয়ে আছে রচনার 'জাদু'। বিষয়বস্তু-ভাব-ভাষা-ছন্দে এবং রূপাঙ্গিকের সঙ্গে কবির বাস্তব-জীবনদৃষ্টি, রসদৃষ্টি এবং সৌন্দর্যদৃষ্টির সঙ্গে এমন সংহতি লাভ করেছে যে, অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রকাশভঙ্গির মধ্যেও শিল্পমাধুর্যের স্পর্শ লেগেছে। বেশ বোঝা যায় আমাদের আটপৌরে জীবনের যে সমস্ত চিত্র বা ভাব এখানে তুলির এক এক 'আঁচড়ে নব রে নিতুই নব' হয়ে উঠেছে—তা কবির দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার সঙ্গে শিল্পসাধনার স্বাভাবিক রসবোধের একান্ত পরিণতি। কোন কষ্টকল্পনা বা সচেতন সৃষ্টির প্রয়াস প্রচেষ্টা নয়; যে সব খণ্ড চিত্র বা

টুকরো ভাব ঘনীভূত হয়ে উঠেছে এক একটি স্তবকে তারা একদিকে যেমন বাস্তবের তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর ঘটনা, চিত্র বা ভাব, অপরদিকে কবিমনের রূপ সৌন্দর্যের পটে যে তুলিতে এক এক আঁচড়ে তাদের অমরত্ব দান করেছেন—সে তুলি বহু সাধনায় শিল্পীর আপন জীবনরসের বৈচিত্র্যময় পেয়ালায় ডুবানো। কোন্ রঙের আলিম্পন কোথায় কতটুকু পড়লে এর ভাবসৌন্দর্য বাড়বে অথবা রসমাধুর্য ঘনীভূত হয়ে উঠবে তা কবির বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর আয়ত্তে এসেছে। কাজেই কাব্যসুষমার স্বচ্ছ সাবলীল প্রকাশভঙ্গিতে এবং অনবদ্য রূপনির্মিতিতে এখানে বাস্তব জীবনবোধ এবং সৌন্দর্যবোধ যে পরস্পর হাত মিলিয়ে একে অন্যকে বরণমালা দিয়ে আপন করে নিয়েছে তাতে আর কোন সন্দেহ থাকে না। তাই কাব্যদেহে এই হরপার্বতীর মিলনে যে সুর বাজলো তা চিরকালের চেনা হয়েও অচেনা—জানা হয়েও অজানা। সে সাহানা রাগিণীর অনুরণন জাগে আপন মনের রসবোধের সুরমাধুরীতে। শিহরণ জাগায় তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে যার ব্যঞ্জনা যার মূর্চ্ছনা অনির্বচনীয়লোকের। এদিক থেকে তাঁর এই গদ্যকাব্যের শিল্পপ্রয়াস একদিকে যেমন অভিনবত্ব এবং বৈচিত্রের সৃষ্টি করে কাব্যরস আস্বাদনের ক্ষেত্রে একটি নূতন দিক নির্দেশ করলো, অপরদিকে তাঁর এতদিনের যে সাধনা প্রচেষ্টা—বাস্তব জীবনবোধের সঙ্গে সৌন্দর্যবোধের সমন্বয় ঘটিয়ে কাব্যকে দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতায় নামিয়ে এনে—বাস্তব জীবনের এই খণ্ড তুচ্ছ সুখ-দুঃখ-বিরহমিলনপূর্ণ জীবনদ্বন্দ্বকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে দেখা—এ কবি কল্পনা এতদিনে যেন সার্থকতার পথ খুঁজে পেয়েছে বলে মনে হয়।

রেমব্রাণ্ট

পশ্চিম ইউরোপের শিল্প সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করার সময় যখনই ইউরোপের শ্রেষ্ঠতম চিত্রশিল্পীদের উল্লেখ করা হয়। তখনই রেমব্রাণ্টের নামও এক নিঃশ্বাসে বলা হয়।

তবে তাঁর আন্তর্জাতিক খ্যাতি এখনও অনেকখানি আধুনিক। প্রায় একশো বছর পূর্বেও তাঁর সম্পর্কে লোকের যে ধারণা ছিল তা কোন সময়েই সঠিক বা সম্পূর্ণ ছিল না। সে সময় কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি ছাড়াই তাঁর সম্পর্কে নানা রকম কাহিনী প্রচলিত ছিল। তাঁর সম্বন্ধে অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য কাহিনীগুলি আবার জনগণ বেশী বিশ্বাস করতেন। এমনকি এখন পর্যন্ত প্রায় অবিশ্বাস্য এই কাহিনীগুলি প্রচলিত আছে। এর ফলে বিখ্যাত চিত্রশিল্পীর জীবন ও শিল্প সৃষ্টি সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য প্রায় অবজ্ঞাত ছিল। এখন প্রাচীন তথ্যাদি ও তাঁর শিল্প সৃষ্টির থেকে তাঁর জীবনের প্রকৃত ঘটনা জানতে পারি।

রেমব্রাণ্ট যে তাঁর সমসাময়িক যুগের জনগণের কঠোর ও উদ্দাম জীবনের চিত্রশিল্পী ছিলেন তা সকলেই জানেন। তাঁর বহু চিত্রে ও রেখাঙ্কণে এই জীবনের দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। যে যুগে পৌরাণিক কাহিনীর চিত্ররূপ দেওয়াই ছিল চিত্রশিল্পীর আদর্শ সেই যুগে রেমব্রাণ্টের এই বিষয়বস্তুর মৌলিকত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া চিত্রশিল্পীর পিতামাতা বিশেষ ধনী না হলেও, লিডেন মীলারের ব্যবসা থেকে ছেলেকে ভালো শিক্ষা দেওয়ার মতো যথেষ্ট আয় হতো। তাঁর পিতামাতার আর্থিক অবস্থা এতোখানি ভালো ছিল যে তিনি স্থানীয় গ্রামের স্কুলে শিক্ষালাভ করার পর ১৪ বছর বয়সে লিডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। রেমব্রাণ্ট শেষ পর্যন্ত যখন চিত্রশিল্পী হওয়াই স্থির করলেন তখন তিনি তিন বছর চিত্রশিল্প অভ্যাস করেন এবং তারপর আমস্টারডামের পিটার লাষ্ট ম্যানের কাছে ৬ মাস শিক্ষানবীশ থাকেন। এই তথ্যগুলি তাঁর পরিবারের শিক্ষা সংস্কৃতির মান ও পরিবেশ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অন্য রকমের ধারণা এনে দেয়।

রেমব্রাণ্টের চরিত্র তাঁর শিল্পকৌশল, সামাজিক মর্যাদা, তাঁর বিবাহিত জীবন এবং প্রেম কাহিনীগুলি সম্পর্কেও ঠিক একই রকম ভিত্তিহীন কাহিনী প্রচলিত আছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় যে তাঁর রেখাচিত্রগুলিকে শিল্প রসিকগণ অত্যন্ত প্রশংসা করতেন এবং সাগ্রহে সেগুলি সংগ্রহ করতেন। কিন্তু রেমব্রাণ্ট তাঁর রেখচিত্রগুলিতে ক্রমেই বেশী পরিবর্তন করতে থাকায় সংগ্রহকারীরা তাঁর সম্পর্কে নানা রকম দুর্ণাম রটনা করেন।

তাঁর সম্পর্কে আর একটি দুর্ণাম হল, তাঁর একজন জীবনী লেখক বলেছেন, যে রেমব্রাণ্ট তাঁর নিজস্ব একটি এচিং পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন এবং সেই পদ্ধতিটি তিনি তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত ছাত্রগণের কাছে সম্পূর্ণ গোপন রাখেন। এই কাহিনীর গল্পাংশ বাদ দিলে একটি জিনিস খুব সহজেই বুঝতে

পারা যায়। তা হল রেমব্রাণ্ট তাঁর এচিং সম্পর্কে কোন সময়েই সন্তুষ্ট ছিলেন না এবং তাঁর পূর্ববর্তীগণ যে কৌশল অবলম্বন করতেন, তাঁর পদ্ধতি ছিল তা থেকে অনেকখানি আলাদা। কাজেই তাঁর এচিংগুলিতে নতুন এক শিল্প মুড সৃষ্টির প্রতি সাহসিকতাপূর্ণ অভিযানের পরিচয় পাওয়া যায়।

তাঁর শিল্প ও কলাকৌশল সম্পর্কেও অনেকে প্রশ্ন তোলেন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে তাঁর কাছে এই বৈচিত্র্যই বেশী আশা করা যায়। ঐ সময় ইতালীতে গিয়ে কিছুদিন না থাকলে কোন শিল্পীই চিত্রশিল্পী সমাজের মর্যাদার আসন পেতেন না। তিনি বরং ইতালীতে যান নি বলেই গর্ব অনুভব করতেন। প্রচলিত শিল্প পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, প্রতিটি ক্ষুদ্র জিনিসও উজ্জ্বলভাবে প্রকট, অত্যন্ত গাঢ় ছায়া বিশিষ্ট তাঁর শিল্পরীতিকে পাগলামী বলে ব্যঙ্গ করা হয়। বলা হয় যে উইন্‌ডমিলের অভ্যন্তর ভাগের দৃশ্যাবলী তাঁকে এই সুন্দর শিল্পরীতি উদ্ভাবনে সাহায্য করেছে। অর্থাৎ ছোট্ট একটি জানালা এই মহান শিল্পীকে প্রায়ান্ধকার স্টুডিওতে অত্যন্ত গাঢ় আলো দিয়েছে। বর্তমানে সপ্তদশ শতাব্দীর ওলন্দাজ চিত্রকলা বহুদূর থেকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে বলে এখন মনে হয় যে সেই স্বর্ণযুগে যখন আলো ছায়ার পার্থক্য, রঙের বৈপরীত্যের ওপরে স্থান লাভ করে তখনই তা কলাকৃতির শীর্ষদেশে পৌঁছোয়। চিত্রকলার সেই স্বর্ণযুগে রঙ তার প্রাধান্য পায় নি, ইটালীয় রেনেসাঁর যুগের চিত্রকলায় প্রতিটি অবয়বের ওপর যে রকম সতর্ক লক্ষ্য দেওয়া হত তাঁর চিত্রে সেইদিকে ততখানি মনযোগ দেন নি। ওলন্দাজ চিত্রকলায় সব সময়েই জাতীয় জীবন প্রতিফলিত হয়েছে কাজেই এগুলির মধ্যে বিদেশী চিত্রকলার কোন সামঞ্জস্য বা প্রভাব খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়। কাজেই অসংখ্য বিখ্যাত ও অখ্যাত শিল্পী একটা বিশেষ জাতীয় চিত্রাঙ্কণ রীতি গড়ে তুলেছেন এবং পশ্চিম ইউরোপীয় সংস্কৃতি গড়ে তোলার পথে তাঁদের অবদান কম নয়।

রেমব্রাণ্ট ছিলেন সেই সব শিল্পীর অন্যতম, এমন কোন বিষয় ছিল না যা তিনি স্পর্শ করেন নি। তিনি বার বার প্রাচীন ঐতিহ্য প্রাচীন শিল্পরীতি ভঙ্গ করেছেন, তিনি অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে প্রায় অসংখ্যবার প্রচলিত শিল্পপদ্ধতিতে বৈচিত্র্য আনেন। আমষ্টারডামে পড়াশুনা শেষ করে তিনি তাঁর জন্মভূমিতে ফিরে আসেন। সেখানে তিনি রাজসভার একজন মন্ত্রীর উচ্চ প্রশংসা লাভ করেন এবং খুব তাড়াতাড়ি বিখ্যাত হয়ে পড়েন। পাঁচ বছর পর তিনি আবার লিডেন ছেড়ে আমস্টারডামে এসে স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকেন। সেখানে তিনি 'ডাঃ টুল্পের এ্যানাটমি লেসনের' বড় গ্রুপ চিত্রটি এঁকে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি একটি বিখ্যাত ফ্রিসিয়ান পরিবারের মেয়ে সাসকিয়া উইলেনবার্গকে বিয়ে করার জন্য ফ্রিসল্যাণ্ডে যান। সামান্য কয়েকবার ভ্রমণ করা ছাড়া তিনি জীবনের অবশিষ্ট অংশ হল্যাণ্ডের রাজধানীতেই অতিবাহিত করেন। ১৬৩১ সালে তিনি যখন প্রথমবারে আমস্টারডামে আসেন তখন তিনি তাঁর ভবিষ্যতে স্ত্রীর একজন ভাইয়ের বাড়ীতেই আতিথ্য গ্রহণ করেন। তিনি হলেন চিত্রশিল্প ব্যবসায়ী হেনড্রিক উইলেনবার্গ। তাঁর কাছে থাকার সময় আমস্টারডাম হয়ে ইউরোপের বিখ্যাত চিত্র আসা যাওয়া করতো সেগুলি অনুশীলন করায় সুযোগ পেতেন। বহু চিত্রে এই যোগাযোগের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়।

সম্পদশালিনী সাসকিয়ার সঙ্গে বিবাহের পূর্বে ও পরে পোর্ট্রেট অঙ্কনই ছিল রেমব্রাণ্টের প্রধান উৎস। পূর্বে উল্লিখিত জীবনী লেখক অবশ্য ব্যঙ্গভাবে বলেছেন যে ঐ সময়ে বহু অনুরোধ উপরোধ করে অগ্রিম টাকা দিলে তবে তিনি চিত্রাঙ্কণে রাজি হতেন। ইতিমধ্যে তিনি আরও বিখ্যাত হয়ে পড়েন এবং এই খ্যাতিও তাঁর সমসাময়িকগণের মধ্যে ঈর্ষার সঞ্চার করে। তা ছাড়া তাঁর অনেক ধনী ছাত্র ছিল যারা ব্যক্তিগতভাবে চিত্রশিল্প সংগ্রহ করতো। কয়েক বছর যাবৎ তাঁর ছবিগুলিতে আনন্দ ও সুখের ইঙ্গিত পাওয়া যেত এবং এর মূলে ছিল তাঁর সুখী বিবাহিত জীবন। কিন্তু দুর্ভাগ্যও সঙ্গে সঙ্গে চলছিল। সাসকিয়ার সন্তানগুলির সবাই অত্যন্ত শৈশবে মারা যায় একমাত্র ১৬৪১ সালে জাত একটি ছেলে টিটাস বেঁচে ছিল এবং ১৬৪২ সালে সাসকিয়াও মারা যান। ঐ সময়ে তাঁর নিজস্ব শিল্পপদ্ধতিতেও নতুন এক ধারা দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর 'রাত্রির প্রহরী' চিত্রটিতে এই ধারা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। চিত্রের প্রতিটি বিষয়ে সমান মনযোগ দেওয়ার যে পদ্ধতি প্রচলিত ছিল তা তিনি সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করেন। তখনকার চিত্ররসিকগণের কাছে এই নতুন ধারা তেমন উৎসাহের সঞ্চার করতে পারেনি বলে তিনি যে সাফল্য আশা করেছিলেন তা অর্জন করতে সক্ষম হন নি। তা ছাড়া কয়েকজন চিত্র রসিকের সঙ্গে তার বিরোধও তাঁর খ্যাতি বৃদ্ধির সহায়ক হয় নি।

১৬৪৯ খৃষ্টাব্দের পর থেকে তাঁর চাইতে ২০ বছরের ছোট হেনড্রিক ষ্টোফেলস্ নামক একজন নারীর সঙ্গে খুব নিকটসম্পর্ক গড়ে ওঠে। তিনি তাঁকে কোন সময়েই বিয়ে করেন নি, তবে এই মেয়েটির এতো ছবি এঁকেছেন যে তাতে এই মেয়েটির প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সময়ে তিনি যে সব বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হন সেগুলি মনের শান্তি নষ্ট করে দেয়, কিন্তু তাঁর ছেলে টিটাস ও ষ্টোফেলস্ তাঁর পাশে এসে দাঁড়ান এবং তাঁর মনের শান্তি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে থাকেন। তাছাড়া জনগণের দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিবর্তন আসায় তাঁর পোরট্রেট অঙ্কণপদ্ধতি তাদের মনঃপুত ছিল না ফলে তিনি আর্থিক দুর্ভাবনার সম্মুখীন হন। কিন্তু তবুও তিনি তাঁর নিজস্ব শিল্প পদ্ধতিতে কোন পরিবর্তন আনতে রাজি হন নি।

১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে ৫০ বছর বয়সে শিল্পীকে দেউলিয়া বলে ঘোষণা করা হয়। ফলে তাঁকে তাঁর সুন্দর বাড়ীটি ছেড়ে দিতে হয়। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে অর্থাভাবে তিনি তাঁর বাড়ীটি বিক্রী করতে বাধ্য হন। এই পর্যন্ত তিনি পরম উৎসাহে শিল্পকলার যে সব নিদর্শন সংগ্রহ করেছিলেন এবং নিজের যে সব ছবি পরম যত্নে রক্ষা করে আসছিলেন সেগুলির খুব অল্পই অবশিষ্ট রইলো। তখন ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে তাঁর ছেলে টিটাস ও হেনড্রিক ষ্টোফেলস্ চিত্রশিল্পের ব্যবসা সুরু করেন। কিন্তু তাঁর দুর্ভাগ্যের দিন তখনও শেষ হয় নি। হেনড্রিক মারা গেলেন এবং তাঁর নিজের ঠিক এক বছর পূর্বে প্রিয় পুত্র টিটাসও মারা যান।

পরবর্তী জীবনে অত্যন্ত দুঃশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা, আর্থিক কষ্ট, মানষিক অশান্তির মধ্যে রেমব্রাণ্ট যে সব ছবি আঁকেন অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় সেগুলি বর্তমানে তাঁর শ্রেষ্ঠতম শিল্প সৃষ্টি বলে বিবেচনা করা হয়।

জাতীয় নাট্যশালার গঠনতন্ত্র

কোন কিছু গড়তে গেলে তার একটা কাঠামো একান্ত ভাবে দরকার। প্রস্তাবিত জাতীয় নাট্যশালার এমন একটা কাঠামো বিচারের জন্য উপস্থিত করছি। বাংলা দেশে নাট্য-রসিকের অভাব ঘটেছে এমন কথা মানতে পারি না বলেই আশা করছি আমার চিন্তায় যে অসম্পূর্ণতা আছে তা তাঁদের চিন্তায় দূরীভূত হবে এবং জাতীয় নাট্যশালার একটা পূর্ণাংগ আকার গড়ে উঠবে।

প্রথম কথা হ'ল, জাতীয় নাট্যশালা যে সব গোষ্ঠির সহযোগিতায় গড়ে উঠবে সেগুলির প্রত্যেকটিকে এক একটি একক হিসেবে ধরে নিয়েই গোড়ায় কাজ আরম্ভ করতে হবে। প্রত্যেকটি গোষ্ঠির এক একজন প্রতিনিধি প্রাথমিক পরিচালন সভার সভ্য হবেন এবং প্রথমাবস্থায় তাঁরাই নাট্যশালা কিভাবে চলবে, কি নাটক অভিনয় হবে ইত্যাদি বিষয় স্থির করবেন।

এটা একেবারে গোড়ার অবস্থা। জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হলে এই সব গোষ্ঠি প্রতিনিধির সঙ্গে অন্যান্য নাট্যরসিকরা সংযুক্ত হয়ে এর কার্য পরিচালনা করবেন। অবশ্য গোষ্ঠিগুলির ক্ষমতা যাতে খর্ব না হয় তার জন্য তাঁদের কিছুটা বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে। সেই সময়কার গঠন তন্ত্র কেমন হবে এবার সে নিয়ে আলোচনা করা যাক।

জাতীয় নাট্যশালার সদস্য সাধারণতঃ পাঁচ ধরণের হবে—(১) গোষ্ঠি, (২) সক্রিয়, (৩) সহযোগী, (৪) দাতা ও (৫) সাধারণ।

গোষ্ঠিসদস্যরা হবেন বিভিন্ন গোষ্ঠী এবং তাঁদের সমস্ত সদস্যই নিজেদের গোষ্ঠির মাধ্যমে জাতীয় নাট্যশালার সদস্য বলে গণ্য হবেন। গোষ্ঠি সদস্যরা অভিনয়কালে নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন দাবী করতে পারবেন। যা' নাটক অভিনয় হবে সেই সঙ্গে তাঁদের সদস্য সংখ্যার আনুপাতিক হার নির্ণয় করে সেই অনুযায়ী অভিনয়ে ক'টি আসন দেওয়া হবে তা স্থির করা হবে। অবশ্য নিজেদের নাটক অভিনয়কালে তাঁরা কিছু অতিরিক্ত আসন পাবেন। এটা নাট্যশালার নির্দিষ্ট আসন সংখ্যা, অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে বণ্টনের পর কত আসন অতিরিক্ত থাকবে ইত্যাদি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল।

প্রতিটি গোষ্ঠি এছাড়া একজন করে প্রতিনিধি পরিচালক সভায় পাঠাতে পারবেন। এইসব প্রতিনিধিরা নাট্যনির্বাচন, নাটক সম্বন্ধে দৈনন্দিন কার্য পরিচালনা প্রভৃতি কাজ করতে পারবেন। তাঁদের এ কাজে সহায়তার জন্য কার্যনির্বাহক সভা নির্দিষ্টসংখ্যক সদস্য মনোনয়ন করবেন। এই সব সদস্যদের মধ্যে কিন্তু অবশ্যই আলোকসম্পাত, শব্দনিয়ন্ত্রণ, মঞ্চকল্পনা, সংগীতানুসংগ প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হবেন।

সহযোগী সদস্যরা বিভিন্ন মঞ্চানুষংগ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বা নাট্যসমালোচক নট তথা নাট্যকার হবেন। এঁদের মধ্যে কয়েকজন পরিচালক সভার সদস্য হবেন। এঁরা প্রতিটি নতুন নাটক

দেখবার অধিকারী হবেন এবং পূর্বোক্ত বিষয়ে আসন সংরক্ষিত হবে।

যে সব ব্যক্তি অভিনয় বা নাট্যানুষংগে সক্রিয় অংশ গ্রহণে ইচ্ছুক অথচ যাঁরা কোন গোষ্ঠির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নন তাঁরা সক্রিয় সদস্য হতে পারবেন। তবে তাঁদের প্রথমে সাময়িকভাবে গ্রহণ করা হবে এবং যদি তাঁরা নিজেদের সক্রিয়তা সম্বন্ধে পরিচালক সভার আস্থা অর্জন করতে পারেন ত তাঁদের পাকাপাকিভাবে গ্রহণ করা হবে। এইসব স্থায়ী সদস্যরা বিশেষজ্ঞদের জন্য সংরক্ষিত পরিচালক সভার সদস্য হবার যোগ্যতা লাভ করবেন।

যে সব ব্যক্তি জাতীয় নাট্যশালার প্রতি সহানুভূতিবশত তার কার্যকলাপ চালানোর জন্য এককালীন দান হিসাবে থোক কিছু টাকা দিতে রাজী হবেন তাঁদের দাতা সদস্য করা হবে। ন্যূনপক্ষে কতটাকা দিলে দাতা-সদস্য হওয়া যাবে কার্যনির্বাহক সভা তা স্থির করবেন। তাছাড়া প্রতিটি নতুন নাটকের অভিনয় একজন সঙ্গীসহ দেখবার অধিকারী হবেন তাঁরা। এই অধিকার অনুযায়ী পূর্বোক্ত উপায়ে আসন সংরক্ষণ করা হবে।

নাট্যরসিক মাত্রেই জাতীয় নাট্যশালার সাধারণ সদস্য হতে পারবেন এনং তার জন্য নির্দিষ্টহারে মাসিক দক্ষিণা দিতে হবে। বিনিময়ে তাঁরা মাসে একটি করে নাটকের অভিনয় দেখতে পাবেন। তাঁদের সদস্য নিদর্শন দেখিয়ে অভিনয়ের অন্ততঃ ৩ দিন পূর্বে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।

জাতীয় নাট্যশালার প্রতিটি সদস্যই কার্যনির্বাহক সভার নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে ও সদস্য-পদ প্রার্থী হতে পারবেন মোট সদস্য সংখ্যার ন্যূনপক্ষে ১% সদস্য দিয়ে কার্যনির্বাহক সভা গঠিত হবে। (অর্থাৎ সদস্য সংখ্যা যত বাড়বে কার্যনির্বাহক সভার সদস্য ও পূর্বোক্ত সংখ্যার অনুপাত ততই বাড়বে।)

কার্যনির্বাহক সভা মুখ্যত জাতীয় নাট্যশালার করণীয় কর্তব্য স্থির করবে, বার্ষিক আয়-ব্যয়ের খসড়া অনুমোদন করবে এছাড়া পরিচালক সভার পক্ষ থেকে যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে তাও কার্যনির্বাহক সভা কর্তৃক অনুমোদিত হবে। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক কাঠামোয় কর্তব্য সীমা নির্ধারণ করবে কার্যনির্বাহক সভা আর বিশেষজ্ঞ দ্বারা গঠিত পরিচালক সভা সে কর্তব্যরূপায়ণে ব্রতী হবে। অবশ্য কার্য নির্বাহক সভা আংশিকভাবে পরিচালক সভা গঠন করায় কর্তব্য রূপায়ণের ব্যাপারে তাদেরও কিছুটা দায়িত্ব থেকে যাবে।

পরিচালক সভায় নট, নাট্যকার, পরিচালক, নাট্যানুষংগ বিশেষজ্ঞ প্রভৃতির থাকায় বাংলা নাটকের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ করে তার উন্নয়নের পথ নির্দেশ করা এঁদের পক্ষে সম্ভব হবে। নাট্য সমালোচক তথা বোদ্ধারাও থাকায় বাংলা দেশের নাট্যশালার টনাপোড়েন নির্ণয় করা এঁদের অসাধ্য হবে না। তখন ভবিষ্যতের পথ নির্দেশ সহজসাধ্য হবে। এঁরা বিভিন্ন নাটক বিচার করে কোনটি কিভাবে ও কোন দলকে অভিনয় করতে বলা যায় সে বিষয়েও আলোচনা করবেন তবে তাঁদের মতামত নির্দেশ হবে না, হবে উপদেশ। কোন গোষ্ঠির পরিচালক প্রয়োজন মত নিজের অসুবিধা সম্বন্ধে মতামত গ্রহণ করতে পারবেন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নাটকের চরিত্রবিশেষ রূপায়ণে ভিন্ন গোষ্ঠির অভিনেতাকে অনুরোধ করা যাবে।

এ ছাড়া নাট্যকারের সঙ্গে আলোচনা করে কিভাবে নাটকের দোষ ত্রুটি কাটানো যায় সে

বিষয়ে এঁরা আলোচনা করবেন। নট তথা শিক্ষার্থীদের শিক্ষার জন্য ব্যবস্থা করার দায়িত্বও এঁদেরই।

আর্থিক দিক থেকে জাতীয় নাট্যশালার আয় হবে দাতাদের দান, সাধারণ সদস্যের মাসিক দক্ষিণা, সাধারণ দর্শকের প্রবেশ দক্ষিণা ও অন্যান্যভাবে উপার্জিত অর্থ। (সরকারী অনুদান পাওয়া গেলে ভাল, না গেলে এই ভাবেই চালাতে হবে।) ব্যয়ের দিকে নাটক মঞ্চায়নের খরচ, জাতীয় নাট্যশালার দৈনন্দিন কাজকর্ম চালাবার উপযোগী প্রয়োজনীয় অর্থ ও অন্যান্য আনুসংগিক খরচ। বছরের শেষে যা উদ্বৃত্ত থাকবে তা তিন ভাগ করা হবে—একভাগ ভবিষ্যতের জন্য একভাগ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর জন্য ও তৃতীয় ভাগ বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে। প্রত্যেক গোষ্ঠির অভিনীত নাটকের সংখ্যাহার বিচার করে হারাহারিভাবে দেওয়া হবে তাদের।

সুযোগ সুবিধামত নট ও অন্যান্য কর্মীদের কিছু কিছু করে বৃত্তির ব্যবস্থা করা হবে। এইভাবে ধীরে ধীরে প্রত্যেককেই কিছু কিছু বৃত্তিক সম্মানী দেওয়া হবে। তখনই জাতীয় নাট্যশালা তার প্রকৃতরূপ পেতে পারবে।

বাংলা দেশে আজো সংকাজ করার লোকের অভাব ঘটেনি, আশা করছি তাদের মধ্যে নাট্যরসিক কেউ এই অতি প্রয়োজনীয় কাজ করে আমাদের জাতীয় লজ্জা দূর করতে পারবেন। তাঁদের মনে নাড়া দেবার জন্যই এই প্রসংগের অবতারণা।

বাংলা দেশ বিশেষ করে সংস্কৃতিগর্বী নগর কলকাতার নাট্যসংস্থানগুলি এ বিষয়ে অবহিত হবেন কি?

রবি মিত্র

শত বছরের ইন্দো-ইংরেজী সাহিত্য

উনিশ শতকের সূচনা থেকে ভারতে ইংরেজী ভাষার চর্চা শুরু হয়েছে এবং সে আয়োজন রীতিমতভাবে সম্পন্ন হবার প্রস্তুতি দেখা যায় ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে এদেশে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ থেকে। আর ঐসময় থেকে এদেশে যেসব স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হয় তাদের পঠন-পাঠনের মাধ্যমিক হয় ইংরেজী। তার ফলে, সেই সময়ের শিক্ষিত বাঙালীরা ইংরেজী ভাষা ব্যবহারে এতদূর অভ্যস্ত হয়ে পড়েন যে, কর্মস্থলে সভাসমিতিতে, এমনকি ব্যক্তিগত দৈনন্দিন জীবনেও তাঁরা মাতৃভাষার বদলে ইংরেজীই ব্যবহার করতে থাকেন।

অতএব এইসব লোকেরা যে সাহিত্য রচনার সময়েও ঐ ইংরেজী ভাষারই মাধ্যম গ্রহণ করবেন তাতে আর আশ্চর্য কোথায়! বাস্তবক্ষেত্রে হয়েওছিল তাই এবং এরই ফলে ১৮৫৭ থেকে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে ভারতের প্রাক্ স্বাধীনতার একশো বছরে ইংরেজীর মাধ্যমে ভারতীয়দের সাহিত্য চর্চার ফলে গড়ে ওঠে 'ইন্দো-ইংরেজী' সাহিত্য।

এটা ঠিক যে, ইংরেজী ভারতীয়দের শেখা ভাষা, আয়ত্ত করা ভাষা; তাঁদের বুদ্ধিবৃত্তি উন্মেষের ভাষা। তাই ইংরেজীর ওপর দখলের সঙ্গে তাঁদের—মাতৃভাষার ওপর দখলের আকাশ পাতাল পার্থক্য থাকতে বাধ্য। বুদ্ধি উন্মেষের ভাষা আর আবেগ প্রকাশের ভাষা, এই দুইয়ের মণিকাঞ্চন মিলন না ঘটলে সে ভাষায় মহৎ সাহিত্য রচনা সম্ভব হতে পারে না। তাই ভারতীয়রা যে ইংরেজী সাহিত্য রচনা করেছেন তার মধ্যে মহৎ সাহিত্যের খোঁজ আজও মেলেনি তা বলাই বাহুল্য। কারণ যতই হোক, ইংরেজী যে আমাদের কাছে 'বিদেশী' ভাষা। কিন্তু এতো সত্ত্বেও আমরা স্বীকার করতে বাধ্য, বাস্তব জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় নিতান্ত সাধারণ গদ্য থেকে কল্পনার রঙে রঙীন কবিতা—সবরকম লেখাই আমাদের আলোচ্য সাহিত্য ভাণ্ডারের মধ্যে পাওয়া যায়। এই সাহিত্যের সংরচন, নিঃসন্দেহে, অনবদ্য প্রতিভার লক্ষণ। সম্পূর্ণ বিদেশীয় ভাষায় এমনতর সাহিত্য রচনার নৈপুণ্য স্বীকৃত পনেরটি প্রাদেশিক ভাষাতেই ফুল ফোটানো ভারতীয়দের পক্ষে কিছুমাত্র আয়াসসাধ্য নয়।

ঐতিহাসিকের দৃষ্টি নিয়ে এই ইন্দো-ইংরেজী সাহিত্যের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, প্রথম অবস্থায় কেবলমাত্র ভারতীয়দের ঘরোয়াজীবন বা গ্রাম্যজীবনের ছবি আঁকাই ছিল ঐ শ্রেণীর সাহিত্যের মূল অবলম্বন; এবং এগুলি লেখা হয়েছিল মূল্যতঃ সামাজিক অথবা অর্থ নৈতিক পুনর্গঠন কামনায়। এইসব রচনায় প্লট নেই, চরিত্র নেই, নেই সাহিত্যরচনার সামান্যতম কুশলতার পরিচয়। অবশ্য ইংরেজী শিক্ষা এবং খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকদের প্রচারের ফলে উনিশশতকীয় ভারতীয় সমাজ-জীবনের কেমনতর ক্রমবিবর্তন ঘটেছিল তার সুন্দর দলিলচিত্র পাওয়া যায় এইসব রচনা

থেকে। সেই কারণে এই সময়ের ইন্দো-ইংরেজী সাহিত্যের আবেদন সাহিত্যরসিকদের কাছে নেই ; আছে, ঐতিহাসিক এবং সমাজতত্ত্ববিদদের কাছে।

অর্থাৎ এই সময়ের ইন্দো-ইংরেজী সাহিত্যিকদের সাহিত্য প্রতিভার বিচার করতে যাওয়া বৃথা। অবশ্য এঁদের মধ্যে কিছু কিছু লেখক বুদ্ধিবলে তাঁদের প্রতিভায় এই ত্রুটি পাঠকদের কাছে প্রকাশ না করার জন্যে প্রাচীন রূপকথা, প্রচলিত পুরাকথা, এমনকি চলিত গ্রাম্য-গাথাকেও উপজীব্য করে সাহিত্য রচনায় তৎপর হয়েছিলেন।

এই সূত্র ধরে উনিশ শতকের একেবারে শেষের দিকে ইন্দো-ইংরেজী সাহিত্যের লেখকরা তাঁদের রচনার বিষয়বস্তু সংগ্রহের জন্য তাঁদের জাতীয় মহাকাব্য, ইতিহাস, অথবা বৃদ্ধ বা অতি বৃদ্ধ গ্রামবাসীদের কাছ থেকে মুখে মুখে চলে আসা কাহিনীর প্রতি মনোযোগী হয়েছিলেন এবং কেবল-মাত্র বিষয়বস্তুর বিশেষত্বে এইসব রচনা জাতীয় রচনার মর্যাদা লাভ করে। এইসব রচনা সমসাময়িক সাহিত্যভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করা ব্যতীত সেই সময়ে জাতীয় চেতনা গঠনেও সহায়তা করেছিল।

ইন্দো-ইংরেজী সাহিত্যের এই সময়কার অধিকাংশ কাব্যকার বা গল্পকারদের কেবলই ব্যক্তিগত জীবনের ধরাবাঁধা দৈনন্দিন তালিকার রোজনামচাকে অথবা ঘরোয়া জীবনের তুচ্ছ খুঁটিনাটিকে সাহিত্য আখ্যা দেবার প্রয়াস পেতে দেখা যায়। এই সময়ের কাব্যকারদের মধ্যে কেবল ইন্দো-ইংরেজী সাহিত্যের আদি বাঙালী কবি কাশীপ্রসাদ ঘোষের নাম স্মরণীয়। ইনি লেখার মধ্যে কিছুটা কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর The Shair an other Poems তার প্রমাণ দেয়। এই কাব্যের কবিতাবলীর মধ্যে পাওয়া যায় কল্পনাপ্রিয় কবির প্রকৃতিপ্রীতির পরিচয়, দেশপ্রেমের কিছু কিছু প্রমাণ, আরো পাওয়া যায় দশহরা রাসযাত্রা, জন্মাষ্টমী ইত্যাদি রূপ হিন্দুর নানা পালাপার্বণের ওপর লেখা ডজনখানেক কবিতা ;—এইসব কবিতার এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে কবির বাঙালী-মনটির পূর্ণ পরিচয়।

কাশীপ্রসাদের সহগামী, রামবাগানের দত্ত পরিবারে শশীচন্দ্র দত্তের কবিতাতেও গঙ্গাপ্রসঙ্গ, হিন্দু প্রতিমার প্রসঙ্গ ইত্যাদি আছে। এঁরও সামান্য কল্পনাশক্তি ছিল। এই সকল কল্পনাশক্তির দৌলতেই তাঁর রচনার প্লটের মূল অবলম্বন ছিল ফৌজদারী আদালতের কাহিনীসমূহ অথবা ইতিহাসের কাহিনী।

এই পরিবারের হরচন্দ্র দত্ত স্বদেশের ইতিহাস এবং সামাজিক ও পারিবারিক জীবন থেকে কবিতার বিষয়বস্তু সংগ্রহ করেছিলেন ; তাঁর Oriental Lyrics-এ তার নজির রয়েছে। তাঁর Rajputani Bride যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য কবিতা। বিশেষ করে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মিনী উপাখ্যানের পূর্ববর্তী রচনা হিসেবে এই ভারতীয় ইতিহাস, রাজপুত ইতিহাস অবলম্বন করে লেখা কবিতাটির মূল্য বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে অসামান্য তাৎপর্য্যপূর্ণ।

এই দত্ত বংশের কবি অবশ্য গোবিন্দচন্দ্র দত্ত।

তবে বাংলা সাহিত্যের জগতে দত্তকবি বলতে যে প্রতিভাধরকে বোঝায় তিনি হচ্ছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। মধুসূদন ইংরেজীতে পারঙ্গমতা এবং ইংরেজীতে সাহিত্যরচনায় ক্ষমতার কথা বলতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র।

ইন্দো-ইংরেজী সাহিত্যের প্রায় সার্থক গল্প লেখক হচ্ছেন বাংলার অমর সাহিত্যস্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর Rajmohan's Wife-এ বিষয়ে তাঁর প্রথম এবং একমাত্র অবদান। Indian Field পত্রিকায় ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে এটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। কিন্তু প্রথম জাতীয় চেতনার তাড়নে এরপরেই তিনি ইংরেজী ভাষার মাধ্যম পরিত্যাগ করে বাংলা ভাষায় রচনাকাজে মনোযোগ দেন এবং অভূত সিদ্ধিলাভ করেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ অনুসরণ করে ইন্দো-ইংরেজী সাহিত্যের একজন সার্থকনামা সাহিত্যিক রমেশচন্দ্র দত্তও ইংরেজী ভাষার মাধ্যম ত্যাগ করে বাংলা ভাষায় লিখতে তৎপর হন।

মাতৃভাষার আকর্ষণে ইংরেজী ভাষার মাধ্যম পরিত্যাগকারী আর একটি নাম যে অবশ্য স্মরণীয় তা হচ্ছে দত্ত কুলোদ্ভব শ্রীমধুসূদন। এঁর কথা অবশ্য আগেই স্মরণ করা হয়েছে।

মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের অসামান্য পরশ থেকে বঞ্চিত হয়ে ইন্দো-ইংরেজী সাহিত্য চরম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, একথা প্রতিটি সাহিত্যরসিক অবশ্যই স্বীকার করবেন।

উনিশ শতকের শেষাংশে ইন্দো-ইংরেজী গল্পসাহিত্যে বেশ কয়েকজন মহিলা সাহিত্যিকের আবির্ভাব-কথা এইখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভারতীয় নারীজাগরণে রাজা রামমোহন রায় যে শুভপ্রয়াসের সার্থক সূচনা করেন তারই সূত্র ধরে এক সর্বভারতীয় নারী আন্দোলনের ঢেউ ওঠে। সেই ঢেউয়ের ধাক্কায় বেশ কিছু উচ্চশিক্ষিতা সাহিত্য-প্রতিভাসম্পন্ন নারী জগত সমক্ষে ভারতীয় নারীর পিছিয়ে থাকার কারণ ব্যক্ত করবার অভিপ্রায় নিয়ে লেখেন আত্মজীবনী ; রচনা করেন গল্প গাথা গান কবিতা। শ্রীমতী অরু, শ্রীমতী তরু দত্ত, শ্রীমতী ক্রুপাবাই সাথী আনন্ধন্, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ইত্যাদির নাম এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

একটি বিষয় বিশেষ লক্ষণীয় ইন্দো-ইংরেজী সাহিত্যের একশত বছরের ইতিহাসে কোন উল্লেখযোগ্য উপন্যাস লেখা হয় নি। ভারতের সকল ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষাতে উপন্যাসের স্বর্ণসিংহাসন রচিত হয়েছে ; ভারতের খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখেরা বাংলা ভাষাতেই উপন্যাস রচনা করেছেন।

এই কারণে, ভারতের অন্য ভাষাভাষী পাঠকদের এবং সুদূর ইংল্যাণ্ডের পাঠকদের জন্য পাঁচখানি উপন্যাস—যথাক্রমে দুর্গেশনন্দিনী, বিষবৃক্ষ, কপালকুণ্ডলা, কৃষ্ণকান্তের উইল ও যুগলাঙ্গুরীয় ইংরেজীতে অনুবাদ করা হয়। এই দৃষ্টান্তে একটা নতুন অনুপ্রেরণা পেয়ে এর পরেই আরম্ভ হয়ে যায় ভারতীয়গণ কর্তৃক আপন ভাষায় লেখা উপন্যাসের ইংরেজী অনুবাদকরণ। ভারতীয় সাহিত্যিকরা বুঝতে পারলেন যে নিজেদের রচনার ইংরেজী অনুবাদ করতে পারলে তাঁরা ইংরেজ গোষ্ঠীর কাছে অল্প আয়াসে পরিচিত হতে পারবেন। এই ধরনের চিন্তার অনুবর্তী হয়ে ইংরেজী অনুবাদ কাজে ভারতীয়রা বেশ মনোযোগ দেন। প্রসঙ্গতঃ বিশেষ উল্লেখযোগ্য, রমেশচন্দ্র দত্তের মতো ইংরেজী-অভিজ্ঞ ব্যক্তিও গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে পরবর্তীকালে অর্থাৎ বিশ শতকের প্রথমে নিজের লেখা বাংলা উপন্যাসের ইংরেজী অনুবাদ করেন। এই গড্ডালিকাপ্রবাহের স্রোত বয়ে যায় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকাল পর্যন্ত। অনেকের ধারণা, রবীন্দ্রনাথ যে আপন বাংলা রচনার ইংরেজী অনুবাদ করেছিলেন তারও মূলে ছিল এই প্রবাহের প্রভাব।

এই সব অনুবাদ সরাসরিভাবে ইন্দো-ইংরেজী সাহিত্যের অন্তর্ভূত না হলেও পরোক্ষভাবে এইসব কাজ ঐ সাহিত্যভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করায় এ বিষয়টি নিয়ে এখানে আলোচনা করা হলো।

তবে ইন্দো-ইংরেজী সাহিত্যের প্রকৃত গল্প উপন্যাসের শুরু বিশেষ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে এবং এঁদের মধ্যে যে নামগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য তা হচ্ছে কে. এস. বেঙ্কটরমণ, মুলকরাজ আনন্দ, আর কে নারায়ণ, রাজারাও, ডন্ মোরেজ, ডি. এন্. কার্কার্, নীরোদ চৌধুরী ইত্যাদি ইত্যাদি।

বেঙ্কটরমণের Murugan the Tiller (১৯২৭), Kundan the Patriot (১৯৩২) ইত্যাদিতে আছে আদর্শবাদী প্রকৃতিপ্রেমিকের বাণী। মুলকরাজ Two leaves and a Bud (১৯৩৭), Coolie, untouchable প্রভৃতির মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার শ্রীমণ্ডিত সমাধানের প্রয়াস পা'ন। The Dark Room (১৯৩৮), The English Teachar (১৯৫৫) ইত্যাদির রচয়িতা নারায়ণের সর্বাধিক দক্ষতা ছোট গল্প রচনায়; একটিমাত্র ভাবকে অবলম্বন করে,—অথবা একটি মাত্র ঘটনাকে কেন্দ্র করে সার্থক ছোট গল্প রচনায় নারায়ণ সিদ্ধ হস্ত। The Serpent and the Rope (১৯৬২) ইত্যাদির লেখক রাজারাও-ও ছোট গল্প রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। অবশ্য উপন্যাস রচনাতেই তিনি সর্বাপেক্ষা কৃতী। ঔপন্যাসিক হিসেবে ইন্দো-ইংরেজী সাহিত্যিকদের তিনি শিরোমণি। এঁর লেখা উপন্যাসের সংখ্যা বেশি নয়; কিন্তু যে কয়টি লিখেছেন গভীর ভাবের পরশে তারা দ্যুতিময়। সচেতন-শিল্পী রাজারাও-এর রচনার বস্তু মহাকাব্যধর্মী এবং বর্ণনা কাব্যময়।

ইন্দো-ইংরেজী সাহিত্যিকদের মধ্যে অধুনাকালে যে-সব নাম আন্তর্জাতিক খ্যাতি পেয়েছে তার মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, শ্রীজওহরলাল নেহেরু (The Discovery of India), ভবানী জংসনের লেখক ইত্যাদির নাম অবশ্য স্মরণীয়।

অবশেষে একটি কথা বলা দরকার যে ইন্দো-ইংরেজী সাহিত্যের রচনার সঙ্গে যদি কেউ অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড বা কানাডায় গড়ে ওঠা ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা করতে যান তবে সেটা বিশেষ ভুল করা হবে। কারণ সেইসব দেশে ইংরেজী ভাষার চর্চার সঙ্গে ভারতে ইংরেজী ভাষা চর্চার গোড়াতেই বিরাট ব্যবধান। এদেশের মতো সে সব দেশে ইংরেজী ভাষাকে ভাষাগত অথবা সংস্কৃতিগত কোন বাধার সম্মুখীন হতে হয় না; অন্যদিকে ভারতে ইংরেজী একেবারেই বিদেশী জিনিস। এত সত্ত্বেও ইন্দো-ইংরেজী সাহিত্য যেভাবে সার্থকতার সঙ্গে সমৃদ্ধ হয়েছে ও হচ্ছে তা মোটেই উপেক্ষার বিষয় নয়; পরন্তু এটি ভারতীয়দের বিশেষ প্রতিভার দৃষ্টান্ত।*

* নিউ ইয়র্কস্থ কলম্বো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী ও তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক John B. Alphonso-র-প্রবন্ধ থেকে কিছু কিছু সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

গীতা পাল

বাংলা উপন্যাসে আধুনিক পর্যায় : রণেন্দ্রনাথ দেব ॥ বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১ নং শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা মূল্য ১২·০ টাকা ॥ পৃষ্ঠা : ৩৩৩ ॥

ডাক্তার শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' প্রকাশিত হবার পরও যে অনেক কথা বলবার আছে তার সার্থক প্রমাণ রেখেছেন রণেন্দ্রনাথ দেব তাঁর 'বাংলা উপন্যাসে আধুনিক পর্যায়' গ্রন্থে। এটি লেখকের গবেষণা গ্রন্থ। শ্রীযুক্ত দেব স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে তাঁর বক্তব্য পেশ করতে সচেষ্ট হয়েছেন এবং তাঁর প্রচেষ্টা আনকাংশে সার্থক। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে তিনি বিচার করতে চেয়েছেন চারজন প্রখ্যাত ঔপন্যাসিকের কৃতকর্মকে। এই চারজন হলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু ও মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

মূল আলোচনায় প্রবেশের প্রাক্কালে লেখক 'বাংলা উপন্যাসের ঐতিহ্য' 'আধুনিক উপন্যাসের জন্ম' এবং 'সামাজিক পটভূমি' সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ অথচ তথ্য সমৃদ্ধ আলোচনা করেছেন। বিশেষ চারজন ঔপন্যাসিক তাঁর গ্রন্থে কেন স্থানলাভ করেছেন, এ বিষয়ে লেখক নিজেই আলোকপাত ক'রেছেন তাঁর কথায় 'বর্তমান আলোচনা আধুনিক বাংলা উপন্যাসের কালানুক্রমিক ইতিহাস নয়। আত্যতনিক সমাজজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে লেখকদের মূল্যবোধ কিভাবে গড়ে ওঠে এবং তাদের উপন্যাস-শিল্প এর দ্বারা কতদূর নিয়ন্ত্রিত ও সমৃদ্ধ হয়, মুখ্যভ'বে একালের প্রধান চারজন ঔপন্যাসিকের সমগ্র সাহিত্যকৃতি বিশ্লেষণ করে তা দেখাবার চেষ্টা করেছি। আধুনিক উপন্যাসের এক দিগন্তে বিভূতিভূষণের গ্রাম প্রকৃতি, অপর দিগন্তে বুদ্ধদেব বসুর নাগরিকতা ; এর একপ্রান্তে তারাশঙ্করের অহিংসামন্ত্র, অন্য প্রান্তে মাণিক বন্দ্যোপাধায়ের তীক্ষ্ণ কঠিন বৈজ্ঞানিক সমীক্ষণ।'

আধুনিক বাংলা উপন্যাসে বিষয়বস্তুগত এবং রীতিগত বৈচিত্র্য প্রচুর মেলে। কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞার দ্বারা এর নির্দেশ করা শক্ত কাজ। নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে কয়েকটি লক্ষণ যে বেছে নেওয়া যায় না তা নয়। ডক্টর দেব বারোটি লক্ষণ খুঁজে পেয়েছেন। সেগুলি হলো প্রচলিত আদর্শে বিশ্বাসের ভাব, যৌনজীবনের অকপট চিত্র, বাস্তবতা বোধের পুষ্টি, পশ্চাত্য প্রভাবের স্বীকরণ বৈজ্ঞানিক মনোভাব ও যুক্তিবাদের প্রসার, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সূচনা, বিভিন্ন মতবাদের অনুশীলন ও রাজনৈতিক চেতনার স্ফুরণ, আভিজাত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও নিম্নশ্রেণীর জীবনালেখ্য অঙ্কন, নগর ও গ্রামের প্রভাব এবং দেশীয় সংস্কৃতিতে বিবর্ধমান ঔৎসুক্য, কাহিনীতে বক্তব্যের গুরুত্ব বৃদ্ধি, রূপ ও রীতি বিষয়ে পরীক্ষা প্রবণতা। এই বিভিন্ন লক্ষণসমূহকে আশ্রয় করে শ্রীযুক্ত দেব বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছেন।

রণেন্দ্রনাথ দেব মনে করেন যে চারজনের কথা তিনি আলোচনা করেছেন তাঁরাই আধুনিক উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ শিল্পী। এ সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ থাকতে পারে, কিন্তু লেখক পরম নিষ্ঠাসহকারে

তাঁর বক্তব্যবস্তু নিয়ে আলোচনা করেছেন। তা সত্ত্বেও তিনি অন্যান্য প্রখ্যাত ঔপন্যাসিকদের অপাংক্তেয় ক'রে রাখেন নি। ধূর্জটিপ্রসাদ, গোকুল নাগ, মণীন্দ্রলাল বসু, বনফুল, শৈলজানন্দ, প্র. না. বি, গোপাল হালদার, সরোজ রায়চৌধুরী, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রবোধকুমার সান্যাল সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করেছেন মূল বস্তুতে প্রবেশের ভূমিকারূপে।

বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, বুদ্ধদেব ও মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাতে কিভাবে একালের জীবন সমস্যার চিত্ররূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে তা লক্ষণীয় বস্তু। শুধু তাই নয়, তাঁরা যুগোচিত নতুন জীবন-তাৎপর্যের সন্ধান উপস্থাপিত করেছেন। এরজন্য প্রয়োজন বর্তমান সমাজের অভিনিবেশ-মূলক সমীক্ষা। 'সামাজিক পটভূমি' শীর্ষক অধ্যায়ে লেখক তাঁর মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়াছেন।

এর পরবর্তী অধ্যায়ে লেখক মূলখণ্ডে প্রবেশ করেছেন। তাঁর বিশ্লেষণভঙ্গী বৈজ্ঞানিক একথা বলা হয়েছে। বিভূতিভূষণকে আলোচনা করেছেন সাতটি আপাত পৃথক ও সম্পর্কযুক্ত স্তরের মাধ্যমে। 'প্রকৃতি ও মানুষ' দিয়ে শুরু করেছেন, আর অধ্যাত্ম দৃষ্টি, প্রেম, ইচ্ছামতী, ছোট গল্প, দৃষ্টিকোণ ইত্যাদি খণ্ড স্তরের ভিতর দিয়ে বিভূতিভূষণের এক অখণ্ড সত্তা সৃষ্টি করেছেন তিনি। এর মধ্যে যে কথাটি তিনি নতুন শুনিয়েছেন তা হলো 'পথের পাঁচালী'র প্রথমাংশে এপিক লক্ষণ স্পষ্ট। বিভূতিভূষণের অধ্যাত্ম দৃষ্টি সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, 'বিভূতিভূষণের অধ্যাত্মসাধনা যোগিসাধকের সাধনপন্থার চাইতে স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট, তা না হলে ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা জেগে ওঠার পরও মানবজীবনের সুখ দুঃখের ইতিবৃত্ত তার কল্পনায় আর দোলা দিত না।'

তারাশঙ্করও একধরণের ঈশ্বর-বিশ্বাসে পুষ্ট। শ্রীযুক্ত দেব বলেছেন, 'অতি রাগের চরম পরিণামে যেমন তিনি দিব্যানুভূতির জাগরণ লক্ষ্য করেছেন তেমনি পাপের ও দুঃখের পরিণতি বিষয়ে চিন্তাও তাঁকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও মঙ্গলময়ত্বে বিশ্বাসে প্রণোদিত করেছে। মানুষ কেন জীবনে দুঃখ পায় এবং দুঃখভোগের দ্বারা তার জীবন উন্নততর হয় কিনা এই চিন্তা অতি প্রাচীন। তারাশঙ্করের রচনাতে এ বিষয়ে তাঁর ধারণা ক্রমশঃ স্ফুটতর ও সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করেছে।' 'জমিদারি প্রথার স্মৃতি, দেশ ও মানুষ, তন্ত্রাচার ও বৈষ্ণব সাধনা, অতিরাগ, নীতিবোধের উন্মেষ, আরোগ্যনিকেতন' ইত্যাদি অধ্যায়ের মাধ্যমে তিনি তারাশঙ্করের মানবসত্তা ও শিল্পীসত্তার পরিচয় পূর্ণাঙ্গ ক'রে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন।

বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে মূল সুর প্রেম। নর-নারীর আকর্ষণ ও ভাব-বৈচিত্র্যের সন্ধানে তিনি যাত্রা শুরু করেছিলেন এবং এখনও তাই। বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসসমূহ আলোচনা করলে দুটি ধারার সন্ধান পাওয়া যায়। এক ধারায় প্রেমের সঙ্গে যৌন জীবনের সম্পর্ক বিষয়ে অন্বেষা, অপরদিকে প্রেমের ব্যর্থতার আলেখ্য চিত্র। এ ছাড়া মেকি আভিজাত্যকে উপহাস করে প্রাণের সুস্থ প্রকাশ ও বিধৃত হয়েছে তাঁর রচনায়। ব্যঙ্গধর্মী চিত্র রচনায় তাঁর সঙ্গে আলডুস হাকস্‌লির তুলনা বেশ চিত্তগ্রাহী। বুদ্ধদেব বসুর খ্যাতির মধ্যগগনের দিনেও লেখক সাহসিকতার সঙ্গে তাঁর মন্তব্য রেখেছেন, 'কবি হিসেবে বুদ্ধদেব বসুর পরিশ্রমশীলতা, অনুসন্ধান ও শব্দানুভূতি যেমন তাঁর উপন্যাসে দীপ্তি বিকাশের হেতু হয়েছে তেমনি একথাও অস্বীকার করা যায় না যে অভিজ্ঞতার অভাবে তাঁর

বহু গল্প নীরক্ত, প্রকৃত আবেগহীন, ভারি এবং শ্লথ। তাঁর অধিকাংশ-চরিত্রকে তাই মনে হয় প্রাণবন্ত ও সজীব নয়, বুদ্ধির দ্বারা বিশ্লেষিত চরিত্রের খসড়া মাত্র।'

লেখকের সর্বশেষ আলোচ্য মানুষ মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভূতিভূষণ এবং মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেন দুই মেরুর মানুষ। প্রথম ব্যক্তি প্রকৃতিকে মায়ের মত দেখেছেন, জীবন-যন্ত্রণার গ্লানি উপশমের জন্য তিনি প্রকৃতিমাতার আশ্রয়ে বিশ্বাসী ছিলেন; আর মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় নাগর সভ্যতার সমস্ত জটিলতা নগ্নমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। বিভূতিভূষণ বর্তমান যুগের সিংহদ্বারে দাঁড়িয়ে যুগের সঙ্গে জীবনকে বিচার করতে চেয়েছিলেন আর মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় সিংহদ্বার অতিক্রম করে প্রবেশ করেছিলেন এই যুগের অন্দরমহলে। তিনি এ যুগের গৌরব, তার বিশালতা, পঙ্কিল অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং ভাবসংঘাত প্রত্যক্ষ করেছেন এবং ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্কটাকে বুঝতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এই প্রগাঢ় অনুভূতির ছাপ তাঁর রচনার সর্বত্র। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় মনেপ্রাণে বৈজ্ঞানিক চিন্তার অনুপন্থী এবং চিন্তাধারার জগতে বিবর্তনবাদে তিনি বিশ্বাসী। গবেষক রণেন্দ্রনাথ অতি যত্নসহকারে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকটি খণ্ডের সংযোজনে অখণ্ড হয়ে উঠেছেন। বিজ্ঞান সাধনা, মনোবিজ্ঞান ও ধর্ম, সংগ্রামী মানুষ, মধ্যবিত্তের সংকট, প্রেম, শিল্পকলার তাৎপর্য, জীবিকা ও জীবন'—এ ধরণের আপাত বিচ্ছিন্ন চিত্রের মধ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণ শিল্পীর রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন এই পরিশ্রমী এবং নিষ্ঠাবান গবেষক।

একসময়ে ফ্রয়েডীয় থিয়োরীতে আস্থাশীল মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় যখন এই তত্ত্বের ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন হলেন, তৎক্ষণাৎ তাকে পরিত্যাগ করতে কুণ্ঠিত হন নি। শেষপর্যন্ত তিনি মার্কসীয় আলোকে ব্যাখ্যাত মনোবিজ্ঞানে আশ্রয়ী হলেন। এ পরিবর্তন নিঃসন্দেহে দুরূহ। লেখক এ বিষয়ে অনেক আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বভাবের একটি স্থায়ী গুণ এই দুই বিপরীতধর্মী চিন্তাপ্রণালীর প্রতি তাঁকে দুইকালে আকর্ষণ করেছিল—তা হচ্ছে তাঁর বৈজ্ঞানিক মনোভাব। বিজ্ঞাননিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে তাঁর জীবনদর্শন বিকশিত হয়েছিল।'

সাম্প্রতিককালে অনেক গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। মনে হচ্ছে আলোচ্য গ্রন্থটি একটি স্বতন্ত্র আসন দাবী করবার স্পর্ধা রাখে। লেখক বঙ্গসাহিত্যের ছাত্র এবং এই দিকে বিচরণ করেও তাঁর দৃষ্টি বৈজ্ঞানিক। একারণেই তাঁর বিশ্লেষণ পদ্ধতি নিপুণতর বলে মনে হয়েছে। গ্রন্থের প্রচ্ছদ ভাল হলেও মুদ্রণ সর্বত্র তৃপ্তিকর নয়। মুদ্রণের অপারিপাট্যকে তুচ্ছ করে দিয়েছে লেখকের মননশীল প্রবন্ধাবলী। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ছাত্র, অধ্যাপক এবং সাহিত্যের অনুরাগীদের কাছে 'বাংলা উপন্যাসে আধুনিক পর্যায়' এক প্রয়োজনীয় সংযোজন।

অমিয়কুমার মজুমদার

অং বং চং ॥ অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় ॥ প্রকাশিকা—শ্রীমতী অঞ্জলি চট্টোপাধ্যায় ॥ গোড়খাড়া, কামরাবাদ (সোনারপুর), ২৪ পরগণা ॥ এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা ॥

ছড়া ছোটদের জন্য। কিন্তু সত্যিকারের ছড়ার আবেদন সর্বজনীন। সব বয়সের পাঠককেই তা আনন্দ দেবে ছড়ার নিজস্ব গুণে; শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'অং বং চং' এই জাতীয় একটি ছড়ার বই যা ছুটে চলা ঝর্ণার মতো, বেজে ওঠা নূপুরের মতো, দুলে ওঠা ঝুমকোর মতো তার ধ্বনির জন্যে মনকে নির্ভর আনন্দে আচ্ছন্ন করে। চিরকালের খামখেয়ালীপনা ছড়ার ছন্দ আর সুরের দোলার প্রতি কার না দুর্বলতা? ছোটদের তো অবশ্যই। যে কারণে ছড়া আমরা বার বার পড়ি এবং ছড়াও আমাদের বার বার পড়িয়ে ছাড়ে। অনেক কিছু বিস্মৃত হই কিন্তু তেমন ছড়া আমৃত্যু সুরের দোলায় মনের ভিতরে বিচরণ করে।

'অং বং চং' গ্রন্থের ছড়া সম্ভার অনেকেরই ভালো লাগবে—ছোটদের তো নিঃসন্দেহে। অমরেন্দ্রনাথের কলমের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য ছন্দের দুলুনি ভাবের বিস্তার :

ঢুল ঢুল ঢুলুনি
ওই এলো ভুলুনি,
নিয়ে গেলো ভুলিয়ে
দোলা দেই দুলিয়ে ॥ (ঢুলুনি)

এবং 'ফুল-ফুল ফুল-কি—
ফুল নয় ফুল্‌কি।
দুল দুল দুল-কি?—
দুল নয়, দুল্‌কি
উড়কুট উল-কি?—
উল নয়, উল্‌কি ॥ (উল্‌কি)

গ্রন্থের অধিকাংশই রচনা 'ননসেন্স রাইমস' পর্যায়ের। এই জাতীয় ছড়ায় ভাবের অভাবের দিকটা আশ্চর্য ধ্বনি সৃষ্টির মাধ্যমে শিশুচিত্তকে যেভাবে কাছে টানবে তা প্রশংসার্হ। অধিকাংশ ছড়া পাঠ করে ছোটরা নিঃসন্দেহে আনন্দ পাবে। বিশেষতঃ 'বায়না; খোকন-সোনা লক্ষ্মীটি; আয়তারা (এ ক্ষেত্রে মনে হয় কবি যদি ছড়াটিকে ক্রিয়াপদ কথ্যভাষায় রূপান্তরিত করতেন তাহলে আরো শ্রুতিমধুর হতো?); ভোজবাজি; ডুগডুগি; তুড়ির ছড়া; টই টম্বুর' ছড়াগুলি খুব সুন্দর। পরিশেষে 'হালতুর পথে ঘাটে' রচনাটি অপেক্ষাকৃত সাধারণ; অন্যান্য সুন্দর সুন্দর রচনার পাশে বেশ বেমানান। গ্রন্থটি সচিত্র এবং সু-চিত্রিত। এ বিষয়ে প্রশংসা করতে হয় শিল্পী সীতেশ রায়-কে। ছড়াগুলির প্রাণকে তিনি আরো প্রদীপ্ত করে তুলেছেন তাঁর তুলিতে।

ইন্দ্রনীল সেন

Regd. No. C-315 Phone : 23-5155 February'66 (0.50) Central Regd. No. R.N.2602/57 SAMAKALIN

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমকালীন

ত্রয়োদশ বর্ষ ॥ ফাল্গুন ১৩৭২

sowing the seeds of progress

UNION CARBIDE PRODUCTS FOR INDIA'S HOMES, INDUSTRIES, AGRICULTURE:

EVEREADY Torch Batteries, Torches, Torch Bulbs, Radio Batteries, Transistor Batteries, Photoflash Batteries, Hearing-Aid Batteries, Dry Cells, Telephone Cells, Railroad & Industrial Cells, Mantles, NATIONAL Arc Carbons.

UNION CARBIDE Polyethylene Resins, Polyethylene Film, Polyethylene Pipe, Plastics, Chemicals, Acetic Acid, Butyl Alcohol, Butyl Acetate, Ethyl Acetate, Agricultural Chemicals, Zinc Addressograph Strips, EMMO Photo-engravers' Plates, UNION CARBIDE Carbon and Graphite products, Welding and Cutting Equipment, Ferro Alloys and Metals, Hard Facing and Corrosion Resistant Materials.

JWTUC 2606

দেশীয় গাছগাছড়া হইতে ইহা প্রস্তুত হয়।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর, কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ যোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম, এ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ, সি, এস (লণ্ডন), এম, সি, এস (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতাকেন্দ্র-ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম, বি, বি, এস (কলিঃ) আয়ুর্বেদাচার্য্য

সুলেখা
ড্রইং এর
কালি
সুলেখা
প্রতিদিনের প্রয়োজনে
সুলেখা
ফাউণ্টেন পেন-এর
কালি
অ্যাডসল
অফিস
পেস্ট
ও গাম
সিক্যুরিটি
সিলিং
ওয়াক্স
সুলেখা
স্ট্যাম্প প্যাড
সুলেখা
ওয়ার্কস্ লিমিটেড
সুলেখা পার্ক, কলিকাতা—৩২
Progressive/SW 24

সম্পূর্ণ ঠিকানা
থাকলে
তাড়াতাড়ি
ডাকবিলি
করা যায়
ঠিকানা অসম্পূর্ণ
থাকলে ডাকবিলি
করতে দেরী হয়
ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগ
DA-65/611 Bengali.

ত্রয়োদশ বর্ষ ১১শ সংখ্যা

ফাল্গুন তেরশ' বাহাত্তর

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

Statement in From IV of the Registration of Newspapers (Central) Rules, 1956.

SAMAKALIN

1.	Place of Publication	Calcutta.
2.	Periodicity of its Publication	Monthly.
3.	Printer's Name	Anandagopal Sengupta.
	Nationality	Indian.
	Address	24, Chowringhee Road, Calcutta.
4.	Publisher's Name	Anandagopal Sengupta.
	Nationality	Indian.
	Address	24, Chowringhee Road, Calcutta.
5.	Editor's Name	Anandagopal Sengupta.
	Nationality	Indian.
	Address	24, Chowringhee Road, Calcutta.
6.	Names and address of individuals who own the newspapers and partners or shareholders holding more than one per cent of the total capital.	Anandagopal Sengupta. *Proprietor.* 24, Chowinghee Road, Calcutta-13.

I, Anandagopal Sengupta, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

(Sd.) A, G, SENGUPTA.
Signature of Publisher.

Dated, 1st March, 1966.

অ্যালিস ইন দি ওয়ান্ডার ল্যাণ্ড

শিশিরকুমার দাশ

আমাদের কৈশোরের বিস্ময় ও আনন্দ জড়ানো অ্যালিস ইন দি ওয়াণ্ডার ল্যাণ্ড-এর একশো বছর বয়স হল। একশ বছর আগে এক জুলাই মাসের উজ্জ্বল অপরাহ্নে তিনটি উৎসুক বালিকার কাছে যে গল্পের শুরু হয়েছিল সারা পৃথিবীর রসিক মানুষের মনে সেই গল্প আজ চিরস্থায়ী আসন করে নিয়েছে বললে কম বলা হয়, উপকথা, রূপকথা, পৌরাণিক কথা যেমন জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে মিশে বিশেষ বিশেষ শ্রেণী বা গোষ্ঠীর মানুষের কল্পনা ও ভাবের জগৎকে বিস্তৃততর করে, অ্যালিসের আজব জগতের কথা তেমনই আজ বহু জাতির কাহিনী ভাণ্ডারের মধ্যে মিশে গেছে। এমন সার্বজনীন কাহিনী রূপকথা ছড়া আর কোথায়? অ্যালিসের জগৎ তাই বিশ্বের শিশুর অনন্ত কল্পনার বিশ্বে সহজ স্থান করে নিয়েছে। এই কাহিনীর স্রষ্টা চার্লস লাটউইগ ডজসন, যাঁর ছদ্মনাম লুইস ক্যারল, তিনি ছিলেন অক্সফোর্ডের ক্রাইস্ট চার্চ কলেজের অধ্যাপক; অঙ্কশাস্ত্রের নিখুঁত নির্ভুল জগতের মধ্যে যাঁর বিচরণ, তাঁরই কল্পনা সৃষ্টি করল এক অদ্ভুত, বিচিত্র, সৃষ্টিছাড়া জগতের। বিপরীতের কী বিচিত্র সমাহার।

১৮৩২ এ ডজসন-এর জন্ম, ১৮৫৫তে অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক হয়ে কলেজে প্রবেশ। একটানা ছাব্বিশ বছর অধ্যাপনা করেছেন খ্যাতির সঙ্গে। অঙ্কশাস্ত্রে ব্যর্থ হয়ে সাহিত্যের পথে এলেন এমনটি নয়। দীর্ঘকাল ধরে গণিতের চর্চা করেছেন; গণিতের প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করেছেন বহু। ইউক্লিড এবং তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের নিয়ে তাঁর গবেষণা সেকালের পণ্ডিত সমাজে ডজসন-কে প্রতিপত্তি দিয়েছিল, দিয়েছিল দুর্লভ সম্মান। কিন্তু গণিতের সাধনা তাঁকে অমরত্ব দেয়নি। সেই অমরত্বের স্বাদ তিনি ব্যক্তি জীবনে পেয়েছিলেন শিশুর ভালবাসায়, আর স্রষ্টা হিসেবে পেয়েছেন শিশুর জগৎ

রচনা করে।

এই শিশুর প্রতি ভালবাসার আর একটি প্রকাশ হল তাঁর আলোকচিত্র তোলার নেশা। তিনি উত্তম ছবি তুলতেন, রাণী ভিক্টোরিয়াও ছিলেন তাঁর তোলাছবির ভক্ত। হেলমুট গার্নাসিয়ার্ন-সাহেব তাঁর লুইস ক্যারল বইটির মধ্যে ডজসন-এর তোলা চৌষট্টিটি ছবি ছেপেছেন এবং ফোটোগ্রাফির ইতিহাসে তাঁর যোগ্যস্থান নির্ণয় করেছেন। তিনি বলেছেন 'লুইস ক্যারল হলেন উনিশ শতকের শিশু-আলোকচিত্রকারদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ'। শিশুর প্রতি আকর্ষণ, আর সেই আকর্ষণের চেয়েও গভীর ভালবাসা তাঁর চৈতন্যে এমন ভাবে মিশেছিল বলেই বোধহয় অঙ্কশাস্ত্রের বাইরের জগতে যখনই তিনি বিচরণ করেছেন তখনই চেয়েছেন শিশুর সান্নিধ্য, কারণ তাঁর ভাষায়, 'ভগবানের নিকটতর'।

ডজসন যখন গণিতের অধ্যাপক তখন ডীন ছিলেন লীডল সাহেব। তাঁর তিনটি কন্যা, লেরিনী, অ্যালিস আর এডিথ। অ্যালিসের বয়স যখন মাত্র চার তখন (অর্থাৎ ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে) পঁচিশে এপ্রিল প্রথম ডজসন তাঁকে দেখেন। ইনিই এই বিশ্বজয়ী গ্রন্থের নায়িকা। কখন অগোচরে ধীরে ধীরে তাঁর বন্ধুত্ব হয়ে গেল। তিন বোন মিলে হঠাৎ তাঁর ঘরে হাজির হত, গল্পের আব্দার জুড়ত, ডজসন তাদের গল্প শোনাতেন। জীবনে অন্য সব ব্যাপারে নিয়মের শাসনে যাঁর ছিল অগাধ বিশ্বাস, নিজের জীবনও যাঁর অতি কঠিন নিয়ম শাসিত, সেই মানুষের জীবনে এরা অন্য জগতের যে স্বাদ বয়ে নিয়ে আসত, তাকে তিনি পরম আগ্রহে আমন্ত্রণ করতেন। তিনি তিনটি আগ্রহী চোখের দিকে তাকিয়ে গল্প শুরু করতেন—কেন, কেমন করে হবে, অসম্ভব, হতেই পারে না —ইত্যাদি প্রশ্নে এবং কথায় গল্পের স্রোত যেত পাল্টে।

১৮৬২ সালের ৪ঠা জুলাই এই তিনটি মেয়ের সঙ্গে অধ্যাপক ডজসন বেরোলেন বনভোজনে, নদীপথে। একটি নৌকায় চারটি প্রাণী। দাঁড় বাইতে বাইতে আর বিচিত্র গল্প করতে করতে সেই উজ্জ্বল দিনটি কেটে গেল। রাত্রে বাড়িতে ঢোকার আগে দশবছরের অ্যালিস হঠাৎ বলল: "আমার জন্যে তুমি এই গল্পগুলো লিখে ফেল না।" ছোট বন্ধুর কথা রাখলেন অধ্যাপক। পরের দিন থেকে লেখা শুরু হল। ১৮৬৩র দশই ফেব্রুয়ারী লেখা শেষ হল, ছবি শেষ হল পরের বছর তেরই সেপ্টেম্বর। আরো দু-মাস পরে অ্যালিসের হাতে পৌঁছল সেই বহু যতনে রচা পাণ্ডুলিপি। আর পরের বছর চৌঠা জুলাই ছাপা বইখানি উপহার দিলেন অ্যালিসকে। সেই পুরোনো দিনের কথা স্মরণ করে ভূমিকায় একটি কবিতা লিখেছেন তিনি:

এ সবই সোনালি বিকেল বেলায়
ভেসে চলি স্রোতের অলস তানে
অনিপুণ হাতে তিন সঙ্গিনী
দাঁড়গুলি ছোট তরীর টানে
কখনও বা তারা অঙ্গুলি তুলে
পথ দেখানোর ছলনা জানে।

সেই অলস মধ্যাহ্নে, নদীর বুকে, তিনটি বালিকার চাপল্য—তারই স্মৃতিতে মেশা কাহিনী

কিন্তু শুধু তাই নয়, তার চেয়েও কিছু বেশি। লেখক একসময় বইটির সম্বন্ধে বলেছিলেন, "শিশুর মন যাঁর কাছে দুর্বোধ্য, শিশুর হাসিতে যিনি স্বর্গীয় ভাব দেখতে পান না, তিনি মিছি মিছি এই বই নাই বা পড়লেন। আর যিনি জীবনে সত্যি সত্যি একটি শিশুকে ভালবেসেছেন তাঁর জন্যে কোন ভাষ্যের প্রয়োজন নেই। কারণ তিনি ত দেখেছেন ঈশ্বরের কাছ থেকে আগত এই সত্তা, এই শিশু ;এখনও তার ওপরে গাছের ছায়া পড়েনি, জীবনের দুঃখ ছায়ার ঠিক বাইরের প্রান্তে সে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি ত' জানেন আমাদের স্বার্থান্ধতা, জীবনের সর্বগুণনাশী স্বার্থান্ধতা আর উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠা ভালবাসার মধ্যে তফাৎ কোথায়! এর কারণ কি? আমার মনে হয়, বিশ্বের প্রতি শিশুর দৃষ্টি হল নিতান্ত প্রেমের দৃষ্টি। জীবনে কোন কাজই স্বার্থহীন নয় জানি; তবু যদি মানুষ এমন কাজ করে, যার জন্য কোন খ্যাতি নেই, কোন পুরস্কার নেই, হয়ত একটি শিশুর পবিত্র ওষ্ঠাধর থেকে উচ্চারিত দুটি শব্দের সাধুবাদই আছে, তবে বলব সেই কাজ স্বার্থশূন্যতার কাছাকাছি।" এই স্বার্থশূন্যতার এই ভালবাসার থেকে অ্যালিসের আজব কাহিনীর জন্ম।

কিন্তু অনেকেই অ্যালিসের আজব জগতের সঙ্গে লুইস ক্যারলের এই চিন্তাকে মেলাতে পারেননি। কেউ কেউ 'Solemn dedication' এবং 'irresponsible laughter' এর যোগ খুঁজে পাননি। খুঁজে পাওয়া কেন সম্ভব নয় তার ইঙ্গিত লুইসক্যারল দিয়েছেন। শিশু তাঁর কাছে পাপহীন আনন্দময় সত্তা। তার কল্পনালোক সংসারীর নিয়ম পীড়িত জগৎ। তার জগৎ বিচিত্র, তার জগৎ স্বতন্ত্র। বাংলাদেশে এই কথাটাই বুঝেছিলেন ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় কিংবা সুকুমার রায়। নিছক সত্যি কথা, সত্যি ঘটনা সাজিয়ে নিটোল নিরেট সত্যি কাহিনী রচনার বিরুদ্ধে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু মনের অতলে বিরাট বিশ্বের ব্যাপ্তি। সেই ব্যাপ্তির মধ্যে শিশুর মন কোন বিশেষ নিয়মের বন্ধনকে মানার দায়িত্ব নেয়নি। তার রাজত্বে তাই সাদা খরগোস হঠাৎ তার ওয়েস্ট কোটের পকেট থেকে ঘড়ি বার করে হায় হায় করে, টেবিলের ওপর রাখা শিশির ওষুধ খেলে কখনও লম্বা, কখনও বা ছোট হতে হতে দশ ইঞ্চি। শুধু ব্যক্তিকে সম্বোধন করতে হবে কেন, 'শ্রীমতী অ্যালিসের দক্ষিণচরণ মহাশয়াকে' সম্বোধন করা যাবে না কেন! কখনও বা ধূমপায়ী পোকার উপদেশ শুনতে হবে। কখনও বা বৃদ্ধ উইলিয়ামও তাঁর পুত্রের কথোপকথন :

"যুবক ছেলে বলে, এখন বৃদ্ধ তুমি পিতঃ
চুলগুলি সব পেকেছে বিলকুল
তবুও তুমি মাথার ওপর দাঁড়াও অবিরত
এই বয়সে এতটা কি করাটা নয় ভুল ?

পিতৃদেব পুত্রে বলেন, আমার বয়স কালে
ভেবেছিলাম হয়ত ব্রেনের ক্ষতি হতে পারে
ও বস্তুটি নেইকো আমার, বুঝেছি এই হালে
তাই এ কর্ম করছি বারে বারে।

পুত্র বলে, বলেইছিত' বৃদ্ধ তুমি পিতঃ
এখনও তুমি হচ্ছ স্ফীত, ক্রমেই গোলাকার
তবুও তুমি ডিগ্‌বাজি দাও ইতস্ততঃ
অনুগ্রহ করে কারণ ব্যাখ্যা করুন তার।

যৌবনেতে, বলেন পিতা, ঝাঁকিয়ে সাদা ঝুঁটি
এক আনাতে একটি মোড়ক, আজব মলম মেখে
সারা অঙ্গ থাকত নরম, এখন তারই দুটি
বিক্রয়ার্থ তোমায় দিচ্ছি, পরখ কর দেখে।

পুত্র বলে, বৃদ্ধ তুমি, চোয়াল হীনবল
অতি নরম, পাকা কলার মত
অস্থিচক্ষু সহ হাঁসটি, বল কি কৌশল
করলে তবু এমন নিপুণভাবে উদরগত।

যৌবনেতে, বলেন পিতা, ছিলাম ল-এর ছাত্র
প্রতি কেসে-ই প্রতিদ্বন্দ্বী করেছি পত্নীকে
তাতেই শক্ত হল পেশী, শক্ত হল গাত্র
তারই জোরে বাকী জীবন দিব্যি আছি টিকে।

পুত্র বলে বৃদ্ধ তুমি, অবিশ্বাস্য প্রায়
তোমার চক্ষু তেমনই দৃষ্টিময়
টিকটিকিকে রাখতে পার অগ্রনাসিকায়
কেমন করে হলে এমন চাতুর্য বিস্ময়।

তিনটে জবাব দিয়েছি তোর, সেই যথেষ্ট মানি
বলেন পিতা, বৎস তুমি কয়না পক্বতা
সারাটি দিন শুনব বসে তোমার প্রলাপ বাণী
ভাগ্, নতুবা পদাঘাতে ভাঙব তোমার মাথা ॥"

এই বিচিত্র উদ্ভটের সৃষ্টির পেছনে সেই স্বার্থহীন মনোবৃত্তি একটি শিশুর মুখে হাসির রেখা ফোটানোর আনন্দ। অ্যালিস লীডেলের বয়স যখন অষ্টাশী তখন অক্সফোর্ডের সাহিত্যরসিকরা অভিনব ভাবে তাঁকে সম্মানিত করেছিলেন। উনিশ শ বত্রিশের মে মাসের এক সন্ধ্যাবেলায়। তাঁর উদ্দেশ্যে যে মানপত্র পড়া হয়েছিল তা একটু উদ্ধার করি :

"হে অ্যালিস প্লেজেন্স হারগ্রীভস্ তুমি ল্যাঙ্কাস্টারের স্বনামধন্য জন অফ্ গন্টের বংশধর, তোমার পিতা অক্সফোর্ডের সুবিখ্যাত পণ্ডিত, যতদিন ইংরাজী ভাষীরা গ্রীকভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করিবে ততদিন তাঁহার নাম স্মরণ করিবে।

তুমি শৈশবের মাধুর্যে গণিতের কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলে, তুমি ইংরাজী সাহিত্যের এই অসামান্য সৃষ্টির আদ্যাশক্তি। তোমাকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর অফ্ লেটারস্ উপাধিতে ভূষিত করা হইল।"

বৃদ্ধা অ্যালিস সেদিন উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন :

"আজি আমাকে উপলক্ষ করে মিঃ ডজসনকে আপনারা যে সম্মান দিচ্ছেন, আমার মনে হয় তা তিনি অনুভব করছেন এবং আমার সঙ্গেই আনন্দ উপভোগ করছেন।"

লুইস ক্যারলের অ্যালিসও আজ শতবর্ষে পা দিয়েছে। তবুও তেমনই কৌতুকময়ী তেমনই লীলাচঞ্চলা। তেমনই বালিকা। আমাদের বার্দ্ধক্যে এই কাহিনীই আমাদের হাতে আমাদের শৈশবকে ফিরিয়ে দেবে। লুইস ক্যারল নিজেই এই কাহিনী সম্বন্ধে বলেছেন, এ কাহিনী ছেলেমানুষির, তবু সযত্নে রেখো। কারণ শুধু ছেলেমানুষি ত নয়, এখানে স্মৃতির দুহাতে মায়াবী রাখী বেঁধে দিয়েছে বাল্যস্বপ্ন।

বাঙলার মৃৎশিল্পে

কমলকুমার মজুমদার

প্রতিমা। বাঙলাদেশে যেভাবে প্রতিমা গড়িয়া পূজার চলন আছে এরূপ আর কোথাও নাই। সারা বৎসরে অনেক প্রকারের প্রতিমা এখানে হইয়া থাকে। যথা রক্ষাকালী, বিশ্বকর্মা, ৺দুর্গা. কালী, অন্নপূর্ণা, বাসন্তী, জগদ্ধাত্রী, সরস্বতী, শীতলা, কার্তিক ইত্যাদি।

সারা, বাঙলায় দুর্গা ও কালী মূর্তিই বেশীর ভাগ হইয়া থাকে। কলিকাতায় ইদানীং বহু ধরনের প্রতিমা সুরু হইয়াছে যথা ওরিয়েণ্টাল, হাফ ওরিয়েণ্টাল সাবেক ও মর্ডান। ওরিয়েণ্টাল বা সেমি বা হাফ ওরিয়েণ্টাল ঠাকুর কলিকাতা আর্ট কলেজের সরস্বতী মডেলের অপভ্রংশ। বারোয়ারী অর্থাৎ অযথা বড ঠাকুর এবং দুর্গা প্রতিমার ক্ষেত্রে সকল মূর্তিই আলাদা আলাদা ভাবে তৈয়ারী। এই সকল নূতনের নেশা বাঙলার জিলা শহরে কিছু প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ইহা ব্যতীত যেখানে অনেক সূত্রধর বা মৃৎশিল্পী আছে সেখানেও আধুনিক প্রভাব বিস্তার, ফলে দুর্গা কোথায় পার্বতীর মত, কোথায় সুরসুন্দরী, কোথাও প্রজ্ঞা পারমিতা অথবা বৌদ্ধ দেবী ধরনের। ইহাকে সাধারণে দুই ভাগে বিভক্ত করে আর্টের ঠাকুর ও সাবেক ঠাকুর।

সাবেক ঠাকুরের দেবী লক্ষণ থাকে তাহা আর্টের ঠাকুরে নাই, অথচ সাবেক ঠাকুরের মত পটপূর্ণিমার মেলায় যে সকল ঠাকুর গড়ন হয় তাহাতে দেবী ভাব বিশেষ রূপে বর্তমান। বিরাট যুক্তি সূত্রে সে কথা আমরা পরে আলোচনা করিব। বিরাট পাথরের মূর্তি যথা শ্রাবণ বেলি গোলা ইত্যাদি অথবা সুলতানগঞ্জ প্রাপ্ত ধাতু নির্মিত মূর্তির মধ্যে সরলতা বর্তমান। এবং মুখমণ্ডল দূরত্ব মানিয়া গড়ন করা হইয়া থাকে। কিন্তু বারোয়ারী মূর্তিগুলিতে সেই চাতুর্য নাই। দেবীর মুখমণ্ডল তাম্বুল পত্রের আকার পদ্মপলাশ লোচন তিল ফুল জিনি নাশা শশাগ্র দৃষ্টি। হস্তধৃত আয়ুধ সকল ঠিক ঠিক সাবেক ঠাকুরে বর্তমান। সাবেক ঠাকুরে আর একটি জিনিস যাহা দেবী প্রতিমাকে রাজসিক করিয়া তুলে, তাহা ডাকের সাজ। মুকুট ঘাড় বেণী, কঙ্কণ রতনচুর, হার বক্ষ পায়ে পায়ে জোর চরণ চাদ ইত্যাদিতে পূজা দালানকে মহিমান্বিত করিয়া থাকে। তিন দিবস অহোরাত্র পূজা ৺মা যেন ক্রমশঃ আনন্দিত হইয়া উঠেন। সত্যই এই প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা যায়। এবং বিসর্জনের দিন পূজা বাড়ীর কর্তা গৃহিনীর চোখে জল আসে; নিঃসঙ্গতা অনুভব করেন।

দেবীর তাম্বুলাকৃতি মুখমণ্ডলই সারা বঙ্গেই প্রচলিত যথা বাঁকুড়া মেদিনীপুর, হুগলী, বর্দ্ধমান বীরভূম মুর্শীদাবাদ নদীয়া কলিকাতা মালদহ। ইহার মধ্যে অসম্ভব যক্ষী মুখের আদল রহিয়া গিয়াছে। প্রস্তর নির্মিত ৺দুর্গা মূর্তি বহু স্থানেই আছে, যথা আউসগ্রাম থানার কয়রাপুর, ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা, বক্রেশ্বরের গ্রাম্য দেবী হিসাবে পূজিত ১০ ভুজা, সালার বারওয়ান পথে বহু বৃক্ষের নিচে ভগ্ন মূর্তি, যখানে sand stroke, ইত্যাদিতে এই মুখমণ্ডল বর্তমান বহু ধাতু নির্মিত

মূর্তিতেও ঐ একই শ্রী পরিলক্ষিত হয়।

কারিগররা এই মূর্তি প্রায় ছাঁচ হইতে তুলিয়া থাকে, মুখমণ্ডলের জন্য মাটি পাট করে কিছুভাগ বালুগুড়া ইহার মধ্যে কোথাও কোথাও মিশ্রিত করা হইয়া থাকে। তাহার পর ছাঁচে ইটের গুড়া ছোট কাপড়ের পুটলি করিয়া লইয়া ঝাড়িতে থাকে, গুড়া সর্বত্রে সমান ভাবে লাগিয়া গেলে তখন বসান দেয়। ছাঁচকে কোথাও ঠাসা বলে। তাহার পর তুলিয়া রৌদ্রে শুকায়। ইহারই উপর খড়ি দিয়া রঙ মাখায়। বাঁকুড়া অঞ্চলে বিশেষত বেলেতোড়ে ঠাসাতে মূর্তির গড়ন হয় না প্রতিটি মুখমণ্ডল পৃথক পৃথক ভাবে হইয়া থাকে; ইহাদের গড়ন কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকৃতির। নাশা ঈষৎ খড়্গাকৃতির এবং নাশাপট বা বেসর সীম বীজ তুল্য নহে। রন্ধ্র ইষৎ বড়। বাঁকুড়ার অনেকে এবং বেলেতোড়ের বাদল বিষ্ণুপুরের গোকুল দে ইত্যাদিরা সুন্দর মুখমণ্ডল করে। মুখে ইহারা বনক মাটি মাখাইয়া লয় ফলে রঙ প্রলেপ আরও গাঢ় হয়। মুর্শীদাবাদে পাঁচথুপির জীবন চিত্রকরের হাতে সূক্ষ্ম কাজ দেখিলে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়। তাঁহার চক্ষুর মধ্যে আরক্তিম শিরা উপশিরা কোথাও বিন্দু দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। কোথাও তিলের ব্যবহার যথা চিবুক গণ্ডদেশ বাঁকুড়া মেদিনীপুর ইত্যাদিতে লক্ষণীয়। পশ্চিমের ঠাকুরে বা প্রতিমায় তালপত্র ও পুঁথির আকৃতি দেখা যায়। এমন কি খেজুর ছড়ি বস্ত্র বিন্যাস অথবা পাটলি পহলবের মত সাড়ী, কিছুদিন পূর্বে বৰ্দ্ধমান জামালপুরে ও জয়পুর বাঁকুড়ায় এবং নন্দীগ্রাম থানায় আরকট ছাপ দেখিয়াছি বেনারসী অথবা বালুচরী যাহা হিমরু জাতীয় তাহাও দেখিয়াছি। খেজুর ছড়ি প্যাটার্ন বা নক্সা বহু পুরাতন হাত তাঁতের (throw shuttle) খুব সৌখীন ও জনপ্রিয় নক্সা। আজ সাঁওতাল এবং নানান আদিবাসীদেয় মধ্যে দেখা যায়। জামদানী বুটিদার ধরনের সাড়ীর নকল অনেক ক্ষেত্রে কোঁচাতে বা পাড়ে দেখা যায়, কোঁচা সাধারণত সোলারই হইয়া থাকে।

কাপড় পরনের ধরণ অন্তত দামী সাড়ীর ক্ষেত্রে আধুনিক ধরণ হইতে বিপরীত ছিল। আধুনিক দামী সাড়ী পড়িবার ধরণ আঁচল পশ্চাতে থাকে, যেরূপ সাধারণ স্ত্রীলোকেরা পরিত। পূর্বকার রীতিতে ৺দুর্গা প্রতিমা এবং বহু দেবী মূর্তি প্রস্তুত হইত (সাদার্ন এভ্যিনু কলিকাতায় একটি ৺দুর্গা মূর্তি অত্যন্ত আশ্চর্যজনক মুখমণ্ডল অৰ্দ্ধেক কৃষ্ণ বর্ণের অৰ্দ্ধেক শ্বেত। অৰ্দ্ধনারীশ্বর রূপব্যঞ্জক কিন্তু আমাদের মনে হয় ইহা কোলকুমারীর মূর্তির ৺দুর্গা রূপ। (কোলকুমারী গঙ্গাহ্রদে দেব দেবী Buchman Hamilton).

৺কালী প্রতিমার বিভিন্ন মূর্তির প্রচার আছে। মহামায়ার অপূর্ব মনোহারিণী এক এক স্থানে এক রূপ। দশমহাবিদ্যার প্রথম যে কালীমূর্তি আমরা দেখিতে পাই, ইহা সেই রূপ, রক্ষাকালী বা শ্যাম কালীর পার্থক্য ইদানীং কোনরূপেই করা যায়, কোথাও কৃষ্ণ বর্ণে কোথাও রবিন ব্লু মাখাইয়া দায় সারা হয়। যাহা হউক কালী পূজা বাঙালীর প্রাণ পূজা। বীরভূম অঞ্চলে মুখ অনেকখানি জাভা, বলী দ্বীপ অঞ্চলের মত, তার ঘাড়বেণী মুণ্ডমালা সাজানো সব কিছুই নিম্ন পূর্ব এবং পশ্চিম বঙ্গের মত নহে মুখ ঈষৎ ফাঁক, ওষ্ঠ প্রান্তে দুই পার্শ্বে বেশ খানিক স্থান অৰ্দ্ধ ইঞ্চি রক্তিম বর্ণ দেওয়া। এইরূপ মূর্তি দুবরাজপুরে প্রতিষ্ঠিত আছে।

সরস্বতী মূর্তি এবং লক্ষ্মী মূর্তি পূর্বে এমন কি ২৫।২৬ সাল পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। ইহার

চতুর্দিকে বর্ণছটার মত অগ্র পদ্ম থাকিত। ইহার রূপে অসম্ভব দেবী ভাব ছিল। এইরূপ মূর্তির চিত্র পুরাতন পঞ্জিকা এবং পুরাতন ধর্মপুস্তকে কাঠের ব্লককৃত হেডপিস হিসাবে ছাপা দেখা যাইবে। ঠাকুর পায়ের উপর পা পদ্মের উপর স্থাপিত করিয়া বীণা বাজাইতেছেন। সেই মূর্তি উঠিয়া পটচিত্রের লক্ষ্মীমূর্তির মত ইহা ক্রমে রূপান্তরিত হইল। দাগুমানা মূর্তি অত্যন্ত পুরাতনরূপে প্রস্তরে, পার্শ্বমূর্তি হিসাবে দেখা যায় কখন এককও দেখা যায় যেমন আশুতোষ মিউজিয়মে একটি আছে। যাহা হউক আর্টস্কুলের সরস্বতী, যাহার চিত্র পুরাতন মাসিক পত্রিকায় দেখা যাইবে, নব্য ভাবধারা রচনা করিল। পূজা যেমন বাড়িতেছে এমন রিক্সাওয়ালা ঢালাই কারখানা, রেল ইয়ার্ড কুলি ব্যারাক তা ছাড়া যতরকমে নোংরা ক্লাব চিৎপুর সোনাগাছির বেশ্যারা সরস্বতী পূজা করিতেছে। ফলে রূপও বিভিন্ন ধরণের হইতেছে। পূজা বাড়িতেছে বলিলাম এই কারণে ৺শ্রীশ্রী কালী মাতার মন্দিরের নিকটস্থ স্থানসমূহে পট পূজা হইত। ইদানীং সর্বত্রেই প্রতিমা পূজা হইয়া থাকে। শীতলা, অন্নপূর্ণা, বাসন্তী, জগদ্ধাত্রী, কার্তিক ইত্যাদি বলিবার তেমন কিছু না থাকিলেও এই সকল দেবীর পূজা বহুল অংশে হয়। ইহাদের রূপের কোনই প্রভেদ হয় নাই, অন্তত আর্টের দোহাইতে; তৎসত্ত্বে মৃৎশিল্পীরা বাজার বশে অনেক নূতনত্ব আনিবার চেষ্টা করেন। কলিকাতায় বহু পুরাতন সিংবাহিনী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন যথা বেনেপুকুরে এবং চিৎপুরে, তাহার মত মূর্তিও ইহারা করিবার জন্য খুবই চেষ্টাবান। কার্তিকের মূর্তি বড় প্রিয় ছিল ইদানীং বেশ্যারাই বেশী পূজা করিয়া থাকে। ফলে গৃহস্থের বাড়ী হইতে পূজা উঠিয়া গিয়াছে নেহাৎ কুসংস্কারগ্রস্ত স্ত্রীলোক ছাড়া আর কেহ পূজা করে না।

প্রতিমার মতই বড় বড় এবং এই রীতিতেই বড় বড় সামাজিক এবং পৌরাণিক মূর্তির কথা বলিতেই হয়। প্রথমে ঝুলন বা রাসে এবং দোল উৎসবে ইহার খুব চল ছিল। বাবুদের বাড়ীতে এবং বারোয়ারীতে ইহার বড়ই সমাদর ছিল। বাবুদের পূজা দালানের চতুর্দিকে ঘেরা দালানে এই সকল মূর্তি সাজানো হইত। কাশিমবাজার কান্দী সিউড়ী পুরুলিয়া হাওড়ার বহু স্থানে, কলিকাতায় মেদিনীপুরে বাঁকুড়ায় সর্বত্রেই এই বড় পুতুলের সমাবেশ দেখা যায়। পৌরাণিক বিষয় এবং কৃষ্ণলীলাই যথেষ্ট সমাদৃত, ইহা ব্যতীত দশ অবতার। কৃষ্ণলীলার, জলকেলী, চির হরণ নৌকাবিলাস দেখিবার মত হয়। চিরহরণের বিবস্ত্র গোপিনীদের দেহসৌষ্টব দেখিলে এনাটমির বোধের কথা ভাবিয়া আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়।

সামাজিক বিষয়বস্তুতে কিছু কালগত বা ঐতিহাসিক ব্যাপার রূপায়ণ আছে। যথা এলোকেশী, ভণ্ডগোস্বামী, বকধার্মিক, মদ্যপান, বেশ্যালীলা, ইংরাজের অত্যাচার (কংগ্রেস exbition দেখান) ইত্যাদি, রসের নাগর, ভাতার (ঘোড়া) সোয়ারী মাগ; ইত্যাদি সামাজিক অবস্থাকে ব্যঙ্গ করিয়া এইগুলি রচনা করা হইত এখনও হইয়া থাকে। গত ৫৬ সনে যখন সার্ভেয়র সিমলা পালে যান তখন বাঁকুড়া মাচানতলায় প্রমাণ সাইজের পুতুল দেখিয়াছিল, বিষয় ব্যাপার settlement-কে লইয়া সেটলমেণ্ট অফিসর ঘুস খাইয়া জমি অন্যকে দিতেছে একটি রমণী হাতে নোট লইয়া ঘুস দিতেছে। এই সকল অনেক ক্ষেত্রে ছোট পুতুল তৈয়ারী করিবায় প্রেরণা দিয়াছে, যথা বাবু, রসের নাগর, এলোকেশী।

পশুপাখীর মধ্যে হাতী, ঘোড়া, টিয়া, গরু, ভেড়া, কুকুর, সিংহ, মুরগী, ময়ুর ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে হাতী, ঘোড়া কুকুর, পোড়া-মাটির হইয়া থাকে। এই পোড়া-মাটির কাজের হাতী বা ঘোড়া থানে উৎসর্গের জন্য লাগে কোন থানে কি লাগে তাহা আমরা গ্রাম্য দেবতা নিবন্ধে উল্লেখ করিব। এখন ইহার কাজের কথা বলা যাউক। হাতী মেদিনীপুর অঞ্চলে বিশেষ হইয়া থাকে বামুন মড়া, লোধাশুলী দলও তীরবর্তী বালিয়া বেড়া ও স্বুবর্ণ রেখাবর্তী নটা চোরচিতা স্থানে প্রায়ই দেখা যায়। বামুনমড়ার হাতীগুলি বিরাট বড় বড় হয় কিন্তু ইহার খুব কিছু বিশেষত্ব নাই, বালিয়াবেড়ার হাতী এবং স্বুবর্ণরেখা অঞ্চলে ত্রিকোণ করিয়া কাটা কাটা হইয়া থাকে, চারটি পা বেশ লম্বা, ধর খুব অল্প। বামুনমুড়ার হাতী ৩″×৩″ সার্পকে বলিবার কথা শুধু এই যে কিভাবে যে উহা পোয়ানে পুড়ানো হয় তাহা সত্যই ভাবিবার কথা, পোড়ানো খুব কড়া হয় না। পাঁচমুড়ার (বিষ্ণুপুর) হাতীগুলি খুব ছোট ৬″। এগুলির ফর্ম অত্যন্ত সুন্দর। হাতীর নাদুস ভাবটি ইহাতে বর্তমান উহার পোড়ান খুবই কড়া হয়। আসানসোলের হাতী সাওতাল পরগণায় হাতী রসান। পাঁচমুড়ার ছোট হাতীটি, ইহার দেহ নাই মাথা শুড় সকলি মনে হয় এক পাকে উঠিয়া গিয়াছে, যেনবা কলমের টানে সৃষ্টি হইয়াছে। উহা হলদেটে রঙের হইয়া থাকে।

ঘোড়া। বাঁকুড়া জিলা এবং কালনার মজলিস সাহেবের দরগার জন্য ঘোড়া সত্যই আশ্চর্যজনক। বাঁকুড়ার ঘোড়ার চেহারা দুই রকমের হইয়া থাকে যেগুলি বড় প্রায় ৫″ উচ্চ অথচ দেহ ছোট। সেগুলি মনে হয় ধাতুময়, ইহার পা চাক প্রস্তুত এর পরে হাতে গড়া। ইহার দেহে অনেক ১।২ ছিদ্র আছে ইহা তাপ সহনশীলতার জন্য রাখা হয়। গায়ে মাঝের বনকের slip এবং গেরী ও বনক মাটির নক্সা কাটা থাকে। ইহার দাম ৪।৬৲ টাকা। ছোট ঘোড়াগুলির মুখটি অদ্ভুত, উপর দিক হইতে চাপা এবং কান বড় হওয়ার দরুণ অসম্ভব আশ্চর্য রকমের মনে হয়। ইহাতে কিছু কিছু ঘোড়ার সাজ পরান হইয়া থাকে—প্রায়ই ঘোর কমলালেবু রঙের দেখিতে। এই প্রকারের ছোট ঘোড়া রাজনগর ফুলবেড়ে, সোনামুখী ইত্যাদির কুমোড়রাই করিয়া থাকে। কালনার ঘোড়াটি অদ্ভুত চমৎকার চেহারা। ইহা ॥৹ হইতে ৴৹ পর্যন্ত ১০″×৩″ হইতে ৩″×২″ সাইজের। ইহাতে শুধু লম্বাটে কুলকি (cone) ধরণের মুখ আছে এবং সমস্ত অবয়বে যদিও কিঞ্চিৎ বেঁটে তবু একটি জোরাল ভাব আছে। এইগুলিতে খড়ি, রঙ ও অন্য রঙের টান থাকে। ইহার রূপটি সত্যই বাস্তবিক, ঠিক এইরূপ জন্তু নিদর্শন বহু পুরাতত্ত্বর মাঠে পাওয়া গিয়াছে এবং ভারত মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। আর যে সকল ঘোড়া বাঙলার সর্বত্রে ছড়াইয়া আছে কোথাও এগুলিকে কুকুর বলা হয়। কাটালিয়ার ঘোড়াগুলি সেই সাধারণ ধরণের শুধু তাহার গাত্রে খড়ি, অভ্র এবং কিছু দৃপ্ত টান থাকে।

সিংহ। পাঁচমুড়ার সিংহ দেখিতে ঠিক চৈনিক কাজের মত, কারণ ইহা ঘোর ব্রোঞ্জরঙের মুখটি ঈষৎ খোলা এবং গোফরেখা কলম দ্বারা উৎকীর্ণ, দেখিলে বিড়াল বলিয়াই মনে হয়। ইহার গাত্রেও ফুটা আছে।

ময়ুর বা পারাবত। ইহা খোলার চাবে বসাইবার জন্য বীরভূম এবং মেদিনীপুরে দেখা যায়। ইলিসমাছ, টিয়াপাখী ইত্যাদির মধ্যে ইলিসমাছ—মকর দুইটি খুব সুন্দর, গায়ের খড়ি অভ্র

এবং ছাঁচে করা ও পোড়ান টিয়াপাখী, গোপীবল্লভপুর ও মালদহের প্রথম বড় দেওয়ালই শেষোক্ত ছোট খুব সুন্দর। দেওয়ালে টানাইবার টিয়াগুলি খুব সুন্দর রঙ করা হয়, ইহার মধ্যে বিদেশী প্রভাব দেখা যায়। টিয়ার ঠিক উপরে একটি Capital দেওয়া থাকে। গরু, ভেড়া, ঘোড়াগুলি সচরাচর অত্যন্ত খারাপ তবে বর্দ্ধমানের ছোট হাতী ও ঘোড়া সত্যই উল্লেখযোগ্য। ইহা সাধারণ মেড়া ছাচে করা নহে। ইহা বেশ সতর্কতার সহিত করা হইয়া থাকে। ইহার পায়ের ফাঁক নাই, এক বসান করা, ইহা কাঁচা, এবং কাল ও ব্লু রঙের হইয়া থাকে। ইহার উপরে যে নক্সা আছে তাহা সত্যিই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সাজ হিসাবে হলুদ (Lemon yellow) রঙের সুন্দর লতাপাতার কেয়ারী করা। মালদহের লাহার তৈয়ারী ভেড়া ও মুরগী এবং বোলপুরে রেফিউজি কৃত মুরগীর কথা না বলিয়া পারা যায় না, দুই পোড়া মাটির। লাহার হাতের তুলির জোরাল টানগুলি দেখিবার মত। বাঙলার রেখার কাজের, সত্যিই অত্যন্ত কম মূল্যের বস্তুর উপরে করা—অদ্ভুত নিদর্শন।

শাস্ত্রীয় মূর্তিতে সকল সময় দেখা যাইবে যে দেবদেবীর সর্বত্রেই বাহন আছে। এই সকল বাহনের নিজস্ব রূপ বর্ণনাও আছে। একদা আমাদের মনে হয় যে সঠিক এই রূপই খেলিবার পুতুলগুলিও হইত, মধ্যে বিদেশী প্রভাব এবং কৃষ্ণনগরের হুবহু ভাব সকলকেই প্রভাবান্বিত করিয়াছে, কারণ কাঠের ছোট ঘোড়া বা গরু যাহা রথে বা অন্য কোন আসবাবে দেখা যায় এইগুলি তাহাদের মত নহে। বাঁকুড়ার ঘোড়ার পুরাতন ঐতিহ্য রহিয়া গিয়াছে, কিন্তু ইদানীং এইগুলির মধ্যে নাই। ইহার ছাঁচ খারাপ হইলে মাল আরও বিসদৃশ হইয়া থাকে। হুগলী, হাওড়া, মালদহ ইত্যাদি স্থানে ইহা প্রচুর পাওয়া যায়।

রবীন্দ্র রচনায় লৌকিক ছন্দ

শ্রীমন্তকুমার জানা

রবীন্দ্র ভাবনায় লৌকিক ছন্দ

লোকসাহিত্যের প্রতি বর্তমানে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনুরাগ খুবই প্রবল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পূর্বে তা শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টির পশ্চাতে প্রায় অবজ্ঞাত অবস্থায় ছিল। এরজন্য কিন্তু তার গতিপ্রবাহ ব্যাহত হয়নি। ফল্গুধারার ন্যায় তা সমাজ জীবনের অন্তস্তলে প্রবহমান ছিল। পল্লীজীবনকে রসসিক্ত ও শ্যামল করে রাখার কাজে লোকসাহিত্যের দান সমধিক। এস্থলে রবীন্দ্রনাথের উক্তি প্রণিধানযোগ্য—

"বাংলার অসাধু ভাষাটা খুব জোরালো ভাষা, এবং তাহার চেহারা বলিয়া একটা পদার্থ আছে। আমাদের সাধুভাষার কাব্যে এই অসাধু ভাষাকে একেবারে আমল দেওয়া হয় নাই; কিন্তু তাই বলিয়া অসাধু ভাষা যে বাসায় গিয়া মরিয়া আছে তাহা নহে। সে আউলের মুখে, বাউলের মুখে, ভক্ত কবিদের গানে, মেয়েদের ছড়ায় বাংলাদেশের চিত্তটাকে একেবারে শ্যামল করিয়া ছাইয়া রহিয়াছে। কেবল ছাপার কালির তিলক পরিয়া সে ভদ্র সাহিত্য সভায় মোড়লি করিয়া বেড়াইতে পারে না। কিন্তু তাহার কণ্ঠে গান থামে নাই, তাহার বাঁশের বাঁশি বাজিতেছেই।"

—'ছন্দ' (১৯৬২ সং), বাংলা ছন্দ, পৃ ৬

যাহক, লোকসাহিত্যের বিষয়বস্তু, ভাব, ভাষা ও ছন্দোরীতির বৈশিষ্ট জনসমক্ষে তুলে ধরার কাজে রবীন্দ্রনাথই পথিকৃৎ। এস্থলে ছন্দটাই আমাদের আলোচ্য।

যে বিশিষ্ট ছন্দোরীতিতে লোকসাহিত্য রচিত তা লৌকিকছন্দ বা ছড়ার ছন্দ নামে অভিহিত। পল্লীসংগীত, ছড়া, লোকগাথা, মেয়েলি ব্রতকথা, বাউলের গান প্রভৃতির মধ্যে এ ছন্দের স্বতন্ত্র প্রকৃতি ধরা পড়েছে। বাংলা ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণপদ্ধতি ও প্রস্বর (accent) স্থাপনের রীতি এ ছন্দের নিয়ামক। বোধ করি এ দিক থেকে বিচার করে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লৌকিকছন্দকে 'বাংলার প্রাণপাখী' নামে অভিহিত করেছেন।

লৌকিকছন্দের মূল বৈশিষ্ট্য এই যে এতে রুদ্ধদল ও মুক্তদল এক এক মাত্রার সমমর্যাদা পেয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত এ ছন্দের প্রতিপূর্ণ পর্বে চারটি করে মাত্রা থাকে। এটা মূলতঃ প্রস্বরপ্রধান ছন্দ। সেজন্য স্বভাবতই হসন্তবহুল শব্দপ্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। লৌকিক ছন্দকে স্বরবৃত্ত, বাংলা প্রাকৃত, শ্বাসাঘাতপ্রধান প্রভৃতি বহুনামে অভিহিত করা হয়। ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন এর নূতন নাম দিয়েছেন দলমাত্রিক বা দলবৃত্ত। (দ্রষ্টব্য 'ছন্দপরিক্রমা' গ্রন্থ, ১৯৬৫ সং, পৃ ১৫)

পূর্বে বলা হয়েছে, লৌকিক ছন্দের প্রতি পূর্ণ পর্বে চারমাত্রা (চারটি দল) থাকে। কিন্তু লোকসাহিত্যে এ নিয়ম সর্বত্র রক্ষিত হয়নি। তার কারণ লোকসাহিত্যের স্রষ্টারা ছন্দসচেতন শিল্পী ছিলেন না। স্বাভাবিক কবিত্বের প্রেরণাবশেই তাঁরা সাহিত্যসৃষ্টি করেছেন—আর সে সাহিত্যের

ছন্দ নিয়ন্ত্রিত হয়েছে চলতি বাংলা ভাষার সাধারণ উচ্চারণ পদ্ধতির দ্বারা। তাই ছান্দসিককৃত ছন্দোরীতির বিচারে কোথাও কোথাও অল্পস্বল্প ব্যতিক্রম দেখা যায়। যেমন—

'যমুনাবতী' | সরস্বতী | কালযমুনার | বিয়ে।
'যমুনা যাবেন' | শ্বশুরবাড়ী | কাজিতলা | দিয়ে॥

উদ্ধৃতি চিহ্নসূচিত পর্বদুটিতে পাঁচটি করে দল থেকে গেছে অর্থাৎ এ-দুটি পর্ব পাঁচ মাত্রার। কিন্তু পড়বার সময় দ্রুত উচ্চারণ করে (যম্‌নাবতী, যম্‌না যাবেন) চার মাত্রায় নিতে আসতে হয় তাল ও সংগতি বজায় রাখার জন্য। এ ছাড়া কোথাও কোথাও তিন মাত্রার পর্বও দেখা যায়। যেমন—

বৃষ্টি পড়ে | টাপুর টুপুর | নদী এল বান।
শিব ঠাকুরের | বিয়ে হল | 'তিন কন্যে' | দান॥
'এক কন্যে' | রাঁধেন বাড়েন | 'এক কন্যে' | খান।
'এক কন্যে' | 'না খেয়ে' | বাপের বাড়ী | যান॥

'তিন কন্যে', 'এক কন্যে' এবং 'না খেয়ে' অংশে তিন মাত্রা হয়েছে কিন্তু একমাত্রার অভাব উচ্চারণের সময় টান দিয়ে (তি-ন কন্যে, এ-ক কন্যে, না-খেয়ে) পূরণ করে নিতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ লৌকিকছন্দের নাম দিয়েছেন বাংলা প্রাকৃতছন্দ এবং কবিজীবনের সূচনাকাল থেকেই এই ছন্দের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করে এসেছেন।

লৌকিকছন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ প্রথম আলোচনা করেন ১২৯০ সালের 'ভারতী' পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায়। এটি কবি নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের (১৮৫৩—১৯২২) 'সিন্ধুদূত' কাব্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিত। এই রচনায় কবি বলেন— ...'ভাষার উচ্চারণ অনুসারে ছন্দ নিয়মিত হইলে তাহাকেই স্বাভাবিক ছন্দ বলা যায়...আমাদের ভাষায় পদে পদে হসন্তশব্দ দেখা যায়।'

—'ছন্দ' (১৯৬২ সং), বাংলাভাষার স্বাভাবিক ছন্দ, পৃঃ ১৭০

রবীন্দ্রনাথের মতে যে-ছন্দে ভাষার স্বাভাবিক 'হসন্ত'বহুল উচ্চারণ অবিকৃত থাকে সেটাই স্বাভাবিক ছন্দ। আর 'হসন্ত'শব্দ প্রধান চলতি বাংলায় ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণ অক্ষুণ্ণ থাকে। লৌকিক ছন্দের বিচার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বারে বারেই চলতি বাংলাভাষায় হসন্তবহুল শব্দ সংঘাতের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। এস্থলে দুটি উদ্ধৃতি দেওয়া গেল—

'বাংলা ভাষারও নিজের একটা বিশেষ ধ্বনিস্বরূপ আছে। তার ধ্বনির এই চেহারা হসন্তবর্ণের যোগে।...বাংলা দেশের সাহিত্য-আরামবাগ থেকে বাংলার 'স্বকীয়' ধ্বনিরূপটি পণ্ডিত পাহাড়াওয়ালার ধাক্কা খেয়ে অনেককাল বাইরে বাইরে ফিরেছিল।...

বাংলা ছন্দের তিনটি শাখা। একটি আছে পুঁথিগত কৃত্রিম ভাষাকে অবলম্বন করে, সেই ভাষায় বাংলা 'স্বাভাবিক' ধ্বনিরূপকে স্বীকার করেনি। আর-একটি সচল বাংলার ভাষাকে নিয়ে, এই ভাষা বাংলা 'হসন্তশব্দের' ধ্বনিকে আপন বলে গ্রহণ করেছে।'

—'ছন্দ' (১৯৬২ সং) ছন্দের প্রকৃতি (১৩৩১), পৃ ১২৮ ও ১৩২,

'চলতি ভাষায় কবিতা বাংলা ছন্দের স্বাভাবিক হসন্তরূপ মেনে নিয়েছে। হসন্ত শব্দ স্বরবর্ণের বাধা না পাওয়াতে পরস্পর জুড়ে যায়,তাতে যুক্ত বর্ণের ধ্বনি কানে লাগে। চলতি ভাষার ছন্দ

সেই যুক্ত বর্ণের ছন্দ।'—পূর্ববৎ, চলতিভাষার ছন্দ (১৩৪৫), পৃ ১৩৮-৩৯

লৌকিকছন্দের তত্ত্ববিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব এই যে, তিনি ভাষার অন্তর্নিহিত ধ্বনি-প্রকৃতির গভীরে প্রবেশ করেছেন। লোকসাহিত্যে চলতি ভাষার হসন্ত বহুল শব্দ প্রযুক্ত হওয়ায় তাতে একটা ধ্বনিঝংকার ও নৃত্য ভঙ্গিমা সৃষ্টি হয়।—

'সেইসব মেঠো গানের ঝরণাতলায় বাংলা ভাষার হসন্ত শব্দগুলো নুড়ির মত পরস্পরের উপর পড়িয়া ঠুনঠুন শব্দ করিতেছে। আমাদের ভদ্রসাহিত্য পল্লীর গম্ভীর দিঘিটার স্থির জলে সেই শব্দ নেই; সেখানে হসন্তর ঝঙ্কার বন্ধ।—পূর্ববৎ, বাংলাছন্দ (১৩২১), পৃ ৬-৭।

বলা বাহুল্য, অন্যরীতির ছন্দে হসন্ত শব্দের প্রভাবের কথা অস্বীকার করা হয় নি। বস্তুতঃ একই ভাষারীতিতে বিভিন্ন প্রকৃতির ছন্দ অনায়াসে রচিত হতে পারে। পক্ষান্তরে বিভিন্ন ভাষারীতিতে একই প্রকৃতির ছন্দ রচিত হওয়ার পক্ষে কোন অসুবিধে নেই।

লৌকিক ছন্দে জনসাধারণের জীবনযাত্রার সব কথা অর্থাৎ তাদের ছোটোখাটো সুখদুঃখ, স্নেহ-আবদার, প্রেম-ভালবাসা ও রঙ্গ-রসিকতা সবই একান্ত সহজ ভাষায় সাবলীলভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে। তা বলে এ ছন্দ যে গভীর ভাবপ্রকাশের উপযোগী নয়, একথা বলা চলে না। অধ্যাত্মদৃষ্টির গভীরতম বাণীও অশিক্ষিত গ্রাম্য কবিরা লৌকিকছন্দে প্রকাশ করেছেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি স্মরণীয়—

'প্রকৃত বাংলার দুয়োরাণীকে যারা সুয়োরাণীর অপ্রতিহত প্রভাবে সাহিত্যের গোয়াল ঘরে স্থান না দিয়ে হৃদয়ে স্থান দিয়েছে সেই 'অশিক্ষিত' লাঞ্ছনাধারীর দল যথার্থ বাংলা ভাষার সম্পদ নিয়ে আনন্দ করতে বাধা পায় না। তাদের প্রাণের গভীর কথা তাদের প্রাণের সহজ ভাষায় উদ্ধৃত করে দিই।

আছে যার মনের মানুষ আপন মনে
সেকি আর জপে মালা।
নির্জনে সে বসে বসে দেখছে খেলা।
কাছে রয়, ডাকে তারে
উচ্চস্বরে
কোন্ পাগেলা
ওরে, যে যা বুঝে তাই সে বুঝে
থাকে ভোলা।

যেথা যার ব্যথা নেহাৎ
সেইখানে হাত
ডলা মলা,
তেমনি জেনো মনের মানুষ মনে তোলা।
যে জনা দেখে সে রূপ
করিয়া চুপ
রয় নিরালা।
ওরে, লালন ভেড়ের লোক দেখানো
মুখে হরি হরি বোলা॥

পূর্ববৎ, ছন্দের প্রকৃতি (১৩৪১) পৃ ১২৯-১৩৯

রবীন্দ্রপূর্বসাহিত্যে লৌকিকছন্দ

লৌকিকছন্দ লোকসাহিত্যের বিষয়বস্তু প্রকাশের বাহন হলেও ভদ্রসাহিত্যে মাঝে মাঝে এ ছন্দের অনুপ্রবেশ লক্ষ্য করা যায়। মধ্যযুগে ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব কবি লোচন দাসের রচনায় প্রথম এ

ছন্দের নিদর্শন মেলে।—

কিসের রান্ধন কিসের বাড়ন
কিসের হলদি বাঁটা।
আঁখির জলে বুক ভিজিল
ভাঙ্গা গেল পাটা।

গোবিন্দ দাসের পদাবলীতে এ ছন্দের প্রয়োগ আছে।—

চিকন কালা গলায় মালা
বাজন নূপুর পায়।
চূড়ার ফুলে ভ্রমর বুলে
তেরছ নয়ানে চায়॥

তৎকালে লৌকিক ছন্দের প্রচলিত নাম ছিল 'ধামালী' ছন্দ 'ধামালী' শব্দের অর্থ সম্পর্কে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন এইরূপ মন্তব্য করেন।—'ধামালী শব্দের অর্থ হচ্ছে ধাবমান, দ্রুত গতিশীল : গৌণার্থে অশান্ত বা দুরন্ত।'—'ছন্দোগুরু রবীন্দ্র নাথ' ('১৩৫ সং) পৃ ৩১।

কোনো কিছু ব্যাপারে রঙ্গরসিকতা ও আনন্দের আতিশয্য প্রকাশ করার জন্য কবিরা ধামালী ছন্দ ব্যবহার করতেন। লোচনদাস প্রথম এইছন্দ ব্যবহার করেন বলে একে 'লোচনদাসী' ছন্দ নামেও অভিহিত করা চলে। এ ছন্দে লৌকিক হাল্কা সহজ জিনিসই প্রকাশ পেত। অষ্টাদশ শতকে ভারতচন্দ্র তাঁর অন্নদামঙ্গলের এক জায়গায় এ ছন্দ প্রয়োগ করেন এই একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য।—

উমার কেশ চামর ছটা
তামার শলা বুড়ার জটা,
তায় বেড়িয়া ফোফায় ফণী
দেখে আসে জর লো।

ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক সাধক কবি রামপ্রসাদ সেনের শ্যামাসঙ্গীতগুলিও লৌকিক ছন্দে রচিত। গানগুলিতে হাল্কা তরল রঙ্গ-রসিকতা নয়, জীবনজিজ্ঞাসার গভীরতম বাণী ও ভক্তিপ্রাণতার আকুতি পরিস্ফুট হয়েছে একান্ত সহজ সরল ঘরোয়া ভাষাশ্রিত লৌকিক ছন্দে। এ স্থলে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল—

প্রসাদ বলে বসে আছি ভবার্ণবে ভাসিয়ে ভেলা',
এবার জোয়ার এলে উজিয়ে যাব ভাঁটিয়ে যাব ভাঁটার বেলা।

রামপ্রসাদ লৌকিক ছন্দকে তাঁর ভাব প্রকাশের বাহন করে নিয়েছিলেন। বাংলার ইতিহাসে বিহারীলালের পূর্বে গীতিকবিতার নিদর্শন হিসাবে রামপ্রসাদী সংগীতকে অনেকে মর্যাদা ও গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। সেই সঙ্গে লৌকিক ছন্দের বহুল ও সুষ্ঠু প্রয়োগের দিক থেকেও রামপ্রসাদের কৃতিত্ব স্মরণ করা দরকার। লৌকিক ছন্দের আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বহুবার রামপ্রসাদের নামোল্লেখ করেছেন এবং তাঁর সংগীতাবলী থেকে প্রয়োজন মত দৃষ্টান্ত নিয়েছেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় এ ছন্দসৌষ্ঠব লাভ করে। ব্যঙ্গাত্মক ভাবপ্রকাশে এ ছন্দ কত শক্তিশালী হতে পারে, নিম্নোদ্ধৃত অংশটির মধ্যে সে পরিচয় মেলে।—

যত ছুঁড়িগুলো তুড়ি মেরে কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে,
তখন এ, বি, শিখে বিবি সেজে বিলাতি বোল কবেই কবে।...
ও ভাই আর কিছুদিন থাকলে বেঁচে পাবেই পাবে দেখতে পাবে,
এরা আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে॥

—'গ্রন্থাবলী' দুর্ভিক্ষ

মধুসূদনের 'বুড়শালিখের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনে (১৮৫৯) লৌকিক ছন্দের নিদর্শন রয়েছে শেষ অংকের শেষাংশে।—

বাইরে ছিল সাধুর আকার
মনটা কিন্তু ধর্ম ধোয়া।
পুণ্য খাতায় জমা শূন্য,
ভণ্ডামিতে চারটি পোয়া।
শিক্ষা দিলে কিলের চোটে,
হাড় গুঁড়িয়ে খোয়ের মোয়া।
যেমন কর্ম ফলন ধর্ম
'বুড় শালিখের ঘাড়ে রোঁয়া'।

কালীপ্রসন্ন সিংহ লৌকিক ছন্দে পদ্য রচনায় যথেষ্ট অধিকার অর্জন করেছিলেন, তার প্রমাণ মেলে 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'য় (১৮৬২)।—

আজব শহর কলকেতা
হেতা ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে বলিহারী ঐক্যতা,
যত বকবিড়ালে ব্রহ্মজ্ঞানী, বদমাইসির ফাঁদ পাতা।
গিলটি কাজে পালিশ করা, রাঙ্গা টাকা তামা ভরা
হুতোম দাসে স্বরূপ ভাষে, তফাৎ থাকাই সার কথা॥

দীনবন্ধু মিত্রের রচনাতেও এ ছন্দের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।—

রাত পোহাল ফর্সা হল ফুটল কত ফুল।
কাঁপিয়ে পাখা নীল পতাকা জুটল অলিকুল॥…

—বঙ্গদর্শন, ১২৭৯ আষাঢ়, প্রভাত

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও দু'একটি কবিতা লৌকিক ছন্দে লেখেন। তবে সেগুলি সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।—

পরের অধীন দাসের জাতি 'নেশন' আবার তারা!
তাদের আবার 'এজিটেশন',—নরুন উঁচু করা!
হায় কি হল—দলাদলি বাধল ঘরে ঘরে।
পার্টি খেলা ঢেউ তুলেছে ভারতরাজ্য পরে!

—'কবিতাবলী', হায় কি হল

দেখা যাচ্ছে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত লৌকিকছন্দ মাঝে মাঝে সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। বিষয়বস্তুর দিক থেকে বিচার করে বলতে পারা যায়, ধর্ম, লৌকিকতা সামাজিক ত্রুটি বিচ্যুতি এবং ব্যক্তিচরিত্রের দুর্বলতার ব্যঙ্গাত্মক সরস অভিব্যক্তি ঘটেছে এ ছন্দে। তবে কোন লেখকই সচেতনভাবে এই ছন্দের প্রতি অনুরাগ, উৎসুক্য বা কৌতূহল পোষণ করেন নি। সাহিত্যের দরবারে এই ছন্দের মাঝে মাঝে উপস্থিতি তখন পর্যন্ত কোন গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদার আসন অধিকার করতে সক্ষম হয়নি।

রবীন্দ্ররচনায় লৌকিক ছন্দের বিবর্তন

রবীন্দ্রপূর্বযুগে বাংলা সাহিত্যে লৌকিক ছন্দের প্রচলন থাকলেও তা খুব সংকীর্ণ ক্ষেত্রে আবদ্ধ ছিল। এ ছন্দের শক্তি ও সৌন্দর্য এবং সম্ভাব্যতা সম্পর্কে কোন লেখকই সচেতন ছিলেন না। বলতে গেলে

এ ছন্দটি অবহেলিত ও অবজ্ঞাত অবস্থায় লোক-সমাজের মধ্যে পড়ে ছিল। রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম এ ছন্দের প্রকৃতি বিচারে অগ্রসর হন। ভারতী পত্রিকায় (১২৯০ শ্রাবণ) 'সিন্ধুদূত' কাব্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেন তা গভীর তাৎপর্যদ্যোতক।—

'ভাষার উচ্চারণ অনুসারে ছন্দ নিয়মিত হইলে তাহাকেই স্বাভাবিক ছন্দ বলা যায়।…যদি কখন স্বাভাবিক দিকে বাংলা ছন্দের গতি হয় তবে ভবিষ্যতের ছন্দ রামপ্রসাদের ছন্দের অনুযায়ী হইবে।'—'ছন্দ' (১৯৬২ সং), বাংলা ভাষায় স্বাভাবিক ছন্দ, পৃ ১৭০ ও ১৭১।

এই প্রবন্ধ প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে 'বাল্মীকি প্রতিভা' (১২৮৭), 'সন্ধ্যা সংগীত' (১২৮৮), 'কাল মৃগয়া' (১২৮৯), 'প্রভাত সংগীত' (১২৮৯) প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। 'সন্ধ্যা সংগীত' ছাড়া অন্যান্য গ্রন্থের ক্ষেত্রবিশেষে লৌকিক ছন্দের ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু এরও পূর্বে ১২৮৭ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'ভারতী'তে প্রকাশিত ম্যাক্‌বেথ নাটকের প্রথম অঙ্কের ডাকিনীদের কথোপকথন অংশের অনুবাদে এ ছন্দের প্রথম প্রকাশ ঘটে।—

ঝড় বাদলে | আবার কখন। ঝগড়া ঝাঁটি | থামবে যখন,।
মিলব মোরা। 'তিন জনে' হারজিত সব | 'মিটবে রণে'

উদ্ধৃতি চিহ্ন নির্দিষ্ট পর্বদুটি ক্রটিহীন নয়। অতঃপর 'বাল্মীকি প্রতিভা' ও 'কালমৃগয়া'র কোন কোন পাত্র পাত্রীর উক্তি প্রত্যুক্তি লৌকিক ছন্দে রচিত।—

আয় সাথে আয়, রাস্তা তোরে দেখিয়ে দিইগে তবে,
আর তা হলে রাস্তা ভুলে ঘুরতে নাহি হবে।

—'বাল্মীকি প্রতিভা' (১৯৫৭ সং), প্রথম দৃশ্য তৃতীয় দস্যুর উক্তি, পৃ ৫

কাল সকালে উঠব মোরা যাব নদীর কূলে
শিব গড়িয়ে করব পূজা আনব কুসুম তুলে।

—'কাল মৃগয়া' (১৩৬০ সং), প্রথম দৃশ্য, লীলার উক্তি, পৃ ২

'প্রভাত সংগীতে'র উৎসর্গ পত্রটি লৌকিক ছন্দে রচিত।—

আমায় দেখে আসিস ছুটে কোথা হতে পড়লি প্রাণে
আমায় বাসিস ভালো, তুইরে ঊষার আলো।

'সুতরাং দেখা যাচ্ছে 'সিন্ধুদূত' কাব্যের সমালোচনার পূর্বে রীন্দ্রনাথ এ ছন্দকে কাজে লাগিয়েছেন এবং বলা যেতে পারে ভবিষ্যতে এ ছন্দের বিচিত্রমুখী বিকাশ ও পরিণতি সম্পর্কে কবির অন্তরে গভীর আস্থা প্রচ্ছন্ন ছিল।

যাহক, 'সিন্ধুদূত' কাব্যের সমালোচনার পর 'ছবি ও গান' (১২৯০) প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষার হসন্তবহুল শব্দের উচ্চারণবৈশিষ্ট্য বজায় রেখে সচেতনভাবে লৌকিক ছন্দের প্রয়োগ এ কাব্যে যেমন—

ঘুমের মতো মেয়েগুলি আধেক মুদি' আঁখির পাতা
চোখের কাছে দুলি দুলি কার সাথে সে কচ্চে কথা
বেড়ায় শুধু নূপুর রণরণি। শুনছে কাহার মৃদু মধুর ধ্বনি।

—'ছবি ও গান' মাতাল

'কড়ি ও কোমল' কাব্যেও (১২৯৩) এ ছন্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।—

দিনের আলো নিবে এল সূর্যি ডোবে ডোবে।
আকাশ ঘিরে মেঘ জুটেছে চাঁদের লোভে লোভে।
মেঘের উপর মেঘ করেছে, রঙের উপর রঙ্।
মন্দিরেতে কাঁসর ঘণ্টা বাজল ঠঙ্ ঠঙ্। —বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর

একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, 'কড়ি ও কোমল' পর্যন্ত লৌকিক ছন্দে যা প্রকাশ পেয়েছে তা সহজ জিনিস, ছড়াজাতীয় বিষয়ের সমধর্মী। সুতরাং এ ছন্দ উচ্চতর ভাবপ্রকাশে সক্ষম কিনা তখন পর্যন্ত তার প্রমাণ মিলল না। 'কড়ি ও কোমলে'র পর দীর্ঘ বারো বছর (১৮৮৬—৯৭) এ ছন্দটি রবীন্দ্রকাব্যে স্থান পায় নি। অতঃপর 'কল্পনা' কাব্যের (১৯০০) একটি কবিতায় এই ছন্দের পুনরাবির্ভাব ঘটে। যথা—

কিসের লাগি অশ্রু ঝরে, কিসের লাগি দীর্ঘশ্বাস! গর্বময়ী ভাগ্যদেবীর নয়কো তারা ক্রীতদাস।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করবো মোরা পরিহাস। হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করবো মোরা পরিহাস॥
রিক্ত যারা সর্বহারা সর্বজয়ী বিশ্বে তারা। —হতভাগ্যের গান (১৩০৫)

লক্ষ্যণীয় যে, অশ্রুপীড়িত দুর্ভাগ্যলাঞ্ছিত সর্বহারাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার বলিষ্ঠ কথা উচ্চারিত হয়েছে লৌকিক ছন্দে। এর পর 'কথা' কাব্যের (১৯০০) তিনটি কবিতায় (নকলগড়, হোরি খেলা, বিবাহ) এ ছন্দের প্রয়োগ দেখা যায়। বস্তুতঃ এসময় থেকেই লৌকিক ছন্দ রবীন্দ্রকাব্যে সুগঠিত শক্তিশালী রূপ দিতে আরম্ভ করে। একটি দৃষ্টান্ত এই—

শুরু হল হোরির মাতামাতি, ভয়ে পাখী কূজন গেল ভুলে
উড়তেছে ফাগ রাঙা সন্ধ্যাকাশে। রাজপুতানীর উচ্চ উপহাসে।
নববরণ ধরল বকুল ফুলে কোথা হতে রাঙা কুজ্ঝটিকা
রক্তরেণু ঝরল তরু মূলে, লাগল যেন রাঙা সন্ধ্যাকাশে।—হোরিখেলা

অতঃপর 'ক্ষণিকা' কাব্যে (১৯০০) এ ছন্দ ব্যাপকভাবে প্রযুক্ত হয় এবং তা বিচিত্র ভাবনা ও চিত্রকল্পে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রকাব্যধারায় ছন্দোবিবর্তনের ইতিহাসে 'ক্ষণিকা' একটি নূতন মর্যাদায় মহিমান্বিত। 'ক্ষণিকা'য় অতীত ভবিষ্যতের চিন্তাশূন্য বর্তমান জীবনের ক্ষণসৌহার্দ্য ও আনন্দচঞ্চল বিচিত্র অনুভূতি শিল্পমূল্য লাভ করেছে। 'ক্ষণিকা'য় ক্ষণিক প্রেম, ক্ষণিক সৌন্দর্য প্রভৃতি ক্ষণিক জীবনের উৎসব প্রাঙ্গণে 'ক্ষণিক দিনের আলোকে' ঝলমল করে উঠেছে। যথা—

শুক্লসন্ধ্যা চৈত্রমাসে তোমার কোলে ফুলের পুঁজি।
হেনার গন্ধ হাওয়ায় ভাসে— তোমার আমার এই-যে প্রণয়,
আমার বাঁশি লুকায় ভুমে, নিতান্তই এ সোজাসুজি॥ —সোজাসুজি

দিঘির জলে ঝলক ঝলে সর্ষে ক্ষেতে উঠছে মেতে
মানিক-হীরা, মৌমাছিরা।…—পথে

'ক্ষণিকা'য় লৌকিকছন্দের বহুলপ্রয়োগ ঘটলেও এ কাব্যে 'গভীর সুরে গভীর কথা' ধ্বনিত হয় নি। ১৯০৩ সালে প্রকাশিত 'শিশু' কাব্যেও কোন গভীরতর উচ্চ ভাবধারা নেই। শিশুমনের

বিচিত্র ভাবনা এ কাব্যে রূপায়িত। একটি দৃষ্টান্ত এই—

সন্ধ্যেবেলায় প্রদীপখানি জেলে তখন আমি ফুলের খেলা খেলে
যখন তুমি যাবে গোয়াল-ঘরে টুপ করে, মা পড়ব ভুঁয়ে ঝরে।—লুকোচুরি

'শিশু' কাব্যের সমকালে রচিত 'উৎসর্গের কয়েকটি কবিতায় দেখা যায় লৌকিক ছন্দ উচ্চতরভাব প্রকাশের যোগ্যতা অর্জন করে নূতন শক্তি ও সৌন্দর্য লাভ করেছে। তবে তা ব্যাপক নয়, মাত্র কয়েকটি কবিতা এছন্দে রচিত। একটি দৃষ্টান্ত এই—

আজি আমার ঘরের পাশে আজি আমার দ্বারের কাছে
গগনপারের কারা আসে অনাদি রাত স্তব্ধ আছে
অঙ্গ তাদের নীলাম্বরে ঢাকি। তোমার পানে মেলি তাহার আঁখি।—'উৎসর্গ', ৩৯

'খেয়ার সময় (১৯০৫—৬) থেকেই লৌকিকছন্দ গভীরতম আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা প্রকাশের বাহন হয়ে ওঠে।

জুড়ালোরে দিনের দাহ, ফুরালো সব কাজ, তারি মাঝে দিঘির জলে যাবার বেলাটুকু
কাটল সারা দিন একটুকু সময়,
সামনে আসে বাক্যহারা স্বপ্নভরা রাত সেই গোধূলি এল এখন সূর্য ডুবু ডুবু
সকল কর্ম হীন। ঘরে কি মন রয়।—দিঘি

এরপর 'গীতাঞ্জলি' পর্বে এ ছন্দের বহুল প্রয়োগ বৈচিত্র ঘটে। মানুষ, ঈশ্বর, প্রেম, প্রকৃতি আত্মা ও মুক্তি প্রভৃতি বিষয়বস্তুর মধ্যে এ ছন্দটি বিবর্তিত ও বিকশিত হয়। অধ্যাপক জে, ডি, এণ্ডারসনকে লিখিত একটি পত্রে কবি বলেন—

"আমার শেষ বয়সের কাব্যরচনায় আমি বাংলার এই চলতি ভাষার সুরটাকে ব্যবহারে লাগাইবার চেষ্টা করিয়াছি। কেননা দেখিয়াছি চলতি ভাষাটাই স্রোতের জলের মতো চলে, তাহার নিজের একটি কলধ্বনি আছে।"··· —'ছন্দ' (১৯৬২ সং), বাংলা ছন্দ (১৩২১), পৃ ৭

শেষ বয়সের কাব্য বলতে 'গীতাঞ্জলি' পর্বের দিকেই কবি ইঙ্গিত করেছেন এবার দু' একটি দৃষ্টান্ত দিলেই বোঝা যাবে কবি কিভাবে লৌকিকছন্দকে কাজে লাগিয়েছেন—

(১) অধ্যাত্মচিন্তামূলক—

সন্ধ্যাবেলার সোনার আভায় নিশীথ রাতের গভীর সুরে
মিলিয়ে নিয়ে তান আবার জীবন উঠে পূরে
পুরবীতে শেষ করেছি তখন আমার নয়নে আর
যখন আমার গান— রয়না নিদ্রালেশ। —'গীতাঞ্জলি' (১৯১০)

(২) অধ্যাত্মচিন্তা ও জীবনচেতনার সুন্দর সমন্বয় ও তার চিত্রকল্প—

এই তো তোমার আলোক-ধেনু সূর্য তারা দলে দলে—
কোথায় বসে বাজাও বেণু, চরাও মহাগগন তলে!
তৃণের সারি তুলছে মাথা, তরুর শাখে শ্যামল পাতা;
আলোয় চরা ধেনু এরা ভিড় করেছে ফুলে ফলে॥—'গীতিমাল্য' (১৯১৪),

(৩) গভীর মর্ত্য প্রীতি—

এই-যে কালো মাটির বাসা
শ্যামল সুখের ধরা—
এইখানেতে আঁধার আলোয়
স্বপন মাঝে চরা।

এরি গোপন হৃদয়'-পরে
ব্যথার স্বর্গ বিরাজ করে
দুঃখে আলো করা॥

—'গীতালি' (১৯১৪)

'বলাকা' (১৯১৬) থেকে এ ছন্দ এক বিশিষ্ট নূতন রূপ নিতে থাকে। 'বলাকা' গতিবাদের কাব্য। ছন্দকে এ কাব্যে নিয়মানুগ নির্দিষ্ট পংক্তির বন্ধন থেকে মুক্ত করে প্রয়োজন মতো হ্রস্ব ও দীর্ঘ পংক্তির প্রবহমানতায় গতিদান করা হয়েছে বলে 'বলাকা'র ছন্দের নাম হয়েছে 'মুক্তক'। 'বলাকা'য় মিশ্রকলাবৃত্ত ও লৌকিক উভয় ছন্দেরই মুক্তক রয়েছে। একটি লৌকিক মুক্তক ছন্দের দৃষ্টান্ত এই।—

জীবন হতে জীবনে মোর পদ্মটি যে ঘোমটা খুলে খুলে
ফোটে তোমার মানস সরোবরে—
সূর্যতারা ভিড় করে তাই ঘুরে ঘুরে বেড়ায় কূলে কূলে
কৌতুহলের ভরে।
তোমার জগৎ আলোর মঞ্জরী
পূর্ণ করে তোমার অঞ্জলি।
তোমার লাজুক স্বর্গ আমার গোপন আকাশে
একটি করে পাপড়ি খোলে প্রেমের বিকাশে।—'বলাকা' ৩৩

'পলাতকা'য় (১৯১৮) লৌকিকছন্দের সমিল মুক্তকরূপ চরম বিকাশ লাভ করে। 'পলাতকা'ও গতিবাদের কাব্য। 'বলাকা'র গতিবাদ নির্বিশেষ (Absolute) তত্ত্বকে নিয়ে। 'পলাতকা'র গতিবাদ বিশেষ বিশেষ জীবনের কাহিনী আশ্রয় করে। মূলতঃ 'বলাকা' তত্ত্বপ্রধান আর 'পলাতকা' জীবন প্রধান। আর-এক পার্থক্য এই যে 'বলাকা'র মুক্তক ছন্দোবন্ধে রবীন্দ্র-কথিত 'সাধু' (অক্ষরবৃত্ত বা মিশ্রকলাবৃত্ত) রীতিরই প্রাধান্য, কিন্তু 'পলাতকা'য় প্রাধান্য পেয়েছে 'প্রাকৃত' বা লৌকিক রীতির মুক্তক বন্ধ। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।—

বিলাসপুরের ইস্টেশনে বদল হবে গাড়ি ;
তাড়াতাড়ি
নামতে হল ; ছ ঘণ্টাকাল থামতে হবে যাত্রীশালায়।
মনে হল এ এক বিষম বালাই।
বিনু বললে, 'কেন, এইতো বেশ'।
তার মনে আজ নেই যে খুশির লেশ।—ফাঁকি

লৌকিকছন্দের সমিল মহাপয়ারের (৮+১০) দৃষ্টান্ত রয়েছে 'শেষগান' শীর্ষক কবিতায়। মর্ত্যপ্রীতি ও অমর্ত্যচিন্তার আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছে এ কবিতায়।—

তাই যারা আজ রইল পাশে জীবনের সূর্য-ডোবার বেলায়
তাদের হাতে হাত দিয়ে তুই গান গেয়ে নে থাকতে দিনের আলো—

বলে নে, 'ভাই, এই-যে দেখা এই-যে ছোঁওয়া এই ভালো এই ভালো।
এই ভালো আজ এ সংগমে কান্নাহাসির গঙ্গা যমুনায়
ঢেউ খেয়েছি, ডুব দিয়েছি, ঘট ভরেছি নিয়েছি বিদায়।
এই ভালো রে ফুলের সঙ্গে আলোয় জাগা, গান গাওয়া এই ভাষায়
তারার সাথে নিশীথ রাতে ঘুমিয়ে পড়া নূতন প্রাণের আশায়।—শেষ গান

লৌকিক ছন্দের অমিল মুক্তকরূপের পরিচয় মেলে 'পুনশ্চ' (১৯৩২) কাব্যের 'ছুটি', 'গানের বাসা', 'পয়লা আশ্বিন' প্রভৃতি কবিতায়। যেমন—

ভয় করো না, লোভ করো না, ক্ষোভ করো না
জাগ আমার মন
গান জাগিয়ে চল সুমুখ পথে
যেখানে ঐ কাশের চামর দোলে
নব সূর্যোদয়ের দিকে।
—পয়লা আশ্বিন।

পরবর্তী কালে 'জন্মদিনে' কাব্যের (১৯৪১) চব্বিশ-সংখ্যক কবিতায় এবং 'সানাই' কাব্যের (১৯৪০) 'বাসাবদল' ও 'পরিচয়' কবিতায় এ ছন্দের উৎকর্ষ ও পরিণতি ঘটে। একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে মুক্তকের আলোচনা শেষ করা গেল।—

অচিন কবি, তোমার কথার ফাঁকে ফাঁকে
দেখা যেত একটি ছায়াছবি,
স্বপ্ন ঘোড়ায় চড়া তুমি খুঁজতে বেরিয়েছ
তোমার মানসীকে
সীমাবিহীন তেপান্তরে
রাজপুত্র তুমি যে রূপকথার।
—'সানাই,' পরিচয়

লৌকিক ছন্দকে অমিত্রাক্ষরে প্রয়োগ করে তার মধ্যে উদাত্ত গাম্ভীর্য আনা সম্ভবপর, এ সম্পর্কে কবি গভীর আস্থাশীল ছিলেন। দুঃখের বিষয় তিনি লৌকিক রীতির অমিত্রাক্ষর বন্ধে কোনো মৌলিক সৃষ্টি কর্ম রেখে যান নি। কেবল ছন্দ আলোচনা কালে 'মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম স্বর্গের কিছুটা অংশ লৌকিকছন্দে রূপান্তরিত করেন। তিনি বলেন—

"এই প্রাকৃত বাংলাতেই 'মেঘনাদ বধ' কাব্য লিখলে যে বাঙালিকে লজ্জা দেওয়া হত সে কথা স্বীকার করব না। কাব্যটি এমনভাবে আরম্ভ করা যেত

যুদ্ধ যখন সাঙ্গ হল বীরবাহু বীর যবে
বিপুল বীর্য দেখিয়ে হঠাৎ গেলেন মৃত্যুপুরে
যৌবনকাল পার না হতেই। কও মা সরস্বতী,
অমৃতময় বাক্য তোমার সেনাধ্যক্ষ পদে
কোন্ বীরকে বরণ করে পাঠিয়ে দিলেন রণে
রঘু কুলের পরম শত্রু, রক্ষকুলের নিধি।

এতে গাম্ভীর্যের ত্রুটি ঘটেছে এ কথা মানব না।"—'ছন্দ' (১৯৬২ সং), ছন্দের প্রকৃতি, পৃ ১৩১।

'গাম্ভীর্য' মানে রবীন্দ্রনাথ কি বলতে চেয়েছেন তা সহজে বোঝা যায় না। এটুকু অংশের মধ্যে শব্দ প্রয়োগের দ্বারা কোনো গাম্ভীর্য এসেছে কি না তা পাঠকের রুচি ও সংস্কার সাপেক্ষ। মোট কথা লৌকিক ছন্দোরীতির অমিত্রাক্ষর বন্ধে উদাত্তগম্ভীর ভাবে চমৎকার ভাবে প্রকাশ পেতে পারে—প্রতিভাবান কবিশিল্পীদের পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ যদি একটি কবিতা অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখতেন তবে বাংলা ছন্দভাণ্ডার সবদিক দিয়ে সামগ্রিকভাবে পূর্ণ থাকত এবং ভবিষ্যতের জন্য বাংলা কাব্যরচনার একটি নূতন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত থাকত। বিচিত্রপথগামী

রবীন্দ্রপ্রতিভা এদিকে অগ্রসর হল না—এ বড়ই পরিতাপের বিষয়।

হাস্যরস সৃষ্টিতে লৌকিকছন্দ কত বিচিত্রভাবে রূপায়িত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। নিম্নে দুটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।—

(১) এতো বড় রঙ্গ জাদু, এতো বড়ো রঙ্গ
চার মিঠে দেখাতে পারো যাব তোমার সঙ্গ।
বরফ মিঠে, জিলাবি মিঠে, মিঠে শোন-পাপড়ি,
তাহার অধিক মিঠে কন্যা কোমল হাতের চাপড়ি॥

—'প্রহাসিনী' (১৩৪১), রঙ্গ

(১) বর এসেছে বীরের ছাঁদে, বিয়ের লগ্ন আটটা—
পিতল আঁটা লাঠি কাঁধে, গালেতে গাল পাট্টা,
শ্যালীর সঙ্গে ক্রমে ক্রমে আলাপ যখন উঠল জমে
রায় বেঁশে নাচ নাচের ঝোঁকে মাথায় মারলে গাঁট্টা,
শ্বশুর কাঁদে মেয়ের শোকে, বর হেসে কয়—'ঠাট্টা'॥

—'খাপছাড়া' (১৩৪৩), বর এসেছে বিয়ের ছাঁদে

রবীন্দ্র রচনায় লৌকিকছন্দের বন্ধ বৈচিত্র্য

ছন্দোবন্ধের, ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ লৌকিকছন্দকে নানাভাবে সজ্জিত করে তার রূপৈশ্বর্য বৃদ্ধি করেছেন। এখানে সেদিকটার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা গেল।

লৌকিকছন্দে পূর্ণপর্বে সাধারণতঃ চারমাত্রায় গঠিত হয়। কিন্তু কোথাও কোথাও তিন মাত্রার পর্বও ব্যতিক্রম হিসাবে দেখা যায়। রবীন্দ্রসাহিত্যেও তার নিদর্শন আছে। যেমন—

'আগুনের' | পরশমণি | ছোঁয়াও প্রাণে।
'এ জীবন' | পুণ্য কর | দহন দানে॥—'গীতালি,' ১৮

উদ্ধৃত কবিতাংশে ত্রিদল ও চতুর্দল পর্বের সমাবেশ ঘটায় এছন্দ তরঙ্গায়িত হয়ে উঠেছে। অবশ্য ত্রিদল পর্ব গঠনের রীতি লোকসাহিত্যেও রয়েছে। বাউল গানে পাই।

আছে যার মনের মানুষ | আপন মনে
সে কি আর | জপে মালা।

'ছেলে ভুলানো ছড়া'র ন্যায় রবীন্দ্রকাব্যে মাঝে মাঝে ত্রিদল পর্বের প্রয়োগও দেখা যায়। যেমন—

ইতিমধ্যে | যোগীন দাদা | 'হাৎরাশ জং' | শনে
গেছেন লেগে | চায়ের সঙ্গে | পাঁউরুটি দং | শনে।—'ছড়ার ছবি,' যোগীন দা

রবীন্দ্রনাথের লৌকিক ছন্দে ত বটেই, অন্যরীতির ছন্দেও অতিপর্বের প্রয়োগ করেছেন। অতিপর্বের আদর্শটি মূলতঃ লোকসাহিত্য থেকে নেওয়া। লোকসাহিত্যে অতিপর্বের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। রবীন্দ্রকাব্য থেকে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল।—

আমি নাই-বা গেলেম বিলাত,
নাই-বা পেলেম রাজার খিলাত,
যদি পরজন্মে পাইরে হতে
ব্রজের রাখাল বালক—
তবে নিভিয়ে দেব নিজের ঘরে
সুসভ্যতার আলোক ॥—'ক্ষণিকা,' জন্মান্তর

পদবন্ধে লৌকিকছন্দের বৈচিত্র্য সাধন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লোকসাহিত্যে এরূপ বৈচিত্র্য নেই। যেমন—(১) একপদী (১০ মাত্রা)

কাঁকন জোড়া | এনে দিলেম | যবে
ভেবে ছিলাম | হয়তো খুশী | হবে।—'পূরবী,' দান

(২) দ্বিপদী (৮+৬ মাত্রা)

সুবল দাদা | আনল টেনে ॥ আদম দিঘীর | পাড়ে,
নীল বাঁদরের | নাচন সেথায় ॥ রামছাগলের | ঘাড়ে।—'ছড়া' ১

(৩) ত্রিপদী (৮+৮+৬ মাত্রা)

কে গো চিরজনম ভরে।
নিয়েছ মোর হৃদয় হরে।
উঠছে মনে জেগে।
নিত্য কালের চেনা-শোনা।
করছে আজি আনাগোনা।
নবীন-ঘন মেঘে।—'উৎসর্গ,' ৩৩

(৪) চৌপদী (৮+৮+৮+৬ মাত্রা)

দুয়ার জুড়ে কাঙাল বেশে।
ছায়ার মতো চরণ দেশে।
কঠিন তব নূপুর ঘেঁষা।
আর বসে না রইব।
এটা আমি স্থির বুঝেছি।
ভিক্ষা নৈব নৈব।—'ক্ষণিকা,' বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী

'জন্মদিনে' (১৯৪১) কাব্যের এগারো নম্বর কবিতায় রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করেছেন যে তিনি তাঁতি, জেলে ও কৃষক প্রভৃতি দীন মূক জনসাধারণের কবি হতে পারেন নি। কিন্তু জনসাধারণের সুখ দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষা ধ্বনিত লোকসাহিত্যের ছন্দকে, তার মূল নীতির ব্যত্যয় না ঘটিয়ে, নানাভাবে রূপান্তরিত করে কাব্যকলা ও ভাবসৌন্দর্যের যে লক্ষ্যণীয় আভিজাত্য ও মর্যাদা এনে দিয়েছেন তার তুলনা নেই। কাশীরামদাস সংস্কৃত মহাভারতের বাংলা অনুবাদ করে রসধারার প্রবাহ সংস্কৃত-না-জানা বঙ্গবাসীর নিকট উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথও তেমনি লৌকিকছন্দ যে সর্বপ্রকার ভাবধারা প্রকাশের উপযোগী তা অজস্র সৃষ্টির মাধ্যমে ভবিষ্যৎ কবিসমাজের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ রেখে গেছেন। ১৩২৪ সালে লৌকিক ছন্দের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন—

"সাধুভাষায় তার সমাদর হয়নি বলে সে মুখ ফুটে নিজের সব কথা বলতে পারেনি এবং তার শক্তি যে কত তার পরিচয় হল না। আজকের দিনের ডিমক্রেসির যুগেও সে ভয়ে ভয়ে দ্বিধা করে চলেছে; কোথায় যে তার পংক্তি এবং কোথায় নয় তা স্থির হয় নি। এই সংকোচে তার আত্মপরিচয়ে খর্বতা হচ্ছে।"—'ছন্দ' (১৯৬২ সং), ছন্দের অর্থ, পৃ ৫১

লৌকিকছন্দের পংক্তি কোথায় তা ১৩২৪ সালের পরবর্তীকালে রবীন্দ্ররচিত বহু কবিতায় নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। অর্থাৎ এ ছন্দ যে কোনো বিষয়বস্তুকে প্রকাশ করতে সক্ষম। রবীন্দ্রসমসাময়িক দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, বিজয়চন্দ্র মজুমদার ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ কবিরা এ ছন্দে কবিতা লিখতে

প্রয়াসী হন। বিশেষ করে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি লৌকিকছন্দের বহিরঙ্গ গঠনে বিশেষভাবে সচেষ্ট হন। এর ফলে কবিতার আঙ্গিকে রূপবৈচিত্র্য সৃষ্ট হলেও ভাবসৌন্দর্যের অমিয় ঐশ্বর্যে তা 'বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থ প্রতিপত্তয়ে'—মূল্য লাভ করেনি। আশা ছিল রবীন্দ্রোত্তর কাব্যে আমরা দেখতে পাব লৌকিকছন্দের প্রয়োগক্ষেত্র আরও বিস্তৃত হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রোত্তর কালের কবিরা এ ছন্দকে মাঝে মাঝে প্রয়োগ করেছেন মাত্র—তাও আবার উচ্চতর বিষয় বা গভীরতর ভাবনাশ্রিত নয়। সাম্প্রতিক কালের কবিদের কথা স্বতন্ত্র—তাঁরা গদ্যছন্দের পূজারী। কচিৎ এঁদের কাব্যে লৌকিকছন্দের সাক্ষাৎ মিলে। লক্ষিতব্য বিষয় এই যে, রবীন্দ্রনাথের পর থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত কোন কবিই সচেতন ভাবে এ ছন্দটিকে কাব্যসৃষ্টিতে প্রয়োগ করার জন্য চেষ্টিত হন নি। আধুনিক যুগের সংশয়কণ্টকিত জিজ্ঞাসাবাদকে লৌকিকছন্দ যে নির্বিবাদে প্রকাশ করতে পারে,—সাম্প্রতিক কবিসমাজের নিকট এ আশা করা বোধ করি অন্যায় হবে না।

'কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রসঙ্গে

অধীর দে

বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র আজও সম্রাটের আসন অলঙ্কৃত করিয়া আছেন। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এই উক্তি অস্বাভাবিক মনে হইলেও তাহা গভীরভাবে সত্য। বর্তমান কালের উপন্যাসের আলো-আঁধারি আঙ্গিকের তুলনায় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-শিল্পের শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করা যায় না। উপন্যাসগত ঘটনার স্বচ্ছন্দ গতিতে, চরিত্রের সহজ স্বাভাবিক বিকাশে এবং সমগ্র কাহিনীর নিটোল সুঠাম রূপায়ণ-কর্মে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিকগুণ বিধৃত। তাঁহার ঔপন্যাসিক প্রতিভার চরমোৎকর্ষ লক্ষ্য করা যায় 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রও স্বয়ং এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন—তাঁহারও মতে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। সমাজের ভাবনা-চিন্তা, তাহার আদর্শের নিখুঁত রূপ যে উপন্যাসের ঘটনা বা বিচিত্র চরিত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় তাহাই সামাজিক উপন্যাসের অভিধা বহন করে। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে সমকালীন বাঙালী হিন্দুর সামাজিক জীবনের বিশিষ্ট সমস্যার ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং এই সমস্যাকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে না পারিয়া কৃষ্ণকান্ত তথা গোবিন্দলালের পারিবারিক জীবন সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে। পারিবারিক জীবনের ভয়াবহ ট্র্যাজেডি সমগ্র বাঙালী সমাজের ব্যাপক সমস্যা-জর্জর চিন্তা হইতে পাঠক সমাজকে আকর্ষণ করিয়া একটি সুনির্দিষ্ট পথে অর্থাৎ কৃষ্ণকান্তের প্রাসাদ অভিমুখে লইয়া গিয়াছে বলিয়া 'কৃষ্ণকান্তের উইল'কে নিছক সামাজিক উপন্যাস আখ্যাও দেওয়া যায় না। পারিবারিক উপন্যাস রূপেই 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র সার্থকতা অবিসংবাদিত।

'কৃষ্ণকান্তের উইল পরিণত লেখনীর সফল ফসল। বরিমচন্দ্রের শিল্পীমন সর্বদাই এই উপন্যাসের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছে। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইবার পরও বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পীমানস সম্পূর্ণভাবে পরিতৃপ্ত হইতে পারে নাই। গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণেও তিনি ইহার অনেক সংস্কার সাধন করিয়াছেন। কিন্তু 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র প্রথম খণ্ডটি যেভাবে মনোযোগ সহকারে সংস্কৃত বা সংশোধিত হইয়াছিল, দ্বিতীয় খণ্ডটি তাহা হয় নাই। এই প্রসঙ্গে স্বয়ং ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের একটি পত্রের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না—

'কৃষ্ণকান্তের উইল' সম্বন্ধে একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল। প্রথম সংস্করণে কয়েকটা গুরুতর দোষ ছিল, দ্বিতীয় সংস্করণে তাহা কতক সংশোধন করা হইয়াছে। পুস্তকের অর্ধেকমাত্র সংশোধিত হইয়া মুদ্রিত হইলে আমাকে কিছুদিনের মধ্যে কলিকাতা হইতে অতি দূরে যাইতে হইয়াছিল। অতএব অবশিষ্ট অংশ সংশোধিত না হইয়াই ছাপা হইয়াছিল। তাহাতে প্রথমাংশে ও শেষাংশে কোথাও কিছু অসংগতি থাকিতে পারে।'

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার নিজস্ব রচনাগত ত্রুটি পাঠক সমাজের নিকট অনাবৃত করিয়া নিজের শিল্পপ্রভাবের গভীরতারই পরিচয় দিয়েছেন। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র শেষখণ্ড অর্থাৎ দ্বিতীয় খণ্ডের

রচনাগত দুর্বলতা বা শৈথিল্য নির্মম সমালোচকের কঠোর মন্তব্যের লক্ষ্যস্থল হইয়াও পাঠক সমাজের মনকে বঙ্কিম প্রীতি হইতে বিচলিত করিতে পারে নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসগুলির মধ্যে তাঁহার সামাজিক মনের দৃষ্টি বা অভিজ্ঞতার পূর্ণতা 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'ই সর্বাধিক লক্ষ্য করা যায়। 'বিষবৃক্ষে' যে ভাবনা বা চিন্তার অঙ্কুর দেখা দিয়াছে বা 'চন্দ্রশেখরে' যাহার সূচনা কৃত্রিমভাবে পরিলক্ষিত হয়, 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' সেইসব চিন্তা বা আদর্শের পরিপূর্ণ অথচ স্বাভাবিক প্রকাশ ঘটিয়াছে। অর্থাৎ শিল্পী হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের ক্রমোন্নতির স্তর লক্ষ্য করার মত।

বাংলাদেশের সমাজজীবনে একদিন বাল-বিধবার সমস্যা পৃথকভাবে দেখা দিয়াছিল এবং সমাজদেহে এক গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করিয়াছিল। সমাজনেতাগণ ইহার সুষ্ঠু নিরাময় সাধনে বিশেষ যত্ন লইলেও ইহার স্বতঃস্ফূর্ত পরিণতিকে নিরস্ত করিতে পারেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে সমাজের এই সমস্যাই আভাষিত হইয়াছে এবং এই সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার যে আদর্শ-চিন্তা বা মনোভাব গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাই তাঁহার বিভিন্ন উপন্যাসে শিল্পসম্মতভাবে প্রকাশের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র রোহিণীর অঙ্কুর 'বিষবৃক্ষে' প্রথম কুন্দনন্দিনীর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। কুন্দনন্দিনী বাল-বিধবা। তাহার আকর্ষণ নগেন্দ্রনাথের জীবনে বিপুল আলোড়ন তুলিয়াছে এবং সূর্যমুখীর সংসার বিপর্যস্ত করিয়াছে। কিন্তু কুন্দনন্দিনীর আচার-আচরণ বা আত্ম-বিলোপ পাঠক-সমাজের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হয় নাই। মনেপ্রাণে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের সেই অভিপ্রায় নিশ্চয়ই ছিল না। তিনি যে আদর্শ-চিন্তা বা মনোভাব পোষণ করিয়াছিলেন তাহার সম্যক সদ্ব্যবহার 'বিষবৃক্ষে'র মাধ্যমে করা সম্ভব হয় নাই। রূপসী যুবতী বাল-বিধবার বিষক্রিয়ায় সমাজের বা পরিবারের যে কি চরম অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে তাহা বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণী চরিত্র সৃষ্টি করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র রোহিণী দোষে-গুণে ভরা এবং তাহার গুণবত্তার পরিচয় এমনভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে যে তাহার চারিত্রিক অন্যান্য ত্রুটি নিষ্প্রভ হইয়া যায় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র তিল তিল করিয়া অতিশয় নিষ্ঠার সহিত রোহিণী-চরিত্রের রূপদান করিয়াছেন এবং তাহা এত স্বাভাবিকভাবে নিষ্পন্ন হইয়াছে যে পাঠকসমাজ রোহিণীর হত্যায় কোনপ্রকার অস্বস্তি প্রকাশ করে নাই। রোহিণী-হত্যার আকস্মিকতা সম্পর্কে কোন কোন সমালোচক মহল হইতে অভিযোগ আসিলেও তাহার প্রত্যুত্তর স্বরূপে বলা যাইতে পারে যে রোহিণীর পরিণাম পূর্ব প্রস্তুতির ভূমিকা তৈয়ারী করিয়াও অন্যভাবে দেখান সম্ভব হইত না। ইহা স্বাভাবিক যে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম খণ্ডে রোহিণী চরিত্র-চিত্রণে যে সময় ব্যয় করিয়াছেন, দ্বিতীয় খণ্ডে তাহার সামান্য মাত্র সময়ও গ্রহণ করেন নাই। ঔপন্যাসিক-গুণের সামান্য ব্যত্যয় ঘটিলেও রোহিণী চরিত্রের মাধ্যমে তিনি যে মনোভাব প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন তাহা সার্থকভাবেই কার্যকরী হইয়াছে, অর্থাৎ বাল-বিধবা যুবতীর ভোগাকাঙ্ক্ষা বা আসঙ্গলিপ্সাকে বঙ্কিমচন্দ্র কোনদিনই সমর্থন করিতে পারেন নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র আদর্শবাদী ছিলেন এবং তাঁহার এই আদর্শবাদ কোন কোন রসিকমহলে বিশেষ উপহসিত বা উপেক্ষিত হইয়াছে। আদর্শবাদী লেখকমাত্রেই যে উপেক্ষণীয় হইবেন, তাহা

কোন দিক দিয়াই স্বীকার করিয়া লওয়া যায় না। অনেক সমালোচক আছেন যে, পূর্ব হইতেই বঙ্কিমচন্দ্রের নীতিবাদ বা আদর্শবাদকে এমনভাবে তুলিয়া ধরেন যে যেখানে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যচিন্তা বা সহজ সৌন্দর্যবোধেরও যথাযথ মূল্যায়ন হয় না। অতএব, সংস্কারমুক্ত দৃষ্টি লইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাকে, বিশেষতঃ 'কৃষ্ণকান্তের উইল' পর্যালোচনা করিলে শিল্পী বঙ্কিমের পরিচয় লাভ করা কষ্টকর হয় না। যদিও 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'ও বঙ্কিমচন্দ্রের নীতিধর্ম বা আদর্শচিন্তারই জয় হইয়াছে, কিন্তু অন্যান্য উপন্যাস অপেক্ষা তাহা এত শিল্পসম্মতভাবে সম্পন্ন হইয়াছে যে তাহা দ্বারা ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের অসাধারণ ক্ষমতার প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না।

বাঙালী হিন্দুর দাম্পত্য আদর্শের বিশিষ্ট গৌরবময় মহিমার প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রদ্ধা ছিল অসাধারণ। দাম্পত্যপ্রেমকে তিনি হিন্দুর ধর্মসাধনার অঙ্গ হিসাবেই দেখিয়াছেন। সেইজন্য এই প্রেমের ক্ষেত্রে যথেচ্ছাচারিতা বা অসংযম এবং এমনকি, মানসিক ব্যভিচারিতাকেও তিনি কোন দিনই প্রশ্রয় দেন নাই। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে তাঁহার এই আদর্শায়িত মনোভাব পরিব্যক্ত হইলেও পাঠকসমাজের নিকট তাহা যথাযথ সমাদর লাভ করে নাই। অর্থাৎ শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত অনেকটাই কৃত্রিম হইয়া পড়িয়াছে এবং দাম্পত্যপ্রেমের মহিমা তেমনভাবে সাধারণ পাঠকের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের এই মহনীয় আদর্শ কিন্তু 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' এমন সুন্দর স্বাভাবিকভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে যে তাহাতে কোন কৃত্রিমতার চিহ্ন নাই। ভ্রমরের সংযত জীবনসাধনা ও গভীর প্রেম এমনভাবে পথ কাটিয়া অগ্রসর হইয়াছে যে তাহাতে কোন সন্দেহ প্রকাশ করিবার অবকাশ পাওয়া যায় না।

বঙ্কিমচন্দ্রের ভারতীয় ঐতিহ্য বা জীবনাদর্শের প্রতি আনুগত্য ছিল গভীর। বিভিন্ন সামাজিক বা পারিবারিক উপন্যাসে তিনি যে জীবনচিত্র প্রকাশ করিয়াছেন তাহা ভারতীয় হিন্দু বা সামাজিক মানুষের আদর্শ রুচিসম্মত। বঙ্কিমচন্দ্র কখনই মনেপ্রাণে তাঁহার লালিত আদর্শ-রুচির বিচ্যুতি বা বিকৃতিকে গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার আদর্শনিষ্ঠ চিন্তাধারার সুস্থ সুন্দর প্রকাশের প্রয়োজনেই সৃষ্টি হইয়াছে উপন্যাসের। প্রথমদিকের উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার আদর্শ বা নীতি-ধর্মকে প্রাধান্য দিয়া ফেলিয়াছেন, কারণ তখন ঔপন্যাসিক গুণসমূহ যথাযথভাবে তাঁহার আয়ত্তাধীন ছিল না। সেইজন্য শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র নীতিবাদী বঙ্কিমের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া হইতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র ঔপন্যাসিক বঙ্কিম অনেক পরিণত, সংযত ও স্থিতধী। অর্থাৎ উপন্যাসের লক্ষণীয় সম্পদ বা ঐশ্বর্যকে তিনি অবিচার করিয়া রাখিয়াছেন। পূর্ববর্তী উপন্যাসগুলির মত বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ মনোভাব বা ভারতীয় নীতিধর্ম 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'ও প্রকাশিত হইয়াছে বটে, কিন্তু যেখানে নীতিবাদী বঙ্কিমের মূর্তি শিল্পী বা ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের নিকট নিষ্প্রভ বা ম্লান হইয়া গিয়াছে। ইহা হইতে উপলব্ধি করা যায় যে, 'কৃষ্ণকান্তের উইল' বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পীমনের সার্থক রূপায়ন এবং উপন্যাস হিসাবে সর্বশ্রেষ্ঠ। আজিকার দিনেও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' বাংলা উপন্যাস রাজ্যে একক আধিপত্য লইয়াই বিরাজ করিতেছে। ঔপন্যাসিক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

আত্মজিজ্ঞাসা

দীর্ঘদিন ধরে 'সমকালীন' এর পাতায় নাট্য বিষয়ে নানা আলোচনা করার পর আজ এই কথাই মনে হচ্ছে যে, এ ধরণের আলোচনার কোন প্রয়োজন আছে কি ? লেখকের চিন্তা ধারা যে সর্বত্র স্বচ্ছ নয় এ বিষয়ে ওয়াকিবহাল থাকলেও কোন পাঠক তো সে অস্বচ্ছতা ঘোচাবার জন্য সহায়তা করেছেন না। কেউত বলছেন না-বাপুহে এই যে কথাটা বলছ এটাত ঠিক নয়, এর অর্থ ভিন্ন।

এমন কথা শুনলে লেখকও উপকৃত হন, অন্য পাঠকরাও কিন্তু কোন কথাই যদি না শোনা যায় তবে নিস্তরংগ সে পাঠক মনোভাব থেকে ধরে নিতে হয়, তাঁরা লেখাটা পড়েন নি বা পড়ে থাকলেও তা তাঁদের মনে কোন রকম নাড়া দেয় নি। এ অবস্থাতেও একই কথা মনে হয়, এ দুর্মূল্যের বাজারে দিনগত পাপক্ষয় হিসাবে পত্রিকার পাতা ভরানোর কি প্রয়োজন ?

অবশ্য নাট্য বিষয়ে এ অনীহা সর্বব্যাপী। সদ্য সদ্য তার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত পেলাম, প্রায় সন্ধ্যা, নিজের কাজে ব্যস্ত এমন সময়ে টেলিফোন। এক বন্ধু অনুরোধ করছেন, সেইদিন রাত্রেই এক মফঃস্বল শহরে যেতে পারব কিনা। কারণ জানতে চেয়ে শুনলাম, এক সারা বাংলা সম্মেলনের নাট্য শাখায় আলোচনা করবার জন্য যারা যেতে স্বীকৃত হয়েছিলেন, শেষ মুহূর্তে গররাজী হওয়ায় উদ্যোক্তারা অকূল পাথারে পড়ে হাতের কাছে যাকে পাচ্ছেন তাকেই টানাটানি করছেন। যেহেতু আমি নাট্য বিষয়ে লিখে থাকি সুতরাং অবশ্যই একজন বিশেষজ্ঞ—এই অজুহাতে উপস্থিত বিদগ্ধজনকে জ্ঞান দেবার অধিকারী বিধায় আমাকে যেতে বলা হচ্ছে।

সবিনয়ে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতে হ'ল কারণ নিজেকে বিশেষজ্ঞ বলে বিবেচনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, বড় জোর সোচ্চার শিক্ষার্থী বলতে পারেন। একজন শিক্ষার্থীর পক্ষে যে ধরণের ধৃষ্টতা দেখানো অমার্জনীয় অপরাধ তা করা সম্ভব হ'ল না। বন্ধুবর এদিকে নিরংকুশ, তিনি রথ দেখা কলা বেচার সুযোগ ছাড়লেন না।

আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করার পর থেকেই আত্মজিজ্ঞাসা আরো মুখর হয়ে উঠেছে—এ অবস্থায় নাট্য সম্বন্ধীয় আলোচনার কি সত্যি প্রয়োজন আছে ?

আজকের নাট্য মঞ্চের অবস্থা বিচার করে দেখলে নির্দ্বিধায় না বলতে আটকায় না। কারণটাও খুব দুর্বোধ্য নয়, সহযোগী এক পত্রিকায় এ বিষয়ে যে প্রশ্ন করা হয়েছিল সেটা দিয়েই বোঝানো যায়। সহযোগীর প্রশ্ন হ'ল, ১০ লক্ষাধিক দর্শক যেখানে প্রতি বছর পদার্পণ করে থাকেন সেই কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট আর সৌখীন নাট্যশালার মধ্যে যে আশমান জমিন ফারাক তা কি দূর হবে ? উত্তরটাও প্রশ্নের মধ্যেই পাওয়া যাবে এবং সেটিও নির্দ্বিধ 'না'। অর্থাৎ সাধারণ নাট্য দর্শক আর অগ্রবর্তী দলগুলির মধ্যে যোগ প্রায় নেই বললেই চলে। একমাত্র যে সব অভিনেতা (উভলিংগ)

সৌখিন তথা অগ্রবর্তী দলগুলিতে নাম করতে পারেন তাঁরা পেশাদারী দলে ঠাঁই পান। সেখানকার রীতিতে তাঁরা বিন্দুমাত্র চিড় ধরাতে পারেন না এবং আস্তে আস্তে পুরানো দল গুলিকেও পেশাদারী রীতিতে প্রভাবিত করে ফেলেন। দলের মধ্যে যদি অন্য কেউ শক্তিমান ব্যক্তি থাকেন তো দলের গোত্রান্তর বিরুদ্ধ হয়, না হলে অগ্রবর্তী দল হয় পশ্চাদবর্তীতে পরিণত। বাংলার নাট্যশালার ইতিহাসের সর্বত্রই এ ঘটনার সাক্ষ্য হাজির আছে।

অগ্রবর্তী দলগুলি কিন্তু এখানে ওখানে কিছু সুনাম অর্জন করলেও জনগণের কাছ থেকে সহযোগিতা বা সমর্থন বড় একটা পান না। কারণ তাঁদের মেম সাহেবকে সাড়ী পড়ানোর প্রচেষ্টা অতি প্রকট হওয়ায় জনগণের মনে তা রেখাপাত করে না। ফলে যত মনোহারী নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে তত টিকে থাকছে না। আজ থেকে ২০-২৫ বছর পরে আজকের সাড়া জাগানো নাটকের ক'টি জনমনে বেঁচে থাকবে তা নিশ্চিত করে বলা শক্ত হলেও সংখ্যাটি যে সামান্য হবে তা বলতে জ্যোতিষী হবার কোন প্রয়োজন নেই।

একথা স্বীকার্য যে শ্রেষ্ঠ নাট্যকারেরও সব কটি নাটকই শ্রেষ্ঠ হয় না। অন্য পরে কা কথা স্বয়ং সেক্‌স্‌পীয়ারের সবগুলি নাটকই সমান হয়েছে—রোমিও জুলিয়েট, হ্যামলেট, ম্যাকবেথ, কিংলিয়ার, মার্চেন্ট অব ভেনিস, কমেডি অব এররস, টেমিং অব দি শ্রু, হেনরী ফিফ্‌থ, রিচার্ড টি থার্ড অ্যাজ ইউ লাইক ইট বা ওথেলো যে স্তরের নাটক বলে স্বীকৃত হয়; টাইমন অব এথেন্স কি টাইটাস এণ্ড্রোনিকাসকে কি কেউ সেই স্তরে ফেলবে? কাজেই কোন নাট্যকারের সব নাটক ভাল না হলেও কিছু তো হবে! দুর্ভাগ্যের কথা তা হচ্ছে না। না হওয়ার কারণ কি? প্রথমতঃ পশ্চিমী প্রভাব এবং তারই পরিপূরক হিসাবে দেশের মাটির সঙ্গে যোগশূন্যতা। আমরা সকলেই প্রায় 'নিরালম্ব বায়ুভূত' টবের ক্যাকটাস্ আর মরশুমী ফুল। দেশের অপরাজিতাও 'দূর অস্ত' পদ্মেরও দাম নেই। লিলি অব ভ্যালিতে আপত্তি নেই কিন্তু তাকে হাসনাহানার মত দেশের মাটির সঙ্গে মিশে যেতে হবে।

দ্বিতীয় কারণ, দেশজ ঐতিহ্য সম্বন্ধে নাট্যকারদের অনীহা। এদেশী নাট্যকারদের কালিদাস ভাস, ভবভূতির মূল নাটক বা তার বাংলানুবাদ পড়া বোধ হয় নিষিদ্ধ। গিরিশচন্দ্র, মধুসূদন, দ্বিজেন্দ্রলাল বা ক্ষীরোদপ্রসাদের ছাত্র পাঠ্য নাটকগুলি ছাড়া বড় জোড় প্রহসনগুলি সম্বন্ধেই কিছুটা জ্ঞান থাকাই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয়। নাটকের বাইরে অন্য বইয়ের কথা বোধ হয় না তোলাই ভাল। অগ্রবর্তী নাট্যকাররূপে পরিচিত পুরস্কৃত প্রশংসিত এক নাট্যকারকে প্রশ্ন করতে শুনেছি, সমুদ্রমন্থন কোন বইয়ে পাব? অমন উৎকট সাহেব এম এস ডাট, তিনিও এ প্রশ্ন করতে লজ্জা পেতেন, কিন্তু এই সব খাঁটি বংগ সন্তান সগৌরবে বেমালুম আত্মপরিচয় ভুলে যাচ্ছে। ভাবটা বোধ হয়, নাটক লেখা তেলেভাজা বেগুনি তৈরির চেয়েও সহজ।

এর ওপর অধিকাংশ নাট্যকারের মঞ্চে কি করা সম্ভব বা অসম্ভব সে বিষয়ে ধারণার একান্তই অভাব। তাই দেখি তরুণ নাট্যকারের নাটকের মুখ্য চরিত্র এক কুকুর। এদেশে শিক্ষিত অভিনেতা পাওয়াই দুষ্কর, শিক্ষিত কুকুর আসবে কোথা থেকে এ প্রশ্ন বোধ হয় অবান্তর।

এমন অবস্থায় মৌলিক নাটক লেখার চেয়ে অনুবাদ বা ভাবানুবাদ সহজসাধ্য বলে

বিবেচিত হয় আর তাই একই নাটকের একাধিক অনুবাদ ভিন্ন নামে ভিন্ন নাট্যকার প্রকাশ করছেন। অনেক সময় তাই দেখা যায় অনুবাদক নাট্যকার হিসাবে এক একজন খুব নাম করেছেন অথচ এঁরাই অনেক সময় মৌলিক নাটক লেখার ব্যাপারে আশ্চর্য রকম ব্যর্থ।

এ সব তথ্য রসিকজনের অবিদিত নয় কাজেই এবিষয় বেশী কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এহ বাহ্য। আমার আসল কথা হচ্ছে, এহেন নৈরাজ্যকে যাঁরা স্বর্গরাজ্য বলে বর্ণনা করেন তাঁদের সম্বন্ধে। প্রতিটি পত্রপত্রিকার নাট্য সমালোচকরা যে সব যুগান্তকারী নাট্য সৃষ্টি সম্বন্ধে আলোচনা করেন আমাদের চোখে তা ধরা পড়ে কেন? কেন সে সব নাটক আমাদের কাছে অতি অকিঞ্চিৎকর বা অর্থহীন প্রলাপ বলে মনে হয়?

নিশ্চয় দেখার চোখের মধ্যে ফারাক আছে কিন্তু কে ঠিক দেখে? এই সব সুপরিচিত তথা প্রতিষ্ঠিত সমালোচকরা না লেখকের মত নাম-গোত্রহীন নাট্য শিক্ষার্থী? এ প্রশ্নের জবাব ঠিক করতে পারছি না বলেই নাট্যচিন্তায় ক্ষ্যান্তি দিতে চাইছি। সমকালীনের রসিক পাঠকবর্গ এবিষয়ে পথ নির্দেশ করতে পারবেন কি? জানাতে পারেন কি বাংলা নাট্যশালায় আজ প্রকৃতই এরণ্ড মহাদ্রুম রূপে পরিচিত না প্রকৃতই মহাদ্রুমের সম্ভাবনা উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হচ্ছে?

আমার চোখে সবই যদি ধূসর মনে হয়, যদি মৌলিক নাট্য রচনার ক্ষেত্রে এক ঊষর বন্ধ্যাত্ব আজ স্বাভাবিক বলে হয়, (পশ্চিমের জানলা থেকে প্রতিফলিত সূর্যালোক বাদ দিলে) নাট্যগগন ঘন তমসাচ্ছন্ন মনে হয় তো সে দোষটা আমার চোখের না প্রকৃত ঘটনা এ খবর জানা একান্ত প্রয়োজন। তাহলে নিজের পথ যে ঠিক এ বোধ জন্মালে নিজের শিক্ষা সম্পূর্ণ করার একটা সম্ভাবনা দেখা দেবে। অন্যথায় এ পথ সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। এবার রসিকজনে বিচার করুন।

রবি মিত্র

বিদেশী সাহিত্য

আমেরিকানদের কাছে ১৯৬৩ সালের ২২ নভেম্বর তারিখ একটি চরম শীতলতম দিন। বিশ্বের ইতিহাসেও এই তারিখটি বেদনার, দুঃখের। বিশ্ব বিমূঢ়, হতচকিত, বেদনার্ত হয়েছিল এই তারিখে। কোটি কোটি মানবাত্মা শোকে কাতর হয়েছিল। এই হতভাগ্য দিবসে মার্কিন প্রেসিডেণ্ট জন ফিটজারেল্ড কেনেডিকে দুর্বৃত্ত হত্যা করে।

তরুণ মার্কিন প্রেসিডেণ্ট কেনেডি আধুনিক রাজনীতির ইতিহাসে একটি স্মরণীয় নাম। সবচেয়ে উল্লেখ্য, কেনেডি ছিলেন মানবপ্রেমিক। এবং উৎসাহিত হবার কথা, রাজনীতিচর্চা তৎসহ তার আধুনিক জটিল সমস্যাকণ্টকিত বাস্তব ব্যবহারের পাশাপাশি শিল্প-সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর ছিল হৃদয়ের যোগ। শিল্পের শক্তিকে তিনি মর্যাদা দিতে শিখেছিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁর তরুণ হৃদয় কাব্যের শাশ্বত সৌন্দর্য ও সত্যের শক্তিতে উৎসাহিত এবং আলোকিত হতো। রবার্ট ফ্রস্টকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে একদা কেনেডি বলেছিলেন, 'In honouring Robert Frost we therefore can pay honour to the deeper sources of our national strength. That strength takes many forms, and the most obvious forms are not always the most significant.

The men who create power make an indispensable contribution to the nation's greatness. But the men who question power make a contribution just as indispensable, especially when that questioning is disinterested.

For they determine whether we use power or power uses us. Our national strength matters ; but the spirit which informs and controls our strength matters just as much. This was the special significance of Robert Frost.' এবং 'When power leads man towards arrogance, poetry reminds him of his limitations. When power narrows the areas of man's concern, poetry reminds him of the richness and diversity of his existence. When power corrupts, poetry cleanses.

For art establishes the basic human truths which must surve as the touch stones of our judgment. The artist, however faithful to his personal vision of reality, becomes the last champion of the individual mind and sensibility against an intrusive society and an officious state.…'

মার্কিন জনমহলে জন কেনেডি ছিলেন অত্যন্ত প্রিয়। অল্প সময়ের মধ্যেই এই তরুণ প্রেসিডেণ্ট তাঁর দেশের জনতার মনের কাছাকাছি আসতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব, মানবতাবোধ এবং সংস্কারহীন গণতান্ত্রিক চেতনার জন্যে শিল্পীমহলও তাঁর প্রতি আশ্চর্য শ্রদ্ধাশীল

ছিল। হত্যা-ঘটিত মৃত্যুতে কেনেডির জনপ্রিয়তা বিশ্বে প্রমাণিত হয়েছে। মার্কিন ইতিহাসে প্রেসিডেণ্ট আব্রাহাম লিঙ্কনের পর এ সৌভাগ্য প্রেসিডেণ্ট কেনেডি ছাড়া আর কারো ভাগ্যে জোটেনি। প্রেসিডেণ্ট লিঙ্কনের উত্তরাধিকার যেন সব দিক থেকেই শতাব্দীর কালের যাত্রায় কেনেডির উপরই বর্তেছিল।

প্রেসিডেণ্ট কেনেডি কবিমহলেরও যে কতোখানি প্রিয় ছিলেন তা প্রমাণিত হবে। কিছুকাল আগে প্রকাশিত 'OF POETRY AND POWER' নামে একটি সঙ্কলন গ্রন্থ থেকে। বলা বাহুল্য, সঙ্কলনটি কাব্য-সঙ্কলন। প্রেসিডেণ্ট কেনেডিকে নিবেদিত প্রায় তিরাশি জন প্রতিষ্ঠিত ও তরুণ কবিদের প্রায় শতাধিক কবিতা সঙ্কলনটির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। সঙ্কলনটি আরো উল্লেখযোগ্য এ কারণে যে এতে শুধুমাত্র আমেরিকান কবিই নয়, কয়েকজন ব্রিটিশ কবিরও শ্রদ্ধার্ঘ পাশাপাশি একই সঙ্কলনে নিবেদিত হয়েছে। প্রেসিডেণ্ট কেনেডির বেদনাদায়ক হত্যাকাণ্ডে পৃথিবীর শান্তিকামী মনুষ্য সমাজ পরম আত্মীয় বিয়োগের মতোই শোকে কাতর হয়েছিলেন। এ বেদনা কবিমহলকে কাতর করেছিল, বিচলিত করেছিল। মুখবন্ধে বলা হয়েছে, 'There is a sad facility in the fact that the murder of John Fitzgerald Kennedy should have provoked this memorial volume. This is in part because poetry had a prominent place in President Kennedy's own vision of America, He saw his country as not just a a political establishment or an economic system or a web of legal relationships, All these were for him aspects of a larger oonception—America as civilized society, He believed that the arts were the source and sign of a serious civilization, and one of his constant concerns while in the White House was to accord artists a nation's belated recognition of their vital role. He considered the arts essential, not only for their own sake, but for the health of the state; for, among other things, art could provide a neccssary check on and criticism of authority. His sense of the relationship between poetry and power was not casual or whimsical. I was organic and profound" (—Arthur Schlesinger Jr.)

বর্তমান সঙ্কলনে অন্তর্ভুক্ত কবিদের মধ্যে রয়েছেন রবার্ট ফ্রস্ট, ডবলুউ. এইচ. অডেন, ফোরেষ্ট ভিক্টর, জর্জ হিচ্‌কক, চার্লস রাইট, ডেভিড ইগনাটো, অ্যালেন জিনসবার্গ, উইলিয়াম বাটলার, হার্ভে শ্যাপিরো, স্টেনলি কোয়েলার, রবার্ট হ্যাজেল, মাইকেল গোল্ডম্যান, ভারনন ওয়াটকিনস, লুইস ঝুকোফস্‌কি, এডওয়ার্ড পলস এবং আরো অনেকে।

'OF POETRY AND POWER' গ্রন্থের কবিতাবলী দু'টি পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথম পর্যায়ে সাতটি কবিতা রয়েছে যার রচনাকাল কেনেডির জীবনকালেই এবং রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন—এই কবিতা সপ্তকে কেনেডির উদ্ভাসিত ব্যক্তিত্ব নানা দৃষ্টিকোণ থেকে ধরা পড়েছে। রাষ্ট্রপতির কর্মভার গ্রহণ অনুষ্ঠানে রবার্ট ফ্রস্ট লিখেছেন :

'It makes the prophet in us all presage
The glory of a next Augustan age
Of a power leading from its strength and pride,
Of young ambition eager to be tried,
Firm in our free beliefs without dismay,
In any game the nations want to play.'

এবং শেষে সংযোগ করেছেন :

'A golden age of poetry and power
Of which this moonday's the begining hour'

(For John Kennedy his Inagurtion)

কেনেডিকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে কবিরা শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। একটি মানুষকে ঘিরে কবিতাবলী রচিত হলেও নানা বিষয়ভাবনা, তৎসহ নানা কণ্ঠস্বর এবং উপস্থাপনার বৈচিত্র্যে সঙ্কলনটি শ্রদ্ধাশীল নৈবেদ্যর একটি স্তবক হয়ে উঠে :

There, still, your bright incontinent essence
Inclines to its own completion, still
Shapes almost its own actuality, still contrives
Some reason, measure, humor in our lives.'

(For John Kennedy of Harvard : Edward Pols)

এবং, 'President I love as my grandfather loved Lincoln,
In the silence after the bugle, lie down.
Lie in your forest of Stone.
Lie close to Lincoln.

One dark hill a flower of light is blooming
Clear as your eyes were.'

(Guard of Honor : Robert Hazel.)

কেনেডির হৃদয়বিদারক মৃত্যুতে বেদনা, ক্রোধ, ক্ষোভ, দুঃখ এবং স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা, ও প্রশংসা বর্তমান সঙ্কলনে* ছন্দোবদ্ধ করেছেন কবিরা। কেনেডির হত্যাকারীও কোনো কোনো কবির হাতে নিষ্কৃতি পান নি। কেউ আবার শ্রীমতী কেনেডির এই চরম শোককে নিজেদের করে নিয়েছেন। কবিদের অতি আধুনিক চিত্রকলা ব্যবহারও অনেক কবিতায় লক্ষণীয় :

'The Black and White glare blink in the inky Air Force night
As the Helikopter rose straight up in the telivision frame

Carrying President Johnson toward the newsphoto White House
Past the tail flag of the giant United States of America super-jet
Settled at rest and lonesome under the klieg light field
Swarmed with cops brass photographers mikrophones blip Macnamara chill
Long nosed Oswald suspect in Dallas of halfmast pro castro assassination.'

(Journals Nov. 22,/'63—Allen Ginsberg.)

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

*OF POETRY AND POWER : Edited by Erwin A. Glikes and Paul Schwaber. Basic Books, Inc. New York.

ডন নদীর কূলে কূলে শোলখভ্

গত বছর সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার পল সাঁত্রা গ্রহণ করেন নি। তার মতে ইদানীং কয়েক বছরের নোবেল পুরস্কার রাজনীতিক পক্ষপাতদুষ্ট। পূর্ব পশ্চিমের ঠাণ্ডা লড়াইয়ের ঠাণ্ডা হাওয়ার হিমস্পর্শ নোবেল পুরস্কারেরও গায়ে এসে লেগেছে। লেগেছে যে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, প্যাস্টারনেকের 'ডাঃ জিভাগো'। ডাঃ জিভাগো বইখানা নাকি নোবেল পুরস্কার পেয়েছে শুধু তার কমিউনিষ্ট বিরোধী মতবাদ ও ইঙ্গিতের জন্যে। শুধু এই কারণেই, প্যাস্টারনেকের ইচ্ছা থাকুক আর নেই থাকুক, সোভিয়েট গভর্নমেণ্টের বিরোধীতায় তিনিও পল সাঁত্রার মতই নোবেল পুরস্কার ফিরিয়ে দিয়েছেন। সে যাই হোক, এ বছর কিন্তু সে রকম কোন গোলযোগের অবকাশ রাখেনি নোবেল পুরস্কার সমিতি এবং এঁরা শোলখভের মত পুরোদস্তুর খাঁটি একজন কমিউনিষ্টকে সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেছেন। তাঁর রাজনৈতিক ধ্যানধারণার জন্যে মোটেই ইতঃস্তত করেন নি। স্বীকার করতেই হবে যে অন্ততঃ এ বছর নোবেল পুরস্কার সমিতি সাহিত্যের যথার্থ মূল্যায়ন করতে সমর্থ হয়েছেন। রাজনীতির লড়াইকে সাহিত্যের অঙ্গনে টেনে আনেন নি। বুনিন্ ও প্যাস্টারনেকের পর রুশের তৃতীয় নোবেল পুরস্কার বিজয়ী হলেন শোলখভ্। বুনিন্ ও প্যাস্টারনেকের সঙ্গে শোলখভের সাহিত্যকর্ম ও ধর্মের আকাশপাতাল ব্যবধান। বুনিন ও প্যাস্টারনেকের চিন্তা-ভাবনায় কতকটা পশ্চিমী সুরের যেন আমেজ পাওয়া যায়। শোলখভের সাহিত্যচিন্তায় জড়িয়ে রয়েছে কমিউনিজম্ ও কালেক্‌টিভিজমের একটা সামগ্রিক ইতিহাস। কমিউনিষ্ট ভাবনার উত্থান-পতনের, দুঃখ-সুখের একটা পরিচ্ছন্ন ছবি। ডন নদীস্রোতের তীব্র ও কোমল সুরের ধ্বনি যেন তাঁর রচনার মর্মবাণী। ডন নদী উপত্যকার কসাক অধিবাসীদের দুঃখবেদনার একটা আন্তরিক ছবি শোলখভ্ তুলে ধরেছেন তাঁর পাঠকদের সামনে—যে কসাকদের মর্মমূল রয়েছে ডন নদীর দুইতীরের সরস মাটির গভীরে। একদা সাহিত্যরসিকদের এক সমাবেশে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'কোথা থেকে আপনি এই অননুকরণীয় রঙ ও চিত্রগুলিকে আহরণ করেছেন? শলোখভ্ নীচের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে হেসে উত্তর দেন, 'একই জায়গা থেকে'। প্রত্যেকেই সাধারণভাবে বুঝতে পারলেন, তিনি কি বোঝাতে চাইছেন,—লেখক জীবনের গভীরে প্রবেশ করেছেন, মাটির আঘ্রাণ নিয়েছেন, সাধারণ মানুষের দুঃখ বেদনায় একাত্ম হয়ে তাদের মধ্যে বাস করেছেন। কিন্তু এ যেমন সত্যের একদিক, তেমনি একথাও সত্য, অনেক লেখকই তাঁর মত গণজীবনের ঘনিষ্ঠতা অর্জন করলেও নিতান্ত অল্প কয়েকজনের পক্ষে সম্ভব হয়েছে তাঁর মত জীবনসত্যের ঊর্দ্ধলোকে আরোহণ করবার। শীতের কুয়াসাঘেরা সকালে বন্ধ ঘরের দরজা খুলে বাইরে এলে, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা মিষ্টি বাতাসের গন্ধ কিভাবে আমাদের মনকে আবিষ্ট করে, তা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু

আমরা সেই সৌন্দর্যের, সেই অমেয় লগ্নের অনুভূতিটুকু ভাষায় প্রকাশ করে উঠতে পারি না। সে কাজ করেছেন শোলখভ্: "শেষ জানুয়ারীর প্রথম উত্তাপের স্পর্শে চেরীর বাগান ভরে ওঠে সুবাসে। দুপুরে সূর্যের উত্তাপ যদি প্রখর হয় তখন নির্জন এক কোণ থেকে ভেসে-আসা বিষণ্ণ মৃদু গন্ধের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে প্রথম তাপে গলে-যাওয়া বরফের আঘ্রাণ আর সেইসঙ্গে বরফ আর ঝরাপাতার নীচের কালজয়ী আদিম মাটির শ্বাস-প্রশ্বাস"। ডন নদী ও তার সরস মাটির পটভূমিকায় শোলখভ্ রচনা করেছেন সাহিত্যরসাশ্রিত একটি অনন্য ইতিহাস। ডন নদীর ভিজে মাটির রসে সিক্ত কসাকদের জীবন ভাবনা। এই কসাকদের হৃদয় ও আত্মাকে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম করে, তাকে উপলব্ধি করে বড় সুন্দর করে বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর হাতে নানা রঙ—নীল, হলুদ, সবুজ আর গোলাপী। তা কোন শিল্পীর জলরঙ বা তেলরঙ নয়। সে রঙ তার শব্দ,—পরিপূর্ণ উচ্ছল শব্দ ভাণ্ডার। তাঁর সৃষ্টির আধার। একটি অপূর্ব বর্ণসমুজ্জ্বল চিত্রপটকে ভাষায় প্রকাশ করতে গিয়ে তাকে ফুটিয়ে তুলতে তাঁকে কত সূক্ষ্মদর্শী ও সচেতন হতে হয়েছে, তা ভাবলে অবাক হতে হয়। তিনি সুন্দরকে যেমন আরো সুন্দর করে দেখেছেন এবং আমাদের দেখিয়েছেন, তেমনি চারপাশের কুশ্রীতাকে, নীচ-নির্লজ্জ প্রবৃত্তিকে এড়িয়ে যাননি বা গোপন করার চেষ্টা করেননি। কিন্তু আমাদের মনে হতে পারে, এর কি কোন প্রয়োজন ছিল—রুশ সমাজ-জীবনের সমস্ত গ্লানি আর লজ্জাকে পৃথিবীর চোখের সামনে তুলে ধরবার? এ প্রশ্নের জবাব শোলখভ না-দিলেও আর একজন সংবেদনশীল রুশ লেখক তাঁর নিজের লেখার মধ্যে ঠিক এমনি অনুযোগের সুন্দর উত্তর লিখে রেখে গেছেন। তিনি হচ্ছেন ম্যাক্সিম গর্কী। তিনি বলেছেন: "এই লজ্জা, ঘৃণা, নির্বুদ্ধিতা, পাশবিকতার ইতিহাস ত আজকের নয় আর মিথ্যাও নয়। এই অন্যায়ের শিকড় অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে; রুশ জীবনের অনেক গভীরে এর হদিশ মিলতে পারে। এই শিকড়ের গতিবিধি তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখে, একে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে উপড়ে ফেলতে হবে। আজকের এই মহীরুহকে জানতে হলে তার শেকড়কেও জানতে হবে। তবেই উপড়ে ফেলার কাজটা সহজ হবে। রুশ জীবনের এই গ্লানি যদিও নক্কারজনক, যদিও রুশ সংস্কারের অন্ধ নৃশংসতা অনেক নিরীহ নির্বোধ রুশ নরনারীকে হত্যা করেছে, তাদের আত্মাকে ক্ষত করেছে, তবু আশ্চর্যের কথা, তাদের মানবিকতাকে চূড়ান্তভাবে ধ্বংস করতে পারেনি। এই সব সরল নির্বোধ রুশদের মুখের দিকে তাকালে ভবিষ্যতের আশায় বুক ভরে উঠে। কোন গ্লানিই এদের অন্তরকে গভীরভাবে কলুষিত করতে পারে নি।"

শোলখভ্ তার বইগুলো লিখতে এত বেশী সময় নিয়েছেন যে, ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। মনে হবে তাঁর অনন্য প্রতিভার কী অলস অপব্যয়ই না হয়েছে। And quiet Flows the Dawn এর প্রথম এবং শেষ বইটির মধ্যে চৌদ্দ বৎসরের ব্যবধান ছিল এবং Virgin soil up-turned উপন্যাসের প্রথমও দ্বিতীয় খণ্ডের মধ্যে প্রায় ত্রিশ বৎসরের ব্যবধান। মনে হবে এই বিরাট বিরতি কালের মধ্যে আমরা তাঁর কাছে আরো কত কী পেতে পারতাম। অথচ Virgin soil upturned এর প্রথম খণ্ডটি তিনি এক বৎসরের কম সময়ের মধ্যে শেষ করেছিলেন। এই সময়েই And Quiet flows the Dawn সম্পর্কে তিনটি বইও খুব তাড়াতাড়ি লিখেছিলেন।

রুশ বিপ্লবের আয়োজন কাল থেকে প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধ পর্যন্ত কসাক তথা রুশ জীবন ভাবনাকে শোলখভ্ কয়েকটি পর্বে ভাগ করে দেখিয়েছেন। এবং তা দেখিয়েছেন তাঁর উপন্যাসগুলির মাধ্যমেই। রুশ বিপ্লবের উদ্‌যোগ পর্বের ইঙ্গিত পাওয়া যাবে And Quiet flows the Dawn এর প্রথম দুই খণ্ডে। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের রুশ সমষ্টি চিন্তা ও তার বিরুদ্ধে অসার্থক' প্রতি বিপ্লবের ইঙ্গিত ছড়িয়ে রয়েছে Virgin soil বইখানার প্রথম দু খণ্ডে। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে জড়িত রুশ ভাবনার পরিচয় মেলে শোলখভের Man's Lot ও অসমাপ্ত উপন্যাস They Fought for their country তে। এই ক'খানি বই-ই সমগ্র ভাবে একটি পরিপূর্ণ উপন্যাস। একটি কাহিনীর শেষ সূত্রাংশটুকু ধরে আর একটি কাহিনীর বুনুনি। একটি জাতির খণ্ড খণ্ড মানসরূপ নিয়ে একটি পরিপূর্ণ রূপ এক জীবন্ময় জাতির এক আশ্চর্যরূপ।

শোলখভের রচনা শৈলী মহাকাব্যের রসানুসারী। টলষ্টয় ও হোমারের রচনা বিশিষ্টতা শোলখভের রচনার মধ্যেও যথেষ্ট স্পষ্ট। তাঁর And Quiet Flows the Dawn বইয়ের পাতায় পাতায় মহাকাব্যের ঘনগম্ভীর মাধুর্যের বিস্তার। মানব মনের সূক্ষ্ম চিন্তকলাপের অপূর্ব ব্যঞ্জনা। শোলখভ্ বিশেষ একটি মানুষের মনকে সমষ্টি মনের অন্তরে এমন নিবিড় ভাবে মিলিয়ে দিয়েছেন যে, কখনও এক হয়েছে বহু, কখনও বহু রূপ পেয়েছে একের মধ্যে। আরও আশ্চর্যের বিষয়, ইতিহাসের কালকে তিনি অনায়াসে অনন্তকালের সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করে দিয়েছেন যাদুকরের মত। ডন নদীতীরের একটা ছোট গ্রামের প্রতিদিনের জীবন কথাকে রূপান্তরিত করেছেন একটা সমগ্র দেশের জীবন কথায়, তারও পর তাকে রূপ দিয়েছেন সমস্ত পৃথিবীর সমস্ত দেশের সকল জাতির জীবন কথায়। তাঁর উপন্যাসগুলি পড়লে মনে হবে তিনি আমাদের এক মহাকাব্য শুনিয়ে চলেছেন। এই মহাকাব্যের নাম 'মহাপৃথিবী' বললেও অত্যুক্তি হয় না। চিন্তায় ভাবনায়; দয়ায় মায়ায়; ঘৃণায় নিষ্ঠুরতায়; বীরত্বে কাপুরুষতায় সে মানুষ ক্ষিন্ন, ঘৃণ্য, বিজয়ী আর উজ্জ্বল তাকে শোলখভ্ বড় আপনার করে চিনেছিলেন। এই সব মানুষদের মধ্যে তিনি নিজেকে মিলিয়ে দিয়েছিলেন, হারিয়ে ফেলেছিলেন। এদের তিনি দেখতেন যেন এক গুচ্ছ উৎপাটিত অসহায় চারাগাছের মত। এদের শেকড়ে যেন তখনও লেগে রয়েছে সেই ডন নদীর ভিজে আর নরম মাটি। ঐ ভিজে মাটির মধ্যেই রয়েছে রুশ জাতির সঞ্জীবনী রস। শোলখভের প্রতিটি উপন্যাসের পাতায় পাতায় অনেক মানুষের অনেকরূপ মিলে মিশে একটি মানুষের একটিই পরিচ্ছন্ন ছবি ফুটে উঠেছে। সে মানুষ ডন নদীতীরের গ্রামের, সে মানুষ মেক্সিকো বা ভারতবর্ষেরও।

শোলখভের এই সার্থক মহাকাব্য রচনা সম্পূর্ণ হয়েছে ১৯৪০ সালে। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এমন এক অনবদ্য সাহিত্য সৃষ্টি নোবেল পুরস্কার সমিতির কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করতে এতকাল সমর্থ হয় নি। কিন্তু ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করে দেখলে, আশ্চর্যের কিছুই মনে হবে না। পল সাঁত্রার মন্তব্যই সত্য বলে মনে হবে—আন্তর্জাতিক রাজনীতির লড়াই। যাই হোক, এই লড়াই-দাঙ্গার মধ্যেও শোলখভের গদ্য মহাকাব্যর অকুণ্ঠ স্বীকৃতি বিশ্বের সমস্ত সাহিত্যরসিকদের আনন্দের বিষয়।

বিদ্যুৎ মৈত্র

রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক মানস ॥ ডঃ অমিয়কুমার মজুমদার। রূপা এণ্ড কোম্পানী ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট। কলিকাতা। দাম ছয় টাকা।

রবীন্দ্রনাথ শুধুই ভাবোচ্ছলতার কবি এ অভিযোগ একদিন খুব প্রবলভাবে শোনা গেলেও আজ আর এই সমালোচনার বিশেষ ধার নেই। বোধ ও বুদ্ধির জগতে তাঁর অনায়াস গতায়াত ছিল। অল্প বয়স থেকেই একটি কঠিন যুক্তিবাদী চিন্তার ধারা তাঁর কল্পনা-প্রবণ মনোপ্রবাহের পাশাপাশি দেখা গিয়েছিল। মনোগত সম্পূর্ণতা বলতে যদি কিছু থাকে তবে রবীন্দ্রমানসে তার যে বিকাশ ঘটেছিল তা মানতেই হবে। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোন বাঙালী সাহিত্যিকই মনের সেই ব্যাপ্তির অধিকারী নন যাতে কাব্য আর বিজ্ঞান ঘনিষ্ঠ মিলনে বসুন্ধরা, সমুদ্রের প্রতি প্রভৃতি কবিতায় রূপ লাভ করতে পারে। অল্প বয়স থেকেই তিনি গভীর উৎসাহে বিজ্ঞানের চর্চা করেছেন, প্রবন্ধ লিখেছেন, বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করেছেন; পরবর্তীকালে বিজ্ঞান চর্চার গভীর প্রয়োজনীয়তার উপর বার বার জোর দিয়েছেন, বৈজ্ঞানিক সমস্যা লোকবোধ্য করে লেখার কাজে নিজেই হাত লাগিয়েছেন।

ডঃ অমিয়কুমার মজুমদার রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক মানস নিয়ে যে গ্রন্থটি লিখেছেন তা এই দিকে বিশেষ করে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ বিষয়ে ইতিপূর্বে ছোট-বড়ো কয়েকটি প্রবন্ধ চোখে পড়েছে কিন্তু পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ এই প্রথম বা দ্বিতীয় *। লেখক রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসাধনার বিভিন্ন স্তরে তাঁর বিজ্ঞান ভাবনার পরিবর্তন ও ক্রমপরিণতি লক্ষ্য করেছেন। যে সর্বানুভূতির ধারণা রবীন্দ্রকাব্যে ছড়িয়ে রয়েছে তা যে অবৈজ্ঞানিক কবি কল্পনামাত্র নয় তা প্রথম বলবার চেষ্টা করেছিলেন অজিতকুমার চক্রবর্তী। কাব্যপরিক্রমার সংক্ষিপ্ত সেই প্রবন্ধটি রবীন্দ্রঅনুরাগীদের একটি নতুন ভাবনার পথ দিয়েছিল। বর্তমান লেখকও সেই পথ ধরে এসেছেন।

ডারুইন, বাটলার, ফেকনার প্রভৃতির অভিব্যক্তিবাদ ও রবীন্দ্রনাথের কল্পিত বৃহৎ চৈতন্যের মধ্যে দূরত্ব বেশী নয়। সবটা কল্পনা নাও হতে পারে। ডঃ মজুমদার জীবনদেবতা সম্পর্কে সমস্ত ধোঁওয়াটে ভাবনার নিরসন করে দিয়ে বলতে চেয়েছেন—"জীবনদেবতা আর কিছু নয়, একটি 'ক্রমশঃ উদ্ভিদ্যমান ব্যক্তিত্ব' মাত্র অর্থাৎ 'ever evolving personality।" জীবনদেবতা যে ভগবান জাতীয় কোন অলীক বস্তু নন তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথ রচনাবলী ৪র্থ খণ্ডে চিত্রার ভূমিকাতেই দিয়েছেন—সেখানে তিনি বলছেন—'বস্তুতঃ চিত্রায় জীবন-রঙ্গভূমিতে যে মিলন নাট্যের উল্লেখ

* ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের গ্রন্থটি প্রথম না দ্বিতীয় সে সম্বন্ধে বর্তমান সমালোচক সঠিক তথ্য অবহিত নন।

হয়েছে তার কোনো নায়ক-নায়িকা জীবের সত্তার বাইরে নেই এবং তার মধ্যে কেউ ভগবানের স্থানাভিষিক্ত নয়।'

জীবনদেবতার প্রসঙ্গ ছাড়াও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব কি আশ্চর্য কাব্যরূপ লাভ করেছে লেখক তা রসজ্ঞ সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখিয়েছেন। বিষয়বস্তু খুব সহজ নয় অথচ লেখার গুণে তা সুখপাঠ্য হয়েছে। অবান্তর পণ্ডিতির চেষ্টা নেই, তাই বিষয়বস্তু সম্বন্ধে লেখকের ধারণা যে স্বচ্ছ তা নিয়ে মনে কোন সন্দেহ থাকে না। রবীন্দ্রনাথের কবিমনের গড়ন সম্পর্কে যাঁদের জানবার আগ্রহ আছে তাঁরা এই গ্রন্থ অবশ্যই পড়বেন।

এই প্রসঙ্গে সর্বশেষে একটি কথা আলোচনা করতে চাই। 'রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান মানস' সম্পর্কে ডঃ অমিয় মজুমদারের আলোচনা খুবই সুন্দর কিন্তু সম্পূর্ণ নয়। রবীন্দ্রনাথ কি কি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব জেনেছিলেন এবং কেমন করে সেগুলি তাঁর কবিতার রসধারার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিলে গেল সেটি রবীন্দ্র-বিজ্ঞান-মানসের সম্পর্কে একটি প্রধান আলোচ্য বিষয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মনে বিজ্ঞান কথাটি কেবলমাত্র কতকগুলি তত্ত্বজ্ঞাপক বিষয় নয়। মনকে অবিদ্যা থেকে যা মুক্ত করে, যা বিশিষ্ট জ্ঞান তারই নাম তো বিজ্ঞান। ফিজিক্স, কেমিষ্ট্রি প্রভৃতি না পড়ে মানুষের মন যে বৈজ্ঞানিক ধারায় কাজ করতে পারে অর্থাৎ scientific হতে পারে তার প্রমাণ রাজা রামমোহন রায়, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মন। চিন্তা যেখানে ঘন সংবদ্ধ কার্যকারণ পরম্পরার ধারাকে রক্ষা করে চলে সেখানে তাকেই বৈজ্ঞানিক বলি। দেশব্যাপী অন্ধতা, অশিক্ষা, কুসংস্কার, মানসিক জড়তার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের যে অবিশ্রাম আন্দোলন সেটিও 'রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানমানস' নামাঙ্কিত গ্রন্থের বিষয়ান্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। তাঁর সমাজসম্পর্কিত প্রবন্ধাবলীতে সেই বৈজ্ঞানিক মনের অধিকারী রবীন্দ্রনাথের পরিচয় আছে। লেখক ডঃ মজুমদারকে কবিমানসের এই দিকটা ভেবে দেখতে বলবো।

সোমেন্দ্রনাথ বসু

ডাকের কথা ॥ লরিন জিলিয়াকাস। অনুবাদক : পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী। কলকাতা ১২। চার টাকা।

চিঠি পাওয়ায় রোমাঞ্চ আছে, পাঠানোয় আনন্দ আছে, না-পাওয়ায় বেদনা আছে। চিঠি আজকের মানুষের জীবনের অনেকখানি জুড়ে। চিঠি পাওয়া ও পাঠানো-য় আজকের মানুষ যতখানি অভ্যস্ত এবং যতখানি স্বাভাবিক, সেকালে কিন্তু ব্যাপারটা ছিল সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। প্রাচীনকালে ছিল সংকেত বহ্নি। তারপর রূপান্তরিত হলো নানা ধারাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে ডাক-হরকরার পদ্ধতি ডাক-হরকরা বা রানাররা কিছুকাল পূর্বেও সংবাদ প্রেরক ও প্রাপকের মধ্যে সংযোগ-দূতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছে। যুগে যুগে নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়েই আজকের ডাক ব্যবস্থা একটা বিশ্বপ্রতিষ্ঠানে, বিশ্বসমবায়ের রূপ নিয়ে সমুপস্থিত।

'ডাকের কথা' গ্রন্থটি Lourin Zilliacus-এর বিখ্যাত 'From Pillar to Post' নামক গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ। আজকের পৃথিবীর সুষ্ঠু ডাক ব্যবস্থার পিছনের যে ইতিহাস, যে উত্তেজনাপূর্ণ এগিয়ে চলার চেষ্টা এবং যার আলোকে আজকের ডাক ব্যবস্থা সমগ্র মানবসমাজের কল্যাণে ব্রতী তার পূর্ণাংগ ইতিহাস 'ডাকের কথা' গ্রন্থটি। কীভাবে ডাকের মাধ্যমে একদা আদান প্রদানের ইচ্ছা জাগ্রত হলো; প্রাচীন আমলে ডাক-হরকরা এবং তার আগে কি ব্যবস্থা ছিল; রাজা-রাজড়াদের চিঠির মাধ্যম; প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের চিঠিপত্র চলাচলের পদ্ধতি এবং তার পরবর্তী পর্যায়ে বেসরকারী চেষ্টায় 'ট্যাকসিস প্রতিষ্ঠানে'র উদ্ভব এবং তার ওপর ক্রমে ক্রমে রাষ্ট্রীয় ডাক ব্যবস্থার সূচনা; বার্তাবহদের উত্থান-পতন; ডাকহরকরার প্রাধান্য; চিঠিপত্রের উপর গোয়েন্দাগিরি এবং তারও পরবর্তী পর্যায়ে চিঠিপত্র থেকে রাজস্বসংক্রান্ত নীতি গ্রহণ এবং ক্রমে ক্রমে সরকারী পর্যায়ে এক বিশ্বজনীন ডাক সংস্থায় রূপান্তরীকরণের মহতী চেষ্টার নেপথ্য কাহিনী বর্তমান গ্রন্থে অতি সুন্দরভাবে উপস্থাপিত। নানা পর্যায়ের মধ্য দিয়ে বিশ্বের ডাক ব্যবস্থা আজকে যেভাবে সুষ্ঠু রূপ নিয়েছে তার পর্যায়ক্রমিক ইতিহাস সত্যিই চমকপ্রদ। একদিকে ঐতিহাসিক বা অন্যদিকে রহস্য-রোমাঞ্চ উপন্যাস পাঠের মধ্যে যে কৌতূহল, যে 'সাস্‌পেন্স' পাঠকের মনকে আচ্ছন্ন করে 'বর্তমান গ্রন্থ পাঠেও তার চাইতে কম সাসপেন্স পাঠক লাভ করবেন না। উপরন্তু 'ডাকের কথা' গ্রন্থটি শিক্ষামূলক—সভ্যতার ইতিহাসের পাশাপাশি এ সমস্ত কাহিনী পাঠও অনিবার্য হয়ে পড়ে। পরিশিষ্টে 'ভারতের ডাকের কথা' সংযোজিত হওয়ায় গ্রন্থটির মর্যাদা আরো বেড়েছে। বলা বাহুল্য, 'নানা ঝড়-ঝাপটা অতিক্রম করে উত্থান-পতনের ভিতর দিয়ে অন্যান্য দেশের মতোই আমাদের দেশের ডাক ব্যবস্থাও সামান্য সূত্রপাত থেকে বর্তমানের বিরাট অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। আমাদের দেশের শিক্ষা ও জনসাধারণের জীবন-যাত্রার মানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এটা যে বিশ্বের বৃহত্তম জনসেবক সংস্থায় পরিণত হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।' আমাদেরও সেই বিশ্বাস ভারতের ডাক ব্যবস্থার ধারাবাহিক ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ কম চিত্তাকর্ষক নয়। গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন শ্রীযুক্ত মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়। ভূমিকাটি সুলিখিত। শ্রীযুক্ত পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদ প্রাঞ্জল এবং আকর্ষক।

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

রঙিন পুতুল ॥ সামসুল হক ॥ অন্নদা প্রকাশনী। কাকদ্বীপ। ২৪ পরগণা। এক টাকা পঁচিশ পয়সা ॥

'রঙিন পুতুল' সামসুল হকের কিশোর সাহিত্য। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত কবির ছোটদের কবিতা, গল্প এবং একটি ছোট নাটক বর্তমান গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে।

'রঙিন পুতুলে'র কিছু সংখ্যক কবিতা ঋতু বিষয়ক; এই অংশের রচনাবলীর মধ্যে 'এই

রোদ্দুরে, আর বৃষ্টি; শরতে গান, কার্তিকের গান, শীতের সকাল' প্রভৃতি খুব মিষ্টি হাতের রচনা ; ছন্দ এবং ভাবের মিতালীতে কবিতাগুলি কিশোর পাঠকদের হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে। গ্রন্থের আর একটি অংশ জুড়ে আছে মণীষীদের উদ্দেশ্যে লেখা কবিতায়। কবি সামসুল হকের প্রণতি নিবেদিত এই কবিতাবলীর মধ্যে 'জাতির জনক, সুভাষচন্দ্র, দেশবন্ধু, জহরলাল, রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ; অন্যান্য রচনার মধ্যে 'পুতুল পুতুল, ইকড়ি মিকড়ি, ময়নামতি, ইঁদুর আর বেড়ালের গল্প' (এর শেষাংশের মরাল চমৎকার : ধেড়ে ধেড়ে প্রাণীগুলোই মন্দ সব, | সোনার শিশু স্বর্গ-ঝরা সুসৌরভ ॥) প্রভৃতি সুন্দর। তবে অন্যান্য রচনার পাশাপাশি 'মজার কথা' বা ঠিক ঠিক বলছি' জাতীয় লেখা স্বতঃস্ফূর্ত নয়।

গ্রন্থে সংকলিত গল্প-দুটিও নাটিকাটিও বিদেশী, ছায়ানুসরণে রচিত। নাটিকাটি সুখপাঠ্য গৃহের পাঠ্যংশ একবারে চিত্র হীন ; ছোটদের বই, বিশেষ এ জাতীয় গ্রন্থ সচিত্র হলে ছোটদের একটা লাভ এই যে কবিতা পাঠের সঙ্গে সঙ্গে ছবির সঙ্গে কিশোর পাঠক তাদের মনকে কল্পনা রাজ্যে আরো বেশী ছড়িয়ে দিতে পারে।

ইন্দ্রনীল সেন

Regd. No. C-315 Phone : 23-5155 March'66 (0.50) Central Regd. No. R.N.2602/57 SAMAKALIN

সমকালীন

ত্রয়োদশ বর্ষ ॥ চৈত্র ১৩৭২

অতিথি-নিয়ন্ত্রণ বিধি

লঙ্ঘন করে

অতিথিদের আপ্যায়ন করলে

আপনার অহমিকা হয়ত তৃপ্ত হতে পারে

কিন্তু তার ফলে

হাজার হাজার লোক

দৈনন্দিন খাদ্যে বঞ্চিত হয়

অতএব

অতিথি-নিয়ন্ত্রণ বিধি মেনে চলুন

যাঁদের নিমন্ত্রণ না করলে নয়, শুধু তাঁদের

নিমন্ত্রণ করুন।

আর যে-সব খাদ্য পরিবেশন

আইন সম্মত

শুধু তাই খাওয়ান

ঝক্‌ঝকে দাঁত
আর সুন্দর হাসি
সাধনা
দশন
আয়ুর্বেদীয় মতে তৈরী আদর্শ দাঁতের মাজন
SADHANA
DASAN
SADHANA AUSADHALAYA
সাধনা দশন নিয়মিত ব্যবহার করিলে কোন দন্তরোগের ভয় থাকে না। দন্তরাজী সুস্থ, সবল ও সুন্দর হয়।
দেশীয় গাছ্‌গাছড়া হইতে ইহা প্রস্তুত হয়।

Orient
ENGINEERED
TO OUTLAST
MANY MANY SUMMERS
Orient
CEILING FAN
GUARANTEED FOR TWO YEARS
ORIENT GENERAL INDUSTRIES LTD.
CALCUTTA-51
ASP/OGI-2/66

quality
BLOCK
MAKERS
and

ত্রয়োদশ বর্ষ ১২শ সংখ্যা

চৈত্র তেরশ' বাহাত্তর

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

কোম্পানীর অযোধ্যা-নীতি ও একটি গ্রন্থ

নারায়ণ দত্ত

বাঙলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌল্লা। ভারতবর্ষের শেষ নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ। যাঁর শেষ আবাসস্থল গার্ডেনরিচ। মেটিয়াবুরুজ। বাঙলার নবাবী শেষ হয় পলাশীর আম বনে। আর তার প্রায় একশ' বছর পরে অযোধ্যার নবাবী শেষ হয়ে গেল একটি সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে। রবার্ট ক্লাইভের ভূমিকায় এবার যে জেনারেলটিকে দেখা গেল—কলকাতার লোকেদের সঙ্গে তার পরিচয় না থাকার কথা নয়। গোধূলির বিষন্ন আলোকে ভাগীরথীর মৃদু জলকল্লোলে শহর কলকাতার বিচিত্র প্রাণস্পন্দন এখনও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনে জেনারেলের মর্মর মূর্তি। জেনারেলের নাম আউটরাম। অযোধ্যা তাঁর অপরিচিত নয়। আগে সেখানেই রেসিডেন্ট ছিলেন কয়েকটা মাসের জন্যে। এবারেও যখন তিনি গিয়েছিলেন—অযোধ্যার রাজসিংহাসন ঠিক অধিকার করতে যাননি। তিনি অযোধ্যার শেষ কবি নবাবকে নূতন একটা সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করাতে গিয়েছিলেন। কিন্তু দেখা গেল, নবাব কবি হলেও রাজনীতির গন্ধও বোঝেন। অতটা অবুঝ তিনি নন। ব্যাপারটা গোড়া থেকেই বলা দরকার।

ইংরেজ জাতটার একটা আশ্চর্য অভ্যাস আছে। বহিরঙ্গভাবে নিয়মতান্ত্রিকতা তাদের জাতিচরিত্র। তারা খুন করলেও বুঝি আইন মেনে করে। অথবা খুন করার সমর্থনে আইন তৈরী করে। অযোধ্যার ব্যাপারটা তাই। লর্ড ডালহৌসী তখন ভারতবর্ষের জবরদস্ত বড়লাট। আঠার শ' এক সালে অযোধ্যার নবাবের সঙ্গে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যে চুক্তি হয় ডালহৌসী সেটা নাকচ করে' একটা নতুন সন্ধি করতে চেয়েছিলেন যার ফলে চিরকালের জন্য সামরিক ও অসামরিক কর্তৃত্ব ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের হাতে তুলে দিতে হবে।

আঠার শ' এক সালের বিখ্যাত লক্ষ্ণৌ চুক্তির সময় অযোধ্যার সিংহাসনে আসফ-উ-দ্দৌল্লার ভাই সা'দত আলি খান। বড়লাট তখন ওয়েলেসলী। অযোধ্যার ভৌগোলিক অবস্থান গুরুত্বপুর্ণ। সুবে বাঙলার ফার্স্ট লাইন অফ ডিফেন্স হচ্ছে অযোধ্যা। তখন দাক্ষিণাত্যে ফরাসীরা স্থানীয় নবাবদের আনুকূল্যে বেশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। তাদের সম্ভাব্য সম্মিলিত আক্রমণের প্রথম বাধা অযোধ্যা। ওয়েলেসলী এখানে বার ব্যাটালিয়ন পদাতিক ও চার রেজিমেণ্ট অশ্বারোহী সৈন্য মোতায়েন করলেন। ব্যয় হবে বার্ষিক পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। বলা বাহুল্য, এ সখের খরচ দেবে অযোধ্যার নবাব। অযোধ্যার নবাব সা'দাত আলি খান হিসেবী বলে কোনদিনই সুনাম কেনেন নি। কাজেই ওয়েলেসলী বললেন, বাপু হে, তোমার রাজত্বটা আমাদের দিয়ে দাও।—'the exclusive management of the civil and military government of that country shall be transferred to the Company'.

সাদাত আলি কিছু খুঁদে নবাব নন। তবু তাঁর গায়ে মুঘল রক্ত একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যায়নি। তাঁরই পূর্বপুরুষ ছিলেন মুঘল সাম্রাজ্যের উজির-ই-আজম। তাঁরই ঠাকুর্দার বাবা কি 'কিং-মেকার' সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের হাত থেকে মুঘল সম্রাটকে বাঁচান নি? কাজেই তিনি ওয়েলেসলীর প্রস্তাব নাকচ করে বসলেন। এবং এই টানাপোড়েনে যেটা দাঁড়াল সেটাই বিখ্যাত লক্ষ্ণৌ চুক্তি—আঠার শ' এক সালের নভেম্বরে যেটা সই হয়ে যায়। চিল যখন নেমেছে, কুটো না নিয়ে উঠবে না। ওদিকে নবাব দেখলেন, সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধেক ত্যাগ করার শাস্ত্রীয় বিধান রয়েছে। কাজেই এই চুক্তির বলে গঙ্গার দক্ষিণ ও পশ্চিমের দশটা জেলা এবং রোহিলাখণ্ড, আজমগড়, গোর্খপুর ও বাস্তি জেলা—খাস ব্রিটিশ সরকারের হাতে চলে গেল।

লর্ড ডালহৌসী ওয়েলেসলীর সেই পুরনো বায়না আবার নতুন করে তুললেন। নবাবের অপরাধ—তিনি শাসনকর্তৃত্বে মোটেই মন দেন না। এ' কথা বলার উদ্দেশ্য এ' নয় যে নবাব প্রজাপালনে উৎসুক ছিলেন। কিন্তু প্রজাদের জন্যে মনোবেদনায় ব্রিটিশ সরকারের রাত্রির নিদ্রা বন্ধ হয়েছিল এটাই বোধ করি ঐতিহাসিক সত্য। সেই হেস্টিংসের আমল থেকে একটা না একটা ছুতোয় নবাবের ওপর যে বিপুল করভার ব্রিটিশ সরকার চাপিয়ে চলেছিলেন, তাদের দেশের রাজস্ব আদায়ের একটা সুবন্দোবস্ত ব্রিটিশ সরকারের অনিবার্য প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। সেকালের সরকারী নথিপত্রে অবশ্য রয়েছে যে ডালহৌসী অযোধ্যার তৎকালীন অবস্থা জানবার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। অযোধ্যার খবর জানবার ও সবচেয়ে সহজ উপায় সেখানের রেসিডেণ্টের রিপোর্ট। আঠার শ' উনপঞ্চাশ সালে লক্ষ্ণৌর রেসিডেণ্ট হয়ে গেলেন ডব্লিউ-এইচ স্লিম্যান। তিনি ছাপান্ন সাল পর্যন্ত লক্ষ্ণৌর রেসিডেন্সী আলো করেছিলেন। তারপরেই যান আউটরাম। তিনিই শেষ। কেননা, তারপর অযোধ্যার নামেমাত্র স্বাধীনতাও রাখা হয়নি। স্লীম্যান সাহেবের রিপোর্ট—তাঁর কেতাব 'জার্নি থ্রু দি কিংডম অব্ আউধ' বেশ একটি প্রামাণ্য বই। স্লীম্যানের পরে আউটরাম। তাঁকে খোলাখুলি এই নির্দেশ দিয়ে পাঠান হয়েছিল—'to make an enquiry into the present state of that country (Oudh), with a view to determine whether the duty imposed upon the British Government by the Treaty of 1801 will, in truth

any longer admit of our honestly indulging the reluctance we have felt to have the recourse to those extreme measures which alone can be of any real efficacy in remedying the evils from which the State of Oudh has suffered so long.'

আউটরামের প্রতি এই হুকুমের শেষবেশ ফল হয়েছিল অযোধ্যার নিয়মতান্ত্রিক অধিকার। বেশ বোঝা যায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বা তার ভারতীয় আমলারা তখনও মনস্থির করতে পারেনি। তবে এ সম্বন্ধে বেশি দেরিও হয়নি। করিৎ কর্ম্মা গভর্ণর জেনারেল আঠারশ পঞ্চান্ন সালের আঠারই জুনের মিনিটে কোম্পানীকে লিখে পাঠান—'I do not think His Majesty can ever be brought to feel the responsibilities of sovereignity strongly enough to be induced to bear that portion of the burden of its duties which must necessarily devolve upon him…the worthless minious…the singers and the enuch meddle in all affairs and influence the king's decision in every reference made to him. (১)

লিডেনহল ষ্ট্রীটের কোম্পানীর ডিরেক্টররা ডালহৌসীর সিদ্ধান্তে সায় দিয়ে লিখলেন যে ওয়াজিদ আলি শা এই সন্ধি সর্তে সই করতে রাজী থাকেন ভালই। না থাকেন ত 'we are fully prepared te take the responsibility of anthorising and enjoining the only other course by which our duties to the people of Oude can be fulfilled, that of assuming anthoritatively the powers necessary for the permanent establishment of good government throughout the country'

আউটরাম সাহেব তখন কলকাতায়। তাঁর কাছে এত্তেলা গেল। স্বয়ং ডালহৌসী তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন। সাক্ষাতে সবিশেষ বুঝিয়ে দিলেন জেনারেলকে। প্রস্তাবিত চুক্তির একটা মুসাবিদাও তৈরী করে আউটরামকে দেওয়া হোল। তাতে নবাবকে একেবারে ঠুটো জগন্নাথ করে দেওয়া হল। আনুষ্ঠানিক ভাবে রাজ খেতাব এবং সম্মান নবাব সাহেবে বর্ত্তাল তাছাড়া তাঁর কর্তৃত্ব রইল লক্ষ্ণৌর রাজপ্রাসাদে, বিবিয়াপুরের পার্ক এবং দিলখুশাতে সীমাবদ্ধ। ওয়াজিদ আলি শা বা অযোধ্যর রাজার বাৎসরিক পনের লক্ষ টাকা করে অর্থ বরাদ্দ হল। এই নকসা চুক্তির প্রথম নম্বর প্রস্তাবে বলা হল যে এই নূতন চুক্তি অনুযায়ী অযোধ্যার রাজ্য সীমার সামরিক ও বেসামরিক সরকারের এক এবং একমাত্র শাসন কর্তৃত্ব এবং রাজস্বের পূর্ণ এবং এবং একমাত্র অধিকার এর পর থেকে চিরকালের জন্যে অনারেবল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীতে বর্তাবে। ডালহৌসী সোজা সুজি আউটরামকে বলে দিলেন, দেখো হে, যদি তিন দিনের মধ্যে এই সন্ধি পত্রে নবাব সই না করে শীলমোহর না করে দেন, তুমি একটা ইস্তাহারে ঘোষণা করে দেবে যে নবাব কর্ত্তৃক নিত্য নিয়ত সন্ধিসর্ত লঙ্ঘন করার অজুহাতে আঠারশ এক সালের লক্ষ্ণৌচুক্তি বাতিল বলে আর তারপর একটাই যা করবার থাকে, সেটা করবে। অযোধ্যায় একটা স্থায়ী সুশাসন চালু করবার জন্যে অযোধ্যাকে ব্রিটিশ ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত করে দেবে। ডালহৌসী বার বার করে বলে দিলেন আউটরামকে যেন তিলেক বিলম্ব নাহি হয়। কোন কথা নয়। এই যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কোন ক্রমেই আর সেটা পালটান যাবে না। কলকাতায় গভর্ণর জেনারেলকে এই ব্যাপারে আর

বিরক্ত করবার কোন প্রয়োজনই নেই।

কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। ত্রিশে জানুয়ারি। বুধবার। আঠারশ ছাপান্ন। লক্ষ্ণৌ পৌছলেন আউটরাম। আলি নকীখাঁ তখন লক্ষ্ণৌর প্রধানমন্ত্রী। তার কাছে খোলাখুলিভাবে তাঁর আসবার কারণ ব্যক্ত করলেন আউটরাম। আউটরাম কিছু অপরিচিত নন নকীখাঁর কাছে; রেসিডেণ্ট হিসেবে পরিচিত। বৃহস্পতিবার দিন নকীখাঁ যখন লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সীতে আউটরামের সঙ্গে দেখা করতে এলেন, তখন তাঁকে এই নূতন সন্ধি পত্রের সকল সর্ত খোলসা করে বললেন আউটরাম। এবং সঙ্গে সঙ্গে এও বলতে ভুললেন না যে নবাব সাহেব যেন যত শীঘ্র সম্ভব একটা দিন স্থির করেন যখন আনুষ্ঠানিকভাবে এই সন্ধিপত্র তাঁর কাছে পেশ করা হবে।

শুক্রবার দিন আউটরাম সাহেবের কাছে এক নেমন্তন্ন এল। নবাবের মা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন। বেগম সাহেবা মহীয়সী। আউটরাম তাঁর রোজনামচায় লিখেছেন যে তিনি ভেবেছিলেন বেগম সাহেবা তাঁর পুত্রকে বোঝাবার চেষ্টা করবেন। তা ছাড়া নবাবের কাছে তাঁর মায়ের কথা যে না চলে তা' নয়। কাজেই সাহেব খুব খুশীমনেই এই নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছিলেন। কিন্তু সাহেব বেশ সুবিধে করতে পারেননি।

সে যাই হোক চৌঠা ফেব্রুয়ারী সোমবারে জার্দকোঠী প্রাসাদে নবাব ওয়াজিদ আলি শার সঙ্গে জেনারেল আউটরাম তাঁর লোকলস্কর নিয়ে দেখা করতে গেলেন। যাতে কোনরকম প্রজাবিদ্রোহ না হয় (অনেকে মনে করেন এইভাবে কোম্পানীর সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা করে থাকতে পারেন ওয়াজিদ) ওয়াজিদ আলি তাঁর লোকলস্কর পাইক বরকন্দাজ সবাইকে নিরস্ত্র করতে হুকুম দিয়েছিলেন। এবং রাজপ্রাসাদের যাঁরা জেনারেলকে 'স্যালুট' করেছিলেন—তারা সবাই যে নিরস্ত্র অভিবাদন করেছিল—এই কথা সরকারী নথিপত্রে রয়েছে।

ওয়াজিদ আলি শা সম্বন্ধে ইংরেজরা নানা দোষ দিয়ে থাকে। তাঁর শাসনকালে অযোধ্যার যে হাড়ির হাল হয়েছিল সে কথা স্লীম্যান তাঁর জার্নি থ্রু আউধের পাতায় পাতায় লিপিবদ্ধ করেছেন। সাহেব লিখছেন—'Under the present wretched system, the contractor who have the form of the revenue let out districts to subordinate officers, who abuse their authority as much as contractors and court favourites abuse theirs and commit all kind of outrags on the unoffending people, Security to life and property is disregarded and is unknown'. (২) রামরাজ্য অযোধ্যার এই ছবি বাস্তবিকই দুঃখকর। যদিও ইংরেজ আমলের বহু জায়গায় এমন চিত্র যে খুঁজে পাওয়া যাবে না, এমন ত মনে হয় না। তবে সেই দোষের অজুহাতে ইংরেজের রাজত্ব কেড়ে নেবার মত কোন 'সুপার পাওআর' তখন ছিল না, এইটেই ওয়াজিদ আলি শা'র ট্রাজেডি। এবং সেই ট্রাজেডি যে কোন কোন ইংরেজের নজরে পড়েনি তাও নয়। আঠার শ' পঁয়তাল্লিশ সালে স্যার হেনরী লরেন্স 'ক্যালকাটা রিভ্যু'তে তৎকালীন অযোধ্যার মাৎস্যন্যায় নিয়ে দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। তাতে কিন্তু তিনি একটা সত্যি কথা বলে ফেলেছিলেন—'The Oudh rulers have been no worse than monarchs so situated are, indeed they have been better than might have been

expected, Weak, vicious and dissolute they were, but they have seldom been cruel, and have never been false'. পরে তিনি বলেছেন—'It is the system that is defective, not the tools with which it has been worked.' এর জন্যে কি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 'আউধ পলিসি'র কোন অবদান নেই ?

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর 'লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক এ্যাজ এ্যান ইম্পিরীয়ালিষ্ট' প্রবন্ধে এ বিষয়ে আলোকপাত করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আসল রূপটি প্রকট করে তুলেছেন। ডক্টর মজুমদার বলছেন—'Bentinck, like his predecessors held out a threat to the Nawab that if he did not improve his administration the British would take over the administration of his country. But curiously enough, when the able minister of Oudh, Hakim Medhi made efforts to introduce reforms, Bentinck obstinately refused to support him. As Beveridge remarks, "the courtiers of Oudh did not reason very illogically when they inferred, from the inconsistency and caprice which marked "the conduct of the Governor General, that the object at which he was aiming was not so much to improve the government of Avadh, as to find in prevailing abuses a plausible pretext for usurping it". (৩) বেণ্টিকের কূটনীতির আসল চরিত্র প্রাজ্ঞ ও প্রবীণ ঐতিহাসিকের দৃষ্টি এড়াতে পারে নি। ডক্টর মজুমদার বলছেন—'It is now known that unknowingly they had divined the truth. For all the while, Bentinck was seriously discussing various plans to bring Auadh under the direct control of the British Government. (৪) বলা বাহুল্য এই চেষ্টা শুধু লর্ড বেণ্টিঙ্কেরই নয়, তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল ব্রিটিশ বড়কর্তাদের। কাউকে ঐ ব্যাপারে আলাদা করে বিচার করা যায় না। ঐতিহাসিকের ভাষার পুনরাবৃত্তি করে বলা যায়—Bentinck never forgot that the end of government in India is the welfare of the British Empire. In order to avoid misunderstanding, it is necessary to add that Bentinck was in no way exceptionally guilty in this respect ! he was neither much better nor much worse than the other Governor Generals of India....

ওয়াজিদ আলি সম্বন্ধে ইংরেজরা লিখেছে যে নবাব সাহেব বোকা বা অপ্রিয় লোক ছিলেন না। সাহিত্যের প্রতি ছিল তাঁর নিকষ নিষ্ঠা এবং কবি ও গদ্যলেখক হিসেবে তাঁর খ্যাতি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এটা তাঁর দুর্ভাগ্য যে বহু লক্ষ লোকের সুখের আয়োজনের ভার তাঁরই ওপর পড়েছিল। এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয় যে ওয়াজিদ আলি শার পিতৃপুরুষের এই তথাকথিত দুর্ভাগ্য এড়াবার কোন উপায়ই ছিল না। কোম্পানীর অযোধ্যানীতি ধীরে ধীরে এই রাজবংশকে ঘিরে যে নিষ্ঠুর লূতাতন্তুর সৃষ্টি করে রেখেছিল তা থেকে কোন ঝানু রাজনীতিজ্ঞরও অব্যাহতি পাওয়ার উপায় ছিল না। একথা নয় যে নবাব বংশে বিলাসী লম্পট রাজপুরুষ ছিল না।

কিন্তু এটাও সত্য নয় যে কেউ কেউ সত্যি অযোধ্যা শাসন করতে চেয়েছিলেন। এবং ব্যর্থ হয়েছেন। শেষের দিকে নবাবরা আর বোধহয় হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। ওয়াজিদ আলি শা'ও তাঁদেরই একজন। কিন্তু, সে যাই হোক, ওয়াজিদ আলি শা'র রাজচরিত্রে যেভাবে যতরকম মসীলেপন করাই হোক না কেন, তাঁর রাজ্যত্যাগ বাস্তবিকই রাজকীয় মহিমায় উজ্জ্বল। অস্তগামী সূর্যের বর্ণাঢ্যতায় সে ছবি দু' চোখ ভরে দেখবার মত। ভারতবর্ষের শেষ নবাবের ইজ্জতে কোন রকম ভাটা পড়তে দেননি ওয়াজিদ আলি। অসম্মানের মধ্যে রাজত্ব করার চেয়ে নবাবের মতই তিনি সিংহাসন ত্যাগ করে যান।

Note of on interview between the king of Oudh and Maj, Gen. Outram—শীর্ষক যে দলিল দস্তাবেজ রয়েছে ইষ্ট ইণ্ডিয়া হাউসের বর্তমানে ইণ্ডিয়া হাউসের মহাফেজ খানায় তা থেকে সেদিনের ঘটনার মোটামুটি একটা বর্ণনা পাওয়া যায়। ডালহৌসী একটা চিঠি দিয়েছিলেন নবাবকে। নবাব সেটা পড়ে বললেন, এ রকম চিঠি লেখবার অর্থ কি আমাকে ? আমার দোষটা কি ?' তারপর সেই মুসাবিদা করা সন্ধিপত্রটি নবাববাহাদুরের হাতে দেওয়া হল। সহকারী ভকিল সাহেবদ্দৌল্লাকে সেই সন্ধিপত্রটি চেঁচিয়ে পড়তে বললেন নবাব। কিন্তু কয়েকটা লাইন পড়ার পর আর পড়তে পারলেন না সাহেবদ্দৌল্লা। কান্নায় ভেঙে পড়লেন তিনি। নবাব তখন নিজেই সন্ধিপত্রটা হাতে করে নিলেন। তারপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সারা সর্তকণ্টকিত খসড়াটি পড়ে ফেললেন। তারপর বললেন, দেখুন সন্ধি হয় সমানে সমানে। আমি কে যে ব্রিটিশ সরকার আমার সঙ্গে সন্ধি করতে আসবে ? তাঁরা হুকুম করলেই হয়। তাঁদের ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। তাঁর শিরস্ত্রাণটি খুলে তিনি রেসিডেণ্টের হাতে দিয়ে দিলেন। তারপর আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

তাঁর কথা শেষ পর্যন্ত বজায় রেখেছিলেন ওয়াজিদ আলি। সন্ধিপত্রে সই করেননি তিনি। অনেক বলা কওয়ার পরও নয়। এই ঘটনার তিনদিন পরে সাতই ফেব্রুয়ারি সারা অযোধ্যা কোম্পানীর মুলুক হয়ে গেল। কোম্পানীর নিশান উড়ল অযোধ্যায়। কানপুর থেকে সৈন্য এল পাছে কোন গোলমাল হয় এই আশঙ্কায়। কিন্তু কিছুই হয়নি। ওয়াজিদ আলি লক্ষ্ণৌ ছেড়ে কলকাতার গার্ডেনরীচে চলে এলেন স্বেচ্ছা নির্বাসনে। বাহাদুর শা'র মত তিনিও এই সময় ভেবেছিলেন কিনা কে জানে—

ন কিসিকে আঁখ কা নূর হুঁ
ন কিসিকে দিলকে করার হুঁ।
যো কিসিকে কামনা আশথে
ম্যায় ও এক মস্ত গব্বার হুঁ॥
মেরা রঙ্গরূপ বিগড় গয়া
মেরা ইয়ার মুরুসে বিছড় গয়া।
যো চমন খজাসে উজড় গয়া
ম্যায় ত উসকী কসলে বহার হুঁ॥

অর্থাৎ—এখন আর আমি কারও চোখের আলো বা মনের আরাম নই। এখন আমি ধুলো। যে ধুলোয় মানুষের কোন কাজ আসে না সেই ধুলো। আমার রং আমার রূপ গেছে উল্টে। আমার বন্ধু, দোস্ত আমাকে ছেড়ে গেছে। বনের গাছের ডাল থেকে যে ফুল ঝরে গেছে আমার সঙ্গে এখন কেবল তারই তুলনা করা চলে।

অযোধ্যার এই বিয়োগান্ত নাটকে একটি ইংরাজি কেতাবের কিছু ভূমিকা আছে। আঠারশ' পঞ্চান্ন সালের অক্টোবর মাসে লণ্ডনে বইখানা ছাপা হয়। বইটির নাম—'দি প্রাইভেট লাইফ এ্যান ঈস্টার্ণ কিং। তেরটি পরিচ্ছেদের এই গ্রন্থটি লক্ষ্ণৌ দরবারের আভ্যন্তরীণ চিত্র উদ্‌ঘাটিত করেছিল বলে প্রকাশ। ভূমিকায় বলা হয়—'দি কলোইং ন্যারোটিভ ইজ এ রেকর্ড অফ ফ্যাক্টস নট ইন এ্যানি কেস ফিক্টিসাস।' প্রথম সংস্করণে গ্রন্থকর্তার কোন নাম দেওয়া হয়নি। সম্পাদক হিসাবে উপক্রমণিকায় বলা হয় যে লক্ষ্ণৌ দরবারে সাড়ে তিন বছর কাটাবার সময় দৈনন্দিন ঘটনার যে সব নোট করা হয় সেগুলি এই গ্রন্থে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে নির্জলা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সম্পাদক আরও বলেন—নবাব নাসিরুদ্দিনের (৫) এখন ইন্তেকাল হয়ে গেছে তবে লক্ষ্ণৌ দরবারে যে সব ব্যক্তিরা তখন থাকতেন তাঁদের অনেকেই এখন ইংলণ্ডে বসবাস করছেন। কাজেই প্রয়োজন বোধে তার বিবরণের সত্যতা যাচাই করার জন্যে তাঁদের শরণ নেওয়া যেতে পারে।

লেখকের উদ্দেশ্য কিন্তু চাপা থাকেনি—'That Oudh is one of the most miserably governed countries under heaven, is no secret, and that it could be a blessing to its numerous inhabitants were the Idian government to do for it what has been so well done for the Punjab every one will admit. স্পষ্টতঃই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পোঁ-ধরা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। এর মধ্যে যতটা না বাস্তব আছে, তার চেয়ে বেশি আছে কল্পনার আমেজ। কিন্তু বইটা বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে 'টাইমস' পত্রিকা লিখলেন—'The book comes before us without a name, but with every other mark of authenticity.' এবং বলা বাহুল্য অযোধ্যার ব্রিটিশ রাজ্যভুক্তির ব্যাপারে এই বইটার সাহায্য নেওয়া হয়েছিল। স্মিথ সাহেব দীর্ঘ ষাট বছর পরে বইখানা সম্পাদনা করতে গিয়ে স্পষ্টই বলেছেন—যে এই বইখানা নিয়ে ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্ট যথেষ্ট আলোচনা হয় এবং যখন পার্লিয়ামেণ্টে অযোধ্যার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করছিলেন তখন এই বইটা ছাপা হওয়ার দরুণ অযোধ্যার ভাগ্যনির্ণয়ে গ্রন্থটির যথেষ্ট প্রভাব ছিল। লেখকও দু পয়সা পেয়েও যান কেন না, কয়েক মাসের মধ্যেই আঠারশ ছাপান্ন বইখানার দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হয়। বইটা ফরাসী ভাষায়ও অনুবাদ করা হয়।

এখন বইখানাকে কতদূর ঐতিহাসিক মর্যাদা দেওয়া যায় সেটাই বিবেচনা করে দেখা দরকার। লেখক তাঁর নাম না ছাপালেও কিছুদিনের মধ্যেই জানা যায় যে বাইশ বছরের এক ছোকরা এই নবাবী কেচ্ছার লেখক। নাম—উইলিঅম নাইটন। বিশ বছরে কলম্বোর নর্মাল স্কুলের হেডমাষ্টারী নিয়ে নাইটন দেশ ছেড়ে আসে। সিংহলে থাকবার সময়—রয়েল এশিয়াটিক

সোসাইটির সিংহল শাখার সম্পাদকের কাজ করেন। এ সময়ে সিংহলের উপর তার দু'খানা বই বেরোয়—'এ হিস্ট্রি অফ সিলন'...আর 'ফরেস্ট লাইফ অফ সিলন'। কলম্বো থেকে কলকাতা। নর্মাল স্কুলের হেড়মাষ্টারী থেকে হিন্দু কলেজের ইতিহাস আর লজিকের অধ্যাপক। এই সময়ে নাইটনের এই নবাবী কেচ্ছা কাহিনী ছাপা হয়। তার শিরোপা হিসেবে লর্ড ক্যানিং তাঁকে অযোধ্যার সহকারী কমিশনারের পদে বসিয়ে দেন।

তরুণ নাইটনের এই জীবন কাহিনী থেকে একটা কথা বোঝা যায় যে তাঁর ব্যক্তিগত কোন অভিজ্ঞতা ছিল না অযোধ্যা সম্বন্ধে। তবে তাঁর সংবাদ দাতা কে? হিল্টনের 'গাইড টু লক্ষ্ণৌ' গ্রন্থে জানা যায় যে নবাব নাসিরুদ্দিনের ইংরেজ বয়স্য ছিল পাঁচজন—নাপিত (ডু রাসেট) শিক্ষক রাইট, ছবি আঁকিয়ে আর সঙ্গীত শিল্পী—মানজ, গ্রন্থগারিক ক্রপলে এবং কাপ্তেন ম্যাগনেস।

এখন প্রোসেস অব এলিমিনেশনে'র সাহায্যে এটা বলা যায় যে নাইটনের সংবাদ সংগ্রাহক রাসেট নন, কেননা তাঁর সম্বন্ধে নাইটন নানা নিষ্ঠুর মন্তব্য করেছেন। অনেকে মনে করেন ক্রুপ্‌লে সাহেবই নাইটনকে এইসব ঘরোয়া কাহিনী বলেন। পরবর্তীকালে রাসেটের সঙ্গে এই বই নিয়ে আলোচনার সময় তিনি নাকি বলেছিলেন বলে শোনা যায় যে গ্রন্থখানি একটি আদি এবং অকৃত্রিম রোমান্স। বলা যেতে পারে, নাইটন এই বইয়ে নাপিতটি সম্বন্ধে বড়ো ভালো কথা বলেন নি, কাজেই এই কেতাবটিকে কেচ্ছার পর্যায়ে টেনে নামাতে পারলে, তাঁরই সুবিধে। তাই যদি হয়, তবু অযোধ্যার এই ইতিহাসে যে অনেক কল্পনার প্রসাদ রয়েছে সে কথা ও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। যেমন ধরা যাক এই গ্রন্থে গ্রন্থগারিকের সঙ্গে রাজার ইংরাজীতে দীর্ঘ কথোপকথনের বিবরণ রয়েছে। কিন্তু ভিন্ন সূত্রে জানা যায় নবাব নাসিরুদ্দিন আর যাই জানুন ইংরিজী জানতেন না। দুটি তিনটি ইংরাজী শব্দ নিয়েই ছিল নবাবের ইংরাজী জ্ঞান-সীমা।

নাইটনের বইয়ের অযোধ্যার বর্ণনা স্বভাবতঃই পরের মুখে ঝাল খাওয়া। তাঁর গ্রন্থের দ্বাদশ পরিচ্ছেদের মহরমের বিবরণও তাই। তিনি এ' বিষয়ে শ্রীমতী মীর হাসেন আলির 'অবজারভেসনস অন দি মুসলমানস অফ ইণ্ডিয়া'র কাছে ঋণী। তার বই-এর পাতায় পাতায় ক্যালকাটা রিভিউতে প্রকাশিত স্যার হেনরী লরেন্স-এর 'কিংডম অফ আউধ' এবং বিশপ হেবায়ের ন্যারেটিভ অফ এ জার্নি থ্রু দি আপার প্রভিন্সেস অব ইণ্ডিয়ার ছায়া পড়েছে। এ ছাড়া তার গ্রন্থে অনেক ঐতিহাসিক চরিত্র ভুলভাবে এসে পড়েছে। অষ্টম পরিচ্ছেদে 'স্বেচ্ছাচারীর খেয়ালে'র বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি ঘানিব জঙ্গের কাহিনী রাজা বক্তায়ার সিংয়ের ওপর চাপিয়েছেন। উধোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে আর কাকে বলে।

কিন্তু এই বইটাই ব্রিটিশ পার্লিয়ামেন্টের মাননীয় সভ্যদের অযোধ্যা অধিকারে প্ররোচিত করেছিল। উদ্বুদ্ধ করেছিল। এর কথাই বারবার উদ্ধার করেছিলেন মাননীয় সভ্যেরা তাঁদের বক্তব্যের প্রতিষ্ঠার জন্যে। অশুদ্ধ তথ্যকণ্টকিত এই কেচ্ছাকাহিনীর ওপর ভরসা করেই ন্যায়নীতি ধারক ও বাহক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাদের খোলসা বিবেক নিয়ে চিরতরে অযোধ্যা গ্রাসে ফতোয়া পাঠিয়েছিলেন ডালহৌসীর হাতে। এতে করে' ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের অযোধ্যা পলিসি

পিছনে যে সাম্রাজ্যবাদী চেতনা সতত সক্রিয় ছিল, সেটা কি দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে ওঠে না ?

১। Oudh papers pp. 156-57.

২। Journey through the kingdom of Oudh,—W. H. Sleeman (1858) Vol. 1. p. 202.

৩। Hindusthan Standard. Puja Annual—1961, pp. 2'-29.

৪। Ibid.

৫। পাঠকদের সুবিধার জন্য অযোধ্যার নবাব বংশের তালিকা এখানে দেওয়া হল—

গান ও কবিতা

দেবেন্দ্রনাথ মিত্র

মানব যখন কথা বলিতে আরম্ভ করিল তখন তাহার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যবুদ্ধি তাহাকে স্বরে কথা বলিবার প্রেরণা দিল। এইখানেই গানের উৎপত্তি।

পৃথিবীর সমস্ত সাহিত্যে দেখা যায় আগে কবিতার সৃষ্টি হইয়াছে তৎপরে গদ্যের। কিন্তু গান আরও প্রাচীন। অর্থাৎ সর্বাগ্রে গানের সৃষ্টি তৎপরে পদ্যের তৎপরে গদ্যের।

আগে হয়ত গানের শৃঙ্খলা ছিল না কিন্তু ভরতমুনি ভারতীয় সঙ্গীতকে একটি বৈজ্ঞানিক রূপ দিলেন এবং তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া অন্যান্য সঙ্গীতজ্ঞ মুনিগণ রাগিণী তাল প্রভৃতি শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া সঙ্গীত সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচনা করিলেন এবং সেই হইতেই ভারতে সঙ্গীত একটি শাস্ত্র হিসাবে চলিয়া আসিতেছে।

ভারতীয় শাস্ত্রকারগণ রচনা বিষয়ে গানকে সাধারণতঃ চারিটি অংশে বিভক্ত করিয়াছেন যথা আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ; সংক্ষেপতঃ আ অ স আ। কবিতা ইচ্ছামত ছোট ও বড় করা যায়। গদ্যে তো কোনও সীমাই নাই।

সমগ্র ভারতের মধ্যে হিন্দীতেই গানের চর্চা অধিক হইতে লাগিল। হিন্দীভাষার অন্য কোনও সম্পদ থাকুক বা না থাকুক গানের সম্পদ অতুলনীয়। তৎপরে রাজা বাদশাগণের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দী গান একটা অপূর্ব শ্রী ধারন করিল। আমরা এ প্রবন্ধে হিন্দী গানকেই ভারতীয় সঙ্গীতের মানদণ্ড বলিয়া ধরিব।

হিন্দী ধ্রুপদ গানের রচয়িতাগণ গানের এই চতুষ্পদী বিভাগ আ অ স আ মানিয়া লইলেন। প্রমাণ যে কোনও একটি হিন্দীগান দেখিলে তাহা বুঝিতে পারা যায় যথা—'শংকর শিব পিনাকী' কিম্বা 'ঐসী বরখা ঋতুমে' ইত্যাদি।

কিন্তু হিন্দী ধ্রুপদ গানে এই চতুষ্পদী বিভাগ সর্বদা রক্ষিত হয় নাই, তবে বৈলক্ষণ্য যাহা হইয়াছে তাহাতে ঐ চারিটি বিভাগ অতিক্রম করিয়া বৃদ্ধির দিকে যায় নাই, বরঞ্চ হ্রাসের দিকেই আসিয়াছে, অর্থাৎ অনেক ধ্রুপদ গানে কেবলমাত্র আস্থায়ী ও অন্তরা দেখা যায় কিন্তু সঞ্চারী ও আভোগ দেখা যায় না, যথা—'যাঁউ যমুনাজলে সজনী ভরন কৈসে', কিম্বা 'আজ ধনভাগ সখিরে ফাগুনমে পিয়া পায়ো' ইত্যাদি।

প্রসঙ্গতঃ বলা দরকার যে গানের পরিধি এইরূপে হ্রাস করিবার একটা সঙ্গীতিক কারণ আছে। নিয়ম অনুসারে শিল্পকার্যের অনুরোধে ধামার প্রভৃতি তালের নানাবিধ 'বাঁট' ও রাগিণীর নানাবিধ কাজ দেখাইতে হয়, গানের কথা বেশী হইলে সেগুলি কৃতকার্যতার সহিত দেখাইতে পারা যায় না।

হিন্দী খেয়াল গান কিন্তু সর্বত্রই একটি আস্থায়ী ও একটি অন্তরাতে সীমাবদ্ধ। ইহাতে সঞ্চারী বা আভোগ থাকে না। ইহারও কারণ আছে। খেয়াল গানে স্বরের অর্থাৎ রাগিণীর খেলাটাই

বেশী, গলা হইতে রাগিনীর সূক্ষ্ম কাজ বাহির করিতে হয় সেস্থলে অধিক কথা যুক্ত গানে তাহা সুবিধাজনক হয় না। তাই দেখা যায় সদারঙ্গ যখন পূর্ণাঙ্গ ধ্রুপদগান রচনা করিতেছেন যথা 'আব মন মানন কহি এরী' তখন চতুষ্পদী ঠাটে রচনা করিতেছেন এবং যখন খেয়াল গান রচনা করিতেছেন যথা 'জানে ন দোঙ্গি' তখন কেবল আস্থায়ী ও অন্তরার উপর রচনা করিতেছেন।

শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসরণ করিয়াই হোক অথবা হিন্দী গান অনুকরণ করিয়াই হোক বাংলা ভাষাতেও ঐরূপ চতুষ্পদী ধ্রুপদ ও দ্বিপদী খেয়াল গান রচনা হইতে লাগিল। বাংলা গানে ভাবের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইল সে কারণ বাংলা গান, হিন্দী গানের অপেক্ষা শব্দবহুল হইয়া পড়িল।

রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও রজনীকান্তের সমস্ত গানগুলি পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় সেগুলির অধিকাংশ ঐরূপ শাস্ত্রোক্ত চতুষ্পদী ঠাটে রচিত। দৃষ্টান্ত বাহুল্য মাত্র। কিন্তু তাঁহারা সর্বত্র ঐ নিয়ম কঠোরভাবে না মানিয়া কতক গানে বৈচিত্র্য সাধন করিলেন। সেরূপ বৈচিত্র্য একাধিক অন্তরা সঞ্চারী বা আভোগরূপে অথবা সঞ্চারী ও আভোগ বর্জিত করিয়া একাধিক অন্তরারূপে অথবা উহাদের সংখ্যা হ্রাস বৃদ্ধির দ্বারা নানা প্রকারে দেখা দিল। রবীন্দ্রনাথের 'তাবলে ভাবনা করা চলবে না' গানটি প্রথম পদটি আস্থায়ী এবং অন্য তিনটি পদকেই অন্তরা বলিলে দোষ নাই, তাঁহার 'যদিও আমার হৃদয় দুয়ার' গানটির প্রথম পদটিকে আস্থায়ী এবং বাকীগুলিকে অন্তরা বলা চলে। দ্বিজেন্দ্রলালের 'নীল আকাশের অসীম ছেয়ে' গানটিতে ছয়টি পদ দেখা যায় তাহাকে যথাক্রমে আস্থায়ী অন্তরা, সঞ্চারী আভোগ এবং পুনরায় সঞ্চারী ও আভোগ বলিতে দোষ নাই, যে সমস্ত ব্রহ্মসঙ্গীত রচিত হইতে লাগিল তাহাতেও দেখা যায় 'মন চল নিজ নিকেতনে' গানটি চতুষ্পদী ঠাটে এবং 'অপরূপ সৎস্বরূপ চিদানন্দ ব্রহ্মরূপ' গানটি দ্বিপদী ঠাটে রচিত এবং অন্যান্য অনেক গান নানাবিধ ঠাটে রচিত।

রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাতীসুরের অনুকরণে বাংলায় কোরাস গানের সৃষ্টি করিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন অধিনায়ক' 'দেশ দেশ নন্দিত করি' ইত্যাদি এবং দ্বিজেন্দ্রলালেরও 'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা' 'জননী বঙ্গ ভাষা এজীবনে' প্রভৃতি গানগুলি বাংলা সঙ্গীতে একাত্ম হইয়া গিয়াছে। এগুলি সঙ্গীত ও ভাব দুই দিক দিয়াই সমৃদ্ধ। হিন্দী গানে এরকম কোরাস গান খুঁজিয়া পাওয়া যায় না তবে ভজন ও গজল কতকটা ইহার নিকটবর্তী বটে।

রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের কতকগুলি অতিকায় শব্দবহুল গান আছে যথা রবীন্দ্রনাথের 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ' ও অন্যান্য। এগুলি ঠিক গানের পর্যায়ে পড়ে না, এগুলিকে সুর সংযুক্ত আবৃত্তি কবিতা বলা চলে।

এই প্রসঙ্গে গানের ভাষা ও পরিধির কথা স্বতঃই আসিয়া পড়ে। কবিতা ও গানের ভাব ও ভাষা বিষয়ে যথেষ্ট পার্থক্য অনুভব করা যায়। যাহা উচ্চ শ্রেণীর কবিতা তাহাই উচ্চশ্রেণীর গান নয়। গানের ভাবটি সরলতাময় মহত্ত্বে পরিপূর্ণ, কবিতার ভাব তাহা অপেক্ষা কিছু জটিল। গানের ভাব মানবের মনে ফুলের নির্যাসের মত কার্য করে কবিতার ভাব শুধু ফুলের মত। কবিতা কেবলমাত্র বর্ণনীয় বস্তুটি প্রাঞ্জলভাবে চিত্তপটে অঙ্কিত করিতে পারে কিন্তু গান সুর ও তালের পশ্চাতে একটি অরূপ অনির্বচনীয় ভাব হৃদয়ে সঞ্চারিত করিয়া দেয় যাহাকে সঙ্গীতের আত্মা বলা যায়। কোথা হইতে

সঙ্গীতের এরূপ গভীরতা আসিল? তাহা কেবল সুরের সাহায্যে। সুরগুলি শরীর ও মনের প্রত্যেক ধমনীতে আঘাত করে কিন্তু কবিতা গানের মত এত অল্প কথার মধ্যে—অবশ্য ব্যতিক্রম আছে—হৃদয়ের অন্তরতম স্থল আলোড়িত করিতে পারে না। আমরা একটি গানকে কবিতার আকারে পাঠ করিয়া পরে সঙ্গীতরূপে শুনিয়া ইহার যথার্থ্য অনুভব করিতে পারি। এমনকি কতকগুলি গান আছে তাহা পড়িতে ভাললাগা দূরে থাকুক পড়িতে বিরক্তি আসে কিন্তু গাহিবার সময় তাহাদের মনোহারিত্ব উপলব্ধি করিতে পারা যায়। হিন্দী গানের কেবলমাত্র একখানি পুস্তক পড়িয়া হতাশ হইতে হয়। তবে অসামান্য প্রতিভাধর কবি ও গায়ক রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র গানগুলি কবিতার আকারেও পড়া চলে। এগুলি গানও বটে গীতিকবিতাও বটে।

সঙ্গীতে যে সুর সাহায্যটি ভাবের অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ তাহা আমরা ব্যবহারিকরূপেও প্রমাণ করিয়া দিতে পারি। গানের আসরে কোনও শ্রোতা গায়ককে একটি বিশেষ গান গাহিবার জন্য অনুরোধ করেন, ধরুন তিনি বলিলেন রজনী সেনের 'কবে তৃষিত এ মরু গানটি ধরুন ত।' এরূপ বরাতের উদ্দেশ্য কী? সুরশ্রবণ না ভাবগ্রহণ? তিনি যে শুধু ভাবগ্রহণের জন্য এরূপ বরাত করিয়াছেন তাহা বলা চলে না কারণ গানটি তিনি ইতিপূর্বে অনেকবার শুনিয়াছেন হয় তো বা সেটি তাঁর মুখস্তও আছে। অতএব বলিতে হইবে তিনি গানের ভাবের সহিত সুরসাহায্যও চান এবং মনে মনে অজ্ঞাতসারে সুরের প্রাধান্য স্বীকার করিতে থাকেন। এমনও দেখা যায় অনেক শ্রোতা একটি হিন্দীগান তন্ময়ভাবে শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন কিন্তু গানের ভাবটির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে কিছুই বলিতে পারেন না, অথচ গানটি গাহিতে গাহিতে গায়ক যখন মধুর মূর্চ্ছনা, আশ মীড় গমক কম্পন প্রভৃতি প্রয়োগ করেন তখন তাঁহারা সেই সেই স্থানে অতি সুন্দর লাগিয়াছে বলিয়া আকার ইঙ্গিতে জানাইয়া দেন এবং মস্তক সঞ্চালনের দ্বারা উল্লাস জ্ঞাপন করেন।

ভাব বিষয়ে উপযুক্ত কথা প্রয়োগ না করিয়া সঙ্গীত হিসাবে উপযুক্ত কথা প্রয়োগ করিতে হয় বলিয়া সাধারণতঃ গানে এবং বিশেষতঃ হিন্দী গানে অনুপ্রাসের এত আধিপত্য, যেখানে 'নরহর' সেইখানেই 'নারায়ণ নিরঞ্জন নরোত্তম' যেখানে 'জগপতি' সেইখানেই 'জগবন্দন জগচক্ষু জগন্নাথ,' যেখানে 'দীননাথ' সেইখানেই 'দয়াল দামোদর দর্পহারী' ইত্যাদি। হিন্দীগান অনেকাংশে বাংলা গানের অপেক্ষা অনুপ্রাসবহুল, যথা হিন্দী গান 'আজু পানিঘাট নিকটবংশীবট তটমে নট ক্ষীণতট পীতপট নিপট কানাইয়া' অথবা লকটী চলনী মুকুট ঝুকনী ভৃকুটি কুটিল তিলক ঝলক হলকান কুণ্ডল কপোলনী আনি আনি' ইত্যাদি। অনুপ্রাসের সঙ্গে লীন হওয়া সঙ্গীতের একটি অদম্য আকাঙ্ক্ষা এবং কবিতার শেষাক্ষরের মিল ইহাদের দিগ্বিজয়ী সন্তান। অনুপ্রাস গানে যদিও অনেক পরিমাণে চলে কবিতায় অতর্কিত ভাবে ব্যবহার করিলে মহৎ দোষের কারণ হইয়া উঠে।

গান ও কবিতার মধ্যে আরও একটি প্রভেদ এই যে কবিতায় assonance অর্থাৎ স্বরবর্ণের মিল অক্ষম মিল বলিয়া গণ্য কিন্তু গানে উহা দোষের হয় না। যথা—

'কতকাল পরে বল ভারত রে
দুখ সাগর সাঁতারি পার হবে।'

অথবা

'আমি পথ ভোলা এক পথিক এসেছি
সন্ধ্যাবেলার চামেলী গো
সকাল বেলার মল্লিকা
আমায় চেনো কি ?'

হিন্দী ও বাংলা গানের মধ্যে আর একটি প্রভেদ এই যে বাংলা গানের কথা সাধারণতঃ বেশী, হিন্দীগানে কথা কম। বাংলা গানের 'ভেসে আসে কুসুমিত উপবন সৌরভ' এই বাক্যটির ষোলটি মাত্রা আছে কিন্তু হিন্দী গানের 'বাদর ঝুমি ঝুমি আয়ে' এই বাক্যটির নয়টি অক্ষরের উপর কুড়িটি মাত্রা আছে। ইহার কারণ এই যে গানে রাগিণীর রূপ, তান লয়, আশ, মীড়, গমক, কম্পন প্রভৃতি নানাবিধ খেলা দেখাইতে হয় এবং পূর্বেই বলা হইয়াছে শব্দ বহুল গানে সেগুলি দেখানো খুবই অসুবিধাজনক।

গানের বাণীও সাধারণ বাণী হইলে চলিবে না সেগুলি একটু উচ্চ ধরনের হইতে হইবে, কিন্তু কবিতায় সেরূপ কোনও ধরাবাঁধা নিয়ম নাই। হিন্দী ধ্রুপদ গানের বাণী চারিটি শ্রেণীর অন্তর্গত যথা—গহরবাণী, খাণ্ডারবাণী, ডগরবাণী ও নেবরবাণী। তন্মধ্যে গহরবাণীকে শ্রেষ্ঠ এবং পর পর বাণীগুলিকে তদপেক্ষা নিকৃষ্ট বলা হইয়াছে। একটা হিন্দী গানে গহরবাণীকে রাজা, খাণ্ডারবাণীকে কোতোয়াল, ডগরবাণীকে দেওয়ান ও নেবরবাণীকে বক্সীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে, যথা—

বাণী চারোঁকে বেওহার
রাজা গবরহার ফৌজদার খণ্ডার
দিবান ডাগর বক্সী নেবর ইত্যাদি।

প্রসঙ্গত: বলা যায় হিন্দী ভাষা বাংলা ভাষা অপেক্ষা সঙ্গীতের অধিক অনুকূল।

মার্গ সঙ্গীত প্রচলিত হইল বটে কিন্তু বাংলা দেশে পূর্বে হইতেই বাউল, ভাটিয়ালী কীর্তন, শিব দুর্গা কালী মনসা প্রভৃতির দেবদেবীর গান এবং লোকসঙ্গীত যে সমস্ত প্রচলিত ছিল তাহাকে মার্গসঙ্গীত স্পর্শ করিতে পারিল না। সেগুলির কবিতামূল্য অর্থাৎ ভাব সম্পদ যে কিছুই নাই এ কথা বলা যায় না।

কবিতা যে কোনও ব্যক্তি নিজের ক্ষমতা মত রচনা করিতে পারে কিন্তু যে কোনও গায়ক গান রচনা করিলেই তাহা গান হয় না। সঙ্গীতে অসামান্য প্রতিভাধর ব্যক্তিগণ যে গান রচনা করিয়া গিয়াছেন এবং যাহা কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে তাহাই প্রকৃত গান এবং সেই সমস্ত ব্যক্তিকে সঙ্গীতনায়ক বলা হয় যথা—হিন্দী গানে তানসেন, বৈজুবাওরা, সদারঙ্গ, নায়ক গোপাল, বাণীবিলাস ইত্যাদি। আমাদের রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালও গানের রাজা তাঁহারাও সঙ্গীতনায়ক।

সঙ্গীতে গানের ভাবের অপেক্ষা সুরের প্রাধান্য যদি আমরা এইরূপে স্বীকার করিয়া লই তাহা হইলে দেখিতে পাইব গানের ভাষা ও কবিতার ভাষা সর্বতোভাবে সমান নয়। কবিতায় ভাব ভাষা ছন্দ অলংকার প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে সামঞ্জস্য রাখিতে হয় কিন্তু গানে শ্রুতিমধুরত্ব বিষয়টি সর্বাগ্রে পরিলক্ষণীয়। কবিতায় যে স্থলে একটি ভাবময় কথা লাগাইতে হয় গানে সে স্থলে একটি সঙ্গীতময় কথা ব্যবহার করিতে হয়।

মেকির শত্রু—ঈশ্বর গুপ্ত

রজতকুমার পাণ্ডা

১৮৮২ থেকে ১৮৫৯ খৃঃ, এই ৪৭ বছরের সীমিত গণ্ডী গুপ্তকবির জীবিত কাল। এই সীমায়িত আয়ুষ্কালের পরিধিতে তাঁর লিখিত কয়েকটা কবিতায় তৎকালীন বঙ্গসমাজ কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল তাই আমরা লক্ষ্য করতে পারব। আলোচনার প্রাক্কালে সেকালের সমাজের একটু পরিবেশগত বিবরণ নিলে সমগ্র রচনাটি হৃদয়ঙ্গম হওয়ার পক্ষে বোধকরি স্বাভাবিক হয়ে উঠবে।

বঙ্গসমাজ বলতে তখন প্রধানত কলকাতাকেই বুঝাত। বাংলাদেশ কেন সমগ্র ভারতের কর্মভূমিই ছিল সহর কলিকাতা। এই সহরের উপরই বৃটিশ শাসকদের ন্যূনাধিক আড়াইশ' বছরের সাম্রাজ্য পরিচালনার কেন্দ্র ছিল। তাই এহেন শহরে দেশী ও বিদেশী নানাজাতির বাসস্থান যে গড়ে উঠবে তা সহজেই অনুমান করা যায়। সেই সূত্র ধরে তাদের আচার আচরণও যে এখানে সমধিক প্রসার লাভ করছিল সে কথাও ভুললে চলবে না। যাই হোক, ১৭৫৭ সালের ঐতিহাসিক পলাশীর আম্রকুঞ্জে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলা যেদিন কুচক্রে পরাস্ত হলেন, সেদিন স্বদেশের সেই অপরিচিত বখাটে ছেলে ক্লাইভ বাংলা তথা ভারতে ব্রিটিশপ্রভুত্ব স্থাপনের পথে দৃঢ় পদক্ষেপ স্থাপন করল। তারপর তারা একে একে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার মূলোৎপাটন করে স্বীয় মনোবাসনা চরিতার্থ করতে একটুও পিছ্‌পা হ'ল না। অচিরেই ভারতে বৃটিশপ্রভুত্ব সুদৃঢ় হল।

বাংলা দেশের জনগণের মনোভাব যে বেনের জাত বুঝে নিয়েছিল সেকথা পলাশীর প্রান্তর প্রমাণ করে দিল। তাই মনোহর চাকুরী আর সস্তা খেতাবের লোভ দেখিয়ে তারা নিজের দলে বাংলা দেশের জনগণকে সহজে টেনে নিল। শুধু তাই নয়, তারা যে পরবর্তী কালে সবিশেষ উপকৃত হবে এই সার কথাও বুঝে নিয়েছিল। আর সেই জন্যেই তারা অনুভব করেছিল বাঙালীকে কাজচালানোগোছের শিক্ষিত করা দরকার। এই স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই খৃষ্টান মিশনারীরা দলে দলে বাংলা দেশে আসতে লাগল। শিক্ষাদানের পশ্চাতে ছাত্রদেরকে যে ক্রমশঃ ধর্মান্তঃকরণেও সবিশেষ উৎসাহিত করা হয়েছিল সেকথাও আমরা জানি। সেই কথাটাও ঈশ্বর গুপ্ত নির্মমসত্যে উচ্চারণ করেছেন—

বিদ্যাদান ছল করি' মিশনারি ভব।
পাতিয়াছে ভাল এক নিধনের টব॥
মধুর বচন ছাড়ে জানাইয়া লব।
ঈশুমন্ত্রে অভিষিক্ত করে শিশু সব।

অধিক সম্মান ও প্রচুর সম্পত্তির লোভনীয় মহিমায় নিমজ্জিত হয়ে বহু বাঙালী খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করল। এর বিষময় ফল, সেই সমস্ত বাঙালীবাবুরা অপেক্ষাকৃত অশিক্ষিত দরিদ্র ও স্বদেশবাসীর উপর নানা রকমের অত্যাচার চালাতে লাগল। বলা বাহুল্য, উক্ত বাঙালীবাবুরাও সবিশেষ শিক্ষিত ছিল না। কোনরকমে ইংরেজী দু'পাতা কঁতিয়ে কঁতিয়ে পড়ে সাহেবদের সাথে পাত্‌ পাড়তে পেত, এইটুকুই যা তাদের মূল্য ছিল। যাইহোক দেশীয় প্রথাকে নস্যাৎ করে বিদেশীয়

আচার-ব্যবহারকে অন্ধভাবে গ্রহণ করায় সামাজিক অধোগতি দিন দিন বাড়ছিল বৈ কম ছিল না। জাতির এই দুর্গতির দিনে রামমোহন রায় কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করলেন। তাঁর প্রাণে দারুণভাবে লেগেছিল যখন মিশনারীরা প্রকাশ্যে (পত্র-পত্রিকা মারফৎ) বাঙালী জাতি ও ধর্মকে হীনভাবে আক্রমণ করেছিল। আর যারা খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেনি তাদের উপরও কতরকম ভাবে যে পীড়ন করা হয়েছিল সে কথা পণ্ডিতম্মন্যেরা জানেন। রামমোহনের এই ব্যবহার সহ্য হল না। তিনি কলকাতাতেই সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসরকাল থেকে বাঙালীসমাজকে শিক্ষা-দীক্ষায় আচার-ব্যবহারে অনেকটা প্রগতিশীল করে, সমাজকেই সুযোগ দিয়েছিলেন নিজেকে ভাল করে বুঝাবার। তাঁর সামাজিক মতবাদ, ধর্মীয় আচার এবং শিক্ষাগত মনোবৃত্তিকে কিভাবে কাজে লাগিয়ে বাঙালী-জাতিকে আরও উন্নত করা যায় সেকথা অল্পবিস্তর সকলেরই জানা আছে। তারপর রামমোহনের অবসানের পর থেকে (১৮৩৩ খৃঃ,) সিপাহী বিদ্রোহের সময় (১৮৫৭) পর্যন্ত এই সময়টাকে গুপ্তকবির যুগ বলে ধরে নিতে পারি।

রামমোহনের ভাবোদ্দীপনায় উদ্দীপিত হয়ে এবং ডিরোজিও-রিচার্ডসনের শিক্ষকতায় উদ্বোধিত হয়ে, বহু বাঙালী যুবক ইংরেজী শিক্ষা ও আচার ব্যবহারকে জীবনের বিশিষ্ট বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করে, হিন্দুস্কুলে ভর্ত্তি হয়ে গেল। তাছাড়া দেশী শিক্ষা অপেক্ষা বিদেশী শিক্ষায় ও বিদেশীদের সাহচর্যে যে অধিকতর সহজ এবং স্বাভাবিক জীবনযাত্রা নির্বাহের পথ আছে তা অল্পবিস্তর সহজেই বুঝেছিল। তাই কেউ-বা অধিকতর জ্ঞানান্বেষণের আকাঙ্ক্ষায় বিদেশী শিক্ষাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিল, কেউ-বা সাহেবদের নেকনজরে পড়ে নিজেকে তাদের কাছে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল। বলাবাহুল্য দ্বিতীয় পন্থাটিই সমধিক প্রসারলাভ করেছিল। যে কোন উদ্দেশ্যেই হোক, হিন্দুস্কুলের যুবকগণ শিক্ষালাভ করতে গিয়ে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করাকে জীবনের ব্রত হিসেবেই গ্রহণ করেছিল। আর সেই সুবাদেই তাদের অনেকেই নিজেদেরকে ইংরেজেরও প্রিয়পাত্র বানিয়েছিল,—একথা ভুললে চলবে না। রামমোহনের ইচ্ছা ছিল এদেশীয় জনগণকে সু-শিক্ষিত করে তুলবেন। কিন্তু তাঁর সে আশা বিশেষ ফলবতী হয় নি তাঁর জীবনাবসানে। সাহেবদের স্বার্থান্ধ শিক্ষায় প্রলুব্ধ হয়ে বাঙালী যখন নিজেদের ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দিয়ে একেবারে সাহেবীয়ানায় মত্ত হয়ে উঠল, তখন বাংলাদেশের মধ্যমণি শহর কলকাতার সে এক বিচিত্র চিত্র যা ঐতিহাসিকদের লেখনীতে বিধৃত হয়েছে। নব্য বাঙলার প্রাণকেন্দ্র যে এই কলকাতা, এই কলকাতাতেই বাঙলার সাংস্কৃতিক জীবনের এহেন বিপর্যয় দেখে ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্ত সেই অবক্ষয়ের ধ্বংসস্তূপের মূলে চরম কুঠারাঘাত করলেন। তাঁর শাণিত লেখনী ও লেখনীপ্রসূত পরিবেশন পাত্র ('সংবাদপ্রভাকর') নিয়ে তিনি নিজেই বাঙলার বিপর্যস্ত রঙ্গমঞ্চে এসে দাঁড়ালেন।

অনেকে বলেন ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা অশ্লীল এবং সমাজে যা কিছু নূতন ও প্রগতির পরিচায়ক বলে বিবেচিত (বলা বাহুল্য বিদেশীয় ভাবেরই পরিপূরক) তাকেই তিনি ব্যঙ্গের কষাঘাত দিয়েছেন। কিন্তু একটু অনুসন্ধিৎসা নিয়ে বিচার করলে সে মত বুঝি অগ্রাহ্য হয়ে যায়।

আমরা জানি যে, গুপ্তকবি ইংরেজী শিক্ষায় সবিশেষ শিক্ষিত ছিলেন না। তাই বলে তিনি ইংরেজী শিক্ষাকে সর্বৈব বর্জন করারও অভিপ্রায় পোষণ করতেন একথা বলা তার বিরুদ্ধে নেহাৎ

জেহাদ ঘোষণা করারই সামিল। তিনি বরং ইংরেজী শিক্ষার সপক্ষেই মতামত ঘোষণা করেছেন তাঁর 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকাতেই। —"এদেশে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবার যে কল্পনা স্থির হইয়াছে তাহা অতি উত্তম। ইংলণ্ড দেশে যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ২ প্রকার বিদ্যার শিক্ষা হইয়া থাকে এদেশীয় লোকে তাহার কোন বিষয়েই শিক্ষা করিতে অক্ষম নহে।...এদেশে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত করিয়া অত্রস্থ প্রজাদিগকে তদুপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করিলে এতদিন তাহারা নানা বিষয়ে উপযুক্ত হইয়া উঠিত।" তাহলে কি করে বলি তিনি বিদেশী শিক্ষার বিরোধী ছিলেন এবং যা কিছু বিদেশীয় সে সমস্তকেই ঘৃণা করেছেন? প্রকৃত শিক্ষা যে মানুষকে কতখানি উন্নত করতে সহায়তা করে তা গুপ্তকবি সঠিক বুঝেছিলেন। কিন্তু যে শিক্ষায় গলদ আছে, যে শিক্ষা সংকীর্ণ মনোভাবের দ্যোতনা করে, যেখানে শিক্ষার নামে শিক্ষিতের মনের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়ে ভীমরতির আশ্রয়ই গ্রহণ করানো হয়, সে-শিক্ষাকে কবি কখনোই বরদাস্ত করতে পারেন নি। ঠিক এই কথাই একদিন মনস্বী স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন—"যে শিক্ষা চরিত্র গঠনে সহায়তা করে না, যে শিক্ষা গুরুজনকে শ্রদ্ধা করতে শেখায় না, সে শিক্ষা শিক্ষাই নয়।..." তিনি জানতেন যে প্রকৃত শিক্ষিতেরাই তো সমাজ-সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখবে। তারাই তো ভবিষ্যৎ সমাজের ধারক ও বাহক। কিন্তু তাদেরই মধ্যে যদি সংকীর্ণ আত্মম্ভরিতা এসে যায় তাহলে অপেক্ষাকৃত অশিক্ষিতদের কি দশা ঘটবে এবং দেশই-বা কি ভাবে রক্ষা পাবে। সেইজন্যেই তিনি তৎকালীন স্বার্থান্ধ ও অসম্পূর্ণ শিক্ষাকে তীব্র কষাঘাত করতে দ্বিধা করেন নি।

যেখানে সামাজিকতাকে বিসর্জন দিয়ে বিদেশীয় লালজলের নেশায় কেবল উন্মত্ততাই জেগে উঠে তা যে কি রকমের শিক্ষা পণ্ডিতদের ভেবে দেখতে অনুরোধ করি। সেইজন্যই তিনি পাশ্চাত্য অন্ধ-অনুকরণ-প্রিয়তাকে তীক্ষ্ণভাবে ব্যঙ্গ করেছেন :—

গোরার দঙ্গলে গিয়া কথা কহ হেসে।
ঠেস মেরে বস গিয়া বিবিদের ঘেঁসে॥
রাঙা মুখ দেখে বাবা টেনে লও 'হ্যাম্'।
'ডোণ্টক্যার হিন্দুয়ানী' ড্যাম্ ড্যাম্ ড্যাম্॥

যা স্বাভাবিক বলে বিবেচিত অথচ শান্ত ও সুন্দর তার চাইতে ধার করে কৃত্রিম বাবুগিরির আস্ফালন করাকে তিনি সর্বদাই নিন্দা করে চলতেন। সেই তাগিদের বশবর্তী হয়েই তিনি বাঙালীবাবুদের কৃত্রিম সাহেবিয়ানার মুখোশ খুলে ধরতে এতটুকুও দ্বিধা করেননি।

বুঝি হুট্ বলে বুট পায়ে দিয়ে
চুরুট ফুঁকে স্বর্গে যাবে॥

আর এই জন্যেই বোধকরি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে "মেকির-শত্রু" বলে অভিহিত করেছেন। তাহলে এই চিত্রগুলোর মধ্যে দিয়ে আমরা দেখতে পাই তৎকালীন উচ্চ এবং মধ্যশিক্ষিত বাবুদের শিক্ষাগত চারিত্রিক মহিমা কিভাবে সমাজের মধ্যে প্রবেশ করে পঙ্কিলতার পথকে আরও ভয়াবহ করে তুলেছে যা তাঁর পরবর্তীকালের অনেক কবিতাতেও পেতে পারি।

তিনি নাকি তৎকালীন নারী শিক্ষাকে বরদাস্ত করতে পারেননি—এই অভিযোগ অনেকে

করেছেন। হয়ত বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন প্রবন্ধে কদাচিৎ দু'একটা নিন্দার কথা বেরিয়ে গিয়েছে, সেটা যে ধর্তব্যের বাইরে সেকথাও পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। মানুষ মাত্রেরই ভুল হয়। কিন্তু সে ভুল অভিপ্রেত নয়। তাই যদি হত তাহলে 'সংবাদ প্রভাকরের' পাতাগুলো উল্টাতে পাঠককে সবিনয়ে অনুরোধ করি। সেখানে দেখা যাবে তিনি স্ত্রী-শিক্ষাকে কি পরিমাণ আদর করে, স্বীকার করে তার মর্ম উপলব্ধি করেছিলেন।

আগে মেয়েগুলো ছিল ভাল ব্রতধর্ম কর্তো সবে।
একা বেথুন এসে শেষ করেছে আর কি তাদের তেমন পাবে?
যত ছুঁড়িগুলো তুড়ি মেরে কেতাব হাতে দিচ্ছে যবে;
তখন এ, বি, শিখে বিবি সেজে বিলাতী বোল কবেই কবে॥

এই কবিতায় ঈশ্বর গুপ্ত নারী-শিক্ষার বিরোধী, এই অভিযোগে অনেকের কাছে তিনি অভিযুক্ত হয়েছেন। নারী শিক্ষার উপর নাকি তাঁর আশঙ্কা জন্মে উঠেছে! লক্ষ্য করবার বিষয়, শিক্ষা ব্যবস্থায় তাঁর বিরুদ্ধমত প্রকাশ পায়নি। বরং তিনি শঙ্কিত হয়েছেন যে আমাদের এই বাঙালী-সংস্কৃতি, যা অনেকক্ষেত্রে মেয়েদের উপরই নির্ভর করে, সেই মনোবৃত্তিটিকে মেয়েরা যেন বিদেশী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বিস্মৃত না হয়। তাদের সেই পালা-পার্বন, সাঁজ-সকালে তুলসীতলায় শুচি-শুদ্ধ মনে প্রদীপ নিয়ে সন্ধ্যা দেখানো, পিঁড়ি পেতে সমাদরে অতিথি আপ্যায়ন, মেয়েদের এই যে বিশেষ কাজ, এটি কি তারা আর করতে চাইবে? বঙ্গললনাদের এই সহজ সাধারণ কর্মপ্রবৃত্তিটিতে যেরূপ সংস্কৃতি জাগে তা সত্যিই অপূর্ব নয় কি? আর সেগুলিকে তারা যদি শিক্ষার ভাবাতিরেকের উন্মত্ততায় ত্যাগ করে তবে জাতীয় বৈশিষ্ট্য কোথায় থাকবে, কোথায় থাকবে তাদের সহজাত গৌরব আর জাতির শৃঙ্খলা? "আপন ভাতে হাঁকিয়ে বগী, গড়ের মাঠে হাওয়া" তারা খায় খাক, কিন্তু "ড্যাম্ হিন্দুয়ানী' বলে বিন্দুবিন্দু ব্র্যাণ্ডি" যেন না খায়। কেননা, বাঙালী নারীত্বের যে একটা স্বাভাবিক মহিমা রয়েছে তা এর দ্বারা ক্ষুন্ন হবেই। এই সতর্কীকরণই তাঁর কবিতায় লক্ষ্য করতে পারি। কিন্তু গুপ্তকবির সেকথাগুলো অনেকে শুনেছেন, অনেকে শুনেননি; অনেকে আবার নাক সিঁটকিয়ে কানের পর্দা বন্ধ করে দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর সেই কথাগুলো কি অধুনা সমাজে বারবার করে বলে যায় নি! বঙ্গললনাদের অনেকেই কি 'আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী, গড়ের মাঠে হাওয়া' খেতে যায় না? বিন্দু বিন্দু ব্র্যাণ্ডিও কি গলাধঃকরণ হয় না? তথাকথিত বাবুরাও কি এখনো এদেশীয় অশিক্ষিতদের 'ড্যাম্' বলে মদের বোতল তুলে নেন না? এখনো কি স্বদেশীয় আচার ব্যবহারকে তাঁরা ঘৃণা করেন না? এমনিধারা কতো ঘটনা আজ থেকে প্রায় শতাধিক বৎসর আগেই নিন্দিত-কবি ঈশ্বরগুপ্ত বলে গিয়েছেন।

স্বীকার করি কবির শব্দ ব্যবহার অত্যন্ত রূঢ়। কিন্তু কেবল কবির কাব্যপ্রয়াসকে লক্ষ্য করলেই কি কবির উপর বিচার শেষ হতে পারে? তাঁর যুগ-পরিবেশকেও লক্ষ্য করতে হবে। সে-যুগে যেটুকু না হলে নয়, তাকেই তিনি গ্রহণ করেছেন। কারণ, ভাল কথা, ভাল ব্যবহার, ভাল আচার—কোন 'ভাল'র ব্যাপারেই সেকালের সমাজে একটা অকল্পনীয় ঘটনা বলে বিবেচিত হত। তাই তাদেরই মত করে কবিতা রচনা করায় যদি কবির কোন দোষ হয়ে থাকে তবে সে জিনিসকে

ধর্তব্যের বাইরেই রাখতে হবে। তাছাড়া, তৎকালীন স্বল্পশিক্ষিত বাঙালী সমাজের উৎসন্ন-দশা এমনই পর্যায়ে উঠেছিল যার সম্মুখে কোনরূপ স্তোকবাণী কার্যকরী হতেই পারে না। চটুল এবং রূঢ় বাক্যই সেখানে সমধিক প্রযোজ্য বলে বিবেচিত হয়েছিল। পাঁড় মাতালকে ভাল কথা বললে সে যেরূপ উত্তরোত্তর অশ্লীল কথাই বলে, কিন্তু তার ঢিলে তাকেই মারলে সে যেমন কিছুটা সম্বিৎ ফিরে পায়, তেমনি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধেও বোধকরি গুপ্তকবির এহেন কাব্য ব্যবহারেরই যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল। কেননা, 'ঢুকে ঠাকুর ঘরে কুকুর নিয়ে, জুতো পায়ে দেখতে পাবে"—এই মনোভাবই-বা কোন বাঙালী সহ্য করতো? আর এ-যুগেও কি তাকে আমরা বরদাস্ত করতে পারি? সেইজন্যেই উৎকট ইঙ্গ-বঙ্গীয়দের উপর তাঁর এত রোষ; যারা "ইংরেজী কয় বাঁকা বাঁকা," যারা নিজেদের 'বাঙালী' বলে পরিচয় দিতে ঘৃণায় নাসাকুঞ্চন করে এবং "বাংলা জানিনা" বলে গর্ববোধ করে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বাঙালী সমাজে, বিশেষত ক'লকাতায় আরেকটি নবীন ভাবনা উদ্দীপ্ত হয়েছিল। তা হ'ল ''বিধবা-বিবাহ-আন্দোলন" বিদ্যাসাগর মশায় এই আন্দোলনের প্রবক্তা। তাঁরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিধবা-বিবাহ আইনে পরিণত হয়ে সমাজে প্রচলিত হয় এবং তিনি এই ব্যবস্থাকে শাস্ত্রসম্মত বলে আখ্যাও দিয়েছিলেন। ১৮৫৬ সালের এই অবিস্মরণীয় কীর্তি বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙালী বাল-বিধবাদের জীবন্মুক্তির এক চরম মন্ত্র হিসেবে বহন করে এনেছিলেন যা আজকের দিনে একটা স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবেই বিবেচিত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই কাজে এককালে সকলে একযোগে বিরুদ্ধাচরণ করেছেন কিন্তু আজ তা সর্বৈব গ্রহণ যোগ্য। এককালের যা ঘৃণার পাত্র অন্যকালের তা আদরের সামগ্রী। তেমনি ঈশ্বরগুপ্তের কবিতার নগ্ন তীক্ষ্ণতায় অনেকেই খড়্গহস্ত ছিলেন, কিন্তু আজ তাঁর কথাগুলো কি নিষ্ঠুরভাবে সমাজে ফলে যাচ্ছে। ঈশ্বরগুপ্তও বিধবা-বিবাহকে অবলম্বন করে কবিতা লিখেছিলেন। সেই কবিতায় যে ব্যঙ্গের মূর্চ্ছনা হয়েছে তাতে এই প্রমাণিত হয় না যে ঈশ্বরগুপ্ত বিধবা-বিবাহের বিদ্বেষী ছিলেন। বরং বলা চলে, তিনি বিধবা-বিবাহকে পারতপক্ষে স্বাভাবিকভাবেই স্বীকার করে নিয়ে বলেছিলেন—

বুকে ছেলে কাঁকে ছেলে, ছেলে কোলে কোলে
তার বিয়ে বিধি নয়, উলু উলু বলে॥

এ-কথা কেবল কবির ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিতেই ব্যক্ত হয়নি; এটা তাঁর দূরদৃষ্টিরই পরিচায়ক বলে অভিহিত করব। কেননা, তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন বিধবা-বিবাহের উদ্যোক্তাদিকে, যে, বাল-বিধবার বিবাহ তারা দেন তো দিতে পারেন কিন্তু এহেন নারীদের পুনর্বিবাহ কি শোভনীয়! বলা-বাহুল্য, তা সংস্কৃতিরও পরিপন্থী।

অতএব, গুপ্ত মহাশয়ের উপর একেবারে খড়্গহস্ত না হয়ে, তাঁকে পুরোপুরি সনাতনপন্থী না বলে, 'যা ভবিষ্যতে ভাল হবে তারই উপর বিশ্বাসী' বলেই অভিহিত করা ভাল নয় কি! সন্দেহ জাগে, এমত অনেকের নিকট অগ্রাহ্য হয়ে যাবে। তবুও ভেবে দেখতে বলি যে যে, গুপ্ত কবির অনেক কথাই এখন যে নির্ঘাতভাবে ফলে যাচ্ছে! এবং তিনি তাঁর নির্মম লেখনীর মাধ্যমে যদি সেগুলিকে ব্যঙ্গের আশ্রয়ে সতর্ক করে না দিতেন তাহলে সমাজের অবস্থা যে, কোন্ পথে মোড় নিত তা ভেবে

দেখার বিষয়। আবার কেউ কেউ বলবেন বিধবা-বিবাহ নিয়ে স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর বিরক্তিকর মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন। ঈশ্বরগুপ্তও রক্ষণশীল মনোভাবপন্ন ছিলেন এবং উভয়ের মধ্যে বেশ হৃদ্যতা থাকায় গুপ্তকবিও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। কিন্তু নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে বিচার করলে ঈশ্বর গুপ্তের সম্বন্ধে এতখানি ভ্রান্তধারণা সহজেই নিরসন হতে বাধ্য। প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর গুপ্তের প্রত্যক্ষ চেষ্টা না থাকলে তখনকার সমাজ কতখানি অধঃপতনে যেতে পারত, সেকথা আগেই উল্লেখ করেছি। তাঁর 'সংবাদ প্রভাকর' পাঠ করলেই আমরা জানতে পারব যে দেশহিতৈষণার একটা চরম ঐকান্তিকতায় তিনি কি পরিমাণ চেতনাসম্পন্ন কবিতা প্রবন্ধ রচনা করে জনসমক্ষে প্রচার করেছিলেন, তাঁর এই দেশপ্রাণতা এবং ইংরেজদের পৈশাচিক ও বর্বর অত্যাচার আর পররাজ্যলোভের তীক্ষ্ণতা তাঁর মনে কি রকম বিক্ষুব্ধ মনোভাব জাগিয়েছিল তারও উদাহরণ রয়েছে তাঁর পত্রিকাতে। তখনও পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির জোয়ারে আমাদের চিত্তে জাতীয়তাবোধের মূল্যায়ন নিরূপিত হয়নি; যে সাজাত্যবোধ আমরা পাশ্চাত্যদের কাছ থেকে পুরোপুরি পেয়েছি বলে প্রচার করি, তারও পূর্বে গুপ্তকবির অকপট স্বদেশ মমতায় যে জাতীয়-জীবনের প্রাণোন্মাদনা জেগেছিল, আজ হয়ত তা সমালোচকদের কাছে এবং অধুনা 'স্বাধীনতার পূজারী' বলে বিবেচিত নেতাদের কাছে আমল পাবে না, তবুও সেদিনকার সেই স্বদেশীয় ঐতিহ্যের বিপুল শ্রদ্ধা নিয়ে, নিপীড়িত মানুষের সুতীব্র আর্ত হাহাকারকে পরিশোধিত ও পরিমার্জিত করেই রঙ্গলাল, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র তাঁদের কবি-কৃতিতে প্রেরণাসঞ্চারক ও প্রাণদমন্ত্র হিসেবেই একে অকাতরে ও গর্বের সাথেই গ্রহণ করেছেন।

তিনি বাঙালী সমাজকে ইংরেজের বিরুদ্ধে জাগ্রত হয়ে দেশকে উদ্ধার করবার ঐকান্তিকতার ব্যঙ্গের ছলে সমাজকে সজাগ হতে অনুরোধ কবেছিলেন। মনে রাখতে হবে, এগুলো বিদেশীদের প্রতি তাঁর মোটেই অনুকম্পাবশতঃ নয়। এটা তাঁর হৃদয়ের কথা। যেমন—

ব্রিটিশের জয় জয় বল সব ভাই-রে।　　　এসো সবে নেচে কুঁদে বিভুগান গাইরে॥

অর্থাৎ আমাদের মনোবৃত্তি এমনই হয়ে গিয়েছে যে ব্রিটিশের দেওয়া মিথ্যা সুখানুভূতিতে ভুলে, স্বীয়সত্তা হারিয়ে, 'মনুষ্য' বলে পরিচয় দেওয়ারও অযোগ্য হয়ে পড়েছি। সেই জন্যেই তিনি অত্যন্ত দুঃখের সাথেই উপরোক্ত কথাগুলো বলতে বাধ্য হয়েছেন। "কোম্পানীর মুলুকে কি বর্গিগিরি খাটে ?" একথাও কিন্তু ইংরেজ-বিদ্বেষী মনোভাব। কারণ, সামান্যসংখ্যক সৈন্য দ্বারা দুর্দ্ধর্ব ব্রিটিশকে সায়েস্তা করা যায় না। চাই অধিকসংখ্যক সৈন্য, অটুট মনোবল এবং সর্বোপরি চাই প্রত্যেকর অযাচিত সহযোগিতা।

আবার, নীলকরদের অত্যাচারে জর্জরিত বাঙলার জনগণের সে কি দুঃসহ অবস্থা, যা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটকে। সেই অকথ্য অত্যাচারের দিকেও তাঁর কবি-হৃদয় কেঁদে উঠেছিল। তাই মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেম—

মা, তুমি কল্পতরু, আমরা সব পোষা গরু
শিখিনি শিং বাঁকানো,
কেবল খাবো-খোলবিচালি ঘাস।

আর,—

আমরা ভুসি পেলেই খুসি হবো
ঘুসি খেলে বাঁচবো না।

ব্যঙ্গের এই কষাঘাতে ইংরেজ চটে গেল। সুবিচার অপেক্ষা নীলকরেরা আরও ব্যাপকভাবে যক্ষক হয়েও ভক্ষক হয়ে উঠল। নিরীহ প্রজাসাধারণাক ব্যঙের মত তারা "টপাটপ এমনি করে গ্রাস।" বলাবাহুল্য, দেশের এই স্বেচ্ছাচারিতার জন্য তিনি দায়ী করেছেন তৎকালীন ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজকে ; যারা—

ঘরের ঢেঁকি কুমীর হয়ে ঘটায় কত অঘটনা।
এরা লোনা জল ঢোকালে ঘরে আপন হাতে কেটে খানা॥

ক'লকাতার যে অঞ্চলে বিদেশীদের স্থায়ী আবাসভূমি গড়ে উঠেছিল সেখানেই যে তাদের আচার ব্যবহারেরও সম্যক্ স্ফূর্তি ঘটবে এমন মনে হওয়া স্বাভাবিক। ক'লকাতার তথাকথিত অঞ্চলে ইংরেজদের খানা পিনা, আমোদ, হট্টগোল ইত্যাদি মাত্রাতিরিক্ত কটুক্তিপূর্ণ কাজ চলত। সেই মজলিসগুলোতে যে এদেশীয় বশংবদেরা সুযোগবুঝে জুটে গিয়েছিল সেটাও অস্বাভাবিক ছিল না। কেননা, এ কথা পরিচিত যে, বাঙালী সুযোগ সন্ধানী—ভালোর দিকেই হোক, আর মন্দর দিকই হোক। তার মানস চরিতার্থ হলেই হ'ল। তাই ইংরেজদের মদ্যপাত্রে ঠোকাঠুকি করে তারা নিজেদের ধন্য মনে করত। আর "ডিয়ার ম্যাডাম ইউ টেক দিস্ গ্লাস" বলে বিবিদের সঙ্গে রঙ্গ রসিকতা করত। শুধু কি তাই, সাহেবদের সাথে কিঞ্চিৎ মদ্য পানের পর কুৎসিত উন্মাদ নৃত্যে "হিপ্ হিপ্ হুররে ডাকে" সভাস্থল উচ্চকিত করে তুলত। ক'লকাতার এমনধারা সমাজ যে পরবর্তী এদেশীয় বংশধরদের সাংঘাতিক পরিমাণে বিড়ম্বিত করবে, এই আশংকাতেই কবির মন শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। সাহেবদের নাচের সেই বিকৃত ঢংটাও তিনি তাঁর কবিতায় এমনভাবে ধরে রেখেছেন যে পড়লে মনে হয়, আমরা যেন গুপ্তকবির কালের ক'লকাতায় ফিরে গিয়েছি এবং নাচটি প্রত্যক্ষ করছি।—

গুড়ু গুড়ু গুম গুম লাফে লাফে তাল
তারা রারা তারা রারা লালা লালা লাল॥

সেই সাথে কৃত্রিম সাহেবিয়ানা অধ্যুষিত বাঙালী বাবুদের নিছক ইংরেজপ্রীতি কবির লেখনীতে হাস্যকর হয়ে উঠেছে—

গোচ গাচে বাবু হল, পচালাল চেয়ে।
কোনরূপে পিত্তিরক্ষা এঁটোকাঁটা খেয়ে॥

সমাজকে তার স্বখাত-সলিলে নিমজ্জনের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে বোধকরি এহেন তীব্র লেখনীরই প্রয়োজন হয়েছিল। বলতে পারি, তাঁর এই তীব্র লেখনীর জন্যই যেন আজকাল আমরা অনেকটা সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রা নির্দ্বিধায় নির্বাহ করছি। আর এও বলতে পারি, এ-যুগেও কয়েকজন ঈশ্বর গুপ্তের জন্ম হলে আমাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সুখ-দুঃখকে ঐরূপ অকাট্যভাবে রূপায়িত করতে পারতেন। অতএব, বাঙালার সাংস্কৃতিক ও তার দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার জন্য যতটুকু প্রয়োজন সেই প্রয়োজনটুকু আমার মতে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কলকাতার

বিচিত্র পরিবেশে বসে নির্দ্বিধায় রূপায়িত করে আমাদিকে সতর্ক করে দিয়ে গেছেন। এই সতর্কীকরণই তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য ছিল। শুধু তাই নয়, এতক্ষণ যা আলোচনা করা হল, তা থেকে বুঝা যায় তিমি কৃত্রিমতাকে কখনো প্রশ্রয় দিতেন না। যা স্বাভাবিক, যা সত্য, যা জীবন-যাত্রায় বিঘ্ন উৎপাদন করতে পারে না, তাকেই তিনি বেশী পছন্দ করতেন। গুপ্তকবির শিষ্য বঙ্কিমচন্দ্র এ সম্বন্ধে লিখেছেন—"ঈশ্বর গুপ্ত মেকির বড় শত্রু, মেকি মানুষের শত্রু এবং মেকি ধর্মের শত্রু। ভণ্ডের ধর্মকে ধর্ম বলিয়া জানিতেন না।...যে ধর্মে ঈশ্বরানুরাগ ছাড়িয়া পানাহারকে ধর্মের স্থানে খাড়া করিতে চাহিত—তিনি তাহার শত্রু।"

প্রাচ্য চিন্তাধারায় কবিপ্রতিভার মূল্যায়ন

মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

সহস্রাধিক বছর ধরে সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের ইতিহাসে কাব্যমার্গের নানা দিক নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। কাব্যগঠনের নানা উপায়, কাব্যকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করার জন্য বিভিন্ন কলা-কৌশল প্রভৃতি বিষয়ে সংস্কৃত আলংকারিকেরা নিজ নিজ অভিমত উপস্থাপিত করেছেন। কাব্যাঙ্গিকের প্রশস্ত আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে একাধিক আলংকারিক কবিপ্রতিভা বিষয়ে তাঁদের স্ব স্ব বৈচিত্র্যপূর্ণ মন্তব্য ব্যক্ত করেছেন। কাব্যকে সৌন্দর্যভূষিত করার বিভিন্ন উপায় থাকা সত্ত্বেও যে উৎকৃষ্ট কবিপ্রতিভা না থাকলে কাব্যের উৎকর্ষসম্ভাবনা সমূলেই বিনষ্ট হয়—এ বিষয়ে আলংকারিকেরা ছিলেন একমত। প্রথমে প্রয়োজন সুষ্ঠু প্রতিভাসম্পন্ন কবির, তাঁর হাতেই কাব্যের চরমোৎকর্ষ, অন্যথায় কাব্যের কাব্যত্ব অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়—এই-ই ছিল প্রাচীন অলংকারশাস্ত্রবিদ্‌দের সাধারণ ধারণা।

প্রাচীন ভারতে প্রতিভাসম্পন্ন কবির স্থান ছিল অতি সম্মানের। কাব্যনির্মাণক্ষমতাকে এক বিশেষ ঈশ্বরীয় শক্তি বলে গণ্য করা হত। কিন্তু 'মন্দকবি' অর্থাৎ উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা ব্যাপারে যাঁর চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতো, সাধারণের চোখে তিনি ছিলেন অশ্রদ্ধেয়। আলংকারিক ভামহ বলেছেন—"রহিতা সৎকবিত্বেন কীদৃশী বাগবিদগ্ধতা ?" অর্থাৎ সৎকবি ছাড়া বাগ্‌বৈদগ্ধ্য কেমন করে সম্ভব ? এই যে প্রতিভা—এ মানুষের সহজাত। একে তৈরী করা যায় না। এই প্রতিভাকে ভামহ কাব্যসৃষ্টির প্রধান উপায় বলে মনে করেন। তাঁর মত এই যে, প্রতিভাহীন লোকেরা শিক্ষকের সহায়তায় অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ শিখতে পারে, কিন্তু কাব্য একমাত্র প্রতিভাসম্পন্ন লোকের দ্বারাই সৃষ্ট হতে পারে। "কাব্যং তু জায়তে জাতুকস্যচিৎ প্রতিভাবতঃ।"

অবশ্য কেবলমাত্র প্রতিভাসম্পন্ন কবি হলেই যে সব সময়ে উৎকৃষ্ট কাব্যরচন সম্ভব, তা নয়। সুকবি হতে গেলে প্রতিভাসম্পন্ন কবিরও কয়েকটি শাস্ত্রে বুৎপত্তি প্রয়োজন। ভামহের মতে—

> "শব্দচ্ছন্দোঽভিধানার্থা ইতিহাসাশ্রয়া কথাঃ।
> লোকো যুক্তি কলাশ্চেতি মন্তব্যাঃ কাব্যযোনয়ঃ॥

—শব্দজ্ঞান, ছন্দ, অভিধান, ইতিহাসিক কথা, লোকজ্ঞান (worldly affairs)। যুক্তি (logic) এবং কলাবিদ্যা (fine arts)—এই সমস্ত শাস্ত্রে বুৎপত্তি কাব্যনির্মাণের সাহায্যকারী। এ সব ছাড়া প্রয়োজন কাব্যরচনায় নিয়মিত অভ্যাসের। শব্দ ও অর্থের সুষ্ঠু জ্ঞান অর্জন ক'রে। উপযুক্ত শিক্ষকের কাছে রচনাপদ্ধতি শিক্ষা করে এবং সবশেষে প্রখ্যাত কবিদের রচনা যত্নসহকারে অনুশীলন ক'রে কাব্যরচনায় অগ্রসর হওয়া উচিত। এই কথায় ভামহ বলেছেন—

> শব্দাভিধেয়ে বিজ্ঞায় কৃত্বা তদ্বিদুপাসনাম্।
> বিলোক্যান্যনিবন্ধাংশ্চ কার্যঃ কাব্যক্রিয়াদরঃ॥

অতএব স্বাভাবিক প্রতিভা নিয়ে জন্মেছেন যে কবি, তাঁকে আবার বিভিন্ন শাস্ত্রাধ্যয়ন ও অনুশীলনের মধ্য দিয়ে সৎকবিরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। একেই ডঃ সুশীলকুমার দে বলেছেন—"in making a poet into a poet"।

'কাব্যাদর্শ' রচয়িতা আলংকারিক দণ্ডী ভামহের মতোই প্রতিভাকে কাব্যোৎপত্তির কারণ বলেছেন—

"নৈসর্গিকী চ প্রতিভা শ্রুতঃ চ বহুনির্মলম্।
অমন্দশ্চাভিযোগোৎস্যাঃ কারণং কাব্যসম্পদ॥

—অর্থাৎ সহজাত প্রতিভা, বহু পঠন-পাঠন এবং নিরলসভাবে চর্চার দ্বারা কবিত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। দণ্ডী অবশ্য ভামহক থেকে একধাপ এগিয়ে গিয়েছেন। তাঁর মতে স্বাভাবিক প্রতিভা না থাকলেও কাব্যরচনা সম্ভব। পূর্বজন্মের সংস্কারের অভাব কিংবা কবিপ্রতিভার দৈন্য থাকলেও যত্নসহকারে যদি কেউ বাগ্‌দেবীকে প্রসন্ন করার চেষ্টা করে তবে সে কিছুপরিমাণে সফল হতে পারে। কবি-খ্যাতিলাভেচ্ছুক ব্যক্তি পরিশ্রমের দ্বারা তাঁর কবি-প্রতিভার ন্যূনতা অবশ্যই কিছু পরিমাণে পূরণ করতে পারে এবং এইভাবে রসিকসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। এই ভাবই দণ্ডীর ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে এইভাবে—

"তদস্ততন্দ্রৈরনিশং সরস্বতী
শ্রমাদুপাস্যা খলু কীর্তিমীপ্সুভিঃ।
কৃশে কবিত্বেৎপি জনাঃ কৃতশ্রমাঃ
বিদগ্ধগোষ্ঠীষু বিহর্তুমীশতে॥"

প্রতিভা-ই কাব্যোৎপত্তির প্রথম এবং প্রধান কারণ—এ বিষয়ে অধিকাংশ আলংকারিক একমত। 'কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি' গ্রন্থে বামন প্রতিভাকে 'প্রতিভান' বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর মতে এই প্রতিভান-ই হলো কাব্যের বীজ। "কবিত্ববীজম্ প্রতিভানম্।" আর এই প্রতিভা হলো জন্মান্তরসংস্কারবিশেষ। প্রতিভা ছাড়া উত্তমকাব্য রচনা অসম্ভব। যদি পূর্বজন্মের সংস্কারবশে প্রাপ্ত প্রতিভা ছাড়া কাব্য রচিত হয়, তবে কবি উপহাসের পাত্র হন। বামনের এই মন্তব্যকে আরও জোরালো করে উপস্থাপিত করলেন 'কাব্যপ্রকাশ' রচয়িতা মম্মটভট্ট ও 'কাব্যানুশাসন' প্রণেতা হেমচন্দ্র। মম্মটভট্ট বামনের কথার প্রায় পুনরাবৃত্তি করে বলেছেন—

"শক্তিঃ কবিত্ববীজরূপঃ সংস্কারবিশেষঃ কশ্চিৎ যাৎ বিনা কাব্যং ন প্রসরেৎ প্রসৃতং বা উপহসনীয়ং স্যাৎ।" (কাব্যপ্রকাশ)

আচার্য রুদ্রট প্রাচীন অনেক আলংকারিকের মতো কাব্যনির্মাণের জন্য তিনিটি বিষয়ের উপর জোর দিয়েছেন,—শক্তি, ব্যুৎপত্তি ও অভ্যাস।—"কাব্যস্য করণে ত্রিতয়মিদং ব্যাপ্রিয়তে শক্তির্ব্যুৎপত্তিরভ্যাসঃ।" তিনি প্রতিভার সমার্থক শব্দ হিসেবে 'শক্তি'পদের প্রয়োগ করেছেন। রুদ্রটের গ্রন্থ কাব্যলংকারের টীকাকায় এই তিনটি পদের ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে—"তত্র শক্ত্যা শব্দার্থো মনসি সংনিধীয়তে। তয়োঃ সারাসারগ্রহণনিরাসৌ ব্যুৎপত্ত ক্রিয়েতে। অভ্যাসেন শক্তোরুৎকর্ষ আধীয়তে ইতি শক্ত্যাদিব্যাপারঃ।"—শক্তির দ্বারা মনে শব্দ ও অর্থের জ্ঞান সুদৃঢ়

হয়। শব্দ ও অর্থের মধ্যে যেটি প্রয়োজনীয় তাকে গ্রহণ এবং যেটি অপ্রয়োজনীয় তাকে বর্জন ব্যুৎপত্তির দ্বারাই হয়ে থাকে। আর অভ্যাসের দ্বারা শক্তির উৎকর্ষ হয়। রুদ্রটের মতে কবির শক্তি দু'রকম—সহজা ও উৎপাদ্যা, অর্থাৎ সহজাত ও অর্জিত। এদের মধ্যে প্রথমটিই শ্রেষ্ঠ, কারণ এর মধ্যে একটা স্বাভাবিক সৃষ্টিক্ষমতা থাকে; আর দ্বিতীয়টি ব্যুৎপত্তি ও অভ্যাসের দ্বারা কিছু পরিমাণে পুষ্ট হতে পারে। কাব্যনির্মাণের ব্যাপারে রুদ্রট প্রাচীন আলংকারিকদের অনুকরণ করেছেন মাত্র। কেবল একব্যাপারে তিনি কিছুটা মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। দণ্ডীর মতে প্রতিভা কখনো উৎপাদ্যা নয়, কিন্তু সহজাতা। তাই তিনি প্রতিভাকে বলেছেন 'নৈসর্গিকী'। কিন্তু রুদ্রটের মতে প্রতিভা ব্যুৎপত্তি ও অভ্যাসের দ্বারা 'উৎপাদ্যা'ও হতে পারে।

অতএব দেখা গেল অধিকাংশ আলংকারিক প্রতিভাকেই কাব্যকরণের প্রধান হেতু বলেছেন এবং এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বুৎপত্তি ও কাব্যাভ্যাস। 'কাব্যপ্রকাশ' রচয়িতা মম্মটাচার্য কাব্যোৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে বলেছেন—"শক্তির্নিপুণতা লোকশাস্ত্রকাব্যবেক্ষণাৎ। কাব্যজ্ঞশিক্ষয়াভ্যাস ইতি হেতুস্তদুদ্ভবে।"—প্রতিভা, লোকশাস্ত্র ও বিভিন্ন কাব্যাদিপাঠহেতু নিপুণতা এবং কাব্যাভ্যাস—এগুলিই হলো কাব্যোৎপত্তির হেতু। রাজশেখর তাঁর 'কাব্যমীমাংসা' গ্রন্থে বলেছেন—"সা (শক্তিঃ) কেবলং কাব্যে হেতুরিতি।" বাগ্‌ভট তাঁর 'অলংকারতিলক' নামক অলংকারগ্রন্থে প্রতিভাকে কাব্যহেতু বলেছেন এবং ব্যুৎপত্তি ও অভ্যাসকে প্রতিভার পুষ্টিকারী বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন—

"প্রতিভৈব চ কবিনাং কাব্যকরণকারণম্‌। ব্যুৎপত্ত্যভাসৌ তস্যা এবং সংস্কারকারকৌ ন তু কাব্যহেতু।"—প্রতিভা-ই হলো কবিদের কাব্যসৃষ্টির কারণ। ব্যুৎপত্তি ও অভ্যাস প্রতিভার সংস্কার-কারক, কিন্তু কাব্যহেতু নয়।

'রসগঙ্গাধর' রচয়িতা জগন্নাথও 'কবিগতা প্রতিভা'কে কাব্যের কারণ বলে অভিহিত করেছেন।

এখন এই 'প্রতিভা' কি? কোন্‌ বিশেষ বিষয়কে প্রতিভা বলে বর্ণনা করা হয়েছে? এর জবাবও আলংকারিকেরা দিয়েছে। প্রতিভার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিভিন্ন আলংকারিকেরা যা বলেছেন, তারই সারসংকলন করেছেন মহামহোপাধ্যায় P. V. kane তাঁর History of Sanskrit Poeties গ্রন্থে। সেখানে তিনি বলেছেন—"Pratibha is that power whereby the poet sees the subjects of his poem as steeped in beauty and gives to his readers apt language a vivid picture of the beauty he has seen. It is a power whereby the poet not only calls up in his reader's heart the impressions of faded experiences, but whereby he presents ever new, wonderful and charmiug combinations and relations of things never before experienced or thought by the ordinary man.

সংস্কৃত আলংকারিকদের মধ্যে প্রতিভা সম্বন্ধে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেছেন আলংকারিক ভট্টতৌত। তিনি তাঁর 'কাব্যকৌতুক' গ্রন্থে প্রতিভার সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন এইভাবে—

"প্রজ্ঞা নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভা মতা।"—নতুন নতুন ভাবে উন্মেষিত হয় যে বুদ্ধি তাকেই বলে প্রতিভা। এই প্রতিভার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে যিনি সুন্দরভাবে বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনা করতে পারবেন তিনিই হবেন কবি। "তদনুপ্রাণনাজীবদ্বর্ণনানিপুণঃ কবিঃ।" আর এই কবির সাহিত্যকর্মকে বলা হয় কাব্য।—"তস্য কর্মং স্মৃতং কাব্যম্।"

ভট্টতৌত এবং হেমচন্দ্র প্রভৃতি পরবর্তী আলংকারিক কবির সঙ্গে ঋষির তুলনা করেছেন। পার্থিব বিচিত্র জিনিষের মধ্যে যিনি সত্য-দর্শন করেন তিনি হলেন ঋষি। কবির মধ্যেও এই গুণটি থাকা চাই, তাছাড়া তাঁকে কল্পনাশক্তিরও অধিকারী হতে হবে। স্বচ্ছ দৃষ্টিশক্তির সঙ্গে যখন কল্পনাশক্তির মিশ্রণ হবে তখনই হবে সার্থক কবির জন্ম। ভট্টতৌতের মতে 'কবি' হবেন 'ক্রান্তদর্শী ঋষি'—যিনি অতীত ও ভবিষ্যৎকে মানসচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন। উৎকৃষ্ট প্রতিভা থেকে জাত যে কাব্য তা "lifts the veil from the hidden beauty of the wored and makes familiar objects be as if they were not familiar." (Shelley). ভট্টতৌতের মতের প্রতিধ্বনি করে তাঁর শিষ্য অভিনবগুপ্তও প্রতিভার সংজ্ঞা দিয়েছেন—"প্রতিভা অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞা।"

আনন্দবর্দ্ধন তাঁর 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থের চতুর্থোদ্যতে (fourth chapter) কবির প্রতিভা ও বিভিন্ন গুণাবলী নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। তিনি কবিকে বিশ্বস্রষ্টা প্রজাপতির সঙ্গে তুলনা করেছেন।

—"অপারে কাব্যসংসারে কবিরেব প্রজাপতিঃ।
যথাস্মৈ রোচতে বিশ্বং তথেদং পরিবর্ততে ॥
শৃঙ্গারী চেৎকবিঃ কাব্যে জাতং রসময়ং জগৎ।
স এব বীতরাগশ্চেৎ নীরসং সর্বমেব তৎ ॥"

অসীম এই কাব্যরূপ সংসারে কবিই হলেন প্রজাপতি। এঁর ইচ্ছামত সমস্ত বিশ্ব পরিবর্তিত হয়। কবি যদি কাব্যে শৃঙ্গাররসের বর্ণনা করেন তবে সমগ্র জগৎ রসপূর্ণ হয়। আবার কবি যদি রাগশূন্য হন, তবে সমস্ত জগৎ নীরস প্রতীত হয়।

প্রতিভাসম্পন্ন কবির হাতে কাব্যের উৎকর্ষ ক্রমপরিণতির দিকে স্বচ্ছন্দে এগিয়ে যায়। যেমন বসন্তকালে প্রাচীন গাছ নতুন পত্রপুষ্পে সুশোভিত হয়ে নতুনভাবে বিকশিত হয়, সেইরকম বহু অর্থ পূর্বপরিচিত হলেও কাব্যে রসপরিগ্রহ করে নতুনভাবে প্রতিভাত হয়।

"দৃষ্টাপূর্বা অপি হ্যর্থাঃ কাব্যে রসপরিগ্রাহাৎ।
সর্বে নবা ইবাভান্তি মধুমাস ইব দ্রুমাঃ ॥ (ধ্বন্যালোক)

আনন্দবর্দ্ধন বলেছেন—যদি প্রতিভাগুণ থাকে, তবে কাব্যার্থের কখনো বিরাম হয় না—'ন কাব্যার্থবিরামোঽস্তি যদি স্যাৎ প্রতিভাগুণঃ।' 'বিষমবাণলীলা' গ্রন্থে আনন্দবর্দ্ধন একটি প্রাকৃত শ্লোকের উল্লেখ করেছেন যার অর্থ হলো—"সুকবিদের বাণী এবং প্রিয়াদের ভাববিলাস সমূহ—ইহাদের অবধিও নাই এবং ইহাদের মধ্যে পুনরুক্তিও দেখা যায় না।"

'বক্রোক্তিজীবিত' গ্রন্থের লেখক আচার্য কুন্তক প্রতিভাকেই কাব্যোৎকর্ষের কারণ বলেছেন

তিনি বলেছেন—কাব্যের যা কিছু সৌন্দর্য সবই কবিপ্রতিভা থেকে উদ্ভূত।—"যৎকিঞ্চনাপি সৌন্দর্যং তৎসর্বং প্রতিভোদ্ভবম্।"

শক্তি (প্রতিভা) ও ব্যুৎপত্তি—এ দুইটিই কাব্যরচনার জন্য প্রয়োজন। কিন্তু দুটির মধ্যে শক্তিরই প্রাধান্য। ব্যুৎপত্তি থেকে শক্তির উৎকর্ষ সাধিত হয় মাত্র। আনন্দবর্দ্ধন একটি শ্লোকের সাহায্যে চমৎকার ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন—

"অব্যুৎপত্তিকৃতো দোষঃ শক্ত্যা সংব্রিয়তে কবেঃ।
যস্ত্বশক্তিকৃতো দোষ স ঝটিত্যবভাসতে॥

—ব্যুৎপত্তিহীনতার জন্য যে দোষ তা সুকবির প্রতিভার দ্বারা অবারিত হয়, কিন্তু প্রতিভা না থাকার জন্য যে দোষ তা সহজেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

অবশ্য কোনও কোনও আলঙ্কারিকের মতে কেবল ব্যুৎপত্তি ও অভ্যাসের দ্বারাও কবি হওয়া যায়। হেমচন্দ্র কবিকে তিনভাগে ভাগ করেছেন—শাস্ত্রকবি, কাব্যকবি ও উভয়কবি। এঁদের মধ্যে শাস্ত্রকবি হলেন যিনি বিভিন্ন শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করে কাব্যরচনা করেন। এ প্রসঙ্গে ভর্তৃহরি-রচিত 'ভট্টিকাব্যম্'-এর উল্লেখ করা হয়েছে। ব্যাকরণশাস্ত্র শিক্ষা দেওয়ার জন্যে এই কাব্য রচিত। এই শ্রেণীর কাব্য রসিক পাঠককে আকর্ষণ করতে পারে না। অতএব প্রতিভাহীন কবির রচনা কোনো ক্ষেত্রেই প্রাচীন ভারতীয় দৃষ্টিতে আদৃত হতে পারে নি।

সবশেষে কবিপ্রতিভা সম্বন্ধে প্রাচীন আলংকারিকদের একটি ধারণার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। আচার্য বামন তাঁর 'কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি' গ্রন্থে কবিপ্রতিভার উন্মেষের উপযুক্ত স্থান ও কাল সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—কবিকে সর্বপ্রথম চিত্তের একাগ্রতা আনতে হবে। এবং সেই একাগ্রতা নির্ভর করে উপযুক্ত দেশ ও কালের উপর। নির্জনস্থান কাব্যসাধনার নির্ভরযোগ্য ক্ষেত্র এবং রাত্রির চতুর্থ যামে অর্থাৎ শেষরাতের দিকে কাব্যচর্চ্চা করলে সুফল পাওয়া যায়।—"চিত্তৈকাগ্র্যমবধানম্। তদ্দেশকালাভ্যাম্। বিবিক্তো দেশঃ। রাত্রিযাম-তুরীয়ঃ কালঃ।" এই সব বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা থেকে প্রাচীন ভারতীয় মনীষার মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

নাট্য শিক্ষা

জাতীয় নাট্যশালার অন্যতম প্রধান কাজ যে নাট্যশালার বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে যথোপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবিষয়ে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই। এখন এই শিক্ষা কেমন হবে আলোচনার বিষয় তাই এবং বিতর্কের সূত্রপাতও সেইখানে।

প্রথমতঃ অভিনয় রীতি কেমন হবে এনিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। একপক্ষ স্বাভাবিক রীতির কথা তোলেন, অন্যপক্ষ বলেন আলঙ্কারিক রীতির কথা, তৃতীয় পক্ষের প্রতিপাদ্য সাংকেতিক—এমনি আরো কত কি, সংখ্যার হিসাবে হয়ত বর্ণমালায় কুলোবে না। এঁরা প্রত্যেকেই আপন আপন মতে দৃঢ়নিশ্চয় এবং এঁদের বিপক্ষরা যে অর্বাচীন এভাবটা সর্বদাই প্রকট। অথচ অভিনয় শেখার গোড়ার কথাই শেখানো বাহুল্য মনে করেন এঁরা, ফলে দু'এক জন শক্তিশালী নট ছাড়া বাকিরা কেবল ইত্যাদির দল ভারী করেন এবং চরম মুহূর্তে নাটককে মার খেতে হয়।

অভিনয়ের প্রথম কথা স্পষ্ট ও নির্ভুল উচ্চারণ আর যথাযথ স্বরপ্রক্ষেপ। শিক্ষার্থী নটদের এগুলি ঠিকভাবে করার শিক্ষা দেওয়া অতি আবশ্যক। কেমনভাবে তা দেওয়া সম্ভব, সে বিষয়ে আলোচনার উপযুক্ত স্থান এ প্রবন্ধ নয় আর তা দেবার ক্ষমতাও লেখকের নেই। ব্যাপারটা পুরোপুরি ব্যবহারিক এবং তা হাতে কলমে শেখানো দরকার। এখনো কিছু প্রাচীন নট আছেন যাঁরা এ বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারেন। জাতীয় নাট্যশালা অবশ্যই তাঁদের সাহায্য গ্রহণ করবেন। এ ছাড়া স্বরবিস্তারের প্রয়োজনে কিছু স্বর সাধনা, সুষ্ঠুপদক্ষেপের জন্য নৃত্য শিক্ষা এবং প্রয়োজনানুগ পেশী সঞ্চালন শিক্ষাও প্রয়োজন।

শেষের কথাগুলি পড়তে পড়তে নাট্যাভিজ্ঞ তথা বিদগ্ধ রসিকজনের যে ঠোঁট ওলটাচ্ছে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। কিন্তু এগুলির প্রয়োজনীয়তাকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। শিশিরকুমারের 'রঘুবীর' নাটক 'বিশ্বনাথ শক্তি দাও' বলে শেকল ছেঁড়ার দৃশ্য বা দিগ্বিজয়ীতে তাঁর নাদির শাহ যাঁরা দেখেছেন তাঁরা পেশী সঞ্চালন যে কতটা সহায়ক হতে পারে আর তার পক্ষে মত প্রকাশ করবেন নিশ্চয়। স্বামী-স্ত্রীতে দুর্গাদাসের ট্রে হাতে সোফা ডিঙানোও সুষ্ঠুপদ সঞ্চালনের নমুনা হিসাবে উদ্ধৃত করা চলে। স্বর বিস্তারের প্রসংগে শিশিরকুমারের সাক্ষ্য হল—অন্ততঃ আড়াই অক্টেভ গলা না উঠলে ঠিকমত অভিনয় করা যায় না। এটা হল সাধারণ অভিনেতাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় হিসাব, প্রধান অভিনেতাদের ক্ষেত্রে আরো কিছু বেশী হলেই ভাল হয়। এ ক্ষমতা স্বরসাধনা ছাড়া আয়ত্ত করা সম্ভব নয়।

কোন কোন শক্তিমান অভিনেতার ক্ষেত্রে অশিক্ষিত পটুত্বের দরুণ এ শিক্ষা হয়ত প্রয়োজন না হতে পারে কিন্তু সাধারণ অভিনেতাদের এ সব শিক্ষা না নিয়ে উপায় নেই। সেকালের দুর্বলতম

গ্রন্থিই যখন তার শক্তির পরিচায়ক তখন নাটকের দুর্বলতম অভিনেতার ক্ষমতা দিয়েই অভিনয়ের মান নির্ণয় করতে হবে। এই বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিশ্চয় অবান্তর বলা চলে না।

আজকের যুগে অজেয় সমরসম্ভারও যে শিক্ষিতের কাছে হার মেনে যায় তার প্রমাণ ত হালফিলই পাওয়া গেছে। নটদের ক্ষেত্রেও এ চিন্তা প্রযোজ্য, এ তথ্য ভুলে গেলে চলবে না। প্রতিটি অভিনয় শিক্ষার্থীর সাধারণ শিক্ষার দিকেও নজর দিতে হবে। এ ছাড়া বিশেষ শিক্ষা হিসাবে দেশ বিদেশের নাটক পড়ানো তথা আলোচনা ব্যবস্থাও করা দরকার। প্রসঙ্গতঃ বাংলা দেশের নটদের বাংলা ও সংস্কৃত নাটক সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞান থাকাটা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

এতক্ষণ পর্যন্ত নটদের কথা বললাম, পরিচালক বা প্রয়োগপ্রধানদের আরো কিছু বেশী জানা দরকার—এর মধ্যে মনস্তত্ব ছাড়াও বিভিন্ন আঙ্গিকের সুষ্ঠু সমন্বয় কি ভাবে করা সম্ভব তা নিয়ে বিচার বিবেচনার সুবিধার্থে আলোক সম্পাত, শব্দ নিয়ন্ত্রণ, সংগীতানুষংগ, পশ্চাতপট প্রভৃতির মোদ্দা কথাটা জানা একান্ত প্রয়োজন।

আংগিক বা অনুসংগের ক্ষেত্রে স্ব-স্ব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়াটাও অতি প্রয়োজনীয় সুতরাং সে বিষয়ে কিছু বলা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু আর একটি জিনিস না থাকলে বিশেষ অজ্ঞ বনে যাবেন এ কথা নিশ্চয় বলা চলে। এই অতিরিক্ত বস্তুটি হচ্ছে পরিমিতি বোধ।

অনেক সুসৃষ্টিও এই পরিমিতি বোধের অভাবের জন্য জনচিত্তে আশানুরূপ দাগ কাটতে পারে না। যেমন ধরা যাক, কোন একটি গানের কথা ও সুর খুবই মনোহর কিন্তু তার ব্যবহার পরিবেশানুগত নয় ফলে এর আবেদন মাঠে মারা গেল। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাপসীতে রবীন্দ্র সংগীতের ব্যবহারের কথা বলা যায়। রবীন্দ্র সংগীতানুরাগীরাও স্বীকার করেছেন যে, গানগুলি নাটকের প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়নি বলেই তাদের পূর্ণ রসাস্বাদন তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় নি।

এখানে পরিমিতি বোধের অভাবই দেখা গেল। এসব ক্ষেত্রে অন্য গান বা গানের অংশ-বিশেষ হয়ত ব্যবহার করা চলত। একটি দৃষ্টান্ত (কাল্পনিক) দেওয়া যাক—নায়ক-নায়িকার দেখা হয়েছে অনেকদিন পর—দু'জনের বিচ্ছেদের কালে অনেক দুঃখ কষ্ট, ঝড়-ঝাপটা গেছে দু'জনের উপর দিয়ে—পুনর্মিলনের মুহূর্তে যদি নেপথ্য থেকে শোনানো হয়—শতেক বরষ পরে বঁধুয়া মিলল ঘরে রাধিকার অন্তরে উল্লাস। হারানিধি পাইনু বলি হৃদয়ে লইল তুলি রাখিতে না সহে অবকাশ। —তাহলে দু'জনের মনের ভাবটি দর্শকের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে; অতিরিক্ত ব্যঞ্জনার প্রয়োজন হয় না। সংগীত পরিচালক যদি এখানেই থেমে যান তাহলে তাঁর পরিমিতি বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি যদি পুরো গানটা গাওয়ান তাহলেই রসাভাব ঘটে।

আবার ধরা যাক, নায়িকার মনে একটা প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব চলেছে, নেপথ্যে দূরাগত ঝড়ের শব্দ দিয়ে তা বোঝানো হল; নায়ককে দেখে ক্ষোভ ভাষা পেল দেখা দিল বিজলী ঝলক; নায়িকা ভেঙে পড়ল, অভিমানে নাবল বর্ষা, গান শোনা গেল—দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই নামল, বক্ষের দরজায় বন্ধুর রথ সেই থামল॥

এখানে সংগীত পরিচালক, শব্দ নিয়ন্ত্রক তথা আলোক সম্পাতকারী সকলেরই মিলিত

প্রচেষ্টায় একটি সুন্দর ছবি ফুটে উঠতে পারে যা নাটকীয় ঘটনাকে সাহায্য করবে। কিন্তু কোন পক্ষে পরিমিতি বোধের বিন্দুমাত্র ত্রুটি থাকলে সমস্ত ব্যাপারটাই বিশ্রী হয়ে দাঁড়াবে।

জাতীয় নাট্যশালার শিক্ষাক্রম আলোচনা প্রসংগে উপরিউক্ত কথাগুলি কোন কোন রসিকজনের অবান্তর মনে হতে পারে কিন্তু আজকের দিনে প্রায় প্রতিটি নাট্যানুষ্ঠানে এই পরিমিতি-বোধের অভাব এত বেশী প্রকট যে ভবিষ্যত প্রয়োগ প্রধানদের এ বিষয়ে সাবধান হওয়াটা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। আর সেই সাবধানতা সম্বন্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণের জন্যই এত কথার অবতারণা।

জাতীয় নাট্যশালা প্রসংগে পূর্ব আলোচনার শেষে যে কথা বলা হয়েছে আবার সেই কথাই বলি পূর্ণাংগ রূপরেখা উপস্থিত করা হচ্ছে না। এটি কেবল মাত্র প্রাথমিক খসড়া, অন্যান্য রসিকরা এনিয়ে আলোচনা করে এই খসড়াকে পূর্ণতা দেবেন এই প্রত্যাশায় একে উপস্থিত করছি।

আজকে জাতীয় নাট্যশালার প্রয়োজনীয়তা বর্তমানের মাৎসন্যায় দূর করার জন্য আরো বেশী অনুভূত হচ্ছে বলা চলে। এ অবস্থায় আর দেরী করে কাজে নেবে পড়বার সময় বোধহয় এসে গেছে। রসিক জন কি বলবেন ?

রবি মিত্র

রক্তকরবী নাটকের গান

নাটকীয় ঘটনার প্রাচুর্য যখন দর্শক মনে একটা একঘেয়েমির সৃষ্টি করে, যখন সব নীরস কাহিনীপুঞ্জ বক্ষে মনে হাত থাকে, যখন নাট্যপিপাসুর হৃদয় প্রার্থনা করে অন্য কোথা, অন্য কোনখানে, অন্য কিছুর জন্য তখনই নাট্যপিপাসু চঞ্চল চাতকের কাছে নাট্যকার স্ফটিক জলের মত বর্ষণ মেলে ধরেন। সুর ছাড়া প্রাণ নেই। তাই ঘটনা প্রাচুর্যের মৃন্ময় সমারোহের মধ্যে চিন্ময় প্রাণকে আহ্বান করার জন্যেই যুগ যুগান্তর ধরে নাট্যকার সুরের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে গিয়েছেন। আর এই সুরের ইন্দ্রজালই ব্যাপকভাবে নাটকীয় সঙ্গীত বলে অভিহিত হয়েছে। সংলাপের সুনিশ্চিত বাস্তবতা এবং ঘটনার নিছক বস্তুধর্মিতার নিরবচ্ছিন্নভাবে কোন নাটকে আত্মপ্রকাশ করলে রসের ব্যঞ্জনার অবকাশ থেকে যেত বেশ কিছুটা। তাই নাট্যসৃষ্টির উষা কালেই সঙ্গীত সংযোজনার সুসহ প্রচেষ্টা ছিল নাট্যকারের মনে। সেকালের যাত্রাতে ছিল সঙ্গীতের সীমাহীন প্রাচুর্য। চরিত্র বা ঘটনাধর্মী নাটকেও নাট্যকাররা সঙ্গীতের প্রাধান্য দিয়েছেন। আর তত্ত্বাশ্রয়ী, ভাব প্রধান নাটকে তো গানের গ্রাম ও নগর গড়ে উঠেছে যত্রতত্র।

রক্তকরবী তত্ত্বাশ্রয়ী নাটক। এখানে সঙ্গীতের একটা প্রধান ভূমিকা লক্ষণীয় রূপ লাভ করেছে। সঙ্গীত রক্তকরবীকে দশ দল মেলে বিকাশে করেছে অনিবার্য সহায়তা।

কিন্তু রক্তকরবী সঙ্গীত বহুল নাটক নয়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতবহুল নাটক বলতে যেগুলি অধিকতর উল্লেখ্য মর্যাদার দাবীদার রক্তকরবী অবশ্যই সে দাবী নিয়ে পাঠকের দরবারে উপস্থিত হয় না। এতে সামান্য কয়েকটি মাত্র গান আছে। এবং একই গানের বিচিত্র কলি বিভিন্ন সময়ে গীত হয়েছে। সঙ্গীতবহুল না হলেও নাটকটি গীতিধর্মী। পাত্র পাত্রীদের সংলাপের মধ্যেই রয়েছে সংগীতের সীমাহীন মূর্চ্ছনা। রয়েছে অসাধারণ ছন্দময়তা। অনুপম লিরিক ধর্মিতা। নিতান্ত সর্দারের মুখেও গুরুদেব কাব্যিক ভাষা ব্যবহার করেছেন। সম্ভবত সংলাপের এই গীতিধর্মের জন্যই নাটকটিতে অধিক গানের প্রয়োজন হয় নি। একটি গান আবহসঙ্গীত রূপে রয়েছে। আর কয়েকটি গান বিশু ও নন্দিনীর কণ্ঠে স্থান পেয়েছে। আর এই গানের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে কোন গানই এক ঝোঁকে গীত হয় নি। সংলাপ ও ঘটনায় অন্তর্লীন থেকে একটি সুরের তরঙ্গ দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে। পৌষের যে পূর্ণতার গান নাটকখানিতে আবহসঙ্গীতের মত রয়েছে, সেই গানটি রাজার কানে দুয়ার খোলার বাণী মর্মরিত করে দিয়েছে। এবং নাটকের যবনিকার সাথে সাথে সেই একই সুর অনুরণিত হয়েছে। অন্যান্য নাটকে যেমন গান এসেছে কোন মুহূর্ত বা কোন বিশেষ পরিবেশ বা সিচুয়েসানকে বোঝাবার দায় নিয়ে, রক্তকরবীতে গান দেখা দিয়েছে নাটকের মূল ভাবোপকরণের সাথে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হয়ে। অর্থাৎ কিনা

রক্তকরবী নাটকের কোন গানই একক নয়, বরং তারা ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ।

নাটকে গানের রাজা বিশুপাগল। ফাল্গুনী নাটকের ঠাকুর্দা, প্রায়শ্চিত্তের ধনঞ্জয় বৈরাগী যেমন সঙ্গীতের মাধ্যমে নাটকের মূলভাব কেন্দ্রের দুয়ার মেলে দিয়েছে। এই নাটকেও বিশু তেমনি দুঃখব্রতী প্রেমের সাধনাকে সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রমূর্ত করে তুলেছে। নন্দিনীর পৃথক কোন গান নেই। তার গান বিশুর কাছেই শেখা :

পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে আয়রে চলে
আয় আয় আয় আয়।

এই গানটি অন্তর বাহিরে সুর সূত্ররূপে সমগ্র নাটকখানিকে গ্রথিত করেছে। পৌষের ডাক, পাকা ফসলের আহ্বান, বসুন্ধরা জননীর ডাক। যম পুরীর যন্ত্রবদ্ধ জীবনের শূন্যতা ও শুষ্কতা প্রকটিত করে তুলে মাটির আঁচলে ছড়িয়ে পড়া রোদের সোনার মাধুর্য এখানে বন্ধনমুক্তির গান—

"মাঠের বাঁশি শুনে শুনে আকাশ খুশি হল।
ঘরেতে আজ কে রবে গো? খোলো দুয়ার খোলো"

বাইরের প্রকৃতির উদার আহ্বান যন্ত্রবদ্ধ জীবনে যে বিচিত্র আলোড়ন জাগে এ গানটিতে ছড়িয়ে আছে তারই মধুরিমা। নন্দিনী তার হাতখানি রিক্ত করে দিয়ে যখন পৌষের ডাকে সাড়া দিয়েছিল, এই রাঙা আলোর মশালটি যখন রাজার প্রণয় পথের দীপশিখা রূপে রূপান্তরিত হল নাটকের শেষ পর্যায়ে আর আর একবার এই সুর ধ্বনিত হয়ে উঠেছে, "ধূলার আঁচল ভরেছে আজ পাকা ফসলে।'

দুর্গমের অভিসারে যে যাত্রা। সে যাত্রা হতাশাদগ্ধ নয়, আশ্বাস ভরা। পৌষের ডাক নয়, পূর্ণতার আহ্বান। এ ডাকে ধ্বংসের মশাল জ্বলে না। জ্বলে আলো—দাত্রী দীপবর্ত্তিকা। তখন সোনা মৃত্তিকার গর্ভে থাকে না। ধূলোর আঁচলে প্রাণের ফসল রূপে সহজ সাধনায় বাঞ্ছিত ফল আপনার হয়ে ওঠে। পৌষের ডাক প্রকৃতির আহ্বান, যান্ত্রিকতার স্থলে কৃষিমূলক সভ্যতার সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা। নাটকটির মূল তাৎপর্য গূঢ় সাংকেতিকতা, এই গানটিতে প্রকাশ পেয়েছে। এই গানটি এই নাটকের ধ্রুবসঙ্গীত। ইংরেজীতে যাকে বলে Persistent Background Music.

এই নাটকে বিশুর গানগুলি মুখ্যত মুক্তিসঙ্গীত। যন্ত্রবদ্ধ জীবনের কৃত্রিম পরিবেশ পরিহার করে সহজ প্রাণের লাবণ্যময় জীবনানন্দে বিশু উল্লাসিত। নন্দিনী তার গানের ভাণ্ডার খুলে দিয়েছে। তাই তার গানে চিরন্তনী জীবনশ্রী বন্দনার সুর। যক্ষপুরীর অসুন্দর জীবনে বিশু সুন্দরের ধ্যান করে। এই সুন্দরই তার স্বপনতরীর নেয়ে। সে কখনও আসে প্রাণ গলানো মধুরূপে, কখনও আসে চোখ ঝলসানো রুদ্ররূপে। বিশু গায়—

"পাগল পালে নেশার হাওয়া
পাগল পরাণ চলে গেয়ে।
... ...
তোমার ঘোমটা তুলে দাও,
তোমার নয়ন তুলে চাও
দাও হাসিতে মোর পরাণ ছেয়ে।"

এই হল সুন্দরের মধুমূর্তি। কিন্তু সুন্দরই আবার রুদ্রমূর্তিতে প্রকাশ পায়। বিশু গেয়েছে—

"সে যে চিতার আগুন গালিয়ে ঢালা……"

যান্ত্রিক সভ্যতায় শ্রমিকদের মত্যাসক্তি প্রাণহীন যন্ত্রের প্রভাবে এই রূপক সঙ্গীতটিকে বিশু মুক্তির পথ নির্দেশ করছে এবং চরম দুঃখের মধ্য দিয়ে পরম প্রাপ্তির ইঙ্গিত দিয়েছে, সে নির্ভীকভাবে গেয়েছে— "তবে আসুক না সে তিমির রাতি……"

কিন্তু বুঝেছিল পরমপ্রাপ্তির জন্য চরমতম দুঃখের প্রয়োজন আছে। সংসারে এমন দুঃখও আছে, সে দুঃখকে ভোলার চেয়ে আর বড় দুঃখ নেই। বিশুর ব্যর্থ প্রেমের গানগুলি এই তাৎপর্যে ভরা। নন্দিনী তার জীবনে চরম আদর্শ। সে জন্য নন্দিনী বিশুর কাছে ঘুমভাঙানিয়া, দুঃখ জাগানিয়া, অগমপারের দূতী। দুঃখব্রতের কঠিন সাধনার গান বিশুর কণ্ঠে তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছে। বিশু গেয়েছে— "ও চাঁদ চোখের জলে লাগল জোয়ার

দুখের পারাবারে,

হল কানায় কানায় কানাকানি

এই পারে ওই পারে।"

এই সঙ্গীত সীমা অসীমের বিরহদ্বন্দ্বের অমৃতময়ী বাণী। একটি আশ্চর্য প্রেম সঙ্গীত। নন্দিনীকে বিশু এমন একটি প্রেম সঙ্গীত শিখিয়েছিল যাতে মকররাজের মজ্জায় শিহরণ জেগেছিল। "ভালবাসি, ভালবাসি" এই গানটি রাজা সহ্য ক'তে পারেন নি। কেননা, সেই প্রেমসঙ্গীত ছিল পরম বিরহের বেদনায় গাথা —সেই সুরে সাগর কূলে বাঁধন খুলে

অতল রোদন উঠে দুলে।

রাজার শূন্যজীবনে, অতলস্পর্শী বেদনাসাগরের রোদনে ঢেউ তুলেছিল এই সঙ্গীতে।

নন্দিনী বিশুর কাছে পথ চাওয়া গান শুনেছিল। জীবনতন্ত্রী ব্যাকুল প্রতীক্ষা করেছিল অনন্ত যৌবনের জন্য। এ যৌবন যুগে যুগে জীবনতন্ত্রী প্রত্যাশায় পথের প্রতীক্ষা করে। সংকীর্ণ স্বার্থপরতার আবরণ উন্মোচিত হলে জীবনে যৌবনে হয় রাখীবন্ধন। বিশু সেই আদর্শকে তার শেষ সঙ্গীতটিকে সুন্দরভাবে অভিব্যক্ত করে তুলেছে।

"যুগে যুগে বুঝি আমায় চেয়েছিল সে।"
… … … …
"আজ ওই চাঁদের মরণ হবে আলোর সঙ্গীতে
রাতের মুখের আঁধারখানি খুলবে ইঙ্গিতে।

শুক্লারাতে সেই আলোতে
দেখা হবে, এক পলকে
সব আবরণ যাবে যে খসে।
সেই যেন মোর পথের ধারে রয়েছে বসে।"

বিশুর সঙ্গীতগুলির মধ্যে রক্তকরবী নাটকের রূপকাতিরিক্ত সংকেতের ব্যঞ্জনা রয়েছে। নাটকীয় সংলাপগুলি কীর্তনগানের আখরের মতন সঙ্গীতগুলির অর্থকে সুপ্রকাশ করেছে। জালের আড়ালে রাজা এবং নাটকে অনুপস্থিত রঞ্জন যেমন কথার ধারক বিশুর সঙ্গীত সেই মর্মকথারই বাহক। সুরে ও বাণীতে নাটকীয় ভাবরস বিশুই উজ্জ্বল করে তুলেছে।

সুখররঞ্জন চক্রবর্তী

নাট্যবোধ ও নাট্যকার মধুসূদন ॥ রবীন্দ্রনাথ সামন্ত। গ্রন্থজগৎ; পণ্ডিতিয়া টেরেস, কলিকাতা-২৯। মূল্য : চার টাকা।

সাধারণ পাঠকের কাছে মধুসূদনের পরিচয় কবি হিসেবে। অধিকাংশ পাঠক জানেন, তিনি মেঘনাদ বধ মহাকাব্যের মহাকবি,—তিনি বীরাঙ্গনা পত্র-কাব্যের শক্তিমান স্রষ্টিকর্তা। বিদগ্ধ বাংলা সাহিত্য সমালোচকদের স্বীকৃতি অনুযায়ী মধুসূদন উনিশ শতকীয় আধুনিক বাংলা কাব্য আন্দোলনের পথিকৃৎ। ব্যস! এই পর্যন্ত। মধুসূদনকে উনবিংশ শতাব্দীর নব্য-ভাবনার কাব্য-সিংহাসনে বসিয়ে দিয়েই আমরা আমাদের কর্তব্য সম্পাদনের কৃতকার্যতায় গৌরবান্বিত হয়ে আত্ম-সন্তুষ্টির শান্ত সমুদ্রে ডুব দিয়েছি; তাঁর মাথায় কবির গৌরব মুকুট পরিয়েই তাঁর ঋণ পরিশোধের চেষ্টা করেছি। মধুসাহিত্যের শতাধিক বছরের আলোচনা আমাদের মত সাধারণের দৃষ্টিকে মধুসূদনের কাব্য-জগতের দিকচক্রবালকে অতিক্রম করিয়ে এমন কোন অন্য জগতের অভ্যন্তরে খুব বেশি একটা প্রসারিত করে দিতে পারে নি, যেখানে মধুসূদনকে আমরা অগ্নিবিহঙ্গের মত স্বীয় প্রতিভার দ্যুতিতে প্রোজ্জ্বল দেখতে পাই,—যেখানে দেখতে পাই অন্য একটি জগতের অধিকর্তা হিসেবে।

রবীন্দ্রনাথ সামন্তই প্রথম তাঁর 'নাট্যবোধ ও নাট্যকার মধুসূদন' গ্রন্থের মধ্যে সেই মহৎ প্রচেষ্টার সূত্রপাত বেশি করে করলেন। মেঘনাদ বধ কাব্য রচনার পূর্বেই মধুসূদন যে বাংলায় নাটক রচনার মধ্য দিয়ে একটি স্বতন্ত্র জগতের স্রষ্টিকর্তা ও সম্রাটের পদাধিকারী হয়েছিলেন, আলোচ্য গ্রন্থের মধ্যে সেই কথারই সুষ্ঠু-সুন্দর আলোচনা করেছেন লেখক। বোঝাতে চেয়েছেন মধুসূদন একাধারে কবি এবং নাট্যকার; তাঁর প্রতিভার মধ্যে কবি ও নাট্যকাব্যের দ্বৈত সত্তার সগুণ অস্তিত্বের অবস্থিতি ছিল সুপ্রচুর পরিমাণে। অথচ এতদিনের সমালোচনার নাট্যকার মধুসূদনের ব্যাপক স্বীকৃতিলাভ ঘটেনি কোথাও। রবীন্দ্রনাথ সামন্ত তাঁর তীক্ষ্ণ মননশীলতা এবং স্বচ্ছ বিচার বুদ্ধির আলোক প্রক্ষেপের সাহায্যে মধুসূদনের মনোজগতটিকে আলোকোজ্জ্বল করে এই প্রথম আমাদের মনকে নাট্যকার মধুসূদনের প্রতি গভীরভাবে শ্রদ্ধাশীল করে তুললেন; মধুসূদনকে নতুনভাবে চিনতে ও চিন্তা করতে শেখালেন। এজন্যে তিনি সহৃদয় পাঠক সাধারণের আন্তরিক অভিনন্দন লাভের যোগ্য।

আলোচ্য গ্রন্থটি লেখকের পরিকল্পিত 'নাট্যবোধ ও বাঙালী নাট্যকার' গ্রন্থের একটি অংশ বিশেষ। সমালোচনা হল পূজা—রবীন্দ্রনাথের এই নির্দেশ মান্য করে নাট্যকার মধুসূদনের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন লেখক। কিন্তু কোথাও তাঁর আলোচনা অন্ধ আবেগে একদেশদর্শী হয়ে ওঠেনি। নাট্যরচনার ক্ষেত্রে মধুসূদনের ত্রুটি ও ব্যর্থতার দিকটিও তুলে ধরেছেন, অবশ্য

সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও জানিয়েছেন, নাট্যরচনার ক্ষেত্রে মধুসূদনের যতটুকু অসফলতা তার জন্যে তাঁর প্রতিভা বা নাট্যবোধের দুর্বলতা দায়ী ছিল না। এর জন্যে দায়ী নাট্যকায়ের বাধা যা মধুসূদনকে আঘাত করেছিল। "অতিরিক্ত মঞ্চমুখিনতা তাঁর নাট্য সাহিত্যের অকাল মৃত্যুর কারণ।" এই বাধাকে যদি মধুসূদন দুর্জয় মানসিক শক্তির সাহায্যে অতিক্রম করতে পারতেন [যা আর্থিক প্রয়োজনের খাতিরের তিনি পারেন নি বলে আমার মনে হয়] তা হলে তিনিই হতেন সর্বকালের বাংলা নাট্যসাহিত্যেব সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার। কারণ মধুসূদনের "নাট্যবোধ দুর্বল ও অতিকলাপী ছিল না।" তিনি "কালজয়ী যুগাতিসারী দৃষ্টি ও রসচেতনার অধিকারী ছিলেন।"

বিভিন্ন দিক থেকে সমালোচ্য গ্রন্থটির মৌলিকতা লক্ষণীয়। মধুসূদন সম্পর্কে এতদিন পৌনঃপুনিক ও গতানুগতিক আলোচনায় উষর ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ সামন্ত তাঁর সযৌক্তিক মন্তব্যের এমন কিছু পলিমাটি ছড়িয়েছেন যাতে করে অনেকদিন বাদে মধু-সাহিত্যের সমালোচনা ভাণ্ডারে নতুন কিছু ফসল ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। 'কথাপ্রসঙ্গে' লেখক নতুন কথা শুনিয়েছেন,— "কবি মধুসূদন শ্রদ্ধেয় কিন্তু নাট্যকার মধুসূদন সুপ্রিয়। মেঘনাদ বধ কাব্যের রচয়িতা হয়তো 'মাইকেল মধুসূদন' কিন্তু নাটকগুলির রচয়িতা অবশ্যই 'শ্রীমধুসূদন'। বাংলাদেশের প্রথম গণনাট্যকার যদি কাকেও বল' যায় তবে তিনি নাট্যকার শ্রীমধুসূদন দত্ত।

'নাট্যবোধ ও নাট্যকার মধুসূদন' তেরটি পরিচ্ছেদে সুবিন্যস্ত। লেখকের সহজ, স্বচ্ছ, সুন্দর ও সাবলীল ভাষা-ভঙ্গি এবং ক্ষেত্রোপযোগী জীবন্ত চিত্রকল্প-রচনা তাঁর বক্তব্যকে সুস্পষ্ট ও সুসঙ্গত রূপ দান করেছে। অনাবশ্যক কথার জাল বিস্তার করেন নি লেখক। প্রথমেই তিনি মধুসূদনের নাট্যবোধ সম্বন্ধে মূল প্রশ্ন তুলেছেন; তারপর মধুসূদনের ভাষা-প্রতিভা ও সংলাপ-যোগ্যতা—তাঁর নাটকে গান—শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী ও কৃষ্ণকুমারী নাটকের পূর্ণাঙ্গ বিচার—মধুসূদনের প্রহসনদ্বয় ও নাট্যবোধ—মেঘনাদবধ ও বীরাঙ্গনা কাব্যে তাঁর নাট্যবোধের সঞ্চয় সাফল্য—মায়াকাননে নাট্যকার প্রতিভার পরিণাম—তাঁব নাটকের 'ম্যানারিজম্' সমূহ ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়বস্তু ধরে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ সামন্ত এই কথাটাই বেশি করে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে, মধুসূনের নাট্যবোধ ছিল পূর্ণ-পরিণত তাঁর "কোন নাটকে যদি কোন···ত্রুটি লক্ষিত হয় তা হলে তা সম্ভব হয়েছে বাহ্যিক অথচ অপ্রতিরোধ্য কারণে। তা মধুসূদনের নাট্যবোধের অভাবজাত নয়, মঞ্চের অন্ধ রসরুচির স্থূল হস্তাবলেপজাত।"

গ্রন্থটির ত্রুটি তেমন কিছু চোখে পড়ে না। কেবল কয়েকটি শব্দের প্রয়োগ—যেমন, বিধুরগণ, সংযোটন, কাহিনীমিতি, শরীর সংস্থান—শ্রুতিকটু বলে মনে হয়েছে। মুদ্রণ, বাঁধাই ও গণেশ বসু অঙ্কিত প্রচ্ছদ পরিচ্ছন্ন এবং মার্জিত রুচির সাক্ষ্য বহন করছে। 'রিজিয়া: এম্প্রেস অব ইন্দে" নাট্যকাব্যের অংশ বিশেষ ও 'রিজিয়া' নাটকের খসড়া রূপটি পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হওয়ায় গ্রন্থটির গৌরব বেড়েছে।

অমিয়কুমার দত্ত

কবিতা বিতান : দেবেন্দ্রনাথ মিত্র, ॥ পরগণা প্রকাশনী ॥ ৪৫ চক্রবেড়িয়া রোড (নর্থ) কলিকাতা-২০ ॥ দাম চার টাকা।

বাংলা জগতে পালাবদল ঘটেছে অনেক কাল আগেই। মিত্রাক্ষরের নূপুর বাজিয়ে নানা ছন্দের খেলা চলত, তার অবসান ঘটল রবীন্দ্রনাথের হাতেই। তিনি নিজেই তাঁর কবিতার বেশ বদল করালেন। তবুও তাঁর গদ্য কবিতায় ফেলে আসা দিনের শিঞ্জিনী ধ্বনি অস্পষ্ট হলেও শোনা গেল। তার মধ্যেও এক সুন্দর লয়ের আভাস পাওয়া গেল। ক্রমে অপসৃত হতে লাগলো ধ্বনি তরঙ্গের উত্থান পতনের খেলা। তার দেহ হলো রূঢ়। তার চলার ভঙ্গী হলো কর্কশ—বাস্তব জীবনের অবাঞ্ছিত সমস্যাসংকুল ঘটনার মতো। এই পরিপ্রেক্ষিতে দেবেন্দ্রনাথ মিত্রের 'কবিতা বিতান' বর্তমানের অতি-চঞ্চল জগতে স্নিগ্ধ বিশ্রম্ভালাপের আমেজ আনে। তার মধ্যে মিশ্র ছন্দের রঙের সাহায্যে নানা চারু-চিত্রের আলিম্পন, আর মাঝে মাঝে ফ্রেমের চারপাশে সোনালী জরির পাড় অতীত স্মৃতির রোমন্থনে নিশ্চিত আশ্বাস।

দেবেন্দ্রনাথ মিত্র রবীন্দ্রযুগের কবি। একারণেই রবীন্দ্র চিন্তা, ভাবনা ও রবীন্দ্র-রচিত প্রাক্-বলাকা যুগের ছন্দশৈলীর প্রভাব থেকে বিমুক্ত হতে পারেন নি এবং তাকে অতিক্রম করবার জন্য তাঁর লেশমাত্র প্রচেষ্টা এখানে অনুপস্থিত। বরং কয়েকটি স্থানে রবীন্দ্রনাথকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করার প্রয়াস সুস্পষ্ট। তার ফলে স্বাভাবিক ভাবেই একথা মনে হতে পারে আলোচ্য কবিতা গ্রন্থের স্থান কোথায়। যেখানে কামনা, হিংসা, জিঘাংসা, রিরংসা গাঁজালো রসের সঙ্গে মিশে আবাহাওয়াকে করে তুলেছে কটুগন্ধে ভর্তি, সেখানে দেবেন্দ্রনাথের ঈশ্বরোপাসনা বা নিসর্গ প্রীতি অথবা সুবাসিত প্রেম কিংবা মহৎ জীবনের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিঃসন্দেহে অবহেলিত হবে। তা হোক, কিন্তু কাল নিরবধি এবং কবিতা শাশ্বত। হয়তো এই কাব্যগ্রন্থ এই শতকের প্রথম দুটি দশকে অভিনন্দিত হতো, তার মূল্য স্বীকৃতি হতো, কিন্তু একথাও সত্যি যে ক্রমাগতভাবে উপলখণ্ডের উপর দিয়ে চলতে চলতে শ্রান্তি আসবেই এবং মানুষ তখন শান্তি পেতে সচেষ্ট হবে নিসর্গপ্রীতির মধ্যে, মলিনতাবিহীন প্রেমের স্নিগ্ধ কোমল স্পর্শে। 'কবিতা বিতান' তোলা থাকবে সেদিনের জন্যে।

গ্রন্থটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে কবিতার নানা শ্রেণীবিন্যাস দৃষ্টিগোচর হবে। ঈশ্বরের কাছে 'প্রার্থনা' জানিয়ে তিনি সুরু করেছেন তাঁর কাব্যচর্চা। 'পাগল' কবিতায় তিনি এক বিশেষ ভাবনার অনুসারী। তাঁর কাব্যখণ্ডে কখনো তিনি নিসর্গ প্রীতিতে উচ্ছল (ঝটিকার প্রতি, প্রভাতে, ঊষার উত্থান, বর্ষা দিনে, প্রকৃতির শোভা, শারদীয়া, ভাদরে ইত্যাদি), কখনো বা উপনিষদ, বাইবেল থেকে আহরণ করেছেন কবিতার উপাদান (সৃষ্টিতত্ত্ব, ব্রহ্ম, প্রার্থনা, কাহারা ধন্য, কর্তব্য, ধর্মকার্য), কোথাও আবার কবিতা সুন্দরীর মাহাত্ম্য কীর্তনে মুখর (কবিতা, প্রেরণার খেলা)। 'প্রেমের অনুভূতি' প্রকাশ করে প্রেমের নানা চিত্র অঙ্কনের সময়ে তিনি উল্লসিত হয়ে উঠেছেন (ছায়াময়ী, দেখা, উপহার, সমর্পণ, পূর্ণ বাসনা, প্রবাস যাত্রা, প্রণয়িনী [অনুবাদ])। যেমন যৌবনের গান গেয়েছেন তেমনি তার অনিত্যতার কথা শুনিয়ে দার্শনিক মেজাজ আনতে

সচেষ্ট হয়েছেন (যৌবন প্রবাহ, ভ্রান্তি)।

শুধু তাই নয়, কবি তাঁর গ্রন্থে মহৎ জীবনের জয়গানেও মুখরিত হয়ে উঠেছেন (রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ)। বিবিধ চিন্তার সমাবেশে এক স্নিগ্ধোজ্জ্বল শোভাযাত্রা। কয়েকটি উদ্ধৃতি সংগ্রহ করে তা নমুনা প্রকাশে বক্তব্যের প্রামাণিকতা অনুধাবন করা সম্ভব হবে।

(১) ঘন ঘোর বরিষণে তিমির নিশায়
চপলা চকিতে যবে চমকিয়া যায়,
গগনে জলদ দল গরজে গভীর
সেইদিন কপোলে কপোল রাখি ধীর
জেগে থাকি তামসী যামিনী ; কহি তথা
বিশ্রব্ধ আবেগে প্রাণের আনন্দ ব্যথা। : কবিতা পৃ ৩১

(২) বিশ্ব-তুষার জল হয়ে গলি'
দিতেছে সভয়ে ঘন অঞ্জলি
অমল কমল লুটায় চরণে ফুটিয়া অরুণ রাগে
তাহারি মানসে ভাবময় তব স্বরূপ সতত জাগে। : দরশন পৃ ৪২

(৩) তখনো আমার দ্রাক্ষা কুঞ্জে
ধরেনি রসাল ফল
তখনো বচন শেখেনি নয়ন
ঢলঢল সুকোমল। : প্রতিকার পৃ ৪৮

(৪) কাজল অপাঙ্গেতে আঁকিবে মেঘগুলি
বিজলী আঁখিমাঝে আসিবে নভে ভুলি'
শেফালি দলে দলে ঝরিয়া পদতলে
তোমারে সোহাগেতে লইবে বুকে তুলি। : শারদীয় পৃ ৬৪

এ কাব্যগ্রন্থ পাঠ করে সত্যই মনে হবে, 'এ পুষ্পাঞ্জলি যেন মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের স্বুবর্ণমুদ্রা। একালের বাণিজ্য বন্দরে এর মূল্য নিরূপিত না হলেও এর বিশিষ্ট স্থান চিরদিন নির্দ্দিষ্ট থাকবে প্রাচীন ঐশ্বর্যের জাদুঘরে দুর্লভ বস্তুর সঙ্গে' (ভূমিকা, কবিতা বিতান)।

তবে একথা স্থির যে মানুষ যাদুঘরে গিয়ে আনন্দিত হয়, এক বিশেষ ভাল লাগার উন্মাদনা সে অনুভব করে। সুমুদ্রিত ও সুরুচিপূর্ণ প্রচ্ছদ সমন্বিত 'কবিতা বিতান' সেই আনন্দ দেবে বলে আশা করা যায়।

অমিয়কুমার মজুমদার

দ্বাদশ বর্ষ ॥ ১৩৭২

মে ১৯৬৫—এপ্রিল ১৯৬৬

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা
সম্পাদক ॥ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সূচীপত্র

বৈশাখ

জ্যৈষ্ঠ

আষাঢ়

শ্রাবণ

ভাদ্র

আশ্বিন

কার্তিক

অগ্রহায়ণ

পৌষ

মাঘ

ফাল্গুন

চৈত্র

A
R
U
N
A

আনন্দে উৎসবে...
প্রাত্যহিক প্রয়োজনে..
সবার মনোরঞ্জনে...
কমনীয় কেশতৈল
কেশরঞ্জন